উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনৈতিক

ভূগোল

অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়
ও
অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

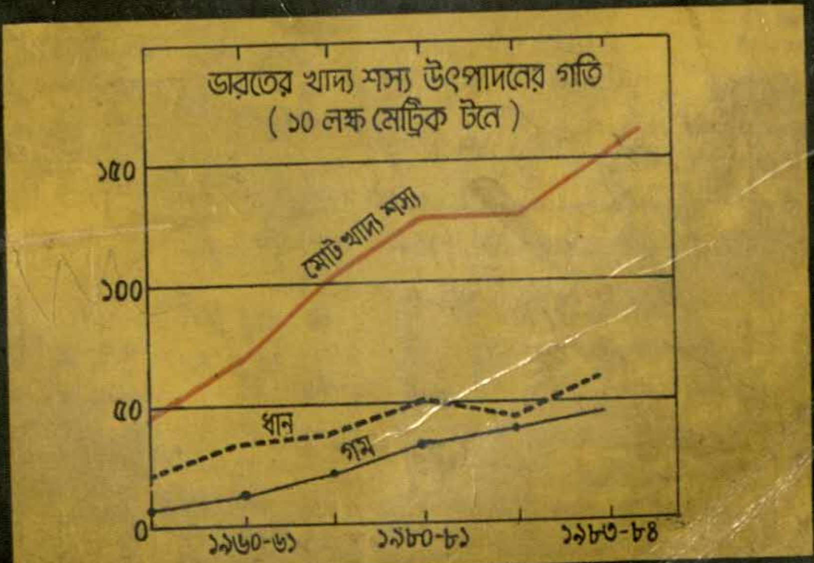

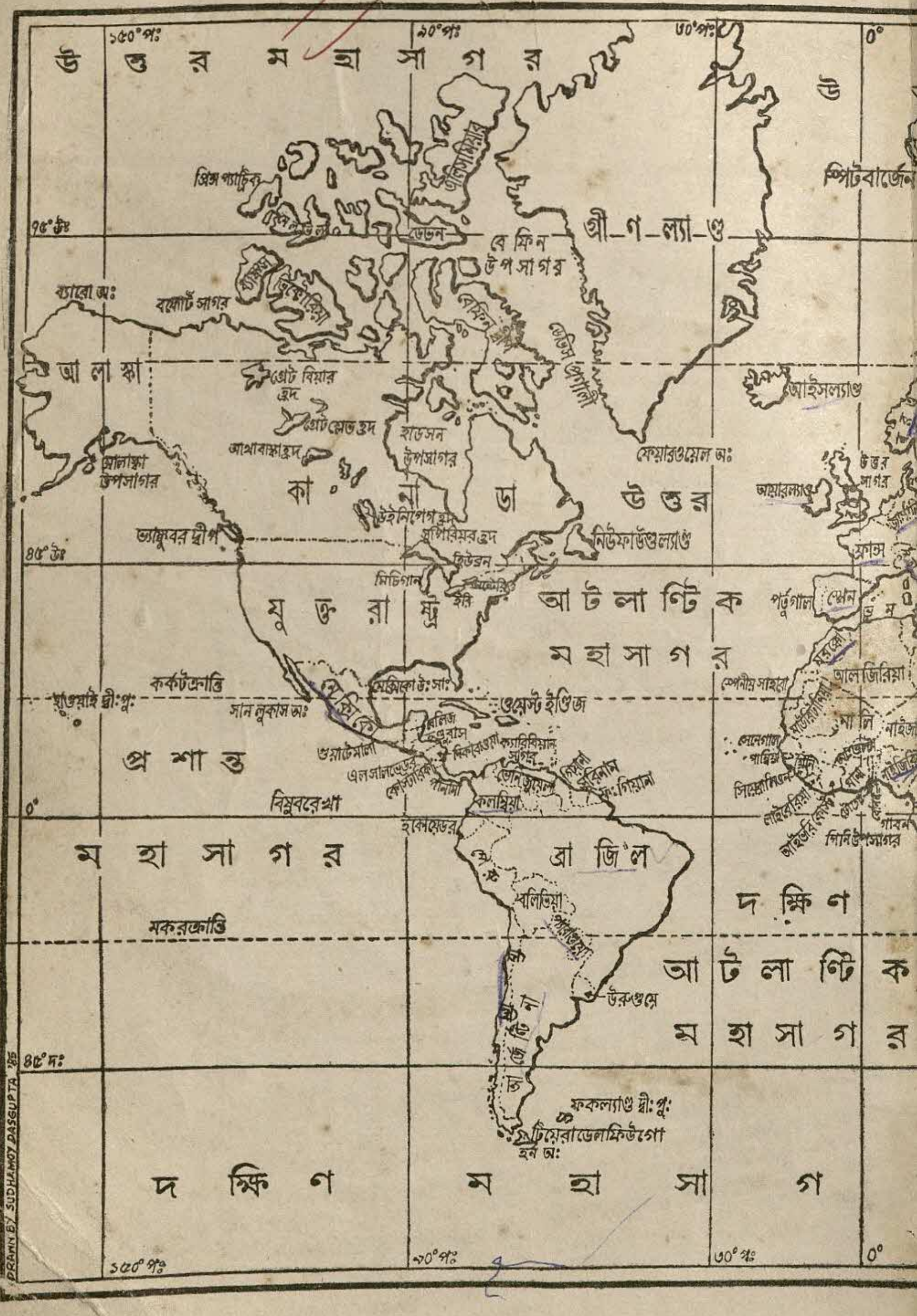

১৫০° পঃ
৯০° পঃ
৩০° পঃ
0°
উ ত্ত র ম হা সা গ র
প্রিন্স প্যাট্রিক
৭৫° উঃ
ডেভন
বে ফিন উপ সাগর
গ্রী-ন-ল্যা-ণ্ড
স্পিটবার্জেন
ব্যারো অঃ
বফোর্ট সাগর
আ লা স্কা
গ্রেট বিয়ার হ্রদ
গ্রেট স্লেভ হ্রদ
আথাবাস্কা হ্রদ
হাডসন উপসাগর
আলাস্কা উপসাগর
কা না ডা
উইনিপেগ হ্রদ
সুপিরিয়র হ্রদ
ভ্যাঙ্কুবর দ্বীপ
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড
৪৫° উঃ
হিউরন
মিচিগান
ইরি
যু ক্ত রা ষ্ট্র
আ ট লা ন্টি ক
ম হা সা গ র
উ ত্ত র
আইসল্যাণ্ড
ফেয়ারওয়েল অঃ
আয়ারল্যাণ্ড
উত্তর সাগর
ফ্রান্স
পর্তুগাল
স্পেন
মরক্কো
আলজিরিয়া
কর্কটক্রান্তি
হাওয়াই দ্বীঃপুঃ
সান লুকাস অঃ
মেক্সিকো উঃ সাঃ
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
গুয়াটেমালা
এলসালভেডর
কোস্টারিকা
পানামা
ক্যারিবিয়ান সাগর
ভেনিজুয়েলা
কলম্বিয়া
ফঃ গিয়ানা
প্র শা ন্ত
বিষুবরেখা
ইকোয়েডর
ম হা সা গ র
ব্রা জি ল
বলিভিয়া
দ ক্ষি ণ
মকরক্রান্তি
আ ট লা ন্টি ক
ম হা সা গ র
উরুগুয়ে
৪৫° দঃ
ফকল্যাণ্ড দ্বীঃপুঃ
টিয়েরা ডেল ফিউগো
হর্ন অঃ
দ ক্ষি ণ ম হা সা গ
সিয়েরালিওন
লাইবেরিয়া
গিনি উপসাগর
গাবন
DRAWN BY SUDHAMOY DASGUPTA

Soma Banerjee

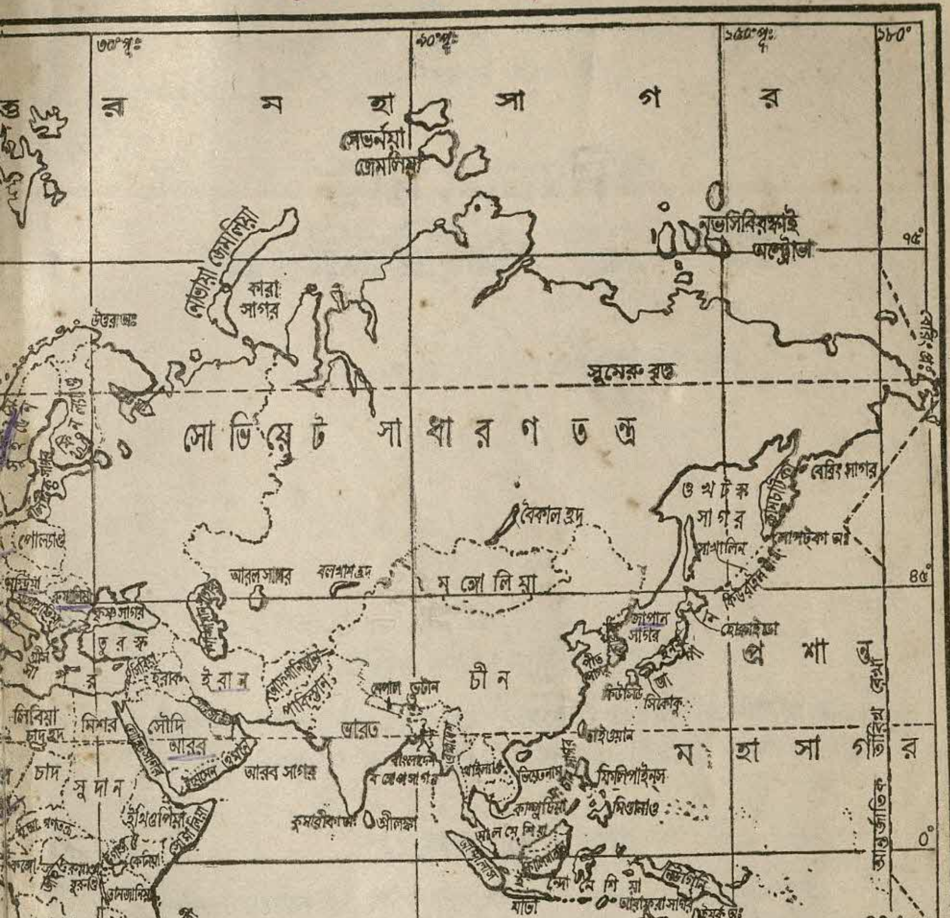

3614
6.1.87

[পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত সর্বশেষ সংশোধিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর অর্থনৈতিক ভূগোলের (Economic Geography) পাঠ্যক্রম অনুসারে লিখিত ।]

উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনৈতিক ভূগোল

[একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য]

অজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ, বনহুগলী কলেজ অফ কমার্স, কলিকাতা ও গোয়েংকা কলেজ অফ কমার্স অ্যাণ্ড বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কলিকাতা ।

ও

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রধান অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ (মর্নিং), কলিকাতা, প্রাক্তন অধ্যাপক, গোয়েংকা কলেজ অফ কমার্স অ্যাণ্ড বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কলিকাতা ও বিধান চন্দ্র কলেজ, রিষড়া ।

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3. B. C.

সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স
৮/১ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৭০০০০৯

শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায়
ও
শ্রীমতী মায়া মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লেখস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৮৫

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 6-1-87
Acc. No. 3619

প্রকাশক
শ্রীযামিনীকান্ত সেন
৮।১, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
শ্রীযামিনীভূষণ উকিল
দি মুকুল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬
এবং
কৃষ্ণা রায়
তারা মুদ্রণ
২৫০/এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

দাম : ৩৫ টাকা

উৎসর্গ

মাতৃদেবী
শ্রীমতী অমিয়া চট্টোপাধ্যায়

মাতৃদেবী
শ্রীমতী মলিনা মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত সর্বশেষ সংশোধিত পাঠক্রম অনুযায়ী একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর অর্থনৈতিক ভূগোলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই পুস্তক রচিত হইল। পাঠক্রম, পঠন-পাঠন ব্যবস্থা ও পরীক্ষাধারার পরিবর্তনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সংশোধিত পাঠক্রমের প্রতিটি বিষয়ের উপযুক্ত গুরুত্বসহ আলোচনা করা হইয়াছে। সাধ্যানুযায়ী নূতন পাঠক্রমের মূল ব্যঞ্জনাটিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রতিটি বিষয়ের সহজ, সরল ও বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। ম্যাপ, পরিসংখ্যান, বারগ্রাফ, সারণী, তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদির সাহায্যে বিষয়বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে দুইটি পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। প্রতিটি বিষয়কে কয়েকটি উপবিষয়ে ভাগ করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে এবং প্রতিটি উপবিষয়ের শেষে 'চালনাত্মক প্রশ্ন' (Leading Questions) দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ছাত্রছাত্রীদের অধীত জ্ঞানের স্বনির্ভর পরীক্ষার সুযোগ ঘটিবে এবং অধীত পাঠ্যাংশের অন্তর্গত প্রশ্নাবলী সম্পর্কে বাস্তব ধারণার সৃষ্টি হইবে। অধিকন্তু ইহাতে 'বাস্তবমুখী প্রশ্ন' (Objective Questions) ও 'সংক্ষিপ্ত উত্তর বিষয়ক প্রশ্ন' (Short Answer Type Questions) প্রস্তুতিতেও বিশেষ সুবিধা হইবে। প্রতিটি পরিচ্ছেদের শেষে বিভিন্ন ধরনের বিষয়মুখী (Essay Type) প্রশ্নাবলী এবং পরিশিষ্টে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা সংসদের প্রশ্নাবলী সন্নিবেশিত হইল।

এই পুস্তক প্রকাশে যাঁহাদের অবদান সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে তাঁহারা হইলেন প্রকাশক এবং মুদ্রাকর ও মুদ্রণ বিভাগের কর্মীবৃন্দ। তাঁহাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও উদার আনুকূল্য কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয়। সমগ্র পুস্তকটির প্রুফ সংশোধন কার্যে শ্রীমতী মায়া মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সংহিতা চট্টোপাধ্যায়-এর অকৃত্রিম সহযোগিতা বিশেষ স্বীকৃতির দাবি রাখে।

ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাব্রতী, শুভানুধ্যায়ী সকলের নিকট পুস্তকখানি সমাদর লাভ করিলে সকল প্রয়াস সফল হইবে। এই পুস্তকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে কোন মতামত, প্রস্তাব ও উপদেশ কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

পরিশেষে উল্লেখ্য সংসদ কর্তৃক ইংরেজী 'Higher Secondary'-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত 'উচ্চ মাধ্যমিক' কথাটি এই বই-এর নামের সঙ্গে যুক্ত হইল।

কলিকাতা,
রথযাত্রা,
৫ই আষাঢ়, ১৩৯২

বিনীত
অজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়
অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

WEST BENGAL COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION

ECONOMIC GEOGRAPHY

SYLLABUS

Full Marks—200

PAPER I (Marks—100)

1. (a) **Economic Geography :** meaning and scope—methods of study—relation with other branches of Geography—importance of study—dynamic nature.

   (b) **Man and his environment :** Principal factors of environment—(i) Physical : geographical location, topography, inland waterbodies, coastline, climate, soil, animals, vegetation, minerals etc. (ii) Non-physical : population, political and social organisation, adaptation of man to his environment, effects of environment on the economic life of man.

   (c) **Climatic regions of the world :** Polar, Temperate (Cool and Warm), Tropical and Equatorial ; their influence on vegetation, animal life, distribution of population, transport, economic development etc.

   (d) **Meaning and nature of resources :** Resources-creating factors—functional theory of resources—concept of conservation of resources.

   (e) **Dual role of man :** Man-land ratio and population densities—causes of uneven distribution of population—world distribution of population—concept of optimum population—world population trend.

Principal resources of the world and their utilisation :

(a) **Fishing and world fisheries :** Economic significance of the sea—important commercial fisheries of the world—modern methods of sea-fishing—fish trade—fish conservation.

(b) **Forest and forest resources :** Utility of forests—classification of forests—distribution of forest areas of the world and their exploitation—timber trade—forest conservation.

(c) Soils : Features—classification—soil problems—soil conservation.

(d) Minerals and power resources : Features of mining—mining and agriculture compared—classification.
Principal minerals and their uses : (i) Metals : Iron, Copper, Lead, Tin, Zinc, Aluminium, Manganese. (ii) Non-metals : Salt, Mica, Building Materials. (iii) Fuel minerals : Coal, Petroleum, Water-power. Principal producers, Consumers and Traders.

3. **Principal resources of the world and their utilisation :**

(a) **Farming and farm resources :** Influence of climate on agriculture—types of farming—principal agriculture products : (i) Food crops : Rice, Wheat, Tea, Coffee, Sugar-cane, Sugar-beet. (ii) Commercial crops : Cotton, Jute, Hemp, Silk, Rubber, Oil-seeds—Their uses, Principal growing areas, Important markets.

(b) Pastoral **Farming :** Livestock—importance—principal products and their uses—production of Raw Wool, Hides and Skins and Dairy article.

(c) **Transport, trade routes and trade centres :**
Importance of transport—different modes of modern transport : Roads, Inland waterways, Railways, Shipping and Airways.
Trade routes : Land routes (road and rail), Water routes (ocean, canal and river), and Air routes. Examples of important routes—a descriptive study.
The Suez canal and the Panama canal.
Trade centres : Ports and Harbours—their functions, relation with the hinterland, required conditions for development. Some important ports of international standing.

(d) **Manufacturing Industries :**

(i) Essential factors for development—location of industries—industrial regions of the world—important industries : Iron and Steel, Textiles (Cotton, Wool, Silk, Artificial Silk, Jute), Paper and Chemicals. Chief world centres.

(ii) **Trade :** Trade as an index of economic development—bases of international trade—major commercial regions of the world. (See Note below)

Note : The following portions of the syllabus will be treated as alternatives to each other, that is, if questions are set from topics of one area of study, alternative questions will be set from topics of the other area of study—

Portion of syllabus stated in sub-section 3 (c)—"Transport, trade routes and trade centres" in item 3 of the printed syllabus under the heading "Principal resources of the world and their utilisation."

Or,

Portion of syllabus as printed under headline "Manufacturing Industries"—all topics.

ECONOMIC GEOGRAPHY OF INDIA

PAPER II (Marks—100)

A detailed study of the economic geography of India under the following heads :—

(a) Environmental features.

(b) Agriculture and agricultural products—pastoral resources—fishing—mining and important mineral resources—water-power—multipurpose river valley projects—forests and forest resources.

(c) Transport, trade routes, ports and trade centres.

(d) Manufacturing Industries : Iron and Steel, Textiles (Cotton, Wool, Jute), Paper, Chemicals, Sugar, Engineering.

(e) Foreign trade.

(f) Distribution of population.

(g) Economic geography of West Bengal : Principal agricultural and mineral resources—large scale industries and industrial regions, Tea industry—importance of Calcutta port.

সূচীপত্র

প্রথম পত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১ : অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা ৩-১৬

পূর্বাভাষ—৩ ; সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয়—৫ ; অনুশীলন পদ্ধতি—৯ ; অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত সম্পর্ক—১১ ; অর্থনৈতিক পাঠের প্রয়োজনীয়তা—১৩ ; অর্থনৈতিক ভূগোল—একটি গতিশীল বিজ্ঞান—১৪।

অধ্যায় ২ : মানুষ ও তাহার পরিবেশ ১৭-৪৯

পরিবেশ : ইহার শ্রেণীবিভাগ ও উপাদান—১৭।

প্রাকৃতিক পরিবেশ : ভৌগোলিক অবস্থান—১৯ ; আকার-আয়তন—২২ ; তটরেখা—২৩ ; ভূ-প্রকৃতি—২৫ ; জলবায়ু—২৯ ; যন্ত্রশিল্প ও জলবায়ু—৩১ ; আভ্যন্তরীণ জলভাগ—৩৩ ; প্রাকৃতিক সম্পদ—৩৭।

অপ্রাকৃতিক পরিবেশ : জনসংখ্যা—৪১ ; সামাজিক সংগঠন—৪১ ; পরিবেশের সহিত অভিযোজন—৪৬।

অধ্যায় ৩ : পৃথিবীর জলবায়ু অঞ্চল ৫১-৮৬

জলবায়ু অঞ্চল—৫১ ; আলোচনার প্রয়োজনীয়তা—৫৩ ; প্রাকৃতিক অঞ্চল—৫৫।

বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চল ইহাদের প্রভাব : নিরক্ষীয় অঞ্চল—৫৬ ; মৌসুমী অঞ্চল—৬০ ; সুদান বা সাভানা অঞ্চল—৬৪ ; বলিভিয়া অঞ্চল—৬৭ ; মরু অঞ্চল—৬৮ ; চৈনিক অঞ্চল—৭১ ; স্তেপ অঞ্চল—৭৩ ; ইরান আদর্শের অঞ্চল—৭৫ ; ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল—৭৫ ; লরেন্সীয় অঞ্চল—৭৮ ; সাইবেরিয়া অঞ্চল—৮০ ; আলতাই অঞ্চল—৮১ ; বৃটিশ আদর্শের অঞ্চল—৮২ ; তুন্দ্রাঞ্চল—৮৪।

অধ্যায় ৪ : সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ৮৮-৯৮

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য—৮৮ ; শ্রেণীবিভাগ—৮৯ ; সম্পদ সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান—৯২ ; সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব—৯৫ ; সম্পদ সংরক্ষণ—৯৬ ; সম্পদ সংরক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি—৯৭।

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় ৫ : মনুষ্য সম্পদ ১০০ ১১৬

মানুষের দ্বৈত ভূমিকা—১০০ ; মনুষ্যবসতির ঘনত্ব—১০১ ; মানুষ-জমির অনুপাত—১০২ ; বসতি ঘনত্বের তারতম্যের কারণ—১০৪ ; কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের ধারণা—১০৭ ; পৃথিবীর জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি—১১০ ; পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন—১১৩।

অধ্যায় ৬ : বিভিন্ন পার্থিব সম্পদ—মৎস্য সম্পদ ১১৮-১৩০

সমুদ্রের অর্থনৈতিক তাৎপর্য—১১৮ ; মৎস্য চাষ—১১৯ ; বাণিজ্যিক মৎস্য চাষের গুরুত্ব—১২০ ; মৎস্যচারণ ক্ষেত্রসমূহের গঠন—১২১ ; পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যচারণ ক্ষেত্রসমূহ—১২৫ ; মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ—১২৯।

অধ্যায় ৭ : অরণ্য ও বনজ সম্পদ ১৩২-১৪২

বনভূমির ব্যবহার ও গুরুত্ব—১৩২ ; অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ—১৩৩ ; চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য—১৩৫ ; পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য—১৩৭ ; সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য—১৩৮ ; বনভূমির সংরক্ষণ—১৪১।

অধ্যায় ৮ : মৃত্তিকা ১৪৪-১৪৮

মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ—১৪৪ ; বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা—১৪৫ ; ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকার সমস্যা—১৪৭ ; ভূমি সংরক্ষণ—১৪৭।

অধ্যায় ৯ : খনিজ সম্পদ ১৪৯-১৭২

খনিজ সম্পদ ও ইহার বৈশিষ্ট্য—১৪৯ ; খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ—১৫১ ; কৃষিকার্য ও খনিজ শিল্পের তুলনা—১৫১ ; লৌহ আকরিক—১৫২ ; ম্যাঙ্গানিজ—১৫৮ ; তাম্র—১৬০ ; টিন—১৬২ ; বক্সাইট—১৬৪ ; সীসা—১৬৬ ; দস্তা—১৬৮ ; লবণ—১৬৯ ; অভ্র—১৭০ ; গৃহ-নির্মাণে ব্যবহৃত খনিজ পদার্থ—১৭১।

অধ্যায় ১০ : শক্তি সম্পদ ১৭৪ ১৯৩

শক্তি সম্পদের গুরুত্ব ও উৎস—১৭৪ ; কয়লা—১৭৫ ; খনিজ তেল—১৮১ ; জলবিদ্যুৎ—১৮৮ ; বিভিন্ন শক্তি-সম্পদের তুলনা—১৯২।

অধ্যায় ১১ : কৃষিকার্য ও কৃষিজ সম্পদ ১৯৫-২৫৭

কৃষির সংজ্ঞা—১৯৫ ; কৃষি ও ইহার উপাদান—১৯৬ ; কৃষিকার্যে প্রকৃতির প্রভাব ও মানুষের প্রচেষ্টা—২০০ ; কৃষি প্রণালী—২০১ ; ফসলের শ্রেণী বিভাগ—২০৩ ; ধান—২০৪ ; গম—২১১ ; ধান ও গম চাষের তুলনা—২১৭ ;

বিষয় পৃষ্ঠা

চা—২১৯ ; কফি—২২৩ ; চিনি—২২৭ ; বীট—২৩১ ; ইক্ষু ও বীটের তুলনা—২৩৩ ; তুলা—২৩৪ ; পাট—২৩৯ ; রেশম—২৪৩ ; শন—২৪৫ ; রবার—২৪৭ ; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রবারের চাষ—২৫০ ; তৈলবীজ—২৫৩।

অধ্যায় ১২ : পশুপালন ২৬১-২৭২

পশুজাত দ্রব্যাদি ও পশুপালনের গুরুত্ব—২৬১ ; পশুচারণ ক্ষেত্রসমূহ—২৬৩ ; পশম—২৬৫ ; মাংস শিল্প—২৬৭ ; চর্ম—২৬৯ ; অন্যান্য প্রাণীজাত দ্রব্য—২৬৯ ; ডেয়ারী শিল্প—২৭০।

অধ্যায় ১৩ : পরিবহণ ও বাণিজ্যপথ ২৭৪ ৩০২

পরিবহণের শ্রেণীবিভাগ—২৭৪ ; পরিবহণের গুরুত্ব—২৭৫ ; স্থলপথে পরিবহণ—২৭৭ ; রেলপথ—২৭৮ ; মহাদেশীয় রেলপথ—২৮০ ; জলপথ—২৮৫ ; অন্তর্দেশীয় প্রধান জলপথ—২৮৬ ; সমুদ্রপথ—২৮৮ ; সুয়েজ খাল—২৯১ ; পানামা খাল—২৯৩ ; বিমান পথ—২৯৫ ; নলপথ—২৯৭ ; বিভিন্ন প্রকার পরিবহণ ও উহার বৈশিষ্ট্য—২৯৯ ; বিভিন্ন প্রকার পরিবহণের সুবিধা ও অসুবিধা—৩০০।

অধ্যায় ১৪ : বাণিজ্য কেন্দ্র—বন্দর ও শহর ৩০৪-৩১০

বন্দর ও পোতাশ্রয়—৩০৪ ; বন্দরের শ্রেণীবিভাগ—৩০৫ ; শহর ও নগর—৩০৯।

অধ্যায় ১৫ : আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন কয়েকটি বন্দর ও শহর ৩১১-৩২০

যুক্তরাজ্য—৩১১ ; ফ্রান্স—৩১২ ; ইউরোপের অন্যান্য বন্দর—৩১৩ ; সোভিয়েত ইউনিয়ন—৩১৪ ; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—৩১৪ ; কানাডা—৩১৬ ; দক্ষিণ আমেরিকা—৩১৭ ; এশিয়া—৩১৮ ; ওশিয়ানিয়া—৩২০।

অধ্যায় ১৬ : যন্ত্রশিল্প বা সর্জন শিল্প ৩২১-৩৩৩

যন্ত্রশিল্প—৩২১ ; শ্রমশিল্প গঠনের উপযোগী উপাদান—৩২২ ; শিল্পের একদেশীভবন ও ওয়েবার তত্ত্ব—৩২৫ ; পৃথিবীর প্রধান শিল্পাঞ্চল—৩২৬ ; পশ্চিম ইউরোপীয় শিল্পাঞ্চল—৩২৭ ; উত্তর আমেরিকার মধ্য-পূর্ব শিল্পাঞ্চল—৩২৮ ; সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পাঞ্চল—৩৩০ ; ভারতের শিল্পাঞ্চল—৩৩২ ; দূর প্রাচ্যের শিল্পাঞ্চল—৩৩৩।

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১৭ : পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান শ্রমশিল্প ৩৩৫-৩৬২

লোহ ও ইস্পাত শিল্প—৩৩৫ ; বয়ন শিল্প—৩৪৩ ; কার্পাস বয়ন—৩৪৩ ; পশম বয়ন—৩৪৮ ; রেশম বয়ন—৩৫১ ; কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন বয়ন শিল্প—৩৫৩ ; পাট শিল্প—৩৫৫ ; কাগজ শিল্প—৩৫৭ ; রাসায়নিক শিল্প—৩৫৯ ; রাসায়নিক সার শিল্প—৩৬১।

অধ্যায় ১৮ : বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক অঞ্চল ৩৬৫-৩৭৫

বাণিজ্য ও উহার শ্রেণীবিভাগ—৩৬৫ ; আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ—৩৬৭ ; পৃথিবীর বাণিজ্যিক অঞ্চল—৩৭০ ; ইউরোপীয় সাধারণ বাজার—৩৭১ ; ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংঘ—৩৭২ ; সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বাণিজ্যিক অঞ্চল—৩৭৩ ; কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহ—৩৭৩ ; উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাণিজ্যিক অঞ্চল—৩৭৪।

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১ : ভারত—সূচনা ১-৭

অবস্থান, সীমা, আয়তন ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো—৫ ;

অধ্যায় ২ : পরিবেশ ৮-৪৯

অবস্থান ও আয়তন এবং ইহার প্রভাব—৮ ; সৈকত রেখা এবং ইহার প্রভাব—১০ ; ভূ-প্রকৃতি এবং ইহার প্রভাব—১৩ ; উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল—১২ ; মধ্যবর্তী সমভূমি—১৮ ; দক্ষিণের মালভূমি—২৬ ; পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমি—২৮ ; দ্বীপভূমি—৩১ ; ভারতের নদ-নদী—৩৩ ; উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদ-নদীর তুলনা—৩৬ ; নদ-নদীর প্রভাব—৩৭ ; জলবায়ু ও ইহার প্রভাব—৩৯ ; ভারতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব—৪৩ ; ভারতের বৃষ্টিপাত অঞ্চল—৪৫ ; মনুষ্য-সম্পদ সংস্কৃতি —৪৭ ;

অধ্যায় ৩ : কৃষিকার্য ৫২-৭৯

ভূমির ব্যবহার ও কৃষির অবস্থা—৫৩ ; কৃষিজাত পণ্য—৫৪ ; মৃত্তিকা—৫৫ ; ভূমিক্ষয়—৫৯, ভূমি সংরক্ষণ—৬০ ; ফসলের ঋতু—৬১ ; জলসেচ পদ্ধতি—৬৪ ; ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা ও খাদ্য-সমস্যা—৭১।

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় ৪ : ভারতীয় কৃষি ফসল ৮২-১১৭

ধান—৮২ ; গম—৮৭ ; ভুট্টা—৯২ ; মিলেট—৯৪ ; চা—৯৭ ; কফি—১০০ ; তুলা—১০১ ; পাট—১০৪ ; মেস্তা—১০৮ ; ইক্ষু—১০৯ ; রবার—১১৩ ; তামাক—১১৪ ; তৈলবীজ—১১৬ ।

অধ্যায় ৫ : ভারতে পশু ও পশু সম্পদ ১২০-১২৩

পশু সম্পদ—১২০ ; সমস্যা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা—১২২ ।

অধ্যায় ৬ : ভারতের মৎস্য সম্পদ ১২৪-১২৭

মৎস্য সম্পদ—১২৪ ; মৎস্যশিল্পের সমস্যা—১২৪ ; উৎপাদন ও প্রসার—১২৫ ; উন্নয়ন প্রচেষ্টা—১২৭ ।

অধ্যায় ৭ : ভারতের অরণ্য ও অরণ্য সম্পদ ১২৮-১৩৪

অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ—১২৮ ; বনজ সম্পদ ও ইহার ব্যবহার—১৩১ ; বনভূমির সমস্যা—১৩৩ ।

অধ্যায় ৮ : ভারতের খনিজ সম্পদ ১৩৭-১৫৪

ভারতীয় খনিজ—১৩৭ ; লৌহ আকরিক—১৩৯ ; ম্যাঙ্গানিজ—১৪৩ ; তাম্র—১৪৫ ; বক্সাইট—১৪৭ ; অভ্র—১৫০ ; চুনাপাথর—১৫১ ; জিপসাম—১৫৩ ; সীসা ও দস্তা—১৫৩ ; স্বর্ণ—১৫৩ ; হীরক—১৫৪ ; ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম—১৫৪ ।

অধ্যায় ৯ : ভারতের শক্তি সম্পদ ১৫৫-১৭৫

কয়লা—১৫৫ ; খনিজ তেল—১৬২ ; জলবিদ্যুৎ—১৬৯ ; পারমাণবিক শক্তি—১৭৫ ।

অধ্যায় ১০ : ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ১৭৯-১৯৮

বহুমুখী নদী পরিকল্পনা—১৭৯ ; দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—১৮০ ; ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা—১৮৫ ; মহানদী পরিকল্পনা—১৮৭ ; কোশী পরিকল্পনা—১৮৮ ; গঙ্গাবাঁধ—১৮৯ ; ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা—১৯৩ ; চম্বল—১৯৪ ; তুঙ্গভদ্রা—১৯৫ ; নাগার্জুন সাগর—১৯৬ ; অন্যান্য কয়েকটি নদী প্রকল্প—১৯৬ ।

বিষয় পৃষ্ঠা

অধ্যায় ১১ : ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থা ২০০-২২৩

পরিবহণের শ্রেণীবিভাগ—২০০ ; ভারতের সড়কপথ—২০০ ; রেলপথ—২০৩ ; জলপথ—২০৭ ; বিমান পথ—২০৯ ; ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর ও শহর—২১১ ; বাণিজ্যকেন্দ্র—২১৬ ।

অধ্যায় ১২ : ভারতের শ্রমশিল্প ২২৬-২৬৫

ভারতের শিল্প বিকাশ—২২৬ ; ভারতের শিল্পাঞ্চল—২২৭ ; লৌহ-ইস্পাত শিল্প—২২৯ ; কার্পাস বয়ন শিল্প—২৩৮ ; পশমবয়ন শিল্প—২৪৩ ; পাটশিল্প—২৪৫ ; কাগজ শিল্প—২৪৮ ; চিনি শিল্প—২৫২ ; রাসায়নিক শিল্প—২৫৬ ; পূর্ত শিল্প—২৬০ ।

অধ্যায় ১৩ : ভারতের বহির্বাণিজ্য ২৭০-২৭৬

বহির্বাণিজ্য গঠন—২৭০ ; পরিমাণ ও উদ্বৃত্ত—২৭২ ; বাণিজ্যের গঠন, গতি ও পরিমাণ—২৭৩ ; বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন—২৭৫ ।

অধ্যায় ১৪ : ভারতের জনবিন্যাস ২৭৮-২৮৪

ভারতের জনসংখ্যা—২৭৮ ; লোকবসতির তারতম্যের কারণ—২৮১ ; ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনবণ্টন—২৮৩ ।

অধ্যায় ১৫ : পশ্চিমবঙ্গ ২৮৬-৩০৬

অবস্থান ও আয়তন—২৮৬ ; কৃষি—২৮৭ ; খনিজ সম্পদ—২৯০ ; বিদ্যুৎ—২৯২ ; শিল্প—২৯২ ; শিল্পাঞ্চল—২৯৫ ; বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চল—২৯৬ ; হলদিয়া শিল্পসমাবেশ—৩০১ ; আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল—৩০৪ ; জলপাইগুড়ি দার্জিলিং শিল্পাঞ্চল—৩০৫ ; কলিকাতা বন্দর—৩০৫ ।

অধ্যায় ১৬ : ত্রিপুরা ৩০৮-৩১৪

অবস্থান ও আয়তন—৩০৮ ; প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—৩০৮ ; জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সম্পদ—৩১০ ; কৃষির উন্নয়ন—৩১২ ; খনিজ ও শক্তি সম্পদ—৩১৩ ; শ্রমশিল্প ও কুটিরশিল্প—৩১৩ ; শহর—৩১৪ ।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের আদর্শ প্রশ্নাবলী ৩১৫

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নাবলী ৩২৬

ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নাবলী ৩৪৫

উচ্চ-মাধ্যমিক অর্থনৈতিক ভূগোল

১ অর্থনৈতিক ভূগোল—পূর্বাভাষ
(Economic Geography—Introduction)

মানুষের আবাসস্থল এই পৃথিবী প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্যে অতুলনীয়। ইহার পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, অরণ্য-প্রান্তর, জীব-জন্তু, সবকিছুই মানুষের জীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। ইহাদের প্রভাব মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে যে কত গভীর তাহা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়।

মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন খাদ্য-পানীয়, পরিধান এবং বাসস্থানের। এই প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মানুষ তাহার জন্মলগ্ন হইতেই প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছে। অভাববোধ হইতেই মানুষের সকল প্রকার কার্যকলাপের সূত্রপাত। অভাবতৃপ্তি বা ভোগের জন্যই তাহার নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টা, বহুবিস্তৃত কর্মের আয়োজন ও নিরন্তর সাধনা।

প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে মানুষ নানাভাবে সম্পদ আহরণ করে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উহা হইতে ভোগের উপযোগী সামগ্রী প্রস্তুত করে এবং দেশে-বিদেশে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ঐ সকল সামগ্রী বণ্টন করিয়া মানুষ ভোগ করে। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের এই কর্মপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহার বিরাম নাই। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মানুষের বিভিন্নমুখী কর্মপ্রচেষ্টাই তাহার অর্থনৈতিক জীবন।

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সকল প্রকার কর্মধারাকে বিশ্লেষণ করিলে চারিটি প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায়—(১) ভোগ (Consumption), (২) উৎপাদন (Production), (৩) বণ্টন (Distribution) ও (৪) বিনিময় (Exchange)। অভাবতৃপ্তি বা ভোগের জন্য মানুষের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়মূলক সকল প্রকার কার্যধারা ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। নিম্নলিখিত ছক হইতে মানুষের এই বহুবিস্তৃত কর্মধারার কিছুটা আভাষ পাওয়া যাইবে :

অর্থনৈতিক কার্যধারা

১. ভোগ (Consumption)	অভাবতৃপ্তির জন্য নানাবিধ পণ্যদ্রব্য ও সেবার ব্যবহার।
২. উৎপাদন (Production)	(ক) প্রাথমিক—প্রকৃতি হইতে প্রত্যক্ষভাবে সম্পদ আহরণ—কৃষিকাজ, বনজ সম্পদ, মৎস্য ও অন্যান্য জলজ সম্পদ আহরণ, খনিজ সম্পদ উত্তোলন। (খ) মাধ্যমিক—বিভিন্ন প্রকার প্রাথমিক পণ্য সামগ্রীর রূপান্তর ঘটাইয়া তাহার উপযোগিতা ও মূল্যবৃদ্ধি। (গ) চূড়ান্ত—সেবামূলক কার্যধারা—পরিবহণ, অর্থ-সংস্থান, ঝুঁকি বণ্টন, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি নানাবিধ আনুষঙ্গিক কর্মের অনুষ্ঠান।

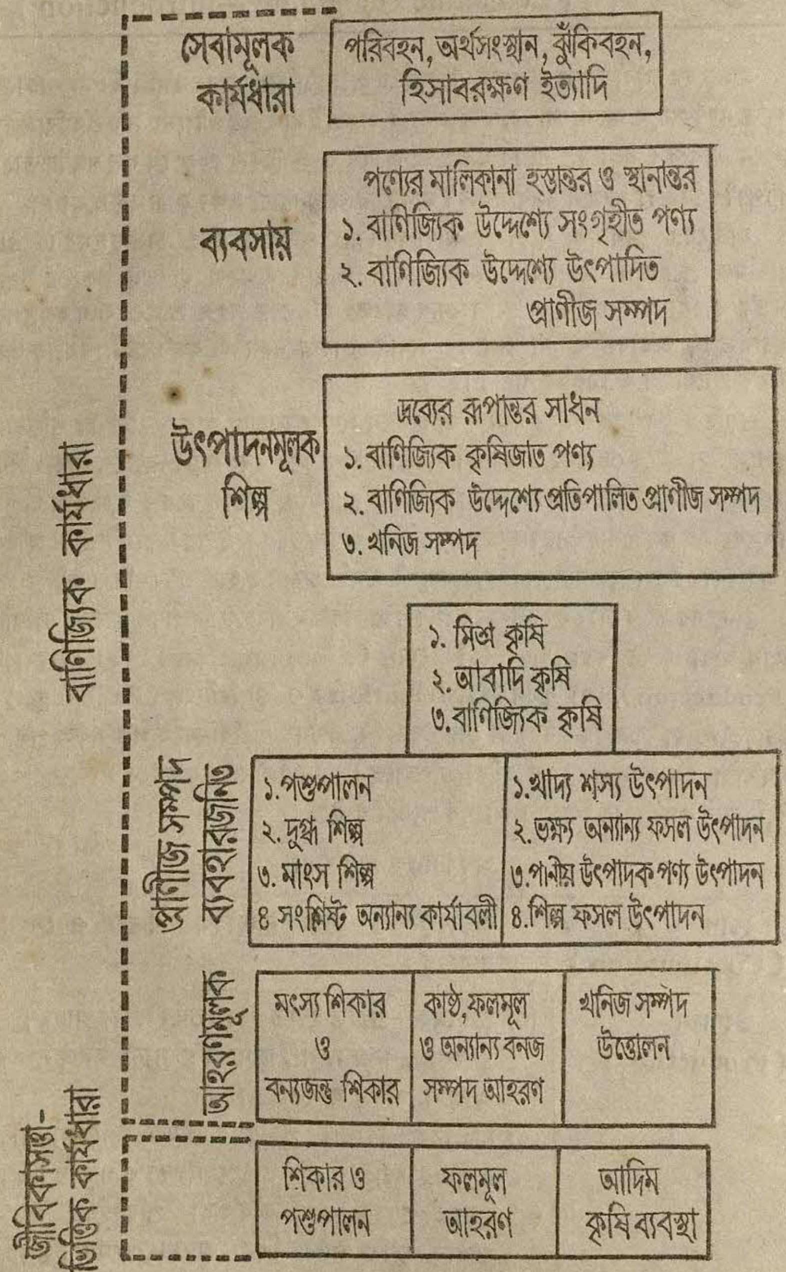

চিত্র ১.১ বাণিজ্যিক কার্যধারা

অর্থনৈতিক কার্যধারা

৩. বণ্টন (Distribution)	(ক) ব্যবসা-বাণিজ্য সংগঠন ও পরিচালনা। (খ) মালিকানা হস্তান্তর ও স্থানান্তর দ্বারা মূল্যবৃদ্ধি। (গ) স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সংগঠন।
৪. বিনিময় (Exchange)	(ক) অর্থ-ব্যবস্থা ও অর্থের যোগান, ব্যাংক-ব্যবস্থা, অর্থলগ্নী-ব্যবস্থা। (খ) বিনিময় মাধ্যম নিরূপণ। (গ) অর্থ-ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা ইত্যাদি।

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ নিজ জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দক্ষতার সাহায্যে প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনিয়া জীবিকার সংস্থান করিতেছে। ইহার ফলে তাহার অর্থনৈতিক কর্মধারার পরিধি যেমন প্রসারিত হইতেছে তেমনি তাহার জীবনধারাও ক্রমাগত উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিতেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার কার্যের মাধ্যমে মানুষ তাহার জীবিকার সংস্থান করে। মানুষের জীবিকা সংস্থানের কার্যধারাকে নিম্নলিখিত প্রধান দুইটি ধারায় ও উহাদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপধারায় বিভক্ত করা যায় [চিত্র ১.১]।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানুষের এই বহুবিস্তৃত কর্মধারা তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অর্থাৎ মানুষের **অর্থনৈতিক জীবন মুখ্যত তাহার প্রাকৃতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের সমন্বয়ে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া** থাকে। মানুষের বিভিন্ন প্রকার পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশই সর্বাধিক ক্রিয়াশীল। কারণ, প্রকৃতির আশ্রয় ও তাহার সম্পদের ভাণ্ডার—জল, আলো, বাতাস, বিভিন্ন প্রকার বনজ, প্রাণীজ, খনিজ সম্পদ—মানুষের জীবনধারণের ও সংগ্রামের মুখ্য অবলম্বন। সুতরাং প্রকৃতি ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুগ যুগ ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার গতি-প্রকৃতি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করাই অর্থনৈতিক ভূগোলের মুখ্য উদ্দেশ্য।

অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয়
(Definition and Scope of Economic Geography)

সংজ্ঞা (Definition): **অর্থনৈতিক ভূগোল মূলত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশ দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কিত আলোচনা।** মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী, যেমন—পশু-শিকার, পশু-পালন, কৃষিকাজ, খনিজ উত্তোলন, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি অনেকাংশেই প্রকৃতি ও

প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই কারণে প্রখ্যাত ভূগোলবিদ্‌গণ অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা নিরূপণে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

ভূগোলবিদ্ জে ম্যাকফারলেন-এর মতে—"প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, অবস্থান ইত্যাদি মানুষের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তাহার তত্ত্ব বিচারকেই অর্থনৈতিক ভূগোল বলা হয়।" (The study of influence exerted on the economic activities of man by his physical environment.—J. M. Farlane)

স্যার ডাডলি স্ট্যাম্প-এর মতে—"মানুষের উৎপাদিকা শক্তি, সীমিতভাবে যাহা শুধুমাত্র পণ্য উৎপাদন ও ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহার উপর প্রভাব-বিস্তারকারী ভৌগোলিক ও অন্যান্য উপাদানের পর্যালোচনাকেই অর্থনৈতিক ভূগোল বলা হয়।" (Commercial geography involves consideration of geographical and other factors which influence men's productivity, but only in a limited depth, so far as they are concerned with production and trade.—Sir Dadley Stamp)

মানুষের অর্থনৈতিক জীবন তাহার পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। তাহার পরিবেশ একদিকে কতকগুলি ভৌগোলিক উপাদান ও অপরদিকে সমাজ-জীবনের জটিলতা হইতে উদ্ভূত কতকগুলি সাংস্কৃতিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মধারার উপর তাহার ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, উভয়ই অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে এবং এই প্রভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের সমাজে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কর্মধারার বিকাশ ঘটে। পৃথিবীর কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতির মূলে রহিয়াছে সেই দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব।

মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পৃথিবীর সকল দেশে সকল সময় একরূপ নহে। স্থান ও কাল অনুযায়ী ইহাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি আরব, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি দেশে খনিজ তৈল উত্তোলন ও পরিস্রবণ সংক্রান্ত কার্যাবলীই প্রধান অর্থনৈতিক কাজ। এই সকল দেশে কৃষি ও অন্যান্য শিল্পের কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে নাই। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনাতে শিল্পের তুলনায় কৃষিকাজের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। আবার আমেরিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ায় শিল্প ও কৃষি উভয়েরই ব্যাপক উন্নতি ও প্রসার ঘটিয়াছে। সুতরাং দেশভেদে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা মূলত পরিবেশগত পার্থক্যেরই ফল। আধুনিক ভূগোলবিদ্ জে ডব্লিউ. আলেকজাণ্ডার এই কারণেই বলিয়াছেন যে, "পৃথিবীর বুকে মানুষের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের সহিত সম্পর্কিত অর্থনৈতিক কার্যাবলীর আঞ্চলিক বিভিন্নতা বিষয়ে তত্ত্ব বিচারকেই অর্থনৈতিক ভূগোল বলা হয়।" (Economic geography is the study

of areal variation on the earth's surface in man's activities related to producing, exchanging and consuming wealth.— J. W. Alexander)

উপরি-উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা সুস্পষ্টরূপে বলা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ মূলত তাহার প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের ঘাত-প্রতিঘাতেই সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিকাশ, বিস্তার ও ক্রমপরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত ইহার কার্যকারণ সম্পর্কের বিচার-বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনাকেই অর্থনৈতিক ভূগোল বলে।

আলোচ্য বিষয় (Scope and Subject-matter): অর্থনৈতিক ভূগোল মূলত প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী এবং তাহার বৈষয়িক উন্নতির পারস্পরিক সম্পর্কের পর্যালোচনা করে। অর্থাৎ, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ও কর্মধারা তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা কিভাবে কতটা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার তত্ত্ব বিচারই অর্থনৈতিক ভূগোলের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। পূর্বে ভূগোল বলিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থান, রাজধানী, শহর-বন্দর, নদ-নদী-সাগর-উপসাগর, অন্তরীপ, পাহাড়-পর্বত, বনভূমি, জীবজন্তু প্রভৃতির বিবরণকেই বুঝাইত। এই কারণে ভূগোল শাস্ত্রকে এক সময় 'অন্তরীপ ও উপসাগরের ভূগোল' (Capes and Bay Geography) বলা হইত। কিন্তু আধুনিক ভূগোল শুধুমাত্র প্রাকৃতিক তত্ত্ব আর তথ্যের বিবরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। মানুষ ও তাহার বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাও আধুনিক ভূগোলের আলোচনার অঙ্গীভূত।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। প্রধানত জীবিকার প্রয়োজনেই অর্থাৎ জীবনধারণের তাগিদেই মানুষের সমাজে বিভিন্নমুখী কর্মধারার বিকাশ ঘটিয়াছে। পশু-শিকার, পশু-পালন, মৎস্য-শিকার, বনজ সম্পদ আহরণ, কৃষিকাজ, খনিজ সম্পদ উত্তোলন, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ ইত্যাদি মানুষের বহুবিচিত্র অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল কার্য অনেকাংশেই প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইহা ছাড়া মানুষ তাহার সামাজিক জীবনকে অধিকতর উন্নত ও সমৃদ্ধ করিবার প্রয়োজনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা, খেলা-ধূলা, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়েরও অনুশীলন করে। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় এই সকল সাংস্কৃতিক কার্যধারার সম্মিলিত প্রভাবও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মোটকথা, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত মানুষের অর্থনৈতিক জীবন ও কর্মধারা একদিকে তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অপরদিকে তাহার চেতনাজাত নানাবিধ সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠে।

প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতেই মানুষ তাহার জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রাথমিক রসদ সংগ্রহ করে। কিন্তু প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সম্পদ আহরণ মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নহে।

মানুষের পরিবেশ কোথাও তাহার সহজ জীবিকার অনুকূল, কোথাও বা তাহা সম্পূর্ণ প্রতিকূল। এই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও সীমাহীন ধৈর্যের সাহায্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া আসিতেছে। মানুষের এই কর্মপ্রচেষ্টার ফলে একদিকে যেমন তাহার বহুমুখী কার্যধারার বিকাশ ঘটিয়াছে অপরদিকে তেমনি মানুষের সহিত তাহার পরিবেশের সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত। সুতরাং পরিবেশের সহিত মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কার্যকারণ সম্পর্কের আলোচনাই অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিবেশের সীমায় আবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের বিকাশই অর্থনৈতিক ভূগোলের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীর সহিত তাহার পরিবেশের অবিরাম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে এবং উভয়েরই রূপান্তর ঘটিতেছে। ইহার প্রকৃত স্বরূপ ও সম্ভাব্য পরিণতির আলোচনাও অর্থনৈতিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত।

ভূগোলবিদ্ এলস্‌ওয়ার্থ হান্টিংটন-এর মতে —"মানুষের জীবিকার্জনের সহায়ক সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী, প্রাকৃতিক সম্পদ, বিভিন্ন কার্যাবলী, প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, সামর্থ্য এবং কর্মকুশলতার বণ্টনই অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।" (Economic geography deals with the distribution of all sorts of materials, resources, activities, institutions, customs, capacities and types of ability that play a part in the work of getting a living.—Elsworth Huntington) অর্থনৈতিক ভূগোলে প্রধানত মানুষের উৎপাদনভিত্তিক কার্যাবলী আলোচনা করা হয়। পৃথিবীতে কোন একটি দেশ কোন একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে ও রপ্তানিতে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। অপর একটি দেশ আবার এই সকল দ্রব্যই আমদানি করিয়া থাকে। অর্থনৈতিক ভূগোল বিভিন্ন দেশে সংগঠিত এই সকল কার্যকলাপের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে।

সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের সমাজে যে অর্থনৈতিক কার্যধারা চলিতেছে তাহাকে প্রাথমিক, শিল্প ও বাণিজ্য এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের এই সকল কার্যের মধ্যে দেখা যায় দুস্তর ব্যবধান। কারণ, ইহাদের সংগঠন ও বিকাশ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। এই কারণে অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনার ক্ষেত্র প্রধানত এই তিনটি কার্যধারাকে লইয়া গঠিত এবং ইহাদের বিশদ আলোচনার অর্থ স্বভাবতই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা—

(ক) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন—কৃষিজ, খনিজ, বনজ সম্পদ ও অন্যান্য নানাপ্রকার কাঁচামালের অবস্থান ও উৎপাদন;

(খ) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নানাপ্রকার শ্রমশিল্পের সংগঠন ও ইহাদের কার্য-কারণ সম্পর্ক;

(গ) অর্থনৈতিক দিক হইতে আঞ্চলিক স্বয়ম্ভরতা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতা বা বাণিজ্য ; পরিবহণ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা ইত্যাদি।

মানুষের অর্থনৈতিক জীবন প্রাথমিকভাবে পরিবেশ দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইলেও উহা যে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার ফলে রূপান্তরিত হইয়া ক্রমাগত নব নব পর্যায়ে উন্নীত হইতেছে তাহার পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও অনুশীলন অবশ্যই অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনার বিষয়বস্তু। এই আলোচনা যদিও মানুষের বর্তমান কর্মধারাকে কেন্দ্র করিয়াই করা হয়, তথাপি ইহার সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভবিষ্যতে যে-সকল অর্থনৈতিক কর্মধারার বিকাশ সম্ভব তাহারও সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

[প্রশ্ন : (১) অর্থনৈতিক ভূগোল বলিতে কি বুঝায়? (২) অর্থনৈতিক ভূগোলের বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে কোন্‌টি তোমার কাছে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়? তোমার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৩ অর্থনৈতিক ভূগোলের তাৎপর্য ও ইহার বিষয়বস্তু আলোচনা কর।]

অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের পদ্ধতি
(Methods of Study of Economic Geography)

বিগত দুই শতকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে তাহার পরিবেশ, বিশেষ করিয়া সাংস্কৃতিক বা অপ্রাকৃতিক পরিবেশ, পরিবর্তনের প্রভাব। গতিশীল বিশ্বে সবকিছুই পরিবর্তিত হইতেছে। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগ (১৯৫০ খ্রীঃ) হইতে এই পরিবর্তনের হার আরও দ্রুত হইয়াছে। ফলে অন্যান্য গতিশীল বিজ্ঞানের মত অর্থনৈতিক ভূগোল আলোচনা ও অনুশীলন পদ্ধতির নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিয়া অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহের আলোচনা করা হইল :

(১) বিষয়ানুগ আলোচনা (Topical Approach) : কোন একটি বিশেষ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, যেমন—কৃষি বা পরিবহণ বা কোন যন্ত্রশিল্প—পাটশিল্প বা ইস্পাতশিল্প, পৃথিবীর কোথায় কিভাবে গঠিত ও পরিচালিত হয় এবং বিভিন্ন প্রকার পরিবেশের প্রভাবে কিভাবে উহা বিকাশ লাভ করে ইত্যাদি বিষয়ের বিশ্লেষণ ও তথ্যনির্ভর আলোচনা করা হয়।

(২) আঞ্চলিক আলোচনা (Regional Approach) : পৃথিবীর বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অঞ্চলকে বিবেচনা করা হয়, অর্থাৎ নানাপ্রকার পরিবেশ কিভাবে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়। ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ে কিভাবে অধিবাসীরা বিভিন্ন সম্পদকে কাজে লাগাইয়া জীবিকার সংস্থান করে, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহণ কোন্ বিষয়ে তাহারা বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে এবং কেন করে ইত্যাদি বিষয়ের কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণই আঞ্চলিক পদ্ধতির

আলোচনার মূল তাৎপর্য। পাঠ্যসূচী অনুসারে এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত আলোচনা উভয় পদ্ধতিতেই করা হইয়াছে।

(৩) কার্যকারণ তত্ত্ব আলোচনা (Functional Relationship Approach) : এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণের মধ্যে Smith, Fredman, Jones প্রমুখ ভূগোলবিদ্‌গণের নাম উল্লেখযোগ্য। উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকাশ ও অগ্রগতি কতকগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত কারণের উপর নির্ভর করে। এই সকল কারণ ও তাহাদের সম্পর্ক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আলোচনাকে কার্যকারণ তত্ত্ব আলোচনা বলা যায়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের সংগঠন বা অস্ট্রেলিয়ায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গম চাষের কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যাবলীর আলোচনা সম্ভবপর হইবে।

(৪) প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব তত্ত্ব আলোচনা (Physical Determinism Theory Approach) : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে এই তত্ত্বের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। Huntington, Vidal de la Blauch প্রমুখ ভূ-বিজ্ঞানীগণ এই মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

(৫) সাংস্কৃতিক প্রভাব তত্ত্ব আলোচনা (Cultural Determinism Theory Approach) : মানুষের সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে (১৯৪০-৪৫) এই তত্ত্বটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই তত্ত্বের প্রচারকদিগের মধ্যে Miller ও Pounds-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সাংস্কৃতিক পরিবেশই বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, যেমন—জাপানে লৌহ-ইস্পাত শিল্প ও ব্রিটেনে কার্পাস বয়ন শিল্প কাঁচামালের অভাব সত্ত্বেও যথেষ্ট উন্নত। ইহার মূলে রহিয়াছে ঐ দেশগুলির সাংস্কৃতিক পরিবেশের আনুকূল্য। সুতরাং অর্থনৈতিক ভূগোলের অনুশীলনে মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশের আলোচনাই মুখ্য বিষয়।

(৬) সাধারণ পদ্ধতি তত্ত্বের আলোচনা (General System Theory Approach) : মানুষের যে-কোন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের দুইটি দিক আছে। একটি, উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও কারিগরী দক্ষতা এবং অপরটি, উৎপাদিত পণ্যের জন্য নির্দিষ্ট ভোগকারী বা ব্যাপক অর্থে বাজার। সুতরাং উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি (inputs = উপকরণ বা অন্তর্নিয়োগ) এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাত করিবার মাধ্যম (medium of transportation of outputs = উৎপাদন)-এর পারস্পরিক সম্পর্কগুলি আলোচনা দ্বারাই অর্থনৈতিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ের আলোচনা সম্ভব। বর্তমানে এই

তত্ত্ব অনুসারেই অর্থনৈতিক ভূগোলের অনুশীলন করা হইয়া থাকে। অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের ইহাই সর্বাধুনিক তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তাগণের মধ্যে Brian J. L. Bury, William L. Thomas ও Alexanderson-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

[প্রশ্ন : ১ অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠের বিভিন্ন পদ্ধতি কি কি? (২) অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের বিভিন্ন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।]

অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলের সম্পর্ক
(Relation between Economic Geography and other Sciences)

অর্থনৈতিক ভূগোল যেহেতু পরিবেশের সহিত মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের উপর জোর দেয়, সেই হেতু মানুষের জীবন ও জীবিকার সহিত সম্পর্কিত সকল শাস্ত্রের সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলের সম্পর্ক রহিয়াছে। পরিবেশের সহিত মানুষের সম্পর্কের আলোচনা বিরাট ও ব্যাপক। সভ্যতার বিকাশের সহিত নতুন নতুন জ্ঞান, তত্ত্ব ও তথ্যের সংযোজন হওয়ার ফলে ভূগোল শাস্ত্রকে নানা বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান বিভাগ নিম্নরূপ :

(১) প্রাকৃতিক ভূগোল (Physical Geography) : ভূ-পৃষ্ঠের গঠন, ভূ-ত্বকের বৈশিষ্ট্য, ভূ-প্রকৃতি, জলভাগ ও স্থলভাগের বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২) উদ্ভিদ্ সম্পর্কিত ভূগোল (Phyto-Geography) : পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে যে বিভিন্ন প্রকার স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের বিশদ আলোচনা ইহাতে পাওয়া যায়।

(৩) প্রাণী সম্পর্কিত ভূগোল (Zoo Geography) : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাণীর অবস্থান ও মানব-জীবনের সহিত উহাদের সম্পর্কের আলোচনা ইহার বিষয়বস্তু।

(৪) মানবিক ভূগোল (Human or Anthro Geography) : মানুষের আকৃতি, প্রকৃতি, খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, শক্তি, সামর্থ্য, বুদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা মানবিক ভূগোলের অন্তর্গত।

ভূগোলের উপরি-উক্ত আলোচিত শাখাগুলি সম্প্রসারণশীল হওয়ায় ইহাকে আরও কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা যায়, যেমন—

(১) গাণিতিক ভূগোল (Mathematical Geography) : এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীর অবস্থান, আবর্তন, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ইত্যাদি ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়।

(২) ভূ-বিদ্যা (Geology) : ভূ-ত্বকের গঠন, পরিবর্তন ও খনিজ পদার্থের অবস্থান ইত্যাদি বিষয় ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(৩) আবহবিদ্যা (Climatology): পৃথিবীর আবহমণ্ডল ও ইহার প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা।

(৪) রাজনৈতিক ভূগোল (Political Geography): সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার প্রসার সম্পর্কিত আলোচনা ইত্যাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

অর্থনৈতিক ভূগোল ও ভূগোল শাস্ত্রের একটি অংশবিশেষ। ভূগোল শাস্ত্রের উপরি-উক্ত শাখাসমূহের বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনার অঙ্গীভূত। ইহা ব্যতীত অর্থনীতি (Economics), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science), দর্শন (Philosophy), সমাজ-বিজ্ঞান (Sociology), পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry) ইত্যাদি বিষয় নানাভাবে অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনার সহিত সংশ্লিষ্ট।

অর্থনীতি (Economics): অর্থনীতি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সহিত সংশ্লিষ্ট তাহার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পর্যালোচনা করে। অর্থাৎ, বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনে মানুষ কি করিয়া সম্পদ আহরণ করিয়া নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে এবং ভোগ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে, অর্থনীতি তাহারই আলোচনা করে। অর্থনৈতিক ভূগোল মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সহিত তাহার পরিবেশের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করে। সুতরাং অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনা অর্থনীতির মূল সূত্রগুলির পরিবেশভিত্তিক প্রয়োগ বিষয়েরই আলোচনা।

অন্যান্য বিষয় (Other Subjects): পরিবর্তনশীল জগতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিবর্তন ঘটিতেছে। ফলে তাহার রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজ-চিন্তা, জীবনদর্শন উত্তরোত্তর তাহার অর্থনৈতিক জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া বৃহত্তর পটভূমিকায় পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনাকে প্রভাবিত করিতেছে। সম্পদের নানা ব্যবহার ও তাহার বহুল উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষ অবশ্যই রসায়ন ও পদার্থবিদ্যাকে হাতিয়ার হিসাবে প্রয়োগ করিতেছে। দূর-দূরান্তের সহিত যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতেও মানুষ এই সকল শাস্ত্র হইতে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ করিতেছে। সুতরাং মানুষের সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে একটি বিষয় অপর একটি বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের কোনটির প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে বা কোনটির প্রভাব পরোক্ষভাবে বর্তমান। সর্বোপরি বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইত্যাদির ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া মানব-সভ্যতাকে এক নতুন গতিবেগ দিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক ভূগোলের গতানুগতিক আলোচনা অবান্তর। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বচ্ছ চিন্তাধারার সাহায্যে অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনার ক্ষেত্র এমন ভাবে প্রসারিত করা প্রয়োজন যাহাতে ইহা আগামী দিনে এক মহাবিশ্ব মানব-সমাজের অভ্যুদয়ের পটভূমিকা রচনা করিতে পারে।

[প্রশ্ন : (১) অর্থনৈতিক ভূগোলের সহিত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা কর। (২) অর্থনৈতিক ভূগোলের সহিত অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।]

অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব
(Importance of the study of Economic Geography)

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবনধারণের উপকরণ ও উপায়ের দুস্তর ব্যবধান। এই সকল ব্যবধানের কারণ কি? আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান শিল্প-বাণিজ্যে এত উন্নত কেন? কেনই বা আফ্রিকার জাইরে, সুদান, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশ অর্থনৈতিক দিক হইতে পশ্চাৎপদ? কেন ব্রাজিল কফি রপ্তানিতে এবং ভারত চা ও পাট রপ্তানিতে শীর্ষস্থান অধিকার করে? লৌহ-আকরিক থাকা সত্ত্বেও কেন স্পেন বা সুইডেন লৌহ-ইস্পাত শিল্পে পশ্চাৎপদ? এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতই মনকে নাড়া দেয়। অর্থনৈতিক ভূগোল পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টনের সহিত তথাকার মানব-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্পর্কে অনুসন্ধান ও আলোচনা করে। ফলে, অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনা হইতে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের বিকাশ ও তাহার গতিশীলতা সম্পর্কে জানিতে পারি। কোন একটি অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক জীবন একটি বিশেষ ধারায় গঠিত হয়। অর্থনৈতিক ভূগোল এই ধারাকে অনুসরণ ও পর্যালোচনা করে।

মানুষের জীবনযাপন-প্রণালী কোথাও কোন একটি আকস্মিক ঘটনা নহে। ইহা অধিবাসীদের শারীরিক গঠন, প্রকৃতি, শ্রম-দক্ষতা ইত্যাদির উপর যেমন নির্ভর করে তেমনি ঐ অঞ্চলের জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থান এবং সর্বোপরি ঐ সকল প্রাকৃতিক উপাদানকে তাহাদের কাজে লাগাইবার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে (The mode of living in any given region is not an accident but is the product of environment.)। সুতরাং কোন অঞ্চলের মানুষের জীবন-ধারা সেখানকার অধিবাসী, পরিবেশ ও তাহাদের সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত। অর্থনৈতিক ভূগোল এই তিনটি উপাদানের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া উহাদের সহিত মানুষের অর্থনৈতিক জীবনধারার কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে। ইহাতে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর অতীত ও বর্তমান জীবনযাপন-প্রণালীর বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। শুধু অতীত ও বর্তমান নহে, ইহা হইতে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনধারা সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। এই সকল ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনার সার্থকতা।

অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত। কোন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ, তথাকার অর্থনৈতিক ভিত্তি কিরূপ, অধিবাসীদের চাহিদার স্বরূপ কি, বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি কোন্ স্তরে, দেশের উৎপাদনের গতি-প্রকৃতি কোন্ পথে ইত্যাদি বিষয়েও অর্থনৈতিক ভূগোল গভীরভাবে সমীক্ষা করে এবং কার্যকরী আলোচনার সূত্রপাত করে। ফলে, দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পথনির্দেশে সহায়তা করে। ইহা হইতেই দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের উদ্বৃত্ত ও

ঘাটতি অনুযায়ী উহার রপ্তানি-আমদানি অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করা যায়।

বর্তমান বিশ্বে কোন দেশের সহিত অন্য দেশের সম্পর্ক, শত্রুতা, মিত্রতা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলেও অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠ অপরিহার্য। কারণ, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক মূলত ঐ সকল দেশের সম্পদের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠে। দেশের সামরিক শক্তিও দেশের সম্পদের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং অর্থনৈতিক সম্পদের বিষয়ে গভীর জ্ঞান ব্যতিরেকে ঐ সকল বিষয়ে ধারণা করা সম্ভব নহে। সর্বশেষে, বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক জটিলতা সম্পর্কে অবহিত হইতে হইলে বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্পদের বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই সকল বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা অর্থনৈতিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই ইহা বর্তমানকালে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান বলিয়া বিবেচিত হয়।

[প্রশ্ন : (১ অর্থনৈতিক ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা কর।]

অর্থনৈতিক ভূগোল—একটি গতিশীল বিজ্ঞান
(Economic Geography is a Dynamic Science)

মানব-জীবনের সহিত বিভিন্ন প্রকার পরিবেশের সম্পর্কের আলোচনাই অর্থনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু। সুতরাং যে অর্থে পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা যায়, সেই অর্থে অর্থনৈতিক ভূগোল বিজ্ঞান না হইলেও ইহাকে সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত একটি বিজ্ঞান বলা যায়। কারণ অর্থনৈতিক ভূগোল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ঘাত-প্রতিঘাতে গঠিত ও পরিচালিত মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের বিবর্তনের ধারাবাহিক ও সুসংবদ্ধ আলোচনা করে। অন্যান্য গতিশীল বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মত অর্থনৈতিক ভূগোলও একটি গতিশীল বিজ্ঞান। কারণ, অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনায় মানুষই কেন্দ্রবিন্দু এবং মানব-জীবন অতিমাত্রায় গতিশীল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা ও তাহার জীবনযাপন-প্রণালীর সহিত আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা ও উহার অন্তর্ভুক্ত মানুষের জীবনযাপন-প্রণালী ও রীতিনীতির দুস্তর ব্যবধান ঘটিয়াছে ও নিয়তই ঘটিতেছে। ইহার বাস্তবতাকে স্বীকার করিলে মানব-জীবনের গতিশীলতাকেই স্বীকার করিতে হয়। অতএব, পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অতিমাত্রায় গতিশীল মানব-জীবনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আলোচনা অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনা অবশ্যই গতিশীল হইবে।

আদিম মানব অভ্যস্ত ছিল শিকারে, ফলমূল আহরণে ও পশু পালনে। আগুনের আবিষ্কার ও কৃষির উদ্ভাবন তাহার সেই অভ্যস্ত জীবনে বিপ্লবের সূচনা করিল। ক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও প্রসার ঘটিল। পত্তন হইল গ্রামীণ সভ্যতার, কৃষির উন্নতির সহিত ধীরে ধীরে প্রাণিজ শক্তিনির্ভর শিল্পের জন্ম হইল, যেমন—বয়নশিল্প ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লব মানুষের পুরাতন সভ্যতার মূলসুদ্ধ

নাড়াইয়া দিল। শুরু হইল নতুন যুগ, নতুন সভ্যতা—শিল্প-সভ্যতা—যাহার মুখ্য উপাদান মানুষের উদ্ভাবিত জড়শক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যা। এই জড়শক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগে মানুষ কেবল কৃষিতে বা শ্রমশিল্পে উন্নতি লাভ করে নাই। পরিবহণ, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কার্যধারার নানা শাখায় তাহার বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটিল। আধুনিক মানুষ চাঁদে পা দিয়াছে, গ্রহান্তরে রকেট পাঠাইতেছে, কেবল জড়শক্তি ও তাহার প্রযুক্তি-জ্ঞানের উন্নত প্রয়োগের মাধ্যমে। ফলে, তাহার জীবনযাপন-প্রণালীতে, তাহার শিক্ষা-সংস্কৃতিতে, ব্যবসা বাণিজ্যে ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে। পরিবেশের পরিবর্তনের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের এই যে ক্রম পরিবর্তনশীল ধারা—ইহার বিশ্লেষণ ও সুসংবদ্ধ পর্যালোচনা অর্থনৈতিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত।

এই সম্পর্কে উল্লেখ্য, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন একই সময়ে একই ধরনের পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটিতে দেখা যায় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, রাশিয়া বা জার্মানীতে যে ধরনের শিল্পোন্নতি ঘটিয়াছে, অনুরূপ শিল্পোন্নতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বা আফ্রিকার দেশগুলিতে দেখা যায় না। আবার, চীন ও ভারতের সম্পদ পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ফলে ঐ সকল দেশের উন্নতির সহায়ক ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ঐ সকল দেশে সাংস্কৃতিক পরিবেশের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ফলে বর্তমানে ঐ সকল দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

গতিশীল জগতে কোন কিছুই স্থায়ী নহে। মানুষের পরিবেশ, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক উভয়ই সতত পরিবর্তনশীল। ভূ-আন্দোলন, অগ্ন্যুৎপাত, আবহিকবিকার প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে আকস্মিকভাবে বা ধীর গতিতে ভূ-পৃষ্ঠের তথা সামগ্রিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে। নদ-নদী-বাহিত পলি দ্বারা যেমন নতুন ভূভাগের সৃষ্টি হইতেছে তেমনি বন্যা, প্লাবন, নদ-নদীর গতি-পরিবর্তন ইত্যাদির ফলেও বহু সমৃদ্ধ অঞ্চল কালক্রমে ঊষর মরুতে পরিণত হইতেছে। 'সাহারা মরু' অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা বা ভারতের 'মরুস্থলী' এক সময় যে সুজলা-সুফলা ছিল তাহার প্রমাণ সাম্প্রতিক কালে পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার শৈত্যপ্রধান অঞ্চলে কয়লার বিপুল সম্ভার এক সময়ে ঐ সকল অঞ্চলে যে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাব ছিল তাহাই প্রমাণ করে।

এই পরিবর্তিত প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপেরও আমূল পরিবর্তন ঘটিতেছে। সুতরাং অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনাও সর্বদা পরিবর্তিত ও প্রসারিত হইতেছে।

সভ্যতার অগ্রগতির সহিত মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশেরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে। মানুষ তাহার বুদ্ধি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে প্রকৃতি হইতে নিত্য নতুন সম্পদ সৃষ্টি করিয়া তাহার ভোগস্পৃহা নিবৃত্ত করিতেছে। ইহার ফলে প্রকৃতির উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে

এবং তাহার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপেরও প্রসার ঘটিতেছে। সমুদ্র হইতে মৎস্য-আহরণ, নদীর জলের সাহায্যে কৃষিকাজ বা নদীতে বাঁধ দিয়া জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বৃক্ষরোপণের সাহায্যে মরুভূমির আগ্রাসন রোধ ইত্যাদি কাজের ফলে মানুষের জীবনযাপন প্রণালীর দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহার সাংস্কৃতিক পরিবেশেরও। সুতরাং পরিবেশের সহিত মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের যেমন কার্যকরণ সম্পর্ক দেখা যায় তেমনি প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনের মধ্যেও কার্যকরণ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

যুগ যুগ ধরিয়া প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হইতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় উন্নতির ফলে মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশও ক্রমাগত পরিবর্তিত হইতেছে। অতএব, প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্পর্ক সতত পরিবর্তনশীল। ফলে, মানুষের জীবন ও জীবিকা অতিমাত্রায় গতিশীল। মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন তাহার অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। অর্থনৈতিক ভূগোল মানুষের গতিশীল জীবনের সহিত তাহার সতত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সম্পর্কের ধারাবাহিক আলোচনা করে। অতএব, ইহাকে একটি গতিশীল বিজ্ঞান বলা যায়।

[প্রশ্ন : (১) "অর্থনৈতিক ভূগোল একটি গতিশীল বিজ্ঞান।"—উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।]

অনুশীলনী ১

১। অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং ইহার আলোচনার ক্ষেত্র ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
[Define Economic Geography and explain its scope and importance.]
[H. S. Council : Specimen Question, 1981]

২। অর্থনৈতিক ভূগোলের অর্থ ও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা কর। ভূগোলের অন্যান্য শাখার সহিত উহার সম্পর্ক নির্দেশ কর।

[Discuss the meaning and scope of Economic Geography and indicate its relation with other branches of Geography.] [W. B. H. S. Exam., 1978]

৩। অর্থনৈতিক ভূগোলকে একটি গতিশীল বিজ্ঞান বলা হয় কেন তাহা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

[Explain why Economic Geography is called a dynamic science. Discuss with suitable example.] [W. B. H. S. Exam., 1979, 1981]

৪। প্রাকৃতিক ভূগোল, অর্থনীতি ও মানবিক ভূগোলের সহিত অর্থনৈতিক ভূগোলের সম্পর্ক আলোচনা কর।

[Discuss the relation of Economic Geography with Physical Geography, Economics and Human Geography.]

৫। অর্থনৈতিক ভূগোলের অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

[Describe the methods of study of Economic Geography.]

২ মানুষ ও তাহার পরিবেশ
(Man and his Environment)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী বিভিন্ন প্রকার। কোন দেশ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে, আবার কোন দেশ সম্প্রসারণের পথে সবেমাত্র পদক্ষেপ করিয়াছে। মানব-সভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও সকল দেশ সমভাবে উন্নতি লাভে সমর্থ হয় নাই। এই বিভিন্নতার মূলে রহিয়াছে মানুষের উপর তাহার পরিবেশের প্রভাব।

মানুষের অভ্যস্ত জীবনযাত্রা-প্রণালী কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। পরিবেশই ধীরে ধীরে গড়িয়া তোলে মানুষকে ও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে তাহার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে। পরিবেশের আনুকূল্য বা বিরূপতা মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। মানুষের চারিদিকে ভিড় করিয়া আছে একদিকে যেমন প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান—পাহাড়, পর্বত, নদী-সমুদ্র, বন, প্রান্তর, সমভূমি, তৃণভূমি ইত্যাদি, তেমনি আর একদিকে রহিয়াছে মানুষের নিজের তৈয়ারী সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, ভাষা, জনসংখ্যা ইত্যাদি। এই সকল উপকরণ-উপাদানের মিলিত প্রভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে মানুষের জীবন।

দৃশ্য ও অদৃশ্য যে-সকল উপাদান-উপকরণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব বিস্তার করে, সম্মিলিতভাবে তাহাকেই পরিবেশ বলা হয়।

পরিবেশকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ (**Physical Environment**) এবং (২) অপ্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশ (**Non-Physical or Cultural Environment**)।

প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষের পরিবেশের অন্তর্গত বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাদানের সমষ্টিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়। এই সকল উপাদান, যেমন—ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি প্রকৃতির দান ও প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। পক্ষান্তরে, মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং, সমাজ-জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিবার প্রয়োজনে মানুষ নিজেই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও বৈষয়িক রীতি-নীতি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়িয়া তুলিয়াছে। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন সামাজিক ও বৈষয়িক উপাদানের সমষ্টিকে অপ্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলা হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল উপাদানের পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটিতেছে। জনসংখ্যা, জাতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি সাংস্কৃতিক পরিবেশের কয়েকটি মৌল উপাদান।

প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে দেখান হইল।

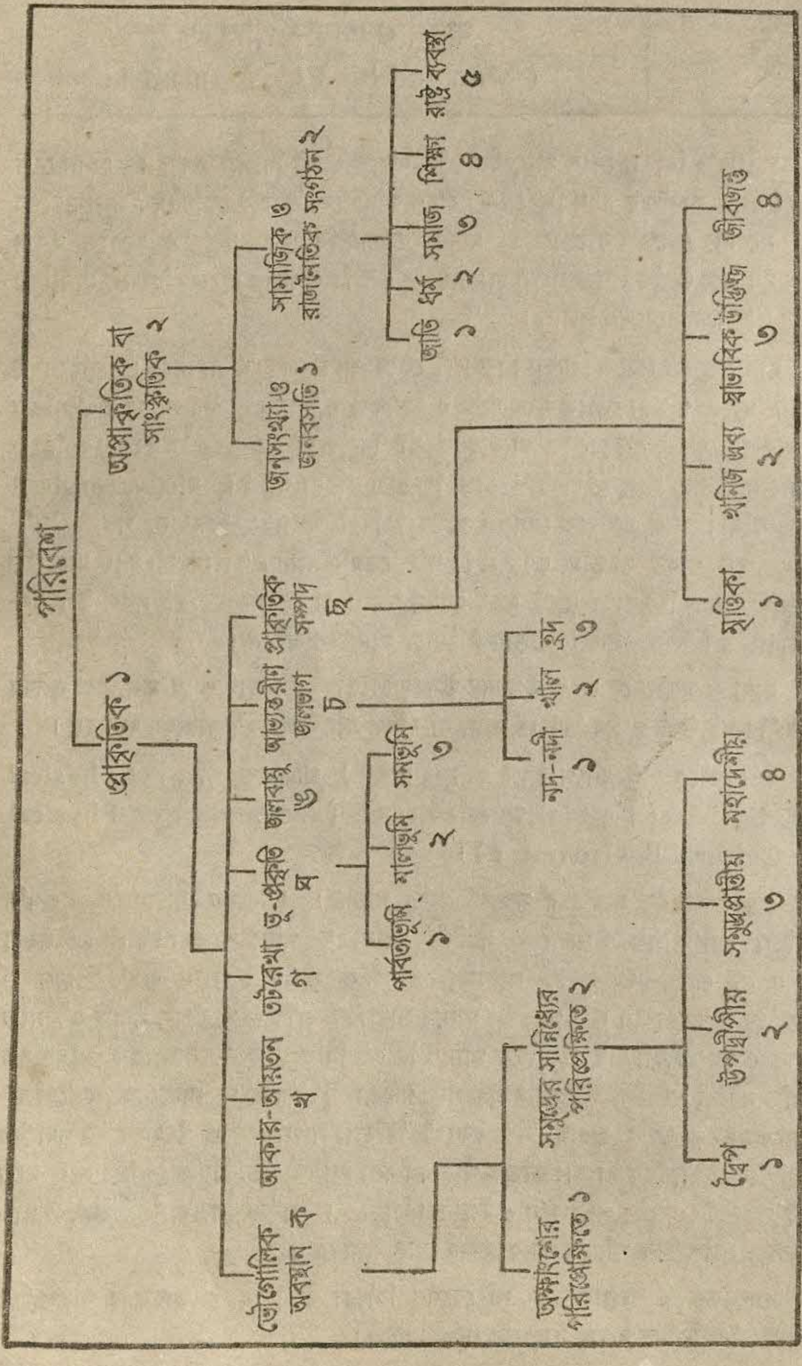
পরিবেশ
প্রাকৃতিক ১
অপ্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক ২
জনসংখ্যা ও জনবসতি ১
সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ২
জাতি ১
ধর্ম ২
সমাজ ৩
শিক্ষা ৪
রাষ্ট্র ব্যবস্থা ৫
ভৌগোলিক অবস্থান ক
আকার-আয়তন খ
তটরেখা গ
ভূ-প্রকৃতি ঘ
জলবায়ু ঙ
আভ্যন্তরীণ জলভাগ চ
প্রাকৃতিক সম্পদ ছ
অক্ষাংশের পরিপ্রেক্ষিতে ১
সমুদ্রের সান্নিধ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ২
দ্বীপ ১
উপদ্বীপীয় ২
সমুদ্রপ্রান্তীয় ৩
মহাদেশীয় ৪
পার্বত্যভূমি ১
মালভূমি ২
সমভূমি ৩
নদ-নদী ১
খাল ২
হ্রদ ৩
মৃত্তিকা ১
খনিজ দ্রব্য ২
স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ৩
জীবজন্তু ৪

প্রাকৃতিক পরিবেশ
(Physical Environment)

প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান হইল—(ক) ভৌগোলিক অবস্থান, (খ) আকার আয়তন, (গ) তটরেখা, (ঘ) ভূ-প্রকৃতি, (ঙ) জলবায়ু, (চ) আভ্যন্তরীণ জলভাগ ও (ছ) প্রাকৃতিক সম্পদ। ইহাদের বৈশিষ্ট্য ও মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হইল :

(ক) ভৌগোলিক অবস্থান
(Geographical Situation)

ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেশের অবস্থান। এই অবস্থান যেমন অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দ্বারা নির্দেশ করা যায় তেমনি সমুদ্রের নৈকট্য বা সমুদ্রের সহিত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেও নির্দেশ করা যায়।

(i) অক্ষাংশের পরিপ্রেক্ষিতে

ভূ-পৃষ্ঠে কোন স্থানের সঠিক অবস্থান জানা যায় ঐ স্থানের অক্ষাংশ (Latitude) ও দ্রাঘিমাংশ (Longitude) দ্বারা। কারণ ঐ দুইটি রেখা যথাক্রমে বিষুবরেখা ও মূলমধ্যরেখার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ স্থানের কৌণিক দূরত্ব নির্দেশ করিয়া থাকে। যেমন—আমাদের দেশ ভারত ৮°৪' উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৩৭°৩০' উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৬৮°৭' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হইতে ৯৬°২৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখা ও ইহার সন্নিহিত অঞ্চলকে নিম্ন অক্ষাংশের (Low Latitude) অঞ্চল ; বিষুবরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণে দুই মেরু বৃত্তের নিকটবর্তী অঞ্চলকে উচ্চ অক্ষাংশের (High Latitude) অঞ্চল এবং নিম্ন ও উচ্চ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে মধ্য অক্ষাংশের (Mid Latitude) অঞ্চল বলা হয়। বিষুবরেখা হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই জলবায়ুর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিষুবরৈখিক অঞ্চলে সারা বৎসর অতিরিক্ত উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বিষুবরেখার উত্তরে এবং দক্ষিণে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত ক্রমাগত কমিতে থাকে। ইহার ফলে গাছপালা, জীবজন্তু ও মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর বিশেষ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বিষুবরেখা হইতে উত্তরে সুমেরু বৃত্ত ও দক্ষিণে কুমেরু বৃত্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে চারিটি প্রধান তাপমণ্ডলে বিভক্ত করা হইয়াছে—উষ্ণ মণ্ডল, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল, হিমোষ্ণ মণ্ডল ও হিমমণ্ডল।

উষ্ণ মণ্ডলে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক হওয়ায় কৃষিজ ও বনজ সম্পদের প্রাচুর্য দেখা যায়। ফলে উষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত দেশসমূহের (মরু অঞ্চল বাদে) অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকাজ এবং বনজ সম্পদ আহরণ। জলবায়ুগত কারণেই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের চরিত্রে দৃঢ়তা ও উদ্যমের অভাব এবং কর্মবিমুখতা দেখা যায়। হিমমণ্ডল সারা বৎসর বরফে ঢাকা থাকে বলিয়া মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ

অনুপযোগী। হিমোষ্ণ মণ্ডলে অত্যধিক শীত ও স্বল্প বৃষ্টিপাতের জন্য কৃষিকাজ বিশেষ কষ্টসাধ্য। কৃষিকাজের সহিত পশুপালন, খনিজ উত্তোলন, বনজ সম্পদ আহরণ এই মণ্ডলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। মজবুত শারীরিক গঠন, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও কর্মে উদ্যম এই মণ্ডলের অধিবাসীদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত মোটামুটি স্বাভাবিক বলিয়া জলবায়ু মনোরম। এই মনোরম জলবায়ুতে কৃষি, বাগিচা কৃষি, মৎস্য আহরণ, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার দেখা যায়। এই মণ্ডলের অধিবাসীদের দৈহিক ও মানসিক গঠন ও দৃঢ়তা, কর্মনৈপুণ্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও কর্মোদ্যম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অক্ষাংশের পরিপ্রেক্ষিতে কোন দেশের অবস্থান সেই দেশের জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, জনবসতি ইত্যাদি এবং সর্বোপরি ঐ দেশের অধিবাসীদের দৈহিক-মানসিক গঠন এবং তাহাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

(ii) সমুদ্র-সান্নিধ্যের পরিপ্রেক্ষিতে

সমুদ্র তথা বিশাল জলভাগ মানুষের জীবন ও জীবিকাকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে। সুতরাং সমুদ্রের সহিত দেশের অবস্থানগত সম্পর্ক আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সমুদ্র হইতে দূরত্ব এবং সমুদ্রের সহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে দেশসমূহের অবস্থানকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (১) দ্বৈপ বা দ্বীপীয়, (২) উপদ্বীপীয়, (৩) সমুদ্রপ্রান্তীয় বা মহাসাগরীয় এবং (৪) মহাদেশীয়।

(১) দ্বৈপ বা দ্বীপীয় (Insular) অবস্থান: চারিদিকে জল দ্বারা বেষ্টিত ভূ-ভাগকে দ্বীপ বলে। দ্বীপের অবস্থানকে দ্বীপীয় বা দ্বৈপ অবস্থান বলে। অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ দ্বীপ। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, জাপান, শ্রী লঙ্কা, মালাগাসি সাধারণতন্ত্র, প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ দ্বীপীয় অবস্থানযুক্ত দেশের উদাহরণ। দ্বীপীয় অবস্থানের ফলে—(ক) দেশের প্রান্তভাগ দিয়া প্রবাহিত সমুদ্র-স্রোতের প্রভাবে জলবায়ু সমভাবাপন্ন হয়। (খ) অধিবাসিগণ পরিশ্রমী, উদ্যমশীল ও সাহসী হয়। (গ) নৌ-বিদ্যায়, বন্দর গঠনে ও নৌ-শিল্পে দেশ উন্নত হয়। (ঘ) অগভীর মহীসোপানে মৎস্যচারণ-ক্ষেত্র গড়িয়া উঠে এবং মৎস্য আহরণে ও মৎস্য-শিল্পে দেশ উন্নত হয়। (ঙ) সমুদ্র দ্বারা অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে ঐ দেশে একটি স্বনির্ভর অর্থনীতি রূপলাভ করে এবং অধিবাসীদের চরিত্রে স্বাধীন ও স্বাতন্ত্র্য ভাব পরিদৃষ্ট হয়। (চ) স্বাভাবিক সীমা ও নিরাপত্তার দিক হইতেও সুবিধা ভোগ করে। (ছ) বহির্বাণিজ্যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও জাপান অবস্থানগত সুবিধার জন্য শিল্প ও বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। অবস্থানগত সুবিধার জন্যই ব্রিটিশ জাতি এত উন্নত। পৃথিবী-জোড়া সাম্রাজ্য স্থাপনের মূলে ছিল তাহাদের নৌ-বিদ্যায় দক্ষতা, অনমনীয় দৃঢ়তা এবং অপূর্ব সাহসিকতা। জাপান ও ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য মৎস্য-শিল্পেরও বিরাট কেন্দ্র।

(২) উপদ্বীপীয় (Peninsular) অবস্থান : তিন দিকে জলভাগ দ্বারা আবদ্ধ ভূ-ভাগকে উপদ্বীপ বলে। সুতরাং যে-সকল দেশের তিনদিকে সমুদ্র বা বিস্তীর্ণ জলভাগ এবং অপরদিকে স্থলপথে অন্যান্য দেশের সহিত সংযুক্ত ঐ সকল দেশের অবস্থানকে উপদ্বীপীয় অবস্থান বলা হয়। ভারত, ইতালি, গ্রীস, মালয়েশিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি উপদ্বীপীয় অবস্থানযুক্ত দেশ। তিনদিকে জলভাগ দেশের স্বাভাবিক সীমা নির্দেশ করে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করে। সমুদ্র-প্রভাবিত বলিয়া সমুদ্র-সন্নিহিত অঞ্চলে জলবায়ু মৃদু ভাবাপন্ন ও মনোরম। উপকূল অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক হয়। উপকূল অঞ্চলে বন্দর গঠনের সুবিধা হয় এবং বাণিজ্যের সুযোগ ঘটে। উপকূল অঞ্চলের অধিবাসীরা নৌ-বিদ্যায় ও নৌ-শিল্পে দক্ষ হয়। মৎস্য-আহরণ ও মৎস্য-শিল্পের প্রসার ঘটে। মূল ভূ-খণ্ডের সহিত যোগাযোগ থাকায় স্থলপথে অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্ভব হয়। প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক-রোমক সভ্যতা এই সকল প্রাকৃতিক সুযোগের ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

(৩) সমুদ্র প্রান্তীয় বা মহাসাগরীয় (Littoral) অবস্থান : সমুদ্রপ্রান্তে অবস্থিত দেশগুলির অবস্থানকে প্রান্তীয় বা মহাসাগরীয় অবস্থান বলে। এই প্রকার অবস্থানে দেশের একটি দিক বা কিছু অংশ সমুদ্রপ্রান্তে অবস্থিত থাকে ও অন্যান্য অংশ স্থলভাগ দ্বারা অন্যান্য দেশের সহিত যুক্ত থাকে। ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানী, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা প্রভৃতি এই প্রকার দেশের উদাহরণ। (ক) দেশের কিছু অংশ সমুদ্র-সন্নিহিত হওয়ায় সমুদ্রবায়ু দেশের জলবায়ুকে আংশিকভাবে প্রভাবিত করিতে পারে। (খ) সমুদ্রোপকূলে বহু স্বাভাবিক বন্দর গড়িয়া উঠে এবং বাণিজ্যেরও সুবিধা হয়। (গ) ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়িয়া ওঠে এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার ঘটে।

(৪) মহাদেশীয় (Continental) অবস্থান : সমুদ্র হইতে দূরে মহাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত দেশসমূহের অবস্থানকে মহাদেশীয় অবস্থান বলা হয়। এশিয়ার নেপাল, তিব্বত, ইউরোপের সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের অবস্থান মহাদেশীয়।

সমুদ্রের সহিত যোগ না থাকায় এই প্রকার দেশের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন হয়। বৃষ্টিপাত কম, শীত তীব্র এবং গ্রীষ্ম প্রখর হয়। এই জলবায়ু কৃষিকার্যের পক্ষে অনুপযোগী। নিজস্ব বন্দর না থাকায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে না। রেলপথ ও সড়কপথে অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সম্মতির উপর নির্ভর করে। নেপাল, আফগানিস্তান, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশের ব্যবসা-ব্যাণিজ্যে অনগ্রসরতার মূলে রহিয়াছে তাহাদের অবস্থানগত অসুবিধা।

ভারত, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ আকারে বৃহৎ হওয়ায় ইহার অভ্যন্তরে অবস্থিত অঞ্চলবিশেষে মহাদেশীয় অবস্থানের প্রভাব দেখা যায়। পূর্বে মহাদেশীয় অবস্থানযুক্ত দেশের আন্তর্জাতিক-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ নামমাত্র

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 6-1-87
S.C.E.R.T., West Bengal Library

বা নগণ্য ছিল। বর্তমানে বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে ঐ সকল দেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহায়তায় বিশ্বের বাজারে অংশগ্রহণ করিতে পারিতেছে।

দেশের অবস্থান সুবিধাজনক হয় তখনই যখন একমাত্র অবস্থানের জন্যই দেশের জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানুষের কর্মদক্ষতা ইত্যাদি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হয়। শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত দেশের সন্নিহিত দেশগুলিও শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ, উন্নত দেশের সান্নিধ্য ঐ দেশের সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইউরোপে ইতালি, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের উন্নতিতে পার্শ্ববর্তী শিল্পোন্নত দেশগুলির প্রভাব কম নয়।

অন্যান্য দেশের সহিত সহজ যোগাযোগের দিক হইতেও অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য উত্তর গোলার্ধে এমন একটি স্থানে অবস্থিত যে স্থান হইতে পৃথিবীর বৃহৎ বাজারগুলিতে সহজেই পৌঁছান সম্ভব। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ঐ দেশের উন্নতি বিস্ময়কর। প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে ভারতের অবস্থান বিশেষ সুবিধাজনক। ভারত সেইজন্য ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত সহজেই যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং শিল্পে ও বাণিজ্যে ভারতের অগ্রগতি ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

[**প্রশ্ন :** (১) কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান উহার অর্থনৈতিক জীবনের উপর কিরূপে প্রভাব বিস্তার করে—তাহা উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। (২) দেশের অবস্থান কি কি প্রকারের হয়? প্রত্যেক শ্রেণীর অবস্থানের একটি করিয়া উদাহরণ দাও। (৩) ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য এবং জাপান নৌ-বিদ্যা ও বৈদেশিক বাণিজ্যে এত উন্নত কেন? (৪) আফগানিস্তান বা নেপালের বৈদেশিক বাণিজ্যের অসুবিধা কি? (৫ বিভিন্ন দেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের পক্ষে ভারতের অবস্থান কিরূপ?]

(খ) আকার-আয়তন
(Shape and Size)

দেশের আকার তিন প্রকারের হইতে পারে—দৃঢ় সংবন্ধ (Compact), বিচ্ছিন্ন (Fragmented) এবং কৃশানুকৃতি (Attenuated)। দেশের অভ্যন্তরস্থ রাজনৈতিক বিভাগগুলি, রাজ্য বা প্রদেশ বা ক্যাণ্টন, দৃঢ়ভাবে পরস্পর-সংযুক্ত হইয়া গঠিত হইলে উহাকে দৃঢ়সংবন্ধ দেশ বলা যায়, যেমন—ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড। রাষ্ট্রনৈতিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার ও উন্নতির দিক হইতে এই প্রকার দেশ সর্বাধিক সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অংশ লইয়া বিচ্ছিন্ন দেশ গঠিত হয়, যেমন গ্রীস। পক্ষান্তরে দীর্ঘ কিন্তু অপ্রশস্ত ভূভাগ হইয়া কৃশানুকৃতি দেশ গঠিত হয়, যেমন চিলি। এই সকল দেশ রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে দুর্বল ও নিরাপত্তাহীন। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার ও উন্নতি এই সকল দেশে নানাভাবে ব্যাহত হয়।

আয়তন অনুযায়ী দেশকে চারিটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—অতি বিশাল (Gigantic), বৃহৎ (Large), মধ্যমাকার (Medium) এবং ক্ষুদ্র

(Small)। দেশের আয়তন ১৬ লক্ষ বর্গ কি. মি.-এর অধিক হইলে উহাকে অতি বিশাল দেশ বলা যায়। ১ লক্ষ বর্গ কি. মি. হইতে ১৬ লক্ষ বর্গ কি. মি. আয়তন বিশিষ্ট দেশকে বৃহৎ এবং ষাট হাজার বর্গ কি. মি. হইতে এক লক্ষ বর্গ কি. মি পর্যন্ত আয়তনের দেশকে মধ্যম আকারের দেশ বলে। অন্যান্য যে সকল দেশের আয়তন ষাট হাজার বর্গ কি. মি.-এর কম উহাদিগকে ক্ষুদ্র দেশ বলা হয়। আয়তনের সহিত দেশের অর্থনৈতিক কার্যধারার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। বৃহদায়তন দেশে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে কৃষির ব্যাপক প্রসারের সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বনজ, প্রাণিজ, খনিজ ইত্যাদি নানাবিধ সম্পদের অবস্থান ঐ দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নতির বিশেষ সহায়ক হয়। ইহা ছাড়া ঐ দেশে বিপুল জনবসতি গড়িয়া উঠিবারও সুযোগ ঘটে। ক্ষুদ্র বা মধ্যম আকারের দেশে কৃষির ব্যাপক প্রসার সম্ভব হয় না। শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ঐ সকল দেশ প্রভূত উন্নতি লাভ করিলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ বহন করিতে পারে না। বর্তমান বিশ্বের অতি বিশাল ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি, যেমন সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত প্রভৃতি কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে বিশেষ দক্ষতার অধিকারী। এই সকল দেশে অনেকাংশে ব্যাপক কৃষি (Extensive agriculture) ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মধ্যম ও ক্ষুদ্র আকারের দেশে জনসংখ্যার চাপ অতিরিক্ত হওয়ার ফলে নিবিড় কৃষি (Intensive agriculture) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। অধিকন্তু, এই সকল দেশে শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা হয়। বৃটিশ যুক্তরাজ্য, জাপান, পশ্চিম জার্মানি ইত্যাদি দেশ ইহার উদাহরণ। পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় বিগত দুইটি মহাযুদ্ধ এই সকল দেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলেই ঘটিয়াছিল। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত আকার-আয়তন দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতি প্রকৃতি নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

[প্রশ্ন : (১) দেশের আকার কত প্রকারের হইতে পারে ও কি কি ? (২) দেশের আয়তনের বিভাগগুলি কি কি ? (৩) দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর আকার ও আয়তনের প্রভাব আলোচনা কর।]

(গ) তটরেখা
(Coast Line)

কোন দেশের সমুদ্রসন্নিহিত অংশকে তটরেখা বা উপকূলভাগ বা উপকূলভূমি বলে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকাংশে তটরেখার উপর নির্ভর করে। পৃথিবীতে মহাদেশীয় অবস্থানযুক্ত দেশগুলি, যেমন—নেপাল, সুইজারল্যাণ্ড, বলিভিয়া ইত্যাদি সমুদ্রপথে অন্যান্য দেশের সহিত যুক্ত না থাকায় ইহাদের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কম।

তটরেখা দেশের উন্নতির অন্যতম প্রধান সহায়। ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি নানা প্রকারের হইতে পারে; যেমন—ভগ্ন (Irregular or Indented), অভগ্ন

বা নগণ্য ছিল। বর্তমানে বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে ঐ সকল দেশ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহায়তায় বিশ্বের বাজারে অংশগ্রহণ করিতে পারিতেছে।

দেশের অবস্থান সুবিধাজনক হয় তখনই যখন একমাত্র অবস্থানের জন্যই দেশের জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানুষের কর্মদক্ষতা ইত্যাদি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হয়। শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত দেশের সন্নিহিত দেশগুলিও শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ, উন্নত দেশের সান্নিধ্য ঐ দেশের সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইউরোপে ইতালি, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের উন্নতিতে পার্শ্ববর্তী শিল্পোন্নত দেশগুলির প্রভাব কম নয়।

অন্যান্য দেশের সহিত সহজ যোগাযোগের দিক হইতেও অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য উত্তর গোলার্ধে এমন একটি স্থানে অবস্থিত যে স্থান হইতে পৃথিবীর বৃহৎ বাজারগুলিতে সহজেই পৌঁছান সম্ভব। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ঐ দেশের উন্নতি বিস্ময়কর। প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে ভারতের অবস্থান বিশেষ সুবিধাজনক। ভারত সেইজন্য ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত সহজেই যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারে। সুতরাং শিল্পে ও বাণিজ্যে ভারতের অগ্রগতি ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

[**প্রশ্ন :** (১) কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান উহার অর্থনৈতিক জীবনের উপর কিরূপে প্রভাব বিস্তার করে—তাহা উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। (২) দেশের অবস্থান কি কি প্রকারের হয়? প্রত্যেক শ্রেণীর অবস্থানের একটি করিয়া উদাহরণ দাও। (৩) ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য এবং জাপান নৌ-বিদ্যা ও বৈদেশিক বাণিজ্যে এত উন্নত কেন? (৪) আফগানিস্তান বা নেপালের বৈদেশিক বাণিজ্যের অসুবিধা কি? (৫ বিভিন্ন দেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের পক্ষে ভারতের অবস্থান কিরূপ?]

(খ) আকার-আয়তন
(Shape and Size)

দেশের আকার তিন প্রকারের হইতে পারে—দৃঢ় সংবদ্ধ (Compact), বিচ্ছিন্ন (Fragmented) এবং কৃশানুকৃতি (Attenuated)। দেশের অভ্যন্তরস্থ রাজনৈতিক বিভাগগুলি, রাজ্য বা প্রদেশ বা ক্যান্টন, দৃঢ়ভাবে পরস্পর-সংযুক্ত হইয়া গঠিত হইলে উহাকে দৃঢ়সংবদ্ধ দেশ বলা যায়, যেমন—ভারত, সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড। রাষ্ট্রনৈতিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার ও উন্নতির দিক হইতে এই প্রকার দেশ সর্বাধিক সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অংশ লইয়া বিচ্ছিন্ন দেশ গঠিত হয়, যেমন গ্রীস। পক্ষান্তরে দীর্ঘ কিন্তু অপ্রশস্ত ভূভাগ হইয়া কৃশানুকৃতি দেশ গঠিত হয়, যেমন চিলি। এই সকল দেশ রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে দুর্বল ও নিরাপত্তাহীন। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার ও উন্নতি এই সকল দেশে নানাভাবে ব্যাহত হয়।

আয়তন অনুযায়ী দেশকে চারিটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—অতি বিশাল (Gigantic), বৃহৎ (Large), মধ্যমাকার (Medium) এবং ক্ষুদ্র

(Small)। দেশের আয়তন ১৬ লক্ষ বর্গ কি. মি.-এর অধিক হইলে উহাকে অতি বিশাল দেশ বলা যায়। ১ লক্ষ বর্গ কি. মি. হইতে ১৬ লক্ষ বর্গ কি. মি. আয়তন বিশিষ্ট দেশকে বৃহৎ এবং ষাট হাজার বর্গ কি. মি. হইতে এক লক্ষ বর্গ কি. মি পর্যন্ত আয়তনের দেশকে মধ্যম আকারের দেশ বলে। অন্যান্য যে সকল দেশের আয়তন ষাট হাজার বর্গ কি. মি.-এর কম উহাদিগকে ক্ষুদ্র দেশ বলা হয়। আয়তনের সহিত দেশের অর্থনৈতিক কার্যধারার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। বৃহদায়তন দেশে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে কৃষির ব্যাপক প্রসারের সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বনজ, প্রাণিজ, খনিজ ইত্যাদি নানাবিধ সম্পদের অবস্থান ঐ দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নতির বিশেষ সহায়ক হয়। ইহা ছাড়া ঐ দেশে বিপুল জনবসতি গড়িয়া উঠিবারও সুযোগ ঘটে। ক্ষুদ্র বা মধ্যম আকারের দেশে কৃষির ব্যাপক প্রসার সম্ভব হয় না। শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ঐ সকল দেশ প্রভূত উন্নতি লাভ করিলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ বহন করিতে পারে না। বর্তমান বিশ্বের অতি বিশাল ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি, যেমন সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত প্রভৃতি কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে বিশেষ দক্ষতার অধিকারী। এই সকল দেশে অনেকাংশে ব্যাপক কৃষি (Extensive agriculture) ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মধ্যম ও ক্ষুদ্র আকারের দেশে জনসংখ্যার চাপ অতিরিক্ত হওয়ার ফলে নিবিড় কৃষি (Intensive agriculture) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। অধিকন্তু, এই সকল দেশে শিল্প ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা হয়। বৃটিশ যুক্তরাজ্য, জাপান, পশ্চিম জার্মানি ইত্যাদি দেশ ইহার উদাহরণ। পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় বিগত দুইটি মহাযুদ্ধ এই সকল দেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফলেই ঘটিয়াছিল। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত আকার-আয়তন দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতি প্রকৃতি নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

[প্রশ্ন : (১) দেশের আকার কত প্রকারের হইতে পারে ও কি কি? (২) দেশের আয়তনের বিভাগগুলি কি কি? (৩) দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর আকার ও আয়তনের প্রভাব আলোচনা কর।]

(গ) তটরেখা
(Coast Line)

কোন দেশের সমুদ্রসন্নিহিত অংশকে তটরেখা বা উপকূলভাগ বা উপকূলভূমি বলে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকাংশে তটরেখার উপর নির্ভর করে। পৃথিবীতে মহাদেশীয় অবস্থানযুক্ত দেশগুলি, যেমন—নেপাল, সুইজারল্যাণ্ড, বলিভিয়া ইত্যাদি সমুদ্রপথে অন্যান্য দেশের সহিত যুক্ত না থাকায় ইহাদের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার কম।

তটরেখা দেশের উন্নতির অন্যতম প্রধান সহায়। ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি নানা প্রকারের হইতে পারে; যেমন—ভগ্ন (Irregular or Indented), অভগ্ন

(Regular), উচ্চ (High), নিম্ন ও গভীর (Deep)। ভগ্ন, নিম্ন ও গভীর তটরেখা দেশের উন্নতির পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী। তটরেখা ভগ্ন হইলে জলভাগ দেশের অভ্যন্তরে অধিকদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে, এবং ঐ স্থান বাহির সমুদ্রের তরঙ্গক্ষেপ হইতে স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত থাকে। ফলে সেখানে বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ সুবিধাজনক হয়। ইহাতে দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। সমুদ্রপথে দেশ-বিদেশের সহিত যোগাযোগ সহজ হয়। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা নৌ-বিদ্যায় পারদর্শী হয়। ইহা ছাড়া সমুদ্র হইতে মৎস্য আহরণ ও ইহার ব্যবসায় অধিবাসীরা জীবিকা হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশের সৈকতরেখা অতিমাত্রায় ভগ্ন হওয়ায় ইহার যে-কোন অংশ সমুদ্র হইতে মাত্র ১৬০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। ইহার ফলে পণ্য-পরিবহণের ব্যয় অত্যন্ত কম হয়। অধিকন্তু ইহার ভগ্ন, নিম্ন ও গভীর তটরেখা এই দেশকে অনেক বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। অধিবাসীরা যেমন নৌ-বিদ্যায় দক্ষ তেমনি মৎস্য আহরণেও পটু। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য আন্তর্জাতিক মৎস্য-ব্যবসায়ের এক বিরাট কেন্দ্র। ভগ্ন তটরেখার এই সুযোগই একদিন তাহাকে বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য স্থাপনে সাহায্য করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম তটরেখা বিশেষ ভগ্ন না হওয়ায় ঐ অঞ্চলে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন বন্দর গড়িয়া উঠে নাই। ভারতের উপকূলভাগও তেমন ভগ্ন না হওয়ায় ভারতে স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয়ের সংখ্যা খুব কম।

আদর্শ তটরেখা : তটরেখার গুরুত্ব ইহার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, তটরেখা ভগ্ন হওয়া প্রয়োজন। তটরেখা ভগ্ন হইলে জলপথে দেশের অভ্যন্তরে অনেক দূর দূর অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়। বন্দর ও পোতাশ্রয় গঠন সহজ হয়। দ্বিতীয়ত, তটরেখা খুব গভীর হওয়া প্রয়োজন। সমুদ্রোপকূল গভীর না হইলে সমুদ্রগামী জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে বন্দর বা পোতাশ্রয় গঠন করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, তটরেখা বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, তটভাগ বিস্তৃত না হইলে অধিক সংখ্যক জাহাজ নোঙ্গর করিতে পারে না। চতুর্থত, তটরেখা নিম্ন ও সমতল হওয়া প্রয়োজন। নিম্ন ও সমতল তটভাগ বন্দরের সহিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগকারী রেলপথ ও সড়কপথ নির্মাণে সহায়ক হয়।

তটরেখা অভগ্ন ও উচ্চ হইলে পোতাশ্রয় নির্মাণ যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি বন্দরের সহিত অন্যান্য অঞ্চলের যোগসাধনও অসুবিধাজনক হয়। সাধারণত অভগ্ন তটভাগ অগভীরও হয়। ফলে জাহাজ তীরভূমির সন্নিকটে আসিতে পারে না। বাহির সমুদ্রে জলযান নোঙ্গর করিয়া থাকা নিরাপত্তার দিক হইতে বিপজ্জনক। আবার মালপত্র খালাস ও বোঝাই করিতে ছোট ছোট জলযানের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। ইহাতে পরিবহণ-ব্যয় অধিক হয়। সুতরাং এই সকল স্থানে বন্দর বা পোতাশ্রয় নির্মাণ অলাভজনক।

[প্রশ্ন : (১) ভগ্ন ও গভীর তটরেখায় বন্দর গড়িবার সুবিধা হয় কেন ? (২) অভগ্ন ও অগভীর তটরেখার অসুবিধা কি ? (৩) ভগ্ন ও গভীর তটরেখাযুক্ত দুইটি দেশের নাম লিখ। ভারতের তটরেখা কিরূপ ? (৪) দেশের তটরেখা কিরূপ হইলে অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হয় ? (৫) দেশের বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নে তটরেখার প্রভাব উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা কর।]

(ঘ) ভূ-প্রকৃতি

(Physical Features or Topography)

পৃথিবীর উপরিভাগ সর্বত্র সমান নহে। ইহার কোন স্থান অত্যন্ত উচ্চ ও খাড়া, কোন স্থান গভীর খাদের ন্যায়, কোন স্থান আবার বেশ সমান ও সমতল। ভূ-পৃষ্ঠের এই বন্ধুরতা বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে। বন্ধুরতা অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন—(১) পার্বত্যভূমি (Mountains), (২) মালভূমি (Plateaus) ও (৩) সমভূমি (Plains)।

(১) পার্বত্যভূমি (Mountains): পর্বতসংকুল স্থান পাথরে গড়া উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো হওয়ায় ইহা মানুষের বসতির পক্ষে অসুবিধাজনক। এই অঞ্চলে সমভূমির খুবই অভাব। ফলে কৃষিকার্য, বাড়ীঘর নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈয়ার, শিল্প স্থাপন ইত্যাদি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তেমন দেখা যায় না। কৃষিকার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—পর্বতের ঢালু পার্শ্বদেশে কোথাও সিঁড়ির ন্যায় ধাপ কাটিয়া কিছু কিছু ধান, গম, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতির চাষ-আবাদ (Terrace Cultivation) করা হয়। কোথাও দীর্ঘমেয়াদী বাগিচা-কৃষির প্রসার লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ভারতের হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে ও দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি অঞ্চলে চা-এর আবাদ, কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশে আপেল ও অন্যান্য ফলের চাষ উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য অঞ্চলে সভ্যতার আলোক এখনও ভালভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। অধিবাসীরা আজিও পুরাতন 'জুম চাষ'-এর মাধ্যমে জীবিকার সংস্থান করে এবং নানাপ্রকার কুসংস্কারে বিশ্বাস করে।

মোটকথা পার্বত্য ভূমি জনবসতি বিস্তারে, ভাষা, আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে। এই সকল কারণে পার্বত্য অঞ্চলকে কষ্টের অঞ্চল (Region of Strain) বলা হয়। এই অঞ্চলে জনবসতি খুবই বিরল। নদী-উপত্যকায় বা পর্বতাঞ্চলের প্রধান পথের উভয় পার্শ্বে বিক্ষিপ্তভাবে (Scattered) অথবা রৈখিক (Liner) পদ্ধতিতে কিছু কিছু জনবসতি গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়।

পার্বত্যভূমি অর্থনৈতিক প্রসারের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলেও পর্বতের অবস্থান অনেক সময় দেশের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হয় ; যেমন—

(i) পর্বত দেশের স্বাভাবিক সীমা নির্দেশ করে এবং অনেক সময় বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে। হিমালয় পর্বত ভারতের উত্তর দিকের স্বাভাবিক সীমা নির্দেশ করে। ইহার অবস্থান ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(ii) পর্বত দেশের জলবায়ুকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতের সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমিকে সুজলা সুফলা করিতে হিমালয়ের দান অপরিসীম। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বর্ষাকালে হিমালয়ে বাধা পাইয়া সমগ্র উত্তর ভারতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং ইহার ফলে এই সমভূমিতে ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। ভারতের কৃষি-অর্থনীতির মূল ভিত্তি এই মৌসুমী বৃষ্টিপাত হিমালয়ের দান। আবার শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু এই হিমালয় পর্বতে বাধা পায় বলিয়াই উত্তর ভারতে শীত তত্টা তীব্র নহে। দিল্লী নগরীর পার্শ্বে যমুনা নদী ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর মোহনা ভৌগোলিক দিক হইতে একই অক্ষাংশে অবস্থিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মিসিসিপি নদীর মোহনায় জল শীতকালে কখনও কখনও জমিয়া বরফ হইয়া যায় কিন্তু দিল্লীর নিকট যমুনার জল কোনদিনই জমিয়া বরফ হয় না। ইহার কারণ, ভারতের হিমালয়ের মত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশে পূর্ব-পশ্চিমাংশে প্রসারিত কোন পর্বত নাই। ফলে উত্তর মেরু অঞ্চলের শৈত্য-প্রবাহ সরাসরি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত নামিয়া আসে। ভারতের উত্তরে হিমালয় না থাকিলে ভারতের জলবায়ু যে চরমভাবাপন্ন হইত ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

(iii) পার্বত্য ভূমি নদ-নদীর উৎস। পর্বতের উচ্চতর অংশে প্রচুর বরফ জমে এবং পর্বতাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির জল ও বরফগলা জল সর্বদা পর্বতের গাত্র বাহিয়া নামিয়া আসে এবং সমভূমি অঞ্চলে বিরাট নদ-নদী সৃষ্টি করে। এই নদ-নদীই দেশকে শস্য-শ্যামলা ও সম্পদশালিনী করে। মিশরের নীলনদ, চীনের হোয়াংহো, ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সকল নদী জলপথে বাণিজ্য বিস্তারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

(iv) পার্বত্য অঞ্চলের নদীগুলি সাধারণত খরস্রোতা হয়। এই সকল নদীতে বাঁধ দিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। তাপ-বিদ্যুতের অভাবে যে-সকল অঞ্চলে শিল্প-কারখানা স্থাপন অসুবিধাজনক সেই সকল স্থানে জলবিদ্যুতের সাহায্যে শিল্প সংস্থাপন সম্ভব হয়। আবার ঐ বাঁধের পিছনের দিক হইতে খাল কাটিয়া কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের সুবন্দোবস্তও করা যায়। ইহার ফলে দেশ কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধি লাভ করে।

(v) পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টির জলে ও বরফগলা জলে মাটি সিক্ত থাকে বলিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ বনভূমি পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়। ইহা খুব ঘন হয় এবং নানা প্রকার মূল্যবান কাঠ ও বনজ সম্পদে পূর্ণ থাকে। কাগজ ও কৃত্রিম রেশম শিল্পের প্রধান কাঁচামাল—নরম কাঠ ; গৃহ, জাহাজের পাটাতন ও আসবাবপত্র প্রভৃতি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত মজবুত কাঠ, নানাপ্রকার ফলমূল, মধু, এমনকি ভেষজ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালও এই সকল বনভূমি হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার রকি, ইউরোপের স্ক্যান্ডিনেভিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার আন্ডিজ এবং ভারতের হিমালয় বিভিন্ন প্রকার বনজ সম্পদে পূর্ণ।

(vi) পার্বত্য অঞ্চলে কোথাও কোথাও সুন্দর গোচারণ ভূমি গড়িয়া উঠে। ওক, বীচ প্রভৃতি গাছের ফল শূকরের খাদ্য। এই কারণে ইউরোপের পার্বত্য অঞ্চলে ওক, বীচ অরণ্যপ্রান্তে স্থানে স্থানে শূকর চারণ-ভূমি দেখা যায়। ভারতের হিমালয় অঞ্চলে ও সুইজারল্যাণ্ডে পর্বতের উচ্চ ঢালে তৃণভূমিকে কেন্দ্র করিয়া গো-চারণ ভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। পরোক্ষভাবে ইহা দুগ্ধজাত দ্রব্যের শিল্প সংগঠনে সহায়তা করে।

(vii) পার্বত্য অঞ্চলে প্রায়ই বহুবিধ খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। ভারতের আসাম, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলি পর্বতসংলগ্ন। আমেরিকার রকি ও আপালেচিয়ান পর্বত অঞ্চল, সোভিয়েত ইউনিয়নের উরাল পর্বত বিবিধ খনিজসম্পদে পূর্ণ ও দেশের শিল্পবিকাশে এই সকল খনিজ পদার্থের অবদান অপরিসীম।

(viii) পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন স্থানে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জলবায়ু অতি মনোরম। ঐ সকল স্থানে আকর্ষণীয় শৈলাবাস গড়িয়া উঠে ও ভ্রমণকারিগণের আপ্যায়নের জন্য ঐ সকল স্থানে হোটেল-ব্যবসার প্রসার ঘটে।

পার্বত্য অঞ্চলে নানাপ্রকার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে।

(২) মালভূমি (Plateaus): সমুদ্র-সমতল হইতে প্রায় ৫০০ মিটার উচ্চে অবস্থিত সমতল বা প্রায় সমতল ভূমিকে মালভূমি বলা হয়। ভূতাত্ত্বিকগণের মতে মালভূমি অঞ্চল পৃথিবীর অতি প্রাচীন অংশ। পৃথিবীর সমস্ত মালভূমির গঠন ও প্রকৃতি এক নহে। ভূ-আন্দোলনের ফলে অথবা পর্বতাঞ্চল ক্রমাগত ক্ষয় হইয়া অথবা আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত লাভা সঞ্চয়ের ফলেই মালভূমির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের মাটি অনুর্বর বলিয়া কৃষিকার্যের সুযোগ কম। তথাপি এই সকল স্থানে পর্বতাঞ্চলের তুলনায় কৃষিকার্যের প্রসার বেশি। পৃথিবীর প্রায় সকল মালভূমি অঞ্চলই নানা প্রকার খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে লোহা, কয়লা, ম্যাঙ্গানীজ, তাম্র, বক্সাইট ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মালভূমি অঞ্চল হইতে সীসা, দস্তা, সোনা প্রভৃতি উত্তোলিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলনের অন্তর্গত মালভূমি অঞ্চলেও কয়লা, সোনা, লোহা ইত্যাদি পাওয়া যায়। কানাডার মালভূমি অঞ্চল প্রচুর নিকেল, রূপা ও অ্যাসবেস্টসে সমৃদ্ধ। কষ্টসাধ্য হইলেও এই সকল অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও যানবাহনের ব্যবস্থা করা যায়। ফলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, জনবসতি ঘন হয় এবং সুন্দর শহর ও শিল্প বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। উষ্ণমণ্ডলের মালভূমি অঞ্চলে কোন কোন স্থানে জলবায়ু মনোরম ও আরামপ্রদ হয় এবং ঐ সকল স্থানে স্বাস্থ্যনিবাস গড়িয়া উঠে। ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের রাঁচি শহর উল্লেখযোগ্য। মালভূমি অঞ্চলে বিস্তীর্ণ তৃণভূমিও দেখা যায়। ঐ তৃণভূমিতে পশুচারণক্ষেত্র ও দুগ্ধ-শিল্পের প্রসার ঘটে। দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব প্রান্তে, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে এবং মধ্য এশিয়ার মালভূমি অঞ্চলে পশুপালন অধিবাসীদের একটি প্রধান

উপজীবিকা। মালভূমি অঞ্চল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে খুব উপযোগী না হইলেও খনিজ সম্পদের অবস্থান হেতু এই সকল অঞ্চলে ক্রমাগত শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিতেছে ও অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৩) **সমভূমি (Plains):** নদী-অবাহিকা ও সমুদ্রোপকূল অঞ্চলগুলি সাধারণত সমভূমি। ইহা ছাড়া মহাদেশের মধ্যভাগেও সমভূমি আছে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে সমভূমি আদর্শস্থানীয়। সমভূমিগুলি বেশির ভাগই নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত বলিয়া উর্বর হয়। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সমভূমিগুলি কোন একটি নদী এবং তাহার উপনদী ও শাখা নদী বাহিত পলি দ্বারা গঠিত, যেমন—ভারতের সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি, মিশরের নীলনদের সমভূমি, চীনের হোয়াংহো সমভূমি এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি-মিশৌরী সমভূমি। পলি সঞ্চয় ছাড়াও কখনও কখনও মালভূমি বা পার্বত্য ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া সমভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তাহাদের গুরুত্ব নগণ্য।

এই অঞ্চলের প্রধান আকর্ষণ কৃষিকার্য এবং যুগ যুগ ধরিয়া কৃষির সহজ সুযোগই সমভূমি অঞ্চলে মানুষকে আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। এই অঞ্চলের উর্বর পলল-মৃত্তিকা ও জলসেচের সহজ সুযোগ কৃষিকার্যের বিশেষ সহায়ক বলিয়া বিশ্বের প্রধান প্রধান কৃষি-বলয়গুলি সমভূমি অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ভূ-ভাগ উঁচুনিচু না হওয়ায় এখানে সড়কপথ ও রেলপথ নির্মাণ সহজ। পৃথিবীর রেলপথ ও সড়কপথের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ সমভূমি অঞ্চলে নির্মিত হইয়াছে। অধিকন্তু সমভূমি অঞ্চলে প্রবাহিত নদীগুলি নাব্য হওয়ায় জলপথে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা সুন্দর-ভাবে গড়িয়া উঠে। পরিবহণের সহজ সুযোগ আবার ভারী শিল্প-গঠনের উপযোগী। জীবিকার সহজ সুযোগ থাকায় এই অঞ্চল সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ হইয়া থাকে। সমভূমি অঞ্চলে নদীর তীরে শহর, বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া ওঠে। বিশ্বের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লোক এই সমভূমি অঞ্চলে বসবাস করে। উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রকার পণ্যসামগ্রীর চাহিদা (ঘনবসতির জন্য) ও পর্যাপ্ত শ্রমিকের যোগান ইত্যাদির সুবিধা থাকায় এই অঞ্চলে শিল্প প্রসারলাভ করে। পৃথিবীর উন্নত শিল্পাঞ্চলগুলি, যেমন—সোভিয়েত ইউনিয়নের ডোনেৎস্, জার্মানীর রূঢ়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গ, ভারতের হুগলী নদীর অববাহিকা, স্কট-ল্যান্ডের ক্লাইড অববাহিকা প্রভৃতি অঞ্চলগুলি সবই সমভূমিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। সংক্ষেপে, সমভূমি অঞ্চল কৃষি, শিল্প ও আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে খুবই অনুকূল। ফলে এই সকল অঞ্চলেই প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল এবং ঐ ধারা অবলম্বন করিয়া সমভূমিতে শিক্ষা-সংস্কৃতির নব নব রূপায়ণ ঘটিয়া চলিয়াছে।

অবশ্য সকল সমভূমি অঞ্চলই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে সুবিধাজনক না-ও হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, জলবায়ু ইত্যাদির প্রতিকূলতার জন্য কোন কোন সমভূমি অঞ্চল, যেমন—কঙ্গো, আমাজন অববাহিকা অর্থনীতির দিক

হইতে এখনও অনুন্নত। আবার, সাহারা বা আরব মরু-অঞ্চল সমভূমি হইলেও প্রাকৃতিক কারণেই লোকবসতির অনুপযোগী এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে অনগ্রসর।

[প্রশ্ন : (১) পার্বত্য অঞ্চল জনবিরল হয় কেন ? অথবা, পার্বত্য অঞ্চল মানুষের বসতি, কৃষি ও শিল্পের পক্ষে তেমন উপযুক্ত না হইবার কারণ কি ? (২) কোন দেশের জনজীবনে পার্বত্য অঞ্চলের উপকারিতা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (উদাহরণ উল্লেখ করিতে হইবে।) (৩ মালভূমি কাহাকে বলে ? মালভূমি অঞ্চলে সাধারণতঃ কি প্রকার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয় ? (৪) "সমভূমি অঞ্চল মানুষের বসতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে আদর্শ স্থান।"— উক্তিটি সংক্ষেপে আলোচনা কর। (৫) ভূ-প্রকৃতি কিরূপে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও।]

(ঙ) জলবায়ু
(Climate)

জলবায়ুর উপাদান প্রধানত তিনটি—সূর্যের উত্তাপ, বৃষ্টিপাত ও বায়ু। এই তিনটি উপাদানের অতি স্বল্পকালীন প্রভাবকে কোন একটি স্থানের আবহাওয়া বলা হয়। আবার এই উপাদানগুলির প্রভাবের অতি দীর্ঘকালীন গড়কেই উক্ত স্থানের জলবায়ু বলা হয়।

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রভাববিস্তারকারী প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মধ্যে জলবায়ু অন্যতম প্রধান। মানুষের সর্বাধিক প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান। ইহার সকলই জলবায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জলবায়ুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবই পৃথিবীতে নানা অংশে মানুষের নানাপ্রকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য মুখ্যত দায়ী।

জলবায়ুর প্রতিকূলতার ফলে আজিও আলাস্কা, সাইবেরিয়া বা সাহারা, আটাকামা জনবিরল। আবার জলবায়ুর আনুকূল্যই এশিয়ার নদ-নদীর অববাহিকাগুলিকে সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে। এই কারণে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যধারা বিশ্লেষণে জলবায়ুর আলোচনা অপরিহার্য। জলবায়ু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মানুষের জীবন ও জীবিকার সহিত সম্পর্কিত যে-সকল বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে, নিম্নে তাহাদের আলোচনা করা হইল :

(১) স্বাভাবিক উদ্ভিদ : জলবায়ুর সহিত উদ্ভিদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বৃষ্টিপাত মাটিকে রসসিক্ত করে এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়তা করে। বৃষ্টির অভাবে মাটি ঊষর ও কৃষির অনুপযোগী হইয়া পড়ে। বৃষ্টিপাতের মত উত্তাপও স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের সহায়ক। জলবায়ুর তারতম্যের জন্যই নিরক্ষীয় অঞ্চলের ঘন বৃক্ষশ্রেণী ক্রমশ খর্ব ও হাল্কা হইতে হইতে মধ্যাঞ্চলের তৃণভূমিতে পরিণত হয়। নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনভূমি বা নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বনভূমি বা সরলবর্গীয় বনভূমি জলবায়ুর প্রত্যক্ষ প্রভাবেই সৃষ্ট হয়। এই সকল বনভূমি হইতে কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজ দ্রব্য আহরণ করিয়া মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করে।

(২) পশুচারণ ও পশুর ব্যবহার : জলবায়ুর তারতম্যের প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের জীবজন্তুর সমাবেশ দেখা যায়। পশু নানাভাবে

মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টায় সাহায্য করে। পর্বতের দুর্গম স্থানে মাল ও যাত্রী বহনে বা মরুভূমিতে চলাচলের ক্ষেত্রে পশুই মানুষের প্রধান সহায়। পশুচারণ ক্ষেত্রগুলি জলবায়ুর প্রভাবেই গড়িয়া উঠে, যেমন—নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মধ্যদেশীয় তৃণভূমি। পশুর মাংস, চামড়া, হাড়, দাঁত প্রভৃতি মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করে। সুতরাং পশুজাত বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবহারকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে দুগ্ধশিল্প, মাংসশিল্প, পশমশিল্প, চর্মশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প সংগঠিত হইয়াছে।

(৩) **কৃষিকার্য**: জলবায়ুর প্রভাব কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রকট। কৃষিকার্যের জন্য ন্যূনতম উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর তারতম্যের ফলেই কৃষি পদ্ধতি ও কৃষি-পণ্যের বিভিন্নতা দেখা যায়। অতি-বৃষ্টি ও অতি-উত্তাপ যেমন কৃষির অন্তরায় তেমনি ন্যূনতম উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের অভাবও কৃষির অন্তরায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অতি-উষ্ণ ও অতি-আর্দ্র জলবায়ু তথাকার কৃষিকার্যের পক্ষে বাধাস্বরূপ। আবার মেরুসন্নিহিত অঞ্চলের অত্যল্প উত্তাপও কৃষিকার্যের পক্ষে বিরাট বাধা।

কৃষিকার্য জলবায়ুর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল বলিয়াই বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাভাবিক উৎপন্ন ফসলকে ঐ অঞ্চলের নামেই চিহ্নিত করা হয়। ধান, পাট ইত্যাদি উপক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের ফসল। ইহাদিগকে উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল বলা হয়। গম, যব, রাই ইত্যাদি আবার অল্প উত্তাপ ও অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই প্রধানত জন্মিয়া থাকে। এই কারণে ইহাদিগকে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ফসল বলা হয়। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে জলবায়ুর নিরঙ্কুশ প্রভাব মানুষের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক বলিয়া ইহার নিয়ন্ত্রণে মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই। জলসেচ ব্যবস্থা, শুষ্ককৃষি, মিশ্র কৃষি-ব্যবস্থা ও নানা জলবায়ুর উপযোগী বীজের আবিষ্কার ইত্যাদি এই বিষয়ে মানুষের বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টারই ফল।

(৪) **পোশাক ও বাসগৃহ**: পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের পোশাকের বিভিন্নতা জলবায়ুর কারণেই দেখা যায়। উষ্ণ অঞ্চলের মানুষ সুতীবস্ত্র বেশী ব্যবহার করে। কিন্তু শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষ পশমের আঁটোসাঁটো পোশাক পছন্দ করে। মেরু অঞ্চলের অধিবাসীরা পশুর চামড়া দ্বারা প্রস্তুত পোশাক ব্যবহার করে। জলবায়ুর উষ্ণতা ও শীতলতার সহিত ঐ সকল অঞ্চলে পরিধেয় বস্ত্র তৈয়ারের উপযোগী কাঁচামালের সহজলভ্যতার সম্পর্কও রহিয়াছে। উষ্ণ অঞ্চলে তূলা যেমন সহজলভ্য, শীতোষ্ণ অঞ্চলে তেমনি পশমের যোগান সহজ, স্বাভাবিক ও প্রচুর। বাসগৃহের ক্ষেত্রেও জলবায়ুর বিভিন্নতা অনুযায়ী বাসগৃহের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শীতপ্রধান অঞ্চলে বাসগৃহের ছাদ সাধারণত চারিদিকে ঢালু থাকে। ইহাতে বরফ জমিয়া ছাদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করিতে পারে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ছাদ মোটামুটি সমতল হয়। বৃষ্টিবিরল অঞ্চলে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ছাদের ঢাল বাড়ির মধ্যেই রাখা হয়। ভূমিকম্প-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে,

যেমন—জাপানে বাড়িগুলি সাধারণত কাঠের তৈয়ারী হয়। পাহাড় অঞ্চলেও কাঠ সহজলভ্য বলিয়া সাধারণত কাঠের বাড়িই বেশী দেখা যায়।

(৫) উপনিবেশ স্থাপন : মানুষের বসবাসের উপযোগী জলবায়ু অঞ্চলেই মানুষ বসতি স্থাপন করে। আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গগণের বসবাসের উপযোগী জলবায়ু অঞ্চলেই তাহারা প্রথম বসতি গড়িয়া তোলে। ভারতে দার্জিলিং, মুসৌরী, ডালহৌসী প্রভৃতি একদিন দুর্গম ছিল। কিন্তু ঐ সকল অঞ্চলের জলবায়ু শ্বেতাঙ্গগণের উপযোগী হওয়ায় ঐ সকল স্থানে তাহারা কালক্রমে সুন্দর শহর ও স্বাস্থ্যনিবাস গড়িয়া তুলিয়াছে।

(৬) স্বাস্থ্য ও শারীরিক গঠন : মানুষের স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতার উপর জলবায়ুর অশেষ প্রভাব বিদ্যমান। জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের শারীরিক গঠন, কর্মদক্ষতা, মানসিক বিকাশ ও রীতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়। উষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণত দুর্বল, অলস ও ভাগ্যবিশ্বাসী হয়। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীরা কঠোর পরিশ্রমী, আত্মনির্ভর ও উদ্যমী হয়। তাহারা ভাগ্যকে জয় করিতেই বেশি আনন্দ পায়।

(৭) লোকবসতি : লোকবসতি জলবায়ুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জলবায়ু ব্যাপক কৃষিকার্যের পক্ষে উপযোগী এবং এই অঞ্চলে জীবিকার সহজ সুযোগ রহিয়াছে বলিয়া পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশিসংখ্যক লোক এই অঞ্চলে বাস করে। এই কারণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে এবং ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব অধিক। আবার মরুভূমি বা মরুদেশীয় প্রতিকূল জলবায়ু অঞ্চলে দেখা যায় স্বাভাবিক জনবিরলতা।

(৮) যন্ত্রশিল্পের সংগঠন : অতীতে যন্ত্রশিল্পের সংগঠনে জলবায়ুর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যাইত, যেমন—বয়নশিল্প, সিনেমা শিল্পে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু ইহার পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। এই কারণে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে ম্যাঞ্চেস্টার, জাপানের ওসাকা, ভারতের বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলেই ইহার একদেশীভবন লক্ষ্য করা যায়। উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়া ময়দা-শিল্পের সংগঠনে উপযোগী বলিয়া পাকিস্তানের করাচী, ভারতের কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার সমাবেশ দেখা যায়। সিনেমা-শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচুর উজ্জ্বল সূর্যকিরণ প্রয়োজন। এই কারণে ইটালি ও আমেরিকার লস এঞ্জেলস্-এ (হলিউড) ঐ শিল্পের বিশেষ প্রসার দেখা যায়। বর্তমানকালে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় কারখানার অভ্যন্তরে উত্তাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যায় বলিয়া শিল্প সংগঠনে জলবায়ুর প্রত্যক্ষ প্রভাব অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে।

যন্ত্রশিল্প ও জলবায়ুর সম্পর্ক (Relation between Industry and Climate)

যন্ত্রশিল্পের সংগঠন বহুলাংশে জলবায়ুর দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত। শিল্প সংগঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ, দক্ষ শ্রমিকের প্রাচুর্য, পণ্য-

চলাচলের উপযোগী পরিবহণ-ব্যবস্থা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা নিয়মিত হওয়া একান্ত দরকার। এই বিষয়গুলির সহিত জলবায়ুর যোগ অতি নিবিড়। এই কারণেই যন্ত্রশিল্পকে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল বলা হইয়া থাকে।

(i) কাঁচামাল: পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত শিল্পের মধ্যে অধিকাংশ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কৃষিজ দ্রব্য, যেমন—তুলা, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ, আঙ্গুর ইত্যাদি। এই সকল কৃষিজ পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। ভারতের পাটশিল্প বিশ্বের বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদার শতকরা সত্তর ভাগ মিটাইয়া থাকে। এই বিষয়ে ভারতের বিশেষ সুবিধার উৎস ভারতের জলাবায়ু। ভারতের পূর্বাঞ্চলের অতি আর্দ্র জলবায়ু পাট উৎপাদনের অনুকূল বলিয়া এতদঞ্চলে পাটের ব্যাপক চাষ হয়। তুলা উৎপাদনে অনুরূপ সুবিধা রহিয়াছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু তুলা চাষের উপযোগী, ফলে মিশর ব্যতীত অন্য তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্রেই বস্ত্রবয়নশিল্প বিশেষরূপে উন্নত। পৃথিবীতে মদ্য-শিল্পে ফরাসী দেশ বিশেষ সম্মানের অধিকারী। ইহার কারণ, দক্ষিণ ফ্রান্সে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু আঙ্গুর উৎপাদনের বিশেষ সহায়ক। ভারতের বিহার ও উত্তরপ্রদেশ মধ্যম বৃষ্টিপাতযুক্ত শুষ্ক অঞ্চল হওয়ায় ইক্ষু চাষের বিশেষ উপযোগী। এই কারণে এই অঞ্চলে শর্করা-শিল্পের একদেশীভবন লক্ষণীয়।

(ii) শ্রমিকের যোগান ও দক্ষতা: সকল প্রকার শ্রমশিল্পের জন্যই দক্ষ শ্রমিকের যোগান বিশেষ প্রয়োজন। শ্রমিকের যোগান ও তাহার দক্ষতা নির্ভর করে জলবায়ুর উপর। অনুকূল জলবায়ুতে জীবনযাপনের সহজ সুযোগ থাকে বলিয়া লোকবসতি ঘন হয়। আবার ঐ জলবায়ু শ্রমিকের শারীরিক গঠন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। ক্রান্তীয় বা উপক্রান্তীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা উষ্ণতার আধিক্যে সাধারণত অলস ও স্বল্প পরিশ্রমেই কাতর হয়। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীরা কর্মঠ ও বলিষ্ঠ হয় এবং একনাগাড়ে দীর্ঘ সময় কাজ করিয়াও ক্লান্ত হয় না। এই কারণেই ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা জাপানের শ্রমিকেরা ভারত বা মালয়েশিয়া অঞ্চলের শ্রমিকের তুলনায় বেশি পরিশ্রমী ও কর্মনিপুণ হয়।

(iii) পরিবহণ-ব্যবস্থা: যে-কোন দেশের শিল্পোন্নতির পক্ষে পরিবহণ ব্যবস্থা অপরিহার্য। কাঁচামাল শিল্পক্ষেত্রে পৌঁছাইতে এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাজারজাত করিতে পরিবহণের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবহণ-ব্যয় শিল্পপণ্যের উৎপাদন-ব্যয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিবহণ-ব্যয়ের বিষয়টি বিশেষরূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু সুষ্ঠু পরিবহণ-ব্যবস্থা জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত রেলপথ ও সড়কপথ নির্মাণ এবং সংরক্ষণের বিশেষ অন্তরায়। তুষারাচ্ছন্ন পথঘাট বা নদী পরিবহণের অযোগ্য। যে-সকল অঞ্চলে প্রায়ই ঘূর্ণিবাতাস দেখা যায় সেই সকল অঞ্চলে জাহাজ ও বিমান পরিবহণও ভীষণ বিপজ্জনক। সাইবেরিয়া, কানাডা প্রভৃতি অঞ্চলের নদীগুলি বৎসরের প্রায় ৩/৪ মাস বরফাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া পরিবহণের বিশেষ অসুবিধা হয়। ভারতে কাশ্মীর ও তিব্বত অঞ্চলে

অধিক তুষারপাতের ফলে কখনও কখনও যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং জলবায়ুর প্রতিকূলতা পরিবহণ-ব্যবস্থাকে দুর্বল করে এবং শিল্পের সংগঠন ও প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে।

(iv) **উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা ও বাজার** : শিল্পের সংগঠন নিঃসন্দেহে চাহিদাকেন্দ্রিক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক চাহিদারই গুরুত্ব বেশি। এই কারণে দেখা যায় শীতপ্রধান অঞ্চলে পশমী পোশাকের চাহিদা বেশি। আবার উষ্ণ অঞ্চলে সুতীর পরিচ্ছদের চাহিদা বেশি। ফলে ঐ স্থানীয় চাহিদাকে ভিত্তি করিয়া শীতপ্রধান অঞ্চলে পশমীবস্ত্র, বয়নশিল্প এবং উষ্ণ অঞ্চলে কার্পাসসূত্র-নির্মিত বয়নশিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া শীতপ্রধান অঞ্চলে তীব্র শীতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার সহজ উপায় হিসাবে মদ্য উত্তেজক পানীয় হিসাবে গ্রহণ করা একটি সাধারণ স্বাস্থ্যরীতি। এই কারণে ঐ সকল অঞ্চলে মদ্য প্রস্তুত বিষয়টি শিল্প হিসাবে সংগঠিত হইয়াছে। অবশ্য বর্তমানকালে সকল দেশেই মদ্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে সর্বত্রই প্রায় মদ্য-শিল্পের প্রসার লক্ষ্য করা যায়।

[প্রশ্ন : (১) পৃথিবীর স্বাভাবিক উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণে জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর। (২) পশুর ব্যবহার ও পশুপালন কিরূপে জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও। (৩) "কৃষিকার্য প্রধানত জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"—উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (৪) কৃষিকার্যকে জলবায়ুর নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য মানুষের প্রচেষ্টাগুলি কি? (৫) তিনটি উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল এবং তিনটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসলের নাম লিখ। (৬) মানুষের খাদ্য, পোশাক ও বাসগৃহের উপর জলবায়ুর প্রভাব উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা কর। ৭) পরিবহণ-ব্যবস্থা কিরূপে জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত হয়, উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। (৮) উদাহরণসহ উল্লেখ করিয়া শ্রমশিল্পের উপর জলবায়ুর প্রভাব আলোচনা কর। (৯) আর্দ্র জলবায়ু বয়ন শিল্পের অনুকূল কেন? (১০) ভারতের বাহিরে আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত দুইটি বয়নশিল্পকেন্দ্রের নাম লিখ। (১১) হলিউড কোথায়? 'প্রধানত জলবায়ুর জন্যই হলিউডে সিনেমাশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।'—কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।]

(চ) আভ্যন্তরীণ জলভাগ
(Inland water bodies)

দেশের প্রান্তে বা মধ্যে অবস্থিত নদ-নদী, হ্রদ এবং মানুষের তৈরী খাল ইত্যাদি দেশের আভ্যন্তরীণ জলাশয়ের উদাহরণ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ইহাদের অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

নদ-নদী (Rivers): প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে নদ-নদীই মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই নদ-নদীর সহিত মানুষের জীবন অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলি নদ-নদীকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল : যেমন—(১) আফ্রিকায় নীল নদকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা, (২) মধ্যপ্রাচ্যের টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, (৩) চীনের হোয়াংহো

নদের উপত্যকায় প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা এবং (৪) ভারতে সিন্ধু-গঙ্গাকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন আর্যসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে বর্তমানেও নদ-নদীর গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে নদ-নদীর প্রভাব নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দ্বারা সূচিত হয় :

(i) পাহাড় হইতে বালি, পাথর, পাথরের ক্ষয়ীভূত অংশ নদ-নদী বহিয়া আনিয়া একদিকে যেমন মোহনায় নতুন নতুন ভূ-ভাগের (ব-দ্বীপ) সৃষ্টি করিয়া নতুন নতুন জনপদের অভ্যুত্থান ঘটায় তেমনি অববাহিকা অঞ্চলে পলি বিতরণ করিয়া জমিকে উর্বর ও শস্যশ্যামল করে। মিশর, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের নদ-নদীর অববাহিকাগুলি কৃষিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

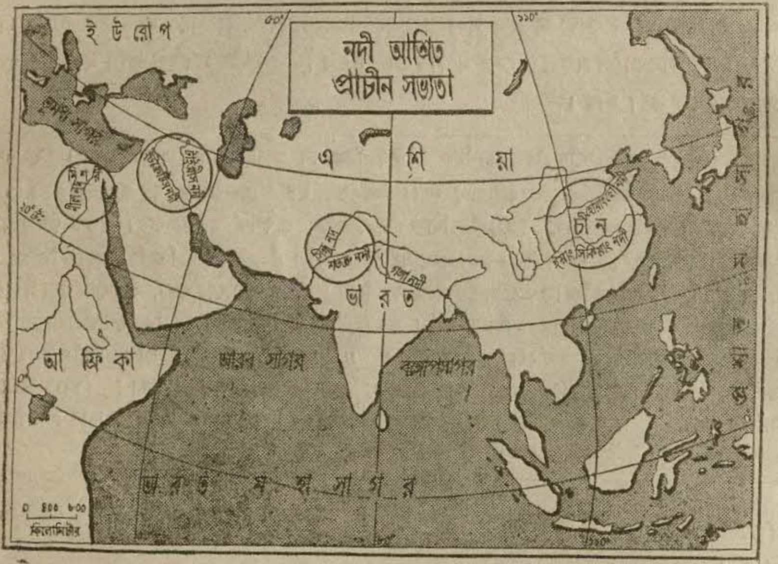

চিত্র ২.২ : নদ-নদী আশ্রিত পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র।

(ii) স্নান ও পানের জন্য মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় জলের বেশির ভাগই নদ-নদী হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। আধুনিক শিল্পোন্নত শহরগুলিতে ভূগর্ভ হইতে যদিও প্রচুর জল সংগ্রহ করা হয়, তথাপি প্রয়োজনীয় জলের বেশির ভাগ নদ-নদী হইতেই লওয়া হয়। ইহা ছাড়া কোন কোন শিল্পে, যেমন—লৌহ-ইস্পাত শিল্পে প্রচুর জলের প্রয়োজন এবং এই জল নিকটবর্তী নদ-নদী হইতে সংগ্রহ করা হয়।

(iii) কৃষিকার্যে জলসেচের গুরুত্ব অপরিসীম। এই সেচের জল সকল দেশে নদ-নদী হইতেই সংগ্রহ করা হয়। নদ-নদীর উপর বাঁধ দিয়া জল আটকাইয়া খালের সাহায্যে ঐ জল কৃষিক্ষেত্রে সরবরাহ করা হয়। আধুনিক কালে বহু মরুপ্রায়

অঞ্চলকে সেচের সাহায্যে উন্নত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। ভারতের রাজস্থান ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(iv) দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক পরিবহণের ক্ষেত্রে নদ-নদীর দান অতুলনীয়। অতি সুলভে পণ্য পরিবহণে নদীপথ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রেলপথ বা সড়কপথ নির্মাণ অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধাজনক ও ব্যয়বহুলও বটে। কিন্তু নদীপথ ঐ সকল ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধাজনক। ইহা ছাড়া আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও সুবিধা আছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ার শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে আভ্যন্তরীণ জলপথের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকায় সেণ্ট লরেন্স নদী, মিসিসিপি-মিসৌরী, ইউরোপে রাইন, রোন এবং ইউরেশিয়ার ডন, নীপার, ভল্গা ইত্যাদি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ভারতে আসামের চা, বাংলাদেশের পাট ইত্যাদি ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা-পদ্মার পথেই কলিকাতা বন্দরে পৌঁছিয়া থাকে।

(v) বর্তমান কালে নদ-নদীকে ইহার উচ্চ ভূ-ভাগ হইতে নিম্নে অবতরণের পথে বাঁধ দিয়া আটকাইয়া জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন সুলভ হয়। জল-বিদ্যুৎ দেশে শিল্পপ্রসারে সাহায্য করে। অধিকন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনে যে-সকল বাঁধ নির্মাণ করা হয় সেই সকল বাঁধের পিছন দিকের জলাধার হইতে জলসেচও করা হয়। ভারতের দামোদর, ভাকরা প্রভৃতি বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার মাধ্যমে সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাহায্যে দ্রুত শিল্পপ্রসারের কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

(vi) দেশের স্বাভাবিক জল নিকাশের প্রণালী হিসাবে নদ-নদীর গুরুত্ব কম নয়। নদ-নদীর তীরে পৃথিবীর বহু শিল্পোন্নত শহর ও নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল শিল্প-নগরীর যাবতীয় নোংরা আবর্জনা নদীপথে বাহিত হইয়া দূরে সাগরে বিসর্জিত হয়।

(vii) দেশের অভ্যন্তরে নদ-নদীতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ইহা স্বাদু জলের মাছ। চাহিদার তুলনায় ইহা অপ্রচুর হইলেও অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহার গুরুত্ব কম নহে। কারণ মৎস্য আহরণ, মৎস্য বিপণন এবং মৎস্য আহরণের যন্ত্রপাতি ও জলযান ইত্যাদি নির্মাণ কার্য দ্বারা বহুসংখ্যক লোক জীবিকা নির্বাহ করে।

নদ-নদী মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে নানাদিক হইতে প্রভাবিত করে। নদ-নদীর দানেমানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুষ্টিলাভ করে। মিশরের ঊষর প্রান্তরের মধ্য দিয়া নীল নদ প্রবাহিত হওয়ায় মিশরের মরুপ্রায় আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং দেশটি কৃষিতে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করিয়াছে। নীল নদের উপর "আসোয়ান বাঁধ" মিশরকে আরও সম্পদশালী করিয়াছে। এই সকল কারণেই মিশরকে "**নীল নদের দান**" বলা হয় (Egypt is the gift of Nile)।

অর্থনৈতিক দিক হইতে নদীর কার্যকারিতা ইহার কতগুলি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, নদ-নদী বরফগলা জলে পুষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কারণ বরফগলা জলে পুষ্ট নদী সারা বৎসর নাব্য থাকে—যেমন, ভারতের গঙ্গা, যমুনা

ইত্যাদি। বৃষ্টিপুষ্ট নদী শীত ও গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে নাব্যতা হারাইয়া ফেলে ও পরিবহণের অযোগ্য হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যের নদ-নদীগুলি বৃষ্টির জলে পুষ্ট বলিয়া সারা বৎসর নাব্য নহে। দ্বিতীয়ত, নদ-নদী গভীর হওয়া প্রয়োজন। নদ-নদী অগভীর হইলে পরিবহণের অসুবিধা দেখা দেয়। বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিপাতে নদীতে প্রবল বন্যা দেখা দেয় এবং তাহাতে প্রচুর শস্য, সম্পদ এমনকি জীবনহানিও ঘটে। পক্ষান্তরে, গভীর নদীখাত প্রচুর জলধারণে সমর্থ, ইহা সুনাব্য ও বন্যা নিরোধক। তৃতীয়ত, নদ-নদী খরস্রোত ও জলপ্রপাত হইতে মুক্ত থাকা প্রয়োজন। নদ-নদীর মধ্য ও নিম্ন গতিতে খরস্রোত ও জলপ্রপাত নাব্যতার পরিপন্থী। চতুর্থত, নদ-নদী বরফমুক্ত থাকা প্রয়োজন। নদ-নদীর জল জমিয়া বরফ হইয়া গেলে ইহা সারা বৎসর পরিবহণের উপযোগী থাকে না।

নদ-নদী মানুষের প্রভূত উপকার করে। কখনও কখনও নদ-নদী মানুষের অপকারও করে। চীনের হোয়াংহো ও ভারতের দামোদর নদে পূর্বে প্রায়ই বন্যা হইত। ইহাতে প্রভূত সম্পত্তি ও প্রাণের হানি হইত। এই কারণে হোয়াংহোকে 'চীনের দুঃখ' ও দামোদরকে 'বাংলার দুঃখ' বলা হইত। অনেক সময় নদী গতিপথ পরিবর্তন করে, ফলে একদিকে যেমন শস্যশ্যামল প্রান্তর জলের অভাবে ঊষর হইয়া যায়, অপরদিকে তেমনি শস্যশ্যামল প্রান্তর, জনপদ নদীর গহ্বরে বিলীন হয়। বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও কারিগরী প্রয়োগরীতির যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় নদীকে বাঁধের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার কল্যাণকর শক্তিকে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে মানুষ নিজের উন্নতির প্রয়োজনে লাগাইতেছে। আধুনিক কালের বহুমুখী নদ-নদী পরিকল্পনাগুলি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

খাল (Canals): মানুষের কাটা খাল নদ-নদী-হ্রদ-সমুদ্র ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন দ্বারা দেশের পরিবহণ-ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটাইয়া থাকে। ফ্রান্স, জার্মানী, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশ বহুসংখ্যক খাল কাটিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ-ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়াছে। জার্মানীর কিয়েল খাল, ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার খাল, হল্যাণ্ডের আমস্টারডম খাল, সোভিয়েত ইউনিয়নের ষ্ট্যালিন খাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আভ্যন্তরীণ পরিবহণের ক্ষেত্রে হ্রদ ও খালপথে যোগাযোগ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নদ-নদীর মত ইহাদের সুযোগ সকল দেশে থাকে না। নদ-নদীই আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ-ব্যবস্থার মূল উৎস। ইহা ছাড়া নদ-নদীর অন্যান্য কার্যের জন্যও নদীর গুরুত্ব সর্বাধিক।

হ্রদ (Lakes): আমেরিকার পঞ্চ হ্রদ—সুপিরিয়র, মিচিগান, হুরণ, ইরি ও অণ্টারিও এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার পঞ্চ হ্রদের মধ্যে খাল দ্বারা যোগাযোগ স্থাপন করায় সেণ্ট লরেন্স নদী পথে আটলাণ্টিক উপকূল হইতে পণ্যদ্রব্যবাহী জাহাজ দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে, ফলে পণ্যদ্রব্য চলাচলের যেমন সুবিধা হইয়াছে তেমনি ঐ সুবিধাকে কেন্দ্র করিয়া ঐ সকল হ্রদের

তীরে সুপিরিয়র, চিকাগো, ডুলুথ প্রভৃতি উন্নত বন্দর ও সমৃদ্ধ শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষ্ণসাগরের সহিত ভূমধ্য সাগরের যোগ থাকায় ঐ একটিমাত্র পথেই মধ্য-প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলির সহিত ঐ দেশের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে। পানামা ও সুয়েজখাল খননেও ঐ অঞ্চলের হ্রদগুলির যোগাযোগ বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

[প্রশ্ন : (১) কি প্রকার নদ-নদীকে আদর্শ নদ-নদী বলা যাইতে পারে? একটি আদর্শ নদ-নদীর নাম উল্লেখ কর। (২) কি প্রকার নদ-নদী পরিবহণের পক্ষে (উপযুক্ত বা) আদর্শ স্থানীয়? (৩) মানুষ নদীকে কি কি কাজে ব্যবহার করিয়া থাকে? (৪) মানুষের জীবনে নদ-নদীর উপকারিতা এবং অপকারিতা কি কি? (৫) কোন্ নদীকে 'চীনের দুঃখ' বলা হয় এবং কেন? (৬) মিশরকে 'নীল নদের দান' বলা হয় কেন? (৭) নদী ইহার গতিপথ পরিবর্তন করিলে কি প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয়? (৮) মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে নদ-নদীর প্রভাব উদাহরণ-সহ সংক্ষেপে আলোচনা কর। (৯) ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে গঙ্গা নদ-নদীর প্রভাব বর্ণনা কর।]

(ছ) প্রাকৃতিক সম্পদ
(Natural Resources)

প্রকৃতির অফুরন্ত দানে মানুষের জীবন সমৃদ্ধ। মানুষ এই দানকে অঞ্জলি ভরিয়া গ্রহণ করে, নিজের প্রয়োজনমত নানা রূপ দেয়, ব্যবহার করে তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনে, ফলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত প্রাকৃতিক সম্পদগুলির মধ্যে (ক) মৃত্তিকা, (খ) খনিজ সম্পদ, (গ) বনজ সম্পদ, (ঘ) প্রাণিজ সম্পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) মৃত্তিকা (Soil) : ভূ-ত্বকের বহিরাবরণকে সাধারণভাবে মৃত্তিকা বলা হয়। কৃষিকার্যের সংগঠন একান্তভাবে মৃত্তিকার উপর নির্ভরশীল। মৃত্তিকার গুণাগুণ প্রধানত ইহার উর্বরাশক্তির তারতম্য দ্বারা বিচার করা হয়। উর্বর মৃত্তিকা কৃষি-উন্নতির সহায়ক। এই কারণে উর্বর মৃত্তিকা-প্রধান অঞ্চলে কৃষিকে আশ্রয় করিয়া ব্যাপকভাবে জনবসতি গড়িয়া উঠে। ভারত, চীন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের নদী-অববাহিকা অঞ্চলে ঘন বসতি দেখা যায়। আবার ঐ সকল অঞ্চলের কৃষিপণ্যকে কেন্দ্র করিয়া নানা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মৃত্তিকার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ধাতব, রাসায়নিক ও জৈব পদার্থের উপর উহার গুণাগুণ নির্ভর করে। একই প্রকার মৃত্তিকায় যদিও কয়েকটি ফসল ফলানো সম্ভব হয়, তথাপি বিশেষ বিশেষ ফসলের উপযোগী মৃত্তিকার প্রকারভেদ আছে। তূলা চাষের মৃত্তিকার সহিত চা, পাট, রবার চাষের মৃত্তিকার গুণগত পার্থক্য আছে। জল, বায়ু, বৃষ্টি, তুষার প্রভৃতির প্রভাবে মৃত্তিকার গুণাবলী পরিবর্তিত হয়। পলিগঠিত মৃত্তিকা ধান বা পাট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আবার ধাতব সম্পদে সমৃদ্ধ লাভা মৃত্তিকা তূলাচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বনভূমি অঞ্চলে 'পডসল' জাতীয় এক প্রকার অম্লধর্মী মৃত্তিকা

দেখা যায়। ইহা অনুর্বর ও কৃষির পক্ষে অনুপযোগী। কিন্তু মধ্যদেশীয় তৃণাঞ্চলে বিশেষ করিয়া উত্তর আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলে 'সারনোজেম' নামক যে মৃত্তিকা দেখা যায় উহা খুবই উর্বর ও নানাবিধ খাদ্যশস্য, যেমন—গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মৃত্তিকার অন্তর্নিহিত বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থের সংমিশ্রণের তারতম্য অনুযায়ী মৃত্তিকাকে পডসল, পেডালফার, লোয়েস, সারনোজেম, কৃষ্ণ-মৃত্তিকা, পলি, দো-আঁশ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে ও উপবিভাগে ভাগ করা যায়। কৃষিকার্য ছাড়া মৃত্তিকার সাহায্যে বিভিন্ন দেশে ঘরের দেয়াল, বাসন, পোড়ামাটির খেলনা, ইট, টালি, কুপের চাক, দেব-দেবীর মূর্তি, পুতুল ইত্যাদিও তৈরী করা হয়। প্রত্যেক প্রকার মৃত্তিকাই মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানুষ ইহার প্রভাবকে অস্বীকার করিতে পারে না। সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশে মৃত্তিকার দান অতুলনীয়।

(২) খনিজ দ্রব্য (Minerals): আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার মূলে রহিয়াছে কয়লা, লোহা, অভ্র, খনিজ তৈল প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ অবদান। দেশে দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত নানাপ্রকার খনিজ সম্পদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, একটি হইতে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বরং খনিজ সম্পদের অবস্থান, পরিমাণ ও তাহার প্রয়োগরীতি ইত্যাদি বিষয়ের উপরই যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। যন্ত্রশক্তির প্রধান উৎসই খনিজ সম্পদ, কয়লা ও খনিজ তৈল। ইহার অভাবে শিল্প-সংস্থান প্রায় অবাস্তব কল্পনা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানী প্রভৃতি দেশের বিস্ময়কর অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে কয়লা, লোহা, খনিজ তৈল প্রভৃতি খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য। বর্তমানকালে কৃষিও অনেকাংশে খনিজ সম্পদের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল; যেমন, রাসায়নিক সার ব্যতীত উন্নত কৃষির কথা ভাবা যায় না। কিন্তু রাসায়নিক সারের প্রধান কাঁচামাল কয়লা, খনিজতৈল ফসফেট ইত্যাদি খনি হইতে পাওয়া যায়। কয়লা, খনিজ তৈল, স্বর্ণ, লৌহ আকরিক প্রভৃতি খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন বিরাট বিরাট শহর-বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি বহু জনবিরল মরুপ্রায় অঞ্চলেও শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জার্মানীর রুঢ় অঞ্চল, সোভিয়েত ইউনিয়নের ডোনেৎস্ অঞ্চল বা ভারতের দুর্গাপুর, রাউরকেল্লা, ভিলাই প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি প্রধানত কয়লা ও লৌহ আকরিকের সুলভ সমন্বয়ে গঠিত ইস্পাত শিল্পকে কেন্দ্র করিয়াই। খনিজ সম্পদের আবিষ্কারের ফলে ঐ সকল অঞ্চলে যেমন যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তেমনি জনবসতিরও প্রসার ঘটে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুপ্রায় কালগুর্লি ও কুলগার্ডি অঞ্চলে স্বর্ণ উত্তোলনকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট শিল্পশহরের পত্তন ঘটে। মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি-আরব, কুয়েট, ইরাক, প্রভৃতি দেশের মরুপ্রায় অঞ্চলগুলিতেই খনিজ তৈলের বিপুল সম্ভার লুক্কায়িত আছে বলিয়া মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী এই সকল অঞ্চলেও ঘনবসতিপূর্ণ শহরাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। খনিজ সম্পদের জাদুস্পর্শে যে কোন অনুন্নত, অবহেলিত অঞ্চলের অতি দ্রুত শিল্পোন্নত শহরে পরিণত হওয়া বর্তমান পৃথিবীতে কোন বিস্ময়কর ঘটনা নহে।

(৩) **স্বাভাবিক উদ্ভিদ (Natural Vegetation):** মানুষের নিকটতম প্রতিবেশী উদ্ভিদ। ইহার সহিত মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যধারার উপর ইহার প্রভাব সুগভীর। ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্ভিদশ্রেণীকে অরণ্যানী বলা হয়। জলবায়ুর তারতম্যের উপর অরণ্যের আকৃতি ও তরুশ্রেণীর প্রকৃতি নির্ভর করে। উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতে শক্ত কাষ্ঠের চিরহরিৎ অরণ্য দেখা যায়। হিমোষ্ণ অঞ্চলে সরু পত্রবিশিষ্ট দীর্ঘ নরম কাষ্ঠের সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যের সমারোহ দেখা যায়। বৃষ্টিবিরল স্থানে তৃণভূমি ও পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যই স্বাভাবিক উদ্ভিদ। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট। মানুষ অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে এবং গৃহ, নৌকা, জাহাজ, রেলের কামরা, আসবাবপত্র প্রভৃতি নির্মাণ করে। খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম, মোটরগাড়ি প্রভৃতি নির্মাণে কাষ্ঠের চাহিদা পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে। আবার বর্তমানকালে নরম কাষ্ঠ হইতে কাগজমণ্ড, রেয়ন প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়। অর্থাৎ উদ্ভিদ শিল্পের একটি বিশিষ্ট কাঁচামালও বটে। ইহা ছাড়া, অরণ্য হইতে মানুষ নানাপ্রকার ফুল, ফল, মধু, মোম, লাক্ষা, রবার, রেশম-গুটি, তার্পিণ তেল, কর্পূর ইত্যাদি সংগ্রহ করে। অরণ্যাঞ্চলে নানাজাতীয় পশু শিকার করিয়া অরণ্যচারী মানুষ ক্ষুন্নিবারণ করে ও তাহাদের চামড়া, লোম, দাঁত, শিং প্রভৃতি সংগ্রহ করে, কারণ দেশে-বিদেশে ইহার বাণিজ্যিক চাহিদা যথেষ্ট রহিয়াছে।

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে উদ্ভিদের পরোক্ষ প্রভাবও কম নহে। উদ্ভিদ জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে, আবহাওয়ার আর্দ্রতা বৃদ্ধি করিয়া বৃষ্টিপাত ঘটায়। উদ্ভিদ যেমন ভূমিক্ষয় নিবারণ করে তেমনি প্রবল ঝড় বা বায়ু প্রবাহকে প্রতিহত করিয়া দেশকে প্রভূত ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করে। উদ্ভিদ বাতাসে অক্সিজেনের সমতা রক্ষা করে। মরুভূমির প্রসার রোধে একমাত্র বনভূমিই সমর্থ। উদ্ভিদই একদিন মাটিতে প্রোথিত হইয়া মানুষের অতি প্রয়োজনীয় কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মানুষের জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশগত সাম্য (Ecological Balance) বিধানে উদ্ভিদের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। [পরিবেশের সহিত জীবের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন জীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনাকে 'পরিবেশ বিজ্ঞান' বা 'বাস্তুসংস্থান' বলে। ইংরেজীতে ইহাকে বলে Ecology.] উদ্ভিদের সবুজ সমারোহ মানুষের চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। শীতল ছায়ার আবেশ তাহার মনেপ্রাণে নতুন কর্মোদ্যম সৃষ্টি করে। উদ্ভিদের প্রাচুর্য ও বিরলতা উভয়ই মানুষের সহজ জীবনযাত্রা নির্বাহের পথে অন্তরায়। আমাজন, কঙ্গো অঞ্চলের নিবিড় বন—মনুষ্যবাসের অযোগ্য। মরু বা মরুপ্রায় অঞ্চলের উদ্ভিদের বিরলতাও মনুষ্যবাসের অনুপযোগী। উদ্ভিদ মানুষের নিত্যসঙ্গী।

(৪) **জীবজন্তু (Biotic Resources):** প্রাণিজগৎ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। প্রাণিজগতের সহিত মানুষের সম্পর্ক নানা দিক হইতে খুবই ঘনিষ্ঠ। জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে পৃথিবীর

দেখা যায়। ইহা অনুর্বর ও কৃষির পক্ষে অনুপযোগী। কিন্তু মধ্যদেশীয় তৃণাঞ্চলে বিশেষ করিয়া উত্তর আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলে 'সারনোজেম' নামক যে মৃত্তিকা দেখা যায় উহা খুবই উর্বর ও নানাবিধ খাদ্যশস্য, যেমন—গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মৃত্তিকার অন্তর্নিহিত বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থের সংমিশ্রণের তারতম্য অনুযায়ী মৃত্তিকাকে পডসল, পেডালফার, লোয়েস, সারনোজেম, কৃষ্ণ-মৃত্তিকা, পলি, দো-আঁশ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে ও উপবিভাগে ভাগ করা যায়। কৃষিকার্য ছাড়া মৃত্তিকার সাহায্যে বিভিন্ন দেশে ঘরের দেয়াল, বাসন, পোড়ামাটির খেলনা, ইট, টালি, কুপের চাক, দেব-দেবীর মূর্তি, পুতুল ইত্যাদিও তৈরী করা হয়। প্রত্যেক প্রকার মৃত্তিকাই মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানুষ ইহার প্রভাবকে অস্বীকার করিতে পারে না। সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশে মৃত্তিকার দান অতুলনীয়।

(২) খনিজ দ্রব্য (Minerals): আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার মূলে রহিয়াছে কয়লা, লোহা, অভ্র, খনিজ তৈল প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ অবদান। দেশে দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত নানাপ্রকার খনিজ সম্পদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, একটি হইতে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বরং খনিজ সম্পদের অবস্থান, পরিমাণ ও তাহার প্রয়োগরীতি ইত্যাদি বিষয়ের উপরই যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে। যন্ত্রশক্তির প্রধান উৎসই খনিজ সম্পদ, কয়লা ও খনিজ তৈল। ইহার অভাবে শিল্প-সংস্থান প্রায় অবাস্তব কল্পনা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানী প্রভৃতি দেশের বিস্ময়কর অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে কয়লা, লোহা, খনিজ তৈল প্রভৃতি খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য। বর্তমানকালে কৃষিও অনেকাংশে খনিজ সম্পদের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল; যেমন, রাসায়নিক সার ব্যতীত উন্নত কৃষির কথা ভাবা যায় না। কিন্তু রাসায়নিক সারের প্রধান কাঁচামাল কয়লা, খনিজতৈল ফসফেট ইত্যাদি খনি হইতে পাওয়া যায়। কয়লা, খনিজ তৈল, স্বর্ণ, লৌহ আকরিক প্রভৃতি খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন বিরাট বিরাট শহর-বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি বহু জনবিরল মরুপ্রায় অঞ্চলেও শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জার্মানীর রুঢ় অঞ্চল, সোভিয়েত ইউনিয়নের ডোনেৎস্ অঞ্চল বা ভারতের দুর্গাপুর, রাউরকেল্লা, ভিলাই প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি প্রধানত কয়লা ও লৌহ আকরিকের সুলভ সমন্বয়ে গঠিত ইস্পাত শিল্পকে কেন্দ্র করিয়াই। খনিজ সম্পদের আবিষ্কারের ফলে ঐ সকল অঞ্চলে যেমন যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তেমনি জনবসতিরও প্রসার ঘটে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুপ্রায় কালগুর্লি ও কুলগার্ডি অঞ্চলে স্বর্ণ উত্তোলনকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট শিল্পশহরের পত্তন ঘটে। মধ্যপ্রাচ্যের সৌদি-আরব, কুয়েট, ইরাক, প্রভৃতি দেশের মরুপ্রায় অঞ্চলগুলিতেই খনিজ তৈলের বিপুল সম্ভার লুক্কায়িত আছে বলিয়া মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী এই সকল অঞ্চলেও ঘনবসতিপূর্ণ শহরাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। খনিজ সম্পদের জাদুস্পর্শে যে কোন অনুন্নত, অবহেলিত অঞ্চলের অতি দ্রুত শিল্পোন্নত শহরে পরিণত হওয়া বর্তমান পৃথিবীতে কোন বিস্ময়কর ঘটনা নহে।

(৩) **স্বাভাবিক উদ্ভিদ (Natural Vegetation)**: মানুষের নিকটতম প্রতিবেশী উদ্ভিদ। ইহার সহিত মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যধারার উপর ইহার প্রভাব সুগভীর। ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্ভিদশ্রেণীকে অরণ্যানী বলা হয়। জলবায়ুর তারতম্যের উপর অরণ্যের আকৃতি ও তরুশ্রেণীর প্রকৃতি নির্ভর করে। উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতে শক্ত কাষ্ঠের চিরহরিৎ অরণ্য দেখা যায়। হিমোষ্ণ অঞ্চলে সরু পত্রবিশিষ্ট দীর্ঘ নরম কাষ্ঠের সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যের সমারোহ দেখা যায়। বৃষ্টিবিরল স্থানে তৃণভূমি ও পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যই স্বাভাবিক উদ্ভিদ। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট। মানুষ অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে এবং গৃহ, নৌকা, জাহাজ, রেলের কামরা, আসবাবপত্র প্রভৃতি নির্মাণ করে। খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম, মোটরগাড়ি প্রভৃতি নির্মাণে কাষ্ঠের চাহিদা পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে। আবার বর্তমানকালে নরম কাষ্ঠ হইতে কাগজমণ্ড, রেয়ন প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়। অর্থাৎ উদ্ভিদ শিল্পের একটি বিশিষ্ট কাঁচামালও বটে। ইহা ছাড়া, অরণ্য হইতে মানুষ নানাপ্রকার ফুল, ফল, মধু, মোম, লাক্ষা, রবার, রেশম-গুটি, তার্পিণ তেল, কর্পূর ইত্যাদি সংগ্রহ করে। অরণ্যাঞ্চলে নানাজাতীয় পশু শিকার করিয়া অরণ্যচারী মানুষ ক্ষুন্নিবারণ করে ও তাহাদের চামড়া, লোম, দাঁত, শিং প্রভৃতি সংগ্রহ করে, কারণ দেশে-বিদেশে ইহার বাণিজ্যিক চাহিদা যথেষ্ট রহিয়াছে।

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে উদ্ভিদের পরোক্ষ প্রভাবও কম নহে। উদ্ভিদ জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে, আবহাওয়ার আর্দ্রতা বৃদ্ধি করিয়া বৃষ্টিপাত ঘটায়। উদ্ভিদ যেমন ভূমিক্ষয় নিবারণ করে তেমনি প্রবল ঝড় বা বায়ু প্রবাহকে প্রতিহত করিয়া দেশকে প্রভূত ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করে। উদ্ভিদ বাতাসে অক্সিজেনের সমতা রক্ষা করে। মরুভূমির প্রসার রোধে একমাত্র বনভূমিই সমর্থ। উদ্ভিদই একদিন মাটিতে প্রোথিত হইয়া মানুষের অতি প্রয়োজনীয় কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মানুষের জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশগত সাম্য (Ecological Balance) বিধানে উদ্ভিদের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। [পরিবেশের সহিত জীবের সম্পর্ক এবং বিভিন্ন জীবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনাকে 'পরিবেশ বিজ্ঞান' বা 'বাস্তুসংস্থান' বলে। ইংরেজীতে ইহাকে বলে Ecology.] উদ্ভিদের সবুজ সমারোহ মানুষের চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। শীতল ছায়ার আবেশ তাহার মনেপ্রাণে নতুন কর্মোদ্যম সৃষ্টি করে। উদ্ভিদের প্রাচুর্য ও বিরলতা উভয়ই মানুষের সহজ জীবনযাত্রা নির্বাহের পথে অন্তরায়। আমাজন, কঙ্গো অঞ্চলের নিবিড় বন—মনুষ্যবাসের অযোগ্য। মরু বা মরুপ্রায় অঞ্চলের উদ্ভিদের বিরলতাও মনুষ্যবাসের অনুপযোগী। উদ্ভিদ মানুষের নিত্যসঙ্গী।

(৪) **জীবজন্তু (Biotic Resources)**: প্রাণিজগৎ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। প্রাণিজগতের সহিত মানুষের সম্পর্ক নানা দিক হইতে খুবই ঘনিষ্ঠ। জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে পৃথিবীর

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির সমাবেশ দেখা যায়। মানুষ ঐ সকল প্রাণীকে নানাভাবে তাহার জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে ব্যবহার করে। মানুষ প্রায় সর্বত্রই গরু, ভেড়া, মহিষ, ছাগল প্রভৃতির মাংস ও দুগ্ধ খাদ্য ও পানীয় হিসাবে ব্যবহার করে। পরিবহণের মাধ্যম হিসাবে গাধা, অশ্ব, উট প্রভৃতির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মরু অঞ্চলে উট এবং অশ্ব পরিবহণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। মানুষ পশুর লোম, দুগ্ধ, চামড়া, হাড় ইত্যাদিকে কাজে লাগাইয়া নানা শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছে। মাংসশিল্প, পশমশিল্প, দুগ্ধশিল্প, চর্মশিল্প ইত্যাদি মানব-জীবনের সহিত সম্পর্কিত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। ভারতীয় কৃষিতে পশু-শক্তির ব্যবহার এখনও সর্বাধিক। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার অর্থনীতিতে পশু-নির্ভর মাংস দুগ্ধ ও পশম শিল্পের গুরুত্ব কোন অংশেই ন্যূন নহে। আধুনিক কৃষিকার্যে কীটপতঙ্গের হাত হইতে ফসল রক্ষা করিবার জন্য ব্যাপক কীটনাশকের ব্যবহার বহুল পরিমাণে কমাইবার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইতেছে। কীটনাশকের প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। সুতরাং ফসল নষ্টকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংসের জন্য উহাদের খাদক পতঙ্গের চাষ করা হইলে কীটনাশকের প্রতিক্রিয়া হইতে মানুষ রক্ষা পাইতে পারে। অর্থাৎ এমন পতঙ্গের লালন-পালন করা হইবে যাহা ফসলের পরিবর্তে ফসল নষ্টকারী পতঙ্গ খাইয়া জীবন ধারণ করে। আশা করা যায়, প্রকৃতির রাজ্যের এই স্বাভাবিক নিয়মের সুষ্ঠু প্রয়োগ মানব-জীবনের অশেষ উপকার সাধন করিবে। সুতরাং মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে জীবজন্তুর ভূমিকা নগণ্য নহে।

[**প্রশ্ন :** (১) কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বলিতে কি বুঝায়? (২) মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রাকৃতিক সম্পদের প্রভাব উদাহরণ-সহ বর্ণনা কর। (৩) মরুভূমির এমন দুইটি স্থানের নাম উল্লেখ কর যেখানে শুধু খনিজ সম্পদের অস্তিত্ব হেতু বড় বড় জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে। (৪) কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিরূপে নিম্নলিখিত উপকরণগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়? (ক) স্বাভাবিক উদ্ভিদ, (খ) মৃত্তিকা, (গ) খনিজ সম্পদ।]

সাংস্কৃতিক বা অপ্রাকৃতিক পরিবেশ
(Cultural Environment)

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। ইহার প্রভাব অনেকাংশে প্রত্যক্ষ। কিন্তু মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের জটিলতা হইতে, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকাশ ও প্রসার হইতে এবং তাহার জীবনযাপন প্রণালীর অভ্যস্ত ধারা হইতে কতকগুলি বিমূর্ত উপাদানের সৃষ্টি হইয়াছে, যেমন—জাতি, ধর্ম, শিক্ষা, রাষ্ট্র ইত্যাদি। ইহাদের প্রভাবও তাহার অর্থনৈতিক জীবনে কোন অংশে কম নহে। বরং তাহার অগ্রগতির ইতিহাসে এই সকল উপাদানের প্রভাব অনেক বেশী সুদূরপ্রসারী। এই উপাদানগুলি মানুষের গোষ্ঠীচেতনা ও উন্নততর জীবনবোধের চেতনা হইতে উদ্ভূত। ইহাদের সম্মিলিত

প্রভাবেই মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্ম ও বিকাশ। মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—(ক) জনসংখ্যা এবং (খ) সামাজিক সংগঠন। সামাজিক সংগঠনে জাতি, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত।

(ক) জনসংখ্যা (Population)

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে জনসংখ্যাই সর্বাপেক্ষা গতিশীল উপাদান। যে-কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও জনবসতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে। কিন্তু উহাদের আহরণ ও ব্যবহার নির্ভর করে মানুষের উপর। সুতরাং মানুষই এই পৃথিবীর যোগ্য সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদের সহিত জনসংখ্যার অনুপাত বিশ্লেষণ করিয়া কোন দেশকে জনবহুল বা কোন দেশকে জনবিরল বলা হয়।

জনবহুল দেশে জমির তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্যহেতু শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়া থাকে। ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশ,—ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম এবং এশিয়ার জাপান প্রভৃতি দেশের শিল্পোন্নতির মূলে জনসংখ্যার চাপ। ভারতের শিল্প-প্রচেষ্টার মূলেও রহিয়াছে তাহার জনবাহুল্য। জনবিরল দেশগুলিতে প্রচুর আবাদযোগ্য জমি সহজলভ্য হওয়ায় কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি প্রাথমিক কার্যধারা ও উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু শিল্পের প্রসার ঘটে। ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে জমির স্বল্পতাহেতু খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, বনজ সম্পদ ইত্যাদি বিভিন্নপ্রকার সুলভ সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া শিল্পের বিকাশ ঘটে। এই শিল্প, কৃষি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়াই আবার জনসংখ্যার ঘনত্বও বৃদ্ধি পায়। ইহার উদাহরণ চীন, ভারত, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল, ইউরোপীয় রাশিয়া। জনসংখ্যা ও জনবসতির বৃদ্ধি অর্থনৈতিক দিক হইতে অবিচ্ছেদ্য। অতি জনসংখ্যার চাপ অর্থনৈতিক দিক হইতে অনগ্রসরতার কারণ। জনবিরলতাও আবার অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতিবন্ধক। ইউরোপে ফ্রান্স বা জার্মানী এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে জন্মহার যথেষ্ট কম হওয়ায় ঐ সকল দেশ জনবিরলতার অসুবিধা ভোগ করিতেছে। এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে প্রতি বৎসর বহু লোক এই সকল দেশে কর্মের সংস্থানে যায়। অস্ট্রেলিয়া কৃষি ও শিল্পের দিক হইতে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও তাহার শ্বেত-অস্ট্রেলিয় নীতির জন্য (White Australian Policy) জনবিরলতার চাপে অর্থনৈতিক দিক হইতে আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না। চীনে জনসংখ্যার চাপ যথেষ্ট, তথাপি সুশৃঙ্খল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে উহার আর্থিক উন্নতি ত্বরান্বিত হইতেছে। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এই বিষয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

(খ) সামাজিক সংগঠন (Social Organs)

(i) জাতি বা প্রবংশ (Race): মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত জাতিগত বৈশিষ্ট্যের যোগাযোগ আছে বলিয়া অনেক ভূগোলবিদ্ দাবি করেন। কিন্তু বিষয়টি যুক্তিতর্ক-সাপেক্ষ। পৃথিবীতে প্রধানত তিন প্রকার জাতি দেখা যায়—

(ক) শ্বেতকায় বা ককেশীয়—উত্তর ইউরোপ, রাশিয়া, পশ্চিম এশিয়া, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দীর্ঘ শ্বেতকায় অধিবাসী।

(খ) পীতকায় বা মঙ্গোলীয়—ব্রহ্মদেশ, চীন, ইন্দোচীন, জাপান প্রভৃতি দেশে খর্বকায় হরিদ্রাভ অধিবাসী।

(গ) কৃষ্ণকায় বা নিগ্রোজাতীয়—মধ্য আফ্রিকা, আমাজন অববাহিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অঞ্চলবিশেষে কালো জাতি বা শক্তগড়ন অধিবাসী।

অর্থনৈতিক দিক হইতে শ্বেতকায় জাতি বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। পীতকায় জাতিও উন্নতির পথে অগ্রসরমান। কিন্তু কৃষ্ণকায় জাতি আজিও অর্ধোন্নত বা অনুন্নত। শ্বেতকায় ও পীতকায় জাতির উন্নতির মূলে তাহাদের বুদ্ধি, উদ্যম, নিরলস কর্মসাধনা যে অনেকাংশে সাহায্য করিয়াছে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু কৃষ্ণকায় জাতির অনগ্রসরতা তাহাদের আলস্য, উদ্যমহীনতা, ভাগ্যবিশ্বাস ইত্যাদির ফলেই ঘটিয়াছে, এমন যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ বহুক্ষেত্রে কৃষ্ণকায় জাতি শ্বেতকায় জাতির তুলনায় অনেকাংশে কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। খেলাধূলার আসরে ও শিল্প-বাণিজ্যে আমেরিকার প্রাধান্যে তথাকার নিগ্রো অধিবাসিগণের ভূমিকা যে-কোন শ্বেতকায়ের তুলনায় অনেক বেশী ক্রিয়াশীল। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা তাহাদের উন্নতির বড় প্রতিবন্ধক। ইহা ছাড়া, দীর্ঘদিন যাবৎ ইউরোপীয় শ্বেতকায় জাতিগুলি কৃষ্ণকায় জাতিকে পরাধীন রাখিয়া নির্বিচারে শোষণ করিয়াছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে তাহাদের পশ্চাৎপদ রাখিয়া উন্নত সভ্যতার আদর্শ প্রচার করিয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণকায় জাতির উদ্যম, কর্মপ্রেরণা সকলই উন্মেষের সুযোগের অভাবে তিলে তিলে বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে বহু কৃষ্ণকায় জাতি স্বাধীন হইয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা বিশেষ উন্নতি করিতেও সমর্থ হইয়াছে। অবশ্য শ্বেতকায় জাতির প্রত্যক্ষ শোষণের অবসান হইলেও অর্থনৈতিক শোষণ অনেক ক্ষেত্রেই অব্যাহত। কৃষ্ণকায় জাতির অনগ্রসরতা এবং শ্বেতকায় জাতির উন্নতি জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ফল, কোন নৃ-তাত্ত্বিক সমীক্ষাও বর্তমানে এই মত স্বীকার করে না। বরং জাতিগত বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই একটি ব্যবহারিক দিক। সর্বশেষে বলা যায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রত্যেক জাতিরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্য কোন জাতিকে কৃষিতে, কোন জাতিকে শিল্প-বাণিজ্যে, বা কোন জাতিকে মৎস্য আহরণে অতিরিক্ত পটুতা দান করিয়াছে। পরিবেশের আনুকূল্যে প্রত্যেক জাতিরই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমান দক্ষতা রহিয়াছে। জাতিসংঘ হইতেও জাতিগত বৈষম্যকে অস্বীকার করিয়া ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে।

(ii) ধর্ম (Religion): অর্থনৈতিক জীবনে ধর্মকে উপেক্ষা করা যায় না। যুগ যুগ ধরিয়া ধর্ম মানুষের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। ধর্মের অনুশাসনের ফলে মানুষ আজও কোন কোন কার্য হইতে বিরত থাকে। আবার কোন কার্যকে পরম শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়া থাকে। সুতরাং

মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ধর্মের অনুশাসনের বহির্ভূত নহে। পৃথিবীতে চারিটি ধর্মমত প্রাচীনতা ও ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বিচারে প্রধান, যেমন—হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান। হিন্দুসমাজে পূর্বে যে বৃত্তিগত জাতিভেদ প্রথা ছিল উহা তৎকালীন সমাজে সকল প্রকার কার্যের বণ্টন সুষ্ঠু করিয়া সমাজ-জীবনকে সহজ-সুন্দর করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় উহার কোন মূল্যই নাই। কারণ অর্থনৈতিক দিক হইতে খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান সমাজে ধর্মীয় সাম্য তাহাদের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করিয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ অহিংস হওয়ায় তাহাদের সমাজে জীবহত্যা পাপ। এই কারণে উহাদের মধ্যে মৎস্য ও পশু-মাংসের চাহিদা কম। ফলে বৌদ্ধ ও জৈন অধ্যুষিত অঞ্চলে, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে দীর্ঘকাল ঐ সকল শিল্পের প্রসার ঘটে নাই। মুসলমান ধর্মের অনুশাসনে মদ্যপান, অর্থের উপর সুদগ্রহণ নিষিদ্ধ। এই কারণে মদ্যশিল্পে ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের অংশগ্রহণ দীর্ঘকাল নগণ্য ছিল। মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে শূকর প্রতিপালনও ধর্মের অনুশাসনে নিষিদ্ধ। মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশেই শূকর-ব্যবসায় প্রসারলাভ করে নাই। ধর্মীয় অনুশাসনের বিষয়ে খ্রীষ্টানগণ অনেক বেশি উদার ও প্রগতিশীল। ফলে বর্তমান পৃথিবীর অর্থনৈতিক প্রগতির ইতিহাসে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য লক্ষণীয়। খ্রীষ্টান সমাজের উন্নতির আদর্শ সাম্প্রতিককালে অনুন্নত দেশগুলিতে ধর্মের অনুশাসনের অনেক রদবদলে প্রেরণা যোগাইতেছে।

(iii) সমাজ (Society): মানুষ সমাজবদ্ধ জীব (Man is a social being)। সুতরাং সমাজের বিভিন্ন রীতি-নীতি, প্রথা, সংগঠন প্রভৃতি মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ভারতীয় জনসমাজে ব্যাপক প্রচলিত একান্নবর্তী পরিবার প্রথা অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দিক হইতে আদর্শস্থানীয় ছিল। কিন্তু অলসতা ও উদ্যমহীনতাকে প্রশ্রয় দেয় বলিয়া বর্তমানে ইহা প্রায় অবলুপ্ত।

ভারতের উত্তরাধিকার-আইন ভূসম্পত্তির অতিরিক্ত বিভাজনের অন্যতম কারণ। কৃষকের মৃত্যুতে তাহার বংশধরগণের মধ্যে কৃষিজমির খণ্ডীভবনের জন্য ইহা দায়ী। ইহা অর্থনৈতিক দিক হইতে খুবই ক্ষতিকারক সন্দেহ নাই। মুসলমান সমাজে বিবাহ আইন সম্পত্তির খণ্ডীভবনের পরিপন্থি হওয়ায় অর্থনৈতিক দিক হইতে বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয়।

(iv) রাষ্ট্রব্যবস্থা বা সরকার (Government): মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে রাষ্ট্রতন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় সংগঠনই সম্ভবত মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমাজ-বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, মানব-সমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং তাহার বিকাশ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া উন্নততর সোপানে পৌঁছাইয়া দিবার সংগঠন হিসাবেই কাজ করিয়া চলিতেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা হইতে শুরু করিয়া

বর্তমান সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা পর্যন্ত সকল স্তরেই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতাবৃদ্ধি ও তাহার প্রসার লক্ষণীয়। পূর্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মতবাদের আমলে রাষ্ট্র দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণকারী কোন ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। দেশে শান্তিরক্ষা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়েই তাহার দায়িত্ব ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল পরোক্ষ ও নগণ্য। রাষ্ট্রের এই ভূমিকার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে রাষ্ট্রের ভূমিকা ক্রমশঃই অধিকতর নিয়ন্ত্রণমূলক পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রসারের ফলে রাষ্ট্র বর্তমানে শুধু আর শান্তিরক্ষাকারী সংগঠন নহে, রাষ্ট্র জনগণের আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক, দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রকৃত দিশারী।

দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক নীতির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা বর্তমানে রাষ্ট্রের এক্তিয়ারভুক্ত। বিপ্লবের পূর্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন কৃষিনির্ভর একটি দেশ ছিল। শিল্প-বাণিজ্যে তাহার ভূমিকা ইউরোপে তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু বিপ্লবের পরে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মাত্র চল্লিশ বৎসরের মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যে বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোন্নত দেশের স্থান দখল করিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণই সম্ভব হইয়াছে ঐ রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নমূলক ভূমিকার জন্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউ ডিল ইকনমিক পলিসি' দেশকে দুইটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী অর্থনৈতিক মন্দাজনিত অসুবিধা হইতে মুক্ত করিয়া আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

যে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা যত স্থিতিশীল সেই দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্ভাবনাও তত অধিক। রাষ্ট্রের ভূমিকা সর্বত্রই উন্নয়নমূলক না-ও হইতে পারে। প্রগতিশীল রাষ্ট্রব্যবস্থার অভাবে দেশে বৈষয়িক উন্নতির অন্তরায় সৃষ্টি হইতে পারে। মেক্সিকো, যুদ্ধপূর্ব চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ভূমিকা বৈষয়িক উন্নতির পরিপন্থী ছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কালে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে সন্দেহ নাই। দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল প্রকার কার্যই রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যায়, মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র বর্তমানে এক বিশেষ সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত 'বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী' রাষ্ট্রের উপরি-উক্ত ভূমিকার একটি মৌল নিদর্শন।

(v) শিক্ষা ও সংস্কৃতি (Education and Culture): মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সহিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি যেমন তাহার সভ্যতার অগ্রগতির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তেমনি সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতি মানুষের শিক্ষাধারার বিকাশ ও উন্নতির সহিত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। সিন্ধু, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, গ্রীক ও চৈনিক সভ্যতার

উন্নতি ঐ সকল অঞ্চলের শিক্ষার উন্নতির প্রত্যক্ষ ফল। শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব মানুষের চিন্তায় ও কর্মে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি—একটি অপরটির পরিপূরক। শিক্ষার প্রভাবে সংস্কৃতির উন্নতি ও রূপান্তর ঘটে। সংস্কৃতির প্রভাবে আবার শিক্ষারও উন্নতি ঘটে। ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ও আধুনিক শিল্প সভ্যতার বিকাশের মূলে রহিয়াছে ঐ দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি। শিক্ষা ও প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্য ব্যতীত প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও তাহার সুষ্ঠু ব্যবহার আদৌ সম্ভব নহে। ইউরোপের উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, বিজ্ঞান-অনুশীলন ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি উৎপাদন পদ্ধতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিয়াছে এবং আধুনিক শিল্পসভ্যতার ভিত্তি রচনা করিয়াছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বর্তমানে সুস্পষ্ট। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় যে নূতন জনপদ গড়িয়া উঠে ও নূতন সভ্যতার পত্তন হয় তাহার মূলেও রহিয়াছে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্পাশ্রয়ী প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব। এশিয়া ও আফ্রিকার সুপ্রাচীন সভ্যদেশগুলি ইউরোপের এই উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতার সহিত সমতা রক্ষা করিতে পারে নাই। ফলে ক্রমে ক্রমে এই সকল দেশ ইউরোপীয়গণের পদানত হয় এবং অর্থনীতি ক্ষেত্রে তাহাদের উপনিবেশে পরিণত হয়। প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে একমাত্র জাপান আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্ত করিতে এবং উহার সার্থক রূপায়ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার কারণ, একদিকে যেমন ঐ দেশে নিরক্ষতার অবসান ঘটিয়াছে অপরদিকে তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও উহার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত সাক্ষরতার প্রত্যক্ষ যোগ বর্তমান। ভারতের শতকরা ৬৮ ভাগ অধিবাসী আজও নিরক্ষর। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান বা বৃটিশ যুক্তরাজ্যে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটিয়াছে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ সার্বিক সাক্ষরতা। নিরক্ষরতাই সর্বপ্রকার উন্নতির প্রধান অন্তরায়। নিরক্ষতার জন্যই সুদক্ষ ও উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার ধারক শ্রমিকশ্রেণীর অভাব দেখা যায় ও দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সর্বোপরি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব অন্ধ কুসংস্কার দূর করে, মানুষের সুপ্ত গুণাবলীর সম্যক বিকাশে সাহায্য করে এবং পরিবেশানুসারী ও বাস্তবানুগ কর্মপ্রচেষ্টায় প্রেরণা যোগায়। সুতরাং কোন দেশের বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম।

[প্রশ্ন : (১) সাংস্কৃতিক পরিবেশ কাহাকে বলে? তিনটি সাংস্কৃতিক পরিবেশের উদাহরণ দাও। (২) কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার গতি ও প্রকৃতির প্রভাব উদাহরণ সহ বর্ণনা কর। (৩) দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সরকারের ভূমিকা আলোচনা কর। (৪) কোন্ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিম্নলিখিত সাংস্কৃতিক পরিবেশগুলির প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা কর :—(ক) ধর্ম, (খ) সমাজ এবং (গ) জাতি (Nation)। (৫) দেশের সম্পদ উন্নয়নে মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার গুরুত্ব সর্বাধিক,— কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।]

পরিবেশের সহিত মানুষের অভিযোজন
(Adaptation of Man to his Environment)

একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক নিয়মেই জীবনের প্রথম প্রকাশ ঘটিয়াছিল। তাহার পর যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সেই জীবনের ক্রমবিকাশ ও রূপান্তর ঘটিয়া বর্তমানের বহু বিচিত্র জীব ও জীবনধারার সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বের এই বহু বিচিত্র জীবগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিদীপ্ত ও গতিশীল জীবই মানুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ কঠোর সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া আছে। শুধু বাঁচিয়াই নাই, ভালভাবেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে ও উত্তরোত্তর তাহার জীবনযাত্রার মানও উন্নত করিয়া চলিয়াছে। মানুষের এই চরম সাফল্যের মূলে রহিয়াছে তাহার সহজাত অভিযোজন ক্ষমতা।

জীববিজ্ঞানের আলোচনায় প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাবকে আত্মস্থ করিয়া জীবজগতের সহজ ও স্বাভাবিক জীবনধারণের পদ্ধতিকেই বলা হয় অভিযোজন। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী জীবনের বিকাশ ও জীবের দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই কারণেই মানুষের জীবনযাপন প্রণালীও বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিবেশ যেমন মানুষের জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে তেমনি মানুষও তাহার বহুবিধ কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। মানুষ কৃত্রিম বাঁধের সাহায্যে নদ-নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, নদ-নদীর জলের সাহায্যে জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে পারে, এমনকি বন সৃজন দ্বারা মরুভূমির আগ্রাসনও রোধ করিতে পারে। দেশে দেশে নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা মানুষ নিয়ত তাহার পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাইতেছে। সুতরাং পরিবেশের প্রভাবে মানুষের জীবন ও জীবিকার পরিবর্তন যেমন ঘটিতেছে তেমনি মানুষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার ফলে পরিবেশেরও নিয়ত পরিবর্তন ঘটিতেছে। **নিয়ত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া (Adaptation) জীবন-সংগ্রামে জয়ী (Survival) হইবার মানুষের সকলপ্রকার প্রচেষ্টাকে অর্থনৈতিক ভূগোলে অভিযোজন বলা হয়।** অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাইতেছে এবং ঐ পরিবর্তিত পরিবেশ অনুযায়ী তাহার জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রও প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে। ইহাকেই মানুষের পারিবেশিক বা পরিবেশগত অভিযোজন বলা হয়।

মানুষের আর্থনীতিক কার্যকলাপের উপর পরিবেশের প্রভাব (Impact of Environment on Man's Economic Activities): অর্থনৈতিক ভূগোলে মানুষ ও তাহার পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবন ও জীবিকার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলপ্রকার কার্যধারা তাহার পরিবেশ দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। মানুষের

পরিবেশ দুই প্রকার—প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অপ্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশ। মানুষের জীবনধারণ ও জীবিকার প্রাথমিক সংস্থান মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশেরই দান। কিন্তু ইহাদের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নতি সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল। যেমন কৃষিকার্য, প্রাকৃতিক উপাদান, যথা—ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, উত্তাপ ও আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু ইহার উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাংস্কৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ উন্নত বীজ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ, মূলধন নিয়োগ, যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন, চাষীর কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতা ইত্যাদির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশকে সাংস্কৃতিক পরিবেশ হইতে আলাদা করিয়া বিচার করা চলে না। একটি অপরটির পরিপূরক। মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব যেমন অপরিসীম, তেমনি মানুষ নিজেও ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাও তাহার অসামান্য। এই আলোচনাকে দুইটি প্রধান ধারায় ভাগ করা যায়—(১) মানুষের উপর প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ ও (২) প্রকৃতির উপর মানবিক নিয়ন্ত্রণ বা পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাব।

(১) মানুষের উপর প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ: মানুষের জীবনযাপন প্রণালী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে। পরিবেশ ভেদে তাহার খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ এবং সর্বোপরি তাহার জীবিকার পার্থক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলির মধ্যে জলবায়ু মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। উষ্ণমণ্ডলের প্রখর সূর্যতাপের ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষ যেমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তেমনি বিকট দর্শন ও বামনাকৃতি। এই অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে গভীর বনভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। আবহাওয়া সর্বদা উষ্ণ ও স্যাঁতসেঁতে। এই অঞ্চলে কৃষিকাজ অথবা অন্যান্য উন্নত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। এই কারণে ফল-মূল আহরণ, পশুশিকার, পশুপালন ও জীবিকাসত্তা-ভিত্তিক সামান্য চাষ আবাদই মানুষের প্রধান উপজীবিকা। মরু অঞ্চলে আরব-বেদুইনগণ যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনপ্রকারে জীবিকার সংস্থান করে। আবার তুন্দ্রা অঞ্চলের অতিরিক্ত শীতল আবহাওয়ায় কানাডার এস্কিমো বা রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের স্যামোয়েদ ও ল্যাপগণ সীল, সিন্ধুঘোটক, মৎস্য ও পশু শিকার করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। মৌসুমী জলবায়ুর দেশ ভারত, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে জলবায়ুগত সুবিধার জন্যই অধিকাংশ লোক কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। আবার উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বাধিক প্রসার লক্ষ্য করা যায়।

মানুষের খাদ্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণতায় তূলার চাষ ঐ অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজনীয় হাল্কা পোশাক-পরিচ্ছদ ও উহা তৈয়ারীর শিল্পের কাঁচামালের অভাব মিটাইয়া থাকে।

পরিবেশের সহিত মানুষের অভিযোজন
(Adaptation of Man to his Environment)

একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক নিয়মেই জীবনের প্রথম প্রকাশ ঘটিয়াছিল। তাহার পর যুগ যুগ ধরিয়া বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সেই জীবনের ক্রমবিকাশ ও রূপান্তর ঘটিয়া বর্তমানের বহু বিচিত্র জীব ও জীবনধারার সৃষ্টি হইয়াছে। বিশ্বের এই বহু বিচিত্র জীবগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিদীপ্ত ও গতিশীল জীবই মানুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ কঠোর সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া আছে। শুধু বাঁচিয়াই নাই, ভালভাবেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে ও উত্তরোত্তর তাহার জীবনযাত্রার মানও উন্নত করিয়া চলিয়াছে। মানুষের এই চরম সাফল্যের মূলে রহিয়াছে তাহার সহজাত অভিযোজন ক্ষমতা।

জীববিজ্ঞানের আলোচনায় প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাবকে আত্মস্থ করিয়া জীবজগতের সহজ ও স্বাভাবিক জীবনধারণের পদ্ধতিকেই বলা হয় অভিযোজন। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী জীবনের বিকাশ ও জীবের দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই কারণেই মানুষের জীবনযাপন প্রণালীও বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পরিবেশ যেমন মানুষের জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে তেমনি মানুষও তাহার বহুবিধ কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। মানুষ কৃত্রিম বাঁধের সাহায্যে নদ-নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, নদ-নদীর জলের সাহায্যে জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে পারে, এমনকি বন সৃজন দ্বারা মরুভূমির আগ্রাসনও রোধ করিতে পারে। দেশে দেশে নানাবিধ অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা মানুষ নিয়ত তাহার পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাইতেছে। সুতরাং পরিবেশের প্রভাবে মানুষের জীবন ও জীবিকার পরিবর্তন যেমন ঘটিতেছে তেমনি মানুষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার ফলে পরিবেশেরও নিয়ত পরিবর্তন ঘটিতেছে। **নিয়ত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া (Adaptation) জীবন-সংগ্রামে জয়ী (Survival) হইবার মানুষের সকলপ্রকার প্রচেষ্টাকে অর্থনৈতিক ভূগোলে অভিযোজন বলা হয়।** অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাইতেছে এবং ঐ পরিবর্তিত পরিবেশ অনুযায়ী তাহার জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রও প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে। ইহাকেই মানুষের পারিবেশিক বা পরিবেশগত অভিযোজন বলা হয়।

মানুষের আর্থনীতিক কার্যকলাপের উপর পরিবেশের প্রভাব (Impact of Environment on Man's Economic Activities) : অর্থনৈতিক ভূগোলে মানুষ ও তাহার পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবন ও জীবিকার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলপ্রকার কার্যধারা তাহার পরিবেশ দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। মানুষের

পরিবেশ দুই প্রকার—প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অপ্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক পরিবেশ। মানুষের জীবনধারণ ও জীবিকার প্রাথমিক সংস্থান মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশেরই দান। কিন্তু ইহাদের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নতি সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল। যেমন কৃষিকার্য, প্রাকৃতিক উপাদান, যথা—ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, উত্তাপ ও আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু ইহার উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাংস্কৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ উন্নত বীজ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ, মূলধন নিয়োগ, যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন, চাষীর কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতা ইত্যাদির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশকে সাংস্কৃতিক পরিবেশ হইতে আলাদা করিয়া বিচার করা চলে না। একটি অপরটির পরিপূরক। মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব যেমন অপরিসীম, তেমনি মানুষ নিজেও ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাও তাহার অসামান্য। এই আলোচনাকে দুইটি প্রধান ধারায় ভাগ করা যায়—(১) মানুষের উপর প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ ও (২) প্রকৃতির উপর মানবিক নিয়ন্ত্রণ বা পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাব।

(১) মানুষের উপর প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ : মানুষের জীবনযাপন প্রণালী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে। পরিবেশ ভেদে তাহার খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ এবং সর্বোপরি তাহার জীবিকার পার্থক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলির মধ্যে জলবায়ু মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। উষ্ণমণ্ডলের প্রখর সূর্যতাপের ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষ যেমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তেমনি বিকট দর্শন ও বামনাকৃতি। এই অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে গভীর বনভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। আবহাওয়া সর্বদা উষ্ণ ও স্যাঁতসেঁতে। এই অঞ্চলে কৃষিকাজ অথবা অন্যান্য উন্নত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব। এই কারণে ফল-মূল আহরণ, পশুশিকার, পশুপালন ও জীবিকাসত্তা-ভিত্তিক সামান্য চাষ আবাদই মানুষের প্রধান উপজীবিকা। মরু অঞ্চলে আরব-বেদুইনগণ যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনপ্রকারে জীবিকার সংস্থান করে। আবার তুন্দ্রা অঞ্চলের অতিরিক্ত শীতল আবহাওয়ায় কানাডার এস্কিমো বা রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের স্যামোয়েদ ও ল্যাপগণ সীল, সিন্ধুঘোটক, মৎস্য ও পশু শিকার করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে। মৌসুমী জলবায়ুর দেশ ভারত, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে জলবায়ুগত সুবিধার জন্যই অধিকাংশ লোক কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। আবার উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বাধিক প্রসার লক্ষ্য করা যায়।

মানষের খাদ্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণতায় তুলার চাষ ঐ অঞ্চলের মানুষের প্রয়োজনীয় হাল্কা পোশাক-পরিচ্ছদ ও উহা তৈয়ারীর শিল্পের কাঁচামালের অভাব মিটাইয়া থাকে।

কিন্তু শীতোষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গরম পরিচ্ছদের চাহিদা মিটাইতে পশম-প্রদায়ী মেষ প্রতিপালন করা হয়। ফলে এই সকল অঞ্চলে পশমশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উষ্ণ অঞ্চলে, ধান ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গমের স্বাভাবিক চাষ ঐ সকল অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। সুতরাং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবন ও জীবিকা প্রাথমিকভাবে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই কারণেই এক সময় মানুষকে পরিবেশের দাস (Man is the slave of his environment) বলিয়া অভিহিত করা হইত।

(২) প্রকৃতির উপর মানবিক নিয়ন্ত্রণ বা পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাব: মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী। কোন কোন ভূগোলবিদ্ বলিয়াছেন, "পরিবেশই মানুষকে গড়িয়া তোলে" (Man is the product of his environment.)। কিন্তু বর্তমানকালে এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ পরিবেশের প্রভাব মানুষের উপর যত বেশী হউক না কেন, মানুষ নিজেও পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত একটি উপাদান—একটি সক্রিয় ও সৃজনশীল উপাদান। মানুষ নিজবুদ্ধি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাবলে পরিবেশকে নিজের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে সর্বদাই সচেষ্ট। ফলে, দেখা যায় যে, সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশও কালক্রমে মানুষের পক্ষে অনেকটা অনুকূল হইয়াছে। বিখ্যাত ভূগোলবিদ্ কার্ল সয়ারের মতে দাবানল দ্বারা কোন বনভূমি বারবার ভস্মীভূত হইলে কালক্রমে ঐ অঞ্চলে তৃণভূমির সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাভানা তৃণভূমি মনুষ্যসৃষ্ট দাবানলের ফলেই একদিন সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া বর্তমানে অনেক ভূগোলবিদ্ উল্লেখ করিয়া থাকেন। সাইবেরিয়া বা আলাস্কা অঞ্চল একদিন মনুষ্যপদচিহ্ন-বর্জিত স্থান ছিল। বর্তমানে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে মানুষ ঐ অঞ্চলের উন্নতির জন্য সচেষ্ট। তুন্দ্রা অঞ্চলে কাঁচের উষ্ণ ঘর নির্মাণ করিয়া মানুষ কৃষিকার্য পরিচালনার চেষ্টায় রত। বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষকে এই বিষয়ে সর্বাধিক সাহায্য করিতেছে। যে হোয়াংহো বা দামোদর নদ একদিন বন্যার তাণ্ডবে মাতিয়া মানুষের ঘরবাড়ি ভাসাইয়া লইয়া যাইত, গ্রাম-জনপদ ধ্বংস করিয়া সোনালী ফসলের ক্ষেত নিশ্চিহ্ন করিত, তাহাকেই মানুষ বাঁধ দিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করিয়াছে, জমিতে সবুজের সমারোহ আনিয়াছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া কলকারখানা স্থাপন করিয়া জীবনধারার আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। একদিন কার্পাস-বয়নশিল্প স্থাপনে জলবায়ুর আনুকূল্য অপরিহার্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে যে-কোন স্থানে কারখানার ভিতরেই প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় বলিয়া ঐ শিল্প যে-কোন স্থানেই স্থাপন সম্ভবপর হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের ম্যানচেস্টার বা জাপানের কোবে-ওসাকা অঞ্চলের পরিবর্তে বর্তমানে মিশরের উষ্ণ জলবায়ুতে বা মধ্য-এশিয়ার রুশীয় তুর্কিস্তানেও বয়নশিল্প স্থাপন করা সম্ভব হইতেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পৃথিবীর কোন স্থানই আর দুর্গম নহে। মালয়েশিয়ার স্যাঁতসেঁতে জমিতে বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রবার বাগিচা

দেখা যায়। অথচ একদিন এই পরিবেশে মানুষের জীবনযাত্রা দুঃসহ মনে হইত। জাপান বা ইংলণ্ডে কার্পাস আদৌ জন্মে না। কিন্তু কার্পাস উৎপাদনকারী দেশ হইতে কার্পাস আমদানি করিয়া নিজেদের কারিগরী দক্ষতার গুণে ঐ দুইটি দেশ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সমর্থ হইয়াছে। জাপানে লৌহ আকরিকের অভাব সত্ত্বেও ভারত হইতে আকরিক লৌহ আমদানি করিয়া জাপান লৌহ ইস্পাত শিল্পে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। সাংস্কৃতিক পরিবেশের আনুকূল্যে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের বাধাকে অতিক্রম করিয়া যে বৈষয়িক উন্নতি করিতে সমর্থ ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার প্রাকৃতিক পরিবেশের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিশেষত বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞানের বিকাশ না ঘটিবার ফলে এশিয়া-আফ্রিকার বহু দেশ অর্থনীতি ক্ষেত্রে তেমন উন্নতি করিতে সমর্থ হয় নাই। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, জাইরে ইহার উদাহরণ। মরুভূমির বুক চিরিয়া সুয়েজখাল খনন করিয়া, আরব সাগরের তলদেশ হইতে খনিজ তৈল টানিয়া প্রতিকূল পরিবেশকে যে মানুষ কতটা কাজে লাগাইতে পারে তাহার নতুন নজীর স্থাপন করিয়াছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়া শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ করিতেও মানুষ অনেকটা আগাইয়া আসিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন ইহার উদাহরণ। সুতরাং মানুষ নিজে তাহার চিন্তায় ও কর্মে প্রতিনিয়ত রূপান্তরিত হইতেছে এবং তাহার পরিবেশকেও নতুন করিয়া গড়িয়া লইতেছে। সংস্কৃতিবান মানুষ ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কের সংঘাতে পরিবেশের রূপান্তর একটি শাশ্বত সত্য। এবং এই পরিবর্তিত পরিবেশের সহিত মানুষ নিয়তই তাহার অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গতিবিধান করিয়া চলিতেছে।

[প্রশ্ন : (১) "কোন দেশের সম্পদ উন্নয়নে মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ-ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।"—উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২। উপযুক্ত উদাহরণ-সহ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর পরিবেশের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা কর। (৩) উদাহরণ উল্লেখ করিয়া পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাব আলোচনা কর।]

অনুশীলনী ২

১। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কি কি? মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সমালোচনার দৃষ্টি লইয়া পর্যালোচনা কর।

[What are the different factors of natural environment? Critically examine the role of envi onment on the economic activities of man.]

[W. B. C. H. S. Exam. 1978]

২। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলিতে কি বুঝ? কোন একটি অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে প্রাকৃতিক পরিবেশ কিরূপে প্রভাবিত করে তাহা আলোচনা কর। উদাহরণ উল্লেখ কর।

[What do you understand by natural environment? Discuss how natural environment influences the economic activities of people of a region. Give example.] [W. B. C. H. S. Exam. 1980]

৩। অ-প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কি কি? পরিবেশের সহিত মানুষ কিভাবে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলে উদাহরণ-সহ তাহা আলোচনা কর।

[What are the different components of non-physical environment? Discuss with illustration how man adopts to his environment.] [W. B. C. H. S. Exam. 1979]

৪। 'কোন অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন প্রণালী কোন আকস্মিক ঘটনা নহে, বরং উহা পরিবেশের প্রভাবের ফলশ্রুতি।' আলোচনা কর।

['The mode of life in any region is not an accident but is the result of environment.'—Discuss.] [W. B. C. Specimen Questions—1978]

৫। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কি কি? মানুষের কার্যকলাপের উপর নদ-নদী অথবা ভূ-প্রকৃতির প্রভাব সমালোচনার দৃষ্টি লইয়া পর্যালোচনা কর।

[What are the different elements of Physical environment? Critically examine the role of rivers or the topography on the activities of man.]

[W. B. C. H. S. Exam. 1980 & 1981]

৬। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত ঐ দেশের নদ-নদী, সমতল ভূমি ও সৈকতরেখার সম্পর্ক আলোচনা কর। তোমার আলোচনা উদাহরণের সাহায্যে বিস্তৃত কর।

[Discuss the relation of rivers, plains and coastline with the economic development of a country. Expand your ideas with illustrations.]

৭। ভৌগোলিক পরিবেশের প্রধান উপাদান কি কি? মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা কর।

[What are the principal factors of geographical environment? Discuss the role of physical factors on the economic activities of man.] [W. B. C. H. S. Exam. 1982]

৮। জলবায়ুর সংজ্ঞা লিখ। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর জলবায়ুর প্রভাব আলোচনা কর।

[Define climate. Describe the influence of climate on man's economic activities.]

[W. B. C. H. S. Council Specimen Questions, 1980 & 1981]

৯। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর (ক) পর্বত, (খ) আভ্যন্তরীণ জলভাগ ও (গ) প্রাকৃতিক সম্পদের প্রভাব বর্ণনা কর।

[Describe the influence of (a) Mountains, (b) Inland waterbodies & (c) Natural resources on the economic activities of man.]

১০। অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ বলিতে কি বুঝায়? ইহার প্রধান কয়েকটি উপাদানের নাম কর। জনসংখ্যা, ধর্ম ও শিক্ষা এবং সরকার মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে কিভাবে প্রভাবিত করে উহা উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা কর।

[What is meant by Non-physical Environment? What are its main factors? Discuss how Population, Religion & Education and Government influence the economic activities of man.]

১১। জলবায়ু বলিতে কি বুঝায়? মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সহিত ইহার সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। বস্তুশিল্পের সংগঠনে ইহার ভূমিকা পর্যালোচনা কর।

[What is meant by climate? Analyse its relation with the economic activities of man. Discuss its role in the location of industries.]

১২। (ক) পরিবেশের সহিত মানুষের সম্পর্ক আলোচনা কর।

(খ) মানুষ কিভাবে পরিবেশের সহিত নিজেকে খাপখাওয়াইয়া চলে তাহা উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা কর।

[(a) Discuss human relation with environment.

(b) Describe how man adopts himself to his environment. Give illustration.]

৩ পৃথিবীর জলবায়ু অঞ্চল
(Climatic Regions of the World)

কোন স্থানে একদিনে সূর্যের তাপ, বৃষ্টিপাত, বাতাসের চাপ, আর্দ্রতা ও বাতাসের গতি প্রভৃতির সমন্বয়ে যে অবস্থা অনুভূত হয় তাহাকে ঐ স্থানের ঐ দিনের আবহাওয়া বলে। কমপক্ষে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের আবহাওয়ার গড়কে ঐ স্থানের জলবায়ু বলে। দীর্ঘকালের গড় হিসাবে বিবেচনা করিলে বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়ার মধ্যে কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। গড় আবহাওয়ার ঐ সাদৃশ্যগুলিকে ভিত্তি করিয়াই জলবায়ুর ধারা নির্দিষ্ট হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জলবায়ুর বিভিন্নতা দেখা যায়। এই বিভিন্নতার মূলে রহিয়াছে সূর্যতাপের তারতম্য।

পৃথিবীর সর্বত্র সূর্যকিরণ সমভাবে পড়ে না। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর চব্বিশ ঘণ্টায় একবার পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব দিকে আবর্তিত হয়। ইহাই তাহার **আহ্নিক গতি**। আহ্নিক গতি ছাড়া পৃথিবীর আর একটি গতি আছে। ইহা তাহার **বার্ষিক গতি**। এই গতি অনুযায়ী পৃথিবী আপন কক্ষপথের সহিত ৬৬½° কোণ করিয়া একটি ডিম্বাকার কক্ষপথে তিন শত পঁয়ষট্টি দিন ছয় ঘণ্টায় একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী আপন কক্ষপথের উপর ৬৬½° হেলিয়া থাকিবার ফলে সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু পর্যায়ক্রমে একবার সূর্যের সম্মুখীন হয় ও আবার সূর্য হইতে দূরে সরিয়া যায়। এই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্যতাপের ও বায়ুচাপের তারতম্য ঘটে এবং দেখা দেয় ঋতু পর্যায়। নিরক্ষ অঞ্চলের উভয় পার্শ্বে কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি রেখা দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলে সূর্য সারা বৎসর প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। ইহার ফলে নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণে উভয় গোলার্ধে সমদূরবর্তী কয়েকটি স্থানে স্থায়ী কয়েকটি তাপমণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছে, যেমন—

(১) **উষ্ণ মণ্ডল**: নিরক্ষরেখা হইতে ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত।

(২) **উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল**: ৩০°—৪৫° উত্তর-দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। গ্রীষ্মপ্রধান।

(৩) **শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল**: ৪৫°—৬৬½° উত্তর-দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত।

(৪) **হিম মণ্ডল**: ৬৬½° হইতে ৯০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অর্থাৎ উত্তরে সুমেরু ও দক্ষিণে কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই তাপমণ্ডলের প্রভাবে ঐ সকল অঞ্চলে কয়েকটি বায়ুচাপ-বলয়ের এবং কয়েকটি নিয়মিত বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য স্থানীয় কারণে অর্থাৎ ভূ-প্রকৃতি

প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য স্থানে স্থানে জলবায়ুর কিছু তারতম্য ঘটিলেও বায়ুর চাপ-বলয়গুলিই মোটামুটিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। সূর্য প্রদক্ষিণের পথে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ যখন পর্যায়ক্রমে সূর্যের নিকটবর্তী হয়, তখন চাপ বলয়গুলি কিছুটা উত্তরে বা দক্ষিণে সরিয়া যায়। বিষুব রেখা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই সূর্যের উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ভূপৃষ্ঠে মহাদেশের অবস্থান, উচ্চতা, সমুদ্র-সান্নিধ্য, ভূ-প্রকৃতি, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি বিষয়ের উপর জলবায়ুর পার্থক্য নির্ভর করে। তথাপি বিষুব রেখা হইতে উভয় গোলার্ধের সমদূরবর্তী স্থানগুলির জলবায়ুর মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন, ৫° হইতে ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত মহাদেশগুলির পশ্চিমা প্রান্তে অতি উষ্ণ একপ্রকার জলবায়ু বিদ্যমান। উত্তর গোলার্ধে আফ্রিকার সাহারা, এশিয়ার আরব, দক্ষিণ গোলার্ধে আফ্রিকার কালাহারি ও দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা প্রভৃতি মরুভূমি এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই মরুভূমিগুলির জলবায়ু, উদ্ভিদ, এমনকি মানুষের জীবনধারার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

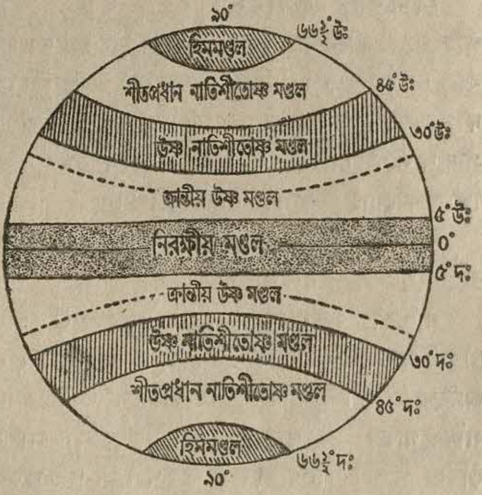

চিত্র ৩.১: পৃথিবীর বিভিন্ন তাপমণ্ডল

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত অঞ্চলগুলির মধ্যে ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু, জনবসতি ও অধিবাসীদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে গভীর মিল লক্ষ্য করিয়া এই সকল অঞ্চলকে লইয়া এক একটি প্রাকৃতিক গণ্ডি রচনা করা যায়। এই প্রকার গণ্ডিবদ্ধ অঞ্চলগুলি রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও জলবায়ুর কারণে এক একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক ভূগোলের আলোচনায় অবস্থান ও জলবায়ুর দিক হইতে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু, জনবসতি ও অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার বিষয়ে পরস্পর মৌলিক সাদৃশ্যযুক্ত অঞ্চলগুলিকে একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল (Natural Region) বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। অধ্যাপক হার্বার্টসন মৌলিক সাদৃশ্যযুক্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলকে একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল বা সমজলবায়ুসম্পন্ন অঞ্চল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রাকৃতিক অঞ্চল বলিতে বুঝায় "পৃথিবীর এমন একটি অঞ্চল যেখানে মানবজীবন-নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান।" ("An area of earth's

surface, which is essentially homogeneous with respect to conditions that affect human life."—A. J. Herbertson.) কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ব্যতিক্রমের ফলে সাদৃশ্যের পরিবর্তে কি কিছু বৈষম্য দেখা যাইতে পারে।

প্রাকৃতিক অঞ্চল সম্পর্কে বিবেচ্য বিষয় ও ইহার গুরুত্ব
(Factors to be noted and its importance)

প্রাকৃতিক অঞ্চল সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

(১) প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মৌলিক সাদৃশ্য জলবায়ুর ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইহা মূলত জলবায়ুভিত্তিক। ইহাদিগকে জলবায়ু অঞ্চলও বলা হয়।

(২) প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলি পরস্পর সন্নিহিত। কোন একটি অঞ্চলকে অপর একটি অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা যায় না। একটি অঞ্চল ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া অপর একটি অঞ্চলের সহিত মিশিয়া যায়। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে দুইটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে একটি সন্ধিক্ষেত্র (Transitional Area) দেখা যায়।

(৩) দেশের অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি প্রভৃতি কারণে একই প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে অপর একটি উপ-অঞ্চলের সৃষ্টি হইতে পারে। যেমন—দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর ও তাহার রাজধানী কিটো। প্রাকৃতিক অঞ্চলের দিক হইতে ইহা নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও পর্বতের উপর ইহার অবস্থান বলিয়া এই অঞ্চলের জলবায়ু নিরক্ষীয় জলবায়ুর তুলনায় অনেক বেশি শীতল।

(৪) প্রাকৃতিক অঞ্চলের কোনও রাজনৈতিক সীমা নাই। ইহা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের সমগ্র বা অংশবিশেষ লইয়া প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে গঠিত।

প্রাকৃতিক অঞ্চলের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা
(Natural Regions—Need for discussion)

প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলির গঠন ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার কার্যকরী প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ যদি অর্থনৈতিক দিক হইতে যথেষ্ট উন্নতি লাভে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ঐ পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অনুন্নত দেশের পক্ষে প্রায় অনুরূপ উন্নতিলাভ নিতান্ত অসম্ভব নহে। কারণ প্রকৃতিগতভাবে ঐ পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত সকল দেশের মধ্যে মিল রহিয়াছে। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় উন্নত দেশটির আদর্শে অনুন্নত দেশগুলিতে সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন। কৃষিকার্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে রবার উৎপাদন দক্ষিণ আমেরিকার

প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য স্থানে স্থানে জলবায়ুর কিছু তারতম্য ঘটিলেও বায়ুর চাপ-বলয়গুলিই মোটামুটিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। সূর্য প্রদক্ষিণের পথে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ যখন পর্যায়ক্রমে সূর্যের নিকটবর্তী হয়, তখন চাপ বলয়গুলি কিছুটা উত্তরে বা দক্ষিণে সরিয়া যায়। বিষুব রেখা হইতে উত্তরে ও দক্ষিণে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই সূর্যের উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ভূপৃষ্ঠে মহাদেশের অবস্থান, উচ্চতা, সমুদ্র-সান্নিধ্য, ভূ-প্রকৃতি, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি বিষয়ের উপর জলবায়ুর পার্থক্য নির্ভর করে। তথাপি বিষুব রেখা হইতে উভয় গোলার্ধের সমদূরবর্তী স্থানগুলির জলবায়ুর মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন, ৫° হইতে ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত মহাদেশগুলির পশ্চিমা প্রান্তে অতি উষ্ণ একপ্রকার জলবায়ু বিদ্যমান। উত্তর গোলার্ধে আফ্রিকার সাহারা, এশিয়ার আরব, দক্ষিণ গোলার্ধে আফ্রিকার কালাহারি ও দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা প্রভৃতি মরুভূমি এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই মরুভূমিগুলির জলবায়ু, উদ্ভিদ, এমনকি মানুষের জীবনধারার মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

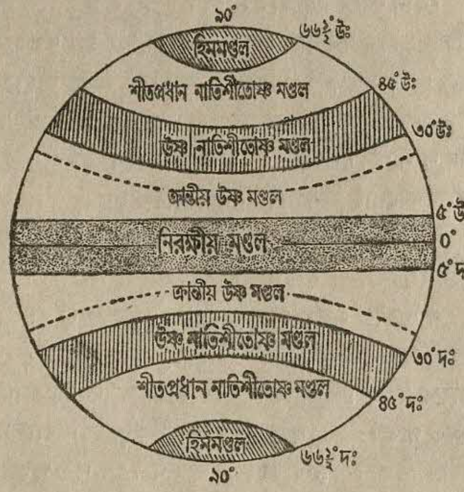

চিত্র ৩.১ : পৃথিবীর বিভিন্ন তাপমণ্ডল

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত অঞ্চলগুলির মধ্যে ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু, জনবসতি ও অধিবাসীদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে গভীর মিল লক্ষ্য করিয়া এই সকল অঞ্চলকে লইয়া এক একটি প্রাকৃতিক গণ্ডি রচনা করা যায়। এই প্রকার গণ্ডিবদ্ধ অঞ্চলগুলি রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও জলবায়ুর কারণে এক একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক ভূগোলের আলোচনায় অবস্থান ও জলবায়ুর দিক হইতে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু, জনবসতি ও অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার বিষয়ে পরস্পর মৌলিক সাদৃশ্যযুক্ত অঞ্চলগুলিকে একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল (Natural Region) বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। অধ্যাপক হার্বার্টসন মৌলিক সাদৃশ্যযুক্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলকে একটি প্রাকৃতিক অঞ্চল বা সমজলবায়ুসম্পন্ন অঞ্চল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রাকৃতিক অঞ্চল বলিতে বুঝায় "পৃথিবীর এমন একটি অঞ্চল যেখানে মানবজীবন-নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান।" ("An area of earth's

surface, which is essentially homogeneous with respect to conditions that affect human life."—A. J. Herbertson.) কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ব্যতিক্রমের ফলে সাদৃশ্যের পরিবর্তে কি কিছু বৈষম্য দেখা যাইতে পারে।

প্রাকৃতিক অঞ্চল সম্পর্কে বিবেচ্য বিষয় ও ইহার গুরুত্ব

(Factors to be noted and its importance)

প্রাকৃতিক অঞ্চল সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

(১) প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মৌলিক সাদৃশ্য জলবায়ুর ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ইহা মূলত জলবায়ুভিত্তিক। ইহাদিগকে জলবায়ু অঞ্চলও বলা হয়।

(২) প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলি পরস্পর সন্নিহিত। কোন একটি অঞ্চলকে অপর একটি অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা যায় না। একটি অঞ্চল ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া অপর একটি অঞ্চলের সহিত মিশিয়া যায়। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে দুইটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে একটি সন্ধিক্ষেত্র (Transitional Area) দেখা যায়।

(৩) দেশের অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি প্রভৃতি কারণে একই প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যে অপর একটি উপ-অঞ্চলের সৃষ্টি হইতে পারে। যেমন—দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর ও তাহার রাজধানী কিটো। প্রাকৃতিক অঞ্চলের দিক হইতে ইহা নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও পর্বতের উপর ইহার অবস্থান বলিয়া এই অঞ্চলের জলবায়ু নিরক্ষীয় জলবায়ুর তুলনায় অনেক বেশি শীতল।

(৪) প্রাকৃতিক অঞ্চলের কোনও রাজনৈতিক সীমা নাই। ইহা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের সমগ্র বা অংশবিশেষ লইয়া প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে গঠিত।

প্রাকৃতিক অঞ্চলের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

(Natural Regions—Need for discussion)

প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলির গঠন ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার কার্যকরী প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ যদি অর্থনৈতিক দিক হইতে যথেষ্ট উন্নতি লাভে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ঐ পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অনুন্নত দেশের পক্ষে প্রায় অনুরূপ উন্নতিলাভ নিতান্ত অসম্ভব নহে। কারণ প্রকৃতিগতভাবে ঐ পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত সকল দেশের মধ্যে মিল রহিয়াছে। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় উন্নত দেশটির আদর্শে অনুন্নত দেশগুলিতে সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন। কৃষিকার্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে রবার উৎপাদন দক্ষিণ আমেরিকার

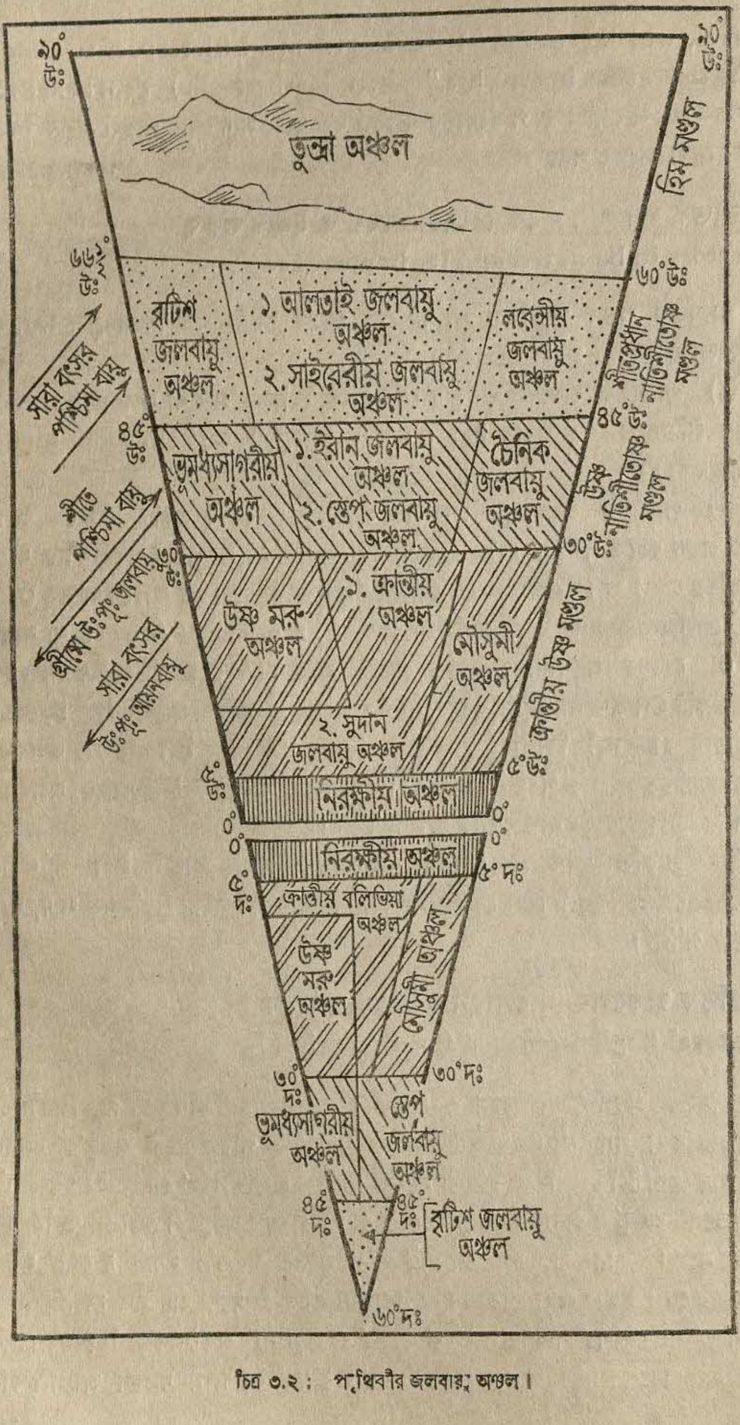

চিত্র ৩.২ : পৃথিবীর জলবায়ু অঞ্চল।

আমাজন অববাহিকায় ও আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকায় সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ ঐ সকল স্থানের নিরক্ষীয় জলবায়ু স্বাভাবিক রবার উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল। পরবর্তী কালে মালয়েশিয়া অঞ্চলের অনুরূপ জলবায়ুতে রাবারবাগিচা শুরু করা হয় এবং অতি দ্রুত রবার উৎপাদনে মালয়েশিয়া বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচনায় এই কারণেই বিভিন্ন জলবায়ু-পরিমণ্ডলের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক অঞ্চল
(Natural Regions)

অধ্যাপক হার্বার্টসন-এর সংজ্ঞা অনুসরণ করিয়া প্রধান জলবায়ুর ভিত্তিতে (উত্তাপ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা প্রভৃতি) পৃথিবীকে নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে ও অঞ্চলে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) **উষ্ণ মণ্ডল (Warm Zone)**: (ক) নিরক্ষীয় অঞ্চল (Equatorial zone)। (খ) পূর্বপ্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল (Eastern Marginal or Monsoonal Region)। (গ) ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চল (Tropical Region)। (ঘ) বলিভিয়া আদর্শের (Balivia Type) জলবায়ু। (ঙ) পশ্চিম প্রান্তের মরু অঞ্চলের জলবায়ু অঞ্চল (Western Desert Region)।

(২) **উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল (Warm Temperate Zone)**: (ক) পূর্বপ্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চল (Eastern Marginal Region)। (খ) অন্তর্দেশীয় তৃণভূমি অঞ্চল (Interior Grass Land Region)। (গ) অন্তর্দেশীয় উচ্চভূমি অঞ্চল (Interior High land Region)। (ঘ) পশ্চিমপ্রান্তীয় ভূমধ্য-সাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল (Western Marginal Mediterranean Region)।

(৩) **শীত প্রধান নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল (Cool Temperate Zone)**: (ক) পূর্বাঞ্চলের লরেন্সীয় আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল (Eastern Marginal or St. Lawrence Type)। (খ) অন্তর্দেশীয় নিম্নভূমির জলবায়ু বা সাইবেরিয়া আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল (Interior Low Lands or Siberean Type)। (গ) অন্তর্দেশীয় উচ্চভূমি বা আলতাই আদর্শের জলবায়ু (Interior Highland or Altai Type)। (ঘ) পশ্চিম ইউরোপীয় জলবায়ু বা শীতোষ্ণ সামুদ্রিক জলবায়ু অঞ্চল (Western European Region or Temperate Oceanic Type)।

(৪) **হিম মণ্ডল (Polar Zone)**: (ক) উচ্চ অংশে বরফাবৃত উচ্চভূমি (Ice Cap)। (খ) বরফাস্তীর্ণ সমতলভূমি বা তৈগা (Ice Sheet or Taiga)।

[প্রশ্ন : (১) আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কি? (২) জলবায়ু অঞ্চল বলিতে কি বুঝ? পৃথিবীকে কয়টি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা যায় এবং উহারা কি কি? (৩) জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? (৪) পৃথিবীকে জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করিয়া পড়িবার সার্থকতা কি? (৫) একই প্রকার জলবায়ুতে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানুষের জীবনযাত্রার সমতা ও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কেন?]

নিরক্ষীয় উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চল বা ক্রান্তীয় বৃষ্টি-অরণ্য অঞ্চল (Equatorial Climatic Region or Tropical Rain-Forest Region)

নিরক্ষ বা বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত নিরক্ষীয় শান্ত বলয়। এই অঞ্চলে সারা বৎসর অতিরিক্ত উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের ফলে গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। নিরক্ষরেখার নিকট অবস্থিত বলিয়া এই জলবায়ু অঞ্চলকে নিরক্ষীয় উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চল বা ক্রান্তীয় বৃষ্টি-অরণ্য অঞ্চল বলা হয়।

অবস্থান (Location): নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে সাধারণত ৫° পর্যন্ত অঞ্চলে এই প্রকার জলবায়ু দেখা যায়। কোথাও কোথাও প্রায় ১০° উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষরেখা

চিত্র ৩.৩: নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল।

দ্বারা আবদ্ধ অঞ্চলেও এই জলবায়ুর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকা, কলম্বিয়া উপকূল অঞ্চল, আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকা, গিনি উপকূল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রী লংকার কতকাংশ ও ওশিয়ানিয়ার নিউগিনি প্রভৃতি অঞ্চল এই প্রকার জলবায়ুর অন্তর্গত। আমাজন অববাহিকা অঞ্চলেই এই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ইহাকে আমাজন আদর্শের (*Amazon Type*) জলবায়ুও বলা হয়।

জলবায়ু (Climate): (ক) এই অঞ্চলে সূর্য বৎসরের বেশির ভাগ সময় প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেওয়ার ফলে সারা বৎসর অতিরিক্ত উত্তাপ অনুভূত হয়। উত্তাপের তারতম্য খুবই কম। দিন ও রাত্রি বার মাসই প্রায় সমান। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের নিকটে মিলিত হওয়ায় আন্তঃক্রান্তীয় সম্মিলন (Inter-Tropical Convergence) ঘটে। ইহার ফলে বাতাস উপরে উঠিয়া ঠাণ্ডার সংস্পর্শে আসিয়া প্রসারিত হয় ও বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই অঞ্চলে জলভাগ বেশি।

অতিরিক্ত উত্তাপের ফলে এই অঞ্চলের জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় ও উপরের ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া বৃষ্টিরূপে ঝরিয়া পড়ে। এই প্রকার বৃষ্টিপাতকে পরিচলন বৃষ্টিপাত (Convectional Rainfall) বলে। বৃষ্টির সহিত বজ্রবিদ্যুতের সংমিশ্রণ থাকে এবং প্রায় প্রতিদিনই বিকালের দিকে আকাশ বেশ ঘনঘটা করিয়া আসে। প্রাতে বৃষ্টি হয় না বলিলেই চলে। সারা বৎসরই বৃষ্টিপাত হয়। স্থানবিশেষে মার্চ-এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক।

(খ) এই অঞ্চলের বার্ষিক গড় উত্তাপের পরিমাণ প্রায় ২৭° সেন্টিগ্রেড। বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ প্রায় ২০৩ সে.মি। কিন্তু স্থানবিশেষে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫০০ সে. মি. হয়। সারা বৎসর বৃষ্টিপাত হইলেও বৎসরে দুইবার সূর্য নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিবার পর (২১ শে মার্চ ও ২২ শে সেপ্টেম্বর) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক হইয়া থাকে।

(গ) অতিরিক্ত উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চলের জলবায়ু সর্বদাই উষ্ণ ও আর্দ্র থাকে।

(i) বার্ষিক গড় উত্তাপ—২৬° সে.।

(ii) বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত—১৮৩ সে. মি.।

(iii) বার্ষিক গড় উত্তাপের প্রসর—১.৮০।

(iv) ইহা নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ের অন্তর্গত হওয়ার ফলে বৎসরের প্রায় সময়েই তেমন প্রবল বাত্যা হয় না।

(v) ঋতুচক্রের আবর্তন এই অঞ্চলে দেখা যায় না। একমাত্র ঋতু উষ্ণ ও আর্দ্র; জলবায়ু স্যাঁতসেঁতে ও অস্বাস্থ্যকর। জানুয়ারী ও জুলাই মাসে প্রায় একই রকম উত্তাপ অনুভূত হয়। প্রতিদিনের আবহাওয়ায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না। জলবায়ুর এই একঘেঁয়েমি ভাব অধিবাসীদের অলস ও উদ্যমহীন করিয়া তোলে।

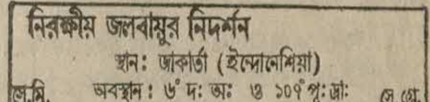

চিত্র ৩.৪ : নিরক্ষীয় জলবায়ুর নিদর্শক।

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু (Vegetation and Biotic Resources): সারাবৎসর অধিক উত্তাপ ও অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে নিরক্ষীয় অঞ্চলে চিরহরিৎ

বৃক্ষের গভীর অরণ্য দেখা যায়। গাছপালাগুলি বিশাল কাঠ শক্ত ও মজবুত। বৃক্ষে ও লতাগুল্মে সমস্ত বনভূমি আচ্ছাদিত থাকে। সূর্যের আলো দিনের বেলায়ও প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য এই অঞ্চলকে 'গোধূলি অঞ্চল' (Regions of Twilight) বলে। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকায় এই অরণ্যাঞ্চলের স্থানীয় নাম 'সেলভা' (Selva)। আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকার বিশাল বনভূমি 'আফ্রিকার জঙ্গল' বলিয়া খ্যাত। ইহা স্থানে স্থানে তৃণভূমি দ্বারা বিচ্ছিন্ন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জলভাগ বেশি থাকায় উত্তাপের কিছু তারতম্য দেখা যায় ও বনভূমিও তেমন ঘন নহে। আমাজন অববাহিকার 'সেলভা' অরণ্যে রোজউড, আয়রণ উড, রবার, ব্রেজিলনাট ও বাঁশ জন্মে। আফ্রিকার জঙ্গলে রবার, কোকো, সিঙ্কোনা ইত্যাদি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অরণ্যে শাল, রাবার, কর্পূর, আবলুস প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। ক্যারিবিয়ান সাগরদ্বীপ অঞ্চলে 'জাপোটে' গাছ (Zapote Tree) জন্মে। ইহার রস হইতে চিকল সংগ্রহ করা হয় এবং চিকল হইতে চুইং গাম তৈয়ারি করা হয়। এই সকল অঞ্চলের বনভূমিতে বিষাক্ত সাপ, নানা ধরনের বানর, বনমানুষ ও নানা জাতের পক্ষী প্রভৃতি দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে আমাজন অঞ্চলের লম্বালেজ বানর, পুমা, আফ্রিকার শিম্পাঞ্জী, গরিলা, জাগুয়ার, হাতি, ইন্দোনেশিয়ার ওরাং ওটাং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পরিবহণ ব্যবস্থা (Transport) : এই অঞ্চলে অতিরিক্ত উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের ফলে আবহাওয়া অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে। বেশির ভাগ অঞ্চলেই গভীর অরণ্য বিদ্যমান। অতি বৃষ্টির ফলে মাটিও নরম। এখানে রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ করা বিশেষ অসুবিধাজনক। সুতরাং এই অঞ্চলে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আজিও অনুন্নত। নদী-উপনদীসমূহ অত্যন্ত খরস্রোতা। নদীগুলি মোহনার নিকট কিছুদূর নাব্য।

মনুষ্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Population and Economic Activities) : নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু কৃষিকার্য ও মনুষ্যবাসের উপযোগী নহে। এই কারণে লোকবসতি খুবই কম। অধিবাসীরা সাধারণত খর্বকায়। তাহাদের গায়ের রং কালো, চুল কোঁকড়ানো, ঘন কালো, ঠোঁট মোটা। আফ্রিকায় এই খর্বকায় জাতি 'পিগমি' বলিয়া পরিচিত। নদীর তীরে কোথাও কোথাও পিগমিরা গাছের উপর লতাপাতার সাহায্যে মাচা বাঁধিয়া বাস করে। জলবায়ু স্যাঁতসেঁতে হওয়ায় অধিবাসীরা যেমন আলস্যপরায়ণ তেমনি উদ্যমহীন ও কর্মবিমুখ। এই কারণে এই অঞ্চলকে দুর্বলতার অঞ্চল (Regions of Debilitation) বলা হয়।

গভীর বনভূমি কাটিয়া কৃষিকার্য করা, রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ অসুবিধাজনক। অধিকন্তু সভ্য দেশগুলি হইতে এই অঞ্চল বহু দূরে অবস্থিত হওয়ায় সাংস্কৃতিক যোগাযোগও গড়িয়া উঠে নাই। ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ এই সকল অঞ্চল খুবই অনুন্নত ছিল।

এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অনুর্বর অম্লধর্মী পেডালফার জাতীয়। একমাত্র নদী বদ্বীপ অঞ্চলে পলিসমৃদ্ধ মৃত্তিকা উর্বর। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে ধাতব উপাদান-সহ মাটির উপরের অংশ নিয়ত অপসৃত হয়। এই কারণে কৃষিকার্যের যেমন অসুবিধা তেমনি কৃষিও অনুন্নত। পশুচারণ শিল্পও গড়িয়া উঠে নাই।

আমাজন ও কঙ্গো অববাহিকা অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে মাত্র একজন লোক বাস করে। গভীর অরণ্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নানাপ্রকার বিষাক্ত মশা, মাছি, সাপ ও হিংস্র প্রাণীর উপদ্রব এই অঞ্চলে বিরল বসতির কারণ। নদী অববাহিকা ও সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে কিছু ঘনবসতি দেখা যায়। নাইজেরিয়া, ব্রেজিল ও গিনি উপকূলে জনবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যথেষ্ট ঘন জনবসতি দেখা যায়। ইহার কারণ এই অঞ্চলের উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা। অধিবাসীরা কোথাও-কোথাও পশু-শিকার, ফলমূল আহরণ এবং 'জুম' চাষ-এর মাধ্যমে জীবিকার সংস্থান করে। তাহারা অরণ্যের প্রান্তে জঙ্গল কাটিয়া পোড়াইয়া একটি স্থান করিয়া লয়। পরে গর্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে শস্যবীজ পুঁতিয়া রাখে। বর্ষার জলে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া শস্য হইলে তাহা সংগ্রহ করে ও অন্যত্র চলিয়া যায়। এই প্রকার চাষকে 'জুম' চাষ বলা হয়।

নিরক্ষীয় জলবায়ু নানা দিক্ হইতে উন্নত কৃষির অন্তরায় সন্দেহ নাই। তথাপি এই জলবায়ু রবার, কফি, কোকো ও নানা বনজ সম্পদ উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই অঞ্চলের বনভূমি হইতে বহু মূল্যবান কাঠ, হস্তিদন্ত, গাটাপার্চা, বাদাম, গদ, চিকল্ (চ্যুইং গাম), সার্সাপেরিলা, নারিকেল শাঁস ও ছোবড়া প্রভৃতি পাওয়া যায়। আমাজন অঞ্চলের প্রাকৃতিক রবার, কফি, কোকো, ধান ও ইক্ষু, কঙ্গো অঞ্চলের রবার ও কোকো এবং ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার আবাদি রবার, ধান, ইক্ষু, কোকো, কফি, কলা, ধুনা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সকল অঞ্চলে প্রচুর খনিজ দ্রব্যও পাওয়া যায়। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় টিন ও কিছু খনিজ তেল, কঙ্গো অঞ্চলের তামা ও হীরক এবং ঘানা অঞ্চলের বক্সাইট ও ম্যাঙ্গানীজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অধিকাংশ টিন মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার বাঁকা, সিঙকেপ ও বেলিতুং অঞ্চল হইতে উত্তোলিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপ হইতে প্রচুর খনিজ তৈল উত্তোলন করা হয়। সুরিনাম ও ব্রিটিশ গিয়ানা অঞ্চলে প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলে শ্রম-শিল্পের প্রসার আদৌ ঘটে নাই। খনিজ দ্রব্য উত্তোলন, খনিজ-তৈল পরিশোধন, টিন ও গন্ধক শিল্প উল্লেখযোগ্য। এই সকল সম্পদের লোভে ইউরোপীয় জাতিগুলি দীর্ঘদিন এই অঞ্চলের দেশগুলিকে দখল করিয়া নির্বিচারে শোষণ করিয়াছে।

বর্তমানে রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা স্বাধীন হইয়া ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই অঞ্চলে কয়লা ও শ্রমশক্তির অভাবে তেমন উল্লেখযোগ্য শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠে নাই। এই

অঞ্চলের অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদের আহরণ ও রপ্তানি। সমগ্র পৃথিবী আজিও রবার, কফি, কোকো, তাম্র ও টিনের জন্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপর অতি বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল। অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চলের নদীগুলি হইতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং জলবিদ্যুতের সাহায্যে স্থানীয় কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে এই অঞ্চলে অতি দ্রুত শ্রমশিল্পের বিকাশ অবশ্যই ঘটিবে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা একটি বাস্তব সত্য।

[প্রশ্ন : (১) নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলবায়ু বর্ণনা কর। এই জলবায়ু অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার কৃষিকার্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের বিবরণ দাও। (২) নিরক্ষীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই জলবায়ু দেখা যায়? (৩) কিটো কোথায় অবস্থিত? এখানকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কি? (৪) নিরক্ষীয় অঞ্চলের রপ্তানী দ্রব্যগুলির নাম লিখ। (৫) পৃথিবীর একটি রেখাচিত্রে নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল চিহ্নিত করিয়া দেখাও।]

পূর্বপ্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল
(Eastern Marginal Monsoon Climatic Region)

মৌসিম একটি আরবি শব্দ, অর্থ ঋতু। অর্থাৎ বৎসরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আগত বায়ুপ্রবাহের ফলেই এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, উত্তাপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া ইহাকে মৌসুমী জলবায়ু বলা হয়। মৌসুমী জলবায়ু অধ্যুষিত অঞ্চলকেই মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল বলা হয়।

অবস্থান (Location): নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ৫° হইতে ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে মহাদেশগুলির পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত দেশসমূহ এই জলবায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত। এশিয়া মহাদেশে—ভারত, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, ইন্দোচীন উপদ্বীপ, চীনের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, জাপানের দক্ষিণাংশ, শ্রী লঙ্কার দক্ষিণাংশ। আফ্রিকা মহাদেশে—ইথিয়োপিয়ার পূর্বাংশ, মালাগাসি। উত্তর আমেরিকায়—মধ্য আমেরিকার রাজ্যসমূহ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা উপদ্বীপ। দক্ষিণ আমেরিকায়—ব্রাজিলের পূর্ব উপকূলের অংশবিশেষ। অস্ট্রেলিয়ায়—কুইন্সল্যান্ড ও উত্তর টেরিটরির তীরভূমি ইত্যাদি। ক্যারাবিয়ান সাগরে অবস্থিত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত হইলেও এই অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে মৌসুমী জলবায়ুমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত একটি উপমণ্ডলে—'ক্যারাবিয়ান' আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল বলিয়া চিহ্নিত করেন। কিন্তু ভারতের মাদ্রাজ উপকূলে ও শ্রী লঙ্কায় শীত ও গ্রীষ্মকালে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়। সুতরাং ইহাকে আলাদা করিয়া নির্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। ভারত উপমহাদেশে এই প্রকার জলবায়ু বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ইহাকে ভারতীয় আদর্শের জলবায়ুও বলা হয়।

জলবায়ু (Climate): সূর্য যখন কর্কট বা মকর ক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন কর্কটীয় বা মকরীয় নিম্নচাপ অঞ্চলে বিপরীত দিকের উচ্চচাপ অঞ্চল

হইতে প্রবল বেগে বাতাস ছুটিয়া আসে। এই বায়ুপ্রবাহ নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিবার সময় ফেরেলের সূত্র অনুসারে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম

চিত্র ৩.৫ : মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল।

দিকে বাঁকিয়া যায়। ফলে উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ দিক হইতে আগত বায়ুপ্রবাহ দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর হইতে আগত বায়ু উত্তর-পূর্ব বায়ু প্রবাহে পরিণত হয়। আবার দক্ষিণ গোলার্ধে উহা যথাক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় ঐ বাতাস জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া লয় এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া পাহাড় বা উচ্চভূমিভাগে আঘাত করিয়া বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই ধরনের বৃষ্টিপাতকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি (Relief Rain) বলা হয়। ভূ-প্রকৃতির বিশেষ গঠন এই বৃষ্টিপাতের পক্ষে সহায়ক।

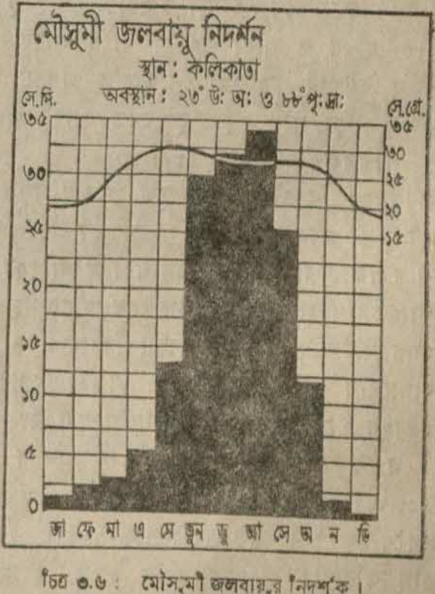

চিত্র ৩.৬ : মৌসুমী জলবায়ুর নিদর্শক।

মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে সারা বৎসর প্রবল উত্তাপ পরিলক্ষিত হয়। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ৩২° সে. এবং শীতকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ১৫° সে.। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু শীতকাল প্রায় শুষ্ক। বার্ষিক গড়

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২০০ সে মি. হইলেও সমতলভূমিতে প্রায় ৫০—২৫০ সে.মি.। এবং পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় ১,০০০ সে.মি.। ভারতের গারো ও খাসিয়া পাহাড় অঞ্চলে ও চেরাপুঞ্জিতে বৎসরে প্রায় ১.২০০ সে.মি. বৃষ্টিপাত হয়। ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের কিছু তারতম্য ঘটিয়া থাকে। মৌসুমী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রধানত গ্রীষ্মকালের শেষ দিকে হয় এবং এই সময়কে বর্ষাকাল বলা হয়। শীতকাল বৃষ্টিহীন, গ্রীষ্মকাল উত্তপ্ত ও রুক্ষ। অর্থাৎ বৎসরের প্রায় নয় মাস কাল গরম ও তিন মাস কাল শীত অনুভূত হয় এবং গ্রীষ্মকালের এক অংশ উত্তপ্ত ও বাকী অংশ আর্দ্র।

(ক) বার্ষিক গড় উত্তাপ—২৯.৪° সে। (খ) বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত—১৬৩.১০ সে মি.। (গ) বার্ষিক উত্তাপের প্রসর—১৯° সে.।

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু (Vegetation and Biotic Resources): এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক বলিয়া স্থানে স্থানে গভীর বনভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। ২০০ সে মি.-এর অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্যে সেগুন, জারুল, অর্জুন, মেহগিনি, আবলুশ, বাঁশ, বেত প্রভৃতি দেখা যায়। ১০০ সে মি. হইতে ২০০ সে.মি. বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যে শাল, হরীতকী, বহেড়া প্রভৃতি দেখা যায়। ইহা ছাড়া ১০০ সে.মি.-এর কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে নানা জাতীয় ছোট গাছ, তৃণগুল্ম ইত্যাদির আধিক্য লক্ষণীয়। এই অঞ্চলের কাষ্ঠসম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান এবং সমগ্র পৃথিবীতে সেগুন, মেহগিনি, আবলুশ প্রভৃতি কাষ্ঠের যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে। বনভূমিতে বাঘ, ভল্লুক, চিতাবাঘ, গণ্ডার, হাতি, হরিণ ও নানা ধরনের পাখি আছে। ভারতের সুন্দরবন অঞ্চলের রয়েল বেঙ্গল টাইগার ভয়ংকর, সৌন্দর্যের অপূর্ব নিদর্শন। ইহা ছাড়া গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, গাধা প্রভৃতি তৃণভোজী প্রাণী অধিক সংখ্যায় পরিলক্ষিত হয়।

পরিবহণ ব্যবস্থা (Transport): মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অনেকাংশে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি হওয়ায় সড়কপথ ও রেলপথ নির্মাণ সুবিধাজনক। নদীগুলিও অনেকাংশে নাব্য। ফলে এই অঞ্চলে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন নদী-অববাহিকা অঞ্চলে—যেমন গঙ্গা, ইরাবতী, মেকং লোহিত, সিকিয়াং অববাহিকায় ও বদ্বীপে সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়াছে। এই অঞ্চলে বিমানপথেও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের মধ্যে মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলেই পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উন্নত।

মনুষ্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Population and Economic Activities): এই অঞ্চল বহুদিন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অধীন ছিল বলিয়া অর্থনৈতিক দিক্ হইতে অনুন্নত ছিল। কিন্তু বর্তমানে দেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে ও দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। জীবনযাত্রার সহজ সুযোগ থাকিবার ফলে সুদূর অতীতকাল হইতেই এই অঞ্চলে জনবসতি খুব ঘন। মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা বলা যায়।

বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক এই অঞ্চলে বসবাস করে। চীন ও ভারতের লোকসংখ্যা বর্তমানে যথাক্রমে ১০০ কোটি ও ৭০ কোটি। অধিকাংশ বসতিই নদী-ব-দ্বীপ অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং জনবসতির ঘনত্ব কোন কোন অঞ্চলে ৩০০-এর অধিক। অধিবাসীদের বেশীর ভাগই কৃষিজীবী। অস্ট্রেলিয়ার মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে জনবসতি তেমন ঘন নহে। অল্প বৃষ্টিপাত ও পার্বত্য এলাকায় জনবসতি খুবই কম। বর্তমানে এই অঞ্চলের বর্ধিত জনসংখ্যা একটি বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বের সর্বাধিক জনবসতি মৌসুমী অঞ্চলে দেখা যায়।

মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে নানা ধরনের মৃত্তিকা আছে। ইহাদের মধ্যে নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে পলিসমৃদ্ধ মৃত্তিকা, কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অতিশয় উর্বর। কৃষিকার্যই এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান উপজীবিকা। নদী-উপত্যকায় কৃষিকার্য যেমন সহজ তেমনি লাভজনক। স্থানে স্থানে মূল্যবান খনিজ সম্পদও পাওয়া যায়। ফলে এই অঞ্চলে শ্রম-শিল্পের প্রসার ঘটিতেছে। তৃণভূমির অভাব হেতু পশু-চারণ শিল্পের অগ্রগতি ঘটে নাই।

বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে এই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার কৃষিজ দ্রব্য, যথা—ধান, গম, যব, ভুট্টা, ডাল, তামাক, তুলা, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। পাট উৎপাদনে ভারত ও বাংলাদেশের আধিপত্য উল্লেখযোগ্য। পর্বতের ঢালে চা, কফি, রবার, সিন্‌কোনার আবাদ দেখা যায়। এই অঞ্চলে এক সময়ে জীবিকা সত্তাভিত্তিক কৃষির প্রাধান্য ছিল। বর্তমানে জমির উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ পড়ায় ভারত, চীন, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি অঞ্চলে কিছু কিছু নিবিড় কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে। কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার ও সঙ্কর বীজ ব্যবহারের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইতেছে। চা, পাট, কফি, ইক্ষু প্রভৃতি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। বনজ সম্পদের মধ্যে ব্রহ্ম ও থাইল্যাণ্ডের মেহগিনি, সেগুন কাষ্ঠ উল্লেখযোগ্য। খনিজ সম্পদের মধ্যে ভারতের কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, চুনাপাথর, খনিজ তৈল প্রভৃতি, ব্রহ্মদেশের খনিজ তৈল ও টিন, চীনের কয়লা, লৌহ ইত্যাদি সহজলভ্য হওয়ার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে এই অঞ্চলে যন্ত্র-শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে। ভারত, চীন, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন ভারী শিল্প যেমন—লৌহ ইস্পাত, কার্পাস বয়ন, ইক্ষু, পাট, সিমেণ্ট, রাসায়নিক সার, ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে।

কৃষি ও শিল্পের দিক্‌ হইতে এই অঞ্চলের দেশগুলির যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা থাকার ফলেই এই অঞ্চলকে 'প্রাচুর্য ও উদ্বৃত্তের দেশ' (Regions of Abundance and Surplus) বলা হয়। আবার এই অঞ্চলের দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতেছে বলিয়া এই অঞ্চলকে 'বৃদ্ধির অঞ্চল' (Regions of Increment) বলা হয়। এই অঞ্চলে কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য—ভবিষ্যতের বিরাট শিল্প সম্ভাবনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রসার আজিও এই অঞ্চলের সর্বত্র সমানভাবে হয় নাই। ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার ঘটিতেছে। এই অঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ অতিরিক্ত হইলেও শ্রমিকের প্রাচুর্য ও বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা তথা বাজার অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতির ফলে ইতিমধ্যেই এই অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়াছে। ভবিষ্যতে মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল বিশ্বের অন্যান্য শিল্পোন্নত অঞ্চলের সমকক্ষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

[প্রশ্ন : (১) ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (২) পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশ ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত ? (৩) এই জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য কি কি ? (৪) মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে এই জলবায়ুর প্রভাব সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (৫) "মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ।"—উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।]

উষ্ণমণ্ডলের মধ্যভাগের নিম্নভূমির ক্রান্তীয় জলবায়ু বা সুদান বা সাভানা আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল

(Tropical Climatic Region of the Tropical Central Low Lands or Sudan or Savana Type of Climatic Region)

উষ্ণমণ্ডলে মহাদেশসমূহের মধ্যভাগে বৃষ্টিপাতের স্বল্পতাহেতু বিস্তীর্ণ তৃণভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। আফ্রিকার সুদান অঞ্চলে এই তৃণভূমি ও উহার উপযোগী জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ইহাকে সুদান আদর্শের জলবায়ু বলা হলা হয়। আবার সাভানা তৃণভূমির নাম অনুযায়ী ইহাকে সাভানা আদর্শের জলবায়ুও বলা হয়।

অবস্থান (Location) : উষ্ণ মণ্ডলের ক্রান্তীয় অঞ্চলে মহাদেশসমূহের মধ্যভাগে ১০° হইতে ২৫°—৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত দেশগুলির সমগ্র বা

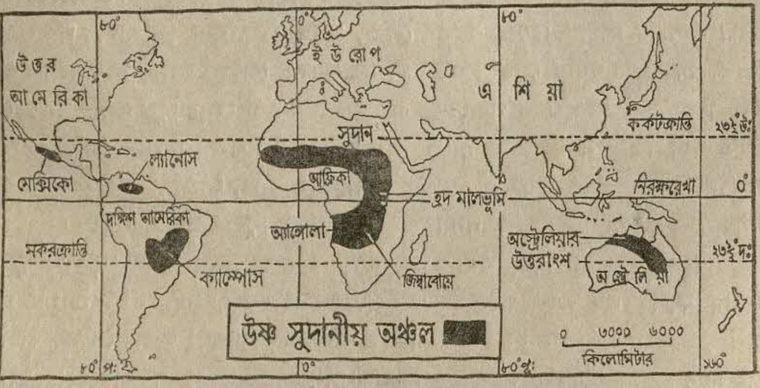

চিত্র ৩.৭ : উষ্ণ সুদানীয় অঞ্চল।

অংশবিশেষ এই প্রকার জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত। আফ্রিকা মহাদেশেই এই সাভানা অঞ্চল একটি ছেদহীন বলয়রূপে নিরক্ষরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে বিস্তৃত। দক্ষিণ আমেরিকায় ইহা বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। দক্ষিণ আমেরিকায়—ভেনেজুয়েলা রাজ্যের ওরিনকো

নদীর অববাহিকা, আর্জেণ্টিনার পারানা-প্যারাগুয়ে অববাহিকা, আফ্রিকার সুদান, উগাণ্ডা, কেনিয়ার পশ্চিমাংশ, উত্তর রোডেশিয়া, চ্যাড, সিয়েরা লিওন ; অস্ট্রেলিয়ার উত্তর টেরিটরি ও কুইন্সল্যাণ্ডের অংশবিশেষ এই জলবায়ু পরিমণ্ডলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলটি প্রধানত নিরক্ষীয় বনভূমি ও পশ্চিম প্রান্তীয় মরুভূমির মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত একটি বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। মধ্যে মধ্যে মৌসুমী অঞ্চলের কিছু কিছু উদ্ভিজ্জ দেখা গেলেও ইহা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে উষ্ণমণ্ডলীয় তৃণভূমি। প্রত্যেক মহাদেশেই এই তৃণভূমির একটি স্থানীয় নাম আছে, যেমন—আফ্রিকায় সাভানা (Savana), রোডেশিয়া অঞ্চলে পার্কল্যাণ্ড (Parkland), দক্ষিণ আমেরিকায় ওরিনকো নদীর অববাহিকায় ল্যানোস (Llanose), ব্রাজিলের দক্ষিণ অংশে ক্যাম্পস (Campos), আর্জেণ্টিনার উত্তরাংশে এল্ গ্রান চাকো (El Gran Chaco), অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলে সাভানা (Savana)।

জলবায়ু (Climate): নিরক্ষীয় অঞ্চলের উত্তরে ও দক্ষিণে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমিতে থাকে। তথাপি নিরক্ষীয় অঞ্চল-সংলগ্ন স্থানে জুন হইতে আগস্ট মাসের মধ্যে পরিচলন বৃষ্টি (Convectional Rain) হয়। মরু অঞ্চলের দিকে প্রসারিত উত্তাপও বেশী, বৃষ্টিপাত কম। দিবা-রাত্রির উষ্ণতার পার্থক্য অধিক, প্রায় ১১° সে.। এই অঞ্চলের বার্ষিক গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপের পরিমাণ প্রায় ২৭° সে. হইতে ৩৩° সে.। কিন্তু শীতকালে এই গড় উত্তাপ ১০° সে. হইতে ১৫° সে.। অর্থাৎ শীত ও গ্রীষ্মে উত্তাপের পার্থক্য প্রায় ১৭° সে। বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রায় ১০০ সে.মি। কিন্তু

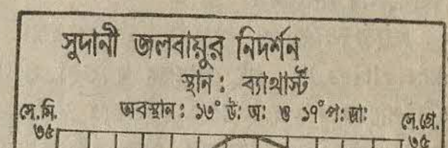

চিত্র ৩.৮ : সুদানী জলবায়ুর নিদর্শক।

নিরক্ষীয় বৃত্তের সংলগ্ন অঞ্চলে ইহা প্রায় ১৬৫ সে.মি.। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয়। শীতকাল শুষ্ক ও উজ্জ্বল। জুলাই হইতে নভেম্বর মাসের মধ্যে এই অঞ্চলে প্রবল ধূলিঝড় হয়। এই অঞ্চলে বৎসরে দুইটি ঋতুর মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। শীতকাল—শীতল ও শুষ্ক আবহাওয়া, গ্রীষ্মকাল—শীতের শেষে শুরু হয়। প্রথম দিক যেমন উষ্ণ তেমন শুষ্ক। কিন্তু গ্রীষ্মের শেষ দিক উষ্ণ ও

আর্দ্র। অর্থাৎ এই সময়ে উষ্ণতার সামান্য পরিবর্তন ঘটে এবং প্রচুর বর্ষা হয়। মৌসুমী অঞ্চলের মত এই অঞ্চলেও প্রায় সারা বৎসরের বর্ষা এই সময়েই হয়।

(ক) বার্ষিক গড় উত্তাপ—২৩·৬° সে.।

(খ) ,, গড় বৃষ্টিপাত—১·৫০ সে মি.। (গ) উত্তাপের প্রসর—২০·৫৫° সে.।

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু (Vegetation and Biotic Resources): ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলে দীর্ঘ তৃণ জন্মে। তৃণগুলি (৩—৫) মিটার দীর্ঘ হয়। Elephant grass অত্যন্ত ঘন ও দীর্ঘ হয়। ইহার মধ্যে হাতীও অদৃশ্য হইয়া যায়। আফ্রিকার সাভানা অঞ্চলে মাঝে মাঝে বাওবাব (Baobab) নামক এক বিশেষ প্রকারের গাছ জন্মে। ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে প্রচুর আবরী গঁদ উৎপাদনকারী গাছ জন্মে। তৃণভূমিতে জিরাফ, জেব্রা, মরুপ্রায় অঞ্চলে এমু, অস্ট্রিচ (উটপাখি) ও বনভূমি অঞ্চলে সিংহ, চিতাবাঘ প্রভৃতি দেখা যায়। এই অঞ্চলের বিশেষ প্রাণীর মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় তীক্ষ্নদন্তী চিনচিল্লা, ক্যাপিবারা, অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকার সাভানা অঞ্চল পৃথিবীর বিখ্যাত মৃগয়া ক্ষেত্রগুলির অন্যতম।

মনুষ্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Population and Economic Activities): এই অঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণত অম্লধর্মী পেডালফার জাতীয়। বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা হেতু মৃত্তিকার ক্ষয় কম হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের তুলনায় ইহা পশুচারণ ও কৃষিকার্যের পক্ষে কিছুটা উপযোগী। এই কারণে এই অঞ্চলে পশুচারণ ও কৃষিকার্যকে কেন্দ্র করিয়া জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পূর্ব-আফ্রিকায় মাসাই, পশ্চিম আফ্রিকায় হোসান, কেনিয়ায় কিকুয়ু জাতি যাযাবর জীবন ত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়াছে। তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া এই সকল অঞ্চলে গম, ভুট্টা, ইক্ষু, জওয়ার, তামাক, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতির চাষ ক্রমেই বৃদ্ধি করা হইতেছে। কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে বর্তমানে সেচেরও প্রসার ঘটিতেছে। নিয়মিত পরিশ্রম ব্যতিরেকে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করা কঠিন বলিয়া এই অঞ্চলকে পরিশ্রমের অঞ্চল (Region of Effort) বলা হয়।

খনিজ উত্তোলনে এই অঞ্চলের গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা খনিজ তৈল উত্তোলনে উল্লেখযোগ্য। ওরিনকো নদী অববাহিকা ও ম্যারাকাইবো হ্রদের পূর্ব তীরে প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায়। গিয়ানার উচ্চভূমিতে লৌহ আকরিক ও জ্যামেইকাতে প্রচুর বক্সাইট উত্তোলিত হয়। আফ্রিকার জাইরে রাজ্যের কাটাঙ্গা এবং উত্তর রোডেশিয়া অঞ্চলে প্রচুর তাম্র পাওয়া যায়। নাইজেরিয়ায় কিছু টিন ও কয়লা উত্তোলন করা হয়।

এই অঞ্চলে চিনি, তামাক, কুইব্রকো (Quebracho) গাছের ছাল হইতে চামড়া ট্যান করিবার দ্রব্যাদি প্রস্তুতের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ভেনেজুয়েলায় খনিজ তৈল শোধনাগার প্রধান শিল্প। বিশ্বের বাজার হইতে দূরে অবস্থিত এবং যোগাযোগ

ব্যবস্থা উন্নত নহে বলিয়া এই অঞ্চলের উন্নতি খুব মন্থর। তবুও এই অঞ্চল হইতে বিশ্বের বাজারে চামড়া, গঁদ, তামাক, তৈলবীজ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়।

[প্রশ্ন : (১) পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ক্রান্তীয় তৃণভূমির ভিন্ন ভিন্ন নামগুলি উল্লেখ কর। (২) এই তৃণভূমি অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার বর্ণনা কর।]

মধ্যভাগের উচ্চভূমি অঞ্চলের বা বলিভিয়া আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল
(Central Highland Climatic Region or Bolivies Type of Climatic Region)

অবস্থান (Location) : ক্রান্তীয় অঞ্চলের জলবায়ুমণ্ডলের মধ্যে উচ্চ ভূভাগে সাধারণত জলবায়ুর কিছু কিছু তারতম্য দেখা যায়। এই কারণে ক্রান্তীয় মণ্ডলের উচ্চ ভূ-ভাগসমূহকে জলবায়ুর সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একটি উপমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া, এশিয়ার তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে এই ধরনের জলবায়ু দেখা যায়। বলিভিয়ার মালভূমি অঞ্চলে এই জলবায়ু সবিশেষ অনুভূত হয় বলিয়া ইহাকে বলিভিয়া আদর্শের জলবায়ুও বলা হয়।

জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু (Climate, Vegetation and Biotic Resources) : এই অঞ্চলের জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন। সাধারণত শীত অতি দীর্ঘ ও তীব্র। পক্ষান্তরে গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও স্বল্পস্থায়ী। তিব্বত অঞ্চলেই এই ধরনের জলবায়ুর প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু বলিভিয়া অঞ্চলের জলবায়ু শীতপ্রধান নাতিশীতোষ্ণ। উদ্ভিদের মধ্যে মালভূমির উচ্চতা অনুযায়ী বিভিন্ন অংশে গাছ দেখা যায় কিন্তু বেশির ভাগ অঞ্চলই প্রায় বৃক্ষহীন। স্থানে স্থানে তৃণভূমি আছে। বলিভিয়ার তৃণভূমি মণ্টানা (Montana) নামে খ্যাত। তিব্বতের অধিবাসীরা নানা কাজে ইয়াক নামে এক প্রকার পশু ব্যবহার করে। গরু, ছাগল, গাধা, অশ্বেতর জীব, মেষ অধিক সংখ্যায় প্রতিপালিত হয়।

মনুষ্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Population and Economic Activities) : কিছু কিছু তৃণভূমি থাকায় এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের সহিত পশুচারণ-শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। জলবায়ুর কারণেই লোকবসতি খুব কম। একমাত্র নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে লোকবসতি দেখা যায়। উচ্চ অঞ্চল বসতিহীন। জীবন-সংগ্রাম এই অঞ্চলে খুবই কঠোর। খনিজ পদার্থ এই অঞ্চলে কোথাও কোথাও পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যানবাহনের তেমন কোন উন্নত ব্যবস্থা না থাকায় এই সকল সম্পদ আহরণ ও তাহার কার্যকর প্রয়োগ সম্ভবপর হইতেছে না। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে গম, ভুট্টা, ইক্ষু, ফল ইত্যাদি প্রধান। রাজনৈতিক দিক হইতে

তিব্বতের অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় বর্তমানে এই অঞ্চলে কিছু কিছু রাস্তাঘাটের উন্নতি হইয়াছে। বলিভিয়াতে প্রচুর টিন পাওয়া যায়।

[প্রশ্ন : (১) বলিভিয়া কোথায় অবস্থিত ? এখানকার তৃণভূমি কি নামে পরিচিত ? (২) তিব্বতে কোন্ কোন্ পশু পালন করা হয় ? (৩) বলিভিয়া জলবায়ু অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রধান বাধা কি কি ?]

পশ্চিম প্রান্তীয় মরু অঞ্চলের জলবায়ু বা সাহারা আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল

(Western Marginal Hot Desert or Sahara Type of Climatic Region)

মহাদেশসমূহের পশ্চিম প্রান্তে প্রাকৃতিক কারণে বিস্তীর্ণ মরুভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। আফ্রিকার সাহারা মরু অঞ্চলের জলবায়ু মরু জলবায়ুর আদর্শ বলিয়া এই জলবায়ুকে সাহারা আদর্শের জলবায়ুও বলা হয়। পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় চারি ভাগের একভাগ অঞ্চল জুড়িয়া এই সকল মরু অঞ্চল অবস্থিত।

অবস্থান (Location) : ক্রান্তিবৃত্তের উভয় পার্শ্বে প্রায় ১৫° হইতে ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষরেখা দ্বারা আবদ্ধ উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে মহাদেশগুলির পশ্চিম প্রান্তে এই প্রকার জলবায়ু দেখা যায়। এই অঞ্চলেই পৃথিবীর উষ্ণ মরু অঞ্চলগুলির অবস্থান।

উত্তর গোলার্ধে—এশিয়া মহাদেশে আরবের মরুভূমি, উত্তর-পশ্চিম ভারতের থর মরুভূমি ; উত্তর আমেরিকায়—কলোরাডো ও মেক্সিকো মরুভূমি ; উত্তর আফ্রিকায় সাহারা মরুভূমি।

দক্ষিণ গোলার্ধে—দক্ষিণ আফ্রিকার কালাহারি মরুভূমি, দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা মরুভূমি ; অস্ট্রেলিয়ায়—মধ্য ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি।

জলবায়ু (Climate) : এই মরু অঞ্চলগুলির সকলই মহাদেশগুলির পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। পৃথিবীর উভয় গোলার্ধে ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় হইতে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে যে আয়ন বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা সর্বদাই এই মরু অঞ্চলের উপর দিয়া পার্শ্ববর্তী সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। কখনও সমুদ্রের দিক হইতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু এই অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় না। স্থলভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ু শুষ্ক ও উষ্ণ থাকে। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ৩৩° সে. এবং শীতকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ১৫° সে.। মরু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না। কোথাও বৎসরে ৩০ সে.মি.-এর বেশী বৃষ্টিপাত হইতে দেখা যায় না। কোন কোন অঞ্চলে পরপর তিন চারি বৎসর বৃষ্টিপাত হয় না। আকাশ সারা বৎসর মেঘমুক্ত থাকে। সূর্যকিরণ প্রখর ও প্রচুর। তাপ বিকিরণ

দ্রুত হয় বলিয়া রাত্রি অত্যন্ত শীতল। গ্রীষ্ম অত্যন্ত উষ্ণ, শীত অত্যন্ত তীব্র। এক কথায় জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। দিবারাত্রি ও শীত-গ্রীষ্মের উত্তাপের পার্থক্য

চিত্র ৩.৯ : উষ্ণ মরুদেশীয় অঞ্চল ও মধ্যভাগের মরুভূমি অঞ্চল।

অত্যন্ত বেশী। মরু অঞ্চলের সমুদ্রপ্রান্তীয় স্থানগুলির জলবায়ু কিছুটা মৃদু। মরু অঞ্চলে প্রায়ই বালুর ঝড় হয়। সাহারা অঞ্চলে এই ঝড়কে **'সাইমুম'** বলে।

মরু জলবায়ুর নিদর্শন

স্থানের নাম	অবস্থান	বৃষ্টিপাত	সর্বোচ্চ উত্তাপ	সর্বনিম্ন উত্তাপ	প্রসর
(১) জেকোবাবাদ	পাকিস্তান	১২ সে. মি.	৩৭° সে.	১৪°০ সে.	২৩° সে.
(২) কায়রো	সাহারা-সংলগ্ন আরব সাধারণতন্ত্র	৩·৩০ সে মি.	৩৩° সে.	১৫·৫° সে.	১৮° সে.
(৩) ইকুইক	আটকামা মরু অঞ্চল	বৃষ্টিহীন			
(৪) বাগদাদ	আরব মরু সংলগ্ন ইরাক	২ সে. মি.	৩৫° সে.	১·৭° সে.	৩৪° সে.

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু (Vegetation and Biotic Resources): মরু অঞ্চলের প্রান্তদেশে প্রথমে কিছু কিছু তৃণগুল্ম দেখা গেলেও ধীরে ধীরে ছোট ঝোপ ও কাঁটা গাছ ঐ তৃণগুল্মের স্থান নেয় এবং মরুভূমির অভ্যন্তরে কোথাও ধু ধু বালু কোথাও পাথরের রুক্ষতা ছাড়া কিছু দেখা যায় না। এই অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের মধ্যে ফণিমনসা (Cactus), বাবলা (Acacia), ইউকা, উট কাঁটা, সেজ গুল্ম এবং খেজুর গাছই প্রধান। মরুভূমিতে উট ও উটপাখী প্রধান জীব। কোথাও কোথাও শৃগালজাতীয় একপ্রকার জীবও দেখা যায়। মরু অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য একমাত্র বাহন উট। এই কারণে উটকে মরুভূমির

জাহাজ বলা হয়। মরুভূমিতে কোথাও কোথাও জলের উৎস দেখা যায়। এই সকল স্থানে খেজুর গাছ জন্মে এবং কিছু কিছু চাষ-আবাদও হয় ; ধান, ভুট্টা, তুলা, আখ, তামাক ইত্যাদির চাষ হয় ; কিছু কিছু লোক বাস করে এবং উট, ঘোড়া, গরু, ছাগল প্রভৃতি পশুও প্রতিপালন করে। এই সকল স্থানকে মরূদ্যান (Oasis) বলে।

মনুষ্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Population and Economic Activities) : মরু অঞ্চলের চরম জলবায়ু মনুষ্যবাসের অযোগ্য, ফলে লোক-বসতি অতি নগণ্য। তথাপি কিছু যাযাবরজাতীয় লোক বিভিন্ন মরু অঞ্চলের প্রান্তে বাস করে। প্রকৃতির রুক্ষ পরিবেশে তাহারা আকৃতি ও প্রকৃতিতে খুবই রুক্ষ ও কঠোর হয়। তাহারা অনেক সময় লুঠতরাজ ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। অঞ্চলভেদে এই মরু অঞ্চলের যাযাবর অধিবাসীরা বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন—আরব অঞ্চলে বেদুইন, সাহারা অঞ্চলে ট্যুরেগ (Touregs), কালাহারি অঞ্চলে বুশম্যান ইত্যাদি। কোনও কোনও অঞ্চলে অধিবাসীরা বিষাক্ত তীরের সাহায্যে পশু শিকার করে এবং কাঁচা ও পচা মাংসও খায়। তাহারা ক্যারস (Karos) নামক এক প্রকার পশুচর্ম-নির্মিত পোশাক ব্যবহার করে। এই অঞ্চলে জীবনযাত্রা দুর্বিষহ বলিয়া এই অঞ্চলকে স্থায়ী কষ্টের অঞ্চল (Regions of lasting difficulty) বলা হয়।

মরু অঞ্চলে বিশেষ করিয়া দক্ষিণ গোলার্ধে কোথাও কোথাও মূল্যবান খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। যেমন—চিলির আটকামা অঞ্চলে নাইট্রেট ও তামা, পেরুর ফালি মরু অঞ্চলে খনিজ তৈল, আফ্রিকার কালাহারি অঞ্চলে হীরক, পশ্চিম অস্ট্রেলিয় মরু অঞ্চলে স্বর্ণ (কালগুর্লি ও কুলগার্ডি), লৌহ আকরিক (আয়রন ওর), আরবের মরু অঞ্চলে (সৌদি আরব, ইরাক, ইরাণ) খনিজ তৈল পাওয়া যায়। খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতেই লোকবসতি দেখা যায়। খনিজ সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে এই সকল অঞ্চলে ধীরে ধীরে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটিতেছে। মধ্য প্রাচ্যের খনিজ তৈল শোধনাগার মিশরের চিনি ও বস্ত্র শিল্প, দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সান ডিয়েগোতে বিমানপোত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল অঞ্চলে বহুদূরবর্তী স্থান হইতে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় জল সরবরাহ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে খনির কাজ শেষ হইয়া গেলে ঐ সকল স্থান পরিত্যক্ত হয়। মরু অঞ্চলে পরিবহণ-সমস্যা অতি তীব্র। বালুকাময় প্রান্তরের উপর রেলপথ, সড়কপথ নির্মাণ দুরূহ। জলের সমস্যাও দুর্লঙ্ঘ্য। এই সকল অঞ্চল পার্বত্য অঞ্চলের মতই সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের বিরাট অন্তরায়। কিন্তু বর্তমানে এই অঞ্চলে খনিজ উত্তোলন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক শিল্পের প্রসার ঘটায় সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিতেছে। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

[প্রশ্ন : (১) অবস্থান উল্লেখ করিয়া পৃথিবীর উষ্ণ মরুভূমিগুলির নাম লিখ। (২) মরুভূমি অঞ্চলের জলবায়ু বর্ণনা কর। (৩) বেদুইন, ট্যুরেগ, বুশম্যান ইত্যাদি জাতিরা কোন্ কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী? ইহাদের জীবন-যাত্রা কিরূপ? 'সাইমুম' কাহাকে বলে?]

পূর্বপ্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ বা চৈনিক আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল
(Eastern Marginal Temparate Region or China Type of Climatic Region)

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের পূর্বপ্রান্তে যে বিশেষ ধরনের জলবায়ু দেখা যায়, তাহাকে পূর্বপ্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বলে। চীন দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই প্রকার জলবায়ু দেখা যায় বলিয়া ইহাকে চৈনিক-আদর্শের জলবায়ুও বলা হয়।

অবস্থান (Location) : উষ্ণ-নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে ৩০° হইতে ৪৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে মহাদেশসমূহের পূর্বপ্রান্তে এই ধরনের জলবায়ু বিদ্যমান। এই অঞ্চলে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত অনেকটা মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অনুরূপ। এশিয়া মহাদেশে—উত্তর ও মধ্য চীন, কোরিয়া ও জাপানের অংশ ; উত্তর আমেরিকায়—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ; দক্ষিণ আমেরিকায়—দক্ষিণ-পূর্ব ব্রাজিল, উরুগুয়ে ; আফ্রিকায়—দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলনের অন্তর্গত নাটাল উপকূল এবং অস্ট্রেলিয়ায়—প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল প্রভৃতি এই জলবায়ুর অন্তর্গত।

জলবায়ু (Climate) : এই জলবায়ু কিছুটা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। সমুদ্রোপকূলের তুলনায় দেশের অভ্যন্তর ভাগ অনেকটা উষ্ণ। অভ্যন্তর ভাগের উষ্ণতার জন্য আয়ন বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং শীতকালে প্রত্যায়ন বায়ুর প্রভাবেও স্থানে স্থানে কিছু পরিমাণ বৃষ্টিপাত ঘটে। ক্রান্তি বৃত্তের সংলগ্ন

চিত্র ৩.১০ : পূর্ব প্রান্তীয় চৈনিক জলবায়ু অঞ্চল।

এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ ও আর্দ্র বলিয়া ইহাকে আর্দ্র উপক্রান্তীয় জলবায়ুও বলা হয়। এই অঞ্চলের গ্রীষ্ম ও শীতকালীন গড় উত্তাপ যথাক্রমে

১৭° সে—২১° সে. এবং ১০° সে.। কোথাও ইহা ১° সে-এর নিচে নামিয়া আসে। অর্থাৎ এই অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রার তারতম্য মৌসুমী অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী। এই অঞ্চলে প্রায়ই প্রবল ঘূর্ণিবাতাস হইয়া থাকে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার নাম বিভিন্ন। যেমন, চীন ও জাপান অঞ্চলে টাইফুন, অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাংশে সাদার্ন বাস্টার, ভিক্টোরিয়ায় ব্রিকফিল্ডার্স, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাংশে নর্দার এবং ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনায় প্যাম্পেরো ও জোন্ডা ইত্যাদি।

এই ঘূর্ণিবাত্যা অনেক সময় বিরাট বিধ্বংসী আকার ধারণ করে এবং জীবন ও সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি করে। নিম্নে এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুর নিদর্শন দেখানো হইল—

স্থানের নাম	অবস্থান	বার্ষিক উত্তাপ			বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড়
		সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	প্রসর গড়	
সাংহাই (চীন)	৩১°১৫° উঃ অঃ	৩° সে.	২৭° সে.	২৪° সে.	১১৬ সে. মি.
চার্লসটন (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)	৩২°৪৮° উঃ অঃ	সে. ১০° সে.	২৮° সে.	১৮° সে.	১১৯ সে. মি.
সিডনি (অস্ট্রেলিয়া)	৩৩°৫৫ দঃ অঃ	১১° সে.	২২° সে.	১১° সে.	১১৯ সে. মি.

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু (Vegetation and Biotic Resources): মৌসুমী অঞ্চলের ন্যায় এই জলবায়ুতেও প্রচুর বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে দেখা যায় পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য। আবার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে কিছু সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। শাল, কর্পূর, ওক, পাইন, ফার, বীচ, মেপল, চেস্টনাট, ওয়াল নাট (আখরোট), নানা ধরনের পরগাছা, বাঁশ এই অঞ্চলের অরণ্যে প্রচুর জন্মে। এই অঞ্চলের অরণ্যে বাঘ, হাতি, গণ্ডার আছে। তৃণভূমিতে গরু, ঘোড়া, মহিষ, গাধা, প্রচুর পালিত হয়। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে শূকরও প্রতিপালিত হয়।

মনুষ্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Population and Economic Activities): পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশ চীনের বিস্তীর্ণ অংশ ও জাপানের কিয়দংশ এই জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা রক্ত ও পীতবর্ণের পেডালফারজাতীয়, অনুর্বর। কিন্তু নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে উর্বর মৃত্তিকা থাকায় প্রচুর কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের সহজ সুযোগ আছে। ইহা ছাড়া কৃত্রিম সার প্রয়োগের দ্বারা অনুর্বর অংশেও প্রচুর ফসল ফলানো সম্ভব হইতেছে। কৃষি-পণ্যের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সয়াবীন এই অঞ্চলের একটি বিশেষ কৃষিজ ফসল। এখানে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে রেশমকীটের জন্য তুঁত গাছের চাষ হয়। স্থানে স্থানে তুলা, চা ও আনারসের চাষও হয়। কৃষি ও পশুপালন এই

অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। পশুপালনের সুযোগ থাকায় দুগ্ধ শিল্পও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। এই অঞ্চলের নদীগুলি নাব্য হওয়ায় পরিবহণের উপযোগী। রেলপথ ও সড়কপথে যোগাযোগ ব্যবস্থাও এই অঞ্চলে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই সকল কারণে এই অঞ্চলে শ্রমশিল্পের প্রসার ঘটিতেছে। জাপানের দক্ষিণাংশ, আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চীনের উপকূল অঞ্চলে নানা ধরনের শিল্প সন্নিবেশ অর্থনৈতিক দিকে এই অঞ্চলের উন্নতির পরিচায়ক। জাপানে লৌহ-ইস্পাত, কার্পাস, রেশম ও সার শিল্প, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে লৌহ-ইস্পাত, কার্পাস, সার, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প ইত্যাদি বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ আরও সম্ভাবনাময়।

[প্রশ্ন : (১) পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশ চৈনিক আদর্শের জলবায়ুর অন্তর্গত? এই জলবায়ু অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে ঝড়ের নামগুলি উল্লেখ কর। (২) এই জলবায়ু অঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।]

অন্তর্দেশীয় উষ্ণ তৃণভূমি বা স্তেপ আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল (Interior Tropical Grass Land or Steppe Type of Climatic Region)

অবস্থান (Location) : মহাদেশসমূহের মধ্যভাগে প্রায় ৩০°—৪৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন স্থান এই জলবায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত। ইউরেশিয়ার মধ্যভাগের তুরান বা তুর্কিস্তান, ইউরোপের মধ্যাঞ্চলের ড্যানিউব অববাহিকা, রুমানিয়া ও হাঙ্গেরী, উত্তর আমেরিকার কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টিনার উত্তর-মধ্যাংশ, অস্ট্রেলিয়ার মারেডার্লিং নদীর অববাহিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার মালভূমি প্রভৃতি স্থানে এই প্রকার জলবায়ু দেখা যায়।

জলবায়ু (Climate) : মহাদেশসমূহের মধ্যভাগে এবং দুই পার্শ্বের সমুদ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া এই অঞ্চলের জলবায়ু অনেকটা চরমভাবাপন্ন। শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র। গ্রীষ্মকাল স্বল্পস্থায়ী ও উষ্ণ। গ্রীষ্মকালীন উত্তাপের গড় প্রায় ২৭° সে.। শীতকালে উত্তাপ প্রায় হিমাঙ্কের নিচে নামিয়া যায়। শীত-গ্রীষ্মের উত্তাপের প্রসর খুবই বেশী। অবশ্য উত্তর গোলার্ধের তুলনায় দক্ষিণ গোলার্ধে ইহা অপেক্ষাকৃত কম। দিবারাত্রির তাপের পার্থক্যও বেশ বেশী।

এই অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০ সে.মি.। স্থানে স্থানে বৃষ্টিপাত ২৫ সে.মি.-৩০ সে.মি. এবং ৭০ সে.মি.-৭৫ সে.মি হইয়া থাকে। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মের প্রথম দিকেই সাধারণত হয়। এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি সর্বত্র সমান নহে। নিম্নভূমি, মালভূমি ও পার্বত্যভূমি ইতস্তত দেখা যায়, এই অঞ্চলের বৃষ্টিবিরল স্থানসমূহের জলবায়ু ও উদ্ভিদ মরুপ্রায় অঞ্চলের অনুরূপ। এই অঞ্চলে তৃণভূমিই প্রধান। রুশ ভাষায় বৃক্ষহীন তৃণভূমিকে স্তেপ বলে এবং মধ্য এশিয়ার রুশ অঞ্চলে এই জলবায়ু বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় বলিয়া ইহাকে স্তেপ আদর্শের জলবায়ু বলা হয়।

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু (Vegetation and Biotic Resources) : স্বল্প বৃষ্টিপাত ও চরম ভাবাপন্ন জলবায়ুর ফলে বিস্তীর্ণ তৃণভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের তৃণাঞ্চলে বৃক্ষ দেখা যায়, কিন্তু এই তৃণভূমিতে বৃক্ষ দেখা যায় না। ক্রান্তীয় অঞ্চলের তৃণের তুলনায় ইহা নরম ও আকারে ছোট। শীতকালে বরফ পড়ে এবং সমস্ত তৃণভূমি শুষ্ক আকার ধারণ করে। বসন্তে বরফ গলিয়া গেলে দিকে দিকে সবুজের ঢেউ খেলিয়া যায়। গ্রীষ্মকালে তৃণ শুকাইয়া পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে। বিভিন্ন মহাদেশে এই তৃণভূমি বিভিন্ন স্থানীয় নামে পরিচিত। যেমন—ইউরেশিয়ায় স্তেপ (Steppes), উত্তর আমেরিকায় প্রেইরিজ (Prairies), দক্ষিণ আমেরিকায় প্যাম্পাস (Pampas), দক্ষিণ আফ্রিকায় ভেল্ড (Veld) এবং অস্ট্রেলিয়ায় ডাউন্‌স (Downs)।

এই তৃণাঞ্চলে বহুপ্রকার তৃণভোজী পশু, যেমন—গরু, ঘোড়া, গাধা, মেষ, উট প্রভৃতি চরিয়া বেড়ায়। কিছু মাংসাশী হিংস্র প্রাণীও দেখা যায়।

মনুষ্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Population and Economic Activities) : তৃণভূমি অঞ্চলে অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা একদিন ছিল পশুপালন ও পশুশিকার। এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা স্তেপ অঞ্চলে কিরঘিজ, কাজাক, প্রেইরি অঞ্চলে রেড ইণ্ডিয়ান ও আর্জেণ্টিনায় গোচা নামে পরিচিত। বর্তমানে এই তৃণভূমি, পরিষ্কার করিয়া কৃষির প্রসার ঘটানো হইয়াছে। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা ক্ষারযুক্ত 'পেডোক্যাল' শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা উর্বর জৈব সারসমৃদ্ধ। ইহাকে 'সারনোজেম' বলা হয়। কৃষির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। গম এই অঞ্চলের প্রধান শস্য। বীট, যব, ভুট্টা, রাই প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয়। গম উৎপাদনে ও রপ্তানিতে ইহা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বলিয়া ইহাকে পৃথিবীর শস্যভাণ্ডার (Granaries of the World) বলা হয়। লোকবসতি এখনও খুবই কম। কৃষিদ্রব্য ছাড়াও এতদঞ্চলে পশুর মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, পশম, চামড়া, হাড়, শিং প্রভৃতি জিনিসকে কেন্দ্র করিয়া নানা ধরনের হাল্কা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ-শিল্পও উত্তর আমেরিকায় ও সোভিয়েট ইউনিয়নে গড়িয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো, মিলওয়াকি, কানাডার উইনিপেগ উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র। রেলপথ, সড়কপথ নির্মাণ সহজ এবং বিশ্বের অন্তর্মহাদেশীয় দীর্ঘতম রেলপথগুলি, যেমন—রাশিয়ার ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ, কানাডার কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথ প্রভৃতি এই মধ্যাঞ্চলের তৃণভূমির উপর দিয়াই বিস্তৃত। খনিজ দ্রব্যের অভাব, এই কারণে শিল্প সংগঠনের সম্ভাবনা বিরল।

[প্রশ্ন : (১) বিভিন্ন মহাদেশে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলগুলির নাম কর। (২) এই অঞ্চলের জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (৩) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিগুলিকে কিভাবে ব্যবহার করা হইতেছে ?]

অন্তর্দেশীয় উচ্চভূমি বা ইরাণ আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল
(Interior High Land or Iran Type of Climatic Region)

মধ্য অক্ষাংশের অর্থাৎ ৩০° হইতে ৪৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে মহাদেশসমূহের অভ্যন্তরে অবস্থিত উচ্চ ভূভাগে এই প্রকার জলবায়ু দেখা যায়।

অবস্থান (Location): এশিয়ার ইরাণ, বেলুচিস্থান, মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত গোবিমরুভূমি, উত্তর আমেরিকার মধ্য মেক্সিকো, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমের উটা, নেভাডা, ইডাহো প্রভৃতি রাজ্য, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনার পশ্চিম ভাগ ইত্যাদি এই জলবায়ু পরিমণ্ডলের অন্তর্গত।

জলবায়ু (Climate): সমুদ্র হইতে বহুদূরে ও মহাদেশসমূহের মধ্যভাগে অবস্থিত বলিয়া এই অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। শীতের সময় প্রবল শীত এবং গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্মের প্রকোপ বেশী। শীত-গ্রীষ্মে উত্তাপের প্রসর বেশী। এই অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে ভূ-প্রকৃতির তারতম্যের জন্য জলবায়ুর কিছু বিভিন্নতা দেখা যায়। বার্ষিক উত্তাপের গড় ১৬° সে. এবং বৃষ্টিপাত মাত্র ১৬ সে. মি.। গোবি অঞ্চলে শীতকালে বরফ জমিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে ইহার উত্তাপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। এই কারণে ইহা জনশূন্য। ইরাণ, বেলুচিস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে শীত-গ্রীষ্মের তীব্রতা খুব বেশী। পশ্চিম প্রান্তীয় ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রভাবে এই সকল স্থানে শীতকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়।

লোকবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Population and Economic Activities): জলবায়ু প্রতিকূল বলিয়া এই অঞ্চলে তৃণভূমি এবং বৃষ্টিবিরল অঞ্চলে গুল্ম ও ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়। তৃণাঞ্চলে কৃষি ও পশুপালন অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। গরু, ঘোড়া, মেষ, উট প্রতিপালিত হয়। উৎপন্ন কৃষি দ্রব্যের মধ্যে গম, ভুট্টা, বীট, ইক্ষু, তামাক, তুলা ইত্যাদি প্রধান। ইরাণ অঞ্চলের গোলাপ ফুল বিখ্যাত। এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে কিছু খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। ইরাণের খনিজ তৈল, আমেরিকার উটা, নেভাডা অঞ্চলের তাম্র, সীসা, রৌপ্য ও দস্তা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইরাণ অঞ্চলে দক্ষ শ্রমিক ও পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে শ্রমশিল্পের প্রসার ঘটে নাই।

[প্রশ্ন : (১) ইরাণ-আদর্শের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কি ? (২) যথেষ্ট খনিজ তৈল থাকা সত্ত্বেও ইরাণ শ্রমশিল্পে তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই।—ইহার কারণ ব্যাখ্যা কর।]

পশ্চিমপ্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ বা ভু-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল
(Western Marginal Temperate or Mediterranean Climatic Region)

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে মহাদেশসমূহের পশ্চিমপ্রান্তে যে বিশেষ ধরনের জলবায়ু দেখা যায় তাহাকে পশ্চিমপ্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বলা হয়। ভূমধ্যসাগরের উভয়

তীরে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের অঞ্চলবিশেষে এই জলবায়ু বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় বলিয়া ইহাকে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুও বলা হয়।

অবস্থান (Location) : পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে মহাদেশসমূহের পশ্চিম প্রান্তে ৩০° হইতে ৪৫° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত দেশসমূহে এই জলবায়ু দেখা যায়। ইউরোপের ইটালি, দক্ষিণ ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া, বলকান উপদ্বীপ ; আফ্রিকায় আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অন্তরীপ প্রদেশ ; এশিয়ার তুরস্ক, সিরিয়া ইত্যাদি ; উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য ; দক্ষিণ আমেরিকার মধ্য চিলি ; অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে সোয়ান নদী ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে ভিক্টোরিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের কিয়দংশ এই জলবায়ুর অন্তর্গত।

জলবায়ু (Climate) : ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে শুষ্ক আয়ন বায়ু এবং শীতকালে আর্দ্র প্রত্যায়ন বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহার ফলে গ্রীষ্মকালে মেঘমুক্ত আকাশ, উজ্জ্বল সূর্যকিরণ ও আবহাওয়া শুষ্ক থাকে এবং শীতকালে আবহাওয়া আর্দ্র ও মৃদুভাবাপন্ন থাকে। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ৩৩° সে. কিন্তু শীতকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ১০° সে.। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্থানবিশেষে প্রায় ২৫ সে. মি. হইতে ১০০ সে. মি. পর্যন্ত। উষ্ণ মরু অঞ্চলসংলগ্ন অংশে বৃষ্টিপাত প্রায় ১০ সে. মি। কিন্তু প্রত্যায়ন বায়ু-প্রবাহের বিপরীত দিকে পর্বতযুক্ত অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাত

চিত্র ৩.১১ : ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল।

শীতকালেই হয়। এই অঞ্চলে বসন্তকালে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে প্রবল ঝড় হয়। এই ঝড় সিসিলি দ্বীপে ও ইটালিতে সিরোক্কো এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় "ওয়া" নামে পরিচিত। কোন কোন স্থানে শীতকালে একপ্রকার শুষ্ক হাওয়া প্রবাহিত হয়।

দক্ষিণ ফ্রান্সে ইহাকে "সিস্ট্রাল" বলে। এইসব সত্ত্বেও এতদঞ্চলের জলবায়ু অতীব মনোরম ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

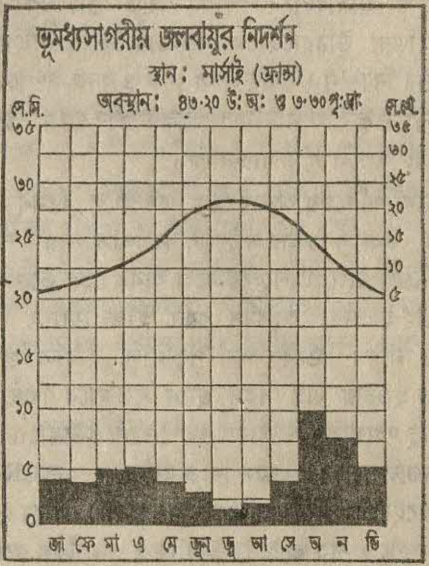

চিত্র ৩.১২ : ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ুর নিদর্শক।

(ক) বার্ষিক গড় উষ্ণতা—১৫° সে.। (খ) বার্ষিক উষ্ণতার প্রসর—১৬°। (গ) বার্ষিক বৃষ্টিপাত—৫৮ সে মি।

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু (Vegetation and Biotic Resources): শীতকালীন বৃষ্টিপাতের ফলে এই অঞ্চলে গাছপালা বৃক্ষলতাদি শীতকালেই বেশি জন্মে। আঙ্গুর ও জলপাই এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উৎপন্ন দ্রব্য। সারা বৎসরই জলপাই পাওয়া যায়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কমলালেবু, আপেল, ন্যাসপাতি, দারিম্ব, বাদাম, পীচ প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বনভূমিতে কর্ক-ওক, পাইন, চেস্টনাট, সিডার, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার কারি ও জারা, পর্তুগালের কর্ক-ওক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রীষ্মকাল শুষ্ক বলিয়া এতদঞ্চলের বৃক্ষের মূল দীর্ঘ হয়। পাতা ও ছাল পুরু ও তৈলাক্ত হয়। এই অঞ্চলে তৃণভূমি কম বলিয়া গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদির প্রতিপালন কম হয়, কিন্তু স্পেনের তৃণভূমিতে মেরিনো মেষ, ছাগ প্রতিপালিত হয়। ঘন বন না থাকায় এতদঞ্চলে হিংস্র পশু কমই দেখা যায়।

মনুষ্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Population and Economic Activities): ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মৃত্তিকা প্রধানত 'পেডোক্যাল' জাতীয় ক্ষারধর্মী। স্থানে স্থানে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের সাহায্যে বাণিজ্যিক কৃষি

সম্ভব হইয়াছে। নিম্ন অঞ্চলের মৃত্তিকা নদীবাহিত পলিসমৃদ্ধ বলিয়া উর্বর। প্রচুর চাষ-আবাদের সহজ সুযোগ থাকায় এই অঞ্চলে লোকবসতি বেশ ঘন। জীবনযাত্রা সহজ ও আরামদায়ক বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই অঞ্চলে মানুষের আবাস গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতা ইহার নিদর্শন। এই অঞ্চল কৃষি ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কৃষি পণ্যের মধ্যে গম, ধান, ভুট্টা প্রভৃতি ও নানাবিধ ফলের চাষ হয়। রেশমকীট প্রতিপালনের জন্য তুঁতের চাষ এই অঞ্চলে খুব লাভজনক।

কয়লা ও অন্যান্য খনিজের অভাব হেতু এতদঞ্চলে তেমন উল্লেখযোগ্য শ্রমশিল্পের বিকাশ ঘটে নাই। তথাপি চিলির নাইট্রেট, ক্যালিফোর্নিয়ার স্বর্ণ ও খনিজ তৈল এবং ইটালির মার্বেল উল্লেখযোগ্য। শিল্পের মধ্যে খনিজ তৈল উত্তোলন ও নিষ্কাশন শিল্পই গুরুত্বপূর্ণ। লৌহ-ইস্পাত, কার্পাস বয়ন, ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি শিল্প এতদঞ্চলে এখনও গড়িয়া উঠে নাই। তবে স্পেন, পর্তুগাল, ইটালি প্রভৃতি দেশ শিল্পোন্নত ইউরোপের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই সকল স্থানে বর্তমানে কিছু কিছু শিল্পের প্রসার ঘটিতেছে। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও আরামপ্রদ হওয়ায় ইউরোপের বহু ভ্রমণকারী অবসর যাপনের জন্য এতদঞ্চলে আসে। ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরা (French Reviera) ভ্রমণকারীদের স্বর্গ। এই অঞ্চলে হোটেলের ব্যবসা খুবই লাভজনক। ইহা ছাড়া উজ্জ্বল সূর্যকিরণ থাকায় সিনেমা-শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে ইটালিতে ও মার্কিন (আমেরিকা) যুক্তরাষ্ট্রের হলিউডে। এই অঞ্চল ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

[প্রশ্ন : (১) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে পরিলক্ষিত হয়? ঐ অঞ্চলগুলি মহাদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত হইবার কারণ কি? (২) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। কোন্ কোন্ কৃষিজাত দ্রব্য ও ফলাদি এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়? (৩) অবস্থান, বৃষ্টিপাত ও অর্থনৈতিক উন্নতির দিক দিয়া ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর সহিত মৌসুমী জলবায়ুর তুলনা কর।]

পূর্বপ্রান্তীয় হিমশীতোষ্ণ বা লরেন্সীয় আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল
(Easternal Marginal Cool Temperate Region or St. Lawrence Climatic Region)

উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সেন্ট লরেন্স নদী অববাহিকা অঞ্চলে এক বিশেষ ধরনের শীতল জলবায়ু লক্ষ্য করা যায়। সেন্ট লরেন্স নদীর নাম অনুযায়ী এই জলবায়ুকে লরেন্সীয় আদর্শের জলবায়ু বলা হয়।

অবস্থান (Location) : উত্তর গোলার্ধে ৪৫° হইতে ৬৬½° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে মহাদেশগুলির পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত দেশগুলি এই জলবায়ুর অন্তর্গত। দক্ষিণ গোলার্ধে মহাদেশগুলি দক্ষিণপ্রান্তে ক্রমশ সরু হইয়া যাওয়ায় এই প্রকার জলবায়ু অঞ্চল খুব কমই দেখা যায়।

উত্তর আমেরিকায় কানাডার পূর্বাংশে, নিউফাউন্ডল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশে, দক্ষিণ আমেরিকায় আর্জেন্টিনার দক্ষিণ-পূর্বাংশে, এশিয়ায় সাইবেরিয়ার নদীর অববাহিকার দক্ষিণাংশে, মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে এই প্রকার জলবায়ু দেখা যায়।

জলবায়ু (Climate) : পশ্চিমা বায়ু-বলয়ের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া দেশের শীতল অভ্যন্তরভাগ হইতে আগত বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে অতি তীব্র শীত অনুভূত হয়। শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী। শীতকালীন গড় উত্তাপ প্রায়ই হিমাঙ্কের ২° সে.—৬° সে. নিচে থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মকালের পূর্ব প্রান্তীয় সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে শীতের তীব্রতা হ্রাস পায়। বার্ষিক উত্তাপের গড় প্রায় ১৫° সে.—২০° সে.। গ্রীষ্মকাল স্বল্পস্থায়ী। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫০ সে.মি.—১০০ সে.মি.। এতদঞ্চলে প্রায় প্রতি মাসেই সামান্য সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। শীত তীব্র হওয়ায় নদী ও পোতাশ্রয়গুলি অনেক সময় বরফে আবৃত থাকে এবং স্থানে স্থানে তুষারস্তূপ জমিয়া থাকে।

লরেন্সীয় জলবায়ুর নিদর্শন

স্থানের নাম	অবস্থান	সর্বনিম্ন উত্তাপ	সর্বোচ্চ উত্তাপ	প্রসর	গড় বৃষ্টিপাত
(১) মণ্ট্রীল	কুইবেক প্রদেশ, কানাডা	– ১০·৫° সে.	২১° সে.	৩১° সে.	১০২ সে. মি.
(২) হারবিন	মাঞ্চুরিয়া, চীন	– ১৯° সে.	২১° সে.	৪০° সে.	৫০ সে. মি.

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু (Vegetation and Biotic Resources) : এই অঞ্চলের উষ্ণতর অংশে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য এবং শীতলতর অংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। পাইন, ফার প্রভৃতি বৃক্ষের কাণ্ড দীর্ঘ হয় এবং শীর্ষভাগ মোচার মত হয় বলিয়া ইহাকে সরলবর্গীয় বৃক্ষ বলে। নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যে ওক, বীচ প্রভৃতি গাছ জন্মে। এই সকল বনে শ্বেত শৃগাল, শ্বেত ভল্লুক, আরমিন, বীবর, সেবল্ প্রভৃতি লোমশ প্রাণী বাস করে। ইহাদের লোম, চামড়া প্রভৃতি দেশ-বিদেশে চালান দেওয়া হয়।

মনুষ্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Population and Economic Activities) : এই অঞ্চলের বৃষ্টিবহুল স্থানের মৃত্তিকা অনেকটা অম্লধর্মী পেডালফারবর্গীয়। কিন্তু বৃষ্টিবিরল অঞ্চলে মৃত্তিকা ক্ষারধর্মী পেডোক্যালজাতীয়। কোথাও কৃষ্ণ ও বাদামী রঙের উর্বর মৃত্তিকাও দেখা যায়। এই অঞ্চলে শীতের তীব্রতাহেতু জনবসতি ঘন নহে। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, কোরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ঘটায় জনবসতি কিছু ঘন দেখা যায়। এই অঞ্চলে অনেক বনভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিক্ষেত্র ও পশুচারণক্ষেত্র তৈয়ার করা হইয়াছে।

কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে গম, যব, রাই, ওট, সয়াবীন প্রধান। বনভূমি হইতে প্রচুর কাষ্ঠসম্পদ আহরণ করা হয়। ঐ কাষ্ঠের সাহায্যে কানাডা প্রভৃতি অঞ্চলে কাগজের মণ্ড, রেয়ন প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। খনিজ সম্পদের অভাবে এই অঞ্চলে শিল্পের প্রসার তেমন না হইলেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সীমান্তে নায়গ্রা জলপ্রপাত হইতে উৎপন্ন জলবিদ্যুতের সাহায্যে এই দুই দেশের এই অঞ্চলে কিছু কিছু হালকা শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। জাপানের সহায়তায় মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলেও কিছু শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলে যোগাযোগ-ব্যবস্থা তেমন উন্নত না হইলেও কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই অঞ্চলে রেলপথ, সড়কপথ এবং সেণ্ট লরেন্স নদীর সাহায্যে জলপথের যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছে। মৎস্য আহরণ এই অঞ্চলের মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজীবিকা। এই জলবায়ু মৎস্য চারণক্ষেত্র সৃষ্টির সহায়ক হওয়ায় এই অঞ্চলে প্রচুর মাছ ধরা হয়। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড-এর অদূরে গ্র্যাণ্ডব্যাংক ও জাপানের তীরবর্তী অঞ্চল মৎস্য আহরণের জন্য বিখ্যাত।

অন্তর্দেশীয় নিম্নভূমির জলবায়ু বা সাইবেরিয়া আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল
(Interior Low Land or Siberean Type Climatic Region)

সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত সাইবেরিয়া অঞ্চলে যে চরমভাবাপন্ন মহাদেশীয় জলবায়ু লক্ষ্য করা যায় তাহাকে সাইবেরিয়ার নামানুসারে সাইবেরিয়া আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল বলে।

অবস্থান (Location): মহাদেশসমূহের মধ্যভাগে ৪৫° হইতে ৬৬½° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত স্থানসমূহে এই প্রকার জলবায়ু দেখা যায়—এশিয়ায় সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত সাইবেরিয়ার মধ্যস্থ নিম্ন ভূভাগ, ইউরোপে পোল্যাণ্ড ও জার্মানীর উত্তরাংশ, নরওয়ে ও সুইডেনের অংশবিশেষ, উত্তর আমেরিকায় প্রেইরি অঞ্চলের উত্তরাংশ এবং দক্ষিণ আমেরিকায় দক্ষিণ প্রান্তের সামান্য অংশ। দক্ষিণ গোলার্ধে এই অক্ষাংশে ভূভাগের অভাব বলিয়া সাইবেরীয় আদর্শের জলবায়ু প্রায় দেখা যায় না। এই অঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। ইহার স্থানীয় নাম তৈগা হইতে এই অঞ্চলের জলবায়ুকে তৈগা আদর্শের জলবায়ুও বলা হয়।

জলবায়ু (Climate): মহাদেশসমূহের মধ্যভাগের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাইবেরিয়া অঞ্চলের জলবায়ুও চরমভাবাপন্ন। শীতের তীব্রতা অত্যন্ত বেশী এবং শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী। গ্রীষ্মকাল খুবই স্বল্পস্থায়ী, মাত্র দুই-তিন মাস স্থায়ী। গ্রীষ্মের উষ্ণতা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশী। বার্ষিক গড় উত্তাপ যদিও ৪·৫° সে. তথাপি উত্তাপের প্রসর প্রায় ৪০° সে.। অর্থাৎ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপযুক্ত অঞ্চলের তাপের পার্থক্য এত অধিক আর কোন জলবায়ু-পরিমণ্ডলে দেখা যায় না। বৃষ্টিপাত

অতি সামান্যই হয়। তুষারপাতই এই অঞ্চলে স্বাভাবিক ঘটনা। স্থানে স্থানে ৩০ সে.মি. হইতে ৫০ সে.মি. বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু (Vegetation and Boitic Resources): এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হইলেও বরফ-গলা জলে মাটি সিক্ত থাকে বলিয়া এই অঞ্চলে একপ্রকার দীর্ঘ সরল বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। সূর্যের কিরণ এই অঞ্চলে হেলানভাবে পড়ে। খুবই স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মের জন্য গাছগুলি সূর্যালোক পাইবার জন্য দীর্ঘ হয়। এই বনভূমিতে নানা প্রকার নরম কাষ্ঠ পাওয়া যায়; যেমন—পাইন, ফার, লার্চ, স্প্রুস, হেমলক প্রভৃতি; স্থানে স্থানে কিছু পর্ণমোচী বৃক্ষও দেখা যায়। এই সকল কাষ্ঠ খুবই মূল্যবান ও নানা শিল্পে ব্যবহৃত হয়। শীতল অঞ্চল বলিয়া এই ভূমিতে নানা প্রকার লোমশ প্রাণী বাস করে। ইহাদের মধ্যে সেবল্, আরমিন প্রভৃতি প্রধান। এই বনভূমির উত্তর দিক ক্রমশ ছোট হইয়া বরফাচ্ছাদিত অঞ্চলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

মনুষ্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Population and Economic Activities): উত্তাপের স্বল্পতা হেতু এই অঞ্চলে মনুষ্যবসতি প্রায় নাই। মৃত্তিকা কঙ্করময় ও অম্লধর্মী হওয়ায় কৃষিকার্যের অনুপযোগী। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে সামান্য কিছু মনুষ্য বাস করে। কিছু যব, রাই, আলু, বীট ইত্যাদি চাষ করা হয়। ইহা ছাড়া পশুপালন, কাষ্ঠ আহরণ ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা।

এই অঞ্চলে কাষ্ঠ নরম হওয়ায় উহা দিয়াশলাই শিল্প, কাগজ শিল্প, রেশম শিল্প, জাহাজ শিল্প প্রভৃতি কাজে কাঁচামাল হিসাবে এবং আসবাবপত্র ও রেলের স্লীপার ইত্যাদি কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চলের কাষ্ঠ-শিল্পের উন্নতি লক্ষণীয়। কাষ্ঠ ছাড়া এই বনভূমি হইতে তার্পিন তেল, রজন, কাষ্ঠ-সুরাসার প্রভৃতি ও লোমশ প্রাণীর লোম, চামড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয় এবং বিদেশে রপ্তানি করা হয়। সাইবেরীয় অঞ্চলে ট্রান্স-সাইবেরীয় রেলপথ নির্মাণের পর হইতে কিছু কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে। বর্তমানে ঐ অঞ্চলের উন্নতির জন্য রুশ সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। তুষারপাতের ফলে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত নহে।

অন্তর্দেশীয় উচ্চভূমির বা আলতাই আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল (Interior High Land or Altai Type of Climatic Region)

অবস্থান (Location): ৪৫° হইতে ৬৬½° উত্তর অক্ষাংশে মহাদেশসমূহের মধ্যভাগে উচ্চ ভূভাগ এই জলবায়ু-পরিমণ্ডলের অন্তর্গত। উত্তর আমেরিকার কর্ডিলেরা পার্বত্য অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমাংশ (কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল) ও এশিয়ায় সাইবেরিয়ার আলতাই পার্বত্য অঞ্চলে এই প্রকার জলবায়ু বিশেষভাবে দেখা যায়।

জলবায়ু (Climate): এই অঞ্চলের অবস্থান ও উচ্চতা অনুযায়ী জলবায়ুর তারতম্য আছে। কিন্তু মহাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত হওয়ায় জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। শীতের তীব্রতা খুবই বেশী, প্রায় সারা বৎসরই শীতকাল।

মনুষ্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Population and Economic Activities): উত্তাপের স্বল্পতা, কৃষিজমির অভাব, মৃত্তিকার অনুর্বরতা প্রভৃতি কারণে এই অঞ্চলে কৃষিকার্য সম্ভব নহে। মনুষ্যবসতি প্রায় নাই। খুবই স্বল্প সংখ্যক মানুষ পশু শিকার ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া স্থানে স্থানে বাস করে। সরলবর্গীয় বৃক্ষই প্রধান। ডগলাস, স্প্রুস, ফার, লার্চ প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। আমেরিকার এই অঞ্চলে কিছু খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়ায় ঐ অঞ্চল এশিয়ার সাইবেরীয় অঞ্চলের তুলনায় অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। পশুচারণ ও কাষ্ঠ আহরণ অধিবাসিগণের প্রধান উপজীবিকা। সাইবেরিয়ার উচ্চ ভূভাগে বর্তমানে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু জলবায়ুর প্রতিকূলতার জন্য ঐ অঞ্চলের উন্নতি তেমন দেখা যাইতেছে না। পার্বত্য উপত্যকার কোন কোন স্থানে পার্বত্য নদী হইতে জলসেচের সাহায্যে কিছু যব, রাই, যই ইত্যাদি চাষ করা হয়।

পশ্চিম ইউরোপীয় বা হিমোষ্ণ সামুদ্রিক জলবায়ু বা বৃটিশ আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল

(Western European or Cool Temperate Marine or British Type of Climatic Region)

পশ্চিম ইউরোপ অংশে সমুদ্র প্রান্তীয় দেশসমূহে এই প্রকার জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের নামানুসারে এই জলবায়ুকে **বৃটিশ আদর্শের জলবায়ু** বলা হয়।

অবস্থান (Location): মহাদেশসমূহের পশ্চিম প্রান্তে ৪৫° হইতে ৬৬½° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত দেশসমূহে বা উহাদের অংশবিশেষে এই প্রকার জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। **ইউরোপে**—বৃটিশ যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, সুইডেন, পশ্চিম জার্মানী, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, উত্তর ফ্রান্স, **উত্তর আমেরিকায়**—দক্ষিণ-পশ্চিম কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমাংশ; **দক্ষিণ আমেরিকায়**—দক্ষিণ চিলি ও **ওশেনিয়ায়**—টাসমানিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে এই জলবায়ুর প্রভাব বিদ্যমান।

জলবায়ু (Climate): এই অঞ্চল প্রত্যায়ন বায়ু বা পশ্চিমাবায়ু বলয়ের অন্তর্গত। এই বায়ুপ্রবাহ সারাবৎসর মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সমুদ্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় প্রচুর জলীয় বাষ্প বহন করিয়া আনে। এই কারণে এই সকল স্থানে সারাবৎসরই বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্ম অপেক্ষা শীতকালেই অধিক বৃষ্টিপাত হয়।

অবশ্য সমুদ্র হইতে দূরত্বের উপর ও ভূ-প্রকৃতির উপরই বৃষ্টিপাতের তারতম্য নির্ভর করে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০ সে.মি. হইতে ৭৫ সেন্টিমিটার। বায়ু-প্রবাহের গতিপথে আড়াআড়ি পর্বত থাকিলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সে.মি. হইতে ২৫০ সে.মি. হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের উপকূলভাগে উষ্ণ সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হওয়ায় জলবায়ু যতটা শীতল হওয়া উচিত ছিল ততটা শীতল নহে, বরং মৃদু-শীতল সামুদ্রিক ভাবাপন্ন। বার্ষিক গড় উত্তাপের পরিমাণ প্রায় ১০° সে.। সমুদ্রসন্নিহিত অঞ্চল অপেক্ষা দূরবর্তী অঞ্চলের জলবায়ু অনেকটা চরমভাবাপন্ন। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাসের সহিত উত্তাপের বৃদ্ধি ইহার বৈশিষ্ট্য। এই অঞ্চলে অতি দ্রুত আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে।

চিত্র ৩.১৩ : হিমোষ্ণ সামুদ্রিক জলবায়ু বা বৃটিশ আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল।

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু (Vegetation and Biotic Resources) : এই অঞ্চলে যে সকল স্থানে উচ্চতার আধিক্য ও বৃষ্টিপাতের অভাব সেই সকল স্থানে ওক, এলম, বীচ, বার্চ, মেপল প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। শীতল আর্দ্র উচ্চভূমিতে পাইন, ফার, স্প্রুস, সীডার, লার্চ, হেমলক প্রভৃতি বৃক্ষের অরণ্য আছে। এই অঞ্চলে অনেক তৃণভূমি ও সরলবর্গীয় বৃক্ষ আছে। এই সকল তৃণভূমিতে ঘোড়া, মেষ, শূকর প্রতিপালিত হয়। বনভূমিতে বহু লোমশ জন্তু বাস করে। ইহাদের মধ্যে সেবল, আরমিন, শ্বেত খেঁকশিয়াল, বীবর প্রভৃতি প্রধান।

মনুষ্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Population and Economic Activities) : এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অনুর্বর পডসলজাতীয়। একমাত্র নদী অববাহিকাগুলি উর্বর। সার প্রয়োগে এই মৃত্তিকা কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী। এই অঞ্চলের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন, আরামপ্রদ ও স্বাস্থ্যকর। লোকবসতি বেশ ঘন।

কৃষিভূমি কম বলিয়া এই অঞ্চলে বনভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য করা হইতেছে। গম, যব, আলু, ওট, বীট প্রভৃতি শস্যের চাষই প্রধান। তৃণভূমি অঞ্চলের পশু-সম্পদের সহায়তায় বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে দুগ্ধ-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের সমুদ্রে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। মৎস্য শিকার এই অঞ্চলের একটি লাভজনক উপজীবিকা। বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও নরওয়ে-সুইডেনের মধ্যবর্তী উত্তর সাগরের ডগার্স ব্যাঙ্ক, গ্রেট-ফিসার ব্যাঙ্ক এবং উত্তর আমেরিকার উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল মৎস্য আহরণের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র।

খনিজ সম্পদে এই অঞ্চল বিশেষ সমৃদ্ধ। কয়লা, লৌহ-আকরিক ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ প্রচুর পাওয়া যায়। ফলে বৃহদায়তন শ্রমশিল্পের, যেমন—লৌহ-ইস্পাত-শিল্প, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, বয়ন-শিল্প, নৌ-শিল্প, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছে। জলবায়ু অনুকূল হওয়ায় এই অঞ্চলে রেলপথ, সড়কপথ নির্মাণ সহজ হইয়াছে। ইহা ছাড়া পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্স ও জার্মানী খাল কাটিয়া নদীগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া পরিবহণের একটি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছে। নদীপথে সমুদ্রের সহিত যোগাযোগ সহজ হওয়ায় অন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যেরও দ্রুত প্রসার ঘটিয়াছে। বিমানপথেও এই অঞ্চলের যোগাযোগ-ব্যবস্থা খুবই উন্নত।

পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির শ্রমশিল্পে বিশেষ উন্নতির মূলে রহিয়াছে এই অঞ্চলের প্রচুর কাঁচামাল, দক্ষ শ্রমিক, উন্নত যোগাযোগ-ব্যবস্থা ইত্যাদি। আবার এই সকল সুযোগ-সুবিধার জন্য লোকবসতিও খুব ঘন। কিন্তু এই অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে দক্ষিণ চিলি, টাসমানিয়া, নিউজিল্যাণ্ড শিল্পে তেমন উন্নত নহে।

হিমমণ্ডলীয় তুন্দ্রাঞ্চল
(Polar or Tundra Region)

অবস্থান (Location) : ৬৬½° হইতে ৯০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উত্তরে ও দক্ষিণে এই জলবায়ু-পরিমণ্ডল অবস্থিত। উত্তর গোলার্ধে এশিয়ার সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তরাংশ, উত্তর আমেরিকায় কানাডা ও আলাস্কার উত্তরাংশ হিমমণ্ডলের অন্তর্গত। দক্ষিণ গোলার্ধে মনুষ্যবসতি বর্জিত অ্যাণ্টার্কটিকা মহাদেশ এই জলবায়ু পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত।

জলবায়ু (Climate) : এই অঞ্চল সারাবৎসরই বরফাচ্ছন্ন থাকে। বার্ষিক গড় উত্তাপ হিমাঙ্কের নিচে প্রায় ১৪° সে. হইতে ১৫° সেণ্টিগ্রেড থাকে। বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালে ২০ সে.মি. হইতে ২৫ সে.মি. হইয়া থাকে। অনেক সময় তুষার ঝড় হয়। গ্রীষ্মকালে সামান্য তুষার গলে। গ্রীষ্মকালে দিনের মধ্যে ২০ ঘণ্টা হইতে ২৩ ঘণ্টা আকাশে সূর্যের আলো থাকে, শীতকালে আকাশে সূর্যকে দেখা যায় না। উত্তর

গোলার্ধে উত্তর সাগরতীরস্থ নরওয়ে রাজ্যের হ্যামারফেস্ট শহর হইতে গ্রীষ্মকালে রাত্রি বেলায়ও আকাশে সূর্য দেখা যায় বলিয়া উহাকে নিশীথ সূর্যের দেশ বলা হয়। আবার শীতকালে আকাশে যখন সূর্য থাকে না তখন মাঝে মাঝে আকাশে এক প্রকার জ্যোতি দেখা যায়। ইহাকে মেরু জ্যোতি বলে। উত্তর গোলার্ধে ইহা সুমেরু জ্যোতি (Aurora Borealis) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ইহা কুমেরু জ্যোতি (Aurora Australis) নামে পরিচিত। এই অঞ্চলকে তুন্দ্রা অঞ্চল ও তুষার অঞ্চল এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

চিত্র ৩.১৪: হিমমণ্ডলীয় তুন্দ্রাঞ্চল।

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু (Vegetation and Biotic Resources): এই অঞ্চলে নয় মাসের অধিক কাল জলবায়ু তীব্র শীতল থাকিবার ফলে গাছপালা কিছুই জন্মে না। গ্রীষ্মে স্থানে স্থানে গুল্ম ও বরফাচ্ছাদিত অঞ্চলে শৈবাল (Moss) দেখা যায়। শীতে ইহাদের চিহ্নও থাকে না। এতদঞ্চলের সমুদ্রের উপরিভাগে জল জমিয়া গেলেও নিচে মাছ, সীল, সিন্ধুঘোটক ইত্যাদি দেখা যায়। স্থলভাগে বল্গাহরিণ (Reindeer), শ্লেজ কুকুর, শ্বেত ভল্লুক, ক্যারিবু, কস্তুরী বৃষ, সেবল, খেঁকশিয়াল প্রভৃতি লোমশ পশু বাস করে।

মনুষ্যবসতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা (Population and Economic Activities): শীতের প্রকোপে এই অঞ্চল মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইলেও বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে কিছু লোক বাস করে। ইউরেশিয়ার উত্তরে সাইবেরিয়ার নিম্নভূমিতে 'স্যামোয়েদ' ও 'ইয়াকুট' জাতির মনুষ্যগণ বাস করে। ল্যাপল্যাণ্ডে ল্যাপ জাতি, ফিনল্যাণ্ডে ফিন, উত্তর আমেরিকার উত্তরাঞ্চলে আলাস্কা ও কানাডার উত্তরাংশে এবং গ্রীণল্যাণ্ডে বাস করে এস্কিমো জাতি। ইহারা সকলেই বরফের তৈয়ারী ঘরে বাস করে। এই ঘরকে স্থানীয় ভাষায় 'ইগলু' (Igloo) বলে। শীতে এই ঘর বেশ গরম। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিয়া গেলে তাহারা পশুচামড়া-নির্মিত তাঁবুতে বাস করে। কৃষিকার্যের অভাবে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সীল, সিন্ধুঘোটক, মাছ, পাখী ইত্যাদি শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহারা বল্গা-হরিণের দুধ ও মাংস খায়। পশুর চামড়া দিয়া পোশাক তৈয়ার করে এবং হাড়ের সাহায্যে নানা প্রকার অস্ত্র তৈয়ার করে। মাছ শিকারে তাহারা হারপুন (Harpoon)

জাতীয় এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে। স্থানীয় অধিবাসীরা কুকুর বা বল্গাহরিণে টানা শ্লেজ গাড়ি ব্যবহার করে।

বর্তমান কালে এই অঞ্চলে ভূগর্ভে উষ্ণ ঘর (Hot House) তৈয়ার করিয়া কৃষিকার্যের সম্ভাবনা বিষয়ে পরীক্ষা চালান হইতেছে। এই তুষার অঞ্চলে দুই একটি বন্দরও নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সাইবেরিয়ার উত্তরাংশে ঈনিসী নদীর তীরে ইগার্কা বন্দর উল্লেখযোগ্য। আধুনিক মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া ল্যাপ, এস্কিমো প্রভৃতি জাতির কিছু উন্নতি হইতেছে। পানীয় জলের সমস্যা মিটাইবার জন্য ঠাণ্ডা ও গরম জল পরস্পর সংলগ্ন পাইপে সরবরাহ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

মেরুদেশীয় উচ্চভূমি সারাবৎসরই বরফে আচ্ছন্ন থাকে। উত্তাপ সর্বদা হিমাঙ্কের অনেক নিচে থাকে। কোন প্রকার উদ্ভিজ্জ বা জীবজন্তু দেখা যায় না। এই অঞ্চল হইতে অনেক সময় বিরাটকায় হিমশৈল আটলাণ্টিক মহাসাগরে ভাসিয়া আসিয়া জাহাজের বিপদের কারণ ঘটায়। এই হিমশৈলের আঘাতেই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাহাজ "টাইটেনিক" ধ্বংস হইয়াছিল।

[প্রশ্ন : (১) কোন্ দেশকে 'নিশীথ সূর্যের দেশ' বলা হয়? এই কথাটির তাৎপর্য কি? সুমেরু জ্যোতি ও কুমেরু জ্যোতি কাহাকে বলে? (২) তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিবাসী ও তাহাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। (৩) এই অঞ্চলের একটি বন্দরের নাম ও অবস্থান উল্লেখ কর। (৪) হারপুন', 'উষ্ণঘর' ও 'টাইটেনিক' সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।]

অনুশীলনী ৩

১। জলবায়ু অঞ্চল ও প্রাকৃতিক অঞ্চল বলিতে কি বুঝায়? একটি ছকের সাহায্যে পৃথিবীর প্রধান জলবায়ু অঞ্চলের অবস্থান দেখাও।

[What is meant by a Climatic Regi n as well as a Natural Region? Construct a diagram to show the position of the Principal Natural Regions of the world.]

২। নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর এবং ঐ সকল অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতির বর্ণনা কর : (ক) নিরক্ষীয় অঞ্চল, (খ) মৌসুমী অঞ্চল, (গ) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, (ঘ) সেণ্ট লরেন্স অঞ্চল।

[Describe the following Natural Regions indicating the value of economic development of each of these regions : (a) Equatorial Region? (b) Monsoon Region, (c) Mediterranean Region, (d) St-Lawrence Region.]

[W. B. Council—Specimen Questiens]

৩। মৌসুমী অথবা ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের বিশেষত্ব বর্ণনা কর। এই জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলির নাম কর। এই জলবায়ু অঞ্চলের উদ্ভিদ ও কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের বিবরণ দাও।

[Describe the characteristics of either the Monsoon or the Mediterranean climatic region. Name the countries where such type of climate prevails. Give an account of the Natural vegetation and Principal agricultural products of such climatic regions.]

৪। পৃথিবীর বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চলগুলির নাম উল্লেখ কর। ইহাদের যে কোন একটি অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উপর জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর।

[Name the different climatic regions of the world. Describe the role of climate of any region on the activities of the people.]

[W. B. C. H. S. Exam. 1979]

৫। নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত তিনটি দেশের নাম উল্লেখ কর। এই প্রকার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কি? এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার উপর এই জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর।

[Name three countries located in the Equatorial Climatic Region. What are the characteristic features of this type of climate? Describe the role of this climate on the economic activities of the people.]

[W. B. C H. S. Exam. 1978 & 1981]

৬। উষ্ণ-নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। যে সকল দেশে এই প্রকার জলবায়ু দেখা যায় তাহাদের নাম উল্লেখ কর। এইরূপ জলবায়ু অঞ্চলে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

[What are the characteristics of Warm Temperate Climate? Name the countries located in this climatic region. Briefly describe the economic activities of man in this region.]

[W. B. C. H. S. Exam. 1982 & 1984]

৭। মৌসুমী অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের তুলনামূলক আলোচনা কর।

[Give a comparison between Monsoon Region and Mediterranean Region.]

৮। ক্রান্তীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য কি? ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত দেশসমূহের নাম লিখ এবং ঐ সকল দেশের অর্থনৈতিক কার্যধারা সম্পর্কে আলোচনা কর।

[What are the features of Tropical Climate. Name the countries where such climate occurs and describe the economic activities carried on in such countries.]

৪ সম্পদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Meaning and Nature of Resources)

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের লগ্ন হইতেই তাহার অভাববোধের সূত্রপাত। খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব, শিক্ষার অভাব। অভাব নানাপ্রকার দ্রব্যের ও সেবার। অভাব ব্যক্তিগত ও সামাজিক। আর এই অভাব পরিতৃপ্তির জন্য তাহার প্রচেষ্টার অন্ত নাই। ফলে একদিকে যেমন দিন দিন মানুষের অভাববোধ বাড়িতেছে অপরদিকে তেমন মানুষ তাহার অভাব পরিতৃপ্তির জন্য নানাবিধ উপায় ও উপকরণের সৃষ্টি করিতেছে। অভাব পরিতৃপ্তির উপায় ও উপকরণকে সম্পদ বলা হয়। কিন্তু সম্পদ প্রকৃত পক্ষে কোন দ্রব্য বা বস্তু নহে। মানুষের ব্যক্তিগত বা সামাজিক অভাবমোচনে কোন দ্রব্য বা পদার্থ যে কার্য করে তাহাই সম্পদ। ("The word 'resource' does not refer to a thing or a substance but to a function which a thing or a substance may perform or to an operation in which it may take part, namely the function or operation of attaining a given end, such as satisfying a want."— E. W. Zimmermann)। অর্থাৎ দ্রব্যের বা বস্তুর কার্যকারিতাই সম্পদ, দ্রব্য বা বস্তু নহে। মানুষের কোন না কোন প্রকার অভাবমোচনের কার্যকরী ক্ষমতা ছাড়া কোন দ্রব্য বা বস্তুর নিজস্ব কোন উপযোগিতা নাই। যেমন, কয়লা, খনিজ তৈল, ইত্যাদি মানুষ তাহার নানাবিধ অভাব মিটাইবার জন্যই ব্যবহার করে, ইহাদের কার্যকারিতা আছে। ব্যবহারিক উপযোগিতা ছাড়া মানুষের নিকট কয়লা বা খনিজ তেল ইহার আকার-আকৃতি বা দুষ্প্রাপ্যতার জন্য সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না। ইহারা মানুষের কোন অভাব মোচন করে বলিয়াই সম্পদ হিসাবে গণ্য হয় ("means of attaining a given end.")। সুতরাং সম্পদ বলিতে মানুষের নানাবিধ অভাব পরিতৃপ্তির ক্ষেত্রে দ্রব্যের বা বস্তুর কার্যকারিতাকে (function-কে) বুঝায়।

মানুষের অভাব পূরণের উপযোগী যে কোন উপকরণের কার্যকারিতাই সম্পদ। অতএব সম্পদ বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় প্রকারের হইতে পারে। কয়লা, লৌহ-আকরিক, খনিজ তেল প্রভৃতি মানুষের বস্তুগত সম্পদ। আবার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, শ্রমিকের দক্ষতা, কারিগরী বিদ্যা প্রভৃতি অবস্তুগত সম্পদ। কারণ, ইহারাও মানুষের চাহিদা বা অভাব মিটায়।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Resources): কোন পদার্থ বা দ্রব্য সম্পদ কিনা ইহা নির্ভর করে বস্তুটির দুইটি বিশেষ গুণের উপর। একটি ইহার উপযোগিতা, এবং অপরটি মানুষের ব্যক্তিগত বা সামাজিক চাহিদা পূরণে ইহার কার্যকারিতা। লৌহ আকরিক বা খনিজ তেল দীর্ঘকাল ধরিয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিল। মানুষ যখন ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ইহা হইতে নানা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া উহাদিগকে ব্যবহারোপযোগী করিল তখনই ইহার উপযোগিতা ও কার্যকারিতা মানুষের নিকট ধরা পড়িল এবং ইহা সম্পদে রূপান্তরিত

হইল। যতক্ষণ কয়লা বা লৌহ আকরিক ইত্যাদি মানুষের কোন কার্যে আসে নাই ততক্ষণ উহা সম্পদ ছিল না। সুতরাং উপযোগিতা ও কার্যকারিতা ব্যতিরেকে কোন কিছুই সম্পদ নহে। সম্পদের মূল বৈশিষ্ট্য ইহা বস্তু বা পদার্থ নিরপেক্ষ। কয়লা বা খনিজ তেল এই কারণে সম্পদ নহে, কিন্তু উহাদের কার্যকারিতা সম্পদ।

সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত (actual) ও সম্ভাব্য (potential) দুই প্রকারের হইতে পারে। কোন দেশে যে পরিমাণ কয়লা বা খনিজ তেল উৎপাদিত হয় উহা সেই দেশের প্রকৃত সম্পদ। কারণ নির্দিষ্ট সময়ে ঐ পরিমাণ তেলের কার্যকারিতা দেশটি ভোগ করে। কিন্তু ঐ দেশে যে পরিমাণ খনিজ তেল সঞ্চিত আছে বলিয়া অনুমান করা হয় উহা তাহার সম্ভাব্য সম্পদ। প্রয়োজন বোধে দেশটি উহার সঞ্চিত তেলের সবটুকুই উত্তোলন করিতে পারে এবং উহা ব্যবহার করিতে পারে। একটি উদাহরণ হইতে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। ভারতে খনিজ তেলের বার্ষিক উৎপাদন ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু ভারতে খনিজ তেলের মোট সঞ্চয় প্রায় ৫০০ কোটি মেট্রিক টন। এই ক্ষেত্রে ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন দেশের প্রকৃত সম্পদ এবং মোট সঞ্চয় অর্থাৎ ৫০০ কোটি মেট্রিক টন দেশের সম্ভাব্য সম্পদ।

স্থান ও কালের উপর বস্তু বা পদার্থের কার্যকারিতা ও পরিমাণ নির্ভর করে। খনিজ তেল প্রথম যখন ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয় তখন উহার কার্যকারিতা প্রধানত জ্বালানি শক্তি ও পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবেই ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির ফলে খনিজ তেলের উপজাত দ্রব্য এত বহুল পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে পূর্বের তুলনায় উহার কার্যকারিতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্বে বহু নদ-নদী মানুষের অনেক ক্ষতি সাধন করিত। মানুষ প্রকৃতির খামখেয়ালীর নিকট নিতান্ত অসহায় ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্তমানে ঐ নদ-নদীকেই মানুষ বহু প্রকার সামাজিক কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করিতেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সীমান্তে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের ধারাকে কাজে লাগাইয়া ঐ স্থানে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে। কিন্তু আফ্রিকার দেশগুলিতে প্রবহমান জলশক্তিকে কাজে লাগাইবার কোন সুব্যবস্থা আজিও হয় নাই। সুতরাং বস্তু বা পদার্থের কার্যকারিতা স্থান ও কাল অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের হয়।

[প্রশ্ন : (১) সম্পদ কাহাকে বলে তাহা উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। (২) "বস্তু বা দ্রব্য সম্পদ নহে, উহার কার্যকারিতাই সম্পদ।"—উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (৩) সম্পদের একটি সংজ্ঞা লিখ এবং ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।]

সম্পদের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Resources)

সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resources), মানবিক সম্পদ (Human Resources) এবং সাংস্কৃতিক সম্পদ (Cultural Resources) এই তিন শ্রেণীতে

ভাগ করা হয়। (১) প্রাকৃতিক সম্পদ—প্রকৃতিদত্ত যে সকল উপকরণ মানুষের অভাব মোচনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, যেমন—মৃত্তিকা, জলবায়ু, নদী, অরণ্য, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি। (২) মানবিক সম্পদ—মানুষের প্রয়োজনে সম্পদ। মানুষের ক্রিয়াশীলতা ব্যতিরেকে সম্পদের উদ্ভব সম্ভব নহে। এই কারণে জনসংখ্যা, মনুষ্য-বসতি, শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ইত্যাদি মানবিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। (৩) সাংস্কৃতিক সম্পদ—মানুষের ক্রিয়াশীলতা নির্ভর করে মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের নানাপ্রকার জটিল বিষয়ের উপর; যেমন—নানাপ্রকার সামাজিক সংগঠন, শিক্ষা-জ্ঞান, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, প্রযুক্তি বিদ্যা প্রভৃতি। এইগুলিকে বাদ দিয়া সম্পদের ধারণা করা যায় না। কারণ সম্পদ সৃষ্টিতে ইহাদের কার্যকারিতা অসাধারণ। সুতরাং এই সকল বিষয়কে সাংস্কৃতিক সম্পদ বলা হয়।

সম্পদ, প্রতিরোধ ও নিরপেক্ষ উপাদান (Resources, Resistance and Neutral Staff): গোলাপ যেমন কণ্টকবিহীন হয় না, দিন যেমন রাত্রিবিহীন হয় না তেমনি প্রাকৃতিক সম্পদের সহিত প্রাকৃতিক বাধা অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিয়া আছে। জল, বাতাস, সূর্যের আলো, উর্বর জমি, অনুকূল জলবায়ু, খনিজ পদার্থ, বনভূমি, উপকারী নদ-নদী ইত্যাদি প্রকৃতি রাজ্যের সম্পদ। আবার প্রতিকূল জলবায়ু, অনুর্বর ভূমি, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক প্রতিরোধ। ইহারা মানুষের অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। এমন কোন দেশ দেখা যায় না—যেখানে প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানই সম্পদ। আবার এমন দেশও অতি বিরল যেখানে প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানই বাধার স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে সকল দেশেরই প্রকৃতি-রাজ্যে সম্পদ ও বাধা মিশিয়া থাকে।

প্রাকৃতিক সম্পদের মত মানবিক সম্পদের ক্ষেত্রেও নানাবিধ প্রতিরোধ বা প্রতি-বন্ধকতা দেখা যায়। কাম্য জনসংখ্যা, উন্নত জনস্বাস্থ্য, উন্নত কর্মদক্ষতা, সামাজিক মনোভাব, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, নীতিবোধ ইত্যাদি দেশের অগ্রগতির সহায়ক। ইহারা মানবিক সম্পদ। কিন্তু ইহাদের সহিত মিশিয়া থাকে নানাবিধ প্রতিরোধ বা প্রতিবন্ধক; যেমন, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, যুদ্ধবিগ্রহ, স্বার্থপরতা, স্বল্প বা অতিজনাকীর্ণতা প্রভৃতি। ইহাদিগকে মানবিক প্রতিরোধ বলা যায়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সম্পদ ও প্রতিরোধের পাশাপাশি অবস্থান লক্ষণীয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বিকাশ, প্রগতিশীল সরকার, জনকল্যাণমূলক শাসন-ব্যবস্থা, সুষ্ঠু পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পদ। কিন্তু ইহার বিপরীত অবস্থাই সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা, যেমন, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, সংরক্ষণশীলতা, শোষণমূলক শাসন-ব্যবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি বা উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি।

মানুষের ব্যক্তিগত বা সামাজিক কল্যাণের সহায়ক সব কিছুই সম্পদ। পক্ষান্তরে মানুষের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক বিষয়গুলিই প্রতিরোধ। পৃথিবীতে সর্বত্রই সম্পদ এবং প্রতিরোধ পাশাপাশি অবস্থান করে। প্রতিরোধবিহীন সম্পদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সুতরাং সম্পদ আহরণে ও সৃষ্টিতে মানুষকে দুস্তর বাধা অতিক্রম করিতে হয়।

প্রকৃতির রাজ্যে এক প্রকার উপাদান দেখা যায় যাহা মানুষের কোন উপকারে আসে না বা মানুষের কোন অপকারও করে না। অর্থাৎ মানুষের জীবন ও জীবিকার সহিত উহার ভালমন্দের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রকার সম্পর্কই থাকে না। এই সকল বস্তু বা উপকরণকে বলা হয় নিরপেক্ষ উপাদান। এই নিরপেক্ষ উপাদান সম্পর্কে মানুষের কোন আগ্রহ থাকে না। ইহার অস্তিত্ব বিষয়েও মানুষ অজ্ঞ থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বর্তমানে মানুষের নিকট যাহা কিছু সম্পদ প্রাগৈতিহাসিক মানুষের নিকট উহারা সম্পদ ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই উহারা ছিল প্রতিরোধ অথবা নিরপেক্ষ উপাদান। সমুদ্র আদিম মানুষের নিকট কোন সম্পদই ছিল না। বরং ভয়ের বিষয় ছিল। তেমনি কয়লা মাটির অভ্যন্তরে ছিল। আদিম মানুষ না জানিত তাহার ব্যবহার, না জানিত তাহার অবস্থান। ফলে কয়লা তাহার নিকট সম্পদও ছিল না প্রতিরোধও ছিল না। উহা ছিল নিরপেক্ষ উপাদান। কিন্তু আধুনিক মানুষ সমুদ্রের কার্যকারিতা নিজের উপকারে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছে। কয়লাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া উহার কার্যকারিতাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতেছে। এই কারণে সমুদ্র বা কয়লা সম্পদ। সুতরাং একই বস্তু বা পদার্থ কখনও নিরপেক্ষ উপাদান, কখনও প্রতিরোধ আবার কখনও সম্পদ। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষ উপাদান বা প্রতিরোধ সম্পদে পরিবর্তিত হইতেছে।

ভারতে হিমালয়ের উচ্চতর ঢালে প্রচুর কাষ্ঠ সম্ভার রহিয়াছে। কিন্তু পরিবহণের সুব্যবস্থা না থাকায় ঐ কাষ্ঠ এখনও নিরপেক্ষ উপাদান। মানুষের কোন অভাব পূরণের ক্ষমতা আপাতত উহার নাই। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি উন্নত ও সহজ করা যায় তাহা হইলে অতি দ্রুত ঐ নিরপেক্ষ উপাদান সম্পদে রূপান্তরিত হইবে। এই কারণে প্রগতিশীল ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে সম্পদের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। প্রতিরোধ থাকে সামান্যই, কারণ মানুষের অদম্য উৎসাহ সকল প্রতিরোধকে জয় করিয়া নিত্য-নতুন সম্পদ সৃষ্টি করিয়া উন্নততর সমাজ জীবনের পথে অগ্রসর হয়। এই প্রয়াস ও প্রক্রিয়ার ফলে নিরপেক্ষ উপাদান খুব সামান্যই দেখা যায়। কারণ প্রকৃতির রাজ্যে প্রায় সব কিছুকেই মানুষ নানাভাবে তাহার প্রয়োজনে লাগাইবার চেষ্টা করে।

[প্রশ্ন : (১) সম্পদ কয় শ্রেণীর এবং কি কি? (২) সম্পদ ও বাধার পার্থক্য একটি বাক্যে লিখ। (৩) প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতি—এই তিন পর্যায়ে সম্পদ ও বাধার তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও। (৪) নিরপেক্ষ উপাদান কাহাকে বলে? নিরপেক্ষ উপাদানের দুইটি উদাহরণ দাও। (৫) যুক্তি দেখাইয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কোন্‌টি আমাদের নিকট সম্পদ, কোন্‌টি বাধা এবং কোন্‌টি নিরপেক্ষ উপাদান তাহা নির্দেশ কর ঃ—সুন্দরবন, দামোদর নদ, সিঙ্গালীলা পর্বত, মেদিনীপুর জেলার ভূগর্ভে সঞ্চিত লৌহ আকর, রাণীগঞ্জের ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লা, টাটা কোম্পানির শেয়ার, চোর, ডাক্তার, কারিগরী বিদ্যা, শ্রমিকদের দক্ষতা, শিক্ষাব্যবস্থা, পরীক্ষায় নকল করিবার নৈপুণ্য, ইউরেনিয়াম, সমুদ্রের ঢেউ, ল্যাটারাইট মৃত্তিকা, হিমালয়ের চূড়ায় অবস্থিত বরফ।]

সম্পদ-সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান
(Resource-creating factors)

মানুষ তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পূরণের উপায় হিসাবে যাহা কিছু ব্যবহার করে উহাই সম্পদ। সম্পদের প্রধান উৎস প্রকৃতি।

মানুষ প্রাথমিকভাবে তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু সকল প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সংগ্রহ করে এবং নিজ বুদ্ধিবলে উহাকে নানাভাবে রূপান্তরিত করিয়া ব্যবহার করে। এই রূপান্তরিত বস্তু বা পদার্থই সম্পদ। প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে কোন কিছুই সহজলভ্য নহে এবং প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারযোগ্যও নহে, উহাকে ব্যবহারোপযোগী করিতে মানুষের প্রচেষ্টা অপরিহার্য। আবার মানুষের এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে থাকে তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবদান। প্রবহমান জলরাশি প্রকৃতির অবদান। ইহার সাহায্যে জলসেচ, পরিবহণ বা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন কোন কিছুই মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব নহে। জলশক্তির ব্যবহার আদিম মানুষের অজ্ঞাত ছিল। আধুনিক মানুষ তাহার সংস্কৃতির অন্তর্গত প্রযুক্তি জ্ঞানের সাহায্যেই ইহার ব্যাপক ব্যবহার আবিষ্কার করিয়াছে। ইহার ফলে নিরপেক্ষ উপকরণ—প্রবহমান জলরাশি—সম্পদের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। অতএব সম্পদ সৃষ্টিতে প্রকৃতি, মানুষ এবং মানুষের সংস্কৃতি এই তিনটি উপাদান সতত ক্রিয়াশীল। আবার এই তিনটি উপাদানই ইহাদের নিজস্ব কার্যকারিতার জন্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয়।

প্রকৃতি (Nature)

প্রকৃতি একাধারে সম্পদ এবং সম্পদের বিপুল ভাণ্ডার। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান মানুষের কর্ম প্রচেষ্টার ফলে সম্পদে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু কিছু কিছু প্রাকৃতিক উপাদান মানুষের চেষ্টা ব্যতিরেকেই প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অভাব দূর করে। যেমন—বাতাসের অক্সিজেন, ঝরনার জল ইত্যাদি। ইহাদিগকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলা যায়। অধ্যাপক জিমারম্যান প্রাকৃতিক সম্পদ বলিতে প্রকৃতির এমন কতকগুলি উপকরণকে বুঝাইয়াছেন যাহা মানুষ প্রত্যক্ষভাবে তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে ব্যবহার করিতে পারে। সূর্যের আলো, বাতাস, নদীর জল, বনের ফলমূল ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ। এই ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ পশুপক্ষীও ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের ব্যবহার খুবই সীমিত। ইহার তুলনায় প্রকৃতির সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা অনেক গুণ বেশি। সংস্কৃতিবান আধুনিক মানুষ তাহার উন্নত কারিগরি জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ও উপকরণকে কাজে লাগাইয়া প্রভূত পরিমাণে সম্পদ সৃষ্টি করিতেছে। কয়লা, লৌহ আকরিক বা প্রবহমান জলকে মানুষ তাহার দক্ষতা ও কারিগরী জ্ঞানের সাহায্যে নিত্য নতুন সম্পদে রূপান্তরিত করিতেছে। প্রকৃতির উপাদান যেমন জলবায়ু নদী, সমুদ্র ইত্যাদি মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। মানুষ জলবায়ুর আনুকূল্যে কৃষিকার্য পরিচালনা করে। নদীতে বাঁধ দিয়া জলসেচ, মৎস্য চাষ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতির সুযোগ গ্রহণ

করে। এইভাবে প্রকৃতির কার্যকারিতাকে মানুষ ব্যবহার করে। সুতরাং প্রকৃতি সম্পদের প্রধান ভিত্তি এবং সম্পদ সৃষ্টির অপরিহার্য উপাদান। অধ্যাপক জে, এল, গুহ লিখিয়াছেন, "··· nature provides the physical base upon which man displays his skill."*

মানুষ (Man)

মানুষ নিজে সম্পদ সৃষ্টি করে এবং নিজে ভোগ করে। তাহার অভাব আছে; তাহার প্রচেষ্টাও আছে। মানুষের জন্যই সম্পদ। সম্পদের জন্য মানুষ নহে। অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পূর্বেও কয়লা বা খনিজ তেল ইত্যাদি ছিল কিন্তু তখন তাহার ব্যবহার ছিল না। কিন্তু মানুষের আবির্ভাবের পরে সে নিজ প্রচেষ্টায় ঐ প্রাকৃতিক উপকরণকে রূপান্তরিত করিয়া তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা মিটাইতে ব্যবহার করিল। কায়িক ও মানসিক প্রচেষ্টার সাহায্যে মানুষ নিয়ত সম্পদ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সুতরাং মানুষ সম্পদের স্রষ্টা। আর এই সৃষ্টির দ্বারা সে তাহার অভাব পূরণ করে। অতএব সম্পদের স্রষ্টা এবং ভোক্তা হিসাবে মানুষকেই সর্বাপেক্ষা গতিশীল ও কার্যকর উপাদান বলা যায়। এই কারণেই সম্পদের সৃষ্টি ও ব্যবহার জনসংখ্যা ও তাহার দক্ষতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ায় জনসংখ্যা যথেষ্ট নহে বলিয়া, তথাকার অর্থনৈতিক অগ্রগতি আশানুরূপ হয় নাই।

সম্পদের স্রষ্টা হিসাবে মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—সংস্কৃতিবান মানুষ ও সংস্কৃতিবিহীন মানুষ। সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষের গতিশীলতা নির্ভর করে তাহার সাংস্কৃতিক অগ্রগতির উপর। সম্পদ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় মানুষের বড় হাতিয়ার তাহার জ্ঞান। আদিম যুগে প্রকৃতির বহু উপকরণ মানুষের নিকট নিরপেক্ষ উপকরণ ছিল। কারণ মানুষ উহাদের কার্যকারিতা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের সহিত তাহার সম্পদ সচেতনতা বৃদ্ধি পাইল এবং সম্পদ সৃষ্টিতে কর্মপ্রচেষ্টার স্ফুরণ ঘটিল। পক্ষান্তরে শিক্ষা ও সভ্যতার দিক হইতে যাহারা পশ্চাৎপদ তাহাদের অবস্থা আদিম মানুষের তুলনায় খুব বেশি উন্নত নহে। সম্পদের মূল ধারণা তাহাদের নিকট স্পষ্ট নহে। আজিও আফ্রিকার দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে বা উষ্ণ মরু অঞ্চলে এমন মানব গোষ্ঠী বাস করে যাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী মোটেই উন্নত নহে। তাহাদের অভাব বোধ এবং সম্পদ সৃষ্টির প্রয়াস অত্যন্ত সীমিত। ইহার কারণ তাহাদের অজ্ঞাত ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা। সুতরাং সংস্কৃতিবান মানুষই সম্পদ সৃষ্টি ও ভোগে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

---

* Prof. J. L. Guha and Prof. P. R. Chatterjee : *A New Approach to Economic Geography—A Study of Resources*, page 10.

সংস্কৃতি (Culture)

ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পূরণে মানুষের সম্পদ সৃষ্টির প্রয়াস। এই সম্পদ সৃষ্টিতে প্রধান উপাদান প্রকৃতি এবং মানুষ নিজে। তাহার প্রধান উপকরণ সাধারণ ও কারিগরী জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি। প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সম্পদ আহরণের জন্য মানুষ সেই সকল কলাকৌশল, কারিগরি ব্যবস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উদ্ভাবন করিয়াছে উহার সমষ্টিকেই সংস্কৃতি বলা যায়। এই সংস্কৃতির রূপ বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় প্রকারের হইতে পারে। যেমন—সংস্কৃতির প্রভাবে মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার হাতিয়ার হিসাবে উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি, কলকারখানা ইত্যাদিকে সংস্কৃতির বস্তুগত রূপ বলা যায়; এবং শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রব্যবস্থা সুশৃংখল সমাজ জীবন ইত্যাদির জটিল প্রভাবকে অবস্তুগত রূপ বলা যায়। অবশ্য কলকারখানা বা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংস্কৃতির অবস্তুগত রূপের প্রভাবেই সৃষ্ট। কিন্তু এই বস্তুগত আকৃতি মানুষের সংস্কৃতিকে আরও উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করে বলিয়া ইহার বিশেষ তাৎপর্য আছে। সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান কখনও প্রত্যক্ষ সম্পদ হিসাবে কখনও বা সম্পদ সৃষ্টির উপাদান হিসাবে ক্রিয়াশীল। সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষের সংস্কৃতিই তাহার বড় হাতিয়ার। আদিম মানুষ ও আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর যে দুস্তর ব্যবধান ইহা নিঃসন্দেহে উভয়ের সংস্কৃতির পর্যায়গত পার্থক্যের পরিণাম। আদিম মানুষ প্রবহমান জলকে তাহার স্নান-পানের জন্যই ব্যবহার করিত। কিন্তু মানুষের জ্ঞান কর্মের উন্নতির ফলে ঐ জল সেচের কাজে, মৎস্য আহরণে, পরিবহণে নিয়োজিত হইল। আধুনিক মানুষ বাঁধ বাঁধিয়া ঐ জলশক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ও নদীর ধ্বংসাত্মক কার্যকে রোধ করে। মানুষের প্রচেষ্টা কিন্তু এখানেই থামে নাই। জলের মূল উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসকে আলাদা করিয়া উহা হইতে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ শক্তির আবিষ্কারের জন্য মানুষ গবেষণারত। অন্যান্য প্রাণী হইতে মানুষের পার্থক্য তাহার সংস্কৃতির জন্যই। সুতরাং প্রকৃতির ক্ষেত্রে সংস্কৃতির কার্যকর প্রয়োগের দ্বারাই মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করিয়া থাকে। সংক্ষেপে, প্রকৃতি, মানুষ এবং সংস্কৃতি এই তিনটি উপাদানের ঘাত-প্রতিঘাতেই সম্পদের সৃষ্টি এবং বিকাশ ঘটে।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, স্বীয় অভাব পূরণের উদ্দেশ্যেই মানুষ সম্পদ উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়। এবিষয় অধ্যাপক জে. এল. গুহ লিখিয়াছেন—"A purposeful combination of nature, man and culture is necessary to produce resources."

[প্রশ্ন : (১) সম্পদ সৃষ্টির উপাদান কি কি ? (২) সম্পদ সৃষ্টির উপাদান হিসাবে প্রকৃতি বা মানুষের ভূমিকা বর্ণনা কর। (৩) "প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতি এই তিন উপাদানের ঘাত-প্রতিঘাতেই সম্পদের সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটে।"—উদাহরণের সাহায্যে উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (৪) সংস্কৃতি কাহাকে বলে ? সম্পদ সৃষ্টিতে সংস্কৃতির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব
(Functional Theory of Resources)

মানুষের অভাব মোচনে বস্তুগত বা অ-বস্তুগত বিভিন্ন প্রকার উপাদানের কার্যকরী ক্ষমতা আছে বলিয়াই ঐ সকল উপাদান মানুষের নিকট সম্পদ। বর্তমান যুগে উৎপাদনযোগ্য লৌহ খনিজ যে কোন দেশের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কিন্তু আদিম যুগের মানুষের নিকট ভূগর্ভস্থ লৌহ-খনিজের কোন গুরুত্বই ছিল না— যদিও ভূ-অভ্যন্তরের স্থানে স্থানে ইহার অস্তিত্ব ছিল। মানুষের নিকট তখন ইহা ছিল নিরপেক্ষ সামগ্রী। যেদিন মানুষ লৌহের ব্যবহার শিখিল সেদিন হইতেই ইহা কার্যকরী ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে এবং সেদিন হইতেই ইহা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত সম্পদ।

উপরি-উক্ত উদাহরণ হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, মানুষের প্রচেষ্টাতেই সেকালের নিরপেক্ষ সামগ্রী অর্থাৎ লৌহ খনিজের সহিত কার্যকারিতা গুণটি সংযোজিত হইয়াছে এবং তাহাতেই উহা সম্পদে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ইহা বলা যায় যে মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করে। কারণ কার্যকারিতাই সম্পদ। ইহা পূর্ব হইতে স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হইয়া থাকে না।

মানুষ সম্পদ সৃষ্টি করে কিসের সাহায্যে ? নিশ্চয়ই তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে। মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি ক্রমসম্প্রসারণশীল। কাজেই সম্পদের উৎপাদনের গতি ও পরিমাণও ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অর্থাৎ সম্পদ গতিশীল, স্থির বা স্থানু নহে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে সৃষ্টিকর্তা সম্পদ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। মানুষ ঐ সম্পদের ব্যবহার ক্রমে ক্রমে শিখিতেছে ও নিজের অভাবমোচনের জন্য উহার ব্যবহার করিতেছে। অর্থাৎ পৃথিবীর ভাণ্ডার যেন একটি খড়ের গাদা। মানুষ প্রয়োজনমত ঐ ভাণ্ডার হইতে খড় টানিয়া লওয়ার মত যথেচ্ছ সম্পদ আহরণ করে। সম্পদ সৃষ্টি করা মানুষের সাধ্যাতীত। এই মতবাদের সত্যতা নির্ভর করে সম্পদের সংজ্ঞার উপর। আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ বিশ্বাস করেন সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্বে। তাঁহারা মনে করেন যে মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে পারে এমন কার্যকরী ক্ষমতা যে বস্তুর নাই উহা সম্পদ হইতে পারে না। যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভূগর্ভস্থ কয়লার কোন কার্যকরী ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এখন কয়লার কার্যকরী ক্ষমতা আছে। কাজেই অতীতে কয়লা সম্পদ ছিল না ; বর্তমানে ইহা সম্পদ। মানুষের প্রচেষ্টায় কয়লার ব্যবহারিক উপযোগিতা আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহা সম্পদে পরিণত হইয়াছে। পূর্বে ইহা ছিল নিরপেক্ষ উপাদান। মানুষের অভাব মোচনে সম্পদের কার্যকারিতাই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পদ-বিষয়ে কার্যকারিতার গুরুত্ব নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি হইতে লক্ষ্য করা যায়* :

* Prof. J. L. Guha and Prof. P. R. Chatterjee : *A New Approach to Economic Geography—A Study of Resources*, pages 8.

বস্তু + কার্যকারিতা = সম্পদ। যেমন কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত একখণ্ড উর্বর কৃষিজমি।

বস্তু − কার্যকারিতা = সম্পদ নহে। যে জমি উর্বরতা হারাইয়া কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।

অবস্তু + কার্যকারিতা = সম্পদ। কারিগরি বিদ্যা, ডাক্তারী বিদ্যা, সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি। যাহা ব্যক্তিগত ও সামাজিক হিত সাধন করে।

অবস্তু − কার্যকারিতা = সম্পদ নহে। প্রাচীন গ্রাম্য আচার নীতি, বর্ণাশ্রম ধর্ম ইত্যাদি। এক সময় মানুষের কল্যাণসাধনে এই বিষয়গুলির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহাদের কার্যকারিতা লোপ পাইয়াছে।

সুতরাং উপরের উদাহরণ হইতে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে বস্তুগত বা অবস্তুগত উপাদানের কার্যকারিতাই সম্পদের প্রধান লক্ষণ।

পুরাতন পন্থীদিগের মতানুযায়ী—কার্যকারিতা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া পৃথিবীর সকল প্রকার প্রাকৃতিক উপকরণকে সম্পদ বলিয়া ধরিয়া লইলে ঝড়, ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, রোগবীজাণু, বিষ ইত্যাদি সব কিছুকেই সম্পদ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কিন্তু ইহারা মানুষের কল্যাণসাধন করে না, বরং অকল্যাণ আনয়ন করে।

আবার তাঁহারা একমাত্র প্রাকৃতিক বস্তুসমূহকেই সম্পদ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু কয়লা, লৌহ, জমি ইত্যাদির মত মানুষের কারিগরী বিদ্যা, শিল্প নৈপুণ্য, সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদিও মানুষের অশেষ কল্যাণসাধন করে। অর্থাৎ ইহাদের কার্যকরী ক্ষমতা আছে। সুতরাং এই সকল অবস্তুগত উপকরণ বা উপাদানও সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত।

[প্রশ্ন : (১) "সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব" সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (২) চারিটি উদাহরণের সাহায্যে সম্পদ বিষয়ে কার্যকারিতার গুরুত্ব বুঝাইয়া দাও।]

সম্পদ সংরক্ষণ
(Conservation of Resources)

সম্পদ সংরক্ষণের ধারণা (Concept of Conservation of Resources) সম্পদের প্রধান উৎস প্রকৃতি। প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণ মানুষের কর্ম প্রচেষ্টা ও তাহার সংস্কৃতির ক্রিয়াশীল প্রভাবে সম্পদে পরিণত হয়। কিন্তু প্রকৃতির ভাণ্ডার অফুরন্ত নহে বা প্রাকৃতিক উপকরণের বণ্টন সর্বত্র সমান নহে। কোথাও প্রাকৃতিক দানের প্রাচুর্য, কোথাও ইহার নিতান্ত অভাব। এই কারণে সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

'সংরক্ষণ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষা করা।' সম্পদের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ শব্দটি স্থান ও কাল অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। ইহা প্রধানত দুইটি অর্থে

ব্যবহৃত হয়। প্রথমত, সংরক্ষণ বলিতে বুঝায় কোন সম্পদের বর্তমান ব্যবহার সীমিত করিয়া ভবিষ্যতের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সঞ্চয় (conservation) করা। ইহাতে সম্পদ ব্যবহারে সংযম দেখা যাইবে এবং ফলে অপচয় নিবারিত হইবে। সম্পদের বর্তমান ব্যবহার হ্রাস করিবার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ সঞ্চিত হইবে। দ্বিতীয়ত, সংরক্ষণ বলিতে অনেকে মিতব্যয়িতাকে (economisation) বুঝাইয়াছেন। সম্পদের মিতব্যয়িতা আবার উৎপাদনের সহিত উৎপাদনের উপকরণের অনুপাতের উন্নতি ঘটানকে বুঝায়। অর্থাৎ যথাসম্ভব স্বল্প উপাদানের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিকে মিতব্যয়িতা বলা যায়। ইহাতে উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু সংরক্ষণ বা মিতব্যয়িতা একই অর্থে ব্যবহার করা যায় না। সম্পদের সীমিত ব্যবহারে ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণে সম্পদের সঞ্চয় ঘটিবে, ইহা নিশ্চিত। সুতরাং স্বল্প সম্পদ ব্যবহারের ফলে সমাজে যে পরিমাণ সম্পদ সংরক্ষিত হইবে উহাকে সংরক্ষণজনিত 'মিতব্যয়িতা' (economy) বলা যায়। পক্ষান্তরে, মিতব্যয়িতার ফলে সমাজে সম্পদ উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও সমাজে বহুল পরিমাণে সম্পদ সংরক্ষিত হইবে। ইহাকে 'মিতব্যয়িতাজনিত সংরক্ষণ' (conservancy) বলা যায়। 'মিতব্যয়িতাজনিত সংরক্ষণের' ফলে যদি দ্রব্যটির উৎপাদন ব্যয় কম হয় এবং বাজারে উহার চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উহার ব্যবহার বাড়িয়া যাইবে। ইহাতে সম্পদের সংরক্ষণ সম্ভব হইবে না। বরং ঐ সম্পদের চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে মিতব্যয়িতাজনিত সংরক্ষণের ফলে সম্পদের সংরক্ষণ সম্ভব হইবে। ব্যাপক অর্থে সংরক্ষণ বলিতে যদিও সম্পদের সঞ্চয় বুঝায় তথাপি ইহা স্থান কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেদে পরিবর্তনশীল, যেমন 'মিতব্যয়িতাজনিত সংরক্ষণ' শুধু উৎপাদন দক্ষতাকে না বুঝাইয়া সম্পদের ভোগ ও ব্যবহারে অপচয়রোধ ও সুষ্ঠু ব্যবহারকেও বুঝায়।

সম্পদ সংরক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি

(১) ব্যবহারে মিতব্যয়িতা—ভোগের জন্যই সম্পদের সৃষ্টি। মিতব্যয়িতা সম্পদের ব্যবহার হ্রাসকে বুঝায় না। বরং সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যাপক ব্যবহারকেই বুঝায়। সম্পদের স্বল্প ব্যবহার দেশের উন্নতির অন্তরায়। এই কারণে সম্পদের কাম্য ব্যবহার প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদের মিতব্যয়িতা নির্ভর করে উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ সম্পদের ব্যবহারের উপর এবং সঞ্চিত সম্পদের পরিবর্তে প্রবহমান সম্পদের ব্যবহারের উপর। খনিজ তেলের সাহায্যে যেমন উড়োজাহাজ, মোটর গাড়ি চালানো যায় তেমনি কলকারখানা চালানো যায়। কিন্তু কয়লার সাহায্যেও কলকারখানা চালানো যায় কিন্তু মোটরগাড়ি বা উড়োজাহাজ চালানো যায় না। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে কয়লার সাহায্যে কলকারখানা চালানো এবং খনিজ তেলের

সাহায্যে মোটর গাড়ি ও উড়োজাহাজ চালানোকেই খনিজ তেলের কাম্য ব্যবহার বা খনিজ তেলের ব্যবহারে মিতব্যয়িতা বলা যায়। সম্পদ ব্যবহারে সঞ্চিত সম্পদের পরিবর্তে অধিক পরিমাণে প্রবহমান সম্পদ ব্যবহার যুক্তিযুক্ত; কারণ সঞ্চিত সম্পদ ব্যবহারে নিঃশেষিত হয়, যেমন, কয়লা, লৌহ আকরিক। কিন্তু প্রবহমান সম্পদ, যেমন—নদীর জল, সমুদ্রস্রোত, মানুষের কর্মদক্ষতা ইত্যাদি নিঃশেষিত হয় না। চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

(২) **উৎপাদনের উপাদানের অনুপাত**—সম্পদের সংরক্ষণের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে উৎপাদনের সকল প্রকার উপাদানকে একত্রে বিচার করা প্রয়োজন। কারণ সম্পদের কাম্য ব্যবহার নির্ভর করে উৎপাদনের উপাদানগুলির কাম্য অনুপাতে নিয়োগের উপর। শ্রম ও মূলধনের অনুপাত বৃদ্ধি করিয়া এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান অপরিবর্তিত রাখিয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্পদের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

(৩) **সম্পদের সম্প্রসারণশীলতা**—ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ ব্যবহারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহা মানুষ পূরণ করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ফলে সম্পদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষয়িষ্ণু সম্পদের সংরক্ষণ সম্ভব হয়। জলবিদ্যুৎ বা আণবিক শক্তির আবিষ্কারের ফলে কয়লা বা খনিজ তেলের সংরক্ষণ সম্ভব। আবার বিশ্বে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে সম্পদের সংরক্ষণ সম্ভব।

(৪) **সরকারী নিয়ন্ত্রণ**—ব্যক্তিগত ব্যবসার উদ্যোগ সর্বত্রই মুনাফাভিত্তিক। সুতরাং অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার **ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি।** মানুষের ভবিষ্যতের ভাবনা তাহাকে সম্পদের কাম্য ব্যবহারে প্রেরণা যোগায়। ইহার বাস্তব প্রয়োগ একমাত্র সরকারী নিয়ন্ত্রণেই সম্ভব। এই কারণে আধুনিক যুগে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেই সম্পদের ব্যবহার রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। **সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যই সকল সম্পদের কাম্য ব্যবহার।**

(৫) **সংরক্ষণ পদ্ধতির বিভিন্নতা**—প্রাকৃতিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক সকল প্রকার সম্পদের বৈশিষ্ট্য এক নহে। বিভিন্ন সম্পদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। সুতরাং সম্পদ সংরক্ষণে একই নীতি কার্যকরী হইতে পারে না। সম্পদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংরক্ষণ নিয়ম ও পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার হওয়া প্রয়োজন।

(৬) **সম্পদের ধ্বংস নিবারণ**—পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। শান্তিময় সুন্দর পরিবেশ সম্পদ সংরক্ষণে বিশেষ কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ।

[প্রশ্ন : (১) 'সম্পদ সংরক্ষণ' কাহাকে বলে? (২) সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি? (৩) সম্পদ সংরক্ষণের নীতি ও পদ্ধতিগুলির সংক্ষেপে আলোচনা কর।]

অনুশীলনী ৪

১। সম্পদ বলিতে কি বুঝায়? কোন দেশের অর্থনীতিতে সম্পদ-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? উপযুক্ত উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[What is meant by 'resource'? Is there any need for its conservation in the economic development of any country? Illustrate your answer with suitable examples.] [W. B. H. S. Exam. 1978]

২। সম্পদের সংজ্ঞা লিখ ও শ্রেণীবিভাগ কর। সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর।

[Define and classify resources. Analyse the functional theory of resources.]

৩। সম্পদ সৃষ্টির উপাদানসমূহ কি কি? সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা কর।

[What are the resource-creating factors? Explain the concept of conservation of resources.]

৪। সম্পদ-সংরক্ষণ সম্পর্কিত ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। সম্পদ-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং সংরক্ষণের নীতি আলোচনা কর।

[Explain the concept of conservation of resources and discuss the need for the conservation of resources and the policies of conservation.]

৫। সম্পদ সৃষ্টির উপাদান বলিতে কি বুঝায়? সম্পদ সৃষ্টির উপাদানসমূহের বিবরণ দাও। উদাহরণের সাহায্যে তোমার আলোচনা স্পষ্ট কর।

[What is meant by resource-creating factors? Describe briefly the resource-creating factors. Give suitable illustrations.]

৬। সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব ও ক্রমবর্ধমান সম্পদচেতনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

[Discuss in detail the Functional Theory of Resources and the modern trend in resource conciousness.]

৫ মনুষ্য সম্পদ (Human Resources)

মানুষের দ্বৈত ভূমিকা (Dual Role of Man)

মানুষকে কেন্দ্র করিয়া সম্পদের ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষের অভাব ব্যক্তিগত ও সামাজিক। ইহা যেমন অন্তহীন তেমনি ইহার অভাব পূরণে মানুষের প্রচেষ্টাও বিরামহীন। প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে মানুষ নিজ কর্মপ্রচেষ্টায় সম্পদে পরিণত করে এবং ভোগ করে। জমি বা জলশক্তি ছিল নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক উপাদান। মানুষ নিজবুদ্ধি বলে ঐ জমিতে চাষ আবাদ করিয়া শস্য উৎপন্ন করে এবং উহার সাহায্যে খাদ্যের অভাব পূরণ করে। জলশক্তির সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করে, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে বা পরিবহণের ব্যবস্থা করে। এইভাবে মানুষ প্রাকৃতিক উপাদানগুলির সাহায্যে সম্পদ সৃষ্টি করিয়া ভোগ করে। সম্পদের সহিত মানুষের সম্পর্ক দ্বৈত। মানুষ একাধারে সম্পদের সৃষ্টিকারী ও ভোগকারী।

মানুষের অভাব দুই প্রকার—মৌলিক ও সাংস্কৃতিক। মানুষের জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম যে সকল উপাদান বা সম্পদ প্রয়োজন উহার অভাবকেই মৌলিক অভাব বলা যায়; যেমন খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব, বাসস্থানের অভাব ইত্যাদি। মৌলিক অভাব পূরণই মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন। কিন্তু জীবনমানের উন্নয়নের সহিত মানুষের আরও বিভিন্ন প্রকার সামগ্রীর ও সামাজিক সুযোগসুবিধার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইগুলি মানুষের বিলাসের আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভূত। এই কারণে এই সকল অভাবকে সাংস্কৃতিক অভাব বলা যায়, যেমন—মোটর গাড়ি, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন ইত্যাদির অভাব। মৌলিক অভাবের পরিধি সীমিত। কিন্তু সাংস্কৃতিক অভাব মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সহিত, তাহার জীবনমানের উন্নতির সহিত ক্রম-সম্প্রসারণশীল।

সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষ শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শ্রমই নিয়োগ করে। প্রাকৃতিক সম্পদই মানুষের বিভিন্ন প্রকার অভাব পূরণের উৎস। মানুষ নিজবুদ্ধি ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া প্রাকৃতিক সম্পদের রূপান্তর ঘটায় এবং তাহার প্রয়োজনীয় নানাবিধ ভোগ্যবস্তু ও ব্যবহারযোগ্য বস্তু উৎপাদন করে। ভূমি প্রাকৃতিক সম্পদ। মানুষ নানা প্রক্রিয়ায় ঐ ভূমি চাষ করিয়া ফসল ফলায়। বৃষ্টিপাতের অভাবে ব্যাপক সেচের ব্যবস্থা করে, উন্নত বীজ বপন করে এবং সার প্রয়োগ করে। আবার ভূগর্ভ হইতে নানাবিধ খনিজ সম্পদ উত্তোলন করিয়া নানা প্রক্রিয়ায় উহাকে ব্যবহার করিয়া মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় বাড়ি, গাড়ি, রেল, জাহাজ কত কি তৈয়ার করে। মানুষ তাহার বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা সম্পদ সৃষ্টির বাধাসমূহ দূর করিয়া ক্রমাগত উন্নততর ভোগ্যবস্তু ও বিলাসদ্রব্যসমূহ তৈয়ার করে ও তাহার অভাব দূর করে। সুতরাং

প্রাকৃতিক সম্পদের সহিত মানুষের শ্রমের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যতীত মানুষের অভাব দূরীকরণের উপযোগী কোন বস্তুই উৎপন্ন হইতে পারে না। সম্পদ সৃষ্টিকারী হিসাবে মানুষের কার্যকরী ভূমিকার গুরুত্ব এই কারণেই অপরিসীম।

মানুষ যাহা কিছু উৎপাদন করে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নিজের অভাব পরিতৃপ্ত করা। অভাবের তাড়নাই মানুষকে নানাবিধ কার্যে প্রেরণা যোগায়। ভূমি হইতে উৎপন্ন শস্যাদি মানুষ তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য গ্রহণ করে বা নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাহার ভোগ বা ব্যবহারোপযোগী বিবিধ পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করিয়া ভোগ করে। বিভিন্ন শিল্পের মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যাদিও মানুষ তাহার জীবন যাপনের প্রয়োজনেই ব্যবহার করিয়া থাকে। মোট কথা, ভোগের প্রয়োজনেই উৎপাদন এবং ভোগের কর্তা মানুষ নিজেই। মানুষের অভাব পূরণের তথা ভোগের কোন প্রয়োজন না থাকিলে এই বহু বিস্তৃত ব্যাপক উৎপাদন ব্যবস্থারও প্রয়োজন হইত না। সুতরাং সম্পদের ভোগকারী হিসাবে মানুষ অনন্য এবং সম্পদের সৃষ্টিকারী ও ভোগকারী হিসাবে মানুষের ভূমিকাও অনন্য।

মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনধারার পরিবর্তনের সহিত উৎপাদন ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ উৎপাদনের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে এবং প্রয়োগ করে। ফলে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের সহিত সমাজে সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও জনকল্যাণের প্রসার ঘটে। সম্পদ সৃষ্টিতে ও তাহার ব্যবহারে মানুষই সর্বাপেক্ষা গতিশীল উপাদান। উৎপাদনের উপাদান হিসাবে মানুষের ভূমিকা যাহাতে অধিকতর ক্রিয়াশীল ও ফলপ্রসূ হয় তাহার জন্য শিক্ষা, দীক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

[প্রশ্ন : (১) সম্পদ সম্পর্কে মানুষের দ্বৈত ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। (২) মানুষের অভাব কয় শ্রেণীর এবং কি কি? প্রত্যেক শ্রেণীর অভাবের তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও। (৩) মানুষের জ্ঞান ও বৃদ্ধির সহিত অভাবের সম্পর্ক কিরূপ?]

মনুষ্যবসতির ঘনত্ব এবং মানুষ ও জমির অনুপাত
(Population Density and Man/Land Ratio)

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সব কিছুই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভূমির সহিত সম্পর্কযুক্ত। এই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিচার বিশ্লেষণে মানুষের সহিত ভূমিভাগের আনুপাতিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মানুষের সহিত ভূমির সম্পর্ক : (ক) মনুষ্যবসতির ঘনত্ব এবং (খ) মানুষ ও ভূমির অনুপাত—এই দুইটি পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়।

(ক) মনুষ্যবসতির ঘনত্ব (Population Density)—মনুষ্যবসতির ঘনত্ব বলিতে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী অধিবাসীদের সংখ্যার সহিত ঐ ভূখণ্ডের

পরিমাণগত সম্পর্ককে বুঝায়। অর্থাৎ কোন অঞ্চলের মোট জমি ও লোকসংখ্যার অনুপাতকেই জনসংখ্যার ঘনত্ব বলা হয়। মিশরে মোট জমির পরিমাণ ১০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং মোট জনসংখ্যা ২৬০ লক্ষ। অতএব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মিশরে ২৬ জন লোক বাস করে। অথবা মিশরে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৬ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব তত্ত্বের সাহায্যে কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা বা গতিপ্রকৃতি নিরূপণ করা যায় না। কারণ ইহা জনসংখ্যার সহিত ভূমির পরিমাণের গাণিতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে, বৈষয়িক অবস্থা নির্দেশ করে না। যেমন, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে মনুষ্যবসতির ঘনত্ব প্রায় একই রকম। উভয়ই নিবিড় বসতিপূর্ণ অঞ্চল। কিন্তু বৈষয়িক উন্নতির দিক হইতে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির তুলনায় অনেক গুণ বেশি অগ্রসর ও উন্নত। আবার কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, জাইরে, সুদান প্রভৃতি নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল। ইহাদের মধ্যে ব্রাজিল, জাইরে, সুদান অঞ্চলের তুলনায় কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া অনেক বেশি উন্নত। সুতরাং লোকবসতির ঘনত্ব কম বা বেশি এই তত্ত্ব দ্বারা কোন অঞ্চলের বৈষয়িক অবস্থা নিরূপণ করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে বৈষয়িক উন্নতি নির্ভর করে ভূমি ও জনসংখ্যার গুণগত অনুপাতের উপর, ইহার সংখ্যাগত বা পরিমাণগত অনুপাতের উপর নহে।

(খ) মানুষ/ভূমির অনুপাত (Man/Land ratio)—মানুষ/ভূমির অনুপাত দ্বারা মানুষের সহিত ভূমির পরিমাণগত ও গুণগত সম্পর্ক উভয়ই বুঝায়। ইহা একটি পরিমাণ ও গুণগত সংজ্ঞা। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে জনসংখ্যার সহিত ঐ অঞ্চলের ভূমিগত পরিমাণ নির্ধারণ করিতে ঐ অঞ্চলের ভূমিভাগের জনসংখ্যা পোষণের কার্যকরী ক্ষমতারও মূল্যায়ন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মিশরের ভূমিভাগের পরিমাণ ১০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার হইলেও উহার বেশির ভাগ অংশই মরুপ্রায় এবং কৃষিকার্য বা অন্যপ্রকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুপযুক্ত। ঐ সমগ্র এলাকার মাত্র ৩৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা চাষ আবাদ ও অন্যান্য সম্পদ উৎপাদনের কার্যে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং এই ৩৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার ভূভাগ মিশরের কার্যকরী ভূমির পরিমাণ। ফলে মোট জনসংখ্যার সহিত ইহার অনুপাত নির্ণয় করিলে দেখা যাইবে যে ঐ দেশের জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৭৫০ জন। সোভিয়েট ইউনিয়নের পশ্চিম অংশে বা চীন দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে জনসংখ্যার ঘনত্ব যথেষ্ট বেশি। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন বা চীনের সমগ্র ভূভাগের তুলনায় এই ঘনত্ব মোটেই বেশি নহে। 'মানুষ/ভূমির-অনুপাত' অনুযায়ী ভূমি বলিতে ভূমির পরিমাণকে না বুঝাইয়া ইহার কার্যকরী ক্ষমতাকে বুঝাইয়া থাকে।

ভূমির কার্যকারিতা গতিশীল। মানব সভ্যতার বিকাশের সহিত, মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত ভূমির ব্যবহারেও বহু পরিবর্তন ঘটিতেছে। কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তনের সাহায্যে মানুষ একই ভূমি হইতে পর্যায়ক্রমে নানাপ্রকার ফসল উৎপাদন

করিতে পারে বা বনজ সম্পদ আহরণ করিতে পারে এবং এমনকি ইহার উৎপাদন ক্ষমতাও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারে। আবার বর্তমানকালে ভূমি শুধু কৃষিজ বা বনজ সম্পদের উৎপাদনেই ব্যবহৃত হয় না। ভূমির অভ্যন্তর ভাগ হইতে খনিজ সম্পদ উত্তোলন করিয়া মানুষ নানা কাজে ঐ সম্পদের ব্যবহার করে। সুতরাং ভূমি শুধু দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সীমাবদ্ধ নহে। ইহা বেধযুক্ত ও ত্রিমাত্রিক। ইহার ফলে জনসংখ্যা পোষণে ভূমির যে কার্যকারিতা উহা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জনসংখ্যা পরিপোষণে ভূমির কার্যকরী ক্ষমতাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, (i) আভ্যন্তরীণ পোষণ ক্ষমতা (Internal carrying capacity) এবং (ii) বাহ্যিক পোষণ ক্ষমতা (External carrying capacity)।

(i) আভ্যন্তরীণ পোষণ ক্ষমতা—কোন অঞ্চলে বসবাসকারী অধিবাসীদের পোষণে ঐ অঞ্চলের ত্রিমাত্রিক ভূমি ভাগের যে কার্যকরী ক্ষমতা উহাকে ঐ অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ পোষণ ক্ষমতা বলা যায়। এই ক্ষেত্রে অঞ্চলটির ভূমিভাগের আয়তন, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানই এ অঞ্চলের ভূমির আভ্যন্তরীণ পোষণ ক্ষমতার মূল ভিত্তি।

(ii) বাহ্যিক পোষণ ক্ষমতা—বাহ্যিক পোষণ ক্ষমতা বলিতে কোন একটি অঞ্চল অপর কোন অঞ্চল হইতে যে পরিমাণ অর্থনৈতিক সুবিধা পাইয়া থাকে উহাকে বুঝায়। বাহ্যিক পোষণ ক্ষমতার ধারণাটি সাম্রাজ্যবাদী শোষণমূলক অর্থ-ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত। এক সময় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি নিছক ক্ষমতার জোরে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে দখল করিয়া উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল। ঐ সকল উপনিবেশের বিভিন্ন খনিজ সম্পদ ও কাঁচামাল আহরণ করিয়া নিজ দেশে উহাকে শিল্পপণ্যে রূপান্তরিত করিয়া ঐ সকল পণ্য আবার উপনিবেশসমূহে চড়া মূল্যে বিক্রি করিয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি প্রভূত লভ্যাংশ উপার্জন করিয়াছিল। উপনিবেশ হইতে তাহারা যে পরিমাণ সম্পদ আহরণ করে ও ভোগ করে উহাই তাহাদের দেশের বাহ্যিক পোষণ ক্ষমতা। কারণ ঐ বাড়তি সম্পদ ঐ দেশগুলির ত্রিমাত্রিক ভূমিভাগের মধ্যে উৎপন্ন নহে। এবং ঐ দেশের জনসংখ্যা ঐ বহিরাগত সম্পদের অংশ ভোগ করে। বর্তমান কালে উপনিবেশবাদ বিলুপ্তির পথে, তথাপি মূলধন ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে বৃটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জার্মানী, হল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশ তাহাদের দেশে প্রভূত পরিমাণে বাহ্যিক পোষণ ক্ষমতা আমদানি করে এবং বৈষয়িক উন্নতির সুযোগ লাভ করে।

হল্যান্ডের ত্রিমাত্রিক ভূমিভাগের পোষণ ক্ষমতা অনুযায়ী ঐ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব হওয়া উচিত প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১২০ জন। কিন্তু বাস্তবে ঐ সংখ্যা ৯১৫ জন। এই বাড়তি জনসংখ্যা সত্ত্বেও দেশটি অতি জনাকীর্ণ নহে এবং উন্নতিশীল। ইহার কারণ হল্যান্ডের অর্থনীতি অনেকাংশে বাহ্যিক পোষণ ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে মূলধনের লগ্নী, উত্তর সাগরের গভীর অঞ্চল হইতে মৎস্য আহরণ প্রভৃতি ঐ দেশের আয়ের এক একটি বড় উৎস।

ভূমির আভ্যন্তরীণ পোষণ ক্ষমতা ও বাহ্যিক পোষণ ক্ষমতা উভয়ই অধিবাসীদের মানবিক গুণাবলীর উপর নির্ভর করে। অধিবাসীদের সংখ্যা, চাহিদা, সাংস্কৃতিক মান, উৎপাদন ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা প্রভৃতি পরিবর্তনের সহিত ভূমির পোষণ ক্ষমতারও পরিবর্তন ঘটে। ফলে অধিবাসীদের জীবনমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

জনসংখ্যার সহিত ভূমির পরিমাণগত অনুপাত কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক কোন ধারণা নির্দেশ করিতে পারে না। কিন্তু 'মানুষ-ভূমির অনুপাত' ভূমির কার্যকরী ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা হইতে মানুষের জীবনমান ও বৈষয়িক উন্নতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যাইতে পারে।

জনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকিয়া যদি ভূমির পোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অধিবাসীদের জীবনমানের বৃদ্ধি ঘটিবে। পক্ষান্তরে, ভূমির পোষণ ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকিয়া যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জীবনমান নিম্নমুখী হইবে।

সুতরাং 'মানুষ/ভূমির অনুপাত' ভূমির সহিত মানুষের গুণগত ও পরিমাণগত সম্পর্ক নির্দেশ করে। কিন্তু 'জনবসতির ঘনত্ব' শুধু পরিমাণগত সম্পর্ক নির্দেশ করে। ফলে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে প্রথমটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই উভয় প্রকার ধারণাই নিয়ত পরিবর্তনশীল।

[প্রশ্ন : (১) 'জনবসতির ঘনত্ব' এবং 'মানুষ/ভূমির অনুপাত'—কথা দুইটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। এই দুইটির কোন্‌টি দ্বারা আমরা মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারি? (২) কোন দেশের আভ্যন্তরীণ পোষণ ক্ষমতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে? (৩) দেশের বাহ্যিক পোষণ ক্ষমতা বলিতে কি বুঝায় তাহা উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। (৪) প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ না হইয়াও বৃটেন তথা ইংলণ্ডের জীবনযাত্রার মান ভারতের তুলনায় উন্নত হইবার কারণ ব্যাখ্যা কর।]

মনুষ্যবসতির ঘনত্বের তারতম্যের কারণ
(Causes of Uneven Distribution of Population)

পৃথিবীর সকল দেশে সকল অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব এক প্রকার নহে। কোথাও স্বল্প পরিসর স্থানে অধিক সংখ্যক লোক বসবাস করে, কোথাও বিস্তীর্ণ এলাকায় স্বল্প সংখ্যক লোক বাস করে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন। ইহার আয়তন ২২৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বা পৃথিবীর স্থলভাগের মোট আয়তনের প্রায় $\frac{১}{৬}$ ভাগ। ইহার লোকসংখ্যা মাত্র ২৭ কোটি বা পৃথিবীর জনসংখ্যার $\frac{২}{১৫}$ ভাগ। চীনের আয়তন ৯৫·৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনের দিক হইতে ইহা তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। কিন্তু জনসংখ্যার দিক হইতে ইহা প্রথম। ইহার বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১০২ কোটি। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার আয়তন যথাক্রমে ৩৫ লক্ষ ও ৭৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু ঐ দুইটি দেশের লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২০ কোটি ও ১ কোটি ২৩ লক্ষ। সুতরাং আয়তনের সহিত দেশের লোকসংখ্যার মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত দেশগুলির মোট আয়তন পৃথিবীর

স্থলভাগের মাত্র ১৪ শতাংশ। কিন্তু পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এই অঞ্চলেই বসবাস করে।

জনবসতির ঘনত্বের মূলে রহিয়াছে অঞ্চল বিশেষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব। মানুষ চিরদিনই জীবন ও জীবিকার সহজ সুযোগকে কেন্দ্র করিয়া ঘর বাঁধে। এই কারণে বিশ্বের যে সকল অঞ্চলে জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী উপকরণের প্রাচুর্য ও সহজলভ্যতা আছে সে সকল অঞ্চলেই নিবিড় জনবসতি গড়িয়া উঠে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, (১) প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical Environment), (২) অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economical Environment), (৩) সাংস্কৃতিক পরিবেশ (Cultural Environment)।

(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ

মনুষ্যবসতির ঘনত্বের সহিত প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলিকে তাহাদের কার্যকারিতা অনুযায়ী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত উপাদানগুলি দেশের বা অঞ্চল বিশেষের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু সম্পর্কিত। এই সকল উপাদান মানুষের সম্পদ আহরণ-প্রচেষ্টা ও পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া জনসংখ্যার ঘনত্ব বহুল পরিমাণে ইহার উপর নির্ভরশীল। ইহাদের প্রভাব সকল স্থানে এবং সর্বদা লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাদানগুলি—মৃত্তিকা, জলভাগ, উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত। এই সকল উপাদান হইতে মানুষের জীবিকার উপযোগী উপকরণ পাওয়া যায়। ইহাদের প্রভাব সকল স্থানে ও সর্বদা একপ্রকার নহে। এই উপাদানগুলি আলাদাভাবে বা একত্রে জনসংখ্যার বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করে। লোকবসতির ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল।

ভূ-প্রকৃতি—মানুষের বসবাসের পক্ষে সমতলভূমি সর্বাধিক উপযোগী। গৃহনির্মাণ, কৃষিকার্য, শিল্প-পরিচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে সমতলভূমি সুবিধাজনক বলিয়া এই সকল অঞ্চল সর্বাধিক জনাকীর্ণ। ভারতের সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি, অস্ট্রেলিয়ার মারে-ডার্লিং সমভূমি, আমেরিকার মধ্যাঞ্চল, দক্ষিণ চীন প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। পার্বত্য অঞ্চলে গৃহ নির্মাণের অসুবিধা, কৃষিকার্য বা অন্যান্য বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপেরও বিশেষ অসুবিধা। ঐ সকল অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা অতীব দুঃসাধ্য। ভারতের হিমালয় অঞ্চল বা আমেরিকার রকি, আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চল এই কারণেই জনবিরল।

জলবায়ু—দেশের জলবায়ু ইহার আকার, আয়তন ও অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। জলবায়ু আবার মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, কৃষিকার্য, কর্মদক্ষতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া জনবসতির ঘনত্ব অনেকাংশেই জলবায়ুর উপর নির্ভর করে। মৌসুমী অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত কৃষিকার্যের পক্ষে অনুকূল। ফলে কৃষিনির্ভর জনসমাজের

বিস্তার এই সকল অঞ্চলে দেখা যায়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শ্রমশিল্পের বিশেষ উপযোগী অবস্থা আছে। ফলে ঐ সকল অঞ্চলে শিল্পনির্ভর জনসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে উষ্ণ পার্বত্য অঞ্চলের জলবায়ু, মরুভূমির জলবায়ু বা মেরু অঞ্চলের জলবায়ু মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হওয়ায় এই সকল অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব খুবই কম। ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের জনবসতির ঘনত্ব অনেকাংশে কৃষিকার্যের অনুকূল জলবায়ুর দান। আবার ইউরোপ ও আমেরিকার জনবসতির ঘনত্ব অনেকাংশে তথাকার কৃষি ও শ্রমশিল্পের অনুকূল জলবায়ুর প্রত্যক্ষ ফল।

মৃত্তিকা—কৃষিকার্যে মৃত্তিকার স্থান যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি মৃত্তিকার গুণাগুণ জনসংখ্যা বণ্টনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোন কোন স্থান শিল্পে বিশেষ উন্নত হইলেও বিশ্বের বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী আজিও কৃষিনির্ভর। ফলে উর্বর মৃত্তিকা-প্রধান নদী-বদ্বীপ অঞ্চলগুলিতেই জনসংখ্যার চাপ আজিও সর্বাধিক। অম্লধর্মী পার্বত্য মৃত্তিকা অঞ্চলে বা বালুকা বা কঙ্করময় মৃত্তিকাঞ্চলে কৃষির সুযোগের অভাবে জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক নহে। মধ্য অক্ষাংশের তৃণভূমি অঞ্চলের সারনোজেম মৃত্তিকা কৃষির পক্ষে উপযোগী বলিয়া মহাদেশগুলির মধ্যাংশের তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া বর্তমানে বহু কৃষি-খামার গড়িয়া উঠিতেছে ও ঐ অঞ্চলে জনবসতির প্রসার ঘটিতেছে।

খনিজ সম্পদ—শিল্প-সভ্যতার বিকাশের শুরু হইতে মানুষ খনিজ সম্পদের আকর্ষণে অতি দুর্গম অঞ্চলেও বসতি স্থাপন করিতেছে। আধুনিক শিল্প খনিজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল এবং খনিজ সম্পদের বণ্টন পৃথিবীতে তেমন পরিবেশানুকূল নহে। বহুলাংশে এই কারণে মানুষ অস্ট্রেলিয়ার দুর্গম মরু অঞ্চলে বা আফ্রিকার দুর্ভেদ্য অরণ্যাঞ্চলে স্বর্ণ, হীরক, তাম্র প্রভৃতি খনিজের সন্ধানে ছুটিতেছে। খনিজ তেলের সন্ধানে মানুষ অরণ্যে, পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমনকি সমুদ্রেও ডুব দিতেছে। সুতরাং এই সকল খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শিল্প-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছে; ফলে ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি দেশে শিল্পাঞ্চলগুলিতে জনবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে।

উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু বা জলভাগও জনবসতি বিস্তারে সাহায্য করে। দুর্গম অরণ্য অঞ্চল বসতির পক্ষে অনুপযোগী হইলেও বনজ সম্পদ ও জীবজন্তু আহরণ করিবার জন্য বা উহার উপর নির্ভর করিয়া অতি দুর্গম বনাঞ্চল বা বনভূমির নিকটবর্তী অঞ্চলে জনবসতি গড়িয়া উঠে। জলভাগ সহজ যোগাযোগের ও মৎস্য চাষের উপযোগী হয়। জলভাগকে কেন্দ্র করিয়া বন্দর, পোতাশ্রয় ও শিল্প-বাণিজ্যের পীঠস্থান গড়িয়া উঠে। ফলে ঐ সকল অঞ্চলে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল গড়িয়া উঠে।

(২) অর্থনৈতিক পরিবেশ

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর করে। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করে দেশের কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির প্রসারের উপর। যে সকল অঞ্চলে কৃষি বা শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের সহিত জনসাধারণের জীবনমানের উন্নতি

ঘটে সেই সকল অঞ্চলে জনবসতি নিবিড় হইয়া উঠে। অনুন্নত অঞ্চল হইতে উন্নত ও উন্নয়নশীল অঞ্চলে লোক-চলাচল শুরু হয়। সাম্প্রতিককালে এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় মনুষ্য-চলাচল ইহার উদাহরণ। ইউরোপ বা আমেরিকার মনুষ্যবসতির ঘনত্ব শুধু স্থানীয় সম্পদের উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠে নাই। রাজনৈতিক কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে সম্পদ আহরণে এই অঞ্চলগুলির সুবিধা রহিয়াছে।

(৩) সাংস্কৃতিক পরিবেশ

শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তন বিভিন্নমুখী। ইহার প্রভাবে মানুষের জীবনযাপন প্রণালী, জীবিকা-প্রচেষ্টা প্রভৃতির বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং জনবসতির ঘনত্বের তারতম্য ঘটিয়াছে। স্থানে স্থানে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানুষ অনুকূলে আনিয়া সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিতেছে। এই প্রকার অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব লক্ষ্য করা যায়। সাংস্কৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত বিষয়গুলির মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির প্রসার, জনস্বাস্থ্য-সংরক্ষণ, পরিবার-পরিকল্পনার প্রসার, বহিরাগত আয় ও সম্পদের পরিমাণ ইত্যাদি প্রধান। মানুষের সমাজে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের ফলে কৃষি, শিল্প বাণিজ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ইহাতে অধিক সংখ্যক লোকের জীবিকার সংস্থান হয় বলিয়া জনবসতির প্রসার ঘটে। আবার জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, পরিবার-পরিকল্পনা প্রভৃতির প্রসারে মৃত্যুহার কম হয়, উন্নত জীবনযাত্রার প্রসার ঘটে। ইহাতেও জনবসতি ক্রমে নিবিড় হয়।

[প্রশ্ন : (১) জনবসতির ঘনত্ব কোন্ কোন্ বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়? (২) এমন দুইটি প্রাকৃতিক পরিবেশের নাম কর যাহাদের প্রভাব পৃথিবীর সর্বত্রই অনুভূত হয়। জনবসতি নিয়ন্ত্রণে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ দুইটির প্রভাব আলোচনা কর। (৩) কি কারণে মরুভূমিতেও ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়? এই প্রকার দুইটি উদাহরণ উল্লেখ কর। (৪) বসতির ঘনত্ব কিরূপে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহার বিবরণ দাও। (৫) পৃথিবীর তিনটি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল নির্দেশ কর।]

কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বের ধারণা
(Concept of Optimum Population)

কোন দেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে ঐ দেশে উৎপাদিত মোট সম্পদ ও উহার বণ্টনের উপর। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঐ দেশে যে পরিমাণ সম্পদ ও উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইতে পারিলে যে পরিমাণ সম্পদ সৃষ্টি হইবে উহার সুষ্ঠু বণ্টনের ফলে অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ স্তরে পেঁছাইবে। কিন্তু সম্পদ সৃষ্টির সকল সম্ভাবনাকে যদি কাজে লাগাইতে না পারা যায়, তাহা হইলে জীবন যাত্রার মানের আশানুরূপ পরিবর্তন

ঘটিবে না। সম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা নির্ভর করে একদিকে দেশের অধিবাসীদের সংখ্যা, তাহাদের কর্মপ্রচেষ্টা, কর্মদক্ষতা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এবং অপরদিকে দেশের 'কার্যকরী ভূমির' উপর। ভূমির কার্যকারিতা এই ক্ষেত্রে উহার আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পোষণক্ষমতাকে বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ জনসংখ্যার সহিত কার্যকরী ভূমিভাগের অনুপাতের উপরই জীবনমান নির্ভর করে। সুতরাং জনসংখ্যা যদি দেশের কার্যকরী ভূমির তুলনায় বেশী হয়, তাহা হইলে জীবনমান নিম্নগামী হইবে। আবার জনসংখ্যার তুলনায় কার্যকরী ভূমির পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহা হইলে জীবনমান ঊর্ধ্বগামী হইবে। বস্তুত, এই দুইয়ের মধ্যে একটি আদর্শ অনুপাতকে কাম্য (optimum) অনুপাত বলা যায়। অর্থাৎ মানুষ ও ভূমির 'আদর্শ" অনুপাতই কাম্য জনসংখ্যা নির্দেশ করে।

অর্থনীতিশাস্ত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধি নামে একটি নিয়ম আছে। ইহাতে দেখা যায় যে, একখণ্ড জমিতে শ্রমিক, 'হাল', বীজ ইত্যাদির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া গেলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু অতিরিক্ত যে সকল উপাদান নিয়োগ করা হইবে উহার সহিত আনুপাতিক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে না। নিম্নের উদাহরণটি লক্ষণীয় :

মনে করা যাক্, জমির পরিমাণ এক বর্গ কিলোমিটার; উহা স্থির। শ্রমিকের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত উহার কোন পরিবর্তন ঘটিবে না।

শ্রমিক+হালের সংখ্যা	মোট উৎপাদন গম টন হিসাবে	শ্রমিক প্রতি গড় উৎপাদন টন হিসাবে
১ + ১	২	২
২ + ২	৬	৩
৩ + ৩	১২	৪
৪ + ৪	১৪	৩½
৫ + ৫	১৫	৩
৬ + ৬	১৬	২⅓

উপরের উদাহরণটি হইতে দেখা যায় যে, ঐ একখণ্ড জমিতে ৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করিলেই উৎপাদন শ্রমিক পিছু সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। উহার কম বা বেশী শ্রমিক নিয়োগ করিলে উৎপাদন শ্রমিক পিছু কম হয়। অর্থাৎ শ্রমিকের সংখ্যা ৩ এর কম হইলে যেমন চাষ ভাল না হইবার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না তেমনি শ্রমিকের সংখ্যা ৩ এর বেশী হইলে জমির নির্দিষ্টতা হেতু অনিয়োজিত অলস শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও শ্রমিক পিছু উৎপাদন হ্রাস পায়। সুতরাং ঐ এক বর্গ কিলোমিটার জমি চাষ করিতে ৩ জন শ্রমিক ও সময়ানুযায়ী তাহাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিই আদর্শ, ইহার কমও নহে, বেশীও নহে। ইহাকেই জমির সহিত শ্রমিক ও অন্যান্য উপাদানের কাম্য (optimum) অনুপাত বলা যায়।

উপরি-উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি দেশের জনসংখ্যা ও তাহাদের মাথাপিছু সম্পদের বণ্টন আলোচনা করা যায়। প্রকৃতি, মানুষ ও সংস্কৃতি এই তিনটি উপাদানের সাহায্যে সম্পদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যে দেশের বা সমাজের মাথাপিছু আয় যত বেশী সেই সমাজের জীবনযাত্রার মান তত উন্নত; মানুষের সুখ-সমৃদ্ধিও তত বেশী। পূর্বোক্ত উদাহরণের ভূমির সহিত কোন দেশের প্রকৃতি (সম্পদ-সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান), শ্রমিকের সহিত মানুষ (মোট অধিবাসী) এবং অন্যান্য উপাদানের একক (unit বা uticle)-এর সহিত সংস্কৃতির তুলনা করা হইলে নিম্নোক্ত ফলাফল লক্ষ্য করা যাইবে:

মোট জনসংখ্যা, কোটি হিসাবে	মোট জাতীয় আয় কোটি টাকা হিসাবে	মাথাপিছু গড় আয় টাকা হিসাবে
১০	১,০০০	১০০
১৫	২,২৫০	১৫০
২০	৪,০০০	২০০
২৫	৪,৩৭৫	১৭৫
৩০	৪,৫০০	১৫০

আলোচ্য দেশের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের অনুপাতে অর্থাৎ 'ভূমির কার্যকারিতা'র অনুপাতে ১০ বা ১৫ কোটি জনসংখ্যা কম। ইহাতে সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার হয় না বলিয়াই মাথাপিছু গড় আয় মাত্র ১০০/১৫০ টাকা, জনসংখ্যা ২০ কোটিতে পেঁছাইলে মাথাপিছু গড় আয় ২০০ টাকা হয়। কিন্তু জনসংখ্যা ২০ কোটি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫/৩০ কোটিতে পেঁছাইলে মাথাপিছু গড় আয় ২০০ হইতে কমিয়া ১৭৫/১৫০ টাকায় দাঁড়ায়। পূর্বের তুলনায় মাথাপিছু গড় আয় হ্রাস পায়। কারণ দেশের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় অ-নিয়োজিত অলস শ্রম সম্পদ সৃষ্টিতে সক্রিয় হয় না। সুতরাং ২০ কোটি মনুষ্যসংখ্যাই আলোচ্য দেশের ক্ষেত্রে কাম্য (optimum) জনসংখ্যা। ১০ হইতে ১৯ কোটি পর্যন্ত জনসংখ্যাকে অল্পজনাকীর্ণতা বা অল্পপ্রজতা (under-population) এবং ২০ কোটির অধিক জনসংখ্যাকে অতিজনাকীর্ণতা বা অতিপ্রজতা (overpopulation) বলা যায়।

জনসংখ্যার সহিত ভূমির কার্যকারিতার অনুপাতের উপর ভিত্তি করিয়াই জনসংখ্যা বিষয়ক ধারণাগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে যদি কার্যকরী ভূমির পরিমাণ অল্প হয় তাহা হইলে উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ মাথাপিছু কম হয়। কারণ সম্পদ উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত থাকিয়া শুধু জনসংখ্যাই বৃদ্ধি পায়। ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম সম্পদ অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে বণ্টিত হয়। এই অবস্থাকে অতিপ্রজতা বলে। আবার দেশের কার্যকরী ভূমির অনুপাতে যদি জনসংখ্যা স্বল্প হয় তাহা হইলে সম্পদ সৃষ্টির উপাদানগুলির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার না হইবার ফলে মাথাপিছু উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ কম হয়। কারণ কার্যকরী

ভূমির তুলনায় জনসংখ্যার চাপ কম। এই অবস্থাকে অল্পপ্রজতা বলা যায়। এই অবস্থায় দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ক্রমে মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন একটি স্তরে পৌঁছায় যখন মাথাপিছু সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ বা আয়ের পরিমাণ সর্বাধিক হয়। এই অবস্থায় দেশের যে জনসংখ্যা থাকে উহাকেই দেশের আদর্শ বা কাম্য জনসংখ্যা (optimum population) বলে।

উপরি-উক্ত আলোচনায় সর্বক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে অপরিবর্তিত এবং কেবলমাত্র জনসংখ্যাই পরিবর্তনশীল ধরা হইয়াছে। ইহাতে একমাত্র জনসংখ্যার বিচারে অতিজনাকীর্ণতা বা অল্পজনাকীর্ণতার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু সম্পদ-সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিটি উপাদানই পরিবর্তনশীল। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সম্পদের ধারণা গতিশীল হইয়াছে। সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহের সহিত ঐ দেশের জনসংখ্যার যে অনুপাত গড়িয়া উঠে উহার ভিত্তিতেই বিষয়টি বিবেচিত হওয়া উচিত। কারণ সম্পদ-সৃষ্টির উপাদানগুলি পরিবর্তনশীল হওয়ায় কাম্য জনসংখ্যার ধারণাটিও সতত পরিবর্তনশীল। জন্ম, মৃত্যু, সম্পদ উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে কাম্য জনসংখ্যাও স্থানবিশেষে পরিবর্তিত হইয়া অতিজনাকীর্ণতা বা অল্পজনাকীর্ণতায় পরিণত হইতে পারে। কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্বটি সর্বক্ষেত্রেই আলোচ্য দেশের ভূমির কার্যকারিতার উপর নির্ভরশীল।

[প্রশ্ন : ১) কাম্য জনসংখ্যা কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (২) কোন এক দেশের কাম্য জনসংখ্যা সকল সময় এক প্রকার থাকে না কেন? (৩) কাম্য জনসংখ্যা কিরূপে আদর্শ মানুষ জমির অনুপাতের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় তাহা নির্দেশ কর।]

পৃথিবীর জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি
(World Population Trend)

বিশ্বের জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতির আলোচনা বলিতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা, বিভিন্ন অঞ্চলে মনুষ্যবসতির ঘনত্ব, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তিগণের অনুপাত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণকে বুঝায়। কারণ, জনসংখ্যার সহিত বিভিন্ন পার্থিব সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, মানুষের জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর হইতে যুগে যুগে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। এই বৃদ্ধির কারণ, মানুষের জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার কম। ১৬৫০ সাল হইতে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে লোকসংখ্যার গতি-প্রকৃতির একটি পরিসংখ্যানের ছক পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল কোটি হিসাবে :

পৃথিবীর জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (কোটিতে)

মহাদেশ	১৬৫০	১৭৫০	১৯০০	১৯৬০	১৯৮২
উত্তর আমেরিকা	০'১	০'১	৮'১	১৯'৯	২৫'৩
দক্ষিণ আমেরিকা	১'২	১'১	৬'৩	২১'৬	৩৮'২
ইউরোপ	১০'০	১৪'০	৪০'০	৪২'৫	৫৮'৭
সোভিয়েত রাশিয়া	—	—	—	২১'৪	২৭'১
এশিয়া	৩৩'০	৪৮'০	৯৪'০	১৬৯'৩	২৬৭'২
আফ্রিকা	১০'০	৯'৫	১২'০	২৭'৫	৪৯'৯
ওশিয়ানিয়া	০'২	০'২	০'৬	১'৫	২'৩
পৃথিবী	৫৪'৫	৭২'৯	১৬১'০	৩০১'৭	৪৫৮'৬

প্রাচীন উদ্ভিজ্জ সভ্যতার যুগে (Vegetable civilisation) মানুষের জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের হারই ছিল অধিক, ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল সামান্য। এই সময়ে শিশু মৃত্যুর হার ছিল সর্বাধিক। অবৈজ্ঞানিক ও অনুন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য বিষয়ে অজ্ঞতা, যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তৎকালীন সমাজে উচ্চ মৃত্যুহারের কারণ। ইহা ছাড়া সাধারণভাবে জীবিকা-নির্বাহের জন্যও মধ্য যুগের শ্রমিককে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। ইহাতে অকালে তাহারা অকর্মণ্য ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িত। ইহার ফলে আবার সমাজে কর্মক্ষম শ্রমিকের সংখ্যাও হ্রাস পাইত। শিল্পযুগ তখনও শুরু হয় নাই। সুতরাং উদ্বৃত্ত প্রদায়ী উৎপাদনব্যবস্থা, মূলধনের সৃষ্টি ও ব্যবহার, উন্নত কারিগরি দক্ষতা ও কর্মকুশলতা, উন্নত জীবনমান ইত্যাদি ঐ যুগের মানুষের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী কালে যান্ত্রিক সভ্যতার (Machine civilisation) সূত্রপাত হয়। যন্ত্রের সাহায্যে স্বল্প আয়াসে বহুল উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। ফলে শ্রমিকের কর্মক্ষম অবস্থায় দীর্ঘকাল উৎপাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের বাধাও অপসারিত হয়। কারিগরি বিদ্যার নতুন নতুন প্রয়োগ, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার ইত্যাদি মানুষের সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়, মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করে এবং মৃত্যু হারও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। শিশু-মৃত্যুর হার বর্তমানে খুবই সামান্য।

উদ্ভিজ্জ-সভ্যতার যুগ ও যন্ত্র-সভ্যতার যুগের কর্মক্ষম ব্যক্তি ও কর্মে অনুপযুক্ত ব্যক্তিগোষ্ঠীর একটি তুলনামূলক ছক নিম্নে দেওয়া হইল :

যুগ	ব্যক্তিগোষ্ঠী	অনুপাত
উদ্ভিজ্জ-সভ্যতার যুগ	শিশু, বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য,	বৃহত্তর গোষ্ঠী
	কর্মক্ষম	ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী
যন্ত্র-সভ্যতার যুগ	শিশু, বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য,	ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী
	কর্মক্ষম	বৃহত্তর গোষ্ঠী

শিশু-মৃত্যু হ্রাস পাওয়ায় এই সকল শিশু ভবিষ্যতে কর্মক্ষম হইয়া সম্পদ সৃষ্টি দ্বারা সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়তা করিতে পারে। কারিগরী বিদ্যার প্রসারের ফলে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শ্রমিককে পূর্বের ন্যায় ১২/১৬ ঘণ্টা কোথাও পরিশ্রম করিতে হয় না। ইহাতে সমাজে অবসর যাপনের অবকাশ সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নেরও সুযোগ ঘটিয়াছে। নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার ইত্যাদির ফলে মানুষের সম্পদ-সৃষ্টির সম্ভাবনাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

শিল্প-বিপ্লবের পর হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত ঘটিতেছে এবং বর্তমানে এই হার আরও দ্রুত হইয়াছে। জীবনমানও বিশেষভাবে উন্নত হইয়াছে। ফলে জন্ম-মৃত্যুর হারও হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু মৃত্যু হার যে পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে উহাতে পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। আধুনিক জনসংখ্যাতত্ত্বের ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্তমান পৃথিবীতে লোকসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাইতেছে উহাতে অনেক অর্থনীতিবিদ্ ও সমাজবিদ্ আতঙ্কিত। ইউরোপ-আমেরিকার শিল্পোন্নত দেশগুলিতে জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে জনসাধারণ পরিবার-পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছে। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে এখনও জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়া উঠে নাই। জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রকৃত হার কি এবং ভবিষ্যতে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা কি হইবে এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বৎসরে গড়ে শতকরা ২ জন। ১৯৬৩ হইতে ১৯৭১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার অপরিবর্তিত। কিন্তু ১৯৭৫-৮০ সালে এই হারের পরিবর্তন লক্ষণীয়। নিম্নে বিভিন্ন মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ও প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতির গড় ঘনত্ব দেখান হইল:

পৃথিবীর জনবসতির ঘনত্ব ও বৃদ্ধির হার

মহাদেশ	(গড়) জনঘনত্ব	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	
		১৯৬৩-৭১	১৯৭৫-৮০
পৃথিবী	৩৪	২.০	১.৭
আফ্রিকা	১৬	২.৬	২.৯
উত্তর আমেরিকা	১২	১.৫	১.০
দক্ষিণ আমেরিকা	১৯	২.৭	২.৫
এশিয়া	৯৭	২.৩	২.১
ইউরোপ	৯৯	০.৮	০.৪
সোভিয়েত রাশিয়া	১২	১.১	০.৯
ওশিয়ানিয়া	০৩	২.১	১.৫

জনসংখ্যাবৃদ্ধির এই গতি অপরিবর্তিত থাকিলে আগামী ২০০০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে তাহার একটি আনুমানিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

লোকসংখ্যা (মিলিয়নে বা ১০ লক্ষে)

	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯৫	২০০০
পৃথিবী—	৪,৪৩২	৪,৯৩৩	৫,৯৬১	৬,৪৯৩
আফ্রিকা—	৪৭০	৫৫০	৭১২	৮১৭
আমেরিকা—	৬১২	৭১৫	৮৮৯	৯৮৫
এশিয়া—	২,৫৭৯	২,৮৭৪	৩,৪৮০	৩,৭৭৮
ইউরোপ—	৪৮৪	৫১৫	৫৫০	৫৬৮
ওশিয়ানিয়া—	২৩	২৬	৩২	৩৫
সোভিয়েট রাশিয়া—	২৬৫	২৮৬	৩১৬	৩২৯

জনসংখ্যাবৃদ্ধির এই হার নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধির এই হার সম্ভবত কিছুটা স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। কারণ ১৯৮০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ৪৪৩'২ কোটি। অধিকন্তু বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ফলে আগামী ১০ বৎসরে এই বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা, ইহাতে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা দূরীভূত হইবে আশা করা যায়।

[প্রশ্ন : (১) পৃথিবীর জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (২) 'উদ্ভিজ্জ-সভ্যতা' এবং, যন্ত্র-সভ্যতা'—কথা দুইটির তাৎপর্য কি ? এই দুই প্রকার সভ্যতায় জনসমষ্টির কাঠামোগত পার্থক্য কিরূপ হয় ?]

পৃথিবীর জনসংখ্যা বণ্টন
(World Distribution of Population)

পৃথিবীর সর্বত্র মনুষ্যবসতি সমান নহে। লোকবসতির সহিত মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিশেষ সম্পর্ক আছে। জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সহজ সুযোগকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে মানুষের বসতি। জনসংখ্যা গতিশীল, এই কারণে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সুযোগ-সুবিধাই মানুষের বসতিবিস্তারে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব বিচারে পৃথিবীকে চারিটি বসতি-ঘনত্ব অঞ্চলে (Density Zone) ভাগ করা যায়, যেমন—(১) প্রায় জনবসতিহীন অঞ্চল, (২) বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চল, (৩) নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল এবং (৪) নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল।

(১) প্রায় বসতিহীন অঞ্চল (Lowest Density Area)

এই অঞ্চলের মনুষ্যবসতির ঘনত্ব কোথাও প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২ জনের বেশি নহে। জলবায়ুর প্রতিকূলতাই ইহার জন্য মুখ্যত দায়ী। পৃথিবীর ভূমিভাগের প্রায় অর্ধাংশ জলবায়ুর প্রতিকূলতার জন্য প্রায় জনহীন। **শীতল মেরুদেশীয় জলবায়ু অঞ্চল**—দুই মেরু অঞ্চল, অ্যান্টার্কটিকা, সোভিয়েট ইউনিয়নের সাইবেরিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও কানাডার উত্তরাংশ প্রায় বসতিহীন। কৃষিকার্য, পশুপালন নিতান্ত অসম্ভব। **উষ্ণ মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চল**—আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারি, এশিয়ার আরবের মরুভূমি, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চল, উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকোর অন্তর্গত মরু অঞ্চল। দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা ও প্যাটাগোনিয়া মরু অঞ্চল ইত্যাদি অতি

চিত্র ৫.১ : পৃথিবীর জনবণ্টন।

উষ্ণ জলবায়ুর কারণেই বসতিহীন। **উষ্ণ আর্দ্র নিরক্ষীয় অঞ্চল**—দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা, আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কালিমন্তান (বোর্নিও) ও নিউগিনি দ্বীপ ইত্যাদি অঞ্চলের উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু মনুষ্যবাসের উপযোগী নহে। এই অঞ্চলের মৃত্তিকাও অনুর্বর। ফলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অসুবিধাই এই অঞ্চলে জনবসতি বিস্তারের প্রধান অন্তরায়। **পার্বত্য অঞ্চল**—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চল, ভারতের হিমালয় প্রভৃতি অঞ্চলে ভূমির বন্ধুরতা ও জলবায়ুর প্রতিকূলতা ইত্যাদি কারণে জনবসতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

(২) বিরল মনুষ্যবসতিযুক্ত অঞ্চল (Sparsely Populated Area)

এই অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২ জন হইতে ২৫ জন। মহাদেশসমূহের মধ্যবর্তী তৃণাঞ্চলেই প্রধানত এই প্রকার জনবসতি দেখা যায়। পূর্বে

এই সকল অঞ্চলও প্রায় জনহীন ছিল, কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধি হেতু এই সকল অঞ্চলের তৃণভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটান হইয়াছে ও হইতেছে। আমেরিকার প্রেইরী, পম্পাস, অস্ট্রেলিয়ার ডাউন্স, এশিয়ার স্টেপ্‌স ইত্যাদি অঞ্চলে কৃষিনির্ভর জনবসতি ক্রমবর্ধমান। উত্তর ইউরোপের শীতল বনাকীর্ণ অঞ্চল, এশিয়ার মালভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলের নিম্নাংশ, আফ্রিকার মালভূমি অঞ্চল ধীরে ধীরে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইতেছে, ফলে জনসংখ্যার চাপও এই সকল স্থানে বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৩) নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল (Moderate Density Area)

মনুষ্যবসতির ঘনত্ব এই অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৫ জন হইতে ১২৫ জন। পৃথিবীর কৃষিপ্রধান দেশগুলিতেই প্রধানত এই প্রকার জনবসতি দেখা যায়। বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের সংলগ্ন ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি—ভিয়েৎনাম, লাওস, কাম্বোডিয়া, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, পশ্চিম এশিয়ার ইরাণ, ইরাক, তুরস্ক, আফ্রিকার ঘানা, নাইজেরিয়া, গিনি উপকূল, ভূমধ্য-সাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল—আলজিরিয়া, মরক্কো, দক্ষিণ ও পূর্ব-ইউরোপের অন্তর্গত দেশগুলি—রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ইতালী, স্পেন প্রভৃতিও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অধ্যুষিত কৃষি অঞ্চল নাতিনিবিড় বসতিপূর্ণ। ইহা ছাড়া আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার উপকূলভাগেও নাতিনিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল দেখা যায়, যেমন – দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনস এয়ার্স, ভ্যালপ্যারাইজো, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ, পার্থ, সিডনি ও আফ্রিকার নীল অববাহিকা প্রভৃতি। এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের সহিত স্থানে স্থানে বিশেষত ইউরোপ ও আমেরিকায় খনিজ দ্রব্য উত্তোলন ও আনুষঙ্গিক কিছু কিছু অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। কৃষিনির্ভর দেশগুলির মধ্যে বেশির ভাগই কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোন কোন দেশ উদ্বৃত্ত কৃষিজ রপ্তানি করিয়া থাকে।

(৪) নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চল (Highest Density Area)

এই অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১২৫ জনের অধিক। পৃথিবীর তিনটি জলবায়ু অঞ্চলে সর্বাধিক ঘনবসতি দেখা যায়। ফলে ঐ সকল অঞ্চলে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বাস করে।

(ক) **মৌসুমী ও চৈনিক জলবায়ু অঞ্চল**—এই অঞ্চলে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক বাস করে। এই অঞ্চলের জলবায়ু এবং নদী-অববাহিকা অঞ্চল মৃত্তিকার গুণে কৃষির বিশেষ সহায়ক। ইহা ছাড়া, এই সকল অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদের অবস্থানও অত্যধিক জনবসতির জন্য দায়ী। চীন, ভারত, জাপান, বাংলাদেশ অত্যন্ত জনবহুল দেশ এবং এই সকল দেশের স্থানে স্থানে জনসংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১,০০০ জনেরও অধিক।

(খ) **বৃটিশ আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল**—উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি, যেমন—বৃটিশ যুক্তরাজ্য, উত্তর ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে নিবিড় কৃষি, পশুশিল্প, প্রচুর খনিজ সম্পদনির্ভর বৃহদায়তন শিল্প ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ প্রভৃতি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সুবিধা থাকায় নিবিড় জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে জনবসতির ঘনত্ব ২০০ হইতে ৩০০ জনের মধ্যে।

(গ) **লরেন্সীয় জলবায়ু অঞ্চল**—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রধানত শিল্প-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। রোড আইল্যাণ্ড, ম্যাসাচুসেটস্, নিউইয়র্ক, পেনসিলভ্যানিয়া, ওহিও, ইলিনয় প্রভৃতি রাজ্যে বৃহদায়তন শিল্পের ব্যাপক প্রসার নিবিড় মনুষ্যবসতির জন্য দায়ী।

[প্রশ্ন : (১) পৃথিবীর মনুষ্যবিরলবসতি অঞ্চলগুলি উল্লেখ কর? (২) কোন্ কোন্ জলবায়ু অঞ্চলে নিবিড় মনুষ্যবসতি দেখা যায়—কারণ উল্লেখ করিয়া বর্ণনা দাও।]

অনুশীলনী ৫

১। সম্পদ সৃষ্টি ও ব্যবহারকারী হিসাবে মানুষের দ্বৈত ভূমিকা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

[Explain with example the dual role of man as creator and user of resources.]

[W. B. C. H. S. Exam. 1983]

২। মানুষ/জমির অনুপাত বলিতে কি বুঝ? লোকবসতির ঘনত্বের সহিত ইহার তুলনা কর।

[What do you mean by 'man/land ratio'? Compare this concept with 'population density'.]

৩। 'মানুষ/জমির অনুপাত তত্ত্ব' বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা কর এবং আদর্শ লোকবসতি কিভাবে মানুষ/জমির অনুপাতের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায় তাহা নির্দেশ কর।

[Explain in detail the concept of 'man/land ratio' and indicate how for population optima can be explained in terms of ideal man land ratio.]

৪। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অসম লোকবসতি বণ্টনের কারণ নির্দেশ কর। পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চলগুলির উল্লেখ কর।

[Account for the uneven distribution of population in the world. Identify the regions of densely populated areas of Eastern Hemisphere.]

[W. B. C. H. S. Exam. 1980]

৫। মানুষ/জমির অনুপাত এবং লোকবসতি ঘনত্বের মধ্যে পার্থক্য কি? পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি-ঘনত্বের তারতম্যের কারণসমূহ আলোচনা কর।

[What is the difference between 'man/land ratio' and 'population density'? Discuss the reasons for the varying density of population in different regions of the world.]

[C. U. B. Com. 1970]

৬। আদর্শ লোকবসতির সংজ্ঞা লিখ। যে সকল উপাদান দ্বারা উহা নির্ধারিত হয়, উদাহরণসহ তাহার আলোচনা কর।

[Define optimum population. Discuss the factors which determine this with specific example.]

৭। মানুষ/জমির অনুপাত বলিতে কি বুঝ? দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর। পৃথিবীর ঘনবসতি অঞ্চলের নিবিড় বসতির কারণগুলি আলোচনা কর।

[What do you understand by man/land ratio? Explain with the help of examples. Discuss the causes of high density of population in densely populated regions of the world.] [Tripura H. S. Exam. 1979]

৮। পৃথিবীর লোকবসতি বণ্টনের প্রকৃতি বর্ণনা কর।

[Describe the nature of population distribution in the world.]

[H. S. Council – Specimen question]

৬ | বিভিন্ন পার্থিব সম্পদ (World Resources)

মৎস্য-সম্পদ ও মৎস্য-চাষ
(Fish Resources and Fisheries)

সমুদ্রের অর্থনৈতিক তাৎপর্য (Economic significance of the Sea) : ভূ-পৃষ্ঠে স্থলভাগের তুলনায় জলভাগের পরিমাণ অনেক বেশী। ইহা ভূ-পৃষ্ঠের মোট আয়তনের শতকরা ষাট ভাগের কিছু বেশী। দিগন্তবিস্তৃত অতলান্ত সাগর-মহাসাগর মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। ইহার প্রভাব নিম্নে আলোচিত হইল।

মৎস্যক্ষেত্র হিসাবেই মানুষের নিকট সমুদ্রের আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা অধিক। সমুদ্র বিভিন্নপ্রকার মৎস্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। পৃথিবীতে ধৃত মৎস্যের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সমুদ্র হইতে পাওয়া যায়। খাদ্য হিসাবে মৎস্যের প্রধান ব্যবহার হইলেও ইহা হইতে নানাপ্রকার উপজাত দ্রব্যও পাওয়া যায়। তিমি, সিল প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণীর তেল, চর্ম, হাঙ্গর, কড ইত্যাদির যকৃতের তেল প্রচুর পরিমাণে আহরণ করা হয়। তিমির তেলের সাহায্যে মোমবাতি, সাবান, রং প্রভৃতি তৈয়ার হয় এবং ইহাদের হাড় হইতে চুল ও সার প্রস্তুত হয়। মৎস্য ছাড়া সমুদ্র হইতে স্পঞ্জ, প্রবাল, মুক্তা, শঙ্খ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যও পাওয়া যায়।

সমুদ্র নানাবিধ খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার। যুগ যুগ ধরিয়া সমুদ্রজল হইতে লবণ প্রস্তুত করা হইতেছে। এই লবণ হইতে ক্ষার ও ক্লোরিন প্রস্তুত করা হয়। ম্যাগনেশিয়াম, ব্রোমিন ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ পদার্থও সমুদ্র হইতে আহরণ করা হয়। সমুদ্রের নানা উদ্ভিজ্জ হইতে আয়োডিন, পটাশ তৈয়ার করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রোমিনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত ম্যাগনেশিয়ামের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সমুদ্র হইতে আহরণ করা হয়।

শক্তির বিরাট উৎস সমুদ্র। সমুদ্রের ঢেউ, জোয়ার-ভাঁটা ও স্রোত হইতে অফুরন্ত বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যাইতে পারে। পৃথিবীতে কলকারখানা চালাইতে যে পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন উহার প্রায় সবটুকুই সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। সঞ্চিত সম্পদের তুলনায় ইহা অনেক বেশী মূল্যবান, কারণ ইহা প্রবহমান সম্পদ।

সমুদ্র দেশের জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। সমুদ্রসন্নিহিত দেশগুলির জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। অধিবাসীরা উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হয়। সমুদ্রতীরবর্তী লোকেরা নৌ-বিদ্যায় দক্ষ ও সাহসী হয়।

সমুদ্রপথে নানা দেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা ও বাণিজ্য বিস্তার করা সহজ। স্থলপথে বা আকাশপথে পরিবহণ অতিরিক্ত ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু জলপথে

পরিবহণ অতিশয় সুলভ। স্থলপথ বা আকাশপথের তুলনায় জলপথে পণ্যসামগ্রী পরিবহণে সময়ের বেশী প্রয়োজন হইলেও পরিবহণ-ব্যয় খুবই সামান্য। এই কারণে জলপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

অনন্তকাল ধরিয়া সমুদ্রের তলদেশে পলি সঞ্চিত হইয়া নতুন ভূ-ভাগ সৃষ্ট হইতেছে এবং এই সকল ভূ-ভাগের অভ্যন্তর হইতে খনিজ তৈল ও নানাপ্রকার মূল্যবান খনিজ পদার্থও উত্তোলিত হইতেছে।

সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করিয়া বর্তমানে চাষের কার্যে ব্যবহার করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহা সম্ভব হইলে ভবিষ্যতে মানুষ ভয়ংকর মরুভূমিকেও সেচের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সমৃদ্ধির এক নতুন যুগের সূচনা করিবে। বর্তমানে মানুষ সমুদ্রের নিচে শহর গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে।

মৎস্য-চাষ
(Fisheries)

আদিম যুগ হইতে মানুষ খাদ্য হিসাবে মৎস্যের ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। দেশের অভ্যন্তরের খাল-বিল-নদী-নালা হইতেও মৎস্য সংগৃহীত হয়। কিন্তু মৎস্য-ক্ষেত্র বলিতে প্রধানত সমুদ্রকে বুঝায়। বিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রে প্রায় ১,৮০০ প্রকারের মৎস্য আছে। ইহার মধ্যে বেশির ভাগ মৎস্যই মানুষের অপরিচিত। বহু মৎস্য বিষাক্ত ও অখাদ্য। পুকুরে বা ঝিলে মৎস্যের ডিম ফুটানো বা পোনা প্রতিপালন করিয়া মাছের চাষ করা যায়; কিন্তু প্রবহমান জলভাগে, যেমন, নদীতে, সমুদ্রে স্বাভাবিকভাবেই মৎস্যের জন্ম হয়। মৎস্য-চাষ বলিতে নদী, সমুদ্র বা হ্রদ হইতে মৎস্য আহরণকেই বুঝায়। মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র ও পদ্ধতি অনুযায়ী মৎস্য-চাষকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) **স্বাদু জলের মৎস্য (Fresh-water Fish)**—খাল, বিল, নদী, হ্রদ, পুকুর হইতে ধৃত মৎস্য ও (২) **সামুদ্রিক মৎস্য (Sea Fish)**—সমুদ্র হইতে ধৃত মৎস্য। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণক্ষেত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—(i) **উপকূলীয় মৎস্যক্ষেত্র (Coastal Fisheries)** এবং (ii) **গভীর সমুদ্রের মৎস্যক্ষেত্র (Deep Sea Fisheries)**। পূর্বে মৎস্য কেবল ব্যক্তিগত ও স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য সংগৃহীত হইত, কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী মৎস্যের চাহিদা-বৃদ্ধির ফলে গভীর সমুদ্র হইতেও মৎস্য আহরণ করা হয়। পণ্য হিসাবে মৎস্য বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং মৎস্য-চাষ একটি বাণিজ্যে পরিণত হইয়াছে। মৎস্য আহরণের উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করিয়া মৎস্য-চাষকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—(১) স্বয়ংসম্পূর্ণ বা জীবিকা-সত্তাভিত্তিক মৎস্য-চাষ এবং (২) বাণিজ্যিক মৎস্য-চাষ। গভীর

সমুদ্রে তিমি, হাঙ্গর প্রভৃতি জলজ প্রাণী শিকার এবং প্রবাল, স্পঞ্জ, মুক্তা প্রভৃতি আহরণ মৎস্য-চাষের অন্তর্ভুক্ত।

মৎস্য-চাষ

- স্বাদু জলের মৎস্যক্ষেত্র (Fresh-water Fisheries)
  - স্বয়ংসম্পূর্ণ মৎস্য-চাষ (Subsistence Fishing)
  - বাণিজ্যিক মৎস্য চাষ (Commercial Fishing)
- সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র (Sea Fisheries)
  - উপকূলীয় মৎস্য-চাষ (Coastal Fishing)
  - গভীর সমুদ্রের মৎস্য (Deep Sea Fishing)

বাণিজ্যিক মৎস্য-চাষের গুরুত্ব
(Importance of Commercial Fishing)

মানুষের খাদ্যতালিকায় চাল বা গমজাতীয় খাদ্যের পরেই মৎস্যের অন্যতম স্থান। ধর্মীয় অনুশাসনে কোন কোন জাতির মধ্যে মৎস্যের ব্যবহার সীমিত হইলেও পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই মৎস্যভোজী। সুতরাং পৃথিবীতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত মৎস্যের চাহিদাও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে, বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রগুলিরও প্রসার ঘটিতেছে। সমুদ্র-সন্নিহিত যে সকল দেশে কৃষি-জমির বিশেষ অভাব সেই সকল দেশের উপকূলভাগের অধিবাসীরা অনেকেই ধীবর বৃত্তি দ্বারা জীবিকার সংস্থান করে। বৃটিশ যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশে মৎস্য-চাষ বাণিজ্যিক শিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। মৎস্য আহরণকে কেন্দ্র করিয়া ঐ সকল দেশে নৌ-শিল্পের প্রসার ঘটে। মৎস্য আহরণের নিমিত্ত বিভিন্ন উপকরণ, যেমন জাল, সুতা ইত্যাদি প্রস্তুতকারক শিল্পও গড়িয়া উঠে। মৎস্য কৌটাজাত করিয়া সরবরাহ করিবার জন্য কৌটা উৎপাদন-শিল্প, মৎস্য সংরক্ষণের জন্য হিমায়ন-শিল্প ইত্যাদিও গড়িয়া উঠে।

[প্রশ্ন : (১) মৎস্য-চাষকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং কি কি? (২) সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র কয় প্রকার ও কি কি? (৩) বাণিজ্যিক মৎস্য-চাষের গুরুত্ব আলোচনা কর। (৪) পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশ মৎস্য-শিকারে অধিক উন্নত?]

সামুদ্রিক মৎস্য-শিকারের আধুনিক পদ্ধতিসমূহ
(Modern Methods of Sea Fishing)

অতীতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ উপকূলভাগ হইতে ৫ হইতে ৬ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে সাধারণ নৌকা, ডিঙ্গা বা পালতোলা কাঠের জাহাজ ও সাধারণ জালই মৎস্যজীবীদের সম্বল ছিল। বর্তমানে উপকূলে মৎস্যের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য ক্রমাগত সমুদ্রের গভীরতর প্রদেশে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে। এই কারণে জড়শক্তি-চালিত উন্নত জলযান, মাছ ধরিবার যন্ত্রপাতি ও হিমায়ন যন্ত্র. জলযান ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। মাছ ধরিবার নানা যান্ত্রিক কৌশলও প্রয়োগ করা হইতেছে। শব্দ দ্বারা বা আলো দ্বারা মাছকে আয়ত্ত করা হইতেছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রচুর মূলধনের যোগান থাকায় মৎস্য-শিল্পে যান্ত্রিক কৌশল প্রয়োগ সহজ হইয়াছে। বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতি বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয়।

(১) ড্রিফ্‌ট নেট (Drift Net) পদ্ধতি . ট্রলার-এর সামনের দিকে জলের মধ্যে পর্দার মত জাল ঝুলাইয়া রাখা হয়। জলের উপরের স্তরে বিচরণকারী মৎস্য প্রধানত এই প্রকার জালে ধরা পড়ে। হেরিং বা ম্যাকারেল জাতীয় মৎস্য ঝাঁক-বদ্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা এই প্রকার জালে বেশি ধরা পড়ে।

(২) ট্রল নেট (Trawl Net) পদ্ধতি : সমুদ্রের তলদেশে বিচরণকারী মৎস্য আহরণের উদ্দেশ্যে একপ্রকার ঝুলন্ত জাল পাতা হয়। ইহার তলদেশে পকেটের মত থাকে। সাধারণত অগভীর সমুদ্রে ইহা ট্রলারের সাহায্যে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে টানিয়া যান্ত্রিক কৌশলে উপরে তোলা হয়। সমুদ্রে মগ্ন পাহাড় বা ভাঙ্গা জাহাজ ইহার সম্মুখে পড়িলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

(৩) লং লাইন (Long Line) পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে একটি মোটা তার বা দড়ির সহিত প্রচুর বড়শি থাকে। মাছের খাদ্য গাঁথিয়া ঐ বড়শিগুলি সমুদ্রের জলে ফেলিয়া রাখা হয়। মাছ ঐ টোপ গিলিয়া বড়শিতে আটকাইয়া থাকে। উত্তর-পূর্ব আটলাণ্টিক উপকূলে স্থানে স্থানে এই পদ্ধতিতে মৎস্য-শিকার করা হয়।

[প্রশ্ন : (১) মৎস্য-শিকারে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের একটি বিবরণ লিখ।]

বাণিজ্যিক মৎস্যচারণ ক্ষেত্রসমূহের গঠন ও উন্নতির কারণ
(Factors for the Development of Commercial Fishing Grounds)

পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যচারণ ক্ষেত্রগুলি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অগভীর সমুদ্রোপকূলে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে,

কতিপয় প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক উপাদানের আনুকূল্যই ইহাদের গঠন ও উন্নতিতে বিশেষ সহায়ক। প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মধ্যে (১) অগভীর সমুদ্র ও মগ্ন চড়া, (২) প্ল্যাংকটন, (৩) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, (৪) ভগ্ন সৈকতরেখা ও (৫) ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সাংস্কৃতিক ও মানবিক উপাদানগুলির মধ্যে (১) সুদক্ষ ধীবর, (২) মূলধন ও মৎস্য আহরণের যান্ত্রিক ব্যবস্থা, (৩) মৎস্যের ব্যাপক চাহিদা, (৪) উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ও (৫) হিমঘর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(ক) প্রাকৃতিক কারণসমূহ
(Physical Factors)

(১) অগভীর সমুদ্র ও মগ্ন চড়া (Shallow Seas and Sub-merged Banks): মহাদেশসমূহের সন্নিহিত সমুদ্রোপকূলে জলের গভীরতা বেশি থাকে না। ঐ সকল স্থানে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। ইহার কারণ (ক) মানুষের খাদ্য যে-সকল মৎস্য, উহারা গভীর জলে বাস করিতে পারে না। স্বল্প-চাপযুক্ত অগভীর জলেই তাহাদের আনাগোনা। (খ) মৎস্য সাধারণত অগভীর জলে তীরের নিকট ডিম্ব প্রসব করে এবং ঐ স্থানেই তাহাদের বংশবিস্তার ঘটে। (গ) দেশের অভ্যন্তর হইতে বহু নদ-নদী আসিয়া সমুদ্রে পতিত হয় এবং ঐ অগভীর অংশে নদীবাহিত বহু আবর্জনা জমিয়া উঠে। ঐ আবর্জনা হইতে মৎস্য তাহাদের খাদ্য আহরণ করে।

(২) প্ল্যাঙ্কটন (Plankton): নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সমুদ্রের অগভীর অংশে এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিজ্জ ও পোকার জন্ম হয়। এককথায় এই সকল জলজ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও কীটকে প্ল্যাঙ্কটন বলে। ইহা মৎস্যের প্রধান খাদ্য। প্ল্যাঙ্কটনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(ক) উদ্ভিজ্জ প্ল্যাঙ্কটন এবং (খ) প্রাণিজ প্ল্যাকটন। লবণাক্ত সমুদ্রজলে ভাসমান আবর্জনার মধ্যে সূর্যকিরণের প্রভাবে পচন ধরে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ প্ল্যাঙ্কটনের সৃষ্টি হয়। জলের প্রায় ২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত সূর্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে। প্ল্যাঙ্কটনের সৃষ্টিতে সূর্যকিরণ ও নানা প্রকার লবণ অপরিহার্য। নদীর মোহনা ও মগ্ন চড়া অঞ্চলে প্রচুর খনিজ লবণ জলের উপরের স্তরে জলের সহিত মিশ্রিত থাকে এবং প্ল্যাঙ্কটন সৃষ্টিতে সাহায্য করে। প্ল্যাঙ্কটনের অর্থাৎ খাদ্যের প্রাচুর্যের জন্যই এই সকল অঞ্চলে নানাবিধ মৎস্যের প্রচুর সমাবেশ ঘটে।

(৩) নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু (Temperate Climate): পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রোপকূলেই কম-বেশি মৎস্য পাওয়া যায়। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু-মণ্ডলেই সর্বাধিক মৎস্য পাওয়া যায়। ইহার কারণ (ক) ক্রান্তীয় মণ্ডলে আহরণ-যোগ্য মৎস্যের মধ্যে মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী অর্থাৎ বিষাক্ত মৎস্যের সংখ্যাই

বেশি। পক্ষান্তরে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মৎস্য বেশির ভাগই মানুষের খাদ্যোপযোগী। (খ) ক্রান্তীয় অঞ্চলে একই প্রকার মৎস্য একস্থানে প্রচুর পাওয়া যায় না। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে একই প্রকার মৎস্য একস্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। (গ) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে বিভিন্ন প্রকার সমুদ্রস্রোতের সংমিশ্রণ ঘটে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ঠাণ্ডা স্রোত ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ স্রোত পরস্পর এই অঞ্চলে সম্মিলিত হয়। ইহার ফলে এই সকল স্থানে মৎস্যের চলাচল ও বংশবিস্তারের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহা ছাড়া এই বিপরীতধর্মী স্রোতের মিলনস্থলে প্রচুর মৎস্যখাদ্য প্ল্যাঙ্কটন জন্মে। ইহাও মৎস্যের চারণক্ষেত্র গঠনে সহায়ক। (ঘ) ক্রান্তীয় অঞ্চলের জলবায়ুতে মৎস্য অতি দ্রুত পচিয়া যায়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে মৎস্য অধিক সময় তাজা থাকে এবং ইহার সংরক্ষণ সহজ হয়। (ঙ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মৃদু জলবায়ু মৎস্য শিল্পের উন্নতির সহায়ক। (চ) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার কাষ্ঠের সহজলভ্যতা মৎস্য আহরণের উপযোগী জলযান ইত্যাদি নির্মাণে বিশেষ উপযোগী।

(৪) ভগ্ন সৈকত রেখা (Broken Coast Line) : দেশের ভগ্ন সৈকতরেখা উন্নত বন্দর ও পোতাশ্রয় গঠনের উপযোগী। বাণিজ্যিক মৎস্যচারণ ক্ষেত্রগুলি সমুদ্রে অবস্থিত বলিয়া বন্দরের গুরুত্ব কোন অংশেই ন্যূন নহে। উন্নত বন্দর ও পোতাশ্রয় মৎস্য আহরণের পক্ষে অপরিহার্য। শুধু মৎস্য আহরণই নহে, মৎস্যের বাণিজ্যের জন্যও বন্দরের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট বেশি। এই সকল কারণে ভগ্ন তটরেখা মৎস্য-শিল্পের গঠন ও উন্নতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) ভূ-প্রকৃতি (Topography) : মৎস্যচারণ ক্ষেত্রের সহিত ভূ-প্রকৃতির সম্পর্ক পরোক্ষ। ভূ-প্রকৃতি স্থলভাগে কোন অঞ্চলের ভূ-সংস্থান ইত্যাদি নির্দেশ করে। সমুদ্র-সান্নিহিত অঞ্চলে ভূ-প্রকৃতি যদি কৃষিকার্যের অনুকূল না হয়, তাহা হইলে জীবিকার জন্য স্বাভাবিকভাবেই অধিবাসীরা মৎস্য আহরণে সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল হয় এবং এইভাবেই মৎস্য আহরণ-কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির ভূ-প্রকৃতি কৃষির পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল না হওয়ায় এবং কৃষিজমির অভাব থাকায় ঐ অঞ্চলের বহু অধিবাসী উত্তর সাগর হইতে মৎস্য আহরণকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবেই উত্তর সাগরে উন্নত মৎস্যচারণ ক্ষেত্রের সৃষ্টি।

(খ) সাংস্কৃতিক ও মানবিক কারণসমূহ (Cultural and Human Factors)

শুধু প্রাকৃতিক উপাদানগুলিই নহে, মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও উন্নত কারিগরি দক্ষতা ইত্যাদির সংমিশ্রণেই বাণিজ্যিক মৎস্যচারণ ক্ষেত্রগুলির বর্তমান উন্নতি ঘটিয়াছে। সাংস্কৃতিক ও মানবিক কারণগুলি এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ।

(১) **সুদক্ষ ধীবর** (Skilled Fisherman) : ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের উপকূল অঞ্চলে যে-সকল বিস্তীর্ণ মৎস্যক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে ইহাদের উন্নতিতে ঐ অঞ্চলের মৎস্যজীবী অধিবাসীদের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মূল ভূখণ্ডে কৃষিজমির অভাবই প্রধানত তাহাদের এই বৃত্তি গ্রহণের জন্য দায়ী। তথাপি তাহারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার গুণে মৎস্য-শিল্পকে একটি আন্তর্জাতিক শিল্পের মর্যাদা দিয়াছে এবং দেশীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই শিল্পকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে।

(২) **মূলধন ও যান্ত্রিক ব্যবস্থা** (Capital and Equipment): বর্তমান কালে মৎস্য আহরণ উপকূলভাগেই সীমাবদ্ধ নাই। গভীর সমুদ্রের বিভিন্ন অংশে ও মগ্ন চড়া ইত্যাদি স্থানেও ইহা প্রসারলাভ করিয়াছে। সুতরাং জাহাজ, ট্রলার, ড্রিপটার ইত্যাদি ও মৎস্য আহরণের উপযোগী জাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। মৎস্য আহরণ বর্তমানে লাভজনক ব্যবসা হওয়ায় ইহাতে প্রচুর মূলধন নিয়োগও প্রয়োজন। শিল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে এইগুলি যোগান দেওয়া সম্ভব বলিয়াই মৎস্যচারণ ক্ষেত্রের উন্নতি ঘটিতেছে।

(৩) **মৎস্যের ব্যাপক চাহিদা** (Wide demand for Fish) : মৎস্য প্রোটিন খাদ্য হিসাবে মানুষের খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ক্রান্তীয় অঞ্চলে উন্নতিশীল দেশগুলিতে এখনও ইহার চাহিদা কিছু কম, কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শিল্পোন্নত দেশেই ইহার চাহিদা ক্রমবর্ধমান। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের প্রয়োজনেই মৎস্যচারণক্ষেত্রের উন্নতি ঘটিতেছে।

(৪) **উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা** (Improved Transport and Communication) : মৎস্য-বন্দর হইতে দেশের অভ্যন্তরের বিভিন্ন বাজারে মৎস্যের দ্রুত সরবরাহ নির্ভর করে উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ইহার সহজ সুযোগ মৎস্য-বাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা করিতেছে।

(৫) **হিমঘর** (Cold Storage) : মৎস্য সংরক্ষণে হিমঘর অপরিহার্য। মৎস্য পচনশীল। ইহাকে বাজারজাত করিবার উপযোগী অবস্থায় আনিতেও কিছু সময় প্রয়োজন। এই সময়েই হিমঘরের আবশ্যকতা। বর্তমান কালে হিমঘরের সুযোগ মৎস্যচারণ ক্ষেত্রের উন্নতিতে সহায়তা করিতেছে।

[প্রশ্ন : (১) সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রের অনুকূল অবস্থাগুলি পর্যালোচনা কর। (২) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল সামুদ্রিক মৎস্য-চাষের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী কেন? এ বিষয়ে ক্রান্তীয় অঞ্চলের অসুবিধাগুলি তুলনামূলকভাবে আলোচনা কর। (৩) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : মগ্ন চড়া, প্ল্যাঙ্কটন, মহীসোপান, ভগ্ন তটরেখা ও হিমঘর।]

পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যচারণ ক্ষেত্রসমূহ
(Fisheries of the World)

বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্র হিসাবে পৃথিবীতে চারিটি অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। যেমন—

(১) উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলভাগ।
(২) উত্তর সাগর ও ইউরোপের পশ্চিম উপকূলভাগ।
(৩) উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূলভাগ।
(৪) উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূভাগ।

(১) উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলভাগ : ইহা বিশ্বের অন্যতম প্রধান মৎস্যচারণক্ষেত্র। জাপান, চীনের পূর্ব উপকূল, কোরিয়া, সাখালিন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব উপকূল সন্নিহিত সমুদ্রবলয়কে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা দক্ষিণে অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশ হইতে উত্তরে প্রায় মেরুসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মৎস্যক্ষেত্রের আয়তন প্রায় তেইশ লক্ষ বর্গ কি.মি.। এই অঞ্চলে বিস্তৃত অগভীর

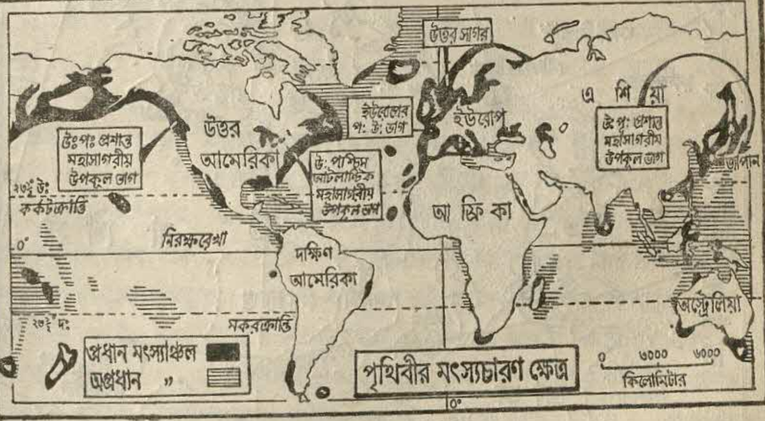

চিত্র ৬.৯ : পৃথিবীর মৎস্যচারণ ক্ষেত্র।

সমুদ্র, উষ্ণ কুরোসিও ও শীতল কিউরাইল স্রোতের মিশ্রণ, প্রচুর প্ল্যাংকটন ইত্যাদির অবস্থিতির জন্য ব্যাপক মৎস্যচারণ ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই মৎস্যক্ষেত্র হইতে মৎস্য আহরণে প্রধানত জাপান, রাশিয়া ও চীনের অধিবাসীরা অংশগ্রহণ করে। দেশের অভ্যন্তরে মাংসপ্রদায়ী পশুপালন-শিল্প তেমন উন্নত না হওয়ায় মৎস্যের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। সমগ্র মৎস্যের প্রায় ৮০ ভাগ মৎস্যই উত্তর চীন, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ, হনসু, হোক্কাইডো, কোরিয়া, সাখালিন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিকটবর্তী সমুদ্র হইতে ধৃত হয়। সার্ডিন, হেরিং, বনিটো, চিংড়ি প্রভৃতি মাছই এই অঞ্চলের প্রধান আহরণ। ইহা ছাড়া পিলকার্ড,

ম্যাকারেল, কড, পোলক, টুনা, কাটলফিস, ঝিনুক, কাঁকড়া এবং মাঝে মাঝে এই অঞ্চলে হাঙর ও অক্টোপাসও ধৃত হয়। এই অঞ্চলে জাপানের অধিবাসীরা সর্বাপেক্ষা বেশি মৎস্য আহরণ করে। জাপানের পরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের স্থান। অখাদ্য মৎস্য নষ্ট না করিয়া ইহার দ্বারা সার প্রস্তুত করা হয়। এই অঞ্চলে কৃত্রিম মুক্তার ব্যবসায় প্রসার লাভ করিতেছে। মৎস্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জাপানের অংশ তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। কারণ ধৃত মৎস্যের প্রায় ৮০% আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণে প্রয়োজন হয়।

(২) উত্তর সাগর ও ইউরোপের পশ্চিম উপকূলভাগ : উত্তর-পূর্ব আটলান্টিক মহাসাগরের অন্তর্গত স্পেনের উপকূলভাগ হইতে ইউরোপের সমগ্র

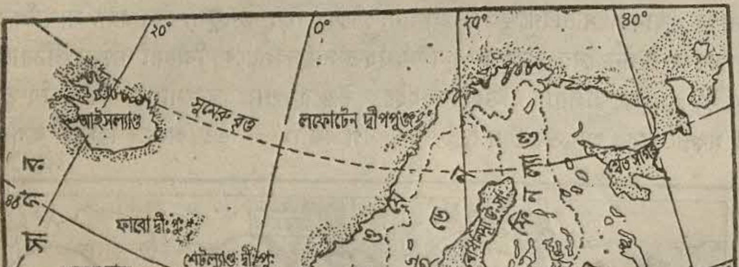

চিত্র ৬.২ : উত্তরসাগর ও উত্তর-পূর্ব আটলান্টিক মৎস্যাঞ্চল।

পশ্চিম উপকূলভাগ, বৃটিশ যুক্তরাজ্যের উত্তরে অবস্থিত উত্তর সাগর এবং উত্তর-পূর্ব দিকে রাশিয়ার উত্তরে অবস্থিত শ্বেতসাগর পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। এইটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মৎস্যচারণ ক্ষেত্র। সমগ্র মৎস্য ক্ষেত্রটি একটি বিশাল অগভীর মহীসোপান বা মগ্ন চড়া। এই মগ্ন চড়ার মধ্যে ডগার্স ব্যাংক, গড উইনব্যাংক, স্যাণ্ড ব্যাংক, পিট ও ওয়েলস ব্যাংক, বার উইক ও মার ব্যাংক, লংফোরটিস, হর্নরিপ প্রভৃতি

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে ডগার্স ব্যাংক সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মৎস্যক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রের আয়তন প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গ কি.মি। ইহার উন্নতির মূলে রহিয়াছে (ক) এই অঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, (খ) অগভীর সমুদ্র ও বৃহৎ মগ্নচড়া, উত্তর সাগর ডগার্স ব্যাংক, লফোটোন দ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল মৎস্যের ডিম্বপ্রসার ও খাদ্য আহরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র। (গ) শীতল স্রোত ও উষ্ণ আটলান্টিক স্রোতের মিলনস্থল নানা প্রকার মৎস্যের আবাস। (ঘ) ইউরোপের বহু নদ-নদী-বাহিত আবর্জনা এই অঞ্চলের মৎস্য-খাদ্য সৃষ্টি করে। (ঙ) ইউরোপের জনবহুল দেশগুলিতে মৎস্যের প্রচুর চাহিদা। বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড, নরওয়ে এবং আইসল্যান্ড এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্য আহরণকারী দেশ। বেলজিয়াম, ডেনমার্ক এবং স্পেনও এই অঞ্চলে মৎস্য আহরণে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। নরওয়ে এই অঞ্চলে মৎস্য আহরণে ও ব্যবসায় শীর্ষস্থান অধিকার করে। বৃটিশ যুক্তরাজ্যের গ্রীমসবি, ইয়ারমাউথ, এবারডীন, পিটারহেড প্রভৃতি বিখ্যাত মৎস্য-ব্যবসায়ের কেন্দ্র। এই অঞ্চলে ধৃত মৎস্যের মধ্যে কড, হেরিং, স্যামন, হ্যাডক ও ম্যাকারেল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নরওয়ের উপকূলভাগে ফিয়র্ড বা খাঁড়ি এবং লফোটন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে বিস্তৃত অগভীর অঞ্চল। মৎস্য আহরণের প্রধান কেন্দ্র। নরওয়ের অধিবাসীদের এক বৃহৎ অংশ মৎস্য-শিল্পের উপর নির্ভরশীল, এই অঞ্চলে প্রধানত কড ও হেরিং ধৃত হয়। এই অঞ্চলে প্রচুর তিমি মাছও ধরা পড়ে। হ্যামারফেস্ট, বার্জেন, টমসো, প্রভৃতি নরওয়ের প্রধান মৎস্য ব্যবসায় কেন্দ্র। ফ্রান্সের সন্নিহিত সমুদ্র উপকূলে প্রচুর সার্ডিন ধরা পড়ে। উত্তর সাগরের তীরে হল্যান্ডের অবস্থান এই দেশকে মৎস্য আহরণে প্রভূত সুবিধা দান করিয়াছে। এই কারণে হল্যান্ডের সমৃদ্ধিকে হেরিং মাছের দান বলা হয়।

(৩) উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরীয় উপকূলভাগ: উত্তর আমেরিকার লাব্রাডার, নিউ ফাউন্ডল্যান্ড, কানাডা ও নিউ ইংল্যান্ডের উপকূলভাগ এই মৎস্যচারণ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। মৎস্য আহরণে এই অঞ্চল বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এই অঞ্চলে উপকূল ভাগের তুলনায় গভীর সমুদ্র হইতে বেশি মৎস্য আহরণ করা হয়। গভীর সমুদ্রের মগ্ন চড়াগুলির মধ্যে গ্র্যান্ড ব্যাংক, জর্জেস ব্যাংক, সেবল ব্যাংক, সেন্টপিয়েরে ব্যাংক, ব্যাংকারু ব্যাংক উল্লেখযোগ্য। অগভীর সমুদ্রের মিডল ব্যাংক, জেফ্রি ব্যাংক, ক্যানসো ব্যাংক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই বিরাট মৎস্য ক্ষেত্রটির আয়তন প্রায় চার লক্ষ বর্গ কি. মি.। ইহার গঠন ও প্রসারে বিশেষ অনুকূল: (ক) এই অঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু। (খ) শীতল লাব্রাডর স্রোতের সহিত উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের মিলনের ফলে মৎস্য চলাচলের উপযোগী পরিবেশ। (গ) অগভীর উপকূল ও মগ্ন চড়া, যেমন, গ্রেট ব্যাংক ইত্যাদি। (ঘ) নদী মোহনায় সঞ্চিত আবর্জনা হইতে মৎস্য-খাদ্যের সৃষ্টি হয়। (ঙ) সন্নিহিত বনভূমি হইতে জলযান নির্মাণের উপযোগী কাষ্ঠের যোগান (চ) দেশের অভ্যন্তরে মৎস্যের ব্যাপক চাহিদা। এই অঞ্চলের ধৃত মৎস্যের মধ্যে কড, হ্যালিবুট, ম্যাকারেল, হেরিং প্রধান। সেন্ট লরেন্স অঞ্চলের চিংড়ি (Lobester) বিখ্যাত।

এই অঞ্চলে প্রচুর ঝিনুক ও কাঁকড়া পাওয়া যায়। হ্যালিফ্যাক্স, বোস্টন, সেণ্ট জন, মণ্ট্রিল ইত্যাদি মৎস্য ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত।

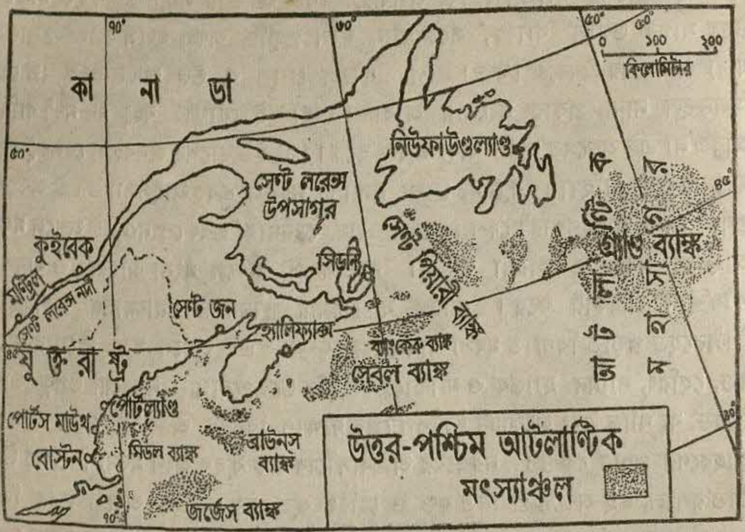

চিত্র ৬.৩ : উত্তর-পশ্চিম আটলাণ্টিক মৎস্যাঞ্চল।

(৪) **উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলভাগ** : উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের উত্তরাংশ হইতে উত্তরে আলাস্কা (বেরিং সাগর) পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগণ, ওয়াশিংটন, কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া এবং আলাস্কার উপকূলভাগ ইহার অন্তর্গত। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ও অগভীর উপকূল এই অঞ্চলে মৎস্যচারণ ক্ষেত্র গঠনের বিশেষ উপযোগী। হ্যালিবাট এই অঞ্চলের প্রধান শিকার। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক হ্যালিবাট এই মৎস্যচারণক্ষেত্র হইতে আহরণ করা হয়। ইহার তেল প্রধান উপজাত দ্রব্য। হ্যালিবাট ছাড়া সার্ডিন, পিলকার্ড, হেরিং, ট্রটম্যানন, কড প্রভৃতি মৎস্যও ধরা হয়। ভ্যানকুভার, ভিক্টোরিয়া, প্রিন্সরুপার্ট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মৎস্যকেন্দ্র।

উপরি-উক্ত চারিটি প্রধান মৎস্যকেন্দ্র ছাড়াও ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্রোপকূলে ও পূর্ব গোলার্ধে বিভিন্ন নদী ব-দ্বীপ অঞ্চলে মৎস্য আহরণকেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব উপকূল, দক্ষিণ আমেরিকার চিলির দক্ষিণাংশ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলেও প্রতিবৎসর প্রচুর মৎস্য ধৃত হয়। কিন্তু নানাপ্রকার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতার জন্য এই সকল স্থানে বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্র গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতে মৎস্যের প্রচুর চাহিদা থাকায় ইহার উপকূলভাগে বর্তমানে মৎস্য আহরণক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে।

পৃথিবীর মৎস্য আহরণ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)

	১৯৮১	মোটের শতাংশ
পৃথিবী	৭৪·৭	১০০
জাপান	১০·৭	১৪·২
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৯·৫	১৩·০
চীন	৪·৬	৬·২
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৩·৭	৫·০
চিলি	৩·৪	৪·৫
নরওয়ে	২·৬	৩·৪
ভারত	২·৪	৩·২
দক্ষিণ কোরিয়া	২·৩	৩·১
আইসল্যান্ড	১·৪	১·৯
কানাডা	১·৩	১·৮

[প্রশ্ন : (১ পৃথিবীর বৃহত্তম চারিটি সামুদ্রিক মৎস ক্ষেত্রের নাম কর। (২) যে কোন একটি মৎস্যক্ষেত্রের বিশদ বিবরণ দাও। (৩) মৎস্য ক্ষেত্রগুলির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (৪) বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্রগুলি সবই উত্তর গোলার্ধে গড়িয়া উঠিবার কারণ কি? দক্ষিণ গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বৃহদাকার মৎস্যক্ষেত্র গড়িয়া উঠে নাই কেন?

যাহা করিতে হইবে : পৃথিবীর একটি রেখা চিত্রে বৃহত্তম চারিটি মৎস্যক্ষেত্র চিহ্নিত কর। মৎস্যক্ষেত্রের আশপাশের দেশগুলির নাম বসাও।]

মৎস্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
(International Trade in Fish)

পৃথিবীর প্রধান মৎস্য উৎপাদনকারী দেশগুলির সংগৃহীত মৎস্য অধিকাংশ স্থানীয় চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয় বলিয়া রপ্তানিযোগ্য মৎস্যের পরিমাণ কমই থাকে। এই কারণেই শিল্পপণ্যের মত মৎস্যের আন্তর্জাতিক বাজার ও আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ খুবই কম। রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে বৃটেন, কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রধান। আমদানিকারক দেশের মধ্যে ইটালী, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ
(Conservation of Fish Resources)

মৎস্য একটি প্রবহমান সম্পদ। কিন্তু পৃথিবীতে লোকসংখ্যার দ্রুতহারে বৃদ্ধির জন্য মৎস্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু মৎস্যের চাহিদা ও শিকারের পরিমাণ দ্বিগুণের মত বৃদ্ধি এক দশকেই হইয়াছে। এই কারণে দক্ষিণ গোলার্ধেও

এই অঞ্চলে প্রচুর ঝিনুক ও কাঁকড়া পাওয়া যায়। হ্যালিফ্যাক্স, বোস্টন, সেণ্ট জন, মণ্ট্রিল ইত্যাদি মৎস্য ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত।

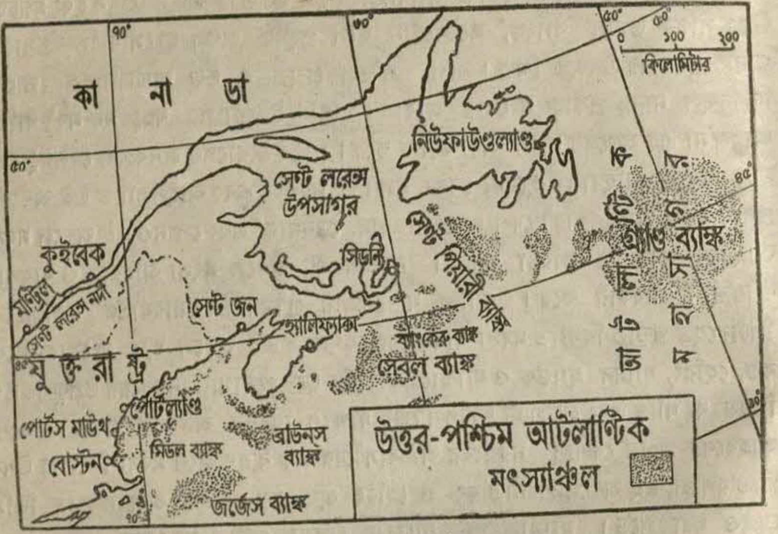

চিত্র ৬.৩ : উত্তর-পশ্চিম আটলাণ্টিক মৎস্যাঞ্চল।

(৪) **উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলভাগ**: উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের উত্তরাংশ হইতে উত্তরে আলাস্কা (বেরিং সাগর) পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগণ, ওয়াশিংটন, কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া এবং আলাস্কার উপকূলভাগ ইহার অন্তর্গত। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ও অগভীর উপকূল এই অঞ্চলে মৎস্যচারণ ক্ষেত্র গঠনের বিশেষ উপযোগী। হ্যালিবাট এই অঞ্চলের প্রধান শিকার। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক হ্যালিবাট এই মৎস্যচারণক্ষেত্র হইতে আহরণ করা হয়। ইহার তেল প্রধান উপজাত দ্রব্য। হ্যালিবাট ছাড়া সার্ডিন, পিলকার্ড, হেরিং, ট্রাউট, স্যামন, কড প্রভৃতি মৎস্যও ধরা হয়। ভ্যানকুভার, ভিক্টোরিয়া, প্রিন্সরুপার্ট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মৎস্যকেন্দ্র।

উপরি-উক্ত চারিটি প্রধান মৎস্যকেন্দ্র ছাড়াও ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্রোপকূলে ও পূর্ব গোলার্ধে বিভিন্ন নদী ব-দ্বীপ অঞ্চলে মৎস্য আহরণকেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব উপকূল, দক্ষিণ আমেরিকার চিলির দক্ষিণাংশ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলেও প্রতিবৎসর প্রচুর মৎস্য ধৃত হয়। কিন্তু নানাপ্রকার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতার জন্য এই সকল স্থানে বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্র গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতে মৎস্যের প্রচুর চাহিদা থাকায় ইহার উপকূল-ভাগে বর্তমানে মৎস্য আহরণক্ষেত্র গড়িয়া তুলিবার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে।

পৃথিবীর মৎস্য আহরণ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)

	১৯৮১	মোটের শতাংশ
পৃথিবী	৭৪'৭	১০০
জাপান	১০'৭	১৪'২
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৯'৫	১৩'০
চীন	৪'৬	৬'২
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৩'৭	৫'০
চিলি	৩'৪	৪'৫
নরওয়ে	২'৬	৩'৪
ভারত	২'৪	৩'২
দক্ষিণ কোরিয়া	২'৩	৩'১
আইসল্যাণ্ড	১'৪	১'৯
কানাডা	১'৩	১'৮

[প্রশ্ন : (১ পৃথিবীর বৃহত্তম চারিটি সামুদ্রিক মৎস ক্ষেত্রের নাম কর। (২) যে কোন একটি মৎস্যক্ষেত্রের বিশদ বিবরণ দাও। (৩) মৎস্য ক্ষেত্রগুলির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (৪) বৃহৎ মৎস্যক্ষেত্রগুলি সবই উত্তর গোলার্ধে গড়িয়া উঠিবার কারণ কি? দক্ষিণ গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বৃহদাকার মৎস্যক্ষেত্র গড়িয়া উঠে নাই কেন?

যাহা করিতে হইবে : পৃথিবীর একটি রেখা চিত্রে বৃহত্তম চারিটি মৎস্যক্ষেত্র চিহ্নিত কর। মৎস্যক্ষেত্রের আশপাশের দেশগুলির নাম বসাও।]

মৎস্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
(International Trade in Fish)

পৃথিবীর প্রধান মৎস্য উৎপাদনকারী দেশগুলির সংগৃহীত মৎস্য অধিকাংশ স্থানীয় চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয় বলিয়া রপ্তানিযোগ্য মৎস্যের পরিমাণ কমই থাকে। এই কারণেই শিল্পপণ্যের মত মৎস্যের আন্তর্জাতিক বাজার ও আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ খুবই কম। রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে বৃটেন, কানাডা, নরওয়ে, সুইডেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রধান। আমদানিকারক দেশের মধ্যে ইটালী, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ
(Conservation of Fish Resources)

মৎস্য একটি প্রবহমান সম্পদ। কিন্তু পৃথিবীতে লোকসংখ্যার দ্রুতহারে বৃদ্ধির জন্য মৎস্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু মৎস্যের চাহিদা ও শিকারের পরিমাণ দ্বিগুণের মত বৃদ্ধি এক দশকেই হইয়াছে। এই কারণে দক্ষিণ গোলার্ধেও

নতুন নতুন অঞ্চলে মৎস্য আহরণের চেষ্টা প্রসারিত হইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলভাগ চিলি, আর্জেণ্টিনার উপকূলভাগ ও অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলভাগ হইতে বর্তমানে কিছু কিছু মৎস্য আহরণ করা হইতেছে। এই অঞ্চলসমূহের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে মৎস্য, সীল, তিমি ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর যথেচ্ছ নিধনের ফলে ঐ সকল সম্পদের বংশ লোপ পাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই কারণে মৎস্য আহরণকারী দেশসমূহের মধ্যে বর্তমান শতাব্দীতে বিভিন্ন সময়ে বহু সংখ্যক আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহার ফলে সীল, তিমি ও মৎস্য শিকারে নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। স্ত্রী ও বাচ্চা সীল ও তিমি শিকার নিষিদ্ধ করা হয়। ছোট মাছ ধরা বা ডিম্ব প্রসবের সময় মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ করা হয়। এই বিষয়ে ১৯৩৬, ১৯৪৩ ও ১৯৪৬ সালের উত্তর সাগর সম্মেলন (North Sea Convention) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যতে মৎস্য সম্পদের যোগান অব্যাহত রাখিবার জন্য ও মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা হইতেছে :

(১) মৎস্যের ডিম্ব প্রসবকালে আইনসঙ্গতভাবে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ করা, (২) মৎস্যের উন্নত চাষের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার মৎস্যের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করা ও এই বিষয়ে গবেষণা করা, (৩) মৎস্য আহরণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন, (৪) মৎস্যের অপচয় রোধ করা, (৫) চাহিদার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া মৎস্য আহরণ।

ক্রমবর্ধমান মৎস্যের চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে একদিকে যেমন নতুন মৎস্যক্ষেত্রের সন্ধান করা হইতেছে, অপরদিকে তেমনি বর্তমান মৎস্যক্ষেত্রগুলি হইতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য আহরণের চেষ্টা হইতেছে। বিভিন্ন দেশে যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা, বৃটেন, জাপান, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করিয়া মৎস্যের বংশবিস্তার ও ধৃত মৎস্যের উন্নততর ব্যবহার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালান হইতেছে। বিভিন্ন প্রকার মৎস্য আহরণ, জাল ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে বহু আন্তর্জাতিক চুক্তি ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আশা করা যায়, মৎস্যের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পদের ব্যবহার মানুষের জীবনযাপনের উন্নতি ঘটাইতে অধিকতর সাহায্য করিবে।

[প্রশ্ন : (১) মৎস্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক দেশগুলির নাম লিখ। (২) মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি? সংরক্ষণের জন্য কোন্ কোন্ নীতি অনুসরণ করা হইতেছে?]

অনুশীলনী ৬

১। সমুদ্রের অর্থনৈতিক তাৎপর্য আলোচনা কর। পৃথিবীর প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলির অবস্থান নির্দেশ কর এবং তাহাদের উন্নতির কারণসমূহ বিশ্লেষণ কর।

[Discuss the economic significance of Sea. Locate the important fisheries of the world and analyse the factors responsible for their development.]

২। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মৎস্যক্ষেত্রগুলির বিবরণ দাও এবং উহাদের বাণিজ্যিক উন্নতির কারণ বিশ্লেষণ কর।

[Give an account of the important fisheries of the world and analyse the factors of their commercial development.] [H. S. Council : Specimen Question, 1981]

৩। পৃথিবীর প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলি একটি বিশেষ জলবায়ু অঞ্চলে সন্নিবেশিত হওয়ার কারণ নির্দেশ কর।

[Point out the reasons which have led to the concentration of the principal fishing grounds in a particular climatic belt.]

৪। পৃথিবীর প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলির বিবরণ দাও।

[Describe the principal fishing grounds of the world.]

৫। মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ?

[Discuss the necessity for preservation of fish resources. What steps should be taken for preserving fish resources ?]

৭ | বিভিন্ন পার্থিব সম্পদ—অরণ্য
(World Resources—Forest)

অরণ্য ও বনজ সম্পদ
(Forest and Forest Resources)

কোন স্থানে একজাতীয় বা নানাজাতীয় বৃক্ষের একত্র সমাবেশকে অরণ্য বা বনভূমি বলা হয়। জলবায়ু, মৃত্তিকা ও পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের তারতম্যের উপর বনভূমির গঠন ও প্রকৃতি নির্ভর করে। এক সময়ে পৃথিবীর মোট স্থলভাগের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বন দ্বারা আবৃত ছিল। মানুষের বসতি বিস্তার ও বনজ সম্পদের যথেষ্ট ব্যবহারের ফলে বর্তমানে ইহার পরিমাণ কমিয়া শতকরা ১৫ ভাগে দাঁড়াইয়াছে। প্রাণিকুলের সহিত বনভূমির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। উদ্ভিদের জন্ম ও বিকাশ আবার পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত অতি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। কারণ প্রাণিকুল প্রয়োজনমত স্থান পরিবর্তন করিয়া পরিবেশের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদ অচল হওয়ায় পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ইহার উপর সর্বাপেক্ষা বেশি।

বনভূমির ব্যবহার ও গুরুত্ব (Uses and Importance): পৃথিবীতে মানুষের জীবন ও জীবিকার সহায়ক বিভিন্ন প্রকার উপাদানের মধ্যে অরণ্য অন্যতম প্রধান মৌলিক উপাদান। ইহার ব্যবহার ও প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—উভয় প্রকার।

প্রত্যক্ষ ব্যবহার (Direct uses): বনভূমির প্রধান সম্পদ কাষ্ঠ। এই কাষ্ঠ নানাপ্রকারের হয়। (১) কাষ্ঠের প্রাথমিক ও প্রধান ব্যবহার জ্বালানি হিসাবে। আজিও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আগুন জ্বালাইবার ইন্ধন হিসাবে কাষ্ঠের ব্যবহার হইয়া থাকে। (২) আসবাবপত্র নির্মাণ ও যানবাহনের নির্মাণ ও পরিচালনায় প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। রেলের স্লিপার, গাড়ির কামরা, জাহাজের পাটাতন, মাস্তুল, স্টীমার, নৌকা, মোটর, বাস, লরি প্রভৃতি নির্মাণে ও নানাপ্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ইহার ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। (৩) গৃহাদি নির্মাণ, খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতিতে ও মালপত্র প্যাকিং-এ প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। (৪) নরম কাষ্ঠের সাহায্যে কাগজ, কৃত্রিম রেশম, দিয়াশলাই প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। (৫) বনজ বৃক্ষ হইতে ধুনা, তার্পিন তেল, গর্জন তেল, কৃত্রিম সুরাসার প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। কাষ্ঠ হইতে ব্যাপকভাবে প্লাস্টিক, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইত্যাদিও পাওয়া যায়। (৬) বনভূমি হইতে বাদাম, চিকল, গঁদ, গাটাপার্চা, নানাবিধ ফুল, ফল, মূল ও ঔষধ পাওয়া যায়। (৭) রবার, কর্পূর, লাক্ষা, চন্দন তেল ও কাষ্ঠ,

রেশম গুটি, মধু, মোম প্রভৃতি বনভূমি হইতেই সংগৃহীত হয়। (৮) অরণ্য হইতে বন্যপশু ও পশুর মাংস, চামড়া, হাড়, শিং লোম, দাঁত প্রভৃতি সংগ্রহ করা হয়। (৯) হাল্কা বনভূমিতে ও তৃণভূমি অঞ্চলে গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়। (১০) কাষ্ঠ ও বনজ সম্পদ আহরণে প্রচুর লোক নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা অর্জন করে। ইহার ফলে বনভূমি সংলগ্ন অঞ্চলে সুসংবদ্ধ কাষ্ঠশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

পরোক্ষ ব্যবহার (Indirect uses) : অরণ্যের পরোক্ষ ব্যবহার প্রত্যক্ষ ব্যবহারের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। (১) অরণ্য অঞ্চলে বাতাস শীতল ও ভারী থাকে বলিয়া বাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। (২) অরণ্য জলীয় বাষ্পপূর্ণ মেঘকে আকর্ষণ করে ও বৃষ্টিপাত ঘটায়। পক্ষান্তরে, অরণ্য অঞ্চলের ধ্বংস সাধনের ফলে বাতাসের শুষ্কতা বৃদ্ধি পায় এবং ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমিয়া যায়। (৩) অরণ্য ঝড়ের গতিবেগ প্রশমিত করে ও কতকাংশে গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করে। (৪) অরণ্য মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করে ও মৃত্তিকাকে উর্বর করে। (৫) অরণ্যাঞ্চলের শীতল আবহাওয়া পার্শ্ববর্তী স্থানের আবহাওয়াকে মনোরম করে। ইহার ফলে ঐ সকল স্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। (৬) অরণ্য মরুভূমির প্রসার রোধ করে ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে। (৭) অরণ্য পশুর আবাসস্থল। লুপ্তপ্রায় পশু ও নানাপ্রকার হিংস্র জীবজন্তু সংরক্ষণের জন্য অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা হয়। ঐ সকল স্থানে প্রচুর ভ্রমণকারীর সমাগম হয় বলিয়া ইহা সরকারী আয়ের একটি উৎসবিশেষ।

অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Forest)

ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও মৃত্তিকার প্রকারভেদে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের সমাবেশ দেখা যায়। ইহাদের গঠন, আকৃতি ও কার্যকারিতার সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বনভূমির শ্রেণীবিভাগ করা হয়। নিরক্ষরেখা হইতে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলে যেমন বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু দেখা যায় তেমনি নিরক্ষরেখা হইতে মেরু অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইলে উদ্ভিদেরও প্রকৃতিভেদ লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর বনভূমিকে প্রধানত চারি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, (১) উষ্ণ ও আর্দ্র চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য, (২) পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য, (৩) সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য এবং (৪) নাতিশীতোষ্ণ (অঞ্চলীয়) মিশ্র অরণ্য।

উপরি-উক্ত প্রধান চারি প্রকার অরণ্য ব্যতীত সমুদ্রোপকূলে, নদী ব-দ্বীপ অঞ্চলে, জোয়ারের জলে প্লাবিত ভূভাগে এবং বৃষ্টিহীন মরু অঞ্চলে বিশেষ ধরনের বৃক্ষ ও গুল্মাদি জন্মায়। সমুদ্রোপকূলের অরণ্যকে উপকূল অরণ্য (Littoral Forest) এবং নদী মোহনায় প্লাবিত অঞ্চলের অরণ্যকে প্লাবন অরণ্য (Tidal Forest) বলা হয়। মরু অঞ্চলে সংগঠিত অরণ্য দেখা যায় না। ঐ অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, কাঁটা গাছ বা ঝোপঝাড়কে মরু অরণ্য (Desert Shrubs) বলা হয়।

অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ

অরণ্যভূমি	জলবায়ু অঞ্চল	বৃষ্টিপাত ও উত্তাপ	উৎপন্ন বৃক্ষ
১. ক্রান্তীয় অঞ্চলের অরণ্যানী (Tropical Forest) ক। ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য বা চির হরিৎ বৃক্ষের অরণ্য খ। ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য	ক্রান্তীয় অঞ্চল 0°-১0° উঃ ও দঃ অক্ষাংশ ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চল ১0°-৩0° উঃ ও দঃ অক্ষাংশ	২০০ ২৫০ সে. মি. গড় বৃষ্টিপাত এবং ৩৫° সে. গড় উত্তাপ ১০০-২০০ সে. মি. গড় বৃষ্টিপাত ও ৩০° সে. গড় উত্তাপ	আবলুস, মেহগিনি, সিডার আয়রণ উড, রোজ উড, রবার, সিঙ্কোনা, কোকো, তাল জাতীয় বৃক্ষ প্রভৃতি। শাল, সেগুন, জারুল. চন্দন, বাঁশ বেত, মহুয়া, গর্জন, চাপলাস প্রভৃতি।
২. নাতিশীতোষ্ণ অরণ্যানী (Temperate Forest) ক। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বনভূমি খ। মিশ্র বনভূমি	ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ৩0°-৪৫° উঃ ও দঃ অক্ষাংশ মধ্য অক্ষাংশের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল	৭৫-১০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত এবং ২৫° সে. গড় উত্তাপ। ৫০ সে. মি.-এর অধিক বৃষ্টিপাত ১৬° সে. গড় উত্তাপ	কর্ক'ওক. কারি, জারা, অলিভ প্রভৃতি। ওক, ম্যাপল, বার্চ, ওয়ালনাট, এলম, অ্যাশ প্রভৃতি।
৩. হিমোষ্ণ অঞ্চলের অরণ্যানী (Cool-Temperate Forest) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি	উচ্চ অক্ষাংশের শীতল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ৪৫°—৬0° উঃ ও দঃ অক্ষাংশ	৫০ সে. মি-এর কম বৃষ্টিপাত এবং ১০° সে. গড় উত্তাপ	পাইন, ফার, স্প্রুস, হেমলক প্রভৃতি।

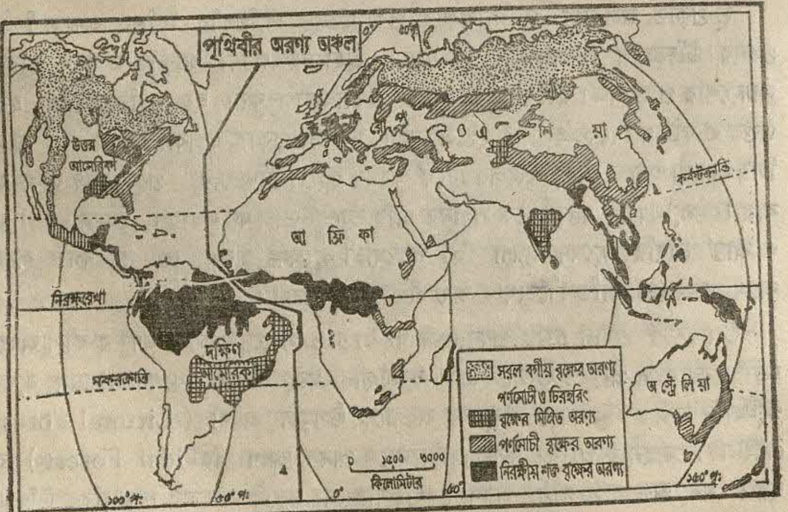

চিত্র ৭.১: পৃথিবীর অরণ্যাঞ্চলের ভৌগোলিক বণ্টন।

পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেণীর বনভূমির আয়তন (প্রায় লক্ষ হেক্টর)

মহাদেশ	চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি	পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি	সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি	মোট ভূভাগের শতাংশ
এশিয়া	২,৫৪০	২,২৮৮	৩,৫৫৬	২২%
আফ্রিকা	৩,০৯২	৬৮	২৮	১১%
ইউরোপ	—	৭৮০	২,৩১৬	৩১%
অস্ট্রেলিয়া	১,০১২	৬০	৬০	২৭%
উত্তর আমেরিকা	৪৩২	১,১৬০	৪,১৮৪	৪৪%
দক্ষিণ আমেরিকা	৭,৪৭৬	৪৬০	৪৩৬	১৫%
	১৪,৫৫২(৪৯%)	৪,৮১৬(১৬%)	১০,৫৮০(৩৫%)	

[প্রশ্ন : (১) মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে অরণ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারিতা আলোচনা কর। (২) পৃথিবীর বনভূমিকে মোটামুটি কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং উহারা কি কি ? (৩ স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও অরণ্যের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। (৪) একটি ছক অংকন করিয়া উত্তর গোলার্ধের স্বাভাবিক উদ্ভিদের অবস্থান দেখাও।]

উষ্ণ ও আর্দ্র চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি
(Hot and Wet Evergreen Forests)

ভৌগোলিক বণ্টন ও বৈশিষ্ট্য (Regional distribution and features): নিরক্ষীয় অঞ্চলের অন্তর্গত মধ্য-আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকায়, গিনি উপকূলে, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে আমাজন অববাহিকায় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। এই সকল অঞ্চলে সারা বৎসর প্রচুর উত্তাপ (গড়ে ৩৮° সে.-৪০° সে.) ও প্রচুর বৃষ্টিপাত গড়ে (২০০ সে মি.-২৫০ সে মি) পরিলক্ষিত হয়। বাতাসের আর্দ্রতাও খুব বেশি (গড়ে ৮০%) থাকে। ইহার ফলে এই সকল অরণ্যে মেহগিনি, আবলুস, সিডার, গোলাপ গন্ধ, লোহা কাঠ, বাদাম, রবার, তালজাতীয় প্রচুর কাষ্ঠযুক্ত বৃক্ষ জন্মে। এই গাছগুলির ছয়-সাতটি স্তরে বিভক্ত বহু শাখা-প্রশাখা থাকে (ইহারা উচ্চতায় ৫০ মিটার হইতে ৬০ মিটার পর্যন্ত হয়। ইহাদের গুঁড়ি মোটা হয়, পাতা খুব বড় ও ভারী হয়। ইহাদের পাতা মাটির রসের অভাবে কখনও একই সময়ে ঝরিয়া পড়ে না। বৃক্ষগুলি সর্বদাই সবুজ থাকে। এই কারণে এই অরণ্যকে চিবহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য বলা হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চল ব্যতীত মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে যে সকল স্থানে বেশি উত্তাপ ও বেশি বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হয় সেই সকল স্থানেও এই প্রকার শক্ত কাষ্ঠযুক্ত চিরহরিৎ বৃক্ষের অবণ্য দেখা যায়। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল, উত্তর-পূর্ব হিমালয়, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, ইন্দোচীন প্রভৃতি মৌসুমী অঞ্চলে ও মধ্য আমেরিকার পানামা,

নিকারাগুয়া প্রভৃতি দেশে এই প্রকার অরণ্য দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে এই প্রকার বনভূমির স্থানীয় নাম সেল্‌ভা (selvas)।

কাষ্ঠ-সম্পদ (Round wood) : উষ্ণ মণ্ডলের অরণ্য হইতে বহু মূল্যবান কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হয়। গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র প্রস্তুত, নৌকা, জাহাজ, যানবাহনের কাজে সেগুন, মেহগিনি, আবলুস, রোজ উড প্রভৃতি কাষ্ঠের ব্যাপক ব্যবহার হয়। জ্বালানী হিসাবেও এই সকল অঞ্চলে প্রচুর কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই সকল অরণ্যের কাষ্ঠ খুবই মূল্যবান হওয়া সত্ত্বে কাষ্ঠ-শিল্পের তেমন উন্নতি ঘটে নাই। ইহার কারণ (১) এই সকল অরণ্য খুবই গভীর ও এই সকল অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে পরিবেশ খুবই অস্বাস্থ্যকর। (২) রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত এবং কাষ্ঠ পরিবহণের উপযোগী রাস্তাঘাট নির্মাণ দুঃসাধ্য। (৩) বিষাক্ত কীটপতঙ্গ ও হিংস্র জীবজন্তুর প্রাদুর্ভাব। (৪) বৈদ্যুতিক শক্তি ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব। (৫) এই অঞ্চলে একই ধরনের বৃক্ষ একস্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। একই প্রকার বৃক্ষ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত থাকে বলিয়া উহা সংগ্রহ করা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। (৬) এই অঞ্চলের কাষ্ঠ প্রধানত শক্ত বলিয়া উহার সংগ্রহ অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য। অরণ্যাঞ্চলের সন্নিকটে সমৃদ্ধ কাষ্ঠ ব্যবসায়ের কেন্দ্রের অভাব।

চিরহরিৎ বৃক্ষের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব না হইলেও বর্তমানে আমাজন ও কঙ্গো অববাহিকা অঞ্চলেও বাণিজ্যিকভাবে কাষ্ঠ আহরণের প্রচেষ্টা চলিতেছে। কঙ্গো, জাইরে, নাইজিরিয়া, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে ধীরে ধীরে কাষ্ঠশিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। এই অঞ্চলের রবার ও অন্যান্য বনজ সম্পদের রপ্তানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে স্থানে স্থানে বন কাটিয়া কিছু আবাদের ব্যবস্থা হইতেছে। এই অঞ্চলেও কাষ্ঠশিল্পের প্রসার ঘটিতেছে। ভারত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে কাষ্ঠ আহরণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। কাষ্ঠের বাজার প্রধানত দেশিয় হওয়ায় ইহার উন্নতি ও প্রসার নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বৈষয়িক উন্নতির উপরই এই সকল অঞ্চলের কাষ্ঠশিল্পের উন্নতি ও প্রসার নির্ভরশীল।

অন্যান্য বনজ সম্পদ (Other forest resources) : চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য হইতে কাষ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য নানা প্রকার বনজ সম্পদ আহরণ করা হয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। অন্যান্য বনজ সম্পদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য (১) মধ্য আমেরিকা ও আমাজন অববাহিকার জাপোটে বৃক্ষের রস বা চিকল। ইহা হইতে চিউইংগাম প্রস্তুত করা হয়। (২) বিভিন্ন ধরনের বাদাম যেমন ব্রেজিলের বেজিল নাট, মধ্য আমেরিকা অঞ্চলের আইভরী নাট, পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলের পাম নাট প্রভৃতি। (৩) বন্য রবার। (৪) পানামা হ্যাট তৈয়ারির কাঁচামাল পানামা অঞ্চলের টোকুইলা পাম গাছের তন্তু। (৫) কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, ভারত প্রভৃতি অঞ্চলের কুইনাইন প্রস্তুতের কাঁচামাল সিঙ্কোনা।

(৬) ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অঞ্চল হইতে লাক্ষা, মোম, গঁদ, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ প্রভৃতি মসলা দ্রব্য এবং (৭) তাল তৈল, কলা, আনারস প্রভৃতি। (৮) বাঁশ, বেত, হরিতকী, নানাবিধ কষায়িনও পাওয়া যায়।

[প্রশ্ন : (১) উষ্ণ ও আর্দ্র চিরহরিৎ অরণ্যের অবস্থান বর্ণনা কর। ব্রেজিলে এই অরণ্যের স্থানীয় নাম কি? (২) পৃথিবীর একটি রেখাচিত্রে উষ্ণ চিরহরিৎ অরণ্যের অবস্থান দেখাও। (৩) এই অরণ্যের জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (৪) চারিটি চিরহরিৎ বৃক্ষের নাম লিখ। এই অরণ্যের বাণিজ্যিক গুরুত্ব আলোচনা কর। (৫) চিরহরিৎ অরণ্য হইতে কোন্ কোন্ সম্পদ সংগ্রহ করা হয়? এখানে অরণ্য-সম্পদ সংগ্রহের অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর। (৬) এই অরণ্য হইতে কোন্ কোন্ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়।]

পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য
(Deciduous Forests)

ভৌগোলিক বণ্টন ও বৈশিষ্ট্য (Regional distribution and features) ; উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অনেক স্থানে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ সে. মি. হইতে ২০০ সে. মি. ও গড় উত্তাপ প্রায় ৩০° সে. হইলেও বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত একটি নির্দিষ্ট ঋতুতেই হইয়া থাকে। এই সকল স্থানে শক্ত কাষ্ঠযুক্ত পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। বৎসরের বৃষ্টিহীন সময়ে এই অঞ্চলের বৃক্ষগুলি মাটি হইতে পর্যাপ্ত রস পায় না বলিয়া কোনক্রমে টিকিয়া থাকিবার প্রয়াসে পত্রশূন্য হইয়া পড়ে। আবার বসন্ত সমাগমে নতুন পাতায় উহারা সজ্জিত হয়। এই কারণে এই বনভূমিকে পর্ণচোরা বা পাতা ঝরা বৃক্ষের অরণ্য বলা হয়। চীন, ভারত (উত্তর ও মধ্য প্রদেশ), মধ্য রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশ, ব্রেজিলের দক্ষিণাংশ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশ, যেমন দক্ষিণ চিলি, ফ্রান্সের আল্পস্, পিরেনীজ প্রভৃতি অঞ্চলে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। ক্রান্তীয় মণ্ডলের কোন কোন স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ সে. মি.-এর কম হওয়ায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বৃক্ষ সমন্বিত তৃণভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল তৃণভূমিকে সাভানা বলা হয়। পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যের মধ্যে ওয়ালনাট, চেষ্ট নাট, হিকোরি, ওক, বার্চ, অ্যাস, এলম, শাল, সেগুন, শিরিষ, পলাশ, মহুয়া, গর্জন, চাপলাস প্রভৃতি দীর্ঘপত্রবিশিষ্ট কঠিন কাষ্ঠযুক্ত বৃক্ষ বিখ্যাত। এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে বাঁশ ও বেত জন্মে।

কাষ্ঠ-সম্পদ (Round wood) : চিরহরিৎ অরণ্যভূমির তুলনায় পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি। কারণ এই অঞ্চলের জলবায়ু মৃদু-ভাবাপন্ন হওয়ায় বনভূমি অত্যন্ত গভীর নহে। এই কারণে এই অঞ্চলের কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ সহজসাধ্য। এই অঞ্চলের কাষ্ঠ গৃহনির্মাণে, আসবাবপত্র তৈয়ারিতে, রেলের স্লিপার, কামরা, মোটর, ট্রাক, নৌকা স্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি নির্মাণে ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে, ব্যাট, র‍্যাকেট ও অন্যান্য খেলার সামগ্রী প্রস্তুতিতে

ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চলের কিছু নরম জাতীয় কাষ্ঠ কাগজ শিল্পেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই অঞ্চলেও যানবাহনের অসুবিধার জন্য বনজ সম্পদের আহরণ বিশেষ ব্যয়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য।

অন্যান্য বনজ সম্পদ (Other resources): এই অঞ্চলে ওক গাছের বাকল হইতে কর্ক প্রস্তুত হয়। এই অঞ্চলে জলপাই, বাদাম, আখরোট, খুবানি, আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি প্রচুর ফল জন্মে। ইহা ছাড়াও মধু, মোম, রেশমগুটি, বেত ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

[প্রশ্ন : (১) পর্ণমোচী বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য কি? (২) পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়? (৩) পর্ণমোচী অরণ্যের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বর্ণনা কর।]

সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য
(Coniferous Forests)

ভৌগোলিক বণ্টন ও বৈশিষ্ট্য (Regional distribution and features): এই জাতীয় অরণ্য প্রধানত পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে ৫০° হইতে ৭০° উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে হিমোষ্ণ অঞ্চলেই দেখা যায়। ইহা ছাড়া প্রায় ৩,৫০০ মিটার উচ্চ পর্বত গাত্রে বরফ-গলা জলে সিক্ত ভূমিতেও এই প্রকার বনভূমি দৃষ্ট হয়। শীতকালে এই সকল স্থানে প্রচুর তুষারপাত হয়। তুষারপাতে গাছের যাহাতে বিশেষ ক্ষতি না হয় এইজন্য এই অঞ্চলের গাছের আকৃতি মোচার মত উপরের দিকে সরু হয় এবং পাতা ও শাখা-প্রশাখা নিম্নে ঝুলন্ত থাকে। ইহাতে সহজেই বরফ ঝরিয়া পড়িতে পারে। এই সকল গাছের পাতা সরু ও নরম হয়। উত্তর গোলার্ধে এই অরণ্যভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব সীমা হইতে পশ্চিমে ইউরোপের অন্তর্গত ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন পর্যন্ত বিস্তৃত। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় অর্ধাংশ জুড়িয়া এই বনভূমি অবস্থিত। ইহার স্থানীয় নাম তৈগা (Taiga)। এশিয়ায় জাপান ও চীনের উত্তরাংশে, ভারতের হিমালয়ের উচ্চতর অংশে, ইউরোপের প্রায় সর্বত্র এইপ্রকার বনভূমি দেখা যায়।

উত্তর আমেরিকায় কানাডার সমগ্র উত্তরাংশে, আলাস্কায় ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই প্রকার বন খুবই বিস্তৃত। দক্ষিণ গোলার্ধে আন্দিজ পর্বতের উপরিভাগে ও অস্ট্রেলিয়ায় গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের উপরিভাগে ও নিউজিল্যান্ডে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। এই প্রকারে অরণ্যে নানাজাতীয় পাইন, ফার, অ্যাসপেন, সিডার, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে।

কাষ্ঠ-সম্পদ (Round wood): সরলবর্গীয় বৃক্ষ হইতে যেমন হাল্কা, স্থায়ী ও দৃঢ় কাষ্ঠ পাওয়া যায় তেমনি প্রচুর নরম কাষ্ঠও পাওয়া যায়। হাল্কা ও দৃঢ় কাষ্ঠ হইতে জাহাজের মাস্তুল, পাটাতন, রেলের স্লিপার, কামরা ইত্যাদি নির্মাণ করা যায়। নরম জাতীয় কাষ্ঠের সাহায্যে কাগজের মণ্ড, কৃত্রিম রেশম, দিয়াশলাই,

প্লাই-উড প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। সরলবর্গীয় অরণ্যাঞ্চল কাষ্ঠশিল্পের উন্নতির বিশেষ সহায়ক। শীতের প্রাক্কালে গাছ কাটিয়া নদীর তীরে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া রাখা হয়। শীতকালে সমস্ত অঞ্চল পুরু বরফে আবৃত হইয়া যায়। বসন্ত সমাগমে ঐ বরফ গলিতে থাকে এবং ঐ বরফ-গলা জলের স্রোতে গাছের গুঁড়িগুলি ভাসাইয়া নদী তীরবর্তী করাতকলে বা কাগজের মণ্ড কারখানায় লইয়া যাওয়া হয়। এই অঞ্চলে কাষ্ঠশিল্পের প্রসার ও উন্নতির মূলে রহিয়াছে: (১) শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের সুবিধা। (২) এই প্রকার অরণ্যে এক জাতীয় বৃক্ষ এক স্থানে প্রচুর সংখ্যায় জন্মে। (৩) নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনের মত ইহা দুর্গম নহে এবং ইহার পরিবেশও অস্বাস্থ্যকর নহে। (৪) বরফ-গলা নদীস্রোতে কাষ্ঠ ভাসাইয়া শিল্পকেন্দ্রে আনিবার সুবিধা থাকায় পরিবহণ সহজ হয়। (৫) এখানে সুলভে জলবিদ্যুৎ পাওয়া যায়। (৬) কাষ্ঠ নরম হওয়ায় দ্রুত গাছ কাটা সুবিধাজনক।

সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি হইতে ব্যাপকভাবে কাষ্ঠ-সম্পদ আহরণকারী দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, কানাডা, ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেন প্রধান। জাহাজ-শিল্পে, মোটর ও রেল পরিবহণ শিল্পে, কাগজ শিল্পে, আসবাবপত্র প্রস্তুতিতে ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে এই সকল দেশে প্রচুর কাষ্ঠের ব্যবহার হইয়া থাকে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কাষ্ঠমণ্ড উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের তৈগা বনাঞ্চলের আয়তন প্রায় ৫২ কোটি হেক্টর। নরম কাষ্ঠের সাহায্যে কাগজের মণ্ড ও কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতিতে এই দেশ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। কাগজ উৎপাদনে কানাডা বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশ বিশ্বের বাজারে সর্বাধিক নিউজপ্রিণ্ট রপ্তানি করিয়া থাকে। ফিনল্যাণ্ড ও সুইডেনের বৈষয়িক অবস্থা কাষ্ঠজাত দ্রব্য রপ্তানির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের মধ্যে নরওয়ে, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালী প্রভৃতি দেশে পর্বতগাত্রে উৎপন্ন সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য হইতে নানাবিধ কাষ্ঠ ও বনজ সম্পদ আহরণ করা হয়। বর্তমানে ভারতের হিমালয় অঞ্চল হইতে এই কাষ্ঠ-সম্পদ আহরণের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। ভারতের কাগজ শিল্পে এই অরণ্যাঞ্চলের নরম কাষ্ঠ ব্যবহারের ব্যাপক প্রয়াস চলিতেছে।

বিশ্বের মোট কাষ্ঠ (Round Wood) উৎপাদন (১০ লক্ষ ঘন মিটারে)

	১৯৭৯	১৯৮০		১৯৭৯	১৯৮০
সোঃ রাশিয়া—	৩৫৬.২	৩৫৬.২	ভারত—	২১০.০	২১৪.৭
আঃ যুক্তরাষ্ট্র—	৩৪৭.৯	৩২২.৩	কানাডা—	১৬১.৪	১৬১.৪
চীন—	২১৮.৫	২২৪.৬	ইন্দোনেশিয়া—	১৫৪.১	১৫৭.২
ব্রেজিল—	২১২.৭	২১৭.৩	পৃথিবী—	২৯৯৩.২	৩০২০.৩

[Source : UNO Statistical Year Book, 1981]

কাষ্ঠ ব্যবসায়
(Timber Trade)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কাষ্ঠ ও বনজ সম্পদের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সরলবর্গীয় অরণ্যের নরম কাষ্ঠই এই ব্যবসায়ে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। নরম কাষ্ঠ রপ্তানিতে কানাডা, রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও বেলজিয়ামের নাম উল্লেখযোগ্য।

আসবাবপত্র ও অন্যান্য নির্মাণকার্যে ব্যবহারের জন্য চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বনাঞ্চলের শক্ত কাষ্ঠ, সেগুন, মেহগিনি, রোজ উড প্রভৃতির চাহিদা শিল্পোন্নত দেশগুলিতে উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ও মধ্য-আমেরিকায় কাষ্ঠ-ব্যবসায়ের উন্নতি ঘটিতেছে। বৃটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি এই সকল কাষ্ঠের প্রধান আমদানিকারক। রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, পানামা, নিকারাগুয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি প্রধান। ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন ও থাইল্যাণ্ডের ব্যাংকক কাঠ রপ্তানির বিখ্যাত বন্দর।

[প্রশ্ন : (১) সরলবর্গীয় বৃক্ষগুলির আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কিরূপ ? কয়েকটি সরলবর্গীয় বৃক্ষের নাম উল্লেখ কর। ইহারা চিরহরিৎ না পর্ণমোচী বৃক্ষ ? (২) পৃথিবীর কোন্ কোন্ অংশে সরলবর্গীয় বনভূমি রহিয়াছে তাহা বর্ণনা কর। (৩) পৃথিবীর একটি রেখাচিত্রে সরলবর্গীয় বনভূমি চিহ্নিত করিয়া দেখাও। (৪) সরলবর্গীয় বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর। (৫) সরলবর্গীয় বনভূমি হইতে কিরূপে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হয় ? এই বনভূমি হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর। এই কাষ্ঠ নরম না শক্ত ? এই কাষ্ঠ কি কি কাজে ব্যবহৃত হয় ?]

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মিশ্র বনভূমি
(Temperate Mixed Forests)

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে স্থানে স্থানে পরিবেশ অনুযায়ী চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। ইহাকেই নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মিশ্র বনভূমি বলে। জলবায়ু অঞ্চলের ক্ষেত্রে দুইটি জলবায়ু মণ্ডলের সীমানায় যেমন সন্ধিক্ষেত্র (Transitional space) গড়িয়া উঠে তেমনি ভিন্নধর্মী জলবায়ুর প্রভাবে এই প্রকার বনভূমির সৃষ্টি হয়। সেগুন, শাল, জারুল, শিশু, তুঁত, কর্ক, সিডার প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের গাছ দেখা যায়। ভারতের মধ্যভাগে, ব্রহ্মদেশের ও শ্যামদেশের উত্তরাংশে, চীনের উত্তর-পশ্চিমাংশে, রাশিয়ার হ্রদ অঞ্চলে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আপালেচিয়ান-সংলগ্ন অঞ্চলে প্রধানত এই ধরনের মিশ্র বনভূমি দেখা যায়।

এই সকল অঞ্চলের জলবায়ু ও পরিবেশ অনুকূল বলিয়া কাষ্ঠ ও বনজ সম্পদ আহরণ সহজসাধ্য। ভারত, ব্রহ্মদেশ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে জলযান নির্মাণ, পরিবহণ ইত্যাদি নানাবিধ কার্যে এই মিশ্র বনভূমির

কাষ্ঠের ব্যবহার হইতে দেখা যায়। অন্যান্য বনজ সম্পদের মধ্যে মধু, মোম, লাক্ষা, হরিতকী, মহুয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভূমধ্যসাগরীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি
(Mediterranean Evergreen Forests)

এই অঞ্চলে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিরক্ষীয় ও মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের তুলনায় কম। কিন্তু শীতের তীব্রতাও বেশি নহে। গ্রীষ্মকাল শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন। শীতকাল আর্দ্র। এই অঞ্চলের গাছের গঠনে কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের বাকল পুরু এবং পাতা ভারী ও প্রশস্ত। কোন কোন গাছের পাতায় মোম বা তৈলজাতীয় এক প্রকার পদার্থের প্রলেপ থাকে। কোন গাছের পাতায় রেশমী রোঁয়া থাকে। ইহাতে গ্রীষ্মের শুষ্ক ঋতুতে খাদ্যরস সংগ্রহ করিয়া রাখিবার সুবিধা হয় এবং গাছের পাতা কখনও ঝরিয়া পড়ে না। এই কারণে এই বনাঞ্চলকেও চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি বলা হয়। এই প্রকার গাছের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার কৌরি ও জারা, পর্তুগালের কর্ক-ওক ও অন্যান্য অঞ্চলের সিডার, ইউক্যালিপটাস, জলপাই প্রভৃতি প্রধান। এই প্রকার গাছের বাড় (growth) খুব ধীরে ধীরে হয়। এই বনভূমি খুব গভীর নহে, বিক্ষিপ্তভাবে ইহার অবস্থান। ফলে সুসংগঠিত কাষ্ঠ শিল্পের পরিবর্তে এই বনভূমি পরিষ্কার করিয়া ধীরে ধীরে ফল বাগিচার প্রসার ও উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে।

[প্রশ্ন : (১) মিশ্র অরণ্য ও ভূমধ্যসাগরীয় অরণ্যের বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান বর্ণনা কর।]

বনভূমির সংরক্ষণ
(Conservation of Forests)

সভ্য জগতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে প্রকৃতির দানে সমৃদ্ধ কাষ্ঠভাণ্ডার ক্রমেই নিঃশেষিত হইতেছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এই সমস্যা বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে। অধিকন্তু বনভূমি ধ্বংসের সহিত জলবায়ুর পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যাইতেছে। ফলে বর্তমানে বনভূমি সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হইয়াছে। বনভূমির সংরক্ষণ-পরিকল্পনাকে দুইটি স্তরে ভাগ করা যায়,—(১) নিঃশেষিত অরণ্যভাগের পরিপূরক হিসাবে নতুন বনাঞ্চল রচনা এবং (২) বনভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা ইহার সংরক্ষণ। বনভূমির সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা সংরক্ষণ বলিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে—(১) প্রায় প্রতি বৎসর দাবানলে বহু বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয় ; সুতরাং দাবানল হইতে বনভূমিকে রক্ষা করা ; (২) যথেচ্ছভাবে কাষ্ঠ আহরণের পরিবর্তে কেবল পরিপুষ্ট বৃক্ষ ছেদন করা ; (৩) কাষ্ঠ আহরণের সময় অন্যান্য বৃক্ষের ক্ষতি না করা ; (৪) কীটনাশক ঔষধপত্র দ্বারা নতুন চারার সংরক্ষণ করা ; (৫) নতুন চারাযুক্ত অঞ্চলকে পশুচারণের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার না করা।

বিশেষজ্ঞদের মতে জলবায়ু ও মানুষের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে দেশের স্থলভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে বনভূমি থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যে হারে নতুন বৃক্ষ জন্মায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি বৃক্ষই মানুষ প্রতি বৎসর কাটিয়া ধ্বংস করে। এই অবস্থার নিরসনকল্পেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বন সংরক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। উষ্ণমণ্ডলের অরণ্যভূমিই বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ কাষ্ঠভাণ্ডার। সুতরাং ইহার সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও পুষ্টির উপর আগামী বিশ্বের সুখসমৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। ভারতে বনমহোৎসবের মাধ্যমে নতুন বনভূমি সৃষ্টির পরিকল্পনা সাফল্যজনক অগ্রগতি লাভ করিয়াছে।

[প্রশ্ন : (১) 'বনভূমির সংরক্ষণ' বলিতে কি বুঝায়? (২) বনভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি? (৩) সংক্ষেপে বনভূমি সংরক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি বর্ণনা কর।]

অনুশীলনী ৭

১। বনভূমির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উপকার আলোচনা কর।

[Discuss the direct and indirect benefits of forest.]

২। জলবায়ুর ভিত্তিতে পৃথিবীর বনভূমির শ্রেণীবিভাগ কর। বনজ সম্পদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ব্যবহার আলোচনা কর।

[Classify forests of the world on the basis of climate. Discuss the direct and indirect uses of forest resources.]

৩। জলবায়ুর ভিত্তিতে পৃথিবীর বনভূমির শ্রেণীবিভাগ কর। এই সম্পদ সংরক্ষণের সমস্যাবলী কি কি?

[Classify the forest types of the world on the basis of climate. What are the problems of conservation of this resource?] (W. B. C. H. S. Exam., 1980)

৪। পৃথিবীর প্রধান প্রধান বনভূমির নাম লিখ। ইহাদের যে-কোন একটির ভৌগোলিক বন্টন নির্দেশ কর। বনজ সম্পদের ব্যবহার কি কি?

[Name the principal forest types of the world. Give geographical distribution of any one of the forest types. What are the uses of forest products?]

৫। পৃথিবীর সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ কর এবং ঐ বনাঞ্চল হইতে সংগৃহীত সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার আলোচনা কর।

[Indicate the geographical location of the coniferous forest of the world and discuss the commercial uses of the products of those forest belts.]

৬। পৃথিবীর চিরহরিৎ বনভূমির ভৌগোলিক বন্টন দেখাও এবং ঐ বনভূমির বাণিজ্যিক ব্যবহার আলোচনা কর। ঐ সকল বনাঞ্চল হইতে সম্পদ সংগ্রহের অসুবিধাগুলি কি কি?

[Indicate the geographical distribution of the Evergreen Forests of the world and discuss the commercial uses of such forests. What are the difficulties of exploitation of resources of those forests.]

৭। পৃথিবীর প্রধান প্রধান বনভূমিসমূহের ভৌগোলিক বন্টন নির্দেশ কর। বনভূমি সংরক্ষণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

[Indicate the geographical distribution of the principal forest belts of the world. Discuss the importance of preservation of forests.]

৮। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সরলবর্গীয় ও চিরহরিৎ বনভূমিসমূহের অবস্থানের কারণ নির্দেশ কর। ক্রান্তীয় অঞ্চলে বনভূমি সমূহের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Account for the location of Coniferous and Evergreen Forests in different parts of the world. Discuss the uses of the forests in the tropical regions.]

৯। ইউরেশিয়া ও উত্তর আমেরিকার সরলবর্গীয় বনভূমির কাঠশিল্প সংক্রান্ত কার্যাবলী বর্ণনা কর।

[Discuss the lumbering activities in the coniferous forest belts of Eurasia and North America.]

১০। বনভূমি এবং বনজ সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়ে আধুনিক বিশ্বের সচেতনার কারণ নির্দেশ কর। বিশ্বের সর্বত্র বনভূমি সংরক্ষণের জন্য যে-সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Point out the reasons for consciousness of modern world in regard to the preservation of forests and forest resources. Give a short account of the steps which are being taken to preserve forests all over the world.]

১১। বনভূমিকে প্রবহমান সম্পদ বলা হয় কেন? ক্রান্তীয় বনভূমির তুলনায় নাতিশীতোষ্ণ বনভূমির বহুল ও ব্যাপক ব্যবহারের কারণ বর্ণনা কর।

[Why are forests described as flow resources? Describe the causes of wider exploitation of temperate forests than tropical forests.]

S.C.E.R.T., West Bengal Library 25/3, B. C. Road Calcutta

৮ বিভিন্ন পার্থিব সম্পদ—মৃত্তিকা
(World Resources—Soil)

ভূ-ত্বক স্তরে স্তরে সজ্জিত বিভিন্ন প্রকার শিলা, নুড়ি, পাথর ও মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। সূর্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, জলস্রোত প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে এই শিলাস্তরে ফাটল ধরে ও শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ক্রমাগত অতি সূক্ষ্ম কণিকায় পরিণত হয়। এবং এই শিলাচূর্ণের সহিত জৈব ও উদ্ভিজ্জ বিভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার নরম ও হাল্কা পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহাকে মৃত্তিকা (Soil) বলে। মৃত্তিকার মধ্যে একপ্রকার ক্ষুদ্র জীবাণু থাকে। ইহারাই মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তির উৎস। ইহাদের অভাবে মৃত্তিকা নিষ্ক্রিয় উপাদান মাত্র।

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে মৃত্তিকার অবদান অপরিমেয়। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি সব কিছুই মৃত্তিকার সহিত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট। কৃষিকার্যের প্রধান এবং প্রাথমিক উপাদান মৃত্তিকা ও ইহার উর্বরা শক্তি। কৃষিকার্য ছাড়া মৃত্তিকার সাহায্যে মাটির পাত্র, মূর্তি, ইঁট, টালি, খেলনা, পুতুল প্রভৃতিও তৈয়ারি করা হয়। মৃত্তিকা শিলাচূর্ণ দ্বারা গঠিত বলিয়া ইহার গুণাগুণ প্রাথমিক-ভাবে সংশ্লিষ্ট মূল প্রস্তরের বৈশিষ্ট্য, ক্ষয়ীভূত শিলাচূর্ণের আকার ও গঠন, বর্ণ, রাসায়নিক ধর্ম, জলধারণক্ষমতা, গভীরতা, জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের উপর নির্ভর করে।

জলবায়ুর প্রভাবে মৃত্তিকার গুণাগুণের তারতম্য ঘটে। অতি বৃষ্টিপাত অঞ্চলে মৃত্তিকার উপরিভাগের রাসায়নিক পদার্থের সমূহ ক্ষয় হয় এবং চুয়াইয়া মৃত্তিকার গভীরে নামিয়া যায়। ইহাতে মৃত্তিকা অনুর্বর হয়। আবার তৃণাঞ্চলে তৃণগুল্ম ইত্যাদি পচিয়া মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু সরলবর্গীয় বনাঞ্চলে জৈব পদার্থের অভাবে ও বরফ-গলা জলে মৃত্তিকা প্রায়ই ভিজা ও স্যাঁতসেঁতে থাকিবার ফলে মৃত্তিকা খুবই অনুর্বর হয়।

মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Soil)

মৃত্তিকার অবস্থান অনুযায়ী ইহাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) অবশিষ্ট বা স্থাণু মৃত্তিকা (Residual Soil) এবং (খ) অপসৃত বা পরিবাহিত মৃত্তিকা (Transported Soil)।

(ক) অবশিষ্ট বা স্থাণু মৃত্তিকা—ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থানে প্রাকৃতিক কারণে জীর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া যদি ঐ স্থানেই সঞ্চিত থাকে তাহা হইলে ইহাকে অবশিষ্ট বা স্থাণু মৃত্তিকা বলা হয়।

(খ) **অপসৃত বা পরিবাহিত মৃত্তিকা**– ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থানের শিলাচূর্ণ মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া যদি ঐ স্থান হইতে বায়ুপ্রবাহ বা জলস্রোত অন্য কোন স্থানে পরিবাহিত হইয়া সঞ্চিত হয়, তবে ইহাকে অপসৃত বা পরিবাহিত মৃত্তিকা বলা হয়।

মৃত্তিকার গঠনে শিলার অভ্যন্তরস্থ ধাতব পদার্থ স্থানীয় জৈব পদার্থ, জলবায়ু ইত্যাদির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইলেও জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে মৃত্তিকার গুণাগুণ বহুলাংশে পরিবর্তিত হয় বলিয়া জলবায়ু অনুযায়ী মৃত্তিকাকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) আর্দ্র বনাঞ্চলের মৃত্তিকা (Pedalfers) এবং (২) শুষ্ক তৃণাঞ্চলের মৃত্তিকা (Pedocals)।

(১) আর্দ্র বনাঞ্চলের মৃত্তিকা (Pedalfers):

বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের মৃত্তিকায় লৌহ ও অ্যালুমিনিয়মের ভাগ বেশি থাকে বলিয়া ইহাকে পেডালফার মৃত্তিকা বা আর্দ্র বনাঞ্চলের মৃত্তিকা বলা হয়। ইহা অম্লধর্মী ও অনুর্বর। ইহাকে কিছু জৈব, ধাতব ও নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ থাকে। কিন্তু অতি বৃষ্টিপাতের ফলে মৃত্তিকার চুনের অংশ কমিয়া যায় ও ইহা অম্লধর্মী হয়। ইহা ধূসর বাদামী বর্ণের অথবা রক্ত ও পীত বর্ণের হয়। এই মৃত্তিকার স্তর ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ৫০ সে.মি. হইতে ৬০ সে.মি.-এর বেশি গভীর হয় না। এই প্রকার মৃত্তিকাকে আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়।

(ক) **ধূসর বর্ণের মৃত্তিকা বা পডসল (Podzol):** এই মৃত্তিকা প্রধানত তৈগা বা সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনাঞ্চলে এবং মিশ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের বনাঞ্চলে দেখা যায়। ইহা ধূসর, অম্লধর্মী। চুন ও সারের ব্যবহার দ্বারা ইহাতে আলুর চাষ করা যায়।

(খ) **ধূসর-বাদামী বর্ণের মৃত্তিকা (Gray-brown Soil):** এই মৃত্তিকা ইউরোপ ও আমেরিকার আর্দ্র বনাঞ্চলে দেখা যায়। ইহা অম্লধর্মী হইলেও মোটামুটিভাবে উর্বর। এই মৃত্তিকায় ফলের চাষ ও তামাকের চাষ ভাল হয়।

(গ) **রক্ত ও পীত বর্ণের মৃত্তিকা (Red and Yellow Scil):** ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ আর্দ্র অরণ্যাঞ্চলে সাধারণত এই মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত অম্লধর্মী। চুন ও সারের প্রয়োগে ইহাতে তামাক, তুলা, ফল ইত্যাদির চাষ করা যায়।

(ঘ) **রক্ত বর্ণের ল্যাটারাইট মৃত্তিকা (Red Laterite Soil):** আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলের ভূমিভাগে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মৃত্তিকার গভীরে লোহার ভাগ বেশি থাকে বলিয়া স্থানে স্থানে নিকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ প্রস্তর গঠিত হয়। ইহা অত্যন্ত অম্লধর্মী। সার প্রয়োগ করিয়া এই মৃত্তিকাঞ্চলে শস্যাদি উৎপন্ন করা যায়।

(২) শুষ্ক তৃণাঞ্চলের মৃত্তিকা (Pedocals):

এই প্রকার মৃত্তিকা চুণপ্রধান, উর্বর ও নানা ধাতব পদার্থে পূর্ণ। ইহা ক্ষারধর্মী। ইহা স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলেই দেখা যায়। জলসেচের সাহায্যে ইহার উৎপাদিকা

শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। ইহার স্তর ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ৫ হইতে ৬ সে. মি.-এর বেশি গভীর নহে। বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুযায়ী এই মৃত্তিকাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) **কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা সারনোজেম (Chernozen)**: এই মৃত্তিকা প্রধানত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানে দেখা যায়। ইহা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। ইহাতে সার মৃত্তিকা (Humas) অধিক থাকে। সেচের সাহায্যে এই মৃত্তিকাঞ্চলে গম, যব, ভুট্টা, বীট, কার্পাস প্রভৃতি উৎপাদন করা যায়। রাশিয়া ও আমেরিকার বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চলের ভূমিভাগ এই প্রকার মৃত্তিকায় গঠিত।

(খ) **চেস্টনাট মৃত্তিকা (Chestnut Soil)**: ইহা গাঢ় বাদামী রঙের মৃত্তিকা, নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। জলসেচের সাহায্যে এই মৃত্তিকায় কিছু তৃণ, গম, ভুট্টা, কার্পাস উৎপন্ন করা যায়।

(গ) **বাদামী মৃত্তিকা (Brown Soil)**: নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমির খুব অল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহাতে জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকে। শুষ্ক প্রথায় কৃষিকার্য করা যায়।

(ঘ) **শিয়ারোজেম ও মরু মৃত্তিকা (Siarozem and Desert soil)**: এই মৃত্তিকা খুবই হাল্কা। ইহাতে সার মাটির খুবই অভাব। ইহা অনেকটা ধূসর বর্ণের। জলসেচের সাহায্যে ইহাতে কিছু কিছু চাষ-আবাদ করা গেলেও ইহা খুবই অনুর্বর ও প্রায় সকল কার্যের অনুপযুক্ত।

[প্রশ্ন: (১) মৃত্তিকা কাহাকে বলে? কিভাবে ইহা গঠিত হয়? (২) অপসৃত মৃত্তিকা ও স্থানু মৃত্তিকার মধ্যে পার্থক্য কি? (৩) জলবায়ু অনুসারে মৃত্তিকাকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং ইহারা কি কি? প্রত্যেক শ্রেণীর তিনটি করিয়া উদাহরণ উল্লেখ কর।]

অপসৃত মৃত্তিকা
(Transported Soil)

উপরি-উক্ত প্রধান দুই প্রকার মৃত্তিকা ব্যতীত নদী ব-দ্বীপ ও উপত্যকা অঞ্চলের পলি মৃত্তিকা ও পার্বত্য অঞ্চলের পার্বত্য মৃত্তিকা উল্লেখযোগ্য। এই মৃত্তিকাকে গঠন ও গুণভেদে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) **নদী ব-দ্বীপ ও উপত্যকা অঞ্চলের পলি মৃত্তিকা (Alluvial Soil)**: ইহা নদীবাহিত শিলাচূর্ণ দ্বারা গঠিত এবং নদী ব-দ্বীপ ও উপত্যকা অঞ্চলে জমিয়া থাকে। ইহা খুবই উর্বর। ভারতের নদী-উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রধানত এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। ধান, পাট, গম, ইক্ষু তুলা ইত্যাদি উৎপাদনের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী।

(২) **লোয়েস মৃত্তিকা (Loess)**: শিলাচূর্ণ বায়ু দ্বারা স্থানান্তরিত হইয়া কোন স্থানে সঞ্চিত হইলে ইহাকে লোয়েস মৃত্তিকা বলা হয়। চীনে এই

প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা খুবই উর্বর। ইহা ধান, কার্পাস, গম ইত্যাদি উৎপাদনের সহায়ক।

ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকার সমস্যা
(Soil erosion and Soil problems)

কৃষিকার্যের জন্য মৃত্তিকা অপরিহার্য। কিন্তু এই সম্পদ সর্বদাই ক্ষয় হইতেছে। ভূমিক্ষয় প্রধানত স্বাভাবিক কারণে অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণে ও মানুষের অবিবেচনা প্রসূত কার্যের ফলেই হইয়া থাকে।

(১) প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে ভূমির ঢাল, অতি বৃষ্টিপাত, বন্যা, তুষারপাত, বায়ুপ্রবাহ, মরুভূমির অগ্রগতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বৃষ্টিপাত, বন্যা, তুষারপাত বা বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির ফলে মৃত্তিকার উপরের স্তর সর্বদা স্থানচ্যুত ও ক্ষয় হয় এবং ক্রমশঃ মৃত্তিকার উর্বরাশক্তি হ্রাস পায়।

(২) ইহা ছাড়া মানুষের নিম্নলিখিত কার্যের ফলেও ভূমিক্ষয় হয়।

(ক) **বনোৎপাটন (Deforestation)**: গাছপালা শিকড়ের সাহায্যে মাটিকে আঁকড়াইয়া থাকে। ইহাতে প্রাকৃতিক কারণে ভূমিক্ষয় খুবই কম ঘটে। কিন্তু মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই ইচ্ছামত গাছপালা কাটিয়া, বনভূমি পরিষ্কার করিয়া, জনপদ গড়িয়া তোলে বা কৃষিক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। ইহাতে ভূমিক্ষয় ঘটে।

(খ) **অতি চারণ (Over-grazing)**: স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে গবাদি পশু চারণের ফলে ভূমিক্ষয় ঘটে। গবাদি পশুর ক্ষুরের আঘাতে মৃত্তিকা আলগা হইয়া যায় ও উত্তাপে ঐ মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া বৃষ্টি বা বায়ু প্রবাহের ফলে স্থানচ্যুৎ হয়।

(গ) **অবৈজ্ঞানিক চাষ-পদ্ধতি (Unscientific method of cultivation)**: ফসল কাটিবার পরে মৃত্তিকা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা প্রায় কোথাও হয় না। অধিকন্তু অনেক সময় জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া কৃষিক্ষেত্রের উপরের কিছু মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করা হয়। কোথাও বৎসরে ক্রমাগত যতবারই চাষ করা হয়, ততবারই ভূমিক্ষয় ঘটে।

(ঘ) **ত্রুটিপূর্ণ সেচব্যবস্থা (Faulty irrigation system)**: ভূ-গর্ভের জল অতিরিক্ত মাত্রায় সেচের জন্য ব্যবহার করিলে কালক্রমে ভূগর্ভে সঞ্চিত লবণের প্রভাবে কৃষিক্ষেত্রের মৃত্তিকা লবণাক্ত হইয়া যায় ও উহার উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়।

ভূমি-সংরক্ষণ
(Soil Conservation)

মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে মৃত্তিকা একটি মৌলিক সম্পদ। ইহার ক্ষয় সাধন ও উর্বরাশক্তির হ্রাস করা প্রয়োজন। মৃত্তিকা-সংরক্ষণ বিষয়টি ভূমিক্ষয়

রোধ ও ভূমির উর্বরাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা—এই দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সুতরাং মৃত্তিকা-সংরক্ষণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি বিশেষ কার্যকর হইবে।

(১) অকৃষি জমিতে নতুন অরণ্য রচন ও বনোৎপাটন রোধ।

(২) মরুভূমির অগ্রগতি রোধে ও বায়ু প্রবাহ রোধে গভীর অরণ্য বলয় রচন।

(৩) বৃষ্টি ও জলপ্রবাহ দ্বারা ভূমিক্ষয় রোধে কৃষিক্ষেত্রে আল নির্মাণ ও সুষ্ঠু জলনিকাশী ব্যবস্থা করা।

(৪) অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ রোধ করা।

(৫) অবৈজ্ঞানিক চাষপ্রথা বর্জন ও বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রবর্তন।

(৬) কৃষিতে সারের ব্যবস্থা করা, শস্যাবর্তন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং এই বিষয়ে কৃষকগণের দায়িত্ববোধ সৃষ্টির সহায়ক প্রচার অভিযান পরিচালন করা।

[প্রশ্ন : (১) ভূমিক্ষয় কাহাকে বলে ? (২) ভূমিক্ষয়ের অপকারিতা বর্ণনা কর। (৩) কি কি কারণে ভূমিক্ষয় হইয়া থাকে ? (৪) ভূমি-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। (৫) ভূমি-সংরক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি বর্ণনা কর।]

অনুশীলনী ৮

১। মৃত্তিকা বলিতে কি বুঝায়? উদ্ভব অনুযায়ী মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ কর এবং প্রত্যেক প্রকার মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

[What is meant by soil ? Classify soil types according to formation and discuss the features of each type of soil.]

২। পৃথিবীতে প্রধান প্রধান মৃত্তিকার ভৌগোলিক বণ্টন দেখাও এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

[Give the geographical distribution of the major soil types of the world and identify their characteristic features.] (W. B. C., H. S. Exam , 1979)

৩। পৃথিবীর মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ কর এবং উহাদের ব্যবহারের প্রকৃতি আলোচনা কর।

[Classify soils of the world and indicate the nature of their utilisation.]

৪। পৃথিবীর চারিটি প্রধান মৃত্তিকার নাম লিখ এবং তাহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ ও ব্যবহার নির্দেশ কর।

[Name four important soil types of the world. Broadly indicate their characteristics and uses.]

৫। ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণগুলি বর্ণনা কর এবং মৃত্তিকার সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি উল্লেখ কর।

[Describe the chief causes of soil erosion and mention the methods of soil conservation.] (Tripura H. S. Exam. 19[illegible]1)

৬। ভূমিক্ষয় রোধের প্রয়োজনীয়তা কি ? ভূমিক্ষয়ের কারণ কি কি ? ভূমিক্ষয় রোধে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের আলোচনা কর।

[Why is it necessary to prevent soil erosion ? What are the causes of soil erosion ? Discuss the methods adopted for soil conservation.]

৯ | বিভিন্ন পার্থিব সম্পদ : খনিজ দ্রব্য
(World Resources : Minerals)

আধুনিক যুগ যন্ত্র-সভ্যতার যুগ। যন্ত্র সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত ধাতু ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের আবিষ্কার ও ব্যবহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। খনিজ পদার্থের আবিষ্কার মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার মূল ভিত্তি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি ও ঐ চাহিদা পূরণের উপযোগী কারিগরি জ্ঞানের প্রসারের সহিত নিত্য নতুন খনিজ পদার্থের সন্ধান মিলিতেছে। আবার আবিষ্কৃত খনিজ পদার্থের বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণে তৈয়ারি নতুন নতুন মিশ্র ধাতু বা সংকর ধাতুর প্রয়োগও বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ধাতু কখনও ব্যবহারোপযোগী স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না। ইহা সাধারণত পৃথিবীর অভ্যন্তরে শিলাস্তরে নানা প্রকার পদার্থের সহিত মিশিয়া থাকে। এই মিশ্র পদার্থ উত্তোলন করিয়া নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহা হইতে প্রয়োজনীয় ধাতু নিষ্কাশন করা হয়। ভূগর্ভ বা খনি (Mines) হইতে যে সকল পদার্থ উত্তোলিত হয় উহাদিগকে খনিজ পদার্থ (Minerals) বলা হয় ; যেমন—কয়লা, স্বর্ণ, লৌহ, খনিজ তৈল ইত্যাদি। কখনও কখনও এই সকল পদার্থকে পৃথিবীর উপরিভাগেও সঞ্চিত দেখা যায়। অর্থাৎ ভূ-আন্দোলন বা অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরের পদার্থসমূহ পৃথিবীর উপরিভাগে উঠিয়া আসে। শিলাস্তরের গঠন ও বিন্যাসের উপরই প্রধানত খনিজ পদার্থের প্রকারভেদ নির্ভর করে।

খনিজ পদার্থ প্রাথমিকভাবে দুই প্রকারের—(১) জৈব (Organic) ও (২) অজৈব (Inorganic)। জৈব পদার্থসমূহ উদ্ভিজ্জ, জীবজন্তু প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত ; যেমন—কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর অবস্থান জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। ইহাদিগকে অধাতব খনিজ পদার্থ বলা হয়। অজৈব পদার্থসমূহ বিভিন্ন উপাদানের রাসায়নিক বিক্রিয়া হইতে উদ্ভূত ; যেমন—লৌহ, নিকেল, তাম্র প্রভৃতি। জলবায়ুর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। ধাতুই ইহার মূল বলিয়া ইহাদিগকে ধাতব খনিজ পদার্থ বলা হয়। খনি হইতে উত্তোলিত এই সকল পদার্থকে আকরিক (Ore) বলা হয়।

খনিজ সম্পদ ও ইহার বৈশিষ্ট্য
(Minerals and its features)

বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে খনিজ সম্পদ। পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলেই তাহাদের উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু

সারা পৃথিবীতে খনিজ পদার্থের সঞ্চয় ও বণ্টন খুবই অসংগতিপূর্ণ। খনিজ সম্পদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় :

(১) খনিজ পদার্থের সঞ্চয় ভূ-সংস্থানের উপর নির্ভর করে বলিয়া ইহা সম্পূর্ণরূপে মানুষের আয়ত্তের বাহিরে। অতীতের ভূ-সংগঠনের সহিত ইহার সম্পর্ক আছে বলিয়া খনিজ সম্পদ বিশ্বের সকল দেশে সমভাবে বণ্টিত হয় নাই। কোন দেশে বিভিন্ন খনিজের প্রাচুর্য দেখা যায়, আবার কোন দেশে ইহার অভাবও দেখা যায়। পৃথিবীর প্রায় ৯০% নিকেল কানাডাতে পাওয়া যায়। খনিজ তৈলের প্রায় অর্ধেকই মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিতে উত্তোলিত হয়।

(২) খনিজ পদার্থ সঞ্চিত সম্পদ। ইহার পরিমাণ সীমাবদ্ধ। মানুষ ইচ্ছা করিলেই ইহার পরিমাণ বাড়াইতে পারে না। প্রাকৃতিক কারণেই যুগ যুগ ধরিয়া তিলে তিলে ইহা ভূগর্ভে সঞ্চিত হয়।

(৩) সম্পদ মানুষের ব্যবহারের সহিত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহার পুনঃসংস্থাপন মানুষের সাধ্যাতীত। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে ইহা দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে।

(৪) খনিজ পদার্থের যোগান সীমাবদ্ধ ও ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় ইহা বিশ্বরাজনীতির উৎস। মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ তেল, আফ্রিকার তাম্র, হীরক ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের প্রধান ইন্ধন।

(৫) খনিজ সম্পদের সন্ধানে মানুষ অতি দুর্গম স্থানেও বসতি গড়িয়া তোলে। ফলে বিশ্বের বহু দুর্গম অঞ্চলও উন্নত জনপদে পরিণত হয়। অস্ট্রেলিয়ার মরু অঞ্চলের স্বর্ণকে কেন্দ্র করিয়া বা আফ্রিকার তাম্র বা হীরককে কেন্দ্র করিয়া বহু শিল্প-সহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৬) খনিজ সম্পদের বণ্টন জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল নহে বলিয়া এক অঞ্চলের খনিজ সম্পদ নিঃশেষিত হইয়া গেলে উহার পুনরুৎপাদন সম্ভব নহে। এই কারণে খনি শ্রমিকেরা অন্য অঞ্চলে নতুন কার্যের সন্ধানে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। খনিজ সম্পদ পরোক্ষভাবে বহুক্ষেত্রে মানুষকে যাযাবর বৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করে।

(৭) খনিজ সম্পদের যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৮) খনি হইতে যতই সম্পদ আহরণ করা যায় ততই ইহার উত্তোলন ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। ক্রমক্ষীয়মাণ উৎপাদন-বিধি কৃষিক্ষেত্রের মত খনিজ শিল্পেও প্রযোজ্য হয়।

(৯) খনিজ সম্পদের উৎপাদন দেশ-বিদেশে ইহার চাহিদা, কারিগরী জ্ঞানের উন্নতি ও যানবাহনের সুব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

[প্রশ্ন : (১) খনিজ সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।]

খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Minerals)

খনিজ সম্পদকে ইহার গঠন অনুযায়ী প্রথমত ধাতব পদার্থ ও অধাতব পদার্থ এই দুইভাগে ভাগ করা গেলেও শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যবহৃত খনিজ সম্পদকে উহার কার্যকারিতা অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা যায়: (১) ধাতব খনিজ, (২) অধাতব খনিজ এবং (৩) খনিজ জ্বালানী। খনিজ জ্বালানীর অন্তর্গত কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি বিষয় পরবর্তী 'শক্তি সম্পদ' অধ্যায়ে আলোচনা করা হইল। ধাতব ও অধাতব খনিজ সম্পদকে আবার কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে এই বিভাগগুলি দেখান হইল :

খনিজ সম্পদ (Minerals)

- ধাতব খনিজ (Me'allic Minerals)
  - লৌহ বর্গীয় ধাতব খনিজ (Ferrous Metals) — লৌহ
  - লৌহ সংকর ধাতব খনিজ (Ferro-a'loys) — ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, টাংস্টেন, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি।
  - অলৌহ বর্গীয় ধাতব খনিজ (Non-Ferrous metals) — তাম্র, টিন, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি।
- অধাতব খনিজ (Non-Metallic Minerals)
  - খনিজ জ্বালানী (Fuel) — কয়লা, গ্যাস, খনিজ তৈল
  - রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত খনিজ (Minerals used for Chemicals) — লবণ, পটাশ, গন্ধক ইত্যাদি।
  - গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত খনিজ (Building Materia's) — চুনাপাথর, মার্বেল, অ্যাসবেস্টস্
  - অন্যান্য অধাতব খনিজ (Non-Metallic Minerals) — গ্রাফাইট, অভ্র ইত্যাদি।

[প্রশ্ন : (১) একটি ছক অঙ্কন করিয়া খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ দেখাও।]

কৃষিকার্য ও খনিজ শিল্পের তুলনা

কৃষিকার্য পরিচালন ও খনিজ সম্পদের উত্তোলন উভয়ই প্রাথমিক স্তরের উৎপাদনমূলক কার্য। চাষ আবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপাদন কৃষিকার্যের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ভূগর্ভে সঞ্চিত নানা প্রকার খনিজ সম্পদের উত্তোলন খনিজ শিল্প বিষয়ক কার্য। উভয়প্রকার কার্যের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় :

(১) কৃষিকার্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু, মৃত্তিকা ও অন্যান্য অনুকূল অবস্থার উপর নির্ভর করে। খনিজ পদার্থের সৃষ্টি ও সঞ্চয় শিলার প্রকারভেদ ও অতীত ভূ-সংস্থানের উপর নির্ভরশীল।

(২) কৃষিকার্য অনেকাংশে মানুষের আয়ত্তাধীন। প্রয়োজনানুসারে নতুন নতুন জমি কৃষির অন্তর্ভুক্ত করা যায় ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের মাধ্যমে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু খনিজ সম্পদ দেশের নির্দিষ্ট কোন স্থানে সঞ্চিত থাকে বলিয়া ইচ্ছা করিলেই নতুন জমি হইতে ইহার উত্তোলন সম্ভব হয় না। একই খনি হইতে খনিজ পদার্থের সঞ্চয় নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রথায় বেশি পরিমাণে উত্তোলিত হইতে পারে।

(৩) একই জমিতে কৃষিজ দ্রব্যের পুনরুৎপাদন সম্ভব। এইজন্য কৃষিজ দ্রব্যকে প্রবহমান সম্পদ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। কিন্তু খনিজ দ্রব্য সঞ্চিত সম্পদ বলিয়া একই খনি হইতে ইহার পুনরুৎপাদন সম্ভব নহে। অধিকন্তু ইহার পরিমাণও সীমিত। ইহার কণামাত্রও মানুষের পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব নহে। মানুষ এই সকল পদার্থের রূপান্তর ঘটাইতে পারে মাত্র।

(৪) কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা কোন দেশে সকল সময়ে প্রায় একই প্রকার থাকে। জনসংখ্যা একটি নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছাইলে ইহার চাহিদার তেমন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু খনিজ পদার্থের চাহিদা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অর্থাৎ ইহার চাহিদা অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত।

[প্রশ্ন : (১) কৃষিকার্যের সহিত খনিজ শিল্পের তুলনা কর।]

ধাতব খনিজ
(Metallic Minerals)

লৌহ আকরিক (Iron Ore)

আধুনিক শিল্পযুগ লৌহ-ইস্পাত নির্ভর। মূল্য হিসাবে লৌহ অন্যান্য অনেক ধাতুর তুলনায় হীন হইলেও ব্যবহারিক কৌলিন্য লৌহেরই অধিক। কারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় নানা প্রকার টুকিটাকি সামগ্রী হইতে অতি সূক্ষ্ম কলকব্জা পর্যন্ত সকল প্রকার জিনিসই লৌহ-ইস্পাতের সাহায্যে প্রস্তুত।

ব্যবহার (Uses) : খনিগর্ভ হইতে লৌহ আকরিক উত্তোলন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় উহা হইতে ধাতু নিষ্কাশন করা যায়। প্রাথমিক স্তরে এই উৎপাদনকে কাঁচা লোহা বলা হয়। উহার সাহায্যে নানা প্রকার পাইপ, হাইড্র্যাণ্টের ঢাকনা, ঝাঁঝরি, কড়াই প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। কাঁচা লোহার সহিত ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল, টাংস্টেন মলিবডেনাম, ভ্যানাডিয়াম প্রভৃতি ধাতু পরিমাণমত মিশ্রিত করিয়া

নানা ধরনের ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। ঐ ইস্পাতের সাহায্যে কাটারি, সুঁচ, পেরেক, থালাবাসন, কৃষিযন্ত্রাদি, শিল্প কারখানার নানা কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, স্থল জল-আকাশ-পথে পরিবহণের উপযোগী রেল-ইঞ্জিন, মোটর, জাহাজ, রেল, বিমান, সেতু, বন্দুক, কামান, ট্যাংক প্রভৃতি আধুনিক সমরাস্ত্র এবং অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রনিক কম্পিউটর প্রভৃতি সব কিছুই প্রস্তুত হয়। মানুষের জীবনযাত্রার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল প্রকার জিনিসই ইস্পাতের দ্বারা প্রস্তুত।

শ্রেণীবিভাগ (Classification): লৌহ ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন প্রকার শিলার সহিত মিশ্রিত থাকে। ইহা কখনও বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য সাধারণত অধিক লৌহযুক্ত আকরিক হইতেই লৌহনিষ্কাশন করা হয়। কিন্তু লৌহের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। পক্ষান্তরে ইহার যোগান সীমাবদ্ধ। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে উন্নত নিষ্কাশন-পদ্ধতির সাহায্যে নিকৃষ্ট শিলা হইতেও লৌহ নিষ্কাশন করা হইবে। লৌহের পরিমাণ ও মান অনুযায়ী লৌহ আকরিককে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—

(১) ম্যাগনেটাইট (Magnetite)—ইহার রং কালো। ইহাতে প্রায় ৭২.৪% ধাতু থাকে।

(২) হেমাটাইট (Haematite)—ইহা দেখিতে ধূসর ও লাল রঙের হয়। ইহাতে ধাতুর পরিমাণ প্রায় ৭০% থাকে।

(৩) লিমোনাইট (Limonite)—ইহার রং হলুদ। ইহাতে প্রায় ৬০% ধাতব লৌহ থাকে।

(৪) সিডেরাইট (Siderite)—ইহার রং ধূসর। ইহাতে ধাতুর পরিমাণ প্রায় ৪৮% থাকে।

উপরি-উক্ত চারিপ্রকার লৌহ আকরিক ব্যতীত অনেক সময় আকরিক হ্রদের তলদেশে অল্প লৌহমিশ্রিত আকরিক পাওয়া যায়। ইহাকে বগ আয়রন (Bog Iron) বলে।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions)—আকরিক লৌহ উৎপাদনে পৃথিবীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়, ফ্রান্স তৃতীয় এবং চীন চতুর্থ স্থান অধিকার করে। অন্যান্য উৎপাদনকারী অঞ্চলের মধ্যে বৃটেন, সুইডেন, কানাডা, পশ্চিম জার্মানি, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, ব্রেজিল, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ প্রভৃতি প্রধান।

এশিয়ার দেশসমূহ

চীন—এশিয়া মহাদেশে চীন আকরিক লৌহ উৎপাদনে প্রথম। ইয়াংসি অববাহিকায় হুপেই, শান্টুং উপদ্বীপ, শানসি হুনান. দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া, কেয়াণ্টুং, পেনসিহু প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর উৎকৃষ্ট আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। উহান (Wuhan) অঞ্চলে তায়ে (Taygeh) নামক স্থানে বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট আকরিক সঞ্চিত আছে বলিয়া দাবি করা হয়। এশিয়ার সর্ববৃহৎ লৌহ-ইস্পাত কারখানা চীনের আনশানে

অবস্থিত। চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এই শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে।

ভারত: লৌহ আকরিক উৎপাদনে ভারত এশিয়ায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ভারতে প্রচুর হেমাটাইট জাতীয় আকরিক উত্তোলিত হয়। ওড়িশা (৩৬%), বিহার (২৬%), মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে প্রধানত এই আকরিক উত্তোলন করা হয়। ভারতের লৌহ আকরিক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বিহারের সিংভুম জেলার নোয়ামুণ্ডি, গুয়া, বুদাবুরু, পানশিরাবুরু; ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার গুরুমহিষাণী, সুলাইপাত, বাদামপাহাড়; কেওঞ্জর জেলার বাগিয়াবুরু; মধ্যপ্রদেশের দুর্গ জেলার ডালি, রাজহারা, বাস্তার জেলার বায়লাডিলা; অন্ধ্রপ্রদেশের কুনুর্ল, কুডাপ্পা, নেলোর; তামিলনাড়ুর সালেম; কর্ণাটকের বাবাবুদান পাহাড়, বেলাড়ি, হসপেট, চিত্রদুর্গ, টুমকুর সান্দুর। গোয়া ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয়। আকরিক লৌহ উৎপাদনে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রচুর আকরিক বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকে।

জাপান: এই দেশের হোক্কাইডো (মুরোরান), হনশু (কেনিন) দ্বীপেই আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। মান অনুযায়ী ইহা খুবই নিকৃষ্ট ধরনের এবং উৎপাদনের পরিমাণ আদৌ পর্যাপ্ত নহে। ফলে জাপানকে বিদেশ হইতে প্রচুর আকরিক আমদানি করিতে হয়। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা জাপানের ইয়াকোহামা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত।

উপরি-উক্ত দেশ ব্যতীত এশিয়ার অন্তর্গত ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, ফরমোসা, ফিলিপাইনস্, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলেও লৌহ-আকরিক উত্তোলিত হয়।

ইউরোপের দেশসমূহ

সোভিয়েত ইউনিয়ন: পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৩০% আকরিক লৌহ উৎপাদন করিয়া এই দেশ বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে এই দেশের উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না। ইউরোপীয় রাশিয়ার অন্তর্গত ইউক্রেনের ডোনেৎজ উপত্যকার ক্রিভয়রগ, কার্চ উপদ্বীপ, ইউরাল পর্বতের নিকট ম্যাগনিটোগোরস্ক, ওস্ক প্রভৃতি আকরিক লৌহ উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ছাড়া, মস্কো, টুলা, কুর্স্ক, কোলা উপদ্বীপের মুরমানস্ক প্রভৃতি অঞ্চলেও আকরিক লৌহ উত্তোলিত হয়। এশিয়ার অন্তর্গত রাশিয়ায় ইনিসি অববাহিকায় কুজবাস, বৈকাল হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চল, আমুর অববাহিকা (ভ্লাডিভোস্টক) প্রভৃতি স্থানে উচ্চস্তরের আকরিক পাওয়া যায়।

ফ্রান্স: ইউরোপে আকরিক লৌহ উৎপাদনে এই দেশের স্থান দ্বিতীয়। ফ্রান্সের লোরেন, নর্মান্ডি, ব্রিটানী ও পিরেনিজ পর্বতাঞ্চলে প্রচুর লৌহ উত্তোলিত হয়। লোরেন এই দেশের সর্ববৃহৎ খনি অঞ্চল। ইহা পার্শ্ববর্তী বেলজিয়াম ও লুক্সেমবার্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই খনি অঞ্চলকে ফ্রান্স-বেলজিয়াম-লুক্সেমবার্গ লৌহক্ষেত্র বলে। লোরেনের লৌহ আকরিক অনেক ক্ষেত্রেই নিকৃষ্ট ধরনের লিমোনাইট বর্গীয়।

চিত্র ৯.১ : পৃথিবীর লৌহ আকরিকের বণ্টন।

ব্রিটেন—বৃটিশ যুক্তরাজ্য বা বৃটেন এক সময় আকরিক লৌহ উত্তোলনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও বর্তমানে ইহার খনিগুলি নিঃশেষিতপ্রায়। পিনাইন পর্বতের পূর্ব পার্শ্বে ক্লীভল্যাণ্ডের অন্তর্গত ইয়র্কশায়ার, ডার্বিশায়ার, নটিং-হ্যাম্পশায়ার, ইহার পশ্চিম পার্শ্বে কাম্বারল্যাণ্ড ও উত্তর ল্যাংকাশায়ার, দেশের মধ্যবর্তী সমভূমির অন্তর্গত স্ট্যাফোর্ডশায়ার এবং স্কটল্যাণ্ডের ক্লাইড অববাহিকা অঞ্চলেই এই দেশের সর্বাধিক আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। ওয়েলস প্রদেশেও কিছু আকরিক উত্তোলিত হয়। অতীতে শিল্পের প্রসারের প্রয়োজনে অতিরিক্ত মাত্রায় উৎপাদনের ফলে বর্তমানে বহু খনি নিঃশেষিত। এই দেশের মোট উৎপাদন চাহিদার তুলনায় খুবই কম। এই কারণে স্পেন ও সুইডেন হইতে প্রচুর আকরিক আমদানি করা হয়।

পৃথিবীর লৌহ আকরিক উৎপাদন (১০ লক্ষ মেট্রিক টনে)

[দেশের পার্শ্বে আকরিকের লৌহের পরিমাণ নির্দেশিত]

	১৯৮০	১৯৮৩		১৯৮০	১৯৮৩
পৃথিবী	৭৪৩.০	৬৭৫.০	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (৬৩%)	৭০.৭	৩৮.৬
সোভিয়েত ইউনিয়ন (৬০%)	২৪৬.০	২৪৪.০	দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন (৬০-৬৫%)	২৬.৩	২৪.৫
অস্ট্রেলিয়া (৬০%)	৯৬.৯	৮০.৯	ফ্রান্স (৩০%)	২৯.৯	১৫.৯
ব্রেজিল (৬৮%)	১৩৯.৭	৬২.৭	সুইডেন (৬০-৬৫%)	২৭.২	১৩.২
ভারত (৬৩%)	৪১.৯	৪২.০	ভেনেজুয়েলা	১৬.১	১১.৭
চীন	৩৭.৫				

পশ্চিম জার্মানি : এই দেশের গুরুত্বপূর্ণ আকরিক লৌহ ভাণ্ডার উত্তর রাইন-অববাহিকায় ওয়েস্ট ফ্যালিয়া অঞ্চলে। হার্ৎজ সলজগিটার সিজারল্যান্ড, ভোজেলস্-বাগ, রাইন প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর আকরিক পাওয়া যায়। জার্মানির ইস্পাত শিল্প খুবই উন্নত।

স্পেন এব্রো নদীর অববাহিকায় বিলবাও এবং স্যানটারডার এবং সুইডেনে কিরুনা ও গালিভারা, গ্রাঞ্জবর্গ, ডানিমো বা কোপারবার্গ অঞ্চলে প্রচুর আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। কিন্তু কয়লার অভাবহেতু এই সকল স্থানে ইস্পাত-শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। এই দুই দেশের আকরিক প্রচুর পরিমাণে বৃটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে রপ্তানি হয়। ইউরোপের ইটালী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশেও স্বল্প পরিমাণে আকরিক লৌহ উত্তোলিত হয়।

আমেরিকার দেশসমূহ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র : বিশ্বে আকরিক লৌহ উৎপাদনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর স্থান একসময় দ্বিতীয় ছিল, অস্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, প্রভৃতি দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এই দেশের স্থান ১৯৮৩ সালে পঞ্চম হইয়াছে। এই দেশে সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চলে এবং আলবামা বার্মিংহাম অঞ্চলেই প্রধানত আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৩০% আকরিক লৌহ উৎপাদন করে। সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চলে মিনেসোটা রাজ্যের অন্তর্গত মেসাবি, ভারমিলিয়ন ও কুইনা এবং উইস্কনসিন এবং মিচিগান রাজ্যের অন্তর্গত মারকোয়েট, মেনোমিনি ও গোজেবিক অঞ্চলের খনিসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের আকরিক হ্রদ জলপথে প্রেরিত হয়। এই অঞ্চলের আকরিক উৎকৃষ্ট হেমাটাইট বর্গীয়। আলাবামা—বার্মিংহাম অঞ্চলে আপালাসিয়ান পর্বতাঞ্চলের দক্ষিণে টেনেসি রাজ্য হইতে আলাবামা পর্যন্ত এই খনি বিস্তৃত। এই অঞ্চলের বার্মিংহাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপরি-উক্ত দুই অঞ্চল ব্যতীত নিউইয়র্কের এডিরনডাক পেনসিলভ্যানিয়ার কর্ণওয়াল, নিউজার্সি এবং রকি পর্বতাঞ্চলের উইওমিং উটা নিউমেক্সিকো, ক্যালিফোর্নিয়া প্রভৃতি স্থানেও উল্লেখযোগ্য লৌহ আকরিকের ভাণ্ডার আছে।

কানাডা : এই দেশের আকরিক লৌহখনিগুলি প্রধানত পশ্চিমাঞ্চলে বৃটিশ কলম্বিয়া, আলবার্টা, সাচকাচুয়ান প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। পূর্বাঞ্চলে নিউফাউন্ড-ল্যান্ড, নোভাস্কোশিয়া অন্টারিও ও সেন্টলরেন্স অববাহিকা প্রভৃতি স্থানেও কিছু কিছু আকরিক পাওয়া যায়। লৌহখনিগুলি বিক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং কয়লা খনির সহিত নিবিড় যোগ না থাকায় কানাডায় লৌহ-ইস্পাত শিল্প তেমনভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

ভেনেজুয়েলা : ভেনেজুয়েলা আকরিক লৌহ উৎপাদনে দক্ষিণ আমেরিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ওরিনকো নদীর দক্ষিণে গুইনার উচ্চ ভূমিতে এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য আকরিক লৌহের খনি অবস্থিত। এল পাও (El Pao) এবং

সেরো বলিভার (Cero Boliver) প্রধান লৌহখনি অঞ্চল। আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় এই অঞ্চলের প্রচুর আকরিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়।

ব্রেজিল : এই দেশে লৌহ আকরিকের বিপুল ভাণ্ডার রহিয়াছে। কয়লার অভাব হেতু ব্রেজিলে আকরিক লৌহের উৎপাদন কম এবং উল্লেখযোগ্য কোন ইস্পাত শিল্পও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। লৌহ আকরিক উত্তোলনে ব্রেজিল দক্ষিণ আমেরিকায় শীর্ষস্থান এবং পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এদেশের উল্লেখযোগ্য খনিগুলি মিনাস গেরায়েস (ইটাব্রিয়া, বেলোহরিজোণ্ট, আউরোপেট্রো), বাহিয়া মাতোগ্রাসো, সাওপাওলো, কোরিয়া, মারা হায়া প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত।

চিলি, পেরু ও বলিভিয়া অঞ্চলেও স্বল্প পরিমাণে আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। চিলির লাসেরেন, ভ্যালপ্যারাইসো ও মারকোনা উল্লেখযোগ্য খনি অঞ্চল।

আফ্রিকার দেশসমূহ

এই মহাদেশে আকরিক লৌহ উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য স্থানের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন (ট্রান্সভাল), মরক্কো, টিউনিসিয়া, আলজিরিয়া ও পশ্চিম আফ্রিকার সিয়েরা লিওন অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। ইহা প্রধানত ইউরোপীয় দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়। স্থানীয় ব্যবহারের পরিমাণ কম।

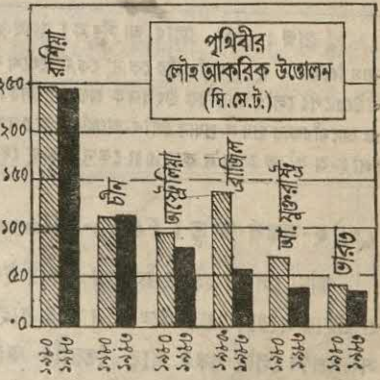

চিত্র ১২ : পৃথিবীর লৌহ আকরিক উত্তোলন—'বার গ্রাফ'।

ওসিয়ানিয়ার দেশসমূহ

এই মহাদেশে আকরিক লৌহের উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডার একমাত্র অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়। বিগত সত্তরের দশক হইতে লৌহ আকরিক উত্তোলনে অস্ট্রেলিয়ার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিয়াছে, বর্তমানে এই দেশ বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার স্পেনসার উপসাগরের নিকট আয়রন নব এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের আয়রন মনার্ক এই দেশে আকরিক লৌহ উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য খনি অঞ্চল। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ইয়াম্পিসা উণ্ড, মাউণ্ট গোল্ডস ওয়ার্দি, মাউন্ট হোয়েল বাক, মাউন্ট ব্রুস, মাউন্ট টমপ্রাইস অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চল। স্থানীয় কয়লা ও টাসম্যানিয়ার চুনাপাথরের সাহায্যে নিউক্যাসল ও কেম্বলা বন্দরে ইস্পাত-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

আকরিক লৌহের বাণিজ্য

ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার শিল্পোন্নত দেশগুলিতে যেমন ইস্পাতের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। তেমনি ঐ সকল দেশের স্থানীয় সঞ্চয়ও কমিয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে কয়লার অভাবে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার ক্ষুদ্র দেশগুলির আকরিক লৌহের স্থানীয় চাহিদা কম। ফলে লৌহ-আকরিকের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আমদানিকারক দেশের মধ্যে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়াম প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী দেশ প্রধান। বর্তমানে ইরাণ ও জাপান ভারত হইতে লৌহ-আকরিক আমদানির চুক্তিতে আবদ্ধ। আকরিক লৌহ রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে সুইডেন, ফ্রান্স, স্পেন, ভেনেজুয়েলা ও ভারত প্রধান। ইহা ব্যতীত স্বল্প পরিমাণে রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে আলজিরিয়া, মরক্কো, ফিলিপাইন, মালয়, কোরিয়া, লুক্সেমবার্গ, ভেনেজুয়েলা, চিলি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

[প্রশ্ন : (১) লৌহ আকরিকের ব্যবহার আলোচনা কর এবং কয়েক প্রকার লৌহ আকরিকের নাম লিখ। ২) পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে অধিক লৌহ-আকরিক পাওয়া যায়? (৩) এশিয়া ও ইউরোপের লৌহ আকরিক উৎপাদক অঞ্চলগুলির বিবরণ দাও। (৪) পৃথিবীর একটি রেখাচিত্রে এশিয়া ও আমেরিকার প্রধান প্রধান লৌহ-আকরিক অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করিয়া দেখাও। (৫) কোন্ কোন্ দেশ লৌহ-আকরিক রপ্তানি করে এবং কোন্ কোন্ দেশ উহা আমদানি করে।]

লৌহ-সঙ্কর ধাতু (Ferro-Alloys)

কাঁচা লোহা হইতে বিভিন্ন প্রকার ইস্পাত প্রস্তুত, ইস্পাতের কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উহার মরিচা রোধ কল্পে লোহার সহিত নানা ধরনের ধাতব পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণে লৌহ-সঙ্কর ধাতু তৈয়ারি করা হয়। লৌহ-সঙ্কর ধাতু তৈয়ারি করিতে সাধারণত ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন, মলিবডেনাম, ভ্যানাডিয়াম প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রণের ফলে ইস্পাতের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। ফলে ইস্পাত তৈয়ারিতে ম্যাঙ্গানীজ অপরিহার্য। ক্রোমিয়াম, নিকেল, টাংস্টেন ইত্যাদি প্রয়োগে লোহার ক্ষয় রোধ হয় এবং প্রচণ্ড উত্তাপেও ইহার কোন বিকৃতি ঘটে না। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতিতে সঙ্কর ধাতুর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)

ব্যবহার (Uses) : ধাতব ম্যাঙ্গানিজ প্রধানত লৌহ-ইস্পাত শিল্পে (৯০%) ব্যবহৃত হয়। ইহার সাহায্যে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ, স্টীল প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। লৌহের সহিত ইহার সংমিশ্রণে লৌহ কঠিন ও দৃঢ় হয়, এবং ইহার মরিচা ধরা রোধ হয়। ইস্পাত-শিল্প ব্যতীত রাসায়নিক, এনামেল, বৈদ্যুতিক ও কাঁচ শিল্পে ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার আছে। প্রধানত পাইরোলুসাইট (Pyrolucite) ও সিলোমিলেন (Psilomelane) নামক দুই প্রকার আকরিক হইতে ইলেকট্রোলাইটিক পদ্ধতিতে ম্যাঙ্গানিজ নিষ্কাশন করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল : সোভিয়েত ইউনিয়ন : ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে জর্জিয়ার চিয়াতুরা (Chiatura) এবং ইউক্রেন রাজ্যের নিকোপল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে (৮৮%) ম্যাঙ্গানিজ আকরিত হয়। ইহা ব্যতীত কুই-বিশেভ, কাজাকস্থান, বাশকিরিয়া ও সাইবেরিয়ার মাঙ্গুল নদীর অববাহিকায়ও কিছু পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৩০% এককভাবে উৎপাদন করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন : এই দেশের কেপ প্রদেশে (কিম্বার্লি) পোমাস-বার্গ ও ক্রোগাস'ডন' অঞ্চলে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হয়। বর্তমানে বিশ্বে এই দেশের স্থান দ্বিতীয়।

ভারত : ম্যাঙ্গানিজের সঞ্চিতিতে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ভারতে বিহারের সিংভূম, উড়িষ্যার গাংপুর, কালাহাণ্ডি, কোরাপুট, বোনাই, কেওনঝড়, সুন্দরগড়, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, ছিন্দওয়ারা, জব্বলপুর, মহারাষ্ট্রের ভাণ্ডারা, পাঁচমহল, অন্ধ্রের বিশখাপত্তনম, শ্রীকাকুলম ও মহীশূরের শিমোগা, চিত্তলদ্রুগ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। ভারতে ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার এখনও কম বলিয়া ভারত হইতে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ বিদেশে রপ্তানি হয়।

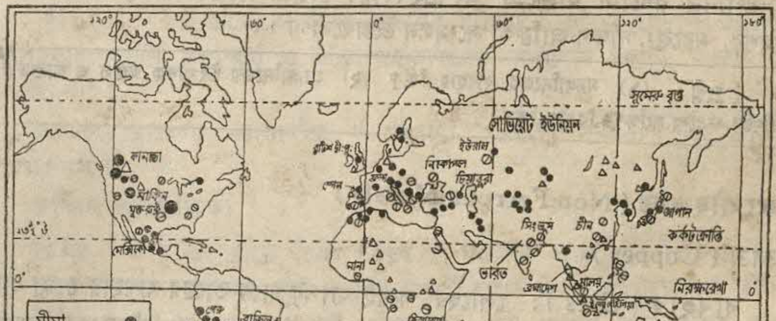

চিত্র ৯.৩ : পৃথিবীর ম্যাঙ্গানিজ, সীসা ও টিন উত্তোলক অঞ্চল।

ব্রেজিল : ব্রেজিল বর্তমানে ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনে বিশ্বে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। এই দেশের মিনাস গেরায়েস-এর অন্তর্গত লাফায়েট জেলায় এবং গ্যাবন, আমাপা ও আউরোপ্রেটো অঞ্চলে প্রচুর ম্যাঙ্গানিজ আকর সঞ্চিত আছে। উৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে আমাপা বিশ্বশ্রেষ্ঠ এবং আউরোপ্রেটো প্রধান খনি অঞ্চল।

আফ্রিকার ঘানা ও গ্যাবন রাজ্যেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন সামান্য। দক্ষিণ ডাকোটা, আরকানসাস,

ভার্জিনিয়া, টেনেসি এবং জর্জিয়া এই দেশের প্রধান উৎপাদক অঞ্চল। পশ্চিম জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া, কিউবা, অস্ট্রেলিয়া, মিশর, জাপান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র স্বল্প পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলন করিয়া থাকে।

পৃথিবীর ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টনে)

	১৯৭৯	১৯৮০		১৯৭৯	১৯৮০
পৃথিবী	১০০·৭	১০২·২	অস্ট্রেলিয়া	৬·৬	১০·৪
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৩১·৬	৩০·৪	ব্রেজিল	১২·৩	৯·৫
দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন	২২·৯	২৫·২	ভারত	৬·৬	৬·২
গ্যাবন	১১·৭	১১·৭	চীন	৩·০	৩·০

[Source : UNO Statistical Year Book, 1981]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade)

ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত শিল্পের একটি অপরিহার্য কাঁচামাল বলিয়া শিল্পোন্নত দেশে ইহার চাহিদা বেশি। ম্যাঙ্গানিজ আমদানিকারক দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে ভারত, ঘানা, ব্রেজিল, মিশর, মরক্কো, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন উল্লেখযোগ্য।

[প্রশ্ন : (১) ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার কি ? (২) ম্যাঙ্গানিজের উৎপাদক অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।]

অলৌহ ধাতু (Non-Ferrous Metals)

তাম্র (Copper)

ব্যবহার (Uses) : লৌহের পরেই ব্যাপকভাবে তাম্রের ব্যবহার দেখা যায়। ধাতুযুগের সূচনা তাম্রের ব্যবহারকে কেন্দ্র করিয়া। সুতরাং প্রাচীনকালে বাসনপত্র, অলঙ্কার, যুদ্ধাস্ত্র সবই তাম্রনির্মিত ছিল। তাম্র উত্তম তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী (Good conductor) বলিয়া বর্তমানে বৈদ্যুতিক শিল্পেই তাম্রের ব্যবহার সর্বাধিক। ইহা ছাড়া সমরাস্ত্র-নির্মাণে, মুদ্রণ-শিল্পে, রং, কীটনাশক ঔষধ তৈয়ারিতে, রেল ও জাহাজ নির্মাণে তাম্র ব্যবহার করা হয়। তাম্রের সহিত অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত করিয়া বিভিন্ন সঙ্কর ধাতুও প্রস্তুত করা হয়। যেমন—

তাম্র + টিন বা রাং = ব্রোঞ্জ (Bronze)
তাম্র + দস্তা = পিতল (Base-metal)
তাম্র + দস্তা + টিন = কাঁসা (Bel-metal)
তাম্র + পিতল = জার্মান সিলভার (German Silver)
তাম্র + স্বর্ণ = গিনি সোনা (Guinea Gold)

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Region)

ধাতব তাম্র পৃথিবীতে সামান্যই পাওয়া যায়। বেশির ভাগ তাম্রই নানাপ্রকার আকরিক হইতে নিষ্কাশন করা হয়। কানাডার সীমান্তে সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চলে, সুইডেন এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কোলা উপদ্বীপ ও ইউরাল পার্বত্য অঞ্চলে খনিজ তাম্র স্বাভাবিক অবস্থায় সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে কপার পাইরাইটস, কপার সালফাইড, কপার কার্বোনেট, কিউপ্রাইট প্রভৃতি আকরিক হইতে তাম্র শোধন করিয়া বাহির করা হয়। আকরিক তাম্র বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শোধন করিবার সময় কিছু পরিমাণে স্বর্ণ, রৌপ্য, নিকেল, সীসা, দস্তা ইত্যাদি পাওয়া যায়।

উত্তর আমেরিকা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র : তাম্র উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর প্রায় ⅕ অংশ তাম্র এই দেশে উৎপন্ন হয়। আরিজোনা, (মিচিগান, বিসবি, জেরোম, গ্লোবমিয়ামি, উস্টার), উটা (বিংহাম), নেভাডার এলি এবং মনটানার বুটে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাম্র উৎপাদক অঞ্চল। ইহা ছাড়া ওয়াশিংটন, টেনেসি রাজ্যেও কিছু কিছু তাম্র উৎপাদিত হয়।

কানাডা : এই রাজ্যে অণ্টারিও প্রদেশের সাডবেরী, কুইবেক প্রদেশের নোরান্ডা. ভ্যাঙ্কুভার, বৃটিশ কলম্বিয়া ও রকি পর্বতাঞ্চলের আলবের্নি প্রভৃতি অঞ্চলে তাম্র পাওয়া যায়।

মেক্সিকো রাজ্যের ক্যানানীয়া ও সোনারা অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে তাম্র পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকা

চিলি : তাম্র উৎপাদনে চিলি পৃথিবীতে বর্তমানে শীর্ষ স্থান অধিকার করে। এই দেশের উৎপাদন প্রধানত চুকুই কামাটা, পেট্রেরিলোস এবং সান্টিয়াগোর দক্ষিণ-পূর্বে ব্রাডেন ডা সেওয়েল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এই দেশের তাম্র বেশির ভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হইয়া থাকে।

পেরু, বলিভিয়া ও ভেনেজুয়েলা অঞ্চলেও কিছু কিছু তাম্র উত্তোলিত হয়।

পৃথিবীর খনিজ তাম্র উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টনে)

	১৯৮০	১৯৮৩		১৯৮০	১৯৮৩
পৃথিবী	৮৩·৮৯	৮৬·৯৩	জাইরে	৪·৫৯	৫·২৭
চিলি	১০·৫২	১২·৮৩	ফিলিপাইনস	৩·০৪	৪·২৬
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	১১·৮১	১০·৪৫	পেরু	৩·৬৭	৩·৪৯
জাম্বিয়া	৭·৩৬	৬·৯৬	পোলাণ্ড	৩·৪২	৩·৬৫
কানাডা	৭·০৯	৬·৭৩	সোঃ রাশিয়া	১১·৫০	

[Source : UNO Monthly Bulletin of Statistics, 1984]

এশিয়া

সোভিয়েত ইউনিয়ন : বিশ্বে তাম্র উৎপাদনে রাশিয়া দ্বিতীয়। ইউরাল পর্বতাঞ্চল, কাজাকস্থান, বলখাস হ্রদ অঞ্চল, আর্মেনিয়া ও উজবেকিস্থানে তাম্র পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ইউরাল অঞ্চলেই রাশিয়ার সর্ববৃহৎ তাম্র-ভাণ্ডার রহিয়াছে।

জাপান : তাম্র উৎপাদনে জাপান এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। জাপানের এসিও, হিতাচী, সাগানোসেকি, কোসাকো প্রভৃতি তাম্র উৎপাদক অঞ্চল।

ভারত : ভারতে তাম্রের উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। বিহারে মোসাবনি ও ধোবানি ; অন্ধ্রে নেলোর ও অনন্তপুর, রাজস্থানে ক্ষেত্রী ও দরিবো অঞ্চলে তাম্র পাওয়া যায়। মহীশূর, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও সিকিম অঞ্চলেও স্বল্প পরিমাণে তাম্র-আকরিক পাওয়া যায়।

আফ্রিকা : **জাম্বিয়া**—(উত্তর রোডেশিয়া) তাম্র উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। এই দেশে এনকানা, বোয়াজ, এন্টলোপ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ তাম্র-খনি কেন্দ্র। আভ্যন্তরীণ চাহিদা সামান্য বলিয়া এই দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে তাম্র বেঙ্গুয়েলা ও লোবিটো বন্দর মারফত ইওরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হয়।

জাইরে : এই দেশের কাতাঙ্গা প্রদেশেই সর্বাধিক তাম্র পাওয়া যায়। উৎপাদিত তাম্র প্রায় সর্বাংশেই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই রাজ্যের প্রধান খনি কাউঙ্গোর দক্ষিণে কিপুসি, রুয়ে ও মুসোনোই প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন-এর ট্রান্সভাল, কেপ প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও তাম্র পাওয়া যায়।

ইউরোপ : তাম্র উৎপাদনে ইউরোপ মহাদেশের স্থান নগণ্য। বেলজিয়াম, জার্মানী ও বৃটিশ যুক্তরাজ্য, স্পেন, (রিও টিনটো) এবং পতুগাল (সিয়েরো নেভাডা অঞ্চলে) স্বল্প পরিমাণে তাম্র উত্তোলিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথওয়েলস (ব্রাকেনহিল), কুইন্সল্যান্ড (কার্পেন্টারিয়া), এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় তাম্র পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) : বৃটিশ যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, ভারত প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে তাম্র আমদানি করিয়া থাকে। তাম্র রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে জাম্বিয়া, কঙ্গো, চিলি, পেরু, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

[প্রশ্ন : (১) তাম্রের ব্যবহার বিশেষভাবে আলোচনা কর। (২) তাম্র-উৎপাদক অঞ্চলগুলির বিবরণ দাও এবং ইহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।]

টিন বা রাং (Tin)

ব্যবহার (Uses) : প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রভাবে সহজে টিনে কলঙ্ক ধরে না বলিয়া ইহা লৌহের পাতের উপর হাল্কা প্রলেপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহা

অনেকাংশে বায়ুরোধক। খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র, ফল, পেট্রল ইত্যাদি সংরক্ষণ ও স্থানান্তরে প্রেরণের জন্য যে হাল্কা পাত্র ব্যবহার করা হয় উহা নির্মাণে টিন বা রাং অপরিহার্য, পাতলা লোহের চাদরের উপর টিন বা রাং-এর প্রলেপ লাগান হয়। সীসার পাতলা চাদরের উপর টিনের প্রলেপ দিয়া চকোলেট ও সিগারেটের রূপালী কাগজ প্রস্তুত করা হয়। ইহা ছাড়া তামার সহিত টিন মিশাইয়া ব্রোঞ্জ ও পিতলের সহিত টিন মিশাইয়া কাঁসা প্রস্তুত করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions): পৃথিবীর অধিকাংশ টিনই ক্যাসিটেরাইট (Caseterite), স্ট্যানাইট (Stannite), সিলিনড্রাইট Cylindrite) এবং ফ্র্যাঙ্কাইট (Frankite) আকরিক হইতে নিষ্কাশিত হয়। ধাতব টিন স্বাভাবিক অবস্থায় খুব কমই পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই টিন সর্বাপেক্ষা বেশি পাওয়া যায়।

পৃথিবীর টিন উৎপাদন (হাজার মেট্রিক টনে)

	১৯৮০	১৯৮৩		১৯৮০	১৯৮৩
পৃথিবী	২০৯.০	২৩০.০	থাইল্যান্ড	৩১.৭	২৩.৫
মালয়েশিয়া	৬১.৪	৪৯.৪	ব্রেজিল	৬.৯	১২.৬
ইন্দোনেশিয়া	৩১.৮	২৬.৫	অস্ট্রেলিয়া	১১.৪	১০.৩
বলিভিয়া	২৭.৩	২৪.৩	বৃটেন	৩.০	৪.৬

[Source: UNO Monthly Bulletin of Statistics, 1984]

এশিয়ার দেশসমূহ

মালয়েশিয়া: পৃথিবীর প্রায় ৪০% টিন এই দেশে উৎপন্ন হয়। সেলাঙ্গার, পেরাক, নেগ্রি সেম্বিলান, পাহাং, জোহোর, কেডা, ত্রেঙ্গনু প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর টিন পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের নদীতীরে বালুকার মধ্যেও টিনের রেণু পাওয়া যায়।

ইন্দোনেশিয়া: এই গণতন্ত্রের বাঙ্কা, বিলিটন, সিংকেপ, সুমাত্রা অঞ্চল টিন উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর ২০% টিন এই দেশে উৎপন্ন হয়।

ব্রহ্মদেশ: মৌচি, ট্যাভয় ও কারাবুরি এই দেশের প্রধান টিন উৎপাদক অঞ্চল।

অন্যান্য দেশ: চীনের ইউনান ও কোয়াংসি প্রদেশ এবং থাইল্যাণ্ডের পাকেট দ্বীপেও কিছু টিন পাওয়া যায়।

আফ্রিকার নাইজারিয়া ও জাইরে গণতন্ত্র, ইউরোপের জার্মানি, পর্তুগাল ও রাশিয়া (লেনিনোগর্স্ক ও ওলোভায়ানায়া অঞ্চল) বৃটিশ যুক্তরাজ্য (কর্নোয়াল), অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্, কুইন্সল্যাণ্ড, টাসমানিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া অঞ্চলে টিন আকরিত হয়। বলিভিয়া রাজ্যের টিনের খনি অঞ্চল আন্দিজ পর্বতের প্রায় ৫০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে এই অঞ্চলে টিন উত্তোলন খুবই কঠিন। পটোসি অরুরো বলিভিয়ার বিখ্যাত টিন উৎপাদক অঞ্চল।

এশিয়া

সোভিয়েত ইউনিয়ন : বিশ্বে তাম্র উৎপাদনে রাশিয়া দ্বিতীয়। ইউরাল পর্বতাঞ্চল, কাজাকস্থান, বলখাস হ্রদ অঞ্চল, আর্মেনিয়া ও উজবেকিস্থানে তাম্র পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ইউরাল অঞ্চলেই রাশিয়ার সর্ববৃহৎ তাম্র-ভাণ্ডার রহিয়াছে।

জাপান : তাম্র উৎপাদনে জাপান এশিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। জাপানের এসিও, হিতাচী, সাগানোবেকি, কোসাকো প্রভৃতি তাম্র উৎপাদক অঞ্চল।

ভারত : ভারতে তাম্রের উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। বিহারে মোসাবনি ও ধোবানি; অন্ধ্রে নেলোর ও অনন্তপুর, রাজস্থানে ক্ষেত্রী ও দরিবো অঞ্চলে তাম্র পাওয়া যায়। মহীশূর, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও সিকিম অঞ্চলেও স্বল্প পরিমাণে তাম্র-আকরিক পাওয়া যায়।

আফ্রিকা : জাম্বিয়া—(উত্তর রোডেশিয়া) তাম্র উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। এই দেশে এনকানা, বোয়াজ, এন্টিলোপ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ তাম্র-খনি কেন্দ্র। আভ্যন্তরীণ চাহিদা সামান্য বলিয়া এই দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে তাম্র বেঙ্গুয়েলা ও লোবিটো বন্দর মারফত ইওরোপ ও আমেরিকায় রপ্তানি হয়।

জাইরে : এই দেশের কাতাঙ্গা প্রদেশেই সর্বাধিক তাম্র পাওয়া যায়। উৎপাদিত তাম্র প্রায় সর্বাংশেই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই রাজ্যের প্রধান খনি কাউঙ্গোর দক্ষিণে কিপুসি, রুয়ে ও মুসোনোই প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন-এর ট্রান্সভাল, কেপ প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও তাম্র পাওয়া যায়।

ইউরোপ : তাম্র উৎপাদনে ইউরোপ মহাদেশের স্থান নগণ্য। বেলজিয়াম, জার্মানী ও বৃটিশ যুক্তরাজ্য, স্পেন, (রিও টিনটো) এবং পতুগাল (সিয়েরো নেভাডা অঞ্চলে) স্বল্প পরিমাণে তাম্র উত্তোলিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথওয়েলস (ব্রাকেনহিল), কুইন্সল্যাণ্ড (কার্পেণ্টারিয়া), এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ায় তাম্র পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) : বৃটিশ যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, ভারত প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে তাম্র আমদানি করিয়া থাকে। তাম্র রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে জাম্বিয়া, কঙ্গো, চিলি, পেরু, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

[প্রশ্ন : (১) তাম্রের ব্যবহার বিশেষভাবে আলোচনা কর। (২) তাম্র-উৎপাদক অঞ্চলগুলের বিবরণ দাও এবং ইহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।]

টিন বা রাং (Tin)

ব্যবহার (Uses) : প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রভাবে সহজে টিনে কলঙ্ক ধরে না বলিয়া ইহা লৌহের পাতের উপর হাল্কা প্রলেপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহা

অনেকাংশে বায়ুরোধক। খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র, ফল, পেট্রল ইত্যাদি সংরক্ষণ ও স্থানান্তরে প্রেরণের জন্য যে হাল্কা পাত্র ব্যবহার করা হয় উহা নির্মাণে টিন বা রাং অপরিহার্য, পাতলা লৌহের চাদরের উপর টিন বা রাং-এর প্রলেপ লাগান হয়। সীসার পাতলা চাদরের উপর টিনের প্রলেপ দিয়া চকোলেট ও সিগারেটের রূপালী কাগজ প্রস্তুত করা হয়। ইহা ছাড়া তামার সহিত টিন মিশাইয়া ব্রোঞ্জ ও পিতলের সহিত টিন মিশাইয়া কাঁসা প্রস্তুত করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions): পৃথিবীর অধিকাংশ টিনই ক্যাসিটেরাইট (Caseterite), স্ট্যানাইট (Stannite), সিলিনড্রাইট Cylindrite) এবং ফ্র্যাঙ্কাইট (Frankite) আকরিক হইতে নিষ্কাশিত হয়। ধাতব টিন স্বাভাবিক অবস্থায় খুব কমই পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই টিন সর্বাপেক্ষা বেশি পাওয়া যায়।

পৃথিবীর টিন উৎপাদন (হাজার মেট্রিক টনে)

	১৯৮০	১৯৮৩		১৯৮০	১৯৮৩
পৃথিবী	২০৯.০	২৩০.০	থাইল্যাণ্ড	৩১.৭	২৩.৫
মালয়েশিয়া	৬১.৪	৪৯.৪	ব্রেজিল	৬.৯	১২.৬
ইন্দোনেশিয়া	৩১.৮	২৬.৫	অস্ট্রেলিয়া	১১.৪	১০.৩
বলিভিয়া	২৭.৩	২৪.৩	বৃটেন	৩.০	৪.৬

[Source: UNO Monthly Bulletin of Statistics, 1984]

এশিয়ার দেশসমূহ

মালয়েশিয়া: পৃথিবীর প্রায় ৪০% টিন এই দেশে উৎপন্ন হয়। সেলাঙ্গার, পেরাক, নেগ্রি সেম্বিলান, পাহাং, জোহোর, কেডা, ত্রেঙ্গনু প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর টিন পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের নদীতীরে বালুকার মধ্যেও টিনের রেণু পাওয়া যায়।

ইন্দোনেশিয়া: এই গণতন্ত্রের বাঙ্কা, বিলিটন, সিংকেপ, সুমাত্রা অঞ্চল টিন উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর ২০% টিন এই দেশে উৎপন্ন হয়।

ব্রহ্মদেশ: মৌচি, ট্যাভয় ও কারাবুরি এই দেশের প্রধান টিন উৎপাদক অঞ্চল।

অন্যান্য দেশ: চীনের ইউনান ও কোয়াংসি প্রদেশ এবং থাইল্যাণ্ডের পাকেট দ্বীপেও কিছু টিন পাওয়া যায়।

আফ্রিকার নাইজারিয়া ও জাইরে গণতন্ত্র, ইউরোপের জার্মানি, পর্তুগাল ও রাশিয়া (লেনিনোগর্স্ক ও ওলোভায়ানায়া অঞ্চল) বৃটিশ যুক্তরাজ্য (কর্নোয়াল), অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্, কুইন্সল্যাণ্ড, টাসমানিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া অঞ্চলে টিন আকরিত হয়। বলিভিয়া রাজ্যের টিনের খনি অঞ্চল আন্দিজ পর্বতের প্রায় ৫০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে এই অঞ্চলে টিন উত্তোলন খুবই কঠিন। পটোসি অরুরো বলিভিয়ার বিখ্যাত টিন উৎপাদক অঞ্চল।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) : টিন ব্যবহারকারী দেশগুলিতে টিনের উৎপাদন খুবই নগণ্য। পক্ষান্তরে টিন উৎপাদনকারী দেশগুলিতে টিনের ব্যবহার কম। ফলে ইহার আন্তর্জাতিক বাজার বেশ প্রসারিত। টিন আমদানিকারী দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি ইতালী, হল্যাণ্ড, ভারত প্রধান। টিন রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে মালয়েশিয়া, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, বলিভিয়া, কঙ্গো বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

[প্রশ্ন : (১) টিন বা রাং-এর ব্যবহার ও উৎপাদক অঞ্চলগুলির বিবরণ দাও।]

বক্সাইট (Bauxite)

অ্যালুমিনিয়ামের প্রধান আকরিক বক্সাইট (Bauxite)। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বক্সাইট হইতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। বক্সাইটকে চূর্ণ করিয়া উহার সহিত ক্রায়োলাইট মিশাইয়া ঐ মিশ্রণের উপর উচ্চশক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রয়োগ করিলে তরল অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশিত হয়। তরল অ্যালুমিনিয়াম হইতে পিণ্ড, পাত, তার প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ বেশি পড়ে বলিয়া প্রধানত জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী শিল্পোন্নত দেশেই আমদানিকৃত বক্সাইট আকরিকের সাহায্যে প্রভূত পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করা হয়। ক্রায়োলাইট, কোরাণ্ডাম ও কেওলিনও অ্যালুমিনিয়াম-আকরিক। কিন্তু উহাতে ধাতুর পরিমাণ খুবই কম। বর্তমানে বিদ্যুৎ-শক্তি দ্বারা নিষ্কাশিত অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে ক্রায়োলাইট অপরিহার্য।

চিত্র ৯.৪ : পৃথিবীর বক্সাইড, তাম্র ও অভ্র উত্তোলক অঞ্চল।

ব্যবহার (Uses) : অ্যালুমিনিয়াম অত্যন্ত হাল্কা ও শক্ত হওয়ায় বিমানপোত-শিল্পে, রেলের কামরা ও মোটর গাড়ি নির্মাণে, গৃহের আসবাবপত্র, বাসনপত্র,

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, রং, আতসবাজী প্রভৃতি প্রস্তুতে ইহার ব্যাপক ব্যবহার হয়। তাম্রের অভাবে এবং অ্যালুমিনিয়াম বিদ্যুৎ-শক্তি পরিবহণে সুপরিবাহী (good conductor) হওয়ায় বৈদ্যুতিক তার নির্মাণে ইহার ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। রাসায়নিক শিল্পেও ইহার ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions) : অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন জল-বিদ্যুৎ নির্ভর হওয়ায় অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদক অঞ্চল ও বক্সাইট উৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দেখা যায়। বক্সাইট উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে জ্যামাইকা, ফ্রান্স (আল্পস পর্বতের নিকটবর্তী অঞ্চল), ওলন্দাজ প্রভাবিত সুরিনাম, ঘানা, ব্রিটিশ গায়না, হাঙ্গেরী, অস্ট্রেলিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, ভারত, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া প্রধান। ক্রায়োলাইট বিশ্বে একমাত্র গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে পাওয়া যায়।

বক্সাইট উৎপাদনে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট সঞ্চিত বক্সাইটের ৪০% এই দেশে অবস্থিত বলিয়া অনুমান করা হয়। এই দেশের উত্তরে ইয়র্ক অন্তরীপের উপদ্বীপ অঞ্চলে উইপার নামক স্থানে বিশ্বের সর্বাধিক বক্সাইট সঞ্চিত রহিয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথওয়েলস ও পার্থ অঞ্চলেও বক্সাইট পাওয়া যায়।

আফ্রিকার গিনি বক্সাইট উত্তোলনে বর্তমানে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ঘানা রাজ্যেও বক্সাইট পাওয়া যায়।

উত্তর আমেরিকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (জর্জিয়া, টেনেসি, আরকানসাস ও আলাবামা) উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বক্সাইট উত্তোলন করিয়া থাকে। কানাডার সঞ্চয় খুবই নগণ্য বলিয়া এই দেশ আমদানিকৃত আকরের সাহায্যে ব্রিটিশ কলম্বিয়া, কুইবেক ও সেন্ট লরেন্স অঞ্চলে অ্যালুমিনিয়াম শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকার জ্যামেইকা, ব্রাজিল, সুরিনাম, গিয়ানা প্রচুর পরিমাণে বক্সাইট উত্তোলন করিয়া থাকে এবং বিদ্যুতের অসুবিধার জন্য ইহার বেশির ভাগই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করিয়া থাকে।

পৃথিবীর বক্সাইট উৎপাদন (১০ লক্ষ মেট্রিক টনে)

	১৯৮০	১৯৮৩		১৯৮০	১৯৮৩
পৃথিবী			সুরিনাম	৪·৯	৩·২
অস্ট্রেলিয়া	২৮·০	২২·১	হাঙ্গেরী	২·৯	২·৯
গিনি	১৩·৯	১১·৮	গ্রীস	২·৫	২·৪
জ্যামেইকা	১২·১	৮·৩	ভারত	১·৮	১·৯
ব্রেজিল	৬·৭	৪·২	আঃ যুক্তরাষ্ট্র	১·৮	০·৭
যুগোস্লাভিয়া	৩·১	৩·৭	সোঃ রাশিয়া	৪·৬	

[Source : UNO Monthly Bulletin of Statistics, 1984]

অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ আকরিক উত্তোলন করে। কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে ঐ দেশ বিশ্বে প্রথম স্থানের অধিকারী। জ্যামেইকা, সুরিনাম ও গিয়ানা হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর বক্সাইট আমদানি করে। এই দেশের অ্যালুমিনিয়াম শিল্পপীঠ হিসাবে ওয়াশিংটন ওরিগন, টেক্সাস, লুইসিয়ানা, টেনেসি, নিউইয়র্ক, আলাবামা, ক্যালিফোর্ণিয়া উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বে দ্বিতীয় প্রধান অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনকারী দেশ। লেনিনগ্রাদের পূর্ব দিকে অবস্থিত ভলখভ, ইউরাল, জাপোরঝি, শ্বেতসাগরের তীরে কাণ্ডালাকশা, আরাত পর্বতের নিকটবর্তী ইরিভান প্রভৃতি স্থানে এই দেশের অ্যালুমিনিয়াম শিল্প-সংগঠিত হইয়াছে। ভারত—ভারত বক্সাইট উত্তোলনে ক্রমাগত উন্নতি লাভ করিতেছে। এই দেশে মধ্যপ্রদেশের কাটনি ও বিলাসপুর, বিহারের লোহারডাগা, ওড়িশার সম্বলপুর ও কালাহাণ্ডি অঞ্চলে প্রচুর বক্সাইট আকরিত হয়। ইহা ছাড়া মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলেও বক্সাইট পাওয়া যায়। জাপান আমদানিকৃত বক্সাইটের সাহায্যে বিরাট অ্যালুমিনিয়াম শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। কানাডার বক্সাইটের স্থানীয় যোগান নগণ্য হইলেও আমদানিকৃত বক্সাইটের সাহায্যে সেণ্ট মরিস ও অরভিদায় বৃহৎ অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম জার্মানীর রাইনল্যাণ্ড ও ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে উন্নত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্স, নরওয়ে, ইতালী, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, হাঙ্গেরী, সুইজারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশেও এই শিল্পের প্রসার উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) বক্সাইটের চাহিদা বেশি হওয়ায় রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে জ্যামেইকা, সুরিনাম, গিয়ানা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি প্রধান। আমদানিকারক দেশ হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, পশ্চিম জার্মানী, নরওয়ে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ইতালী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সীসক বা সীসা (Lead)

সীসক প্রধানত গ্যালেনা (Galena) বা লেড সালফাইড (Lead Sulphide) নামক আকরিক হইতে নিষ্কাশন করা হয়। ইহা আংলিসাইট (Anglisite) ও এরুসাইট (Aerusite) আকরিক হইতেও পাওয়া যায়। অবশ্য গ্যালেনা আকরিক হইতে ইহা সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। খনিজ সীসা, রূপা এবং দস্তার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

ব্যবহার (Uses): ইহা নমনীয়, অল্প উত্তাপে গলিয়া যায় কিন্তু অ্যাসিডে ইহা নষ্ট হয় না। ইহার শিল্পগত গুরুত্ব এই কারণে খুবই বেশি। ইহা টিনের সহিত মিশাইয়া ইস্পাতের উপর মরিচা নিরোধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। জল গ্যাস ও নর্দমার নল নির্মাণে, মুদ্রণ-শিল্পের অক্ষর হরফ প্রস্তুতে, টাইপ যন্ত্র নির্মাণে,

রং, কাঁচ, গোলাগুলি, কীটনাশক ঔষধ তৈয়ারিতে, বিমানপোত, মোটর গাড়ি, তড়িৎকোষ নির্মাণ প্রভৃতি বিবিধ কার্যে সীসার ব্যবহার খুবই দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ শিল্পেও ইহার উল্লেখযোগ্য ব্যবহার রহিয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions) : পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশি সীসা উৎপাদিত হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। এই দেশ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সীসা উৎপাদন করে। জোপলিন অঞ্চল, মিসৌরী এবং ইডাহো এই দেশের উল্লেখযোগ্য সীসা উৎপাদক অঞ্চল। ওকলাহোমা, কলোরাডো, আরিজোনা, নিউ মেক্সিকো রাজ্যেও সীসা পাওয়া যায়। কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া, কুইবেক, অন্টারিও, সীসা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। ঐ দেশের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ সীসা বৃটিশ কলম্বিয়ায় পাওয়া যায়। মেক্সিকো রাজ্যের চিহুয়াহুয়া (Chihuahua), জাকাস্টিকাস (Zacasticus)-এর সান লুই পোটোসিতে (San Louis Potosi) খনিজ সীসা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পেরু (সেরোডি প্যাস্কো), আর্জেন্টিনা (অ্যাহুলার—Auhuler) ও বলিভিয়া অঞ্চলেও সীসা আকরিক উত্তোলিত হয়।

পৃথিবীর খনিজ সীসা উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টনে)

	১৯৮০	১৯৮৩		১৯৮০	১৯৮৩
পৃথিবী	৪৭.৩	৪৭.৮	মেক্সিকো	১.৫	১.৭
অস্ট্রেলিয়া	৪.১	৪.৬	যুগোস্লাভিয়া	১.২	১.১
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৫.৫	৪.৫	মরক্কো	১.২	০.৯
কানাডা	২.৯	২.৫	স্পেন	০.৭	০.৮

[Source : UNO Monthly Bulletin of Statistics, 1984.]

অস্ট্রেলিয়ায় নিউ সাউথ ওয়েলস্ ও কুইন্সল্যান্ড সীসা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য। নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রদেশের ব্রোকেনহিল অঞ্চলে প্রচুর আকরিক সঞ্চিত আছে। সাম্প্রতিক কালে অস্ট্রেলিয়া সীসা উৎপাদনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

ইউরোপে পশ্চিম জার্মানী (সাইলেশিয়া), ফ্রান্স (পিরেনীজ ও আল্পস অঞ্চল) বৃটিশ যুক্তরাজ্য (ডারহাম ও ডার্বিশায়ার), স্পেন, যুগোশ্লাভিয়া, ইতালী অঞ্চলে সীসা পাওয়া যায়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ইহা প্রধানত কাজাকস্তান, ককেশাস ও পূর্ব সাইবেরিয়া অঞ্চলে উত্তোলিত হয়; এশিয়ায় চীন, মাঞ্চুরিয়া, জাপান ও ব্রহ্মদেশ (শান রাজ্যের খনিসমূহ) প্রভৃতি অঞ্চলেও সীসা পাওয়া যায়। আফ্রিকার মরক্কো অঞ্চলে স্বল্প পরিমাণ সীসা উত্তোলিত হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade) : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, স্পেন, পেরু, বলিভিয়া প্রধানত সীসা রপ্তানি করিয়া থাকে। সীসা আমদানিকারী দেশের মধ্যে ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি, জাপান, ভারত ও পাকিস্তান উল্লেখযোগ্য।

দস্তা (Zinc)

দস্তা প্রধানত স্ফ্যালেরাইট (Sphalerite), স্মিথসোনাইট (Smithsonite) ও হেমিমরফাইট (Hemimorphite) আকরিক হইতে নিষ্কাশন করা হইয়া থাকে। ইহাদের সহিত দস্তা ও সীসা মিশ্রিত থাকে। উপরি-উক্ত তিনটি আকরিক ব্যতীত জিঙ্ক স্পার (Zinc Spur), জিঙ্ক ব্লেন্ড (Zinc Blend), জিঙ্কাইট (Zincite), ও উইলেমাইট (Wilemite) হইতেও দস্তা পাওয়া যায়। কিন্তু স্ফ্যালেরাইট হইতেই সর্বাপেক্ষা বেশি দস্তা নিষ্কাশিত হয়। এই সকল আকরিক হইতে শতকরা ২ হইতে ১২ ভাগ ধাতব দস্তা পাওয়া যায়।

ব্যবহার (Uses) : ইহা নমনীয় ও ঘাতসহ, লৌহের মরিচা নিবারক বলিয়া ইহা নানাভাবে প্রলেপ (Galvanises) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ-শিল্পে, শুষ্ক ব্যাটারী নির্মাণে, রং, মুদ্রণের ব্লক, পিতল, কাঁসা, নকল সোনা, জার্মান সিলভার ইত্যাদি—তৈয়ারিতে, ঔষধ, রবার টায়ার প্রভৃতি কার্যে দস্তা ব্যবহৃত হয়। খনিতে দস্তা, রূপা, সীসা, তামা প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

পৃথিবীর দস্তা উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)

	১৯৮০	১৯৮৩		১৯৮০	১৯৮৩
পৃথিবী	৫৮.২	৫৯.২	মেক্সিকো	২.৪	২.৩
কানাডা	১০.৬	১০.৬	জাপান	২.৪	২.৫
অস্ট্রেলিয়া	৫.৭	৬.৮	আয়ারল্যাণ্ড	২.৩	১.৯
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৩.৩	৩.১	স্পেন	১.৭	১.৭
সোঃ রাশিয়া	৭.২	৭.৯			

[Source : UNO Monthly Bulletin of Statistics, 1984.]

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions) : আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে দস্তা উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই দেশের জোপলিন অঞ্চল, নিউজার্সির ফ্রাঙ্কলিন ফার্ণেস, ইডাহো, কানসাস, উটা, কলোরাডো প্রভৃতি রাজ্য দস্তা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। কানাডা—বর্তমান বিশ্বে কানাডা দস্তা উৎপাদনে শীর্ষস্থান অধিকার করে। এই দেশের কুইবেক, অণ্টারিও, বৃটিশ কলম্বিয়া, ম্যানিটোবা অঞ্চলে খনিজ দস্তা সীসা বা রূপার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়া—দস্তা উৎপাদনে এই দেশের স্থান বর্তমানে দ্বিতীয়। এই দেশের নিউ সাউথ ওয়েলস প্রদেশের ব্রোকেনহিল এবং টাসম্যানিয়া দ্বীপের রীডরোজবেরীতে প্রচুর দস্তা পাওয়া যায়। মেক্সিকো বর্তমানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দস্তা উৎপাদন করে। ইউরোপে জার্মানি, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, বেলজিয়াম, স্পেন ও বৃটিশ যুক্তরাজ্যে কিছু পরিমাণ দস্তা পাওয়া যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার ইউরাল, ককেশাসের উত্তরাংশ, কাজাকস্তান ও মধ্য এশিয়া অঞ্চলে দস্তা উৎপাদিত

হয়। এশিয়ার জাপান, ব্রহ্মদেশ, চীন ও ভারতে দস্তা পাওয়া যায়। আফ্রিকার রোডেশিয়া, আলজিরিয়া, মরক্কো, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ঘানায় আকরিক দস্তা পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade): দস্তা রপ্তানিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ব্রহ্মদেশ ও আফ্রিকার ঘানা, আলজিরিয়া ও মরক্কো উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, জাপান ও ভারত প্রচুর দস্তা আমদানি করিয়া থাকে।

[প্রশ্ন : (১) কোন্ কোন্ আকরিক হইতে অ্যালুমিনিয়াম, সীসক ও দস্তা পাওয়া যায় ? এই ধাতুগুলির ব্যবহার পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা কর। (২) কোন্ কোন্ দেশ অ্যালুমিনিয়াম আকরিক উৎপাদন করে ? (৩) সীসক ও দস্তা আকরিক উৎপাদক অঞ্চলগুলির বিবরণ লিখ। (৪) বক্সাইট রপ্তানিকারক ও আমদানিকারক দেশগুলির নাম লিখ। (৫) সীসক ও দস্তা আকরিকের আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও বিক্রেতা দেশগুলির নাম উল্লেখ কর। (৬) পৃথিবীর একটি রেখাচিত্রে প্রধান প্রধান বক্সাইট অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করিয়া দেখাও।]

অধাতব খনিজ সম্পদ
(Non-metallic minerals)

লবণ (Salt)

ভূত্বকের সহিত স্বল্প পরিমাণ লবণ মিশ্রিত অবস্থায় প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু বাণিজ্যিক প্রয়োজনে লবণ আহরণের ক্ষেত্র হিসাবে সমুদ্র, লবণ হ্রদ ও স্তরীভূত শিলা প্রধান। শিলা-লবণকে (Rock Salt) সৈন্ধক লবণ বলা হয়। পৃথিবীর বেশির ভাগ লবণ সংগ্রহ করা হয় সমুদ্রের লোনা জল হইতে। শিলা-লবণের গুরুত্ব কম নহে।

লবণের ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব
(Uses and Economic Importance of)

আমাদের দেহধারণে ও কর্মশক্তির স্ফুরণে লবণের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এই কারণে লবণ আমাদের খাদ্য-তালিকায় অপরিহার্য। উষ্ণ অঞ্চলে অত্যধিক গরমে ঘামের সহিত দেহ হইতে প্রচুর লবণ নিঃসৃত হয় বলিয়া ঐ সকল অঞ্চলে লবণের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা অত্যধিক। আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামাল হিসাবেও লবণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সোডা, অ্যাস, কষ্টিক সোডা, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সোডিয়াম কার্বোনেট ক্লোরিণ, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি উৎপাদনে প্রচুর লবণ ব্যবহৃত হয়। এই সকল রাসায়নিক পদার্থ ঔষধ, বস্ত্র, কাগজ, কৃত্রিম রেশম (রেয়ন), কৃত্রিম রবার, কৃষিসার, সাবান, খনিজ

তৈল সেলুলোজ প্রভৃতি শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া চামড়া পাকা করিতে, মৎস্য ও মাংস সংরক্ষণে, পশু খাদ্য হিসাবেও প্রচুর লবণ ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions)

আমেরিকা : পৃথিবীতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা বেশি লবণ উৎপাদন করে। এই দেশের মিচিগান, নিউইয়র্ক, ওহিও, লুইসিয়ানা, টেকসাস্ ক্যালিফোর্নিয়া, কানসাস প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গড়ে বৎসরে প্রায় ১½ কোটি টন খনিজ লবণ এবং ৬০ লক্ষ টন সমুদ্রজাত লবণ উৎপাদন করে। কানাডা ও মেক্সিকো দেশেও লবণ পাওয়া যায়। ইওরোপে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, জার্মানী, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে লবণ উৎপাদিত হয়। এশিয়া মহাদেশে সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন লবণ উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ সমুদ্রজাত লবণ। ভারতের সমুদ্রোপকূলের রাজ্যগুলি যেমন তামিলনাড়ু, কেরালা, ওড়িশা, গুজরাট লবণ উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। রাজস্থানে কিছু শিলা-লবণ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে বৎসরে প্রায় ১৫ কোটি মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়।

[প্রশ্ন : (১) লবণের ব্যবহার সংক্ষেপে বর্ণনা কর। লবণ সংগ্রহের উৎস কি কি? কোন্ দেশে সর্বাধিক লবণ উৎপাদিত হয়?]

অভ্র (Mica)

অধাতব খনিজ পদার্থের মধ্যে অভ্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। খনি হইতে উত্তোলিত অভ্রকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমন—মাস্কোভাইট, ফ্লোগপাইট, বায়োটাইট, ভারমিকিউলাইট ও লেপিডোলাইট ইত্যাদি। ব্যবহারিক দিক হইতে মাস্কোভাইট ও ফ্লোগোপাইট অভ্র বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মাস্কোভাইট অভ্র শ্বেত বা ঈষৎ নীল ও স্বচ্ছ হয়। ইহাকে রুবি অভ্র বলে। রঙীন ঈষৎ সবুজ ও অস্বচ্ছ অভ্রকে বায়োটাইট জাতীয় অভ্র বলা হয়। খনিতে অভ্র পাতলা স্তরের মত সাজান থাকে। ইহাকে "বুক অব মাইকা" (Book of Mica) বলে।

ব্যবহার ও গুরুত্ব (Uses and Importance) : অভ্র তাপ, বিদ্যুৎ এবং পারমাণবিক শক্তি বিকিরণ অপরিবাহী ও প্রতিরোধক। এই কারণে অভ্র বিদ্যুৎ শিল্পে টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও, মোটর গাড়ি ও বিমানপোত নির্মাণে, অধিক উত্তাপযুক্ত চুল্লীর জানালা নির্মাণ, তাপরক্ষক প্রলেপ প্রস্তুত, রং, দেবদেবীর অলঙ্করণ, ঔষধ প্রস্তুত প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয়। অভ্রের গুঁড়া হইতে সান্-মাইকা তৈয়ারি করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions) : অভ্র উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ অভ্র ভারতে

পাওয়া যায়। মাস্কোভাইট বা রুবি জাতীয় অভ্র ভারতের বিহার অঞ্চলে সর্বাধিক উত্তোলিত হয়। গয়া, হাজারিবাগ (কোডার্মা) ও মুঙ্গের জিলায় প্রচুর উৎকৃষ্ট ধরনের অভ্র উত্তোলিত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে বায়োটাইট জাতীয় অভ্রের প্রাচুর্য দেখা যায়। ইহা ছাড়া তামিলনাড়ু, রাজস্থান, কর্ণাটকেও কিছু অভ্র পাওয়া যায়। ভারত ব্যতীত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, মালাগাসি গণতন্ত্র, দক্ষিণ রোডেশিয়া, তাঞ্জানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ায় স্বল্প পরিমাণে অভ্র পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade): ভারত সর্বপ্রধান অভ্র রপ্তানিকারক দেশ। ভারতের রপ্তানির পরিমাণ মোট রপ্তানির প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ। আমদানিকারক দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানি, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

[প্রশ্ন : (১) অভ্র কয় প্রকার এবং কি কি? (২) অভ্রের ব্যবহার কি? (৩) পৃথিবীতে অভ্রের উৎপাদন ও ইহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।]

গৃহ-নির্মাণে ব্যবহৃত খনিজ পদার্থ
(Building materials)

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহ-নির্মাণে নানাবিধ খনিজ সম্পদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে চুনাপাথর, জিপসাম, গ্রানাইট, শ্লেট, মার্বেল, বেলেপাথর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চুনাপাথর (Limestone): ইহা অতি সুলভ পদার্থ চুন ও সিমেণ্ট উৎপাদনে, ধাতু নিষ্কাশন শিল্পে, বিশেষ করিয়া লৌহ-ইস্পাত শিল্পে, রাসায়নিক শিল্পে ও অন্যান্য নানাবিধ কার্যে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যায়।

জিপসাম (Gypsum): সিমেণ্ট উৎপাদনে জিপসাম প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া প্লাস্টার, অ্যামোনিয়াম সালফেট, সালফিউরিক অ্যাসিড তৈয়ারিতে এবং মৃৎশিল্পেও জিপসামের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, স্পেন, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে জিপসাম পাওয়া যায়।

গ্রানাইট (Granite): ইহা সুন্দর, সুকঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী। গৃহ নির্মাণে গ্রানাইটের ব্যবহার বহু কালের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটিশ যুক্তরাজ্য নরওয়ে, সুইডেন, স্পেন, মরক্কো, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশে গ্রানাইট পাওয়া যায়।

তৈল সেল্লোজ প্রভৃতি শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া চামড়া পাকা করিতে, মৎস্য ও মাংস সংরক্ষণে, পশু খাদ্য হিসাবেও প্রচুর লবণ ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions)

আমেরিকা : পৃথিবীতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা বেশি লবণ উৎপাদন করে। এই দেশের মিচিগান, নিউইয়র্ক, ওহিও, লুইসিয়ানা, টেকসাস্ ক্যালিফোর্নিয়া, কানসাস প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গড়ে বৎসরে প্রায় ১২ কোটি টন খনিজ লবণ এবং ৬০ লক্ষ টন সমুদ্রজাত লবণ উৎপাদন করে। কানাডা ও মেক্সিকো দেশেও লবণ পাওয়া যায়। ইওরোপে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, জার্মানী, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে লবণ উৎপাদিত হয়। এশিয়া মহাদেশে সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন লবণ উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ সমুদ্রজাত লবণ। ভারতের সমুদ্রোপকূলের রাজ্যগুলি যেমন তামিলনাড়ু, কেরালা, ওড়িশা, গুজরাট লবণ উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। রাজস্থানে কিছু শিলা-লবণ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে বৎসরে প্রায় ১৫ কোটি মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়।

[প্রশ্ন : (১) লবণের ব্যবহার সংক্ষেপে বর্ণনা কর। লবণ সংগ্রহের উৎস কি কি? কোন্ দেশে সর্বাধিক লবণ উৎপাদিত হয়?]

অভ্র (Mica)

অধাতব খনিজ পদার্থের মধ্যে অভ্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। খনি হইতে উত্তোলিত অভ্রকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেমন—মাস্কোভাইট, ফ্লোগপাইট, বায়োটাইট, ভারমিকিউলাইট ও লেপিডোলাইট ইত্যাদি। ব্যবহারিক দিক হইতে মাস্কোভাইট ও ফ্লোগোপাইট অভ্র বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মাস্কোভাইট অভ্র শ্বেত বা ঈষৎ নীল ও স্বচ্ছ হয়। ইহাকে রুবি অভ্র বলে। রঙীন ঈষৎ সবুজ ও অস্বচ্ছ অভ্রকে বায়োটাইট জাতীয় অভ্র বলা হয়। খনিতে অভ্র পাতলা স্তরের মত সাজান থাকে। ইহাকে "বুক অব মাইকা" (Book of Mica) বলে।

ব্যবহার ও গুরুত্ব (Uses and Importance) : অভ্র তাপ, বিদ্যুৎ এবং পারমাণবিক শক্তি বিকিরণ অপরিবাহী ও প্রতিরোধক। এই কারণে অভ্র বিদ্যুৎ শিল্পে টেলিফোন, টেলিভিশন, রেডিও, মোটর গাড়ি ও বিমানপোত নির্মাণে, অধিক উত্তাপযুক্ত চুল্লীর জানালা নির্মাণ, তাপরক্ষক প্রলেপ প্রস্তুত, রং, দেবদেবীর অলঙ্করণ, ঔষধ প্রস্তুত প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয়। অভ্রের গুঁড়া হইতে সান্-মাইকা তৈয়ারি করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions) : অভ্র উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ অভ্র ভারতে

পাওয়া যায়। মাস্কোভাইট বা রুবি জাতীয় অভ্র ভারতের বিহার অঞ্চলে সর্বাধিক উত্তোলিত হয়। গয়া, হাজারিবাগ (কোডার্মা) ও মুঙ্গের জিলায় প্রচুর উৎকৃষ্ট ধরনের অভ্র উত্তোলিত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে বায়োটাইট জাতীয় অভ্রের প্রাচুর্য দেখা যায়। ইহা ছাড়া তামিলনাড়ু, রাজস্থান, কর্ণাটকেও কিছু অভ্র পাওয়া যায়। ভারত ব্যতীত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, মালাগাসি গণতন্ত্র, দক্ষিণ রোডেশিয়া, তাঞ্জানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ায় স্বল্প পরিমাণে অভ্র পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade): ভারত সর্বপ্রধান অভ্র রপ্তানিকারক দেশ। ভারতের রপ্তানির পরিমাণ মোট রপ্তানির প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ। আমদানিকারক দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানি, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

[প্রশ্ন : (১) অভ্র কয় প্রকার এবং কি কি? (২) অভ্রের ব্যবহার কি? (৩) পৃথিবীতে অভ্রের উৎপাদন ও ইহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।]

গৃহ-নির্মাণে ব্যবহৃত খনিজ পদার্থ
(Building materials)

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহ-নির্মাণে নানাবিধ খনিজ সম্পদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে চুনাপাথর, জিপসাম, গ্রানাইট, শ্লেট, মার্বেল, বেলেপাথর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চুনাপাথর (Limestone): ইহা অতি সুলভ পদার্থ চুন ও সিমেন্ট উৎপাদনে, ধাতু নিষ্কাশন শিল্পে, বিশেষ করিয়া লৌহ-ইস্পাত শিল্পে, রাসায়নিক শিল্পে ও অন্যান্য নানাবিধ কার্যে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যায়।

জিপসাম (Gypsum): সিমেন্ট উৎপাদনে জিপসাম প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া প্লাষ্টার, অ্যামোনিয়াম সালফেট, সালফিউরিক অ্যাসিড তৈয়ারিতে এবং মৃৎশিল্পেও জিপসামের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, স্পেন, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে জিপসাম পাওয়া যায়।

গ্রানাইট (Granite): ইহা সুন্দর, সুকঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী। গৃহ নির্মাণে গ্রানাইটের ব্যবহার বহু কালের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটিশ যুক্তরাজ্য নরওয়ে, সুইডেন, স্পেন, মরক্কো, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশে গ্রানাইট পাওয়া যায়।

শ্লেট (Slate) : গৃহের ছাদ, মেঝে প্রভৃতি নির্মাণে, রং, রবার, লাইনোলিয়াম শিল্পে এবং ব্ল্যাকবোর্ড ও লিখিবার শ্লেট প্রস্তুতে শ্লেটপাথর ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ইটালি, আয়ারল্যাণ্ড, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে শ্লেট পাওয়া যায়।

মার্বেল (Marble) : অপূর্ব দর্শন গৃহ ও মূর্তি ইত্যাদি নির্মাণে মার্বেল ব্যবহার করা হয়। ইটালির মার্বেল জগদ্বিখ্যাত। ইহা ব্যতীত, ভারত, স্পেন, ফ্রান্স, বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে উচ্চস্তরের মার্বেল পাওয়া যায়।

বেলেপাথর (Sand Stone) : গৃহ নির্মাণে, রাস্তার ফুটপাথ নির্মাণে, কাচ ও তাপ নিরোধক ইট ও টালি তৈয়ারিতে বেলেপাথর বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে প্রচুর বেলেপাথর পাওয়া যায়।

মৃত্তিকা (Soil) : কাঁচা গৃহ-নির্মাণে ব্যাপকভাবে মৃত্তিকা ব্যবহার হইয়া থাকে। ইট ও টালি প্রস্তুতেও মৃত্তিকা অপরিহার্য। ইহা পৃথিবীর সকল দেশেই দেখা যায়।

গৃহ-নির্মাণে ব্যবহৃত খনিজ পদার্থ দামে খুবই কম এবং ওজনে ভারী। এই কারণে উহাদের পরিবহণ ব্যয় অত্যধিক। স্বাভাবিকভাবেই এই সকল পদার্থের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোন গুরুত্ব নাই।

[প্রশ্ন : (১) চুনাপাথর, জিপসাম ও শ্লেট-এর ব্যবহার উল্লেখ কর এবং উৎপাদক দেশগুলির নাম লিখ।]

অনুশীলনী ৯

১। খনিজ সম্পদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। সভ্যতার বিকাশে খনিজ সম্পদের ভূমিকা আলোচনা কর।

[Narrate the features of mineral resources. Discuss the role of mineral resources in the work of the civilization.]

২। কৃষিকার্য ও খনি শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা কর। খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ কর।

[Compare agriculture with mining. Classify mineral resources.]

৩। লৌহ আকরিকের নানাবিধ ব্যবহার বর্ণনা কর। এশিয়া অথবা উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান লৌহ আকরিক উৎপাদক অঞ্চলের বিবরণ দাও।

[Describe the various uses of iron-ore. Give an account of the principal iron-ore producing regions of Asia or North America.] (W. B. H. S. C. Exam. 1981)

৪। লৌহ আকরিকের শ্রেণীবিভাগ কর। পৃথিবীতে লৌহ আকরিকের বণ্টন ও উৎপাদন দেখাও।

[Name the different grades of iron-ore. Give the world distribution and production of iron-ore.] (W. B. H. S. C.—Specimen Question, 1980)

৫। নিম্নলিখিত খনিজ দ্রব্যসমূহের ব্যবহার, উৎপাদক অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা কর :

(ক) ম্যাঙ্গানিজ, (খ) টিন, (গ) তাম্র, (ঘ) সীসা, (ঙ) অভ্র।

[Discuss the uses, producing regions and international trade relating to the following minerals :

(a) Manganese, (b) Tin, (c) Copper, (d) Lead, (e) Mica.

৬। বাণিজ্যিক ব্যবহার আছে এমন চারিটি ধাতব খনিজের নাম লিখ। তাম্রের প্রধান ব্যবহার কি কি ? পৃথিবীর প্রধান প্রধান তাম্র উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির বর্ণনা কর।

[Name four metallic minerals of Commercial use. What are the principal uses of copper ? Describe the main copper producing areas of the world.]

[W. B. H. S. C. Exam. 1980)

৭। অ্যালুমিনিয়ামের মূল আকরিকের নাম কর। অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের সহায়ক অবস্থা উল্লেখ কর। বিশ্বে অ্যালুমিনিয়াম-আকরিকের বণ্টন দেখাও।

[Name the ore from which Aluminium is extracted. Mention the conditions favourable for the extraction of Alluminium. Give an account of the world distribution of Alluminium ores.]

৮। বিশ্বে তাম্র ও বক্সাইট আকরিকের বণ্টন দেখাও এবং এই সকল ধাতুর ব্যবহার বর্ণনা কর।

[Give an account of the world distribution of Copper and Bauxite ore and also discuss the uses of these metals.]

১০ শক্তি সম্পদ (Power Resources)

আধুনিক শিল্প-সভ্যতার মূলভিত্তি জড়-শক্তি। এই জড়-শক্তির প্রধান উৎস কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, প্রবহমান জলধারা, পারমাণবিক বস্তু—ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ভূ-অভ্যন্তর হইতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদিগকে জ্বালানী খনিজ বলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কয়লার সাহায্যে জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া প্রথম জড়-শক্তির আবিষ্কার করেন ইংলণ্ডবাসী জেমস ওয়াট্। এই আবিষ্কারই সূচনা করে শিল্প-বিপ্লবের এবং আধুনিক বিশ্বের বিরাট বিরাট যন্ত্র-শিল্পের তথা মানব সভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতির। কলকারখানা ও যানবাহন চালাইতে এবং এমনকি দৈনন্দিন জীবনের নানা কার্যেও প্রয়োজন জড়-শক্তির। জড়-শক্তির উৎপাদনে ও প্রয়োগে কারিগরি দক্ষতা অপরিহার্য। কিন্তু জড়-শক্তির উৎসগুলির সঞ্চয় প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম এবং উহাদের আঞ্চলিক বণ্টনও বৈষম্যপূর্ণ। এই কারণে ইহাদের আলোচনার বিশেষ তাৎপর্য আছে। বর্তমান কালে শক্তির নতুন নতুন উৎসের সন্ধানে মানুষ সৌরশক্তি ও আগ্নেয়গিরির সাহায্যে ভূগর্ভস্থ উত্তাপের ব্যবহারেরও চেষ্টা করিতেছে।

প্রাচীনকালে মানুষ আপনার পেশীশক্তির উপর নির্ভর করিত। পরবর্তীকালে গৃহপালিত পশু বা পোষমানান পশুর সাহায্যে শ্রমসাধ্য বিভিন্ন কার্য করিত। আধুনিক যুগের মানুষ জড়-শক্তি বা অজৈব শক্তির ব্যবহার আবিষ্কার করিল। নিম্নে শক্তির বিভিন্ন উৎস ও শ্রেণী বিভাগ দেখান হইল—

শক্তি ও শক্তির উৎস

- জৈব
  - সঞ্চিত
  - প্রবহমান (মানুষ ও পশু)
- অজৈব বা জড়
  - সঞ্চিত (কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, আণবিক শক্তি—ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি)।
  - প্রবহমান (প্রবহমান জলধারা, সৌরশক্তি, ভূ-তাপ শক্তি, বাতাস, সমুদ্রের ঢেউ, জোয়ার-ভাঁটা ইত্যাদি।

[প্রশ্ন : (১) জ্বালানি খনিজ বলিতে কি বুঝ? (২) শক্তির বিভিন্ন উৎস কি কি?]

কয়লা (Coal)

পৃথিবীর মোট উৎপাদিত জড়-শক্তির শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ কয়লা হইতে পাওয়া যায়। 'Coal is the bread of industry.' কয়লার অভাবে শিল্প অচল, জাহাজ, স্টীমার, রেল পরিবহন অচল এবং এমন কি গৃহস্থালিও প্রায় অচল। কয়লা ও ইহার উপজাত দ্রব্যের বহুবিধ ব্যবহার আধুনিক সভ্যতাকে নানাদিক হইতে সমৃদ্ধ করিয়াছে। উদ্ভিজ্জ হইতেই কয়লার জন্ম। পৃথিবীর নিম্নভূমি অঞ্চলে প্রাচীনকালে বিরাট বিরাট অরণ্যানীর সৃষ্টি হইয়াছিল। কালক্রমে ভূ-আন্দোলনের ফলে ঐ অরণ্যানী মাটির নীচে চাপা পড়িয়া যায়। ইহার উপরে বালি, কাদা, পাথর ইত্যাদি স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। দীর্ঘকাল যাবৎ ঐ উদ্ভিদকুল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায় পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তাপে ভূপৃষ্ঠের চাপে ও প্রাকৃতিক নানা কারণে ইহার মধ্যে এক বিরাট রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং ইহা কালক্রমে কয়লায় রূপান্তরিত হয়। পৃথিবীর কোটি কোটি বৎসরের ইতিহাসে এই প্রকার ঘটনা অনেকবারই ঘটিয়াছে এবং একই অঞ্চলেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তিও ঘটিয়াছে। এই কারণে পৃথিবীর অনেক কয়লা খনি অঞ্চলে ভূগর্ভের বিভিন্ন গভীরতায় কয়লার আলাদা আলাদা স্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

কয়লার শ্রেণীবিভাগ (Classification of coal): কয়লার প্রধান উপাদান অঙ্গার (carbon)। ইহা ছাড়া কয়লার সহিত গন্ধক, অ্যামোনিয়া, ফসফরাস, নাইট্রোজেন ও নানা প্রকার গ্যাসীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে। কয়লার অঙ্গীভূত অঙ্গার ও গ্যাসীয় পদার্থের তারতম্য অনুসারে কয়লাকে চারি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) অ্যানথ্রাসাইট কয়লা (Anthracite)—ইহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, কঠিন, ভারী এবং সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে প্রায় শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ অঙ্গার থাকে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ইহাতে কম থাকে। ইহাতে ছাই ও ধোঁয়া হয় কম। ইহা সহজদাহ্য নহে, কিন্তু একবার প্রজ্বলিত হইলে ইহা প্রচুর উত্তাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু পৃথিবীতে ইহার সঞ্চয় সমগ্র কয়লা সম্পদের মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগের মত। (২) বিটুমিনাস কয়লা (Betuminous)—ইহা অ্যানথ্রাসাইট কয়লার তুলনায় নবীন। ইহাতে অঙ্গারের ভাগ প্রায় শতকরা ৮০-৮৫। ইহা অপেক্ষাকৃত সহজদাহ্য। ইহাতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কিছু বেশী থাকায় ধোঁয়া হয়। ইহাকে পোড়াইয়া শক্ত ও নরম কোক (Hard and Soft Coke) করা হয়। কোক কয়লার দাহিকা শক্তি খুবই বেশী থাকে। শক্ত কোক আকরিক হইতে ধাতু নিষ্কাশনে ও নরম কোক রন্ধন কার্যে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বিটুমিনাস জাতীয়। (৩) লিগনাইট (Lignite)—ইহা বিটুমিনাস কয়লার তুলনায় নবীন। ইহাতে শতকরা ৪০-৫০ ভাগ অঙ্গার থাকে। জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাস বেশি পরিমাণে থাকে বলিয়া ইহাতে তাপ সৃষ্টি হয় কম, ধোঁয়া ও ছাই হয় বেশী। ইহার রং বাদামী হয় বলিয়া ইহাকে ব্রাউন কোল (Brown coal) বলা হয়। পৃথিবীর মোট কয়লা

সম্পদের শতকরা প্রায় দশ ভাগ এই জাতীয় কয়লা। গ্যাস ও তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনে এবং কৃত্রিম পেট্রল প্রস্তুতে ইহার বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। (৪) পীট কয়লা (Peat coal)—ইহা নিকৃষ্টতম কয়লা। ইহাতে শতকরা ৩৫-৪০ ভাগ অঙ্গার থাকে। ইহা কেবল রন্ধনশালায় ব্যবহার হয়। শিল্পক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার বিরল।

ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্য (Uses and Byproduct): বিভিন্ন জাতীয় কয়লা প্রধানত তাপ সৃষ্টির জন্যই ব্যবহৃত হয়। শিল্প কারখানার চুল্লিতে, তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনে, রেল-জাহাজ-স্টীমার পরিবহনে কয়লার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। ইহা ছাড়া ধাতু নিষ্কাশন শিল্পে, বিশেষ করিয়া লোহ-ইস্পাত ও সিমেন্ট শিল্পে, কয়লার কোক ব্যবহৃত হয়। কয়লা পোড়াইয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোক প্রস্তুত করার সময় কয়লা হইতে নানা প্রকার উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। এই উপজাত দ্রব্য ও ইহার ব্যবহারের অন্ত নাই। বর্তমানে কয়লা হইতে প্রায় ১৬,০০০ প্রকার উপজাত দ্রব্য বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করা হয়। কয়লার বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য : (১) গ্যাস (cool gas) :—রাস্তা আলোকিত করিতে ও রন্ধন কার্যে ব্যবহৃত হয়; (২) পীচ, আলকাতরা :—রাস্তা, গৃহাদি সংস্কারে ব্যবহৃত হয়। (৩) অ্যামোনিয়া ক্যাল লিকার :—নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। (৪) কৃত্রিম পেট্রোল (Synthetic Liquid Fuel) ও তজ্জাত দ্রব্যাদি যেমন—রঞ্জক দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত বেনজিন বা বেনজল, ন্যাপথলিন, টলুয়েন (টি-এন-টি বা ট্রাই নাইট্রো-টলুয়েন), স্যাকারিন, ফেনল বা কার্বলিক অ্যাসিড ইত্যাদি। টি-এন-টির সাহায্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয় এবং স্যাকারিন চিনির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয়। (৫) বিবিধ দ্রব্যাদি—গন্ধক, বার্নিশ, প্লাষ্টিক, ক্রিয়োজোট, সুগন্ধী দ্রব্য, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও বীজাণুনাশক নানা উপকরণ। কয়লার উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্তমান কালে কয়লা শুধু আর ইন্ধন শক্তির আধার নহে। ইহা গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক শিল্পের প্রধান কাঁচা মাল। কয়লাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন দেশে বিরাট বিরাট carbo complex বা কয়লানির্ভর রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions): পৃথিবীতে মোট সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ আনুমানিক ৫,০০,৮০০ কোটি মেট্রিক টন। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০০ কোটি টন কয়লা উত্তোলিত হয়। এই হারে উৎপাদন হইলে মোট সঞ্চিত কয়লা সম্পদে আগামী প্রায় ২০০০ বৎসর চলিতে পারে। পৃথিবীর মোট সঞ্চিত কয়লার মধ্যে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ আমেরিকায়, ৩৫ ভাগ ইওরোপে এবং মাত্র দশ ভাগ এশিয়ার দেশসমূহে আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। সুতরাং অনেক দেশেই আগামী দুই-এক শত বৎসরের মধ্যে কয়লা সম্পদ নিঃশেষ হওয়ার সম্ভাবনা

এশিয়া মহাদেশ

চীন: চীনের প্রধান খনিজ সম্পদ কয়লা। এই দেশে কয়লার অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে বলিয়া দাবি করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে কয়লা উত্তোলনে ও পরিবহণে বিশেষ অসুবিধা থাকায় সঞ্চিত কয়লার তুলনায় ইহার উৎপাদন যথেষ্ট নহে। কয়লা উৎপাদনে চীন পৃথিবীতে তৃতীয় (২০.২%)। হোয়াংহো অববাহিকায় শানসি, শেনসি, হোনান, কানসু ও ফুসান অঞ্চলে চীনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ কয়লা সঞ্চিত আছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সান্টুং, হোপেই, লিখাওলিং প্রদেশে ও ইউনান ও জেচুয়ান অঞ্চলেও প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। এই দেশের প্রায় প্রতিটি প্রদেশেই কয়লা পাওয়া যায়।

ভারত: ভারতের কয়লা খনিসমূহকে গণ্ডোয়ানা ও টার্সিয়ারী এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ আনুমানিক ৬,৫০০ কোটি মেট্রিক টন বা পৃথিবীর মোট সঞ্চিত ভাণ্ডারের শতকরা ১.৩ ভাগ। ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ গণ্ডোয়ানা কয়লা এবং অবশিষ্টাংশ টার্সিয়ারী। গণ্ডোয়ানা কয়লার বেশীর ভাগই উচ্চ বিটুমিনাস জাতীয়। ভারতে সামান্য পরিমাণে

চিত্র ১০.১: পৃথিবীর কয়লা উত্তোলক অঞ্চল।

অ্যানথ্রাসাইট কয়লা আছে। গণ্ডোয়ানা খনিসমূহ প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশেই সীমাবদ্ধ এবং টার্সিয়ারী কয়লার অবস্থান আসাম, রাজস্থান, কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, অরুণাচল (নামচিক-নামফুক লেডো খনির অংশ) অঞ্চলেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

জাপান: জাপানে কয়লার মজুত ভাণ্ডার ও বাৎসরিক উৎপাদন কোনটিই ঐ দেশের শিল্পায়নের তুলনায় পর্যাপ্ত নহে। এই দেশের কয়লা নিম্নমানের বিটুমিনাস জাতীয়। ফলে জাপান বিদেশ হইতে প্রচুর উচ্চমানের কয়লা আমদানি করে।

কিউসিউ ও হোক্কাইডো দ্বীপেই জাপানের প্রধান কয়লাখনি অবস্থিত। কিউসিউ দ্বীপের খনি হইতে জাপানের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কয়লা উত্তোলিত হয়। হোক্কাইডো দ্বীপের ইউবেরি (Yubari) কয়লাখনি উল্লেখযোগ্য। এশিয়ার অন্তর্গত ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন উপদ্বীপেও সামান্য পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হয়।

ইউরোপ মহাদেশ

সোভিয়েত রাশিয়া : এই দেশের সঞ্চিত ভাণ্ডারের পরিমাণ পৃথিবীর মোট সঞ্চিত কয়লার শতকরা ২৪ ভাগ। উত্তোলিত কয়লার মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস জাতীয়। কয়লা উত্তোলনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই দেশে অ্যানথ্রাসাইট কয়লাও যথেষ্ট পরিমাণে উত্তোলিত হয়। এই দেশের কয়লা উৎপাদক অঞ্চলগুলির মধ্যে ডোনেস অববাহিকা বা ডনবাস অঞ্চল, কুজনেৎসক অঞ্চল, কারগাণ্ডা অঞ্চল ও বৈকাল হ্রদ অঞ্চল প্রধান।

ইউরোপীয় রাশিয়ার অন্তর্গত কয়লাখনি অঞ্চলের মধ্যে (১) আজভ সাগরের উত্তরে ডন নদীর পর্যঙ্কে অবস্থিত ডোনেৎস কয়লা ক্ষেত্র, (২) ইউরাল পর্বতের দক্ষিণাঞ্চলের কয়লা ক্ষেত্র, (৩) মস্কোর দক্ষিণে অবস্থিত টুলা কয়লা ক্ষেত্র, (৪) উত্তরে পেচোরা কয়লা ক্ষেত্র, (৫) ট্রান্স ককেশীয় অঞ্চলের কয়লা ক্ষেত্র প্রধান। ডোনেৎস অঞ্চলের কয়লা ক্ষেত্রের নিকটবর্তী ক্রিভয়রগে লৌহ ও নিকোপলে ম্যাঙ্গানীজ আকরিত হওয়ায় এই কয়লা ক্ষেত্রের শিল্পনৈতিক গুরুত্ব সর্বাধিক। এই স্থান হইতে সোভিয়েত রাশিয়ার মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কয়লা আসে।

এশিয়ান্তর্গত রাশিয়ার মধ্যে পশ্চিম সাইবেরিয়ার কুজনেৎস্ক কয়লা ক্ষেত্র, মধ্য সাইবেরিয়ার টুঙ্গুজ, মিনুসিনস্ক, কানস্ক, লেনা অববাহিকা ও বৈকাল হ্রদ তীরবর্তী ইর্খুটস্ক কয়লা ক্ষেত্র এবং মধ্য এশিয়ার কারাগাণ্ডা ও দূর প্রাচ্যের বেরীনস্ক কয়লা ক্ষেত্র সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়লাক্ষেত্রের সহিত লৌহ ও ধাতব আকরিক ক্ষেত্রসমূহের সহজ যোগাযোগ এই দেশের কয়লা ক্ষেত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বৃটিশ যুক্তরাজ্য : এই দেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই কয়লাখনি বর্তমান। (১) স্কটল্যাণ্ড অঞ্চলের খনিগুলি ক্লাইড নদীর পর্যঙ্ক ও সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। আয়ারশায়ার, ল্যানার্কশায়ার, মিডলোথিয়ান ও ফিফশায়ার উল্লেখযোগ্য কয়লা উৎপাদক অঞ্চল। (২) ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে পিনাইন পর্বতের উভয়পার্শ্বেই কয়লাখনি বিদ্যমান।—পিনাইন পর্বতের পূর্বদিকে নর্দাম্বারল্যাণ্ড, ডারহাম, ইয়র্কশায়ার, ডার্বিশায়ার, নাটিংহামশায়ার, পিনাইন পর্বতের দক্ষিণভাগে দক্ষিণ স্টাফোর্ডশায়ার, লিস্টারশায়ার, ওয়ার উইকশায়ার। (৩) ওয়েলস অঞ্চলের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে যথাক্রমে ডি নদীর মোহনায় ও ব্রিস্টল প্রভৃতি স্থানে প্রধান কয়লাখনি অবস্থিত। একসময় বৃটিশ যুক্তরাজ্য কয়লা উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ স্থানের অধিকারী ছিল। বর্তমানে এই দেশের স্থান

আদৌ উল্লেখযোগ্য নহে। ধাতব শিল্পেই এই দেশের কয়লা সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। কয়লা ও লৌহ খনির নৈকট্য এই দেশের শিল্পোন্নতির একটি প্রধান কারণ।

ফ্রান্স : কয়লা উৎপাদন এই দেশের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নহে। এই দেশের বেশির ভাগ কয়লা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ভ্যালেন্সিয়েন, লোরেইন, সেন্ট এতিয়েন ও লা-ক্রসোট প্রভৃতি অঞ্চল হইতে উত্তোলিত হয়।

জার্মানী : জার্মানী বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বিধা বিভক্ত। পশ্চিম জার্মানী অঞ্চলেই এই দেশের প্রধান কয়লা খনিসমূহ অবস্থিত। এই দেশে উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস কয়লা—ওয়েষ্ট ফ্যালিয়া, সার, অ্যালসাসী প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উত্তোলিত হয়। পৃথিবী বিখ্যাত রূঢ় ভ্যালী (Ruhr Valley) ওয়েষ্ট ফ্যালিয়া কয়লাখনি অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত। এই দেশের কোলন (Cologn) লিগনাইট উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। স্যাক্সনী পূর্ব জার্মানীর সর্বপ্রধান কয়লা উৎপাদক অঞ্চল।

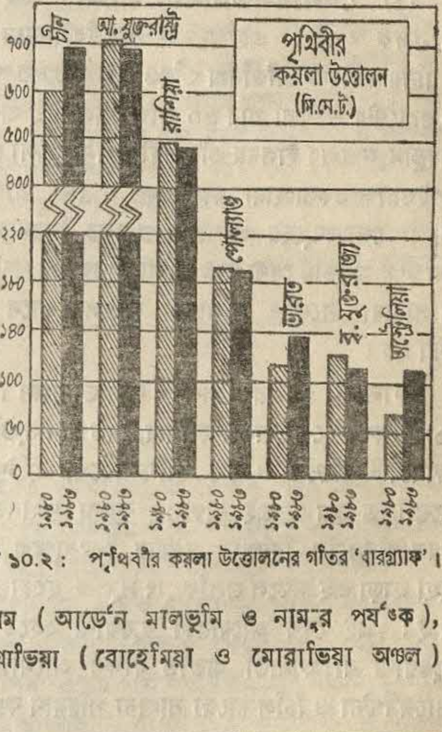

চিত্র ১০.২ : পৃথিবীর কয়লা উত্তোলনের গতির 'বারগ্রাফ'।

ইওরোপের অন্যান্য কয়লা উৎপাদন অঞ্চলের মধ্যে পোল্যান্ড (উত্তর সাইলেসিয়া-জার্মানীর রূঢ় অঞ্চলের সহিত তুলনীয়), বেলজিয়াম (আর্ডেন মালভূমি ও নামুর পর্বতক), হল্যান্ড (ক্যাম্পাইন অঞ্চল) চেকোশ্লোভিয়া (বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া অঞ্চল) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীর কয়লা উত্তোলন (মি. মে. ট.)

	১৯৮০	১৯৮৩		১৯৮০	১৯৮৩
চীন—	৫৯৬.০	৬৮৭.৬	ভারত—	১০৯.১	১৩৬.২
আঃ যুক্তরাষ্ট্র—	৭০১.৩	৬৮৩.৬	যুঃ যুক্তরাজ্য—	১৩০.০	১১৯.২
সোঃ রাশিয়া—	৪৯২.৯	৪৮৬.৭	অস্ট্রেলিয়া—	৭৩.৬	১০৯.০
পোল্যান্ড—	১৯৩.১	১৯১.০	পঃ জার্মানী—	৯৪.৪	৮৪.৮
			পৃথিবী—	২৭৩২.০	২৮৭৬.০

[Source : UNO Monthly Bulletin of Statistics, August, 1984.]

আমেরিকা মহাদেশ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র: পৃথিবীর মোট সঞ্চিত কয়লার শতকরা ৩৪ ভাগ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। কয়লা উত্তোলনে এই দেশ বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। সোভিয়েত রাশিয়ার মত এই দেশেও কয়লা ক্ষেত্রের সহিত লৌহ আকরিক ও অন্যান্য ধাতব আকরিক ক্ষেত্রের সহজ যোগাযোগ এই দেশকে শিল্পে বিশ্বের সর্বোন্নত দেশের মর্যাদা দান করিয়াছে। এই দেশের প্রধান কয়লাখনি অঞ্চল—

(১) **পেনসিলভ্যানিয়া অঞ্চল**: এই অঞ্চল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অ্যানথ্রাসাইট উৎপাদক অঞ্চল। এই অঞ্চলে প্রচুর বিটুমিনাস কয়লাও উত্তোলিত হয়। পেনসিল্‌-ভ্যানিয়া, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ওহিও এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ কয়লা উৎপাদক রাজ্য। যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ কয়লা এই অঞ্চল হইতে উত্তোলিত হয়। (২) মধ্য সমভূমি অঞ্চলের **ইলিনয়-ওহিও-ইণ্ডিয়ানা** কয়লা ক্ষেত্র। (৩) পশ্চিম সমভূমি অঞ্চলের আইওয়া—ওকলাহোমা কয়লাক্ষেত্র। (৪) রকি পর্বতাঞ্চলের কয়লা ক্ষেত্র। রকি কয়লা ক্ষেত্রসমূহের উৎপাদন প্রধানত নিম্নমানের। এই অঞ্চলের কয়লা ক্ষেত্রগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই সকল প্রধান কয়লা ক্ষেত্র ছাড়া আলাবামা রাজ্যেও আলাস্কা অঞ্চলের স্থানে স্থানে কিছু পরিমাণ কয়লা উত্তোলন করা হয়।

কানাডা: কয়লা সম্পদে কানাডা রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধ না হইলেও এই দেশের (১) দক্ষিণ-পূর্বে নোভাস্কোসিয়া, নিউ ব্রান্সউইক রাজ্যে, (২) মধ্যাঞ্চলের আলবার্টা, ক্রোসনেস্ট অঞ্চলে ও (৩) পশ্চিমাঞ্চলের বৃটিশ কলম্বিয়া ও ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপে কয়লা উত্তোলিত হয়। এই অঞ্চলের কয়লা প্রধানত লিগনাইট জাতীয়। এই দেশের কয়লাখনিগুলি বিক্ষিপ্ত হওয়ায় শিল্পাঞ্চলে ইহার যোগান অতীব ব্যয় সাপেক্ষ। ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ সুলভ হওয়ায় কয়লা শিল্পের তেমন উন্নতি হয় নাই। এই দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে কয়লা আমদানি করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা ব্যতীত দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা, পেরু, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও চিলি রাজ্যে সামান্য পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায়।

আফ্রিকা মহাদেশ

এই মহাদেশে কয়লার অভাব সর্বাধিক। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন ও রোডেশিয়া ব্যতীত কোথাও তেমন কয়লা ক্ষেত্র নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলনের নাটাল ও ট্রান্সভাল এবং রোডেশিয়ার ওয়াংকিং গুরুত্বপূর্ণ কয়লা উত্তোলন কেন্দ্র। সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার নাইজেরিয়া অঞ্চলে কয়লাখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ওশিয়ানিয়া মহাদেশ

এই মহাদেশে অস্ট্রেলিয়া সর্বপ্রধান কয়লা উৎপাদক দেশ। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লা খনি বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখা গেলেও নিউসাউথ ওয়েলস ও কুইন্স-ল্যান্ড

কয়লা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের নিউ ক্যাসল, সিডনি, লিথগো কয়লা ক্ষেত্র হিসাবে বিখ্যাত।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কয়লার স্থান বড়ই নগণ্য। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া সামান্যই রপ্তানি করিতে পারে। রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, পোল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, ভারত ও রোডেশিয়া প্রধান। আমদানিকারী দেশগুলির মধ্যে জাপান, ফ্রান্স, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কানাডা ও সুইডেন উল্লেখযোগ্য।

[প্রশ্ন : (১) বর্তমান যুগে কয়লার গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর। (২) কয়লার শ্রেণীবিভাগ ও উহাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (৩) কয়লার উপজাত দ্রব্যের সংখ্যা কত? প্রধান প্রধান কয়েকটি উপজাত দ্রব্যের নাম উল্লেখ কর। (৪) কয়লার জন্ম ইতিহাস বর্ণনা কর। কয়লার প্রধান উপাদান কি? কিসের উপর কয়লার উৎকর্ষতা নির্ভর করে? (৫) পৃথিবীর কত ভাগ কয়লা আমেরিকায় সঞ্চিত আছে? (৬) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কয়লা উৎপাদক অঞ্চলগুলি নির্দেশ কর। (৭) সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ ইউরোপের কয়লাখনিগুলির অবস্থান বর্ণনা কর। (৮) চীন, ভারত ও জাপানের কয়লাখনি অঞ্চলগুলির অবস্থান উল্লেখ কর। পৃথিবীর কত ভাগ কয়লা এশিয়া মহাদেশে সঞ্চিত রহিয়াছে। (৯) পৃথিবীর একটি রেখা চিত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন-এর প্রধান প্রধান কয়লাখনি অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করিয়া দেখাও।]

খনিজ তেল
(Petroleum)

ভূগর্ভস্থ শিলাস্তর হইতে সংগৃহীত হয় বলিয়া এই তেলকে শিলা তেল বলা হয়, (Petro = Rock, Oleum = Oil ; Petroleum = Rock oil)। আবার খনি হইতে এই তেল উত্তোলন করা হয় বলিয়া ইহাকে খনিজ তেল বলে। জলজ উদ্ভিজ্জ এবং সামুদ্রিক প্রাণী পাললিক শিলাস্তরে দীর্ঘকাল প্রোথিত থাকায় উহাদের দেহ নিঃসৃত স্নেহ জাতীয় পদার্থ তিল তিল করিয়া ভূগর্ভের শিলাস্তরের মধ্যে সঞ্চিত হয়। জলের সহিত মিশিয়া ইহা শিলাস্তরের ঢাল অনুযায়ী স্থান হইতে স্থানান্তরে গড়াইয়া চলে ও অপ্রবেশ্য শিলাস্তরের উপরিভাগে সঞ্চিত হয়। উদ্ভিদ বা জীবদেহের নির্যাস বলিয়া ইহার মধ্যে প্রচণ্ড রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে ও গ্যাসের সৃষ্টি হয়। সুতরাং খনিজ তেলের সহিত গ্যাস ও জলের অবস্থান অবশ্যম্ভাবী।

ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্য (Uses and By Products)

খনিজ তেল একটি মিশ্র রাসায়নিক পদার্থ। খনি হইতে উত্তোলিত এই তেল কালো বা পিঙ্গলবর্ণের তরল পাঁকের মতো থাকে। ইহাকে অপরিস্রুত তেল (crude oil) বলে। অপরিস্রুত এই তেল শোধন করিবার সময় তাপ প্রয়োগ করা হয় এবং বিভিন্ন উত্তাপে ইহা হইতে নানা প্রকার উপজাত দ্রব্য (by-product)

পাওয়া যায়। যেমন গ্যাসোলিন বা পেট্রোল প্রায় ৪২%, গ্যাস তেল বা ডিজেল ৪০%, কেরোসিন ৫·৩%, পিচ্ছিলকারক পদার্থ ৩·৭%, অ্যাসফাল্ট ২%, পেট্রল কোক ১% ও অন্যান্য দ্রব্য ৮%।

উপজাত দ্রব্য	ব্যবহার
গ্যাস—	দাহ্য গ্যাস, রন্ধন কার্যে, আলো জ্বালাইতে ও কলে কারখানায় নানাভাবে ব্যবহৃত হয়।
ন্যাপথা—	কৃত্রিম সার, কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম রেশম, প্লাস্টিক, পলিথিন প্রভৃতি প্রস্তুতে ব্যবহার হয়।
পেট্রল—	সর্বাপেক্ষা হাল্কা ও অতিমাত্রায় দাহ্য তেল। বিমান, মোটর, ট্রাক, সাবমেরিন প্রভৃতি চালাইতে ইহা অপরিহার্য।
ডিজেল—	রেল, মোটর লরী, জাহাজ, পরিবহনে ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
কেরোসিন—	গ্রামাঞ্চলে গৃহে আলো জ্বালাইতে ও সাধারণ পাম্প চালাইতে ব্যবহার হয়।
পিচ্ছিলকারক পদার্থ—	শিল্প কারখানায় ও যানবাহনের যন্ত্রপাতি সচল রাখিতে ও ঘর্ষণ জনিত উত্তাপ ও ক্ষয় নিবারণে ইহা অপরিহার্য।
পেট্রোলকোক—	ইলেকট্রোড প্রস্তুতে ব্যবহার হয়।
অ্যাসফাল্ট ও পীচ—	পাকা রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।
প্যারাফিন—	মোমবাতি তৈয়ার করিতে ও সাবান ইত্যাদির মোড়কে মাখানোর মোম প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়।

অপরিস্রুত খনিজ তেল পরিশোধনকালে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় উহা হইতেই বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। বর্তমান কালে এই উপজাত দ্রব্যের সংখ্যা ও ইহাদের কার্যকরী ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পেট্রোলিয়াম নির্ভর রাসায়নিক শিল্পের প্রসার ঘটিতেছে। ইহাকে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প বলা হয়। প্রসাধন দ্রব্য, রং, বার্নিশ, কালি, ফিল্ম, কীটনাশক ঔষধ-পত্র, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য প্রভৃতি শতশত উপজাত দ্রব্য খনিজ তেল হইতে প্রস্তুত করা যায়। আধুনিক শিল্প সভ্যতার মূল বনিয়াদ গঠনে কয়লার পরেই খনিজ তেলের স্থান।

খনিজ তেল বর্তমান বিশ্বের শক্তি সম্পদের অন্যতম। ইহার পরিমাণ ও দেশগত অবস্থানও খুবই সীমাবদ্ধ। মধ্যপ্রাচ্যের অনুন্নত অঞ্চলেই ইহার প্রচুর সঞ্চয় থাকায় বিশ্বের শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ইহা দ্বন্দ্বের বিরাট উৎস। কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির ঘর্ষণজনিত উত্তাপ প্রশমনে খনিজ তেলের পিচ্ছিলকারক পদার্থের অবদান যেমন

অতুলনীয় তেমনি আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও (Source of international fraction) ইহার ভূমিকা অতুলনীয়।

খনিজ তেল উৎপাদনকারী অঞ্চল (Producing Regions)

পৃথিবীর খনিজ তেল উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহকে মোটামুটি চারিটি বলয়ে ভাগ করা যায়। (১) আমেরিকার তেল বলয়, (২) মধ্য প্রাচ্যের তেল বলয়, (৩) রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় তেল বলয় (৪) দূর প্রাচ্যের তেল বলয়।

পৃথিবীর মোট সঞ্চিত তেল সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১১৫২৬ কোটি ব্যারেল। (১ ব্যারেল = $\frac{1}{7}$ মেট্রিক টন) ইহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৫৭'৩ ভাগ মধ্য প্রাচ্যে ৩১'৫ ভাগ আমেরিকায়, ৬'৫ ভাগ সোভিয়েট রাশিয়ায় সঞ্চিত আছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

আমেরিকার তেল বলয়

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—একক দেশ হিসাবে বিশ্বে অন্যতম সর্ববৃহৎ খনিজ তেল উৎপাদক অঞ্চল। এই রাজ্যের অন্তর্গত পেনসিলভ্যানিয়ার টিটুসভিল নামক স্থানে ১৮৫৯ সালে কর্নেল ড্রেক সর্বপ্রথম যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তেল উত্তোলনের ব্যবস্থা করিয়া খনিজ তেল শিল্পে বিপ্লবের সূচনা করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তেল বলয় উত্তরপূর্বে নিউইয়র্ক রাজ্য হইতে দক্ষিণে উপসাগরীয় অঞ্চল হইয়া পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। (১) আপালাচিয়ান খনি অঞ্চল—নিয়ইয়র্ক পেনসিলভ্যানিয়া ও টেনেসি ইহার অন্তর্ভুক্ত। খনিজ তেল উত্তোলনে এই অঞ্চল এক সময় অগ্রণী থাকিলেও বর্তমানে ইহার উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। (২) লিমা ইন্ডিয়ানা-ইলিনয় অঞ্চল - হ্রদ অঞ্চলের দক্ষিণে ইলিনয়, ইন্ডিয়ানা, ওহিও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। (৩) মধ্য মহাদেশীয় খনি অঞ্চল—কানসাস, ওকলাহোমা ও উত্তর টেক্সাস ইহার অন্তর্গত। (৪) উপসাগরীয় অঞ্চল মেক্সিকো উপসাগরের তীরবর্তী লুইসিয়ানা ও টেক্সাস ইহার অন্তর্গত। বর্তমানে এই অঞ্চল হইতেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট খনিজ তেল উৎপাদনের প্রায় ৪৫ ভাগ আসে। (৫) প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল অঞ্চল—ক্যালিফোর্নিয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের খনিজ তেল উৎপাদন বৃদ্ধির পথে। এই অঞ্চলকে কোন কোন সমীক্ষক অন্যান্য স্থানের তুলনায় সমৃদ্ধতর বলিয়া দাবী করেন। এই প্রধান খনিগুলি ব্যতীত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান রাজ্যে ও রকি অঞ্চলের উইওমিং রাজ্যেও সামান্য পরিমাণে খনিজ তেল উত্তোলিত হয়।

মেক্সিকো—মেক্সিকো রাজ্যের তেল খনিসমূহ ইহার উপসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত। এই দেশের প্রধান তেল খনিগুলি ট্যাম্পিকো বন্দরের উত্তর হইতে ধুয়ান্টিপেক যোজকের মধ্যে অবস্থিত। এই অঞ্চলে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস সংগৃহীত হয়। ট্যাম্পিকো ও টুস্কপান নামক বন্দর হইতে এই দেশের উৎপাদিত তেল বিদেশে রপ্তানি হয়।

পাওয়া যায়। যেমন গ্যাসোলিন বা পেট্রোল প্রায় ৪২%, গ্যাস তেল বা ডিজেল ৪০%, কেরোসিন ৫.৩%, পিচ্ছিলকারক পদার্থ ৩.৭%, অ্যাসফাল্ট ২%, পেট্রল কোক ১% ও অন্যান্য দ্রব্য ৮%।

উপজাত দ্রব্য	ব্যবহার
গ্যাস—	দাহ্য গ্যাস, রন্ধন কার্যে, আলো জ্বালাইতে ও কলে কারখানায় নানাভাবে ব্যবহৃত হয়।
ন্যাপথা—	কৃত্রিম সার, কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম রেশম, প্লাস্টিক, পলিথিন প্রভৃতি প্রস্তুতে ব্যবহার হয়।
পেট্রল—	সর্বাপেক্ষা হাল্কা ও অতিমাত্রায় দাহ্য তেল। বিমান, মোটর, ট্রাক, সাবমেরিন প্রভৃতি চালাইতে ইহা অপরিহার্য।
ডিজেল—	রেল, মোটর লরী, জাহাজ, পরিবহনে ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
কেরোসিন—	গ্রামাঞ্চলে গৃহে আলো জ্বালাইতে ও সাধারণ পাম্প চালাইতে ব্যবহার হয়।
পিচ্ছিলকারক পদার্থ—	শিল্প কারখানায় ও যানবাহনের যন্ত্রপাতি সচল রাখিতে ও ঘর্ষণ জনিত উত্তাপ ও ক্ষয় নিবারণে ইহা অপরিহার্য।
পেট্রোলকোক—	ইলেকট্রোড প্রস্তুতে ব্যবহার হয়।
অ্যাসফাল্ট ও পীচ—	পাকা রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।
প্যারাফিন—	মোমবাতি তৈয়ার করিতে ও সাবান ইত্যাদির মোড়কে মাখানোর মোম প্রস্তুতে ব্যবহার করা হয়।

অপরিস্রুত খনিজ তেল পরিশোধনকালে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় উহা হইতেই বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। বর্তমান কালে এই উপজাত দ্রব্যের সংখ্যা ও ইহাদের কার্যকরী ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পেট্রোলিয়াম নির্ভর রাসায়নিক শিল্পের প্রসার ঘটিতেছে। ইহাকে পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প বলা হয়। প্রসাধন দ্রব্য, রং, বার্নিশ, কালি, ফিল্ম, কীটনাশক ঔষধ-পত্র, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য প্রভৃতি শতগত উপজাত দ্রব্য খনিজ তেল হইতে প্রস্তুত করা যায়। আধুনিক শিল্প সভ্যতার মূল বনিয়াদ গঠনে কয়লার পরেই খনিজ তেলের স্থান।

খনিজ তেল বর্তমান বিশ্বের শক্তি সম্পদের অন্যতম। ইহার পরিমাণ ও দেশগত অবস্থানও খুবই সীমাবদ্ধ। মধ্যপ্রাচ্যের অনুন্নত অঞ্চলেই ইহার প্রচুর সঞ্চয় থাকায় বিশ্বের শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ইহা দ্বন্দ্বের বিরাট উৎস। কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির ঘর্ষণজনিত উত্তাপ প্রশমনে খনিজ তেলের পিচ্ছিলকারক পদার্থের অবদান যেমন

অতুলনীয় তেমনি আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও (Source of international fraction) ইহার ভূমিকা অতুলনীয়।

খনিজ তেল উৎপাদনকারী অঞ্চল (Producing Regions)

পৃথিবীর খনিজ তেল উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহকে মোটামুটি চারিটি বলয়ে ভাগ করা যায়। (১) আমেরিকার তেল বলয়, (২) মধ্য প্রাচ্যের তেল বলয়, (৩) রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় তেল বলয় (৪) দূর প্রাচ্যের তেল বলয়।

পৃথিবীর মোট সঞ্চিত তেল সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৩৫২৬ কোটি ব্যারেল। (১ ব্যারেল = ⅐ মেট্রিক টন) ইহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৫৭·৩ ভাগ মধ্য প্রাচ্যে ৩১·৫ ভাগ আমেরিকায়, ৬·৫ ভাগ সোভিয়েট রাশিয়ায় সঞ্চিত আছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

আমেরিকার তেল বলয়

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—একক দেশ হিসাবে বিশ্বে অন্যতম সর্ববৃহৎ খনিজ তেল উৎপাদক অঞ্চল। এই রাজ্যের অন্তর্গত পেন্‌সিলভ্যানিয়ার টিটুস্‌ভিল নামক স্থানে ১৮৫৯ সালে কর্নেল ড্রেক সর্বপ্রথম যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তেল উত্তোলনের ব্যবস্থা করিয়া খনিজ তেল শিল্পে বিপ্লবের সূচনা করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের তেল বলয় উত্তরপূর্বে নিউইয়র্ক রাজ্য হইতে দক্ষিণে উপসাগরীয় অঞ্চল হইয়া পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। (১) আপালাচিয়ান খনি অঞ্চল—নিয়ইয়র্ক পেনসিলভ্যানিয়া ও টেনেসি ইহার অন্তর্ভুক্ত। খনিজ তেল উত্তোলনে এই অঞ্চল এক সময় অগ্রণী থাকিলেও বর্তমানে ইহার উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। (২) লিমা ইণ্ডিয়ানা-ইলিনয় অঞ্চল - হ্রদ অঞ্চলের দক্ষিণে ইলিনয়, ইণ্ডিয়ানা, ওহিও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। (৩) মধ্য মহাদেশীয় খনি অঞ্চল—কানসাস, ওকলাহোমা ও উত্তর টেক্সাস ইহার অন্তর্গত। (৪) উপসাগরীয় অঞ্চল মেক্সিকো উপসাগরের তীরবর্তী লুইসিয়ানা ও টেক্সাস ইহার অন্তর্গত। বর্তমানে এই অঞ্চল হইতেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট খনিজ তেল উৎপাদনের প্রায় ৪৫ ভাগ আসে। (৫) প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল অঞ্চল—ক্যালিফোর্নিয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের খনিজ তেল উৎপাদন বৃদ্ধির পথে। এই অঞ্চলকে কোন কোন সমীক্ষক অন্যান্য স্থানের তুলনায় সমৃদ্ধতর বলিয়া দাবী করেন। এই প্রধান খনিগুলি ব্যতীত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান রাজ্যে ও রকি অঞ্চলের উইওমিং রাজ্যেও সামান্য পরিমাণে খনিজ তেল উত্তোলিত হয়।

মেক্সিকো—মেক্সিকো রাজ্যের তেল খনিসমূহ ইহার উপসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত। এই দেশের প্রধান তেল খনিগুলি ট্যাম্পিকো বন্দরের উত্তর হইতে থুয়ান্টিপেক যোজকের মধ্যে অবস্থিত। এই অঞ্চলে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস সংগৃহীত হয়। ট্যাম্পিকো ও টুস্কপান নামক বন্দর হইতে এই দেশের উৎপাদিত তৈল বিদেশে রপ্তানি হয়।

কানাডা—এই দেশের আলবার্টা ও অন্টারিও প্রদেশে বর্তমানে প্রচুর তেল উত্তোলিত হয়। আলবার্টার অন্তর্গত এডমণ্টন প্রধান তেল কেন্দ্র। এডমণ্টন হইতে পশ্চিমে ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে এবং রেজিনা শহরের তেল শোধনাগারে নলপথে (Pipe Line) তেল প্রেরণ করা হয়। এই নলপথ সুপিরিয়র হ্রদের প্রান্তদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হইবে।

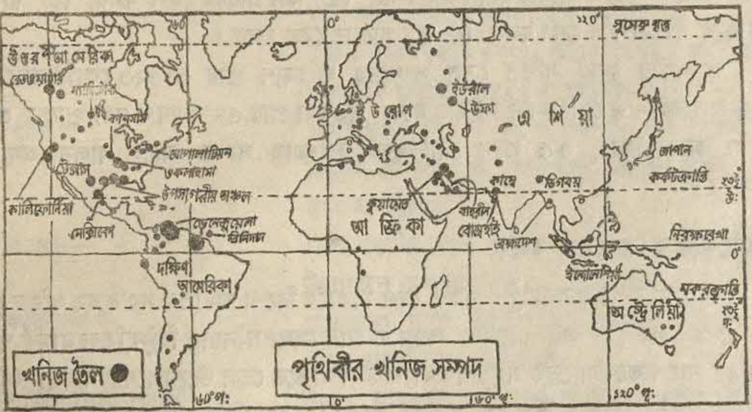

চিত্র ১০.৩ : পৃথিবীর খনিজ তৈলের উত্তোলক অঞ্চল।

ভেনেজুয়েলা—এই দেশ বিশ্বে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ খনিজ তেল উৎপাদক অঞ্চল। ম্যারাকাইবো হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চলে ও ওরিণোকো নদীর উপত্যকায় প্রচুর খনিজ তেল পাওয়া যায়। জাহাজ ও পাইপযোগে এই তেল আরুবা ও কারাকাও বন্দরে শোধনের জন্য আনা হয়। এই দেশ হইতে প্রচুর তেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হয়।

কলম্বিয়া—এই দেশের ম্যাগডালেনা-স্যানট্যাণ্ডার অঞ্চলে খনিজ তেল উত্তোলিত হয়। বারকো ও ম্যাগডালেনা উল্লেখযোগ্য তেল ক্ষেত্র। পাইপযোগে ঐ অঞ্চলের অপরিশোধিত তেল কার্থাজেনা বন্দরের দক্ষিণে প্রেরণ করা হয়।

আর্জেন্টিনা—এই দেশের তেল খনিগুলি উত্তর পাটাগোনিয়া ও আন্দিজ পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত। কোমোডোরো রিভাডাভিয়া উল্লেখযোগ্য তেল ক্ষেত্র। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন তেমন নহে। ইহা ব্যতীত পেরু, বলিভিয়া, ব্রাজিল ও চিলি প্রভৃতি দেশে সামান্য পরিমাণে খনিজ তেল উত্তোলিত হয়। এই সকল দেশের তেল ক্ষেত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি উল্লেখযোগ্য : পেরু (পিউরা প্রদেশ), ব্রেজিল সালভাডরের নিকটবর্তী বাহিয়া) চিলি (ম্যাজিলান), বলিভিয়া (সাণ্টক্রুজের উত্তরাংশ)। ক্যারিবিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী ত্রিনিদাদ দ্বীপেও কিছু পরিমাণে খনিজ তেল উত্তোলিত হয়।

মধ্য প্রাচ্যের তেল বলয়

যৌথভাবে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিই সর্বাধিক তেল উৎপাদন করে এবং এই অঞ্চলের সঞ্চিত তেলের পরিমাণও অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী। মধ্য প্রাচ্যের তেলখনিগুলি ইরাক, ইরাণ, সৌদিআরব বাহেরিণ দ্বীপ, কুওয়েট, কাটার প্রভৃতি রাজ্যে সীমাবদ্ধ। ইরাকের কিরকুক ও খানাকিণ বিখ্যাত তেল উৎপাদক অঞ্চল। বসরার নিকটও দুইটি বিরাট তেল ক্ষেত্র বিদ্যমান। এই অঞ্চল হইতে নলপথে তেল ভূমধ্যসাগরের তীরে হাইফা, বানিয়াস ও ত্রিপলি বন্দরে রপ্তানির জন্য নীত হয়। 'ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী' নামক একটি বৃটিশ সংস্থা এই দেশের তেল উত্তোলনের কাজে নিযুক্ত। ইরাণের মসজিদ-ই-সুলেমান, গাচ সরন, হাফতকেল, আঘাজারি, লালি, নাফট-ই-সাফিদ ইত্যাদি প্রধান তেল উৎপাদক অঞ্চল। বিশ্বের সর্ববৃহৎ খনিজ তেল পরিশোধন কেন্দ্র, আবদান, ইরাণে অবস্থিত। ১৯৫১ সালে এই দেশের তেল শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ ইরাক-ইরাণের যুদ্ধের জন্য এই দুই দেশের তেল শিল্পের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। সৌদি আরবের উল্লেখযোগ্য তেল ক্ষেত্রগুলি ধাহরাণ, আবকোয়েব, আইনডার, সাফানিয়া ও ঘাওয়ার অঞ্চলে অবস্থিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসাহায্যে ধাহরাণে একটি তেল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের বেশির ভাগ তেল বাহেরীণ দ্বীপে অবস্থিত শোধনাগারে শোধন করা হয় এবং জাহাজযোগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত হয়। পারস্য উপসাগরে বাহেরিণ দ্বীপপুঞ্জ কাটার, কুওয়েট, দুবাই, আবুধাবি প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রচুর তেল উৎপাদিত হয়। এই সকল অঞ্চলের তেল খনিগুলি বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে আছে।

মধ্য প্রাচ্যের খনিজ তেল উত্তোলন (মি. মে. ট.)

	১৯৮০	১৯৮৩		১৯৮০	১৯৮৩
সৌদি আরব—	৪৯৫.৭	২৫০.৮	সংযুক্ত আরবশাহী—	৮২.৭	৫৩.৬
ইরাণ—	৭৩.৭	১২৪.১	কাতার—	২২.৮	২১.৬
ইরাক—	১২৯.৮	৪২.৯	ওমান—	১৪.১	১৮.৭
কুওয়েট—	৮৫.৫	৫২.৭	বাহরিণ—	২.৪	২.১

[Source : UNO Monthly Bulletin of Statistics, August, 1984.]

রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় বলয়

খনিজ তেল উৎপাদনে সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ইউরোপীয় রাশিয়ার তেল-খনিগুলি (১) কাস্পিয়ান উপকূলে বাকু, ককেশাস পর্বতের উত্তরে গ্রজনী ও মাইকপ এবং (২) ইউরাল অঞ্চলে উফা হইতে স্টারলিটামাক পর্যন্ত বিস্তৃত। বাকু এক সময় সোভিয়েত রাশিয়ার সর্ববৃহৎ তেল উৎপাদক অঞ্চল ছিল। বর্তমানে ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে উফা তেল উৎপাদনে প্রায় বাকুর সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে ইহাকে 'দ্বিতীয় বাকু' (Second Baku) বলা হয়। এই সকল অঞ্চলের তেল নলপথে শোধনাগারে ও বন্দরে প্রেরিত হয়। বাকু হইতে বাটুম,

গ্রজনি ও মাইকপ হইতে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী তুয়াপসে এবং আরমাভির হইতে রস্টভ-অন-ডন হইয়া ভদোভায়া পর্যন্ত নলপথ বিস্তৃত। এশিয়ার অন্তর্গত রাশিয়ার মধ্য এশিয়া অঞ্চলে কারাগান্ডা, বুখারা, তুর্কমেন ও কিরঘিজ অঞ্চলে স্বল্প পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। পূর্বপ্রান্তে সাখালিন ও কামচাটকা অঞ্চলে তেলখনি আছে।

পূর্ব ইউরোপে খনিজ তেলের অবস্থান তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। রাশিয়ার সীমান্তবর্তী পোল্যান্ড ও রুমানিয়াতে খনিজ তেল পাওয়া যায়। রুমানিয়ার প্লোয়েস্ট উল্লেখযোগ্য উৎপাদনকেন্দ্র। ইহা ছাড়া পশ্চিম জার্মানী (হ্যানোভার), ফ্রান্স (পেচেলব্রন) ইত্যাদি অঞ্চলে ছোট ছোট দু'একটি তেলখনি বর্তমান।

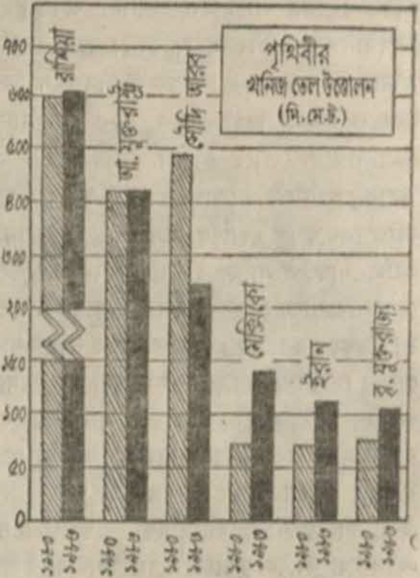

চিত্র ১০.৪ : পৃথিবীর খনিজ তেলের উত্তোলনের 'বারগ্রাফ'।

পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলির অতীতে খনিজ তেল উত্তোলনে কোন অবদানই ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বৃটিশ যুক্তরাজ্য উত্তর সাগরে বিরাট তেল খনি আবিষ্কার করিয়াছে এবং 'অফ্‌শোর ড্রিলিং' পদ্ধতিতে উত্তর সাগর হইতে প্রচুর খনিজ তেল আহরণ করিতেছে। ফলে বিশ্বের খনিজ তেল মানচিত্রে বৃটিশ যুক্তরাজ্য বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত এক দশকে বৃটিশ যুক্তরাজ্য এই বিষয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

পৃথিবীর খনিজ তেল উত্তোলন (মি. মে. ট)

	১৯৮০	১৯৮৩		১৯৮০	১৯৮৩
সোঃ রাশিয়া	৬০৩.২	৬১৮.০	চীন	১০৫.৯	১০৬.০
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৪২৪.২	৪২৫.৯	ভেনেজুয়েলা	১১৪.৭	৯৯.৭
সৌদি আরব	৪৯৬.৭	২১০.৮	কানাডা	৭০.৪	৬৬.৪
মেক্সিকো	৭৫.৪	১৪২.৮	ইন্দোনেশিয়া	৭৭.৬	৬৫.৫
ইরাণ	৭৩.৭	১২৪.১	নাইজিরিয়া	১০২.২	৬৩.৮
বৃঃ যুক্তরাজ্য	৭৮.৯	১১০.৮	ইরাক	১২৯.৮	৪২.৯
			পৃথিবী	২৯৭৫.০	২৬৩০.০

[Source: UNO Monthly Bulletin of Statistics, August, 1984.]

দূর প্রাচ্য বলয়

ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সারাওয়াক, উত্তর বোর্ণিও, ব্রুনেই, ব্রহ্মদেশ, ভারত ইউনিয়ন, চীন, জাপান ও পাকিস্তান এই বলয়ের অন্তর্গত। ইন্দোনেশিয়ার তেল-খনিগুলি প্রধানত জাভা, সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপে অবস্থিত। এই অঞ্চলের পালেম্বাং, সামারিন্দা ও বালিকপাপন উল্লেখযোগ্য তেল-পরিশোধন-কেন্দ্র। সেলিবিস সাগরের তীরে তারাকান মালয়েশিয়ার উল্লেখযোগ্য তেলকেন্দ্র। ব্রুনেই অঞ্চলেও স্বল্প পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বপ্রান্তে আসাম অঞ্চলে, পশ্চিমপ্রান্তে গুজরাটের ক্যাম্বে উপসাগরীয় অঞ্চলে ও মহারাষ্ট্রের বম্বে হাই-এ খনিজ তেল পাওয়া যায়। ভারত বিদেশ হইতে প্রচুর তেল আমদানি করে। তবে ভারতের তেল সম্পদ বিশেষ সম্ভাবনাময়।

চীনের তেলসম্পদ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই দেশের উত্তরপূর্বে সিঙ্কিয়াং প্রদেশে ও অন্তর্মোঙ্গলিয়ায় খনিজ তেল পাওয়া যায়। জাপানের হনসু দ্বীপে সামান্য তেল আছে। চাহিদার তুলনায় ইহা অতি নগণ্য। পাকিস্তানে অতি সামান্য তেল পাওয়া যায়।

উপরি-উক্ত তেল-অঞ্চল ব্যতীত আফ্রিকার মিশর, ঘানা, নাইজেরিয়া ও ওশিয়ানিয়ার নিউজিল্যাণ্ডে সামান্য তেল পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade)

শিল্পোন্নত দেশগুলিই খনিজ তেলের ব্যবহার সর্বাধিক করিয়া থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেল-উৎপাদক অঞ্চল হইলেও আভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য ইহারাই আবার প্রচুর পরিমাণে খনিজ তেল আমদানি করে। খনিজ তেলের আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, ভারত, জাপান, চীন প্রভৃতি প্রধান। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া অপরিশ্রুত ও পরিশ্রুত তেল রপ্তানিও করিয়া থাকে। রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, মেক্সিকো, ইরাণ, ইরাক, সৌদি আরব, কুওয়েট, বাহেরীণ, কাটার, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি প্রধান।

[প্রশ্ন : (১) খনিজতেলের প্রধান উপজাত দ্রব্যের নাম লিখিয়া উহাদের ব্যবহার বর্ণনা কর। (২) পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প কাহাকে বলে? এই শিল্পে উৎপাদিত কয়েকটি দ্রব্যের নাম লিখ। (৩) পৃথিবীর তেল-উৎপাদনক্ষম অঞ্চলসমূহকে চারিটি ভাগে ভাগ করিয়া উহাদের সঞ্চিত তেলের পরিমাণ শতকরা হিসাবে উল্লেখ কর। (৪) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের তেল-উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির বিবরণ দাও। (৫) মধ্য-প্রাচ্যের তেল-বলয়ের উৎপাদক অঞ্চলগুলির বিবরণ লিখ। (৬) "মধ্য প্রাচ্যের তেল আন্তর্জাতিক বিবাদের একটি উৎসবিশেষ।"—যথাযথ ব্যাখ্যা কর। (৭) দূর প্রাচ্যের তেল-বলয়ে উৎপাদক অঞ্চলসমূহ বর্ণনা কর। (৮) পৃথিবীর প্রধান তেল উৎপাদক দেশগুলির নাম লিখ। (৯) তিনটি তেল রপ্তানিকারক দেশ এবং তিনটি তেল আমদানিকারক দেশের নাম উল্লেখ কর। (১০) পৃথিবীর একটি রেখাচিত্রে দেখাও ও নাম লিখ :—তিনটি প্রধান তেল-উৎপাদনকারী অঞ্চল এবং ইহাদের প্রতিটির সহিত রপ্তানিবন্দর।]

গ্রজনি ও মাইকপ হইতে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী তুয়াপসে এবং আরমাভির হইতে রস্টভ-অন-ডন হইয়া ভদোভায়া পর্যন্ত নলপথ বিস্তৃত। এশিয়ার অন্তর্গত রাশিয়ার মধ্য এশিয়া অঞ্চলে কারাগান্ডা, বুখারা, তুর্কমেন ও কিরঘিজ অঞ্চলে স্বল্প পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। পূর্বপ্রান্তে সাখালিন ও কামচাটকা অঞ্চলে তেলখনি আছে।

পূর্ব ইউরোপে খনিজ তেলের অবস্থান তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। রাশিয়ার সীমান্তবর্তী পোল্যান্ড ও রুমানিয়াতে খনিজ তেল পাওয়া যায়। রুমানিয়ার প্লোয়েস্টি উল্লেখযোগ্য উৎপাদনকেন্দ্র। ইহা ছাড়া পশ্চিম জার্মানী (হ্যানোভার), ফ্রান্স (পেচেলব্রন) ইত্যাদি অঞ্চলে ছোট ছোট দু'একটি তেলখনি বর্তমান।

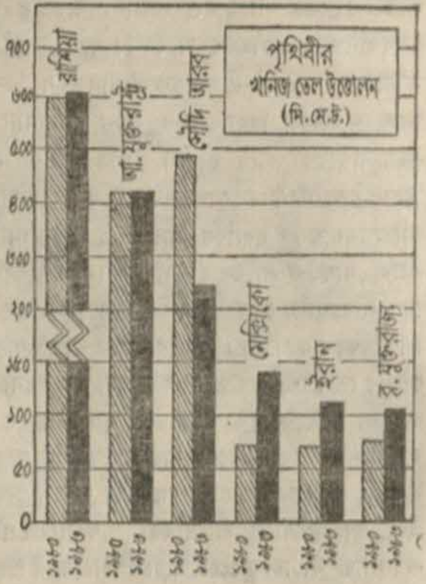

চিত্র ১০.৪ : পৃথিবীর খনিজ তেলের উত্তোলনের 'বারগ্রাফ'।

পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলির অতীতে খনিজ তেল উত্তোলনে কোন অবদানই ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বৃটিশ যুক্তরাজ্য উত্তর সাগরে বিরাট তেল খনি আবিষ্কার করিয়াছে এবং 'অফ্‌শোর ড্রিলিং' পদ্ধতিতে উত্তর সাগর হইতে প্রচুর খনিজ তেল আহরণ করিতেছে। ফলে বিশ্বের খনিজ তেল মানচিত্রে বৃটিশ যুক্তরাজ্য বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত এক দশকে বৃটিশ যুক্তরাজ্য এই বিষয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

পৃথিবীর খনিজ তেল উত্তোলন (মি. মে. ট)

	১৯৮০	১৯৮৩		১৯৮০	১৯৮৩
সোঃ রাশিয়া	৬০৩'২	৬১৮'০	চীন	১০৫'৯	১০৬'০
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৪২৪'২	৪২৫'৯	ভেনেজুয়েলা	১১৪'৭	৯৯'৭
সৌদি আরব	৪৯৫'৭	২১০'৮	কানাডা	৭০'৪	৬৬'৪
মেক্সিকো	৭৫'৪	১৪২'৮	ইন্দোনেশিয়া	৭৭'৬	৬৫'৫
ইরাণ	৭৩'৭	১২৪'১	নাইজিরিয়া	১০২'২	৬১'৮
বৃঃ যুক্তরাজ্য	৭৮'৯	১১০'৮	ইরাক	১২৯'৮	৪২'৯
			পৃথিবী	২৯৭৫'০	২৬১০'০

[Source: UNO Monthly Bulletin of Statistics, August, 1984.]

দূর প্রাচ্য বলয়

ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সারাওয়াক, উত্তর বোর্ণিও, ব্রুনেই, ব্রহ্মদেশ, ভারত ইউনিয়ন, চীন, জাপান ও পাকিস্তান এই বলয়ের অন্তর্গত। ইন্দোনেশিয়ার তেল-খনিগুলি প্রধানত জাভা, সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপে অবস্থিত। এই অঞ্চলের পালেম্বাং, সামারিন্দা ও বালিকপাপন উল্লেখযোগ্য তেল-পরিশোধন-কেন্দ্র। সেলিবিস সাগরের তীরে তারাকান মালয়েশিয়ার উল্লেখযোগ্য তেলকেন্দ্র। ব্রুনেই অঞ্চলেও স্বল্প পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বপ্রান্তে আসাম অঞ্চলে, পশ্চিমপ্রান্তে গুজরাটের কাম্বে উপসাগরীয় অঞ্চলে ও মহারাষ্ট্রের বম্বে হাই-এ খনিজ তেল পাওয়া যায়। ভারত বিদেশ হইতে প্রচুর তেল আমদানি করে। তবে ভারতের তেল সম্পদ বিশেষ সম্ভাবনাময়।

চীনের তেলসম্পদ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই দেশের উত্তরপূর্বে লিয়াওনিং প্রদেশে ও অন্তর্মঙ্গোলিয়ায় খনিজ তেল পাওয়া যায়। জাপানের হনসু দ্বীপে সামান্য তেল আছে। চাহিদার তুলনায় ইহা অতি নগণ্য। পাকিস্তানে অতি সামান্য তেল পাওয়া যায়।

উপরি-উক্ত তেল-অঞ্চল ব্যতীত আফ্রিকার মিশর, ঘানা, নাইজেরিয়া ও ওশিয়ানিয়ার নিউজিল্যাণ্ডে সামান্য তেল পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade)

শিল্পোন্নত দেশগুলিই খনিজ তেলের ব্যবহার সর্বাধিক করিয়া থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেল-উৎপাদক অঞ্চল হইলেও আভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য ইহারাই আবার প্রচুর পরিমাণে খনিজ তেল আমদানি করে। খনিজ তেলের আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, ভারত, জাপান, চীন প্রভৃতি প্রধান। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া অপরিশ্রুত ও পরিশ্রুত তেল রপ্তানিও করিয়া থাকে। রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, মেক্সিকো, ইরাণ, ইরাক, সৌদি আরব, কুওয়েট, বাহেরীণ, কাটার, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি প্রধান।

[প্রশ্ন : (১) খনিজতেলের প্রধান উপজাত দ্রব্যের নাম লিখিয়া উহাদের ব্যবহার বর্ণনা কর। (২) পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প কাহাকে বলে? এই শিল্পে উৎপাদিত কয়েকটি দ্রব্যের নাম লিখ। (৩) পৃথিবীর তেল-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহকে চারিটি ভাগে ভাগ করিয়া উহাদের সঞ্চিত তেলের পরিমাণ শতকরা হিসাবে উল্লেখ কর। (৪) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের তেল-উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির বিবরণ দাও। (৫) মধ্য-প্রাচ্যের তেল-বলয়ে উৎপাদক অঞ্চলগুলির বিবরণ লিখ। (৬) "মধ্য প্রাচ্যের তেল আন্তর্জাতিক বিবাদের একটি উৎসবিশেষ।"—কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (৭) দূর প্রাচ্যের তেল-বলয়ে উৎপাদক অঞ্চলসমূহের বর্ণনা কর। (৮) পৃথিবীর প্রধান তেল উৎপাদক দেশগুলির নাম লিখ। (৯) তিনটি তেল রপ্তানিকারক দেশ এবং তিনটি তেল আমদানিকারক দেশের নাম উল্লেখ কর। (১০) পৃথিবীর একটি রেখাচিত্রে দেখাও ও নাম লিখ:—তিনটি প্রধান তেল-উৎপাদনকারী অঞ্চল এবং ইহাদের প্রতিটির প্রধান রপ্তানিবন্দর।]

জলবিদ্যুৎ বা জলশক্তি
(Hydro-Electricity or Water Power)

প্রবহমান জলরাশিকে ব্যবহার করিয়া যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয় তাহাকে জলবিদ্যুৎ বলে। জলপ্রপাত বা নিম্নগামী বেগবতী নদীর স্রোতকে বাঁধ দিয়া আটকাইয়া উহার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করাই ইহার বৈশিষ্ট্য। কয়লা ও খনিজ তেল ক্ষীয়মাণ সম্পদ হওয়ায় ইহারা দ্রুত নিঃশেষিত হইতেছে। পক্ষান্তরে শিল্প সভ্যতার ক্রম প্রসারের ফলে বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় অফুরন্ত ও চলমান জলরাশির বহুল ও ব্যাপক ব্যবহার মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। জলশক্তিকে বর্তমানে 'সাদা কয়লা' (White Coal) বলা হয়।

কয়লা ও খনিজ তেলের বণ্টন পৃথিবীতে খুবই বৈষম্যপূর্ণ ও ইহার সঞ্চয়ও অঞ্চল বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রবহমান জলরাশি পৃথিবীর অনেক অঞ্চলেই বিদ্যমান ; এবং উহা হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সহজ ও সুলভ। কয়লা ও খনিজ তেলের মত জলশক্তি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অপরিহার্য। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা অতুলনীয়। বর্তমানে সমুদ্রের ঢেউ ও জোয়ার-ভাঁটা হইতেও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে। কয়লা ও খনিজ তেলের ভাণ্ডার একদিন নিঃশেষিত হইবে, কিন্তু জলধারা চিরন্তন।

প্রবহমান জলরাশি হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। নাতি উচ্চ জলপ্রপাত বা খরস্রোতা নদীর ধারাকে কংক্রীটের বাঁধ দিয়া আটকান হয় এবং ঐ বাঁধের সম্মুখভাগে গভীর খাদে একটি ইঞ্জিনঘর নিমাণ করিয়া 'টারবাইন' নামক যন্ত্র বসান হয়। এইবার বাঁধের পশ্চাদ্‌ভাগে আটকান বিপুল জলরাশিকে একটি স্বল্পপরিসর সুড়ঙ্গ-পথে পরিচালিত করিয়া ইঞ্জিনঘরে টারবাইনের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ফলে জলের প্রচণ্ড আঘাতে যন্ত্রটি চালু হয় ও উহার সহিত সংযুক্ত অন্যান্য যন্ত্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা

জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বিশেষ কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই অবস্থাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ক) ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক অবস্থা এবং (খ অর্থনৈতিক অবস্থা।

(ক) ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক অবস্থা (Geographical or Physical Factors)—জলবিদ্যুৎ উৎপাদন অনেকাংশে প্রকৃতির আনুকুল্যের উপর নির্ভর করে। (১) সারা বৎসর সমবেগসম্পন্ন জলপ্রবাহ :—জলের সরবরাহ নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন। তুষারপুষ্ট নদীতে সারা বৎসর জলের ধারা বর্তমান থাকে। পর্বতের উপর প্রচুর বরফ জমিয়া অথবা বৃষ্টির জল বিরাটকায় হ্রদে সঞ্চিত হইয়া

সারা বৎসর যে সকল নদীর ধারাকে সজীব ও পুষ্ট রাখে, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী। বৃষ্টিপুষ্ট নদীতে বিরাট বাঁধের সাহায্যে জলাধারের সৃষ্টি করিয়া নিয়মিত জলপ্রবাহ পাওয়া যাইতে পারে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি বৃষ্টিপুষ্ট নদীর উদাহরণ—(২) বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি :—জলের গতিবেগকে ব্যবহার করিবার পক্ষে উচ্চাবচ ভূভাগ বিশেষ সহায়ক। পর্বতগাত্র হইতে নির্গত নদী সমতলভূমিতে পড়িবার মুখে নিম্নগামী ও খরস্রোতা হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে অতি উচ্চ জলপ্রপাত আদর্শ। তথাপি বন্ধুর ভূভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত খরস্রোতা নদীকে দক্ষতার সহিত ব্যবহার করা যায়। ভূ-প্রকৃতির বন্ধুরতা অনুযায়ী একই নদীর জলধারাকে একাধিকবার ব্যবহার করা যায়। (৩) অনুকূল ঋতু পর্যায় :—স্বল্পস্থায়ী ও নাতিতীব্র শীতকাল নিয়মিত জলপ্রবাহের অনুকূল। শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী ও বেশি তীব্র হইলে শীতে বরফ জমিয়া জলের প্রবাহ কমিয়া যায়। বৃষ্টিবহুল ঋতু এই বিষয়ে অনুকূল। বৃষ্টিপাত অনেকাংশে বনভূমির উপর নির্ভর করে বলিয়া নিকটবর্তী বনভূমি পরোক্ষভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক। ইহা ছাড়া বনভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীর জল পরিষ্কার হয়। অপরিষ্কার জলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ক্ষতি হয়।

(খ) **অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Factors)**- ভৌগোলিক পরিবেশ অনুকূল থাকিলেও নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক অবস্থা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক। (১) মূলধন :—জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্ত কংক্রীটের বাঁধ নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। (২) দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মী —জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন বিশেষ কারিগরী দক্ষতার উপর নির্ভর করে বলিয়া কারিগরী দক্ষতাসম্পন্ন প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীর প্রয়োজন। (৩) বিদ্যুতের চাহিদা :—এই সকল বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সুতরাং পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্র গড়িয়া না উঠিলে ইহা আদৌ লাভজনক হয় না। (৪) নিকটবর্তী শিল্প কেন্দ্র :—৪৫০ হইতে ৫০০ কিলোমিটারের অধিক দূরে জলবিদ্যুৎ সরবরাহ করা অসুবিধাজনক বলিয়া ঐ দূরত্বের মধ্যে শিল্পকেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। দূরত্ব বৃদ্ধির সহিত ভোল্টেজ কমিয়া যায়। এই কারণে বর্তমানে 'গ্রিড' ব্যবস্থার সাহায্যে সরবরাহ নিয়মিত রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে। (৫) যানবাহনের সুবিধা :—জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নিকটবর্তী এলাকার সহিত উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক। ইহাতে সরবরাহ নিয়মিত ও পরিদর্শন ইত্যাদির সুবিধা হয়। (৬) কয়লা বা খনিজ তেলের অভাব :—জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের সন্নিহিত অঞ্চলে কয়লা বা খনিজ তেলের অভাব জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রেরণা যোগায়। অবশ্য বর্তমানে খনিজ সম্পদের সংরক্ষণ-ব্যবস্থার ফলে কয়লা ও খনিজ তেলের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশসমূহে জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদক অঞ্চল—পৃথিবীর অনেক দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অবস্থা বা সুযোগ অনুকূল আছে। কিন্তু তথাপি সুযোগ অনুযায়ী সকল দেশে জলবিদ্যুতের উৎপাদন সমহারে সম্ভব হয় নাই। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্য ক্ষমতার তুলনায় কানাডা ৪৮%, জাপান ৪৫%, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ৩০%, সুইডেন ২৫%, এবং ভারত মাত্র ৬% ক্ষমতার কার্যকরী প্রয়োগ করিতেছে। পৃথিবীতে উৎপাদিত জলবিদ্যুতের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আমেরিকা মহাদেশ

এই মহাদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের আমাজন অববাহিকায় সারা বৎসর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ঐ অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাকৃতিক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুকূল না হওয়ায় মোট সম্ভাব্য ক্ষমতার সামান্য অংশ মাত্র কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সীমান্তে নায়গ্রা জলপ্রপাত হইতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে ঐ বিদ্যুৎশক্তি উভয় দেশ ব্যবহার করিয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বে নিউ ইংল্যান্ড রাজ্যসমূহে কয়লার অভাব জলবিদ্যুতের সাহায্যে পূরণ করা হয়। ইহা ছাড়া মধ্যাঞ্চলের টেনেসি উপত্যকায়, পশ্চিমে রকি পর্বতাঞ্চলে ও আটলান্টিক উপকূলের রাজ্যসমূহে ব্যাপকভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হয়। এই বিদ্যুৎ-শক্তি প্রধানত যানবাহন পরিচালনায়, রাসায়নিক শিল্পে, বয়ন শিল্পে, অ্যালুমিনিয়াম ও অন্যান্য শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো নদীর উপর হুভার ড্যাম ও বোল্ডার ড্যাম এবং কলাম্বিয়া নদীর উপর 'গ্র্যান্ড-কুলী ড্যাম' বিখ্যাত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র।

কানাডা—নায়গ্রা প্রপাত হইতে প্রাপ্ত বিদ্যুৎশক্তি ছাড়াও এই দেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত অন্টারিও ও কুইবেক অঞ্চলে এবং পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ব্যাপকভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে কানাডার স্থান তৃতীয়।

ইউরোপ মহাদেশ

ইতালী—কয়লার অভাবে এই দেশে আল্পস ও আপেনাইন পর্বতাঞ্চলের নদীসমূহ হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পো নদী অববাহিকার শিল্পাঞ্চলেই এই বিদ্যুতের সর্বাধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

সুইজারল্যাণ্ড—কয়লার অভাবে আল্প্‌স পর্বত হইতে নির্গত নদীসমূহ হইতে বিদ্যুৎশক্তি আহরণ করা হয়। রেলপথ ও এই দেশের হাল্কা শিল্পক্ষেত্রে ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

নরওয়ে ও সুইডেন—স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার এই দুইটি দেশ মাথাপিছু জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশ্বের প্রথম সারির দেশ। কয়লা ও খনিজ তেলের অভাব এই অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান প্রেরণা। নরওয়ের দক্ষিণ পশ্চিমের অসংখ্য জলপ্রপাত এই দেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধানকেন্দ্র। সুইডেনের ভেনার হ্রদ হইতে উৎপন্ন গোটা নদীর উপর ট্রলহাট্টা বিখ্যাত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র।

ফ্রান্স—এই দেশের রোন উপত্যকায়, মধ্যাঞ্চলের মালভূমিতে এবং পিরেনীজ ও আল্প্‌স পার্বত্য অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

এশিয়া মহাদেশ

সোভিয়েত রাশিয়া—এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে রাশিয়া বিশ্বে দ্বিতীয়। নীপার নদীর উপর নীপ্রোগেস ও ভল্গা নদীর উপর লেনিন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র এই দেশের বিখ্যাত জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের অন্যতম। ইহা ছাড়া ডন, আমুর, ইনিসি, নিকা, ভল্গা প্রভৃতি নদী হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ইউরাল ও ককেশাস পার্বত্য অঞ্চলেও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র আছে।

জাপান—কয়লা ও খনিজ তেলের অপ্রতুলতা এই দেশে ব্যাপক জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান কারণ। এই দেশের পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয়। সুতরাং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের এই অনুকূল পরিবেশ জাপানকে বিশেষ সুবিধা দান করিয়াছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে জাপান চতুর্থ স্থানের অধিকারী। হনসু দ্বীপের পর্বতের পূর্ব ও দক্ষিণ ঢালেই এই দেশের প্রধান বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি স্থাপিত।

ভারত—জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারতের স্থান অতীতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ভারতে কয়েকটি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণ ভারতের শিবসমুদ্রম ও ময়ার, উত্তর ভারতের ভাকরা-নাঙ্গাল ও দামোদর উপত্যকার বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মদেশ—এই দেশের উত্তরের পর্বতাঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ সুযোগ বর্তমান। কিন্তু ভোগকেন্দ্র দক্ষিণের দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এই অঞ্চলে বিশেষ লাভজনক হইতেছে না। আশা করা যায় কারিগরী বিদ্যার উন্নতির সহিত এই অসুবিধা দূরীভূত হইবে।

আফ্রিকা মহাদেশে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলনে ও ওশিআনিয়ায় অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে সামান্য পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

কয়লা, খনিজ তেল ও জলবিদ্যুতের তুলনা

কয়লা	খনিজ তেল	জলবিদ্যুৎ
১। ইহা সঞ্চিত সম্পদ। ক্রমাগত ব্যবহারে ইহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। ইহার ভাণ্ডার পূরণ করা বা নতুন সৃষ্টি করা মানুষের সাধ্যাতীত।	১। ইহা সঞ্চিত সম্পদ। ক্রমাগত ব্যবহারে ইহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। ইহার ভাণ্ডার পূরণ করা বা নতুন সৃষ্টি করা মানুষের সাধ্যাতীত।	১। ইহা প্রবহমান সম্পদ। প্রবহমান জলরাশির গতিকে কাজে লাগান হয় বলিয়া একই নদীর ধারাকে একাধিকবার ব্যবহার করা যায়। জল, বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টি, জল এই ধারাও যেমন অবিচ্ছিন্ন জলশক্তিও তেমনি অফুরন্ত।
২। স্থায়ী মূলধন অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজন। কিন্তু ইহার পৌনঃপুনিক ব্যয় অধিক।	২। স্থায়ী মূলধন অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজন হইলেও পৌনঃপুনিক ব্যয় অধিক।	২। স্থায়ী মূলধন প্রচুর প্রয়োজন। বাঁধ নির্মাণ, যন্ত্রপাতি বসান অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্য। কিন্তু ইহার পৌনঃপুনিক ব্যয় কম।
৩। কয়লা গুরুভার কঠিন পদার্থ। ইহার স্থানান্তর ব্যয় অধিক।	৩। ইহা তরল পদার্থ হওয়ায় পাইপ পথে স্থানান্তর সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ।	৩। জলশক্তি দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রিড-প্রথায় বহুদূরবর্তী স্থানেও প্রেরণ অতি সুলভ।
৪। শিল্পের একদেশীভবনে কয়লার গুরুত্ব সর্বাধিক।	৪। শিল্পের একদেশীভবনে ইহার গুরুত্ব কম। ইহা বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা করে।	৪। শিল্পের একদেশীভবনের পরিবর্তে ইহা শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা করে।
৫। ইহার ব্যবহার অপরিচ্ছন্ন।	৫। ইহার ব্যবহারও অপরিচ্ছন্ন।	৫। ইহার ব্যবহার পরিচ্ছন্ন।
৬। পরিবহন-শিল্পে ইহার ব্যবহার সীমিত।	৬। ইহার দাহিকা-শক্তি অধিক বলিয়া পরিবহন-শিল্পে অধিক আদৃত।	৬। পরিবহণ-শিল্পে ইহার ব্যবহার সীমিত।

কয়লা	খনিজ তেল	জলবিদ্যুৎ
৭। এই শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখা যায়।	৭। এই শক্তি সঞ্চয়-যোগ্য।	৭। জলশক্তি সঞ্চয়-যোগ্য নহে।
৮। ইউনিট প্রতি উৎপাদন-ব্যয় অধিক।	৮। ইউনিট প্রতি উৎপাদন-ব্যয় অধিক।	৮। ইউনিট প্রতি উৎপাদন-ব্যয় খুবই কম। এই কারণে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন-শিল্পে, কাষ্ঠ-শিল্পে, কৃত্রিম রেশম শিল্পে ইহার ব্যবহার সর্বাধিক।

[**প্রশ্ন :** (১) জলবিদ্যুৎ কিভাবে উৎপাদন করা হয়? (২) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর। (৩) পৃথিবীর প্রধান জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম উল্লেখ কর। (৪) শক্তির উৎস হিসাবে কয়লা, খনিজ তেল ও জলবিদ্যুতের তুলনামূলক আলোচনা কর। (৫) জলবিদ্যুৎ-শক্তির সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর।]

অনুশীলনী ১০

১। কয়লার প্রধান ব্যবহার কি কি? ইহার শ্রেণী বিভাগ কর ও ইহার মুখ্য উপজাত দ্রব্যের নাম কর।

[What are the principal uses of coal? Classify coal and name its principal by-products.]

২। কয়লার বিভিন্ন ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্যসমূহ কি কি? কয়লার পৃথিবী ব্যাপী বণ্টন ও উৎপাদনের বিস্তারিত বিবরণ দাও।

[What are the various uses and by-products of coal? Give a full account of the world distribution and production of coal.]

৩। কয়লার শ্রেণী বিভাগ কর। এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা অথবা দক্ষিণ গোলার্ধে কয়লার ভৌগোলিক বণ্টন আলোচনা কর।

[Classify coal. Give an account of the distribution of coal in Asia and North America or in the Southern Hemisphere.]

৪। খনিজ তেলের শিল্পগত ব্যবহার কি কি? পৃথিবীতে উহার ভৌগোলিক বণ্টনের বর্ণনা দাও।

[What are the industrial uses of mineral oil? Give an account of its geographical distribution in the world.]

(W. B. H. S. Council Spcimen Question. 1980)

৫। খনিজ তেলের বিভিন্ন ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্যের নাম লিখ। পৃথিবীর প্রধান খনিজ তেল উৎপাদক অঞ্চলগুলির বর্ণনা কর।

[Mention the various uses and by-products of Petroleum. Describe the principal petroleum producing areas of the world.]

(W. B. H. S. Council Spcimen Question, 1980)

৬। বর্তমান বিশ্বে খনিজ তেলের গুরুত্ব আলোচনা কর। মধ্য-প্রাচ্য ও উত্তর আমেরিকার অথবা এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার খনিজ তেলের বণ্টন আলোচনা কর।

[Discuss the importance of mineral oil in modern world. Discuss the distribution of mineral oil in the Middle-East and North America or in Asia and South America.]

৭। জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের উপযোগী অবস্থাগুলি আলোচনা কর। তাপবিদ্যুৎ শক্তির তুলনায় ইহার কি কি সুবিধা আছে ?

[Describe the conditions favourable for the generation of Hydel power. What are its advantages to thermal power ?] (W. B. H. S. Council Exam.. 1981)

৮। শক্তির উৎস কি কি? জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ বর্ণনা কর। কোন কোন বিষয়ে জলবিদ্যুৎ অন্যান্য শক্তিসম্পদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ?]

[What are the different sources of Power ? Describe the Geo-economic factors favourable to the generation of hydro-electricity. In what respects is hydro-electricity superior to other sources of power ?]

৯। বর্তমান পৃথিবীতে জলবিদ্যুতের গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ নির্দেশ কর। বিশ্বে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশসমূহের বিবরণ দাও।

[Indicate the causes of growing importance of hydel power in the present world. Give an account of the generation of hydel power in the world.]

১০। সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিবরণ দাও। মধ্য আফ্রিকার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়িয়া উঠে নাই কেন ?

[Give an account of the generation of hydel power in the USSR and the U. S. A. Why has not there developed important hydro-electric centres in Central Africa in spite of much favourable conditions prevailing over there ?]

১১ কৃষিকার্য ও কৃষিজ সম্পদ (Farming and Farm Resources)

কৃষিই সভ্যতার অগ্রদূত। মানব-সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতির ইতিহাসে কৃষিকার্যের আবিষ্কার নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মানুষের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রাথমিক চাহিদা পূরণে কৃষির দান অপরিসীম। প্রাকৃতিক নিয়ম লক্ষ্য করিয়া আদিম যাযাবর মানুষ একদিন জমিতে বীজ বপন করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে শিখিল। ধীরে ধীরে জমিকে আশ্রয় করিয়া মানুষ একই স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিল। পত্তন হইল গ্রাম-নগর, শহর-বন্দর, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজ্য-রাজনীতি ইত্যাদি যাহার ফল আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশ।

কৃষির সংজ্ঞা (Definition of Agriculture) : প্রাকৃতিক পরিবেশের সুযোগ-সুবিধাকে নিজ বুদ্ধিবলে কাজে লাগাইয়া মানুষ জমি হইতে চাষ আবাদের সাহায্যে ধান, গম, ইক্ষু, চা প্রভৃতি নানাবিধ ফসল উৎপাদন করিয়া থাকে। এক সময় জমি হইতে মানুষের ফসল উৎপাদনের বিবিধ কার্যক্রমকেই কৃষিকার্য বলা হইত। কিন্তু বর্তমানে কৃষিকার্য আর জমিতে চাষ-আবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত কৃষিকার্যের পরিধিও বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। Prof. E. W. Zimmerman-এর মতে "Agriculture covers those productive efforts by which man settled on the land, seeks to make use of and if possible accelerate and improve upon the natural genetic or growth processes of plant and animal life to the end that these processes will yield the vegetable and animal products needed or wanted by them." অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া মানুষ যখন জমিতে ফসল উৎপাদন, বন হইতে সম্পদ আহরণ, পশুপালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার সংস্থান করে তখন উৎপাদনমূলক ঐ সকল প্রাথমিক কার্যধারাকে কৃষিকার্য বলিয়া গণ্য করা যায়। কৃষির এই সংজ্ঞানুযায়ী কৃষি-কার্যের অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

(১) **শস্য চাষ (Crop farming)** : জমি চাষ-আবাদের সাহায্যে ধান, গম, যব, ভুট্টা, তুলা, ইক্ষু, চা, রবার ইত্যাদির উৎপাদন করা হয়। ইহাই প্রকৃত কৃষিকার্য।

(২) **পশু পালন (Stock rearing or farming)** : পার্বত্য অঞ্চলে বনভূমির সন্নিহিত অঞ্চলে বা তৃণাঞ্চলে অনেক স্থানে প্রাকৃতিক অবস্থা শস্য উৎপাদনের অনুকূল নহে। এই সকল স্থানে গরু, মহিষ, ভেড়া, শূকর প্রভৃতি পশুপালনের সাহায্যে মাংস, দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি—ঘি, মাখন, পনীর ইত্যাদি, পশু চামড়া, পশম প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী উৎপাদন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা চাষকার্যের অন্তর্গত না হইলেও অর্থনৈতিক ভূগোলে ইহাকে চাষকার্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৩) **মৎস্য চাষ (Fishing)**: নদী বা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে কৃষিকার্যের উপযুক্ত সুযোগের অভাবে সন্নিহিত জলভাগ হইতে মৎস্য আহরণ করা স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের প্রধান উপজীবিকা। ইহাকেও কৃষিকার্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৪) **বনজ সম্পদ আহরণ (Gathering forest resources)**: বনভূমি সৃজন, সংরক্ষণ ও বনাঞ্চল হইতে কাষ্ঠ, মধু, মোম, লাক্ষা, গদ, বাদাম, চিকল্, কর্ক ইত্যাদি আহরণও কৃষিকার্যের অন্তর্গত।

(৫) **মিশ্র কৃষি (Mixed farming)**: কোন কোন অঞ্চলে জলবায়ু ইত্যাদির কারণে সংবৎসর চাষাবাদ করা যায় না। অথবা চাষ-আবাদ সর্বদাই জীবিকা সত্তাভিত্তিক। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফসল উৎপাদনের সহিত অবশিষ্ট সময়ে কৃষক গরু, ভেড়া, শূকর ইত্যাদিও প্রতিপালন করিয়া থাকে। আংশিক কৃষিকার্যের সহিত আংশিক পশুপালন-ব্যবস্থার সংমিশ্রণকে মিশ্র কৃষি বলা হয়।

কৃষিকার্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristic features of agriculture). কৃষিকার্য ভূমিনির্ভর হওয়ায় ইহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়—

(১) কৃষিকার্যের প্রয়োজনে কৃষককে কৃষিক্ষেত্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে হয়। (২) একই জমিতে বারবার চাষ-আবাদ করিতে হয়। (৩) কৃষিকার্য মূলত প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কৃষিকার্যে প্রকৃতির ভূমিকাই মুখ্য। মৃত্তিকা, উত্তাপ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানগুলিই কৃষির প্রাণ। ইহাদের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা কার্যকর নহে। কৃষিকার্যে মানুষের ভূমিকা গৌণ। প্রকৃতির সহায়তায় মানুষ জমি হইতে চাষ আবাদের সাহায্যে ফসল উৎপাদন করে। (৪) কৃষিজ সম্পদ প্রবহমান সম্পদের পর্যায়ভুক্ত। চাষ-আবাদের সাহায্যে বার বার যেমন ফসল উৎপাদন সম্ভব তেমনি কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে হেক্টর প্রতি কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি করা সম্ভব। (৫) কৃষিকার্য কোন দেশের কোন অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু প্রতিকূল না হইলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত কৃষিকার্য করা সম্ভব। (৬) কৃষিজাত দ্রব্যাদি মানুষের খাদ্য, পানীয় ও শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও খাদ্য ও পানীয় হিসাবেই ইহার উৎপাদন সর্বাধিক। (৭) কৃষিক্ষেত্রে অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Return) কার্যকর হয় এবং ইহার ফলে উৎপাদন হার হ্রাস পায়। অবশ্য কৃষিপদ্ধতি পরিবর্তন, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, শস্যাবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে সাময়িকভাবে উৎপাদনহ্রাস রোধ করা যায়।

কৃষি ও ইহার উপাদান (Agriculture and its supporting factors)—পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কম বেশি কৃষিকার্যের অনুশীলন হইয়া থাকে। আধুনিক বিশ্বে শিল্প-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও কৃষিই মানুষের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা এবং কৃষি সকল দেশেরই জাতীয় আয়ের একটি অন্যতম প্রধান উৎস। প্রকৃতির উপাদান সমূহের উপর কৃষিকার্য বহুলাংশে নির্ভর করে। এই কারণে ভূপৃষ্ঠের মোট জমির বা স্থলভাগের সামান্য অংশেই কৃষিকার্য হইয়া

থাকে। বর্তমানে ভূপৃষ্ঠে মোট জমির পরিমাণ প্রায় ১৪৬০ কোটি হেক্টর বা প্রায় ৩৬০০ কোটি একর এবং ইহার শতকরা মাত্র ৮ ভাগ জমি কৃষিকার্যের উপযুক্ত। এই স্বল্প কৃষি জমির আবার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত, চীন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, ব্রেজিল, মেক্সিকো প্রভৃতি ১৫টি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত খাদ্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। সুতরাং কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও অব্যাহত। Prof. O. E Baker এবং অন্যান্য ভূগোলবিদের মতে পৃথিবীর মোট জমির শতকরা প্রায় ৪১ ভাগ কৃষির উপযোগী করা সম্ভব। বর্তমানে কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মেরু সন্নিহিত অঞ্চলে, বৃষ্টিবিহীন মরুপ্রায় অঞ্চলে, তৃণাঞ্চলে এবং পর্বতের ঢালেও চাষ-আবাদের প্রসার ঘটিতেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার কোলা উপদ্বীপে, স্টেপ অঞ্চলে, ভারতের রাজস্থানের সুরতগড়ে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তীয় মরুপ্রায় অঞ্চলে চাষের প্রচলন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কৃষিকার্য ও কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন **প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক** উপাদানসমূহের দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের মধ্যে (১) উত্তাপ, (২) আর্দ্রতা অর্থাৎ বৃষ্টিপাত ও জলসেচ, (৩) ভূ-প্রকৃতি, এবং (৪) মৃত্তিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত কৃষিকার্য এই চারটি উপাদানের দ্বারাই সর্বাধিক নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কারণে ইহাদিগকে **কৃষির চারিটি নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক উপাদান**' (Four physical frontiers of agriculture) বলা হয়। মানবিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য :—(১) কৃষকের জ্ঞান— অভিজ্ঞতা ও কর্মক্ষমতা, (২) মূলধন, (৩) কৃষিজ পণ্যের চাহিদা—কৃষিজ দ্রব্য ব্যবহারকারী শিল্পকারখানা (৪) পরিবহণ ব্যবস্থা ও (৫) সরকারী নীতি।

(১) **উত্তাপ (Temperature) :** উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের জন্ম ও বৃদ্ধির পক্ষে উত্তাপ অপরিহার্য। স্বাভাবিক চাষ-আবাদের পক্ষে ন্যূনপক্ষে প্রায় ৬° সে. উত্তাপের প্রয়োজন। ইহা হইতে কম উত্তাপ উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর। আবার অতি উচ্চ তাপও উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর। নিম্নতাপে যেমন জল বরফে পরিণত হয়, উচ্চ তাপেও তেমনি জল বাষ্পে পরিণত হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধির পক্ষে ইহা স্বাভাবিক নহে। বিভিন্ন প্রকার ফসলের জন্য বিভিন্ন মাত্রার উত্তাপ প্রয়োজন। যেমন, ধান চাষের জন্য প্রায় ২৭° হইতে ৩০° সে উত্তাপ দরকার হয় কিন্তু গম চাষের জন্য ১৪° হইতে ১৬° সে উত্তাপই যথেষ্ট। আবার পাট চাষের জন্য প্রায় ৩৫° সে উত্তাপ উপযোগী। তাপমাত্রার প্রতিকূলতার জন্যই মেরু অঞ্চলে ও মরু অঞ্চলে কৃষিকার্য সম্ভব নহে।

(২) **বৃষ্টিপাত ও জলসেচ (Rainfall and Irrigation) :** সকল কৃষিকার্যের পক্ষে বৃষ্টিপাত অত্যাবশ্যক। অতিরিক্ত বাষ্পীভবনের ফলে যে সকল স্থানে মাটির রস শুকাইয়া যায় সেই সকল স্থানে কৃষিকার্যের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। আবার যেই সকল স্থানে বাষ্পীভবন কম হয় সেই সকল স্থানে স্বল্প বৃষ্টিপাতেই

কৃষিকার্য করা সম্ভব। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি উভয়ই কৃষির পক্ষে ক্ষতিকর। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃষ্টিপাতই কৃষির পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী। কৃষিজ দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ বৃষ্টিপাতের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, যেমন—ধানের পক্ষে প্রায় ১০০ সে মি. হইতে ২০০ সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হইলেও গমের পক্ষে ৭৫ সে.মি. হইতে ১০০ সে.মি. বৃষ্টিপাতই পর্যাপ্ত।

বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ও তারতম্যের জন্য প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন দেশে জলসেচের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ইঁদারা, কূপ, পুষ্করিণী খনন করিয়া ডোঙ্গা বা চাকার সাহায্যে মিশরে ও ভারতে জলসেচের পদ্ধতি বহু পুরাতন।

বর্তমানকালে ভূগর্ভে সঞ্চিত জল ডিজেল বা বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে উত্তোলন করিয়া কৃষিক্ষেত্রে দেওয়া হয়। আবার নদীতে বিরাট বাঁধ বাঁধিয়া ও সেচখাল খনন করিয়া নদীর জলকে কৃষিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয়। ইহার ফলে নদীর প্লাবনরোধের সহিত সেচকার্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ ইত্যাদিরও সুবিধা হয়। ভারত, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, জাপান প্রভৃতি দেশে সাম্প্রতিককালে সেচব্যবস্থার বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছে। পৃথিবীর কৃষি-নির্ভর প্রায় সকল দেশেই বর্তমান শতাব্দীতে সেচব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে।

(৩) ভূ-প্রকৃতি (Topography) ; ভূ-পৃষ্ঠের স্থানে স্থানে পর্বত, মালভূমি ও সমভূমি দেখা যায়। কৃষিকার্যের পক্ষে সমভূমিই সর্বাধিক উপযোগী। এই সকল স্থানে কৃষিকার্য সহজ ও সুলভ, জলসেচ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারও সহজসাধ্য। মালভূমি অঞ্চলে ভূমি অনেক ক্ষেত্রেই ঢেউ খেলান অবস্থায় থাকে। এই কারণে কৃষিকার্য সমতল ভূমির তুলনায় আয়াসসাধ্য ও ব্যয়বহুল। পার্বত্য অঞ্চলে সমতল বা প্রায় সমতল ভূমির অভাব। মাঝে মাঝে উপত্যকা দেখা যায়। কিন্তু ঐ সকল স্থানেও সর্বত্র চাষবাসের উপযোগী ভূমির অভাব। একমাত্র পর্বতের ঢালে বিচ্ছিন্ন-ভাবে স্থানে স্থানে চাষবাসের সুযোগ মিলে। উহা যেমন শ্রমসাধ্য তেমনি ব্যয়বহুল। এই সকল কারণে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কৃষিক্ষেত্রগুলি সমভূমিতেই গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৪) মৃত্তিকা (Soil) : কৃষির অন্তর্গত চাষ-আবাদের পক্ষে মৃত্তিকা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান। উর্বরতা শক্তিই মৃত্তিকার প্রাণ। মাটিকে আশ্রয় করিয়াই বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং মাটি হইতে খাদ্যরস সংগ্রহ করিয়া সকল উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিকার গঠনবৈশিষ্ট্যের উপর মৃত্তিকার গুণাগুণ ও উর্বরতা নির্ভর করে। মৃত্তিকার রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী নানা ধরনের মৃত্তিকায় নানা প্রকার ফসল উৎপন্ন হয়। উর্বরতার তারতম্যের জন্য সাধারণ ফসলের তারতম্য ঘটে। অনুর্বর মৃত্তিকা সার প্রয়োগে উর্বর হইয়া উঠে এবং অধিক ফসল উৎপাদনে সমর্থ হয়। পৃথিবীর নানাস্থানে নানাধরনের মৃত্তিকা দেখা যায়। মৃত্তিকার রাসায়নিক গঠন, দানার গঠন এবং জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের ভিত্তিতে ইহাকে নিম্নলিখিত নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

(ক) রাসায়নিক গঠনের ভিত্তিতে—(১) পেডালফার মৃত্তিকা—লৌহ ও অ্যালু-

মিনিয়ম মিশ্রিত মৃত্তিকা, ইহা তেমন উর্বর নহে। (২) পেডোক্যাল মৃত্তিকা—অধিক চুন ও স্বল্প লবণযুক্ত মৃত্তিকা, জলসেচের সাহায্যে উত্তম কৃষিকার্য সম্ভব।

(খ) জলবায়ু ও উদ্ভিজ্জের ভিত্তিতে—(১) পডসল মৃত্তিকা—সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনাঞ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা অম্লধর্মী ও অনুর্বর। (২) তুন্দ্রা মৃত্তিকা—অনুর্বর ধূসর বাদামী এই মৃত্তিকা উচ্চ অক্ষাংশে দেখা যায়। (৩) ল্যাটেরাইট-মৃত্তিকা—ইহার জলধারণ ক্ষমতা নাই। ইহাকে অনুর্বর শোষিত (beached) মৃত্তিকাও বলা যায়। ইহাতে সার মাটির পরিমাণ কম। (৪) প্রেইরি মৃত্তিকা—স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত দীর্ঘ তৃণাঞ্চলে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা বেশ উর্বর। (৫) সারনোজেম—ইহাতে সার মৃত্তিকা বেশি থাকে বলিয়া খুব উর্বর। নাতিশীতোষ্ণ তৃণাঞ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকা বেশি থাকে বলিয়া খুব উর্বর। নাতিশীতোষ্ণ তৃণাঞ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। (৬) চেস্টনাট ও বাদামী মৃত্তিকা—গাঢ় বাদামী এই মৃত্তিকা উর্বর। (৭) শিয়ারোজেম ও মরু মৃত্তিকা—সামান্য সারমাটি, চূর্ণ ও জৈব পদার্থমিশ্রিত এই মৃত্তিকার উর্বরতা মধ্যমপ্রকার। জলসেচ ছাড়া ইহাতে কৃষিকার্য করা সম্ভব নহে।

(গ) দানার ভিত্তিতে মৃত্তিকাকে পাথুরে, কংকরময়, বেলে, দোঁয়াশ, কাদা ও পলি এই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

অন্যান্য উপাদান :—(১) **কৃষক**—কৃষিকার্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কৃষকদিগের কৃষি-বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর কৃষির সাফল্য সর্বাধিক নির্ভর করে। কৃষির সময়, পদ্ধতি, ফসলের প্রকারভেদ ইত্যাদির সুষ্ঠু নির্বাচন ও প্রয়োগ কৃষকের উপরই নির্ভর করে।

(২) **জনসংখ্যা ও শ্রমিকের যোগান** : কৃষিতে ভূমিকর্ষণ, বীজবপন ইত্যাদি কার্যে বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং জনসংখ্যা কৃষিকার্যে নিয়োজিত শ্রমিকের ও কৃষিপণ্যের চাহিদার দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৩) **মূলধন** : উন্নত কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য, বিশেষ করিয়া যন্ত্রপাতি, উন্নত বীজ, সার ইত্যাদি ব্যবহারে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। অনেকাংশেই ইহা কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

(৪) **কৃষিপণ্যের চাহিদা** : জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত কৃষিপণ্যের চাহিদার বিষয়টি যুক্ত। অতএব আভ্যন্তরীণ চাহিদাই প্রধানত কৃষিকার্যের ব্যাপক প্রসারের জন্য দায়ী।

(৫) **কৃষিজ পণ্যনির্ভর শিল্পের প্রসার ও যোগাযোগব্যবস্থা** : কৃষিজ পণ্যনির্ভর শিল্প—যেমন, বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প, শর্করাশিল্প ইত্যাদির প্রসার ও উন্নতি দেশের মধ্যে তুলা, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের প্রেরণা যোগায়। এই সকল ক্ষেত্রে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজ সুযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ছাড়া শিল্পক্ষেত্রের সহিত কাঁচামাল ও বাজারের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে না।

কৃষিকার্যে প্রকৃতির প্রভাব ও মানুষের প্রচেষ্টা (Influence of nature on agriculture and man's efforts): কৃষিকার্যের উপর প্রকৃতির প্রভাব সর্বাধিক। কৃষির মুখ্য উপাদানসমূহ যেমন মৃত্তিকা, উত্তাপ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি প্রকৃতির দান। ফলে কৃষিকার্য একান্তভাবেই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এবং প্রকৃতির উপর এই নির্ভরশীলতা কৃষির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির খেয়ালিপনার শেষ নাই। একই সময়ে দেশের কোন অংশে খরা এবং কোন অংশে প্লাবন কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। দেশের প্রায় সর্বত্র নির্দিষ্ট সময়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হওয়া বরং নিয়মের ব্যতিক্রম। সূর্যের উত্তাপের অস্বাভাবিক তারতম্যের জন্য স্থানে স্থানে শীত-গ্রীষ্মের তীব্রতা ও ব্যাপকতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। ইহাতে মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তিরও পরিবর্তন ঘটে এবং নানাবিধ কৃষিজ ও বনজ সামগ্রীর উৎপাদন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্ম, বৃদ্ধি ও ইহা হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন বহুলাংশেই প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের উপর নির্ভর করে বলিয়া ইহাদের আনুকূল্য ব্যতিরেকে সুষ্ঠু ও সফল কৃষি প্রায় সম্ভব নহে। অথচ প্রকৃতির এই সকল উপাদানের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা আদৌ নাই। নির্দিষ্ট সময়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটানো বা অসময়ের বৃষ্টিপাত রোধ করা ইত্যাদি মানুষের নিকট আজিও দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

কিন্তু আধুনিক মানুষ সব কিছুই প্রকৃতির উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে নারাজ। তাহার প্রচেষ্টার বিরাম নাই। কৃষিকার্যের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রকৃতির প্রভাব হ্রাস করিয়া কৃষিব্যবস্থাকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অন্তর্গত করিতে মানুষের উদ্যম প্রশংসনীয়। বর্তমান যুগে বৃষ্টির অভাব মানুষ সেচের সাহায্যে পূরণ করিতেছে। অতিবৃষ্টিজনিত প্লাবন রোধে মানুষ নদীসমূহে বাঁধ দিয়া জলাধার নির্মাণ করিতেছে ও সেচ-খালের সাহায্যে ঐ জল বিভিন্ন কৃষিক্ষেত্রে পৌঁছাইয়া দিতেছে। ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন ফসলের উপযোগী মৃত্তিকার সন্ধান পাইয়াছে এবং নানাবিধ জৈবিক ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাধ্যমে জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির কৌশলও মানুষ আয়ত্ত করিয়াছে। পূর্বে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য গোবর, খইল, মিশ্রসার, পক্ষিবিষ্ঠা, মানুষের বিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত। বর্তমান যুগে সোডিয়াম নাইট্রেট বা চিলি সল্ট পিটার, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম সাইনামাইড, ইউরিয়া, সুপার ফসফেট প্রভৃতি রাসায়নিক সারের ব্যাপক প্রয়োগ হইতেছে। আবহাওয়াজনিত বাধা দূর করিতে মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে দ্রুতফলনশীল বীজ ও কীটনাশক ঔষধপত্রের ব্যবহার, নানাবিধ রাসায়নিক সারের প্রয়োগ ইত্যাদি। কৃষিব্যবস্থায় প্রকৃতির প্রভাব হ্রাসে মানুষের এই সকল প্রচেষ্টা তাহার সক্রিয় ভূমিকার ইঙ্গিত বহন করে।

কৃষিকার্যের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের নিয়ন্ত্রণ শুধু কল্যাণকরই হয় নাই, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা মানুষের অকল্যাণও ডাকিয়া আনিয়াছে। মানুষের অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতার ফলে অনেক নদী কালক্রমে স্রোত হারাইয়া সুজলা-সুফলা

শস্যক্ষেত্রকে উষর মরু প্রান্তরে পরিণত করিয়াছে। নদীর জল দূষিত হইয়া মৎস্যকুলের ধ্বংস সাধন করিয়াছে। ভূমিক্ষয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আশার কথা, সাম্প্রতিককালের মানুষ এই সকল বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হইয়াছে এবং ভূমিক্ষয় নিবারণ, নদী নিয়ন্ত্রণ, সেচের প্রসার, বনভূমি সংরক্ষণ, পশু পালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে।

[**প্রশ্ন :** (১) অধ্যাপক জিম্মারম্যানপ্রদত্ত কৃষির সংজ্ঞাটি নিজ ভাষায় ব্যক্ত কর। (২) কৃষিকার্যের বৈশিষ্ট্য কি কি? (৩) কৃষির নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক উপাদানগুলি কি কি? (৪) পেডালফার ও পেডোক্যাল মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (৫) চার শ্রেণীর উর্বর মৃত্তিকার নাম লিখ। (৬) স্বাভাবিক চাষ-আবাদের জন্য কত ডিগ্রী তাপমাত্রা প্রয়োজন? (৭) কৃষিকার্যকে প্রাকৃতিক প্রভাব মুক্ত করায় মানুষের প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।]

কৃষি-প্রণালী (Types of Farming)

কৃষিকার্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্ব সর্বাধিক সন্দেহ নাই। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত মানুষের সাংস্কৃতিক পরিবেশের রূপান্তর ঘটিতেছে। ফলে উভয় প্রকার পরিবেশের প্রভাবে দেশে দেশে কৃষি ব্যবস্থায় বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কোথাও কৃষি ব্যবস্থা খুবই উন্নত এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত। আবার কোথাও কৃষিব্যবস্থা সেই আদিম পদ্ধতি-নির্ভর, ফলে সম্পূর্ণরূপে জীবিকা সত্তাভিত্তিক। কৃষি-উপাদানসমূহের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উন্নতির স্তরভেদে কৃষিব্যবস্থার বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। এই বিভিন্নতা প্রধানত নির্ভর করে চারিটি বিষয়ের উপর, (ক) কৃষি জমির আয়তন, (খ) কৃষির উদ্দেশ্য, (গ) জলবায়ু ও (ঘ) ফসলের সংখ্যা অর্থাৎ একই জমিতে বৎসরে কতবার ফসল তোলা হয়। নিচে বিভিন্ন প্রকার কৃষি-প্রণালীর শ্রেণীবিভাগ দেখাইয়া উহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইল :

কৃষি প্রণালীর শ্রেণীবিভাগ

- কৃষিজমির আয়তনভিত্তিক
  - প্রগাঢ় কৃষি
  - ব্যাপক কৃষি
- কৃষির উদ্দেশ্য ভিত্তিক
  - স্বয়ং সম্পূর্ণ কৃষি
  - বাণিজ্যিক কৃষি
  - আবাদী কৃষি
- জলবায়ু ভিত্তিক
  - আর্দ্র কৃষি
  - সেচন কৃষি
  - শুষ্ক কৃষি
  - মিশ্র কৃষি
- ফসলের সংখ্যা ভিত্তিক
  - এক ফসলী
  - দুই ফসলী
  - বহু ফসলী

জমির আয়তনভিত্তিক কৃষি-ব্যবস্থা : সামগ্রিকভাবে কৃষি-জমির আয়তন সীমাবদ্ধ। কিন্তু দেশে দেশে জনসংখ্যার চাপের তারতম্য অনুসারে মোট কৃষি জমির যোগান কম বেশী হইয়া থাকে। এই কারণে কৃষি-জমির যোগানের ভিত্তিতে

পরিচালিত কৃষি-ব্যবস্থাকে প্রগাঢ় চাষ ও ব্যাপক চাষ—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রগাঢ় চাষ (Intensive Agriculture)

পৃথিবীর শিল্পোন্নত বহু দেশে কৃষি জমির পরিমাণ লোকসংখ্যার অনুপাতে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই কারণে অধিক উৎপাদনের জন্য স্বল্প জমিতে কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার, ব্যাপক সেচের প্রসার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শস্যাবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে যে কৃষি-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাহাকে প্রগাঢ় চাষ বা নিবিড় চাষ পদ্ধতি বলা হয়। বৃটিশ যুক্তরাজ্য, হল্যাণ্ড, জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে এই প্রকার কৃষি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়ায় হেক্টর প্রতি উৎপাদন বেশী হয়।

ব্যাপক কৃষি (Extensive Agriculture)

যে-সকল দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষি-জমির পরিমাণ বেশী অর্থাৎ মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ অধিক সেই সকল দেশে স্বল্প মূলধন নিয়োগ করিয়া হাল্কা চাষের সাহায্যে প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদন করা হয়। এই প্রকার কৃষি-ব্যবস্থাকে ব্যাপক কৃষি বলা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা ও ব্রেজিলে এই প্রকার কৃষির প্রচলন আছে।

উদ্দেশ্যভিত্তিক কৃষি-ব্যবস্থা: কৃষির মৌল ও মুখ্য উদ্দেশ্য উৎপাদিত শস্যদ্বারা মানুষের নানাবিধ অভাব মেটানো। উৎপাদনের পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। কৃষিকার্য পরিচালনার বাস্তব অবস্থা ও উদ্দেশ্যের উপর উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে। সুতরাং উদ্দেশ্যভিত্তিক কৃষিকার্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) **স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি বা জীবিকা-সত্তাভিত্তিক কৃষি (Subsistence or Self-sufficient Agriculture)**: পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে কোন প্রকারে শুধু জীবনযাপনের উপযোগী শস্য উৎপাদনের নিমিত্ত চাষ আবাদ হইয়া থাকে। এই প্রকার কৃষি-ব্যবস্থাকে জীবিকা-সত্তাভিত্তিক চাষ বলে। ইহার মূলে রহিয়াছে নানারূপ প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধা। অনেক স্থানে পার্বত্য অঞ্চলে ও মরুপ্রায় অঞ্চলে এই প্রকার কৃষি-ব্যবস্থা দেখা যায়। বহির্জগতের সহিত যোগাযোগের অসুবিধা লোকসংখ্যার তুলনায় কৃষি-জমির স্বল্পতার ফলেও জীবিকা-সত্তাভিত্তিক কৃষিকার্যের উদ্ভব হয়। আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীতীরবর্তী অঞ্চল, ভারতের পার্বত্য অঞ্চল, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, মালয়েশিয়ার অরণ্যাঞ্চল ও মধ্য এশিয়ার মরুপ্রায় অঞ্চল বিশেষে আজিও জীবিকা-সত্তাভিত্তিক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ধানচাষকে বিশেষ করিয়া এই প্রকার কৃষির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শিল্পযুগ মানুষের সমাজে যেই সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও নব-চেতনার উন্মেষ ঘটাইয়াছে এই সকল স্থানে উহার বিন্দুমাত্র

প্রভাবও পড়ে নাই। ফলে এই অঞ্চলে জীবনধারা ও কৃষি-পদ্ধতি সেই পুরানো পথে একই ছন্দে আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

বাণিজ্যক কৃষি (Commercial Agriculture) : ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ উৎপাদিত কৃষিপণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করিয়া অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কৃষি-ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক কৃষি বলা হয়। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত কৃষিপণ্যকে এই কারণে অর্থকরী ফসল বা বাণিজ্যিক শস্য বলা হয়। ক্যানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি অঞ্চলে গমচাষ বাণিজ্যিক কৃষি-ভিত্তিতে হইয়া থাকে। অনুকূল জলবায়ু, মৃত্তিকা, প্রচুর মূলধন ও আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রে প্রচুর চাহিদা এই প্রকার কৃষি-ব্যবস্থার সহায়ক।

বাগিচা কৃষি বা আবাদী কৃষি (Plantation Farming) : জলবায়ু ও মৃত্তিকার আনুকূল্যে কোন একটি স্থানে একটিমাত্র ফসল যখন বৈজ্ঞানিক প্রথায় বিশেষ সাফল্যের সহিত চাষ করা হয় তখন এই প্রকার কৃষি-ব্যবস্থাকে আবাদী কৃষি-ব্যবস্থা বলে। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া ইউরোপীয় বণিকগণ সর্বপ্রথম এই প্রকার কৃষি-ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ক্রমে ক্রমে এই কৃষি-বিভাগে একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি হয় বিদেশী মূলধনকে আশ্রয় করিয়া। এই প্রকার কৃষি-ব্যবস্থার সাফল্য বৈদেশিক রপ্তানী বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। ভারত ও শ্রী লঙ্কার চায়ের আবাদ, ব্রেজিল-অ্যাঙ্গোলার কফির আবাদ, মালয়েশিয়ার রবারের আবাদ, জাভা-কিউবার ইক্ষুর আবাদ এই প্রকার আবাদী কৃষির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

জলবায়ুভিত্তিক কৃষি : কৃষিকার্যে বৃষ্টিপাত ও উত্তাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার কৃষি-পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

আর্দ্র কৃষি (Humid Farming) : যেই সকল অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ন্যূনপক্ষে প্রায় 200 সে. মি. এবং কৃষিক্ষেত্র বর্ষাকালে ডুবিয়া যায় ঐ সকল স্থানের স্বাভাবিক কৃষি-পদ্ধতিকে আর্দ্র কৃষি বলা হয়। এই সকল স্থানে জলসেচের কোন প্রয়োজন হয় না। ভারতের মালাবার উপকূলে, সুন্দরবন অঞ্চলে, পূর্ব-হিমালয়ের পাদদেশে, বাংলাদেশের নিম্নাংশে, শ্রী লঙ্কা প্রভৃতি স্থানের কৃষি ব্যবস্থা আর্দ্র কৃষির অন্তর্গত।

সেচন কৃষি (Irrigation Farming) : বিশ্বের যে-সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঋতু বিশেষে হয় বা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম ঐ সকল স্থানে কৃষি কর্মের প্রয়োজনে নদীতে বাঁধ বাধিয়া মাটি কাটিয়া বা ভূগর্ভ হইতে পাম্পের সাহায্যে জল তুলিয়া কৃষিক্ষেত্রে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এই প্রকার জল-সেচন দ্বারা কৃষিকার্য পরিচালনাকে সেচন কৃষি বলা হয়। ভারতের দামোদর উপত্যকা, শতদ্রু উপত্যকা, চীনের সিকিয়াং অববাহিকা, আমেরিকার টেনেসি

উপত্যকা প্রভৃতি অঞ্চলে সেচন কৃষি অর্থাৎ জলসেচের সাহায্যেই প্রধানত কৃষিকার্য পরিচালিত হয়।

শুষ্ক কৃষি (Dry Farming): যে-সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনূ্যন ৫০ সে মি. এবং জলসেচের কোন সুবিধা নাই ঐ সকল অঞ্চলে কৃষিকার্যের প্রয়োজনে মাটিকে প্রথমে গভীরভাবে চাষ করিয়া ও গুঁড়া করিয়া রাখা হয়। পরে বৃষ্টিপাতের পূর্বে বীজ ছড়াইয়া লাঙ্গলের সাহায্যে মাঠে গভীর লাইনের সৃষ্টি করা হয়। বৃষ্টিপাতের ফলে যখন সকল লাইনে জল জমা হয় তখন উহা মাটির সাহায্যে ঢাকিয়া দেওয়া হয়। ফলে সূর্যতাপে জলের বাষ্পীভবন সামান্যই হয়। বরং ঐ জল কৃষিক্ষেত্রে শুষিয়া যায় ও ফসল উৎপাদনে সাহায্য করে। শুষ্ক অঞ্চলের সামান্য বৃষ্টিপাতকে কাজে লাগাইয়া কৃষিকার্য করাকে শুষ্ক কৃষি বলে। পৃথিবীর মরুপ্রায় অঞ্চলসমূহে এই প্রকার কৃষিকার্য করা হয়।

মিশ্র কৃষি (Mixed Farming): বিশ্বের স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বা ঋতুগত বৃষ্টিপাত অঞ্চলে জলবায়ু-জনিত বাধার জন্য সারা বৎসর একটানা কৃষিকার্য করা সম্ভব হয় না। এই কারণে কৃষিকার্যের সহিত নানাজাতীয় পশু-পালন করা হয়। এই প্রকার আংশিক কৃষির সহিত পশু-পালনকে মিশ্র কৃষি বলা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে সফল মিশ্র কৃষি পরিলক্ষিত হয়। গম, যব, ভুট্টা, নানাজাতীয় ফল ইত্যাদির চাষের সহিত ভেড়া, শূকর ও গো-মহিষাদি প্রতিপালন করা হয়।

ফসলের সংখ্যাভিত্তিক কৃষি (Turnover of Crops Basis): কৃষি-কার্যের উদ্ভবের গোড়ার দিকে একসময় একটি নির্দিষ্ট কৃষিজমিতে বৎসরে মাত্র একবারই চাষ আবাদ করা হইত। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষি-জমির সীমাবদ্ধতার ফলে একই জমিতে বার বার ফসল ফলানোর বাস্তব প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। ভৌগোলিক ও অন্যান্য পরিবেশের আনুকূল্যে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার জমিতে বৎসরে একাধিকবার ফসল উৎপাদন করা হয়। ফসলের সংখ্যা অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত তিন প্রকার কৃষি-পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়।

এক-ফসলী কৃষি (One-Crop Agriculture): একটি নির্দিষ্ট কৃষিক্ষেত্র হইতে বৎসরে একটি ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত যে চাষ করা হয় তাহাকে এক-ফসলী কৃষি পদ্ধতি বলা হয়। ভারতের চা. কিউবার ইক্ষু, মালয়েশিয়ার রবার উৎপাদন ইহার উদাহরণ। ভারতে ও চীনে বহু অঞ্চলে জলবায়ুর প্রতিকূলতার জন্য বৎসরে একবারের বেশি ধান, গম বা অন্য কোন ফসল উৎপাদিত হয় না। ইহাকেও এক-ফসলী কৃষি-পদ্ধতি বলা হয়।

দুই-ফসলী কৃষি (Double-Crop Agriculture): একই জমিতে বৎসরে যখন দুইবার ফসল উৎপাদন করা যায় তখন উহাকে দুই-ফসলী কৃষিপদ্ধতি বলে। ভারত, চীন, জাপান, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে একই জমিতে দুই-ফসলী

কৃষি-প্রথায় বৎসরে একবার ধান ও আর একবার গম বা অন্য কোন রবিশস্যের চাষ করা হয়।

বহু-ফসলী কৃষি (Multi-Crop Agriculture) : ইহা এক প্রকার উন্নত প্রগাঢ় কৃষি ব্যবস্থা। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিয়মিত সার, সেচ শস্যাবর্তন ও দ্রুত ফলনশীল বীজ প্রয়োগের ফলে একই জমিতে দুই-এর অধিকবার ফসল উৎপাদন করা হয়। জাপানে বৎসরে ৩-৪ বার তাইচুং ধানের চাষ বহু-ফসলী কৃষি-ব্যবস্থার নিদর্শন। বর্তমানে ভারত, চীন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে বহু-ফসলী কৃষি-ব্যবস্থার প্রসার ঘটিতেছে।

ফসলের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Crops)

(১) খাদ্য শস্য

(ক) ভক্ষ্য শস্য (Cereals)	(খ) পানীয় ও ভেষজ (Beverages and drugs)	(গ) ফল (Fruits)	(ঘ) অন্যান্য খাদ্যশস্য (Other Edible crop)
ধান, গম, যব, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি।	চা, কফি, কোকো, তামাক, আফিং, সিঙ্কোনা ইত্যাদি।	কলা, আনারস, আম, আঙ্গুর, পীচ ইত্যাদি।	ইক্ষু, মসলা, সুপারি ইত্যাদি।

(২) শিল্প শস্য

(ক) তন্তুময় ফসল (Fibre crops)	(খ) তৈলবীজ (Oil seeds)	(গ) ঘাসজাতীয় ফসল (Grass)	(ঘ) অন্যান্য ফসল (Other crops)
পাট, তূলা, সিসল, শণ ইত্যাদি।	তিল, তিসি, সরিষা, ইত্যাদি।	বাঁশ, বেত, সাবাই, আলফা ইত্যাদি।	রবার, তুঁতে ইত্যাদি।

ধান (Rice)

ধান হইতে উৎপন্ন চাউল পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোকের প্রধান খাদ্য। ধান ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল হইলেও ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলই ধান উৎপাদনের আদর্শ ক্ষেত্র। ধানের চাষ সর্বপ্রথম শুরু হয় সম্ভবত প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে ভারত ও চীনের সীমান্তবর্তী কোন অঞ্চলে। ভারতে আর্যদের অনুপ্রবেশের পূর্বেও স্থানীয় অধিবাসীরা ধানের উৎপাদন ও ব্যবহার জানিত। ভারত ও চীন ছাড়া মিশরেও যে অতি প্রাচীনকালে ধানের চাষ করা হইত ইহার প্রভূত প্রমাণ বিদ্যমান।

ধানের ব্যবহার (Uses of Rice) : ধানের খোসা ছাড়াইয়া প্রথমে চাউল বাহির করা হয় ও পরে চাউল সিদ্ধ করিলে ভাত হয়। চাউল হইতে নানাবিধ সুস্বাদু পিঠা, মিষ্টান্ন, কাপড় ধোলাইয়ের কাজে ব্যবহৃত শ্বেতসার (starch) ও দেশী মদ্য (liquor) প্রস্তুত করা হয়। চীন ও জাপানে ইহা হইতে নানাবিধ মাদক-পানীয়

তৈয়ারি করা হয়। ইহা ছাড়া ধান হইতে হাল্কা খাবার হিসাবে খৈ, চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, ছাতু এবং ধানের খড়ের সাহায্যে তৈয়ার হয় কুঁড়েঘরের ছাউনি। গদি, টুপি, চট, দড়ি ইত্যাদিও তৈয়ারি করা হয়। সিমেণ্টের সহিত ধানের তুষ মিশাইয়া শব্দ-নিরোধক দেওয়াল নির্মাণ করা হয়। তুষের সাহায্যে গ্রামের মানুষেরা আগুন জ্বালাইয়া রাখে। ধানের ও চাউলের কুড়া অতি উত্তম পশুখাদ্য।

ধানের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Rice) : উৎপাদনের স্থান, গুণাগুণ, পরিমাণ ইত্যাদির বিচারে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নানা জাতীয় ধান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই শ্রেণী বিভাগের প্রধান নিরীখ। ধানকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় (ক) জাপোনিকা (Japonica) ও (খ) ইণ্ডিকা (Indica)। জাপোনিকা জাতীয় ধান প্রধানত উচ্চ-অক্ষাংশে স্বল্প-বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে জন্মে। ইণ্ডিকা জাতীয় ধান নিম্ন-অক্ষাংশের বৃষ্টিবহুল অঞ্চলেই দেখা যায়। সেচ ও সার প্রয়োগে ইণ্ডিকা ধানের তুলনায় জাপোনিকা ধানের উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ধানকে আবার পার্বত্য বা উচ্চভূমির ধান (Hill Rice) এবং নিম্নভূমির বা জলাভূমির ধান (Swamp Rice)—এই দুই শ্রেণীতেও ভাগ করা যায়। উচ্চভূমির ধান উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত স্বল্প বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। হেক্টর প্রতি ইহার উৎপাদন কম। নিম্নভূমির ধান উৎপাদনে প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। ইহার উৎপাদনও যথেষ্ট বেশি হয়। এইজন্য বিশ্বের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ধানের চাষ নিম্নভূমি অঞ্চলেই হইয়া থাকে। উৎপাদনের—কাল অনুযায়ী ধানকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সাধারণত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতে ইহা পরিলক্ষিত হয়। (ক) আমন ধান—বর্ষা কালে রোপণ পদ্ধতিতে লাগান হয় এবং শীত কালে ফসল কাটা হয়। (খ) আউশ ধান—গ্রীষ্ম কালে ছিটানো পদ্ধতিতে বীজ বপন করা হয় ও শরৎ কালে কাটা হয় (গ) বোরো ধান—শীতের শেষে নিম্ন বা জলাভূমিতে ছিটানো পদ্ধতিতে বীজ বপন করা হয় ও গ্রীষ্মের সময়ে ফসল কাটা হয়।

চাষের অনুকূল অবস্থা
(Conditions of growth)

জলবায়ু (Climate) : ধান ক্রান্তীয় বা উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। ইহার উৎপাদনে প্রচুর উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতযুক্ত আবহাওয়া বিশেষ উপযোগী। ধান চাষের জন্য অন্তত ৯০ দিন গড়ে ২৪° সে. উত্তাপ বা বার্ষিক ১৬° হইতে ২৭° সে. উত্তাপ প্রয়োজন। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও গড়ে ১০০ হইতে ২০০ সে. মি. হওয়া প্রয়োজন। এই সকল কারণে উচ্চতর অক্ষাংশে ধান চাষ খুবই অসুবিধাজনক। বৃষ্টিপাতের অভাব সর্বদাই সেচের সাহায্যে পূরণ করা প্রয়োজন। কৃষি ক্ষেত্রে চাষের প্রথম দিকে জল দাঁড়ান ও পর্যায়ক্রমে বৃষ্টি ও শুষ্ক আবহাওয়া থাকা আবশ্যক।

মৃত্তিকা (Soil) : নতুন পলিসমৃদ্ধ কাদা মৃত্তিকা ধান চাষের পক্ষে আদর্শ। ধান চাষের পক্ষে প্রচুর জল থাকার প্রয়োজন। ধান্য ক্ষেত্রের অধোভূমিতে অর্থাৎ ১৫ হইতে ২৫ সে মি. নিচে কাদার স্তর থাকা প্রয়োজন। মৃত্তিকায় ক্ষার বা লবণের পরিমাণ বেশী হইলে ধান চারার ক্ষতি হয়। নদী-ব-দ্বীপ অঞ্চলের প্লাবনভূমি ধান উৎপাদনে বিশেষ সহায়ক। ইহা ছাড়া নদীতীর হইতে দূরে অবস্থিত পুরাতন পলিসমৃদ্ধ অঞ্চলের মৃত্তিকায়ও ধান চাষ করা যায়।

ভূ-প্রকৃতি (Topography) : সমভূমি ধান চাষের অনুকূল। ইহাতে যেমন গভীরভাবে চাষের সুবিধা হয় তেমনি বৃষ্টি বা সেচের ফলে জমিতে জল দাঁড়াইতে পারে। পাহাড়ের ঢালে ধাপ কাটিয়া ও আলের সাহায্যে জল আটকাইয়া ধান চাষ করা হয়। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ খুবই নগণ্য।

অন্যান্য উপাদান (Other factors) : ধান চাষে চারা রোপণ, চারার যত্ন করা ও ফসল কাটা ইত্যাদি নানা কারণে প্রচুর দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন। ধান চাষ বিশ্বের ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলে বিশেষভাবে হয় বলিয়া শ্রমিকের অভাব কখনও ঘটে না। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ও অধিক ফলনের জন্য বর্তমানে ধান্যক্ষেত্রে প্রচুর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা। সার প্রয়োগে ফলনের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে।

ধান চাষের পদ্ধতি
(Methods of Rice Cultivation)

দেশে দেশে বা একই দেশে ধান উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। (ক) রোপণ পদ্ধতি (Transplantation method)—ধান উৎপাদনে ইহাই সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি। প্রথমে ছোট একখণ্ড জমিতে বীজ ছড়াইয়া প্রায় এক ফুট পরিমিত উচ্চ চারা হইলে উহা অন্যত্র প্রস্তুত জমিতে সারিবদ্ধভাবে লাগান হয়। (খ) ছিটানো পদ্ধতি (Broadcasting method)—জমি চাষ করিয়া সাধারণত হাতে বীজ ছড়াইয়া দেওয়া ইহার বৈশিষ্ট্য। (গ) গর্ত খুঁড়িয়া বীজ বোনা (Drilling method)—পার্বত্য অঞ্চলে বা গভীর বনাঞ্চলে অধিবাসীরা ইতস্তত গর্ত খুঁড়িয়া একত্রে ধান বীজ লাগাইয়া থাকে। প্রাচীন ঝুমচাষ ইহার অন্তর্গত। এই প্রকার চাষের প্রচলন বর্তমানে নগণ্য।

প্রধান ধান উৎপাদক দেশসমূহ
(Principal Rice Growing Countries)

বিশ্বে উৎপাদিত ধানের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ এশিয়া মহাদেশে উৎপন্ন হয়। এই মহাদেশে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, জাপান, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া, ফিলিপাইন, শ্রী লংকা প্রভৃতি দেশ উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপে ইতালি, স্পেন, উত্তর আমেরিকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল প্রভৃতি দেশেও কিছু পরিমাণ ধান উৎপাদন করা হয়।

বিশ্বের ধান উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি

দেশ	১৯৭৫		১৯৮৩	
	উৎপাদন মি মে. ট.	হেক্টর কেজি	উৎপাদন মি. মে. ট.	হেক্টর/ কেজি
চীন—	১১৬.৫	৩,২৩৭	১৬৫.৫	৪,৮৭২
ভারত—	৪৩.৭	১১৫১	৮৫.৫	২,১২২
ইন্দোনেশিয়া—	২৩.১	২,৬৮৬	৩৩.৮	৩,৬৩৭
বাংলাদেশ—	১৮.৫	১,৮২৯	২১.৭	২,০৪৭
জাপান—	১৭.১	৬,১৪৫	১২.৯	৫,৭০১
থাইল্যাণ্ড—	১৫.০	১,৭৬১	১৮.৫	১,৯৭২
ব্রহ্মদেশ—	৮.৭	১,৭৪০	১৪.৫	৩,০৮৫
পৃথিবী—	৩৪২.৬	২,৪৩২	৪৩৭.৮	৩,০৪৮

[Source : FAO Monthly Bulletin, April, 1984.]

এশিয়া মহাদেশ

চীন : ধান উৎপাদনে চীন পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। চীনের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ইয়াং-সি-কিয়াং ও সিকিয়াং নদীর নিম্ন উপত্যকা ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রধানত ধান চাষ হয়। এই অঞ্চলের আর্দ্র উপক্রান্তীয় জলবায়ু পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত, জলসেচের সুযোগ, পলিসমৃদ্ধ ভারী কাদা-মৃত্তিকা, সুলভ শ্রমিক ইত্যাদির আনুকূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধান উৎপাদনের সহায়ক। এই দেশের পার্বত্য প্রদেশেও ধানের চাষ হয়। চীনে কৃষিকার্য 'কমিউন' প্রথায় অর্থাৎ সমবায়ের ভিত্তিতে করা হয় বলিয়া উৎপাদনের প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। জনসংখ্যার চাপ খুবই বেশী হওয়া সত্ত্বেও এই দেশ প্রতি বৎসর কিছু পরিমাণ চাউল রপ্তানি করিয়া থাকে। চীনে হেক্টর প্রতি চাউল উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৮৩ সালে ছিল ৪.৮৭২ কি গ্রা।

ভারত : ধান উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। ভারতের মধ্যবর্তী সমভূমি অর্থাৎ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন উপত্যকা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ব‍দ্বীপ ও পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমি ধানচাষের জন্য উল্লেখযোগ্য। ভারতের উত্তরে হিমালয়ের তরাই অঞ্চলেও কিছু কিছু ধান চাষ হয়। বিস্তীর্ণ সমভূমি, পলি মৃত্তিকা, উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু ও শ্রমিকের সুলভ যোগান এই দেশে ধান চাষের স্বাভাবিক অনুকূল উপাদান। অধিক উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেও পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, কেরালা, কর্ণাটক প্রভৃতি উৎপাদক রাজ্যগুলির অবদান নগণ্য নহে। ভারতে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন বরাবরই কম। সম্প্রতি সেচ ও সার প্রয়োগের

ফলে এই অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতের 'বাসমতি' ও 'শালি' ধানের চাউল বিখ্যাত।

ইন্দোনেশিয়া: এই দেশ ধান উৎপাদনে তৃতীয়। এই দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা পর্বতময় হওয়ায় পর্বতের ঢালে ধাপ কাটিয়া চাষ আবাদ করা হয়। জাভাদ্বীপে সমভূমি ও নিম্ন এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধান চাষ হয়। এই অঞ্চলের পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু ধান চাষের বিশেষ অনুকূল।

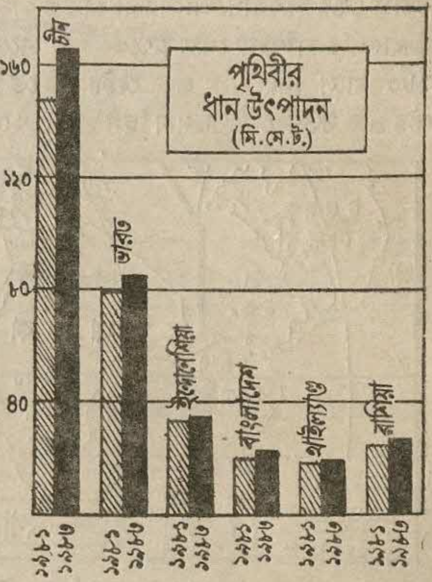

চিঃ ১১,১: পৃথিবীর ধান উৎপাদনের বারগ্রাফ।

বাংলাদেশ: পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র ও ইহাদের অসংখ্য উপনদীর নিম্ন উপত্যকা ও ব দ্বীপ অংশই বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সমভূমি। ফলে জলবায়ুর আনুকূল্যে ইহা ধান চাষের পক্ষে আদর্শ। বাংলাদেশের সর্বত্রই ধান চাষ হয়। বরিশাল, খুলনা, যশোহর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি ধানচাষের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। বরিশালের 'বালামচাল' বর্তমানে কিংবদন্তীতে পর্যবসিত হইয়াছে।

জাপান: এই দেশের বেশির ভাগ অঞ্চল পর্বতময় ও কৃষিকার্যের অযোগ্য। ফলে কৃষিভূমির আয়তন ছোট, জনসংখ্যার চাপও বেশি। হনসুদ্বীপ সহ দক্ষিণ জাপান ধান চাষের প্রধান ক্ষেত্র। দেশটি শিল্প সমৃদ্ধ হওয়ায় নিবিড় চাষ, রাসায়নিক সারের প্রয়োগ ও কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার এদেশের কৃষি ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এদেশে হেক্টর প্রতি ধানের উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি—প্রায় ৫,৭০০ কি. গ্রা.।

ব্রহ্মদেশ: এই দেশের দক্ষিণ ভাগে ইরাবতী নদী অববাহিকা অঞ্চল ধান উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। উত্তরের পার্বত্য এলাকায়ও ধাপ কাটিয়া ধানের চাষ করা হয়। জনসংখ্যার চাপ কম থাকায় ব্রহ্মদেশ চাল রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

থাইল্যাণ্ড: মেনামং নদীর উপত্যকা এই দেশের ধান উৎপাদনের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। জনসংখ্যার স্বল্পতা হেতু এই দেশ চালের রপ্তানি বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই দেশে ধান চাষ হয়।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মেকং নদী-বদ্বীপ ধান চাষের জন্য উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ কোরিয়ার নিম্ন উপত্যকা এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পর্বতের পশ্চিম ঢালে মৌসুমী বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে ধান চাষ হইয়া থাকে।

ইওরোপ মহাদেশ : এই মহাদেশে ইতালির পো নদীর অববাহিকায়, স্পেনের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে ধান চাষ হইয়া থাকে। ইওরোপীয়-সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্গত উত্তর ককেসাস, আজারবাইজান ও কাজাকস্তানে ধান চাষ করা হয়। সম্প্রতি এশিয়ান্তর্গত রাশিয়ার স্টেপ অঞ্চলেও ধান চাষের সম্প্রসারণ ঘটিতেছে। এই দেশে ১৯৮৩ সালে প্রায় ৬·৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ২৫ লক্ষ মে. টন. ধান উৎপন্ন হয়। হেক্টর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৮২০ কেজি.।

চিত্র ১১.২ : পৃথিবীর ধান উৎপাদক অঞ্চলসমূহ।

আফ্রিকা : এই মহাদেশের অন্তর্গত মালাগাসি ও মিশর দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ধান উৎপাদিত হইয়া থাকে। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলেও সামান্য ধানের চাষ হয়।

আমেরিকা : উত্তর আমেরিকার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ধান চাষ হইয়া থাকে। উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে ক্যালিফোর্ণিয়ার সাক্রামান্টো উপত্যকা, মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলবর্তী লুইসিয়ানা, পূর্ব টেক্সাস, মিসিসিপি অববাহিকার আর্কানসাস্ এবং ফ্লোরিডা উপদ্বীপে ধানের চাষ উল্লেখযোগ্য। এই দেশে ১৯৮৩ সালে ৮·৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হইয়াছিল। এই দেশে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫,১০০ কেজি.। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল ও গায়েনা এই মহাদেশে ধান উৎপাদনের বিখ্যাত কেন্দ্র। ইহা ছাড়া সমুদ্রতীর সংলগ্ন অঞ্চলে সামান্য ধানের চাষ হয়।

বাণিজ্য : উৎপাদনের পরিমাণ ও খাদ্যশস্য হিসাবে চাউলের গুরুত্ব বিশ্বে সর্বাধিক হইলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইহার ভূমিকা খুবই নগণ্য। মোট উৎপাদনের শতকরা ৫ ভাগের মত আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে আসে। ইহার কারণ বিশ্বে

সর্বাধিক ধান উৎপাদক দেশগুলিতে যেমন চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাপ অতিরিক্ত হওয়ায় এই সকল দেশ আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া রপ্তানি বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে ছোট ছোট দেশে যেমন ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন ইতালি মিশর প্রভৃতি দেশ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ দেশে আভ্যন্তরীণ চাহিদা কোথাও স্বল্প কোথাও বা নামমাত্র হওয়ায় রপ্তানি বাণিজ্যে ইহারা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। আমদানি কারক দেশের মধ্যে শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, কিউবা, উল্লেখযোগ্য। বিগত ১৯৮৩ সালে বিশ্বে মোট চাউল রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৬ লক্ষ ২৭ হাজার মেট্রিক টন। ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন ও থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কক চাউল রপ্তানির উল্লেখযোগ্য বন্দর।

[প্রশ্ন : (১) কৃষি প্রণালীর শ্রেণী বিভাগ একটি ছকের সাহায্যে দেখাও। (২) প্রগাঢ় কৃষি ও ব্যাপক কৃষির পার্থক্য বর্ণনা কর। (৩) পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে এই দুই প্রণালীর কৃষিকার্য লক্ষ্য করা যায়। (৪) বাণিজ্যিক কৃষি ও আবাদী কৃষি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। (৫) কোন্ কোন্ দেশ ধান রপ্তানি করে এবং কোন্ দেশ উহা আমদানি করে ?

৬. শূন্য স্থানগুলি পূরণ কর—

ধান্য চাষের পক্ষে — সে. তাপমাত্রা — — সে.মি. বৃষ্টিপাত — মৃত্তিকা এবং — ভূ-প্রকৃতির প্রয়োজন হয়।]

গম (Wheat)

খাদ্যশস্য হিসাবে চাউলের পরেই গমের স্থান। মৌসুমী জলবায়ু ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য জলবায়ু অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য গমজাত দ্রব্য। বিশ্বে উৎপাদিত মোট দানা শস্যের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগই গম। ধানের তুলনায় গম উৎপাদনের ভৌগোলিক সুবিধা অনেক বেশী। ফলে নিরক্ষীয় অঞ্চল হইতে হিমোষ্ণ অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই কমবেশী গম উৎপাদিত হইয়া থাকে।

ব্যবহার (Uses) : প্রধানত দুই প্রকারের গম দেখা যায়—সাধারণ গম ও ম্যাকারোণি গম। খাদ্য হিসাবে সাধারণ গমের আটা ও ময়দার ব্যবহারই সর্বাধিক। ম্যাকারোণি গমের ব্যবহার কেক, প্যাষ্ট্রি, পুডিং ইত্যাদি তৈয়ারীর ক্ষেত্রেই বেশী। গম হইতে যেমন আটা, ময়দা, সুজি, বিস্কুট, কেক ইত্যাদি তৈয়ারি হয় তেমনি গ্লুকোজ শ্বেতসার (starch), কাগজ ও চর্ম জুড়িবার আঠা (glue) প্রভৃতিও প্রস্তুত করা হয়। গমের খড় হইতে মোড়কের কাগজ, হাল্কা টুপি, বসিবার কুশন ইত্যাদি তৈয়ার হয়।

চাষের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth) : গমের চাষ মৃত্তিকার তুলনায় জলবায়ুর উপর অধিক নির্ভরশীল। গম চাষে বৃষ্টিপাতের প্রাধান্য না থাকায় বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই গম চাষ সম্ভব। উত্তর গোলার্ধে ৩০° হইতে ৫৫° ও দক্ষিণ গোলার্ধে ২৫° হইতে ৪০° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চল সমূহই গম চাষের সর্বপ্রধান ক্ষেত্র।

জলবায়ু (Climate) : শীতল শুষ্ক আবহাওয়া গম চাষের অনুকূল। কিন্তু উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু বা অতি শীতল জলবায়ু অর্থাৎ সর্বপ্রকার চরম আবহাওয়া গম চাষের পক্ষে অনুকূল নহে। গম চাষে সাধারণত ১৪° সে. গড় উত্তাপ ৫০ হইতে ১০০ সে.মি. বৃষ্টিপাত এবং প্রথমে ঈষৎ আর্দ্র আবহাওয়া ও পরে ক্রমে সূর্যকরোজ্জ্বল ঈষদুষ্ণ আবহাওয়া থাকা আবশ্যক। গম চাষে শেষের দিকে অন্তত তিনমাস কাল তুষারপাতবিহীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। গম চাষে পূর্বে প্রায় ২২০ দিন প্রয়োজন হইত। বর্তমানে নানা ধরনের বীজের আবিষ্কার ও কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ১২০/১৫০ দিনেই গম চাষ করা সম্ভব হয়। অতিরিক্ত শীতের দেশে স্বল্পকাল স্থায়ী বসন্তে মাত্র ৯০ দিনের মধ্যে vernalisation পদ্ধতিতে গমের চাষ করা হয়।

মৃত্তিকা (Soil) : গম চাষের জন্য কাদামিশ্রিত উর্বর দোঁ-আশ মৃত্তিকা উপযোগী। শুষ্ক অঞ্চলের সারনোজেম ও প্রেইরি মৃত্তিকা গম চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। বেলেমাটি ও এঁটেল মাটি গম চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত।

ভূ-প্রকৃতি (Topography) : সমতল ভূমিই গম চাষের পক্ষে সহায়ক। ইহা জলসেচ ও যান্ত্রিক কৃষির পক্ষে অনুকূল। পাহাড়ের ঢালে ঢেউ খেলানো জমিতে গম চাষ আদৌ উন্নত নহে।

অন্যান্য উপাদান (Other Factors) : গম চাষে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে গম উৎপাদক দেশগুলিতে বাণিজ্যিক প্রথায় কৃষি যন্ত্রপাতির সাহায্যেই প্রধানত গম চাষ হইয়া থাকে। এই কারণে শ্রমিকের অভাব যন্ত্রের সাহায্যে পূরণ হয়। উন্নত বীজ, কীটনাশক ঔষধ, রাসায়নিক সার ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবহার ব্যতীত গম চাষ বর্তমান বিশ্বে প্রায় অসম্ভব। সুতরাং এই সকল বিষয়ের উপর সকল দেশেই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে।

গমের শ্রেণীভেদ (Classification of Wheat) : অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিশ্বের নানা দেশে নানা প্রকার গমের চাষ হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প সময়ে ফলনযোগ্য নানাবিধ বীজের আবিষ্কারের ফলে গমের শ্রেণীভেদ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু সাধারণত বীজ বোনার সময়কে ভিত্তি করিয়াই গমের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। ইহা দুই প্রকার—(ক) শীতকালীন ও (খ) বসন্তকালীন বা বাসন্তিক।

শীতকালীন গম (Winter Wheat) : উষ্ণ অঞ্চলে শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ শরৎ কালে বীজ বোনা হয় ও বসন্তের শেষে ফসল তোলা হয়। আমেরিকায় শরৎ কালকে Fall বলে এবং এই সময় বোনা গমকে Fall Wheat বলে। বিশ্বে সর্বাধিক গমের চাষ শীতকালেই হইয়া থাকে। শীতকালীন গম আবার দুই প্রকার—কঠিন ও কোমল।

বাসন্তিক গম (Spring Wheat) : নিম্নোক্ত অঞ্চলেই প্রধানত বাসন্তিক গমের চাষ হইয়া থাকে। শীতের শেষে তুষার গলিতে আরম্ভ করিলে এই গমের চাষ করা হয় এবং গ্রীষ্মের মাঝামাঝি ফসল কাটা হয়। ইহা সাধারণত দ্রুত ফলনশীল জাতীয়।

বিশ্বের গম উৎপাদক অঞ্চল
(Wheat Producing Areas)

বিশ্বের গম উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়, চীন তৃতীয়, ভারত চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া ইতালি, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন ও পাকিস্তান-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জার্মানি, ডেনমার্ক, পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ, জাপান, তুরস্ক ও এশিয়া—আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহে কমবেশি গম উৎপন্ন হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সোভিয়েত রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহ, চীনের উত্তরাংশ, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গমের চাষ হইয়া থাকে।

প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল ও বপনকাল

অঞ্চল	জলবায়ু	বপনকাল
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—শীতকালীন গমবলয়	দীর্ঘস্থায়ী গ্রীষ্ম শুষ্ক ও নাতি আর্দ্র মহাদেশীয়	শরৎ (Fall)
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা গমবলয়	স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্ম-আর্দ্র মহাদেশীয়	বসন্ত
ড্যানিউব অববাহিকা	দীর্ঘস্থায়ী গ্রীষ্ম-আর্দ্র	শরৎ
ভূমধ্যসাগরীয় গমবলয়	উপক্রান্তীয় শুষ্ক গ্রীষ্ম	শরৎ
ইউক্রেন	দীর্ঘস্থায়ী গ্রীষ্ম, আর্দ্র শুষ্ক মহাদেশীয়	শরৎ
ভল্গা ও পশ্চিম সাইবেরিয়া	স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্ম-আর্দ্র ও নাতিশুষ্ক মহাদেশীয়	বসন্ত
উত্তর ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তান	স্বল্পস্থায়ী আর্দ্র মৌসুমী	শরৎ
উত্তর চীন	দীর্ঘ গ্রীষ্ম, নাতি আর্দ্র	শরৎ
আর্জেন্টিনা পম্পাস	উপক্রান্তীয় নাতি আর্দ্র	শরৎ
অস্ট্রেলিয়া	উপক্রান্তীয় শুষ্ক গ্রীষ্ম	শরৎ

[Highsmith Jenh : Geography of Commodity Production]

বিশ্বের প্রধান গম উৎপাদক দেশ

এশিয়া : চীন : গম উৎপাদনে এই দেশ বিশ্বের তৃতীয়। হোয়াংহো নদীর অববাহিকা এই দেশের গম উৎপাদনের বিখ্যাত কেন্দ্র হইলেও ইয়াংসি নদীর উত্তরাংশ

হইতে উত্তরে চীনের আন্তর্জাতিক সীমা পর্যন্তই এই গম অঞ্চল বিস্তৃত। হোয়াংহো ও ইয়াংসি নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গম উৎপাদন ক্ষেত্র। শানসি, শানটুং, হোপেই, মাঞ্চুরিয়া, হোনান প্রভৃতি বিখ্যাত কেন্দ্র। চীনে ১৯৫৮ সালে কমিউন স্থাপনের পর হইতে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এই দেশে হেক্টর প্রতি গমের উৎপাদন বর্তমানে ২৮০০ কেজি.। সাংহাই বিখ্যাত ময়দা শিল্পকেন্দ্র।

ভারত: গম উৎপাদনে ভারতের স্থান চতুর্থ। উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। গম উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। ভারতে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ১৮৩৬ কেজি.। ১৯৬৯-৭০ সালে পাঞ্জাবে 'গম বিপ্লব' (Wheat Revolution) ও ইহার পরবর্তী অধ্যায়ে সারা দেশব্যাপী যে 'সবুজ বিপ্লব' (Green Revolution) অনুষ্ঠিত হয় উহার প্রভাবে গমের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি পায়।

এশিয়ার অন্যান্য গম উৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে **পাকিস্তান** (পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু অববাহিকা, সীমান্ত প্রদেশ) তুরস্ক ও জাপানের নাম উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের লাহোর ও করাচি ময়দা শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

ইউরোপ: এই মহাদেশে ফ্রান্স ও স্পেন ব্যতীত কোন দেশই গম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। ফ্রান্সের প্যারী উপত্যকায় ও দক্ষিণ ফ্রান্সের সমতলভূমিতে গম

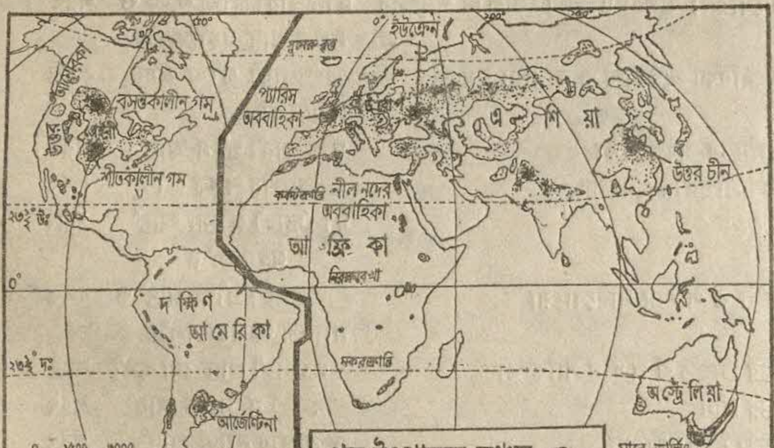

চিত্র ১১.৩: পৃথিবীর গম উৎপাদক অঞ্চলসমূহ।

জন্মে। জার্মানী, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, হল্যান্ড ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে কম-বেশি গম চাষ হয়। ইতালির পো অববাহিকায় গম উৎপাদন হয়। হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট ময়দা উৎপাদনের বিখ্যাত কেন্দ্র।

সোভিয়েত রাশিয়া : গম উৎপাদনে সোভিয়েত রাশিয়ার স্থান প্রথম। এই দেশের ইউক্রেন অঞ্চলকে একসময় 'ইউরোপের রুটির ঝুড়ি' (Bread Basket of Europe) বলা হইত। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সোভিয়েত রাশিয়ায় কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। এই দেশে শীতকালীন ও বাসন্তিক উভয় প্রকার গমের চাষ হয়। কার্পেথিয়ান পর্বতের সানুদেশ হইতে বৈকাল হ্রদ পর্যন্ত প্রায় ৪৮০০ কি.মি. বিস্তৃত অঞ্চল সোভিয়েত রাশিয়ার দীর্ঘতম গম বলয়। ইউক্রেন, মলডেভিয়া, ক্রিমিয়া, উত্তর ককেশাস্ অঞ্চলে শীত ও শীতকালীন গম জন্মে। ভল্গা, ইউরাল ও পশ্চিম সাইবেরিয়া বাসন্তিক গম বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ব্যতীত উত্তর কাজাকস্থানে বাসন্তিক গম ও স্টেপ অঞ্চলে শীতকালীন গম জন্মে। সোভিয়েত রাশিয়ার গম বলয়সমূহে শুষ্ক আবহাওয়া (৩০-৫০ সে. মি. বৃষ্টিপাত), সেচের সুবিধা, সারনোজেম মৃত্তিকা গম উৎপাদনের সহায়ক। কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার, উন্নত অধিক ফলনশীল বীজ ও সার ব্যবহার এবং সর্বোপরি সরকারী ও যৌথ খামার ব্যবস্থা এই দেশের উন্নত গম চাষ তথা সমগ্র কৃষি কার্যের অপরিহার্য উপাদান।

বিশ্বের গম উৎপাদনের গতি-প্রকৃতি

দেশ	১৯৭৫		১৯৮৩	
	উৎপাদন মি. মে. ট	হেক্টর/ কেজি.	উৎপাদন মি. মে. ট	হেক্টর/ কেজি.
রাশিয়া	৮৫·০	১,৪০৬	৮২·০	১,২১২
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৫৮·১	২,০৬০	৬৬·০	২,৬৫৩
চীন	৪১·০	১,৩৬৭	৮২·০	২,৮৪৭
ভারত	২৪·৭	১,২৫০	৪২·৫	১,৮৩৬
কানাডা	১৭·১	১,৮০২	২৬·৯	১,৯৬৫
ফ্রান্স	১৫·০	০,৮৮৮	২৪·৬	৫,০৭২
অস্ট্রেলিয়া	১১·৭	১,৩৬০	২১·৮	১,৭১৬
আর্জেন্টিনা	৮·২	১,৫০৫	১১·৭	১,৭১৩
পৃথিবী	৩৭০·০	১,৯৭৮	৪৯৭·৭	২,১৬৯

[Source : FAO Monthly Bulletin of Statistics, April, 1984]

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র : উত্তর আমেরিকার মধ্যাংশে অবস্থিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গম উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয়। পশ্চিমে রকি পর্বতমালার পাদদেশ হইতে পূর্বে আপালাসিয়ান পর্বতের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত প্রেইরি ক্ষেত্র এই দেশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গম উৎপাদক অঞ্চল। এই গম অঞ্চলকে চারিটি বলয়ে ভাগ করা যায়— (১) হ্রদ অঞ্চলের পশ্চিমে কানাডার দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বাসন্তিক গম বলয়।

মণ্টানা, উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। এই অঞ্চলের রেড নদীর অববাহিকায় প্রচুর গম জন্মে। এই কারণে ইহাকে 'পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি' (Bread Basket of the World) বলা হয়। (২) মধ্য পশ্চিম সমভূমির শীতকালীন গমবলয়—ওহিও, ইণ্ডিয়ানা, ইলিনয়, কানসাস, নেব্রাসকা প্রভৃতি এই গম বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। (৩) দক্ষিণ সমভূমির শীতকালীন গম বলয়—ওকলাহোমা, মিসৌরী, লুইসিয়ানা প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য গম কেন্দ্র। (৪) ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকা—ক্যালিফোর্নিয়া ও ইহার দক্ষিণ পশ্চিমের মরুপ্রায় অঞ্চলে জলসেচ ও শুষ্ক কৃষি পদ্ধতিতে গম চাষ করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জলবায়ু ও প্রেইরি মৃত্তিকা গম চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই দেশের গমচাষ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা হয়। এই দেশ নিউইয়র্ক বন্দর মারফত বিশ্বের বাজারে প্রচুর গম রপ্তানি করিয়া থাকে। মিসিসিপি নদী তীরে মিনিয়াপোলিস ও সেণ্টপলস্ এবং ঈরি হ্রদের তীরে বাফেলো প্রভৃতি ময়দাকলের জন্য বিখ্যাত।

কানাডা : এই দেশের মধ্যভাগে প্রেইরি অঞ্চলের অন্তর্গত আলবার্টা, ম্যানিটোবা ও সাসকাচুয়ান প্রধান গম উৎপাদক অঞ্চল। জলবায়ুর কারণে কানাডায় বসন্তকালীন গমের চাষ হইয়া থাকে। কানাডায় রেলপথ বিস্তারের ফলে গম চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। জনসংখ্যার চাপ কম থাকায় কানাডা প্রতি বৎসর প্রচুর গম রপ্তানি করিয়া থাকে। উইনিপেগ বিখ্যাত গমের বাজার। ভ্যান্কুভার, মণ্ট্রিল ও হ্যালিফ্যাকস গম রপ্তানি বন্দর।

আর্জেণ্টিনা : দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টিনা বিশ্বে গম উৎপাদনে ও রপ্তানিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। পম্পাস সমভূমি অঞ্চলে জলবায়ু ও মৃত্তিকা গম চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জনসংখ্যার অনুপাতে উৎপাদন বেশি বলিয়া এই দেশ গম রপ্তানিতে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

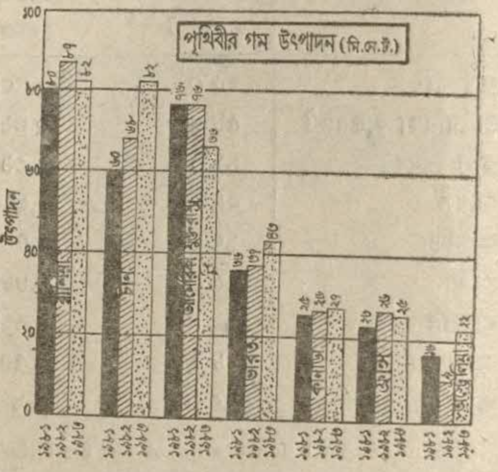

চিত্র ১১.৪ : পৃথিবীর গম উৎপাদনের বারগ্রাফ।

ওশিয়ানিয়া : অষ্ট্রেলিয়ার মারে-ডার্লিং নদীর অববাহিকায় ভিক্টোরিয়া ও নিউসাউথওয়েলসে এবং দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। জনসংখ্যার স্বল্পতা হেতু গম রপ্তানিতে এই দেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

নিউজিল্যাণ্ড: নিউজিল্যাণ্ডে ক্যাণ্টারবেরীর সমভূমি অঞ্চলে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়।

আফ্রিকা: মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া প্রভৃতি দেশে গম উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য (Trade): খাদ্যশস্যের বিশেষ করিয়া দানা শস্যের মধ্যে গম আন্তর্জাতিক লেনদেনে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। মোট উৎপাদনের শতকরা ১০-১২ ভাগ আমদানি-রপ্তানি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সোভিয়েত রাশিয়া গম রপ্তানিতে প্রথম স্থান অধিকার করিত। কিন্তু বর্তমানে ঐ অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অপর কোন অধিক উৎপাদনকারী দেশ রপ্তানি বাণিজ্যতে তেমন অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। বরং উৎপাদনের পরিমাণ কম হইলেও জনসংখ্যার স্বল্পতা হেতু আর্জেণ্টিনা, কানাডা রপ্তানি বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। বিশ্বের মোট রপ্তানিকৃত গমের প্রায় ৯০ শতাংশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জেণ্টিনা হইতে আসে। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া তাহাদের উৎপাদনের প্রায় ৫০-৬০ শতাংশ রপ্তানি করিয়া থাকে। অবশিষ্টাংশ সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি হইতে আসে। অবশ্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে রপ্তানিযোগ্য অতিরিক্ত গম নগণ্য। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনেই উহা সীমাবদ্ধ। আমদানিকারী দেশসমূহের মধ্যে জনবহুল দেশের প্রাধান্য বেশি। বৃটিশ যুক্তরাজ্য সহ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি যেমন জার্মানী, হল্যাণ্ড, ইতালি, বেলজিয়াম প্রভৃতি মোট রপ্তানির প্রায় ৪০ শতাংশ আমদানি করিয়া থাকে। অন্যান্য আমদানিকারী দেশের মধ্যে জাপান, ভারত, মিশর, ব্রেজিল ও পাকিস্তানের নাম উল্লেখযোগ্য।

ধান ও গম চাষের তুলনা
(Rice and Wheat Cultivation—a Comparison)

ধান ও গম মানুষের প্রধান খাদ্য। খাদ্য হিসাবে ধান ও গমের ব্যবহার প্রায় সমান হইলেও সাম্প্রতিক কালে জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় গমের ব্যবহার যেমন ক্রমবর্ধমান তেমনি গম চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ধান ও গম চাষে ভৌগোলিক অবস্থার বিভিন্নতা লক্ষণীয়। নিম্নে উভয় প্রকার শস্যের মধ্যে যে নানা প্রকার বিভিন্নতা দেখা যায় তাহা দেখান হইল:

ধান	গম
১। ধান গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের অ-শ্বেতকায় অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য।	১। গম শীতপ্রধান অঞ্চলের শ্বেতকায় অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য।
২। ধান উৎপাদনে প্রচুর উত্তাপ (২৫°-২৭° সে.) প্রচুর বৃষ্টিপাত (১০০-	২। গম চাষে মাঝারি উত্তাপ (১৪° সে.) ও স্বল্প বৃষ্টিপাত ৫০-১০০ সে.মি.)

ধান	গম
২০০ সে.মি) প্রয়োজন। এই কারণে ইহা মৌসুমী অঞ্চলে বর্ষাকালেই প্রধানত জন্মায়।	প্রয়োজন। ইহা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই ভাল জন্মে।
৩। উর্বর পলি মৃত্তিকা সমন্বিত সমতল নদী-বদ্বীপ ধান চাষের পক্ষে আদর্শ।	৩। সারনোজেম, প্রেইরি ও উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা-যুক্ত সমতলভূমি গম-চাষের সহায়ক।
৪। ধানচাষে প্রচুর শ্রমিক নিয়োগ-আবশ্যক। কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার সীমিত। ধানচাষের যান্ত্রিকীকরণ এখনও হয় নাই।	৪। গমচাষে যান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধা থাকায় শ্রমিক নিয়োগ করা আবশ্যক নয়। উন্নত দেশগুলিতে গম চাষ যান্ত্রিকীকরণ করা হইয়াছে।
৫। ধানচাষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল এখনও তেমন ব্যাপক নহে। ফলে বহুক্ষেত্রে ইহা জীবিকাসত্তা-ভিত্তিক কৃষি।	৫। গমচাষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল খুবই সুদূরপ্রসারী হইয়াছে এবং ইহার চাষ অনেকক্ষেত্রেই বাণিজ্য-ভিত্তিক।
৬। ধানের হেক্টর প্রতি উৎপাদন গম অপেক্ষা বেশি এবং ধান উৎপাদনে এশিয়া সর্বপ্রধান (পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৯২%)।	৬। গমের হেক্টর প্রতি উৎপাদন অপেক্ষা-কৃত কম এবং আমেরিকা ও ইউ-রোপে সর্বাধিক গম উৎপন্ন হয় (মোট উৎপাদনের ৬০%)।
৭। ধানে আমিষজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ কম এবং শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বেশি। ধানের প্রতি কিলোগ্রামে ক্যালরির পরিমাণ ৩,৬২৮।	৭। গমে আমিষজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অধিক ও শ্বেতসারের পরিমাণ কম। প্রতি কিলোগ্রাম গমে ক্যালোরির পরিমাণ ৩৪৩৮।
৮। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গমের তুলনায় ধানের গুরুত্ব কম। মোট উৎপাদনের প্রায় ৮-১০% বিশ্ব-বাণিজ্যে আসে।	৮। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গমের গুরুত্ব বেশি। মোট উৎপাদনের প্রায় ২০% বিশ্ববাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

[প্রশ্ন : (১) বাৎসরিক কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত গম চাষের পক্ষে উপযুক্ত ? (২ শীতকালীন গম ও বসন্তকালীন গম কখন বোনা হয় এবং কখন কাটা হয় ? আমেরিকায় শরৎকালকে কি বলে ? (৩) পৃথিবীর পাঁচটি বৃহত্তম গম-উৎপাদক অঞ্চল নির্দেশ কর এবং একটি মানচিত্রে অঞ্চলগুলি দেখাও। (৪) সোভিয়েত রাশিয়ার গম-চাষ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৫) গম রপ্তানিকারক প্রধান তিনটি দেশ ও বন্দরের নাম লিখ। (৬) ধান ও গম চাষের তুলনামূলক আলোচনা কর।]

পানীয় শস্য (Beverages)

চা (Tea)

মৃদু উত্তেজক পানীয় হিসাবে চায়ের জনপ্রিয়তা বর্তমানে সর্বাধিক। চা মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের উচ্চভূমিতে জাত একপ্রকার চিরহরিৎ বৃক্ষের পাতা। একটি কুঁড়ি সহ দুইটি পত্র আহরণ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বিশুষ্ক করিয়া চা পাতা প্রস্তুত করা হয়। চা গাছের বৈজ্ঞানিক নাম থিয়া সাইনেনসিস (*Thea sinensis*)। চায়ের আবিষ্কার সর্বপ্রথম চীনেই হয়, চীন হইতে ইহা ধীরে ধীরে ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

ব্যবহার (Uses): পানীয় হিসাবেই চায়ের প্রধান ব্যবহার। ইহাতে ক্যাফিন (Caffein) নামক একপ্রকার মৃদু উত্তেজক পদার্থ থাকে। দেশভেদে ও ঋতুভেদে চা উষ্ণ (Hot tea) বা শীতল (Ice tea) অবস্থায় পান করা হয় ; অন্যান্য পানীয়ের তুলনায় ইহা সস্তা বলিয়া ইহার ব্যবহার সর্বাধিক। চায়ের বীজ হইতে সাবান তৈয়ারির একপ্রকার তেল ও ক্যাফিন নামক একপ্রকার ক্ষার পদার্থ প্রস্তুত হয়।

সাধারণত দুই প্রকারের চা দেখা যায়—(১) আসামজাতীয় ও (২) চীন-জাতীয়। আসামজাতীয় চায়ের রং গাঢ় হয় ও কাথ (liquor) ভাল হয়। চীন-জাতীয় চায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য উহার স্বাদ ও গন্ধ। এই কারণে উভয় প্রকার চায়ের উপযুক্ত সংমিশ্রণের উপর চায়ের আন্তর্জাতিক চাহিদা ও মূল্য নির্ভর করে। প্রস্তুত ও ব্যবহারের দিক হইতে চায়ের নানা শ্রেণীভেদ আছে যেমন—Leaf tea, Dust tea, Black tea, Green tea, Brick tea ইত্যাদি। রৌদ্রতাপে শুষ্ক চায়ের রং সবুজ ও উত্তপ্ত পাত্রে সেঁকা চায়ের রং কালো হয়। রাশিয়া ও তিব্বতে চায়ের পাতা গুঁড়া করিয়া ভাতের মণ্ড, মাখন ও মসলা মিশাইয়া ইষ্টকের আকারে উহাকে সংরক্ষণ করা হয়। ইহাকে ব্রিক টি বলে।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth): **জলবায়ু (Climate)**: চা-গাছ উপক্রান্তীয় অঞ্চলের এক স্বাভাবিক উদ্ভিদ। ইহার জন্য দীর্ঘস্থায়ী উত্তাপ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বার্ষিক গড় উত্তাপ অন্ততঃ ২৭° সে. ও বৃষ্টিপাত ১৫০° হইতে ২৫০ সে. মি. হওয়া প্রয়োজন। শিলাবৃষ্টি চা চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক। আবার ৩৫° সে. এর অধিক উত্তাপও চা গাছের ক্ষতি করে। চা-গাছ স্বাভাবিক ভাবে ৫/৭ মিটার দীর্ঘ হয় কিন্তু পাতা আহরণের সুবিধার জন্য অনবরত ইহাকে ছাঁটিয়া ১ মিটারের মধ্যে রাখা হয়। নিয়মিত ছাঁটা ও বৃষ্টিপাত নতুন পাতা বাহির হইবার সহায়ক।

মৃত্তিকা (Soil): চা চাষের পক্ষে লৌহমিশ্রিত উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা বিশেষ উপযোগী। মৃত্তিকায় হাল্কা জৈব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ (Humus) থাকা যেমন আবশ্যক তেমনি সামান্য অম্লের ভাগও থাকা প্রয়োজন। পাহাড়ি মৃত্তিকা এই কারণে চা চাষের সহায়ক।

ভূ-প্রকৃতি (Topography) : চা গাছের গোড়ায় জল দাঁড়ান খুবই ক্ষতিকর। এই কারণে জল নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত ঢালু জমি চা বাগিচার পক্ষে আদর্শ। পাহাড়ের ঢালেই সর্বাধিক চা বাগিচা দেখা যায়।

অন্যান্য উপাদান (Other factors) : চা বাগিচার মৃত্তিকা উর্বর হওয়া আবশ্যক বলিয়া প্রচুর সার ব্যবহার অপরিহার্য। চা-গাছের যত্ন লওয়া ও পাতা তোলার জন্য প্রচুর শ্রমিক নিয়োগ আবশ্যক। ইহা ব্যতীত চা বাগিচার উন্নতি প্রচুর মূলধন, নিকটবর্তী বন্দরের অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। ভারত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে চা শিল্পের উন্নতির জন্য বৃটিশ পুঁজি ও উদ্যোগ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। চায়ের পাতা চয়নে নারী শ্রমিকই প্রধানত নিয়োগ করা হয় কারণ নারী শ্রমিকের মজুরী কম ও তাহাদের নিপুণতায় গাছের ক্ষতি কম হয়। এই সকল কারণে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলেই চায়ের চাষ প্রসার লাভ করিয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing regions) : চা উৎপাদনে এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত দেশগুলির গুরুত্বই সর্বাধিক। চা উৎপাদনে ভারত প্রথম, চীন দ্বিতীয়, শ্রীলঙ্কা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া ইন্দোনেশিয়া, জাপান, বাংলাদেশ ও ফরমোজা স্বল্প পরিমাণ চা উৎপন্ন করে। আফ্রিকায় কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানিকা, মোজাম্বিক, উত্তর রোডেশিয়া, নাটাল প্রভৃতি রাজ্যে চায়ের চাষ প্রসার লাভ করিতেছে। ইউরোপীয় রাশিয়ার ট্রান্সককেশাস অঞ্চলে, উত্তর আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারোলিনা ও ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল, পেরু ও আর্জেন্টিনা রাজ্যে সামান্য পরিমাণে চায়ের চাষ হইয়া থাকে।

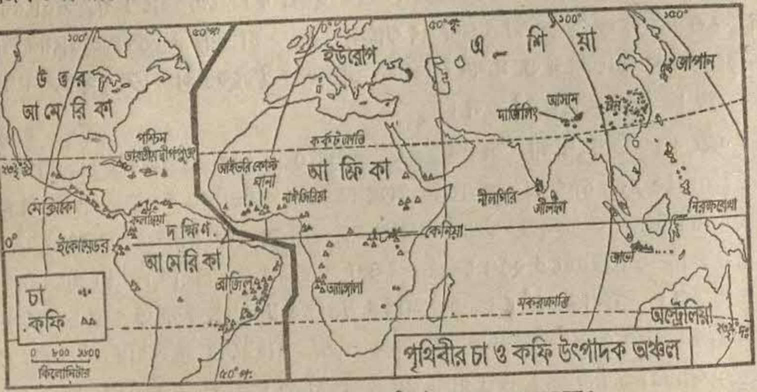

চিত্র ১১.৫ : পৃথিবীর চা ও কফি উৎপাদক অঞ্চলসমূহ।

ভারত : চা উৎপাদনে ভারত বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। বিশ্বের বাজারে ভারতীয় চায়ের গুণের কদরও বেশি। এই কারণে চায়ের উৎপাদন ও বাণিজ্যে ভারতের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের চা বাগিচাগুলি প্রধানত উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে অবস্থিত, যেমন—আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা। আসামের

ব্রহ্মপুত্র ও সুর্মা উপত্যকা, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংএর পাহাড়ের ঢালে, তরাই অঞ্চলে, জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স অঞ্চলে ও কোচবিহারে উল্লেখযোগ্য চা বাগিচাগুলি অবস্থিত। ত্রিপুরা রাজ্যেও সামান্য চা উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া উত্তর ভারতে বিহারের রাঁচী-হাজারিবাগ, উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল, এবং হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকায় চায়ের চাষ হয়। দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু রাজ্যে নীলগিরির ঢালে ও কেরালা রাজ্যেও চায়ের চাষ হইয়া থাকে। ভারতে উৎপাদিত মোট চায়ের প্রায় ৮০ শতাংশ উত্তর-পূর্ব ভারতে জন্মে।

পৃথিবীর চা উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টনে)

	১৯৭৫	১৯৮৩		১৯৭৫	১৯৮৩
ভারত	৫'১৩	৬'০৫	ইন্দোনেশিয়া	০'৬৫	১'০২
চীন	৩'০৪	৪'৫৮	সোভিয়েত রাশিয়া	০'৮৩	১'৫০
শ্রীলঙ্কা	২'১৪	১'৭৫	পৃথিবী	১৬'৭৮	২০'৯৬
জাপান	১'০৩	১'০২			

[Source : FAO Monthly Bulletin of Statistics, January, 1984]

চীন : চীন দেশের চায়ের চাষ সর্ব প্রাচীন। সিকিয়াং ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলেই এই দেশের সর্বাধিক চা বাগিচা অবস্থিত। এই অঞ্চলে ৩০০ হইতে ৯০০ মিটার উচ্চ পর্বতের ঢালে চা বাগিচাগুলি অবস্থিত। সবুজ চা উৎপাদনে চীনের স্থান বিশ্বে প্রথম। এই দেশে জঙ্গল হইতেও কিছু চা পাতা সংগ্রহ করা হয়। এক সময় চা রপ্তানিতে চীনের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে আভ্যন্তরীণ চাহিদা অতিরিক্ত হওয়ায় রপ্তানি বাণিজ্যে চীনের ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

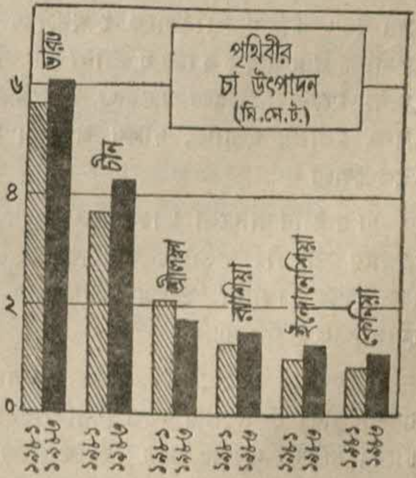

চিত্র ১১.৬ : পৃথিবীর চা উৎপাদনের বারগ্রাফ।

শ্রী লংকা : এই দেশের উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু, পর্বতের ঢালে জল-নিকাশী ব্যবস্থা চা বাগিচা গড়িয়া তোলার পক্ষে সহায়ক। শ্রী লংকার কাণ্ডির দক্ষিণে ও দক্ষিণ মধ্যভাগে পর্বতের ঢালে বৃটিশ পুঁজির সাহায্যে উল্লেখযোগ্য চা বাগিচাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে।

আভ্যন্তরীণ চাহিদার স্বল্পতার দরুণ রপ্তানি বাণিজ্যে শ্রীলংকার স্থান ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

জাপান : হনসু দ্বীপের মধ্যভাগ হইতে দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ও কিউসিউ দ্বীপের নানাস্থানে পর্বতের ঢালে চা বাগিচা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দেশে প্রধানত সবুজ চা উৎপন্ন হয়।

ইন্দোনেশিয়া : এই দেশে পর্বত গাত্রের উর্বর মৃত্তিকা, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু ও সুলভ শ্রমিক চা চাষের বিশেষ সহায়ক। জাভা দ্বীপের পশ্চিমাংশের পার্বত্য অঞ্চলে এবং সুমাত্রা দ্বীপের পার্বত্য অঞ্চলের উত্তর ঢালে চা উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই দেশের চা বাগিচাগুলির প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথের উপর এই দেশের অবস্থান ইহার চা শিল্পের উন্নতির বিশেষ অনুকূল।

বাংলাদেশ : শ্রীহট্ট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনুকূল পরিবেশে চায়ের চাষ প্রসার লাভ করিতেছে। এই অঞ্চলের চা তেমন উৎকৃষ্ট নহে।

ব্যবসায় (Trade) : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পণ্য দ্রব্য। বৃটিশ যুক্তরাজ্য এই ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। বিভিন্ন দেশ হইতে লণ্ডনের চায়ের বাজারে চা আমদানি করা হয় এবং নিলাম প্রথায় ঐ চা বিক্রি করা হয়। যুক্তরাজ্য প্রচুর চা আবার বিদেশে রপ্তানি করে। চা আমদানি অন্তে পুনঃ রপ্তানি করিবার ফলে লণ্ডনকে চায়ের পুনঃ রপ্তানি কেন্দ্র (Entrepot trade centre) বলা হয়। চা আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে বৃটিশ যুক্তরাজ্য প্রথম। মোট রপ্তানির প্রায় অর্ধেক বৃটিশ যুক্তরাজ্য ক্রয় করিয়া থাকে। অন্যান্য আমদানিকারক দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা, ইরাক, ইরাণ, ফ্রান্স, ইতালি, হল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, মিশর প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য।

চা রপ্তানি বাণিজ্যে ভারত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। আন্তর্জাতিক চায়ের বাজারে ভারতীয় রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ৪০ শতাংশ। অপরাপর চা রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে শ্রী লংকা, ইন্দোনেশিয়া, চীন, বাংলাদেশ, কেনিয়া, উত্তর রোডেশিয়া, মোজাম্বিক প্রভৃতি প্রধান।

শিল্পোন্নত দেশগুলিতে চায়ের তুলনায় কফির কদর ক্রমবর্ধমান এবং চা রপ্তানিকারী দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতাও ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কারণে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য "আন্তর্জাতিক চা কমিটি" (International Tea Committee) গঠন করা হইয়াছে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধির স্বপক্ষে প্রচারাভিযান চালান হইতেছে। ভারতে "চা বাজার সম্প্রসারণ সংস্থা" (Tea Market Expansion Board) এবং

আমেরিকায় "আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র চা-পরিষদ" (Tea Council of the U. S. A.) গঠনের মাধ্যমে চায়ের বাজার সম্প্রসারণের ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিতেছে।

[প্রশ্ন : (১) চা উৎপাদনের অনুকূল তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত উল্লেখ কর। (২) পাহাড়ের ঢালে চা-এর চাষ করা হয় কেন ? (৩) সবুজ চা এবং কালো চা কি প্রকারে উৎপাদন করা হয়। (৪) চা-এর পাতা চয়নে নারী শ্রমিক নিয়োগ করা হয় কেন ? (৫) পৃথিবীর প্রধান তিনটি চা-উৎপাদক অঞ্চল বর্ণনা কর এবং মানচিত্রে দেখাও। (৬) পৃথিবীর বৃহত্তম চা রপ্তানিকারক দেশ কোনটি ? (৭) চা রপ্তানি-কারক তিনটি বন্দরের নাম লিখ। (৮) কোন্ কোন্ দেশ চা আমদানি করে ?]

কফি (Coffee)

চায়ের মত কফিও মৃদু উত্তেজক পানীয়। বর্তমানে কফির চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে কফি শব্দটি আবিসিনিয়া রাজ্যের কাফা (Kaffa)প্রদেশের সহিত যুক্ত। কারণ ঐ অঞ্চলে প্রথম কফির জন্ম হয়। আবার কাহারও মতে আরবের ইয়েমেন অঞ্চলেই কফির প্রথম আবিষ্কার ঘটে। প্রথমে ইহা ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। পরে ইহা পানীয়রূপে খ্যাতি লাভ করে। কফি এক প্রকার গাছের ফল। এই ফলকে বেরী (coffee berry) বলা হয়। কফি বেরী কোথাও এক বীজ (pea-berry) বা কোথাও দুই বীজ (berry) ফল হিসাবে জন্মে। এই বেরী আহরণ করিয়া উহার বীজগুলি অল্প আঁচে ভাজিয়া গুড়া করিয়া কফি প্রস্তুত করা হয়। কফি গাছ ৩/৫ বৎসরে ফল ধরে এবং একবার ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে ২৫/৩০ বৎসর কাল ফল দেয়।

ব্যবহার (Uses) : পানীয় হিসাবেই কফির বিশ্বব্যাপী ব্যবহার। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে টোটকা ঔষধ হিসাবেও উহার সামান্য ব্যবহার হইয়া থাকে। কফি দুই প্রকার—(১) **অ্যারাবিকা কফি** (Coffee Arabica)—ইহা স্বাদে গন্ধে উৎকৃষ্ট। ইহার ফলন কম ও ইহার দাম বেশি। অ্যারাবিকা কফির অন্তর্ভুক্ত মোচা কফি (Mocha coffee) বিশ্বে সর্বোৎকৃষ্ট। (২) **রোবাস্তা কফি** (Robusta coffee)—ইহা অ্যারাবিকা কফির ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। তবে ইহার উৎপাদন বেশি হয় ও ইহার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত কফির মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই রোবাস্তা কফি। কফিকে আবার তীব্র (Hard) ও মৃদু (Soft) দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ব্রেজিলের কফি প্রধানতঃ তীব্র ও অন্যান্য অঞ্চলের কফি মৃদু।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth) : জলবায়ু (Clmate) : কফি ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের ফসল। ২৪° উত্তর হইতে ২০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত বিস্তৃত অঞ্চলের উচ্চভূমিতে কফির চাষ হয়। বর্তমানে উত্তরে প্রায় ২৮° উত্তর ও দক্ষিণে প্রায় ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত কফি চাষ প্রসার লাভ করিয়াছে। উত্তাপ বার্ষিক গড় ২৭° হইতে ৩০° সে. এবং বৃষ্টিপাত ১৭৫ হইতে ২৫০ সে.মি. হওয়া

প্রয়োজন। কফির জন্য প্রচণ্ড উত্তাপ প্রয়োজন কিন্তু কফি গাছ অধিক রৌদ্র সহ্য করিতে পারে না। এই কারণে কফি বাগিচার মধ্যে কলা, ভুট্টা প্রভৃতি দীর্ঘ পত্র বিশিষ্ট গাছ লাগানো হয়। ফল পাকিবার সময় বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকা ভাল। প্রতি মাসে নিয়মিত পরিমাণ বৃষ্টিপাত কফির ভাল ফলনের পক্ষে উপযোগী।

মৃত্তিকা (Soil): উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা কফি চাষের পক্ষে উপযোগী। মৃত্তিকায় জৈব ও উদ্ভিজ্জ সার এবং লৌহ কনিকা, পটাস ও নাইট্রোজেন থাকা প্রয়োজন। লাভাজাত মৃত্তিকাও কফি চাষের পক্ষে অনুকূল। দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক স্থানে এই প্রকার মৃত্তিকায় কফির চাষ হয়।

ভূপ্রকৃতি (Topography): কফি বাগিচায় জল নিকাশী ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। এই কারণে পাহাড়ের ঢালেই ৯০০ হইতে ১২০০ মিটার উচ্চে বিশ্বের প্রধান প্রধান কফি বাগিচাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে।

অন্যান্য অবস্থা (Other factors): কফি চাষে প্রচুর সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য নিয়ত প্রচুর সার ব্যবহার করাও আবশ্যক। পৃথিবীর কোথাও স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইতে কফির আবাদ হয় না। রপ্তানিই মূল লক্ষ্য। সুতরাং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বন্দরের সুবিধা কফি আবাদের পক্ষে অপরিহার্য। নেমাটোড নামক এক প্রকার কীট কফি গাছের প্রধান শত্রু। বর্তমানে কীট নাশকের ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা এই কীটের আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়।

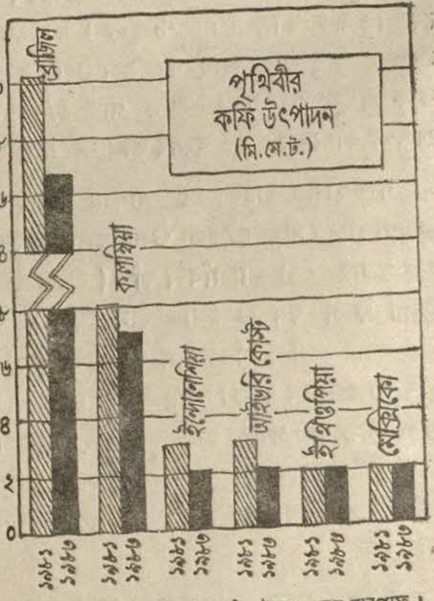

চিত্র ১১.৭: পৃথিবীর কফি উৎপাদনের বারগ্রাফ।

উৎপাদক অঞ্চল (Growing Ares): পৃথিবীর কফি উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর (২) উত্তর আমেরিকায় মেক্সিকো, গুয়াটেমালা, এল সালভেডর, নিকারগুয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জ্যামাইকা ও হাইতি, (৩) আফ্রিকায় অ্যাঙ্গোলা, কেনিয়া, আইভরিকোস্ট, ক্যামেরুন, লাইবেরিয়া, ইথিওপিয়া, উগাণ্ডা, তাঞ্জানিয়া, মালাগাসি, (৪) এশিয়ায় ভারত, ইয়েমেন, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়া।

ব্রেজিল : কফি উৎপাদনে সারা বিশ্বে ব্রেজিলের একচেটিয়া প্রাধান্য রহিয়াছে। পৃথিবীর মোট কফি উৎপাদনের প্রায় ½ অংশ ব্রেজিলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দেশের সাওপাওলো, মিনাস গেরায়েস, রিও-ডি-জেনেরিও, এসপিরিটো, পারানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কফিক্ষেত্র। এই দেশে কফি বাগিচাগুলি আয়তনে বেশ বড়। ইহার স্থানীয় নাম 'ফাজেন্দা' (Fazenda)। ব্রেজিলের অর্থনীতি অনেকাংশে কফি উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। ব্রেজিলের ক্রান্তীয় সাভানা জলবায়ু, টেরারোক্সা (Terraroxa) অর্থাৎ লাল মৃত্তিকা ও ৩৬০-৯০০ মিটার উচ্চ পর্বত ঢাল কফি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই দেশের কফি বাগিচাগুলি রেলপথের সাহায্যে বন্দরের সহিত যুক্ত। স্যাণ্টোস ও রিও ডি-জেনেরিও বিখ্যাত কফি রপ্তানি বন্দর। আন্তর্জাতিক বাজারে কফির দর স্থিতিশীল রাখিবার জন্য Institute to Permanent Defence of Coffee নামক একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে।

কলাম্বিয়া : আন্দিজ পর্বতের কর্ডিল্লেরা অঞ্চলে কফির আবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলাম্বিয়া বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কফি উৎপাদক দেশ। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ এই দেশে উৎপন্ন হয়। এই দেশের কফি বাগিচাগুলি আয়তনে ছোট ও ইহাদের স্থানীয় নাম 'ফিন্কাস'। যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা এই দেশের কফি আবাদের বিশেষ বাধা।

পৃথিবীর কফি উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)

দেশ	উৎপাদন		দেশ	উৎপাদন	
	১৯৭৫	১৯৮৩		১৯৭৫	১৯৮৩
ব্রেজিল	১৩.০০	১৬.৪০	আইভরিকোস্ট	২.৪০	২.২৫
কলাম্বিয়া	৫.৪০	৭.৯৮	ইথিওপিয়া	—	২.০৪
মেক্সিকো	২.৪০	২.৪০	ইন্দোনেশিয়া	১.৯২	২.৫৩
গুয়াটেমালা	১.৬৫	১.৫৪	ভারত	০.৯২	১.৩৫
পৃথিবী	৪৫.২১	৫৫.৬৯			

[Source : FAO Monthly Bulletin Statistics, January, 1984.]

মেক্সিকো : প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে চিয়াপাস ও ওয়াক্সাকা এই দেশের প্রধান কফি উৎপাদক অঞ্চল। মেক্সিকো উপকূলে ভেরাক্রুজ বিখ্যাত কফি রপ্তানি বন্দর।

ইয়েমেন : আরবের অন্তর্গত ইয়েমেন অঞ্চলে বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট কফি উৎপন্ন হয়। ইহাকে মোকা কফি বলে। এই অঞ্চলের নাতি আর্দ্র, উষ্ণ জলবায়ু এই ধরনের কফি চাষের সহায়ক। এডেন উল্লেখযোগ্য কফি রপ্তানি বন্দর।

ভারত : প্রধানত দক্ষিণ ভারতেই এই দেশের কফি আবাদ সীমাবদ্ধ। কর্ণাটক রাজ্যের শিমোগা, চিকমাগালুর, কুর্গ, হাসান, দক্ষিণ কানাড়া, তামিলনাড়ুর নীলগিরি, সালেম, তিরুচিরাপল্লী, কেরালার মালাবার, ত্রিবান্দ্রম, কোচিন কফি উৎপাদনের

প্রধান কেন্দ্র। সম্প্রতি অন্ধ্র ও উড়িষ্যা রাজ্যে কফির আবাদ প্রসারের চেষ্টা চলিতেছে। দক্ষিণ ভারতের পর্বতের উচ্চঢালে বৃষ্টিবিরল অঞ্চলে 'অ্যারাবিকা' কফি ও পর্বতের নিম্ন ঢালে বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে 'রোবাস্তা' কফির চাষ হয়। ভারতে উৎপাদিত কফির প্রায় ৫০ শতাংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। 'ইণ্ডিয়ান কফি বোর্ড' স্বদেশে ও বিদেশে কফির চাহিদা বৃদ্ধির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাইতেছে।

অন্যান্য কফি উৎপাদক দেশের মধ্যে আফ্রিকার ক্যামেরুন, কেনিয়া, উত্তর আমেরিকার কোস্টারিকা, এল স্যালভেডর, দক্ষিণ আমেরিকার পেরু এবং এশিয়ার চীন, শ্রীলংকা উল্লেখযোগ্য। ওশিয়ানিয়ার পাপুয়া, নিউগিনি ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় কয়েকটি দ্বীপেও সামান্য কফির চাষ হয়।

ব্যবসায় (Trade)—পৃথিবীর উৎপন্ন কফির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। ব্রেজিল ও কলাম্বিয়া যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় রপ্তানিকারী দেশ। আফ্রিকার আইভরি কোস্ট, অ্যাঙ্গোলা, ইথিওপিয়া, উগাণ্ডা, ক্যামেরুন প্রভৃতি দেশ হইতে একত্রে মোট রপ্তানির শতকরা প্রায় ২০ ভাগ আসে। আমদানিকারী দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা প্রধান। অন্যান্য আমদানিকারী দেশের মধ্যে ইউরোপের পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও সুইডেন উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় কফি ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই রপ্তানি হইয়া থাকে। চায়ের সহিত কফির ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা ও কফি উৎপাদন দেশগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার জন্য কফির বাজারে জটিলতা দেখা দিতে পারে ও ফলে কফি শিল্পের প্রসারেও বাধা সৃষ্টি হইতে পারে।

চা ও কফির তুলনা
(Tea and Coffee Plantation—a Comparison)

চা	কফি
১। চা মৃদু উত্তেজক পানীয়।	১। কফি মৃদু উত্তেজক পানীয়। ইহাতে খাদ্যগুণ আছে।
২। চা ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও আর্দ্র অংশেও চা জন্মে।	২। কফি কেবল ক্রান্তীয় অঞ্চলেই জন্মে।
৩। চা গাছের পাতা ও কুঁড়ি পানীয় প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।	৩। কফি ফলের বীজ চূর্ণ করিয়া পানীয় প্রস্তুত করা হয়।
৪। ২৭° সে. উত্তাপ ও ১২৫-২২৫ সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন।	৪। ৩০° সে. উত্তাপ ও ১৭৫-৩০০ সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন।
৫। প্রধানত বর্ষাকালেই চা পাতা আহরণ করা হয়।	৫। কফি বীজ ফলপুষ্ট হইলে সূর্যকরোজ্জ্বল শুষ্ক আবহাওয়ায় আহরণ করা হয়।

চা	কফি
৬। ঢাল‌ু জলনিকাশী স‌ুবিধায‌ুক্ত জমি চা বাগিচার পক্ষে উপয‌ুক্ত।	৬। ঢাল‌ু উচ্চভূমি বা পর্বতের ঢাল কফি বাগিচার পক্ষে আদর্শ।
৭। চা গাছ তুষারে বিনষ্ট না হইলেও তুষারপাতের ফলে ইহার উৎপাদন কম হয়।	৭। কফি গাছ আদৌ তুষার সহ্য করিতে পারে না।
৮। চায়ের চাহিদা প‌ৃথিবীর সর্বত্রই বিদ্যমান। দামে সস্তা বলিয়া ইহা খ‌ুবই জনপ্রিয়।	৮। শিল্পোন্নত দেশেই কফির চাহিদা সর্বাধিক। ইহার ম‌ূল্য অপেক্ষাকৃত বেশি বলিয়া ইহার চাহিদা বিশেষ কয়েকটি দেশেই সীমাবদ্ধ।

[প্রশ্ন : (১) কফি কয় প্রকার এবং কি কি? (২) কি প্রক্রিয়ায় বিক্রয়যোগ্য কফি প্রস্তুত করা হয়? (৩) 'মোচা কফি' কোন‌্ শ্রেণীর কফি? ইহা কোথায় উৎপন্ন হয়? (৪) কফি উৎপাদনের অন‌ুকূল তাপমাত্রা ও ব‌ৃষ্টিপাত কিরূপ? (৫) কফি উৎপাদক দেশগ‌ুলির নাম লিখ। (৬) ব্রেজিলের কোন‌্ কোন‌্ অঞ্চলে কফি উৎপাদিত হয়? (৭) "ফাজেন্দা" ও "ফিস্কাস" শব্দ দ‌ুইটির তাৎপর্য কি? (৮) কফি রপ্তানিকারক দ‌ুইটি দেশ ও দ‌ুইটি বন্দরের নাম উল্লেখ কর। (৯) এমন একটি দেশের নাম লিখ যেখানে চা ও কফি দ‌ুই-ই উৎপন্ন হয়।]

চিনি : ইক্ষ‌ুচিনি ও বীটচিনি
(Sugar : Cane Sugar and Beet Sugar)

চিনি মান‌ুষের প্রধান খাদ্য না হইলেও শরীর রক্ষার প্রয়োজনে ইহা মান‌ুষের খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। মান‌ুষের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও পানীয়ের সহিত চিনির সংযোগ অবিচ্ছেদ্য।

চিনি সাধারণত ইক্ষ‌ু, বীট, খেজ‌ুর, তাল, ম্যাপল‌্ (maple) এর রস হইতে তৈয়ারি করা যায় কিন্তু চিনি বলিতে ইক্ষ‌ুচিনি ও বীটচিনিকে ব‌ুঝায়। বিশ্বে উৎপাদিত চিনির প্রায় সবটাই ইক্ষ‌ু ও বীট হইতে আসে এবং ইহার পরিমাণ যথাক্রমে ৬৭ ও ৩৩ শতাংশ।

ইক্ষ‌ু (Sugar Cane)

ইক্ষ‌ু উষ্ণমণ্ডলের ফসল। স্যার জর্জ ওয়াটসের মতে ভারতই ইক্ষ‌ুর আদিস্থান। ভারত হইতে বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ইক্ষ‌ুর চাষ প্রসার লাভ করে। ইক্ষ‌ু দ‌ুই-তিন মিটার লম্বা হয়। ইহার কাণ্ডে যে রস জমা হয় উহার মধ্যে শর্করা উপাদান জমা থাকে। ইহা হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। ইক্ষ‌ু কাণ্ডের গোড়া হইতে ২-৩টি শাখা কাণ্ড বাহির হয়। ইক্ষ‌ু প‌ুষ্ট হইতে জলবায়‌ুর প্রভাব ভেদে ৯ মাস হইতে ২৪ মাস লাগে, যেমন ভারতে ৯ মাস, জাভায় ১৮ ও হাওয়াইতে ২৪ মাস সময় প্রয়োজন হয়।

এই সময়ের ভিত্তিতে ইক্ষ‌ুকে (ক) দীর্ঘজীবী ও (খ) বার্ষিক—এই দ‌ুই শ্রেণীতে

ভাগ করা যায়। দীর্ঘজীবী ইক্ষু হইতে কয়েক বৎসর ফসল আহরণ করা হয় এবং বার্ষিক ইক্ষু হইতে ১ বৎসর ফসল পাওয়া যায়।

ব্যবহার (Uses): ইক্ষুর রস হইতে আধুনিক কারখানায় নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে চিনি প্রস্তুত করা হয়। চিনি হইতে আবার মিছরী, বাতাসা, নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্যাদি তৈয়ারি করা হয়। চিনির গাদ হইতে মদ্য, সুরাসার (alcohol), কৃত্রিম রবার (synthetic rubber) প্রভৃতিও প্রস্তুত করা হয়। চিনি ও অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্য যেমন মানুষের দৈনন্দিন আহারের সহিত নানাভাবে ব্যবহৃত হয়, তেমনি নিকৃষ্ট ধরনের গুড় (molasses) গো-মহিষাদির অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ইক্ষুর ছিবড়া (Bagasee) হইতে কাগজ, কার্ডবোর্ড ও শব্দ নিরোধক ফাইবারবোর্ড (Fibre Board) তৈয়ারি হয়। ইক্ষুর অগ্রভাগ গোমহিষাদির খাদ্য ও ছিবড়া জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

চাষের অনুকূল অবস্থা

জলবায়ু (Climate): ইক্ষু ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুতে ভাল জন্মে। বার্ষিক গড় উত্তাপ ২৭° সে. ও বৃষ্টিপাত ১০০-২৫০ সে মি. হওয়া প্রয়োজন। বৃষ্টিপাত কম হইলে জলসেচ আবশ্যক। ইক্ষুক্ষেত্রে তুষার-পাত ও অধিক বৃষ্টিপাত ইক্ষুর পক্ষে ক্ষতিকর। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত ও শীতকাল শুষ্ক হইলে ইক্ষুর মধ্যে শর্করার রস ঘনীভূত হয়। সামুদ্রিক লোনা আবহাওয়া ইক্ষু চাষের অনুকূল। এই কারণে উষ্ণমণ্ডলের দ্বীপ ও সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে ইক্ষুর ব্যাপক চাষ লক্ষ্য করা যায়।

মৃত্তিকা (Soil): চুন-লবণযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা ইক্ষু চাষের পক্ষে উপযোগী। ইক্ষুক্ষেত্রে জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা ও মৃত্তিকার অন্তর্ভূমির জল ধারণ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এই কারণে লাভা ও পলিমৃত্তিকা ইক্ষু চাষের সহায়ক।

ভূ-প্রকৃতি (Topography): ইক্ষুক্ষেত্রে জল জমা হইলে ইক্ষুর যেমন ক্ষতি হয় তেমনি ১০০ সে মি. এর কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে সেচের প্রয়োজন হয়। সুতরাং ইক্ষু চাষে অনুচ্চ ঢালু সমতলভূমি বিশেষ উপযোগী। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল বা পর্বতের ঢালে ইক্ষু চাষ হয় না।

অন্যান্য অবস্থা (Other factors): ইক্ষু চাষে নিয়মিত চারার যত্ন লওয়া, জমি পরিষ্কার রাখা, ফসল কাটা ইত্যাদি কার্যে প্রচুর দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। ইক্ষু চাষে জমির উর্বরতা ভীষণভাবে কমিয়া যায় বলিয়া নাইট্রোজেন সারের ব্যাপক ব্যবহার আবশ্যক। ইহা ছাড়া ইক্ষু ক্ষেত্র হইতে চিনি কলে দ্রুত ইক্ষু পরিবহণের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থারও প্রয়োজন।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions): ইক্ষুর উৎপাদন জলবায়ুর কারণে ৩২° উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৩২° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ। ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত, ব্রেজিল, কিউবা, চীন,

জাভা, ফিলিপাইন, মরিসাস, জামাইকা, অস্ট্রেলিয়া প্রধান। ইহার মধ্যে ভারত, কিউবা ও ব্রেজিল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বিশ্বে ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত দেশসমূহের নাম উল্লেখযোগ্য :—

এশিয়া : ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত জাভাদ্বীপ, পাকিস্তান, ফিলিপাইন এশিয়ার অন্তর্গত রাশিয়া।

ইউরোপ : দক্ষিণ ইতালি ও স্পেন।

আফ্রিকা : মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, মরিসাস।

উত্তর আমেরিকা : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, (হাওয়াই), মেক্সিকো, মধ্য আমেরিকার সকল রাজ্য, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, কিউবা, জামাইকা, ত্রিনিদাদ, পোর্টোরিকো, ডোমানিকান রিপাবলিক।

দক্ষিণ আমেরিকা : ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, গায়েনা, ইকুয়েডর, কলাম্বিয়া প্রভৃতি।

ওশিয়ানিয়া : অস্ট্রেলিয়া।

পৃথিবীর ইক্ষু উৎপাদন (মি. মে. ট.)

দেশ	উৎপাদন		দেশ	উৎপাদন	
	১৯৮১	১৯৮৩		১৯৮১	১৯৮৩
ব্রেজিল	১৫৫.৬	২০৯.২	মেক্সিকো	৩৪.৯	৩৫.০
ভারত	১৫৪.২	১৮৯.১	পাকিস্তান	৩২.৩	৩২.৫
কিউবা	৬৬.৭	৬৬.০	আঃ যুক্তরাষ্ট্র	২৪.৮	২৭.৮
চীন	৩৭.৫	৪৪.৩	পৃথিবী	৭৮৯.২	৮৯৭.৮

[Source : FAO Monthly Bulletin, January, 1984]

ভারত : বিশ্বে ইক্ষু উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান প্রথম। ভারতের জলবায়ু ও মৃত্তিকা প্রায় সর্বত্রই মোটামুটিভাবে ইক্ষু চাষের সহায়ক। ইহা ছাড়া সুলভ শ্রমিক, জলসেচ ও আভ্যন্তরীণ চাহিদার সুবিধা থাকায় ভারতে প্রায় সকল রাজ্যেই কম-বেশি ইক্ষু চাষ হয়। ভারতে ইক্ষু উৎপাদনের দুইটি নির্দিষ্ট অঞ্চল দেখা যায়—উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল।

উত্তরাঞ্চল : উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ইক্ষু উৎপাদনে উত্তরপ্রদেশ ভারতে প্রথম। **দক্ষিণাঞ্চল :** এই অঞ্চলের অন্তর্গত ইক্ষু উৎপাদক রাজ্যগুলির মধ্যে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রধান।

এই দুইটি অঞ্চল ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ত্রিপুরা, রাজস্থান, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যেও ইক্ষু জন্মে। ভারতে হেক্টর প্রতি ইক্ষুর উৎপাদন (৫০ মে. টন), জাভা (৮১ মে. টন), অস্ট্রেলিয়া (৭৯ মে. টন), মরিসাস (৭৫ মে. টন) প্রভৃতি দেশের

তুলনায় কম। ভারতে উৎপাদিত ইক্ষুর প্রায় ৫০% গুড় ও লাল চিনি, ৩০-৩৫% চিনি ও অবশিষ্টাংশ স্থানীয় অঞ্চলে রস আস্বাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ভারতে অর্ধেক রাজ্যে চিনি কলগুলি ইক্ষুক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া চিনির উৎপাদন ব্যয় বেশি। ভারতে গুড় ও চিনির আভ্যন্তরীণ চাহিদা বেশি। এই কারণে রপ্তানির পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতেছে না।

ব্রেজিল : এই দেশ বর্তমানে ইক্ষু উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ব্রেজিলের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ঢালু সমভূমি, মধ্যাঞ্চলের মালভূমির কিয়দংশ ও উত্তরে ভিক্টোরিয়া হইতে দক্ষিণে রিও-ডি-জেনেরিও পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। উপকূলভাগে সামুদ্রিক লোনা মাটি ও লোনা আবহাওয়া ইক্ষুর অধিক ফলনের সহায়ক। এই দেশ হইতে বিশ্বের বাজারে প্রচুর চিনি রপ্তানি করা হয়।

কিউবা : কিউবা ইক্ষু উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়। কিউবার অর্থনীতিতে চিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধান বাণিজ্য সম্পদ। এই দ্বীপের লোনা জলবায়ু নদী-উপত্যকার চুনমিশ্রিত পলিমাটি ইক্ষু চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই দেশের অর্থনীতির কাঠামো বর্তমানে সাম্যবাদভিত্তিক হওয়ায় ইক্ষুচাষে আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই দেশের বেশির ভাগ চিনি এক সময় আমেরিকায় রপ্তানি হইত। বর্তমানে পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ এই দেশের বেশির ভাগ চিনি গ্রহণ করিয়া থাকে।

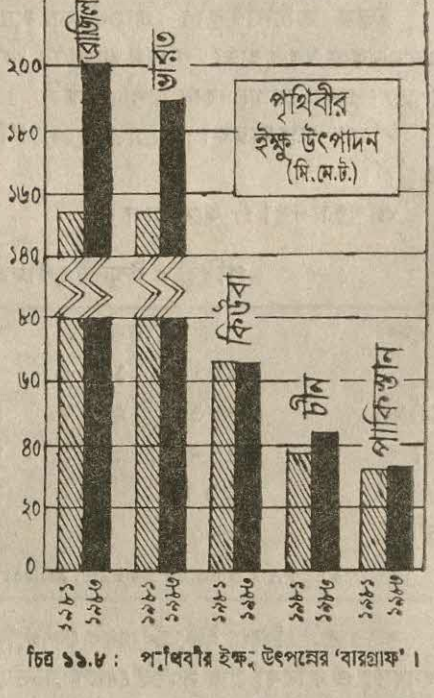

চিত্র ১১.৮ : পৃথিবীর ইক্ষু উৎপন্নের 'বারগ্রাফ'।

অস্ট্রেলিয়া : এই দেশের উত্তর-পূর্বে মৌসুমী জলবায়ু-অধ্যুষিত কুইন্সল্যাণ্ড প্রদেশেই প্রধানত ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। সেচের সাহায্যে এই দেশে হেক্টর প্রতি ইক্ষুর উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

জাভা (ইন্দোনেশিয়া) : সামুদ্রিক বায়ু, উর্বর মৃত্তিকা ও সুলভ শ্রমিক প্রভৃতির আনুকূল্যে এই দেশে প্রচুর ইক্ষু জন্মে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের উপর ইহার অবস্থান হওয়ায় চিনি রপ্তানিতে এই দেশের স্বাভাবিক সুযোগ বর্তমান।

হাওয়াই : এই দ্বীপের জলবায়ু ও মৃত্তিকা ইক্ষুচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আধুনিক কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের সাহায্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই দ্বীপে প্রচুর ইক্ষু উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছে। হেক্টর প্রতি উৎপাদনে বর্তমানে হাওয়াই দ্বীপের স্থান প্রথম (৯০ মে. টন)।

চিত্র ১১.৯ : পৃথিবীর ইক্ষু ও বীট উৎপাদক অঞ্চলের নিদর্শক।

ব্যবসায় (Trade) : কাঁচামাল হিসাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইক্ষুর কোন স্থান নাই। স্থানীয়ভাবেই ইক্ষু হইতে চিনি তৈয়ার করা হয়। বিশ্বের বাজারে চিনির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। চিনি রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে কিউবা, ব্রেজিল, ভারত, জাভা, ফিলিপাইন, মরিসাস, মিশর প্রধান। চিনির আমদানি প্রধানত শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধান আমদানিকারী দেশ। অন্যান্য চিনি আমদানিকারী দেশের মধ্যে পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ ও জাপান, কানাডা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

[**প্রশ্ন** : (১) কোন্ দেশকে ইক্ষুর আদিস্থান বলা হয়? (২) ইক্ষুর বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (৩) উৎপাদনের সময় অনুসারে ইক্ষুকে কি কি ভাগে ভাগ করা যায়? (৪) ইক্ষুজাত চিনির রপ্তানিকারক প্রধান তিনটি দেশের নাম উল্লেখ কর।]

বীট (Sugar Beet)

বীট নাতিশীতোষ্ণ ও হিমোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। জলবায়ু ও অর্থনৈতিক কারণে ইহার চাষ প্রধানত উত্তর গোলার্ধেই সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ গোলার্ধে বীটের চাষ প্রায় নগণ্য।

ব্যবহার (Uses) : বীট শর্করা শিল্পের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল ইক্ষুর পরেই বীটের স্থান। বীটের মূলে প্রচুর রসের সহিত 'সাক্রোজ' জমিয়া থাকে এবং

ইহা হইতেই চিনি প্রস্তুত করা হয়। পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবেও বীটের ব্যবহার প্রচলিত। বীটের পাতা উত্তম পশু খাদ্য ও জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Favourable conditions of growth)

জলবায়ু (Climate) : বীট নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উদ্ভিদ। সুতরাং বেশি তাপ বা বৃষ্টিপাত বীট চাষের পক্ষে ক্ষতিকর। ১৮°-২০° সে. বার্ষিক গড় উত্তাপ, ৫০-১০০ সে.মি. বৃষ্টিপাতযুক্ত মহাদেশীয় জলবায়ু বীট চাষের পক্ষে উপযোগী। চাষের প্রথম দিকে ও ফসল তোলার পূর্বে বৃষ্টিপাত ইহার পক্ষে অনুকূল। জলসেচ বীটের ফলন বৃদ্ধি করে।

মৃত্তিকা (Soil) : বীট চাষের পক্ষে চুন ও হিউমাস সমৃদ্ধ উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা প্রয়োজন। মৃত্তিকার গঠন আলগা বা ফাঁপা হইলে বীটের আকার বৃদ্ধি পায়। লোয়েস মৃত্তিকায় ভাল বীটের চাষ হয়।

ভূ-প্রকৃতি (Topography) : জলনিকাশের জন্য ঢালযুক্ত সমতলভূমি বীট চাষে আবশ্যক। কারণ বীটের গোড়ায় জল জমিয়া থাকিলে ফসলের ক্ষতি হয়।

অন্যান্য অবস্থা (Other factors) : বীট চাষে প্রচুর দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে বহু দেশে যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে শ্রমিক নিয়োগের গুরুত্ব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। বীট চাষে জমির উর্বরতা ভীষণভাবে হ্রাস পায়। এই কারণে জমিতে প্রচুর সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানী সর্বপ্রধান বীট উৎপাদক দেশ ছিল। বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম। ফ্রান্স ও আমেরিকার স্থান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়। পশ্চিম ইওরোপে ফ্রান্সের পশ্চিম প্রান্ত হইতে চেকোশ্লোভাকিয়া, ইত্যাদির মধ্য দিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্রান্সককেসীয়া ও সাইবেরিয়ার পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বীটের চাষ হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ইতালি, ডেনমার্ক, সুইডেন ও উত্তর আমেরিকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বীটের চাষ হয়। অস্ট্রেলিয়ায় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও ভারতে সামান্য বীটের চাষ হয়। চিনি উৎপাদনে ইহার ভূমিকা অতীতে খুবই নগণ্য থাকিলেও বর্তমানে ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন : বীট উৎপাদনে এই দেশ প্রথম। বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৩০ শতাংশ বীট সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়। ইউক্রেন অঞ্চলেই এই দেশের ¾ ভাগ বীট চাষ হয়। ককেশাস অঞ্চলে ভল্গা নদীর নিম্ন উপত্যকায় প্রচুর বীট চাষ হয়। নাতিশীতোষ্ণ মহাদেশীয় জলবায়ু, সারনোজেম মৃত্তিকা, ইক্ষু চাষের অসুবিধা ইত্যাদি এই দেশে বীট চাষের পক্ষে অনুকূল।

ফ্রান্স : ফ্রান্সের জলবায়ু এবং মৃত্তিকা বীট উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই দেশে ফ্লাণ্ডার্স, প্যারি, পিকার্ডি, লিমোজেন প্রধান বীট উৎপাদনকারী অঞ্চল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র : বিশ্বের মোট উৎপাদিত বীটের প্রায় ১০-১২ শতাংশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জন্মে। ক্যালিফোর্ণিয়া এই দেশের প্রধান বীট উৎপাদক অঞ্চল। ইহা ছাড়া অন্যান্য বীট উৎপাদক রাজ্যের মধ্যে ইডাহো, কলোরাডো, নেব্রাস্কা, মিচিগান, ওয়াশিংটন, মিনেসোটা, মণ্টানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বিশেষ প্রয়োগের ফলে বীটের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে ও উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাইতেছে।

বিশ্বে বীট উৎপাদন (মি. মে ট.)

দেশ	উৎপাদন		দেশ	উৎপাদন	
	১৯৮১	১৯৮৩		১৯৮১	১৯৮৩
রাশিয়া	৬০.৫	৮২.০	পঃ জার্মানী	২৪.৯	১৬.৫
ফ্রান্স	৩৪.১	২৪.০	চীন	৬.৩	৭.৫
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	২৪.৯	১৯.১	পৃথিবী	২৮৪.৮	২৭৫.৬
পোল্যাণ্ড	১৫.৭	১৫.৮			

[Source : FAO Monthly Bulletin, January, 1984.]

পশ্চিম জার্মানী : ইওরোপে একসময় যুক্ত জার্মানী সর্বাধিক বীট উৎপাদনের নজির সৃষ্টি করিয়াছিল। বর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স বাদে জার্মানীর এই পশ্চিমাংশ ইওরোপে অন্যতম প্রধান বীট উৎপাদক অঞ্চল। নিম্ন স্যাকসনি ও উত্তর রাইন অঞ্চল বীট উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র।

কানাডা : এই দেশে বৃটিশ কলম্বিয়া, সাসকাচুয়ান, কুইবেক ও হাডসন উপত্যকায় প্রধানত বীট চাষ হইয়া থাকে।

ব্যবসায় (Trade) : বীট, ইক্ষু প্রভৃতি পচনশীল সামগ্রী হওয়ায় কাঁচামাল হিসাবে ইহাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নাই। অধিকন্তু বীট চিনির উৎপাদন এতই কম যে উৎপাদনকারী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া রপ্তানিযোগ্য অতিরিক্ত সামান্যই থাকে। ফলে ইহার আমদানি ও রপ্তানি খুবই সামান্য। একমাত্র পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন সামান্য বীট চিনি রপ্তানি করিয়া থাকে। আমদানিকারী দেশ হিসাবে বৃটিশ যুক্তরাজ্য প্রধান।

ইক্ষু ও বীটের তুলনা (Sugar cane and Beet—a Comparison)

ইক্ষু	বীট
১। ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের ফসল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই ইহার চাষ বেশি হয়।	১। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের ফসল। শীতপ্রধান মহাদেশীয় জলবায়ু-অধ্যুষিত দেশে ইহার চাষ বেশি হয়।

ইক্ষু	বীট
২। উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথাক্রমে ২৭° সে. এবং ১০০-১৫০ সে.মি. হওয়া আবশ্যক। স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে জলসেচ প্রয়োজন।	২। ১৬°-২০° সেঃ উত্তাপ ও ৫০-৭৫ সে. মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন।
৩। চুন ও লবণ যুক্ত ভারী দো-আঁশ মৃত্তিকা ইক্ষুচাষের অনুকূল।	৩। চুন ও হিউমাসযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা বীট চাষের উপযোগী।
৪। ইক্ষুক্ষেত্র ঢালু হওয়া ও জল-নিকাশের সুব্যবস্থাযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কারণ ইক্ষুর গোড়ায় জল জমিলে গাছ মরিয়া যায়।	৪। বীটক্ষেত্রে জমিতে জল শোষিত হওয়া প্রয়োজন। স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা অপরিহার্য।
৫। সামুদ্রিক বায়ু ইক্ষু চাষের সহায়ক। সমুদ্রের লোনা হাওয়ায় ইক্ষুর ফলন বৃদ্ধি পায়।	৫। বীট চাষে সামুদ্রিক বায়ুর প্রয়োজন হয় না।
৬। ইক্ষুর উৎপাদন প্রধানত ৯ মাস হইতে ১২ মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলেও কোন কোন জাতীয় ইক্ষু ২৪ মাসেও ফলন দেয়।	৬। বীট উৎপাদনে ৩/৪ মাস কাল দরকার হয়। প্রতি বৎসরই ইহার চাষ আবাদ করিতে হয়।
৭। ইক্ষু চাষে প্রচুর সার ও সুলভ শ্রমিক দরকার।	৭। বীট চাষে যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধা থাকায় শ্রমিকের যোগান কম প্রয়োজন। সারের প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও বীটের খইল সাররূপে ব্যবহার হয় বলিয়া অন্যান্য সারের চাহিদা কম।
৮। ইক্ষুজাত চিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য পণ্য।	৮। বীট হইতে উৎপন্ন চিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অনুল্লেখ্য।

[প্রশ্ন : (১) বীট ও ইক্ষু উৎপাদনের অনুকূল অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কর।]

তূলা বা কার্পাস (Cotton)

খাদ্যের পরেই মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজন। মানুষের বস্ত্রের অভাব মিটাইতে তন্তু হিসাবে তূলা বা কার্পাসের ব্যবহার বিশ্বের নানাদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত মানুষের বস্ত্রের চাহিদা যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে তেমনি নানাদেশের জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী বস্ত্র তৈয়ারীর

তন্তুরও প্রকারভেদ ঘটিতেছে। রেশম, পশম, তসর, পাট, শণ, ইত্যাদির তন্তুর সহিত বর্তমানে রাসায়নিক তন্তুরও ব্যাপক প্রচলন ঘটিয়াছে। তথাপি বস্ত্রশিল্পে তন্তু হিসাবে তূলার চাহিদাই সর্বাধিক।

তূলার বাণিজ্যিক ব্যবহারের সূচনা হয় শিল্প-বিপ্লবের ফলে। তূলার বাণিজ্যিক চাষের প্রচলন করে শ্বেতাঙ্গ ইওরোপীয় ঔপনিবেশিকগণ। বিশ্বে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তূলা চাষের প্রসারের সহিত ঔপনিবেশিক শোষণের ইতিহাস বিশেষভাবে জড়িত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো মানুষের আবাস গড়িয়া উঠিবার মূলে আমেরিকার তূলার প্রতি শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকগণের অতিরিক্ত আকর্ষণ। ইহার ফলে আফ্রিকার অরণ্য প্রকৃতি হইতে হাজার হাজার নিগ্রো যুবক-যুবতীর রাতারাতি আগমন ঘটে আমেরিকার মাটিতে দাস ব্যবসায়ের সিংহদরজা পার হইয়া ক্রীতদাস হিসাবে।

ব্যবহার (Uses): সূতীবস্ত্রের তন্তু হিসাবে তূলার প্রধান ব্যবহার। বিশ্বের মোট উৎপাদিত তূলার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হয়। বস্ত্রছাড়া তূলার সাহায্যে কার্পেট, গদি, বালিশ, লেপ, তোশক, প্যাড, ব্যাণ্ডেজ, সূতা, দড়ি, তাঁবু, সতরঞ্জি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তূলা কাগজের মণ্ড, কৃত্রিম রেশম তৈয়ারিতেও ব্যবহার করা হয়। তূলার বীজ হইতে ভক্ষ্য তেল তৈয়ারি হয় ও ইহার খইল পশু খাদ্য ও সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তূলা হইতে সেলুলোজ (cellulose) প্রস্তুত করা হয়।

শ্রেণীবিভাগ (Classification): তূলার আঁশের দৈর্ঘ্য, মসৃণতা দৃঢ়তা, ঔজ্জ্বল্য রং প্রভৃতির উপর ইহার গুণাগুণ নির্ভর করে। সুতরাং তূলার আঁশের দৈর্ঘ্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া ইহাকে চারি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তূলা (Short staple cotton বা Gossypium arboreum) ইহার আঁশের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ২·২ সেণ্টিমিটারের কম হয়। ফলে সূতা মোটা ও কর্কশ হয় এবং মোটা ও সস্তা কাপড় তৈয়ারি করিতে ইহার ব্যবহার বেশী হয়। এই প্রকার তূলা ভারতে যথেষ্ট হয় বলিয়া ইহাকে ভারতীয় তূলা বা Indian cotton বলা হয়। (২) মধ্যম আঁশযুক্ত তূলা (Medium staple cotton বা Gossypium hirsulium)—ইহার আঁশের দৈর্ঘ্য ২·২ সে. মি. থেকে ২·৯ সে. মি. পর্যন্ত হয়। আমেরিকার উচ্চভূমিতে ইহার চাষ সর্বাধিক হয় বলিয়া ইহাকে উচ্চভূমির তূলা বা Upland cotton বলা হয়। ইহার আঁশ মোটা বা কর্কশ নহে। ইহার সাহায্যে মধ্যম প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। (৩) দীর্ঘ আঁশযুক্ত তূলা (Long staple cotton or Gossypium barbadisse)—এই তূলার আঁশ ২·৯ সে. মি হইতে ৪·৫ সে. মি. পর্যন্ত হয়। ইহা যেমন মসৃণ ও মিহি তেমনি দৃঢ়। মিহি কাপড় তৈয়ারি করিতে ইহা সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। মিশর, সুদান, উগাণ্ডা, তাঞ্জানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার চাষ হয়। ইহাকে মিশরীয় দীর্ঘ আঁশযুক্ত তূলা বলে (Egyptian long staple cotton)। (৪) সাগর দ্বীপীয় তূলা (Sea Island

cotton) দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার মধ্যে এক প্রকার অতি মসৃণ, সূক্ষ্ম ও ৪·৫ সে. মি.-এর বেশি দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা দেখা যায়। দ্বীপ ও সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চলে এই তুলার চাষ সীমাবদ্ধ বলিয়া ইহাকে সাগর দ্বীপীয় তুলা বলা হয়। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ইহা প্রধানত জন্মে।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Conditions for Cultivation): তুলা বা কার্পাস গাছ ২/৩ মিটার লম্বা হয়। ইহাতে এক প্রকার সবুজ গুটি হয়। এই গুটি ফাটিয়া তুলা বাহির হয়। গুটির মধ্যে থরে থরে সাজানো বীজের গায়ে প্যাডের মত তুলার আঁশ দৃঢ়ভাবে জড়ানো থাকে।

জলবায়ু (Climate): তুলা চাষে ন্যূনপক্ষে ২১০টি তুহিনমুক্ত দিন প্রয়োজন। তুষার ও তুহিন তুলার পক্ষে ক্ষতিকারক। এই কারণেই ক্রান্তীয় সাভানা ও আর্দ্র উপক্রান্তীয় অঞ্চলেই ইহার চাষ সর্বাধিক হইয়া থাকে। তুলা চাষে বার্ষিক গড় উত্তাপ প্রায় ২৪° সেঃ ও গড় বৃষ্টিপাত ৭৫-১২৫ সে. মি. হওয়া প্রয়োজন। গুটি বাহির হইবার পর স্বল্প উত্তাপ এবং গুটি পাকিবার সময় উজ্জ্বল সূর্য কিরণ বিশেষ উপযোগী। জলসেচ অধিক ফলনের সহায়ক। সামুদ্রিক বায়ুও তুলা চাষের পক্ষে খুব উপযোগী।

মৃত্তিকা (Soil): তুলার জন্য লবণ ও চুন মিশ্রিত হালকা দো-আঁশ মৃত্তিকা প্রয়োজন। মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা থাকা দরকার। তুলা গাছের গোড়ায় জল জমিলে গাছ মরিয়া যায়। এই কারণে জমিতে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। মৃত্তিকার এইসব গুণ সাধারণত লাভা দ্বারা গঠিত এক প্রকার কালো মৃত্তিকায় দেখা যায়। এই মৃত্তিকা চাষের পক্ষে উপযোগী বলিয়া বিশ্বে ইহা কালো তুলা মৃত্তিকা (Black cotton soil) নামে খ্যাত। তুলা চাষের জমি গভীর ও উর্বর হওয়া প্রয়োজন।

ভূ-প্রকৃতি (Topography): কার্পাস ক্ষেত্র ঢালু সমতল হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে জলসেচ, জল নিষ্কাশন ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ ঘটে।

অন্যান্য উপাদান (Other factors): তুলা চাষের জমি প্রস্তুত করা, বীজ বোনা, কীটের আক্রমণ হইতে গাছকে রক্ষা করা, গুটি আহরণ করা ইত্যাদি কাজে প্রচুর দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তুলা উৎপাদন ক্ষেত্রে বর্তমানে বহু দেশেই নানাবিধ যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। তথাপি শ্রমিকের চাহিদা যথেষ্ট। তুলা ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সার ব্যবহার করা আবশ্যক। অধিকন্তু তুলা চাষে প্রচুর কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। তুলার প্রধান শত্রু হল বল উইভিল (Boll Weevil)। ইহারা গুটি খাইয়া ফেলে। ইহা ব্যতীত রুট রট (Root Rot) ও পিঙ্কবোল (Pink Boll) নামে আরও কয়েক প্রকার কীট তুলার প্রভূত ক্ষতি করে। বর্তমানে কীটনাশক হিসাবে ক্যালসিয়াম অ্যামিনেট জাতীয় নানা ধরনের বিষাক্ত ঔষধ কার্পাস ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions) : ভারত ও চীন দেশেই প্রথম তূলার চাষ শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে বিশ্বের নানা দেশে তূলা চাষ প্রসার লাভ করে। নিম্নে বিশ্বের প্রধান তূলা উৎপাদক দেশসমূহের নাম উল্লেখ করা হইল :

চিত্র ১১.১০ : পৃথিবীর তূলা উৎপাদক অঞ্চলের ও বাণিজ্য পথের নিদর্শক।

এশিয়া : চীন, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক, সোভিয়েত রাশিয়া।

আফ্রিকা : মিশর, সুদান, উগাণ্ডা, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, রোডেসিয়া, তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া।

উত্তর আমেরিকা : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো।

দক্ষিণ আমেরিকা : ব্রেজিল, পেরু, আর্জেন্টিনা।

সোভিয়েত রাশিয়া : তূলা উৎপাদনে সোভিয়েত রাশিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিত। ১৯৮৩ সালে চীন প্রথম স্থান অধিকার করে। ফলে ইহার স্থান দ্বিতীয় হইয়াছে। বিশ্বের মোট তূলার ২০ ভাগ এই দেশে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তূলা উৎপাদনে ইহার তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। এই দেশে তূলার চাষ মধ্য এশিয়ার মরুপ্রায় অঞ্চলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কাজাকস্থান, তুর্কমেনিস্থান, উজবেকিস্থান, আজার বাইজন, উত্তর ককেশাস্ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য তূলা উৎপাদক অঞ্চল। বুখারা, সমরখন্দ, আশকাবাদ, টিফলিস প্রভৃতি তূলা গাঁট বন্দী করার কেন্দ্র। দক্ষিণ ইউক্রেন ও ক্রিমিয়াতেও তূলা উৎপন্ন হয়। সোভিয়েত রাশিয়ায় তুলা ক্ষেত্রে ব্যাপক জলসেচের ব্যবস্থা আছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র : ইহা বিশ্বে তৃতীয় তূলা উৎপাদনকারী দেশ। দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যগুলিকে লইয়া আমেরিকায় বিখ্যাত তূলাবলয় গঠিত। ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, আলাবামা, মিসিসিপি প্রভৃতি এই তূলাবলয়ের প্রধান তূলা উৎপাদক অঞ্চল। এই অঞ্চলের পূর্বপ্রান্তে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি বলিয়া 'বল উইভিল' পোকার আক্রমণে তূলার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। বর্তমানে এই বলয়টি ক্রমাগত, মিসিসিপি নদীর পশ্চিমে প্রসারিত হইতেছে। জলসেচের সাহায্যে পশ্চিমের টেকসাস, নিউমেক্সিকো,

অ্যারিজোনা, কলোরাডো প্রভৃতি রাজ্যে তূলার ব্যাপক চাষ হইতেছে। এই সকল অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক ও মরুপ্রায়। এই দেশে তূলা চাষে নিয়মিত সেচ, সার ও

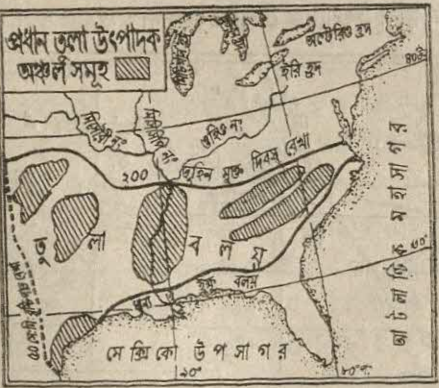

চিত্র ১১.১১ : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান তুলা উৎপাদক অঞ্চলের নিদর্শক।

যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এই দেশ প্রতি বৎসর প্রচুর তূলা বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকে। লুইসিয়ানা রাজ্যে মিসিসিপির তীরে নিউ অর্লিন্স, টেকসাস রাজ্যের গ্যালভাস্টোন ও জর্জিয়া রাজ্যে সাভানা নদীর মোহনায় অবস্থিত সাভানা উল্লেখযোগ্য তূলা রপ্তানি বন্দর।

চীন : এই দেশ তূলা উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয় স্থানের অধিকারী ছিল। কিন্তু ১৯৮৩ সালে ইহার উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং দেশটি বর্তমানে তূলা উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। চীনের ইয়াং-সি-কিয়াং ও হোয়াংহো নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলেই সর্বাধিক তূলার চাষ হইয়া থাকে। উত্তর চীনের সমভূমি, সেনসির উপত্যকা, হুপেই পর্বতক, ইয়াংসি ব-দ্বীপ, কিয়াংসু উপকূল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য তূলা উৎপাদন কেন্দ্র। চীনের জলবায়ু ও মৃত্তিকা তূলা চাষের পক্ষে অনুকূল হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদিত তূলার মান তেমন উন্নত নহে।

ভারত : পৃথিবীতে তূলা উৎপাদক দেশ হিসাবে ভারত চতুর্থ। ভারতের দাক্ষিণাত্যের কৃষি অঞ্চলেই সর্বাধিক তূলা উৎপাদিত হয়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশে প্রচুর তূলা জন্মে। সাম্প্রতিক কালে রাজস্থান ও পাঞ্জাবে জলসেচের ফলে তূলার চাষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। ভারতে ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তূলাই বেশী জন্মে। বর্তমানে রাজস্থান, পাঞ্জাব, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে মধ্যম হইতে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তূলার চাষ করা হইতেছে।

মিশর : মিশরীয় তূলা দীর্ঘ আঁশযুক্ত মসৃণ ও উজ্জ্বল হওয়ায় পশ্চিম ইউরোপে ইহার জনপ্রিয়তা খুবই বেশি। মিশরে নীল নদের ব-দ্বীপ অঞ্চলেই এ দেশের প্রায় ৯০ ভাগ তূলা উৎপাদিত হয়। অসওয়ান বাঁধ হইতে কায়রো পর্যন্ত নীল নদের উভয় তীরে জলসেচের সাহায্যে নিবিড়ভাবে তূলার চাষ করা হয়।

ব্রেজিল: এই দেশের উত্তর-পূর্ব দিকে রিওগ্রাণ্ডি এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকে সাওপাউলো অঞ্চলে প্রচুর ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা জন্মে। পূর্ব উপকূলের বাহিয়া ও পার্নামবুকো এই দেশের তুলা রপ্তানির প্রধান বন্দর।

মেক্সিকো রাজ্যে রিওগ্রাণ্ডি নদীর ব-দ্বীপে ও পশ্চিম উপকূলে তুলার চাষ হয়।

পাকিস্তানে সিন্ধু অববাহিকায় জলসেচের সাহায্যে মধ্যম আঁশযুক্ত তুলার চাষ হইয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত ইরাণ, সুদান, উগাণ্ডা, কঙ্গো, পেরু, আর্জেণ্টিনা প্রভৃতি রাজ্যেও ক্ষুদ্র হইতে মধ্যম আঁশযুক্ত তুলার চাষ হয়।

ব্যবসায় (Trade): বিশ্বে তুলা উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে তুলার আভ্যন্তরীণ চাহিদা বেশি হওয়ায় তাহাদের রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত কমই থাকে। এই কারণে বিশ্বে উৎপাদিত তুলার মাত্র ২০-৩৫ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যার অনুপাতে তুলার উৎপাদন বেশী হয় বলিয়া প্রচুর তুলা উহারা রপ্তানি করিয়া থাকে। অন্যান্য রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে মেক্সিকো, পাকিস্তান, সুদান, পেরু, ব্রেজিল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অন্যান্য তন্তুর সহিত তুলা মিশ্রিত করিবার জন্য তুলার কিছু অতিরিক্ত চাহিদা বিদ্যমান। জাপান, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা প্রভৃতি দেশ তুলা আমদানি করিয়া থাকে। ভারত একাধারে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা আমদানি করে এবং ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা রপ্তানি করে।

বিশ্বে তুলার উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)

দেশ	উৎপাদন		দেশ	উৎপাদন	
	১৯৭৬	১৯৮৩		১৯৭৬	১৯৮৩
সোঃ রাশিয়া	২৭.৭	২৭.৬	মেক্সিকো	৩.১	২.২
চীন	২৪.০	৪০.১	ব্রেজিল	৪.১	৫.৫
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	২১.৫	১৬.৬	মিশর	৩.৮	৪.১
ভারত	১১.৭	১৪.১	পৃথিবী	১১৭.৮	১৪১.৬

[Source : UNO Monthly Bulletin of Statistics, January, 1984.]

[প্রশ্ন : (১) তুলার শ্রেণীবিভাগ ও উহাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। (২) কি প্রকার তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও মৃত্তিকা তুলা চাষের পক্ষে উপযুক্ত? (৩) সর্বাধিক তুলা কোন্ দেশে উৎপন্ন হয়? (৪) কোন্ দেশ সর্বাধিক তুলা রপ্তানি করিয়া থাকে? (৫) সোভিয়েত ইউনিয়নে তুলা চাষের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (৬) কোন্ দেশ তুলা আমদানি ও রপ্তানি দুই-ই করিয়া থাকে।]

পাট (Jute)

পাট ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের ফসল। মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে নদী ব-দ্বীপ বা প্লাবনভূমিতে তন্তুজ ফসল হিসাবে পাটের চাষ খুবই জনপ্রিয়। পাট গাছ

৩-৪ মিটার লম্বা হয়। ইহার কাণ্ডের বহিরাবরণ বা বল্কল হইতে আঁশ বাহির করা হয়। এই আঁশকেই পাট বলা হয়। উত্তম পাটের আঁশ দীর্ঘ, মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়। দেশ-বিদেশের বাজারে ইহার চাহিদা খুব বেশি হয়। ইহা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সকল কারণে বিশ্বের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদক দেশ বাংলাদেশে ইহা সোনালী আঁশ (Golden Fibre) নামে খ্যাত।

পাট গাছ পুষ্ট হইলে গোড়া হইতে ইহাকে কাটিয়া ১৫-২০ দিন জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। ইহাতে বল্কল পচিয়া নরম ও কাণ্ড হইতে আলগা হয়। এই সময় ঐ নরম বল্কল কাণ্ড হইতে ছাড়াইয়া, আঁশ জলে ধুইয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পাট অন্যতম প্রধান অর্থপ্রসূ ফসল (Cash crop) বা বাণিজ্যিক ফসল (Commercial crop)।

ব্যবহার (Uses): বিভিন্ন তন্তুজ ফসলের মধ্যে পাট অতি সুলভ। এই কারণে নানা ধরনের প্যাকিং-এর কাজে পাটের ব্যবহার সর্বাধিক। বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য ধান, গম, যব ইত্যাদি ও ভারী দ্রব্যাদি স্থানান্তরে প্রেরণের জন্য পাটের তৈয়ারি থলে, বস্তা, চট ব্যবহার করা হয়। ক্যাম্বিস, ত্রিপল, কার্পেট, দড়ি, সুতা, কাপড়ও পাট হইতে প্রস্তুত হয়। আবার তুলা ও পশমের সহিত পাটতন্তু মিশাইয়া, জুটসিল্ক, ফ্লানেল কাপড় তৈয়ারি হয়। ইহা ছাড়া পাটের সাহায্যে গৃহ শয্যার উপকরণ লিনোলিয়াম (Lenoleum) ও বাদামী কাগজও প্রস্তুত করা হয়। পাটের সবুজ ও শুকনো পাতা বায়ু ও পিত্তনাশক বলিয়া ভারতে খাদ্য হিসাবে ইহা ব্যবহার করা হয়। পাটের আঁশ ছাড়ানো ডাঁটাকে পাটকাঠি বলে। ইহা উত্তম জ্বালানি।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of Cultivation)

জলবায়ু (Climate): প্রধানত ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অধিক উত্তাপ ও অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানেই পাট অধিক জন্মে। ইহার জন্য ২৭°-৩৫° সে. উত্তাপ ও ২০০-৩০০ সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বাতাসে জলীয় বাষ্পের ভাগ বেশি হইলে পাটের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। প্রচুর তাপ ও বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন থাকায় পাট সর্বত্র গ্রীষ্মকালেই চাষ করা হয়।

মৃত্তিকা (Soil): পাট চাষে নতুন পলি বিশেষ উপযোগী। উর্বর দো-আঁশ ও বেলে দোআঁশ মৃত্তিকায় পাট ভাল জন্মিয়া থাকে।

ভূ-প্রকৃতি (Topography): পাট নিম্ন সমতলভূমিতে ভাল হয়। নদীর চড়া, বিল বা নিম্ন প্লাবনভূমি—যে সকল স্থানে বর্ষার জল বা জোয়ারের জল দাঁড়ায়, ঐ সকল স্থানই পাট চাষের পক্ষে আদর্শ। জমিতে বর্ষার জল বৃদ্ধির সহিত পাট গাছের দ্রুত বৃদ্ধির অদ্ভুত যোগাযোগ আছে। বাংলাদেশের নিম্ন ব-দ্বীপ অঞ্চলে কোথাও কোথাও পাট জমিতে ২-২½ মিটার জল থাকে ফলে শ্রমিকদিগকে জলে ডুব দিয়া পাট কাটিতে দেখা যায়।

অন্যান্য অবস্থা (Other factors) : পাট জমি সর্বদা আগাছা মুক্ত থাকা প্রয়োজন। এই কারণে জমি প্রস্তুত করা, পরিষ্কার করা, পাট কাটা, পাট ভেজানো, আঁশ তোলা প্রভৃতি কার্যের জন্য প্রচুর দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক দরকার। পাট গাছে প্রায়ই পোকা লাগে। এই পোকা দূর করিতে প্রচুর কীটনাশক ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে প্রচুর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা দরকার।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions) : পাট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের একচেটিয়া ফসল। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৯৮ শতাংশ পাট এই অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। পাট উৎপাদনে **এশিয়া মহাদেশে ভারত প্রথম, চীন দ্বিতীয় ও বাংলাদেশ তৃতীয়। নেপাল, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলংকা, ফরমোজা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও পাট জন্মে। ইহা ছাড়া, আফ্রিকা মহাদেশে মিশর, কঙ্গো ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে সামান্য পরিমাণে পাটের চাষ হয়।**

ভারত : পাট উৎপাদনে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করিত। কিন্তু ১৯৮২ সালে চীন পাট উৎপাদনে ভারতকে অতিক্রম করে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পাট উৎপাদনে ভারতের ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। ভারতের পাটকলগুলি বাংলাদেশের (প্রাচীন পূর্ববঙ্গ) উপর নির্ভরশীল ছিল। ভারতে পাট উৎপাদন গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় সীমাবদ্ধ। পূর্ব ভারতের উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু, নিম্ন নদী ব-দ্বীপের পলি মৃত্তিকা, বর্ষার প্লাবন, প্রচুর দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক ও সর্বোপরি দেশের পাটশিল্পে কাঁচা পাটের প্রচুর চাহিদা ইত্যাদির ফলে এই অঞ্চলে পাট চাষের একদেশীভবন ঘটিয়াছে। ভারতে সর্বাধিক পাট উৎপন্ন হয় পশ্চিমবঙ্গের ২৪-পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জিলায়, আসামের কামরূপ, নওগাঁ, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি জিলায় ও বিহারের পূর্ণিয়া, দারভাঙ্গা জিলায়। ইহা ছাড়া ওড়িশা, ত্রিপুরা, মেঘালয়, উত্তরপ্রদেশেও পাট চাষ হইয়া থাকে। সম্প্রতি পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে ও মহারাষ্ট্রের উপকূলীয় অঞ্চলে পাট চাষ প্রসার লাভ করিতেছে। দেশ বিভাগের ফলে কাঁচা পাটের অভাব মিটাইবার জন্য ভারতে পাটের পরিপূরক মেস্তার চাষও প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটের সহিত ইহা সুন্দরভাবে মিশাইয়া দেওয়া হয়। মেস্তা উৎপাদনে অন্ধ্রপ্রদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদার ক্রমাবনতি ও ভারতে আভ্যন্তরীণ চাহিদার স্থিতাবস্থা ভারতে পাটচাষের প্রসারের পক্ষে বিশেষ। আশংকাজনক, ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের স্থান চীনের পরে দ্বিতীয় হইবে বলিয়াই মনে হয়।

চীন : পাট উৎপাদনে চীনের স্থান এক সময় তৃতীয় ছিল। কিন্তু বিগত এক দশকে পাট উৎপাদনে চীনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। বর্তমানে (১৯৮২) চীন পাট উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম। হেক্টর প্রতি উৎপাদনে (৪,০৭৫ কেজি) চীন ইতিমধ্যেই বিশ্বে প্রথম স্থানাধিকারী হইয়াছে। চীনে পাট উৎপাদনের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া বলা যায় পাট উৎপাদনে চীনের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকিবে। দক্ষিণ চীনের ইয়াংসি ও সিকিয়াং নদী-উপত্যকায় ব্যাপকভাবে পাটের চাষ হইয়া থাকে। এই দেশে 'কমিউন'

প্রথায় চাষ আবাদ হওয়ায় এবং কৃষিকার্যে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বাংলাদেশ : একসময় বাংলাদেশ (প্রাচীন পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান) পাট উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিত। সম্প্রতি ভারতে ও চীনে চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের স্থান তৃতীয় হইয়াছে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র পাট হইয়া থাকে। এই দেশের জলবায়ু, মৃত্তিকা ও দক্ষ শ্রমিকের সুলভ যোগান ইত্যাদি পাট চাষের বিশেষ সহায়ক। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, রংপুর এবং দক্ষিণাঞ্চলে বরিশাল, পটুয়াখালি উল্লেখযোগ্য পাট উৎপাদন কেন্দ্র। নোয়াখালি, ফরিদপুর ও ঢাকা প্রভৃতি জিলায় প্রচুর পাট চাষ হয়। এই দেশে বহু ধান জমিতে আমন চাষের পূর্বে এপ্রিল হইতে জুলাই মাসের মধ্যে পাট চাষ শেষ করা হয়।

ব্রেজিল : এই দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে মৌসুমী জলবায়ু-অধ্যুষিত নদী অববাহিকায় পাট চাষ হয়। উৎপাদন ক্রমবর্ধমান।

বিশ্বে পাটের উৎপাদন

দেশ	১৯৮১ বপিত জমি ল. হে.	১৯৮১ উৎপাদন ল. মে. ট.	১৯৮২ বপিত জমি ল. হে.	১৯৮২ উৎপাদন ল. মে. ট.	১৯৮২ হেক্টর/ কেজি
ভারত	১১·৫৪	১৫·১২	১১·৯২	১২·২০	১,০২৩
চীন	৩·১৪	১২·৬০	৩·১৯	১৩·০০	৪,০৭৫
বাংলাদেশ	৫·৭৮	৭·৮৩	৫·৮১	৮·৭৯	১,৫১২
থাইল্যাণ্ড	১·৯৪	২·১৩	২·৩৮	২·৪৮	১,০৪২
ব্রেজিল	০·৯৩	০·৯৭	০·৬৭	০·৬৯	১,০১৮
নেপাল	০·৩৫	০·৪৩	০·২৮	০·৩৯	১,৩৯৩
ভিয়েতনাম	০·১৯	০·৩৫	০·২০	০·৩৬	১,৮০০
পৃথিবী	২৫·১৪	৪০·৭৫	২৫·৮৬	৩৯·৫০	১ ৫২৮

[Source : FAO Monthly Bulletin of Statistics.]

ব্যবসায় : প্যাকিং দ্রব্য হিসাবে এক কালে বিশ্বে পাটের চাহিদা ছিল সর্বাধিক। ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিই পাটের প্রধান ক্রেতা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি ছিল পাটের প্রধান রপ্তানিকারক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত হইতে ইউরোপে পাট রপ্তানি খুবই ব্যাহত হয়। আর এই সময় হইতে বিশ্বের বাজারে পাটের বিকল্প হিসাবে নানা জাতীয় রাসায়নিক তন্তুর আবিষ্কার শুরু হয়। বর্তমানে কাগজ, প্ল্যাস্টিক, পলিথিন প্রভৃতি যদিও পাটের অতিসুলভ বিকল্প-পরিপূরক প্যাকিং দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে, তথাপি পাটের মতো উহা কার্যকরী নহে। পাটের স্থান এই সকল সস্তা বিকল্প দ্রব্য গ্রহণ করায় পাটের অধিকতর

কার্যকরী প্রয়োগের জন্য ব্যাপক গবেষণা চলিতেছে। ভারতে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে পাট আমদানিকারী দেশের মধ্যে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া উল্লেখযোগ্য। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিতে ভারত ও বাংলাদেশ প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। ভারতের কলিকাতা ও বাংলাদেশের চালনা ও চট্টগ্রাম বিখ্যাত পাট রপ্তানি বন্দর।

রেশম (Silk)

রেশম প্রাণিজ তন্তু। এক প্রকার কীটের দেহ-নিঃসৃত লালা শুকাইয়া এই তন্তু স্বাভাবিকভাবেই তৈয়ারি হয়। এই কীটকে রেশম কীট বা গুটিপোকা বলে। রেশম কীটের জীবন চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অবস্থায় ডিম (Egg), দ্বিতীয় অবস্থায় কীট (Worm), তৃতীয় অবস্থায় গুটি (Crysalis) এবং চতুর্থ অবস্থায় মথ (Moth)। কীট অবস্থায় গুটিপোকা সূক্ষ্ম সুতার আকারে আপন দেহ-নিঃসৃত লালা দ্বারা নিজের চারিপাশে লম্বা আকারের বন্ধ একটি আবরণ বা গুটি তৈয়ারি করে। এই গুটির মধ্যেই ধীরে ধীরে গুটিপোকা পূর্ণতা লাভ করে এবং একদিন গুটি কাটিয়া মথ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং রেশম সংগ্রহের জন্য গুটি কাটিবার পূর্বেই ঐ গুটি সংগ্রহ করিয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া সূক্ষ্ম তন্তু বাহির করা হয়। ইহাই রেশম তন্তু। গুটি সিদ্ধ করিবার ফলে গুটিপোকার মৃত্যু হয় বলিয়া এই কীটের প্রতিপালন ও বংশবৃদ্ধির উপরেই রেশম শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে।

গুটিপোকা ডিম্ব অবস্থা হইতে কীটে পরিণত হইলেই তুঁত (mulbery), বা ঐ জাতীয় গাছের কচি পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। অতএব গুটিপোকার চাষ করিতে হইলে তুঁতের চাষ করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

রেশম সংগ্রহের চারিটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। (১) তুঁত গাছের চাষ করা, (২) গুটিপোকা প্রতিপালন করা, (৩) গুটি সিদ্ধ করিয়া সূক্ষ্ম তন্তু বাহির করা ও (৪) সংগৃহীত তন্তুর সাহায্যে ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র তৈয়ারি করা।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় কৃষির এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায় কুটিরশিল্পের অন্তর্গত। উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ু তুঁত গাছের চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অধিকন্তু এই জলবায়ুতে রেশমকীট সহজে বাঁচে এবং বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। এই কারণে রেশমের উৎপাদন এই জলবায়ু-মণ্ডলে অবস্থিত দেশগুলির মধ্যেই সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়।

ব্যবহার (Uses) : অতি প্রাচীন কাল হইতেই রেশমের সাহায্যে মূল্যবান বস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ তৈয়ারির রীতি প্রচলিত আছে। ভারতে রেশম বস্ত্র শুদ্ধ ও পবিত্র বলিয়া পূজা-অর্চনার ক্ষেত্রে ইহা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বস্ত্রাদি ব্যতীত আধুনিক বিদ্যুৎশিল্পে বিদ্যুৎ-নিরোধক মোড়ক, টাইপরাইটারের রিবন, অস্ত্রো-

পচারের ব্যাণ্ডেজ, প্যারাসুটের কাপড় এবং নানাপ্রকার ফিতা ও সুতা প্রস্তুতের জন্য রেশম তন্তু ব্যবহার করা হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth) রেশম কীট প্রতিপালন তুঁত চাষের উপর নির্ভরশীল। তুঁত চাষের পক্ষে উপক্রান্তীয় মৌসুমী ও নাতিশীতোষ্ণ ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু বিশেষ উপযোগী। এই কারণে এই দুইটি অঞ্চলেই বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বেশি রেশম উৎপাদিত হয়। তুঁত চাষ ও গুটিপোকা প্রতিপালনে প্রায় ১৬°-২৫° সে উত্তাপ ও ১০০ সে. মি.-২০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালেই অধিক বৃষ্টিপাত হওয়া আবশ্যক। নদী-উপত্যকায় ও পার্বত্য উপত্যকায় রেশম কীটের চাষ ভাল হয়। গুটিপোকা প্রতিপালনে ও রেশম তন্তু আহরণে প্রচুর দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক আবশ্যক হয়। রেশমতন্তু আহরণকারী দেশগুলিতে এই সকল কার্য সাধারণতঃ পরিবারের সকলেই এমনকি শিশুরা পর্যন্ত করিয়া থাকে।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions): পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতেই বিশ্বের শতকরা ৮০ ভাগ রেশম উৎপন্ন হয়। জাপান সর্বপ্রধান কাঁচা রেশম উৎপাদনকারী দেশ। এশিয়ায় জাপান ব্যতীত চীন, ভারত, পাকিস্তান, কোরিয়া, ইন্দোচীন, ইরাণ, সিরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশেও রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইউরোপে ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, বুলগেরিয়া, রাশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল প্রভৃতি দেশে রেশম তন্তু আহরণ করা হয়।

জাপান: বিশ্বে রেশম উৎপাদন ও রপ্তানিতে জাপান প্রথম স্থান অধিকার করে। জাপানে কৃষিজীবীদের মধ্যে অনেকেই গুটিপোকা প্রতিপালনকে তাহাদের জীবিকার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। এই দেশে গ্রীষ্ম, বসন্ত ও শীত এই তিন ঋতুতেই গুটিপোকার চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু একমাত্র বসন্তকালেই উন্নতমানের রেশমতন্তু সংগ্রহ করা যায়। হনসু দ্বীপের পার্বত্য উপত্যকায়, বিওয়া হ্রদ অঞ্চলে ও নাগোয়া—সিওয়া নদীর মোহনা প্রভৃতি অঞ্চলে রেশম-কীট প্রতিপালন দ্বারা প্রচুর রেশমতন্তু আহরণ করা হয়। জাপান সর্বপ্রধান রেশম রপ্তানিকারী দেশ।

চীন: চীনে অতি প্রাচীন কাল হইতেই রেশম উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে। চীনের রেশম বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘ ৩০০০ বৎসর রেশম তৈয়ারির পদ্ধতি গোপন রাখিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ২৭০০ অব্দে ছি-লিং-সি নামে একজন চৈনিক প্রথম রেশমতন্তু আবিষ্কার করেন। পরবর্তী কালে ভারত, জাপান প্রভৃতি দেশে ইহার চাষ শুরু হয়। চীনে নিম্ন ও মধ্য ইয়াং-সিকিয়াং উপত্যকা, সিকিয়াং উপত্যকা, মিন উপত্যকা ও সাণ্টুং উপদ্বীপ অঞ্চলেই প্রধানত গুটিপোকার চাষ হইয়া থাকে। বেসরকারী হিসাবমতে বর্তমানে চীন সর্বশ্রেষ্ঠ রেশম উৎপাদক দেশ। এই দেশে কোথাও কোথাও ওক্ গাছের কচিপাতা গুটিপোকার খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ইউরোপ: ইতালিতে পো নদীর উপত্যকা ও লোম্বার্ডি অঞ্চলে, ফ্রান্সে রোন উপত্যকা ও স্পেনে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে রেশমশিল্প বিস্তারলাভ করিয়াছে।

ভারত: ভারতে চারিপ্রকার রেশম উৎপন্ন হয়। রেশম বা গরদ, তসর, মুগা ও এণ্ডি।

রেশম বা গরদ: তুঁত গাছের পাতা খাওয়াইয়া যে গুটিপোকার চাষ করা হয় উহা হইতে আসল রেশম পাওয়া যায়। ইহাই ভারতে গরদ বলিয়া খ্যাত। গরদ পশ্চিমবঙ্গ (মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম), তামিলনাড়ু (কোয়েম্বাটুর, তাঞ্জোর) ও কাশ্মীর রাজ্যে উৎপন্ন হয়।

তসর: তুঁত গাছ ব্যতীত শাল, সেগুন, কুল, শিমুল, জাম, অর্জুন প্রভৃতি গাছে একপ্রকার রেশমকীট প্রতিপালিত হয়। ইহাকে তসর কীট বলে। তসর তন্তু এই তসর কীটেরই দান। ভারতে পশ্চিমবঙ্গ (বাঁকুড়া, মালদহ), বিহার (ছোটনাগপুর, পূর্ণিয়া), ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ (নাগপুর), উত্তরপ্রদেশ, আসাম, মহারাষ্ট্র (পুণে) প্রভৃতি রাজ্যে তসরের চাষ হইয়া থাকে।

এণ্ডি: এরণ্ড গাছে এরণ্ড পোকা বা হরি পোকা প্রতিপালিত হয় এবং ইহাদের লালা-তন্তুই এণ্ডি। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা একচেটিয়া এণ্ডি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও বিহারের পূর্ণিয়া, গুজরাটের বরোদা অঞ্চলেও এণ্ডি তৈয়ারি হয়।

মুগা ও মটকা (Muga and Matka): রেশমের নিকৃষ্ট তন্তু হইল মুগা বা মটকা। এণ্ডির মত মুগা তৈয়ারিতেও আসামের স্থান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মুগা কীট নানাজাতীয় বৃক্ষের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও মালদহ অঞ্চলে মুগা ও মটকা তন্তু তৈয়ারি হয়।

ব্যবসায় (Trade): অত্যন্ত মূল্যবান বস্ত্র হিসাবে রেশমের চাহিদা প্রায় সর্বদেশে সর্বকালে। বর্তমানকালে দেশে রাসায়নিক তন্তুর আবিষ্কারের ফলে আসল রেশমকে কৃত্রিম রেশমের সহিত বিশেষ প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। তথাপি রেশমের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। আসল রেশমের রপ্তানিতে জাপান, চীন, ভারত, ইতালি, ফ্রান্স অগ্রণী। আমদানিকারী দেশ হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি প্রধান।

[প্রশ্ন: (১) রেশম উৎপাদনের চারিটি পর্যায় কি কি? (২) রেশম উৎপাদনের জন্য কোন্ বৃক্ষের চাষ করিতে হয়? (৩) রেশম উৎপাদনে অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। কোন্ দেশ সর্বাধিক রেশম উৎপাদন করে? (৪) ভারতে উৎপন্ন চারি শ্রেণীর রেশম সম্বন্ধে টীকা লিখ।]

শন (Hemp)

পাটের ন্যায় শনও উদ্ভিদ্‌জাত বল্কল তন্তু। শন গাছ হইতে বীজ ও তন্তু উভয়ই সংগ্রহ করা হয়। গাছ পুষ্ট হইলে ফল সংগ্রহ করিয়া গোড়া হইতে গাছগুলিকে কাটিয়া জলে ভিজান হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই কাণ্ডগুলি পচিয়া গেলে শক্ত কাঠ দ্বারা পিটাইয়া তন্তু বা আঁশ বাহির করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ্ হইতে শনতন্তু আহরণ করা হয়। শনতন্তু পাটতন্তু অপেক্ষা মোটা ও দৃঢ়।

ব্যবহার (Uses) : শনতন্তু দ্বারা প্রধানতঃ দড়ি-দড়া, জাল ইত্যাদি তৈয়ারি করা হয়। ত্রিপল, চট, বস্তা, সুতা এমনকি পোশাকও তৈয়ারি হয়। ইহাতে পাট অপেক্ষা অধিক খরচ পড়ে। কিন্তু জলে ইহা সহজে পচে না বলিয়া ইহার দ্বারা জাহাজ ও নৌকার দড়ি, কাছি, পাল, ক্যানভাস ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। শনের বীজ হইতে ভাঙ্গ-সিদ্ধি, চরস, মারিজুয়ানা প্রভৃতি নেশার সামগ্রী পাওয়া যায়। শন বীজ হইতে এক প্রকার তেলও সংগ্রহ করা হয়। এই তেল সাবান, রং, বার্নিশ প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়।

শনের শ্রেণীবিভাগ : শন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) কাণ্ডশন বা আসল শন ও (২) পাতা শন। **কাণ্ডশন**—ইহা দুইভাগে বিভক্ত। (ক) ভাঙ্গশন বা ইন্দ্রশন (Cannabis Sative or True Hemp), (খ) ফুলশন (Crotalania Juncea or Sunn Hemp) এই প্রকার শনের কাণ্ড হইতে তন্তু সংগ্রহ করা হয়। **পাতা শন**—ইহা দুই প্রকার। (ক) ম্যানিলা শন (Manila Hemp), (খ) শিশল শন (Sisal Hemp or Henequen Hemp)। ইহার পাতা হইতে আঁশ বাহির করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions)

ভাঙ্গশন ও ফুলশন : ভারত ও পারস্য দেশ ইহার আদি জন্মস্থান। এই গাছের ডাঁটা, পাতা, ফুল, বল্কল, বীজ, আঠা কোনটাই বৃথা যায় না। প্রতিটি বস্তুই কোন-না-কোন কাজে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের পাতা ও মুকুল হইতে ভাঙ্গ বা সিদ্ধি প্রস্তুত হয়। ইহার স্ত্রী-জাতীয় গাছের জটা হইতে গাঁজা, ইহার আঠা হইতে চরস এবং বল্কল হইতে তন্তু পাওয়া যায়। ইহার বীজ হইতে তেল ও হাঁস-মুরগীর খাবার প্রস্তুত হয়। শুষ্ক ডাঁটাগুলি জ্বালানি হিসাবে উত্তম।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে উষ্ণগ্রীষ্মযুক্ত অঞ্চলেই শন চাষ ভাল হয়। শন চাষে প্রায় ১৭° সে.-২০° সে উত্তাপ ও ৭৫ সে.মি.-১০০ সে.মি বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। জলনিকাশী উর্বর দো-আঁশ বা বেলে দোআঁশ মৃত্তিকা শন উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী। ইহা ছাড়া শন চাষে প্রচুর রাসায়নিক সার ব্যবহার করা ও শ্রমিক নিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক।

বর্তমানে সোভিয়েত রাশিয়া শন উৎপাদনে প্রথম। ইউরোপে অন্যান্য শন উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, ইতালি উল্লেখযোগ্য। এশিয়া মহাদেশে ভারত (গঙ্গা অববাহিকায়, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রে), তুরস্ক, পাকিস্তান, কোরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে শন চাষ হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সামান্য শনের চাষ হয়। এই দেশে শন হইতে মারিজুয়ানা সংগ্রহ করা হয়।

ম্যানিলা শন (Manila Hemp) : ফিলিপাইন দ্বীপে 'আবাকা' (Abaca) নামক গাছের পাতা হইতে এই মজবুত তন্তু সংগ্রহ করা হয়। এই গাছ দেখিতে অনেকটা কলাগাছের মত। উচ্চতায় ইহা ৩১/২ মিটার হয়। বিশাল তন্তু নোনা জলেও খুব মজবুত থাকে বলিয়া নৌশিল্পে ও মৎস্যশিল্পে ইহার ব্যবহার সর্বাধিক।

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা হইতে এই শনতন্তু প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয় বলিয়া ইহা ম্যানিলা শন নামে পরিচিত। নিরক্ষীয়, উষ্ণ, আর্দ্র জলবায়ু ইহার চাষের পক্ষে উপযোগী। এশিয়ার ফিলিপাইন ব্যতীত উত্তর বোর্নিও ও মধ্য আমেরিকার কোস্টারিকা, গুয়াটেমালা ও পানামা উল্লেখযোগ্য ম্যানিলা শন উৎপাদক অঞ্চল।

শিশল শন (Sisal Hemp): শিশল গাছ আবাকা জাতীয় গাছ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহা দেখিতে আনারস বা কেয়া গাছের মত। ইহার পাতা আনারস বা কেয়া পাতা হইতে অনেক মোটা ও চওড়া। এই পাতার আঁশই শিশল তন্তু। আমেরিকার মেক্সিকো রাজ্যের ইউকাতান অঞ্চল ইহার আদি জন্মস্থান। মেক্সিকোর শিশল বন্দর মারফত এই তন্তু বিদেশে রপ্তানি হওয়ার জন্য ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে শিশল শন! শিশল শন উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ভাল জন্মে। মেক্সিকোর ইউকাতান রাজ্য ব্যতীত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কিউবা, দক্ষিণ আমেরিকার ভেনুজুয়েলা এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া ও আফ্রিকার তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া ও অ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি অঞ্চলেও স্বল্প পরিমাণে শিশল শন চাষ করা হয়।

ব্যবসায় (Trade): বিভিন্ন তন্তুজাতীয় ফসলের মধ্যে শনের আন্তর্জাতিক চাহিদা কম। সোভিয়েত রাশিয়া আসল শন উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও আভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য তাহার রপ্তানি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। বর্তমানে ইতালি শন রপ্তানিতে প্রথম। শন আমদানিকারী দেশের মধ্যে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স এবং রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে ইতালি, সোভিয়েত রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও ভারত উল্লেখযোগ্য।

ম্যানিলা শনের রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে ফিলিপাইনের নাম উল্লেখযোগ্য। ফিলিপাইনে ইহাই অর্থপ্রসূ ফসল। বৃটিশ যুক্তরাজ্য, জাপান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রধান আমদানিকারী দেশ।

শিশল শন রপ্তানিতে তাঞ্জানিয়া প্রথম। ইহা ব্যতীত ব্রেজিল, মেক্সিকো, হাইতি, কেনিয়া, অ্যাঙ্গোলা প্রভৃতি দেশ হইতে কিছু পরিমাণে শিশল শন রপ্তানি হইয়া থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, হল্যাণ্ড ও কানাডা প্রভৃতি প্রধান আমদানিকারী দেশ।

[প্রশ্ন : (১) "ভাঙ্গশন গাছের ডাঁটা, পাতা, ফুল, বল্কল, বীজ, আঠা কোনটাই বৃথা যায় না।"—কথাটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও। (২ শনের প্রধান ব্যবহার কি? (৩) কোন্ দেশ সর্বাধিক শন উৎপাদন করে? (৪) ম্যানিলা শন কি এবং ইহা কোন্ দেশে উৎপন্ন হয়?]

রবার (Rubber)

নিরক্ষীয় অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিদ 'হেভিয়া' (Hevea Brasiliensis) নামক এক প্রকার গাছের রস বা আঠার (Latex) সহিত ফর্মিক অ্যাসিড মিশাইয়া রবার তৈয়ারি করা হয়। পেনসিলের দাগ মুছিবার জন্য ইহা প্রধানত ব্যবহার করা হইত বলিয়া ইংরেজী 'রাব' (Rub) শব্দ হইতে, যাহার অর্থ ঘষা বা দাগ মোছা, রাবার বা

রবারের উৎপত্তি হইয়াছে। রবারের ব্যাপক বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয় ১৮৩৯ সালে চার্লস গুডইয়ার কর্তৃক ভালকানাইজেশন (Valcanization) পদ্ধতি আবিষ্কারের পর হইতে। অবশ্য ইহার পূর্বে ১৮২৩ সালে ম্যাকিনটোস ওয়াটারপ্রুফ তৈয়ারিতে প্রথম রবারের ব্যবহার করেন।

ব্যবহার (Uses): বর্তমান যুগে রবারের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় যানবাহন শিল্পে, মোটর, ট্রাক, ট্রাক্টর, সাইকেল ও অন্যান্য বহু শ্লথগতি যানবাহনের টায়ার-টিউব তৈয়ারিতে এবং বৈদ্যুতিক শিল্পে বিদ্যুৎবাহী তারের আবরণ হিসাবে। রবার উত্তম বিদ্যুৎ অপরিবাহী। ইহা ছাড়া নানাপ্রকার নল, চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম, খেলাধুলার সরঞ্জাম, ব্যাগ, গদী, কুশন, ওয়াটারপ্রুফ, জুতা, দাগ মোছার রবার ইত্যাদি জিনিস প্রস্তুতেও রবার ব্যবহার করা হয়। আধুনিক জীবনযাত্রায় রবার অপরিহার্য উপাদান।

রবারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Rubber): রবারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) বন্য রবার ও (২) আবাদী রবার। এই দুই প্রকার রবার ছাড়াও ক্যালসিয়াম কারবাইড, এ্যাসিটিলিন, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি হইতে একপ্রকার রবার তৈয়ারি করা হয়। ইহাকে কৃত্রিম রবার বলে। বিভিন্ন দেশে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত।

(১) বন্য রবার (Wild Rubber): নিরক্ষীয় অঞ্চলে দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকা ও আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা অঞ্চলে হেভিয়া গাছ স্বাভাবিক উদ্ভিদ। মানুষ এই সকল গাছের রস সংগ্রহ করিয়া রবার তৈয়ারি করে। এই গাছ মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে জন্মায় বলিয়া ইহাকে বন্য রবার (wild rubber) বলা হয়। অতীতে ব্রেজিলের 'পারা' বন্দর হইতে এই রবার প্রচুর পরিমাণে ইউরোপের বাজারে চালান যাইত। এই কারণে ইহাকে 'পারা' রাবারও বলা হইত। বর্তমান কালে এই রবারের উৎপাদন যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। কারণ শ্বাপদসংকুল বিস্তীর্ণ জঙ্গলে খুঁজিয়া খুঁজিয়া গাছ বাহির করা ও আঠা সংগ্রহ করা খুবই বিপজ্জনক ও সময়সাপেক্ষ। ইহা ছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শ্রমিকের অভাব, রাস্তাঘাট, যানবাহনের অসুবিধা, বন্দরের দূরত্ব ইত্যাদিও এই রবার সংগ্রহের প্রতিবন্ধক।

(২) আবাদী রবার (Plantation Rubber): বন্য রবার সংগ্রহ এক সময় ব্রেজিলের একচেটিয়া ছিল। কিন্তু বন্য রবার সংগ্রহের অসুবিধার জন্য অনুরূপ জলবায়ুতে রবারের চাষ-আবাদ যাহাতে করা যায় ইহার জন্য একদল বৃটিশ ব্যবসায়ী সর্বদা সচেষ্ট ছিল। ১৮৭৮ সালে Henry A. Wickham নামক একজন বৃটিশ ব্যবসায়ী অপর একজন বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদের সহায়তায় ব্রেজিল হইতে ৭,০০০ রবার বীজ চুরি করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যান। তথাকার 'কিউ' বাগানে প্রথম ঐ বীজের চারা তৈয়ারি করা হয় ও পরে নিরক্ষীয় জলবায়ু-অধ্যুষিত বৃটিশ উপনিবেশ শ্রীলংকায় (সিংহল) প্রথম বাণিজ্যিকভাবে রবারের আবাদ শুরু করা হয়। ক্রমে

ক্রমে রবারের আবাদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনুরূপ জলবায়ুতে প্রায় সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। প্রথমে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জমি তৈয়ারি করা হয় এবং পরে আবাদী প্রথায় গাছের চারা সারিবদ্ধভাবে বিস্তীর্ণ এলাকায় রোপণ করা হয়। গাড়ির সাহায্যে ল্যাটেক্স সংগ্রহ করা, গাছের যত্ন করা ইত্যাদি কার্যের সুবন্দোবস্ত এই প্রকার আবাদে করা হয়। এই ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিরার অনেক দেশেই রবারের আবাদ বিস্তারলাভ করিয়াছে।

(৩) **কৃত্রিম রবার (Synthetic Rubber) :** বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সাময়িকভাবে জাপানীদের অধিকারে চলিয়া যাওয়ায় ইউরোপে রবারের প্রচণ্ড অভাব অনুভূত হয়। এবং রবারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে রবারের বিকল্প আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতে থাকে। এই প্রচেষ্টার ফলেই জার্মানি প্রথম ক্যালসিয়াম কারবাইডভিত্তিক বুটাডিন (Butadin) বা বুনা রবার আবিষ্কার করে। বর্তমানে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি বহুদেশই কৃত্রিম রবার প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছে। কৃত্রিম রবার তৈয়ারিতে বর্তমানে এসিটোন (Acetone), মিথাইল সুরাসার (Methyl Alcohol), সেলুলোজ সুরাসার (Cellulose Spirit) প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। বৃটেনে কয়লা, জাপানে স্যাবীন (Saybean) ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রল হইতে উদ্ভূত চেমিগান (Chemigun) প্রভৃতির সাহায্যে কৃত্রিম রবার (Synthetic Rubber) তৈয়ারি করা হয়। জার্মানির বুনা (Buna) এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডুপ্রিন (Duprine) ও নুপ্রিন (Nuprine) কৃত্রিম রবার হিসাবে বিখ্যাত। কৃত্রিম রবার উৎপাদন এখনও স্বাভাবিক বা আবাদী রবারের তুলনায় অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। এই কারণে আবাদী রবারের জনপ্রিয়তা আদৌ হ্রাস পায় নাই।

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth) :

জলবায়ু (Climate) : রবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের একচেটিয়া ফসল। এই কারণে নিরক্ষীয় জলবায়ু বা ইহার অনুরূপ জলবায়ু রাবার চাষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। অত্যধিক উত্তাপ ও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত রবার চাষের পক্ষে অপরিহার্য হওয়ায় বার্ষিক গড় উত্তাপ ২৭° সে.-৩০° সে. ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৫০ সে. মি -৩০০ সে. মি হওয়া প্রয়োজন। উত্তাপের পরিমাণ কখনও ২১° সে.-এর কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। মাসিক বৃষ্টিপাত অন্তত ৫০-৭৫ সে. মি.-এর মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হইলে 'ল্যাটেক্স' কম জমা হয়। প্রতিদিন বিকালের দিকে দুই-এক পশলা বৃষ্টি রবার চাষের সহায়ক।

মৃত্তিকা (Soil) : দোআঁশ মৃত্তিকাই রবার চাষের অনুকূল মৃত্তিকা, তবে অনুর্বর ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা ব্যতীত প্রায় সকল প্রকার উর্বর মৃত্তিকাতেই রবার চাষ সম্ভব।

ভূ-প্রকৃতি (Topography) : রবার গাছের গোড়ায় জল দাঁড়ান গাছের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং জলনিকাশী ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ঢালু গড়ান জমিই রবার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই প্রকার জমিতে দ্রুত জল নিকাশের সুবিধা হয়।

অন্যান্য অবস্থা (Other Conditions) : রবার গাছ হইতে ল্যাটেক্স সংগ্রহ, গাছের যত্ন করা প্রভৃতি কার্যের জন্য প্রচুর সুদক্ষ ও সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। গাছের উপরকার ত্বক কাটিয়া রবার রস সংগ্রহের বিষয়টি বিশেষ নিপুণতার সহিত করা না হইলে গাছের ক্ষতির সম্ভাবনা। অধিকন্তু বাগিচার ভিতর যাহাতে দ্রুত রস সংগ্রহ করা যায় তাহার জন্য যানবাহন ব্যবহারের সুবিধা থাকা আবশ্যক। রবার সংগ্রহ সকালের দিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই করা হয়। কারণ বিকালের দিকে প্রায় নিয়মিতই বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টির পূর্বে আঠা সংগৃহীত না হইলে ইহার কার্যকারিতা নষ্ট হয়। রবার চাষে প্রচুর মূলধন নিয়োগ আবশ্যক।

বিশ্বের রবার উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions) : বর্তমান কালে বন্য রবারের তুলনায় আবাদী রবারের উৎপাদন ও চাহিদা সকলই অত্যন্ত বেশি। বন্য রবারের উৎপাদন মোট রবার উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫ ভাগ মাত্র। বন্য রবারের উৎপাদন প্রধানত দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের আমাজন অববাহিকা ও আফ্রিকার জাইরে গণতন্ত্রের কঙ্গো অববাহিকা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এই সকল অঞ্চলের পারিবেশিক অসুবিধার জন্যই বন্য রবার সংগ্রহের প্রচেষ্টা ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। পক্ষান্তরে এই সকল অঞ্চলের সন্নিহিত অনুরূপ জলবায়ুতে আবাদী রবারের চাষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে।

আবাদী রবারের উৎপাদনে বর্তমানে এশিয়া মহাদেশের মালয়েশিয়া বিশ্বে শীর্ষস্থান অধিকার করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশ্বের শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ রবার উৎপাদন করে। মালয়েশিয়া ব্যতীত ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, ভিয়েৎনাম, থাইল্যাণ্ড ও ভারত এশিয়ার অন্যান্য রবার উৎপাদক অঞ্চল। আফ্রিকায় কঙ্গো, লাইবেরিয়া ও নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল ও কলম্বিয়া অঞ্চলে আবাদী রবারের চাষ ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছে।

বিশ্বের রবার উৎপাদন—১৯৮৩ (লক্ষ মেট্রিক টনে)

মালয়েশিয়া	১৪.৮৮	ভারত	১.৭০
ইন্দোনেশিয়া	৯.৫০	লাইবেরিয়া	০.৬৫
থাইল্যাণ্ড	৫.৭০	নাইজিরিয়া	০.৪০
শ্রীলংকা	১.৩৫	ব্রেজিল	০.৩৫
চীন	১.৬৫	পৃথিবী	৩৮.৪৮

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আবাদী রবারের চাষ : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আবাদী রবারের চাষ বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। এই অঞ্চলের মালয়েশিয়ার অন্তর্গত

মালয়, উত্তর বোর্ণিও, সারাওয়াক এবং ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত সুমাত্রা, বোর্ণিও ও জাভা রবার চাষের প্রধান কেন্দ্র। মালয়ে বৃটিশ মূলধন এবং ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ

চিত্র ১১.১২ : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রবার-উৎপাদক অঞ্চল।

মূলধনে রবার বাগিচার পত্তন ঘটে। এই অঞ্চলে রবার বাগিচাগুলি গড়িয়া উঠিবার পক্ষে নিম্নলিখিত কারণগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(১) রবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের ফসল। এই অঞ্চলের নিরক্ষীয় জলবায়ু আবাদী রবার চাষের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

(২) এই অঞ্চলের জলবায়ু নিরক্ষীয় আদর্শের হইলেও নিকটবর্তী সমুদ্রের প্রভাবে উহা আমাজন (আমাথোনাস) বা কঙ্গো অববাহিকার মত অস্বাস্থ্যকর নহে। এই অঞ্চলের বনভূমিও তেমন ঘন নহে। ফলে ঐ বনভূমি পরিষ্কার করিয়া ঢালু জমিতে আবাদী রবার বাগিচা স্থাপন সহজ হইয়াছে।

(৩) রবার চাষে সুনিপুণ ও সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। এই অঞ্চলের চীনা, ভারতীয়, মালয়ী ও ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিকগণ যেমন পরিশ্রমী তেমনি নিপুণ। তাহাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন বলিয়া মজুরিও কম।

(৪) বৃটিশ ও ওলন্দাজ ব্যবসায়িগণের ব্যবসায় প্রচেষ্টা ও মূলধন আবাদী রবার উৎপাদনের প্রথম যুগে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে।

(৫) এই অঞ্চলের দেশগুলির অবস্থান দ্বীপীয় ও উপদ্বীপীয় হওয়ায় পরিবহণ-ব্যয় খুবই কম। ইহা ছাড়া আভ্যন্তরীণ সড়ক ও রেল যোগাযোগ বিশেষ উন্নত।

(৬) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের উপর অবস্থিত ও সিঙ্গাপুরের মত বিখ্যাত বন্দর মারফত রবার রপ্তানি সুলভ হওয়ায় এই অঞ্চলে রবার চাষের বিস্তার ঘটা স্বাভাবিক।

(৭) আন্তর্জাতিক বাজারে কৃত্রিম রবারের তুলনায় আবাদী রবারের মূল্য কম হওয়ায় আবাদী রবারের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি এই অঞ্চলে রবার চাষের প্রেরণা যোগাইতেছে।

(৮) রবার চাষের জলবায়ুগত সীমাবদ্ধতাও এই অঞ্চলের বৃটিশ ও ওলন্দাজ ব্যবসায়িগণের রবার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহদান করে। ফলে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার নিত্য প্রয়োগ এই অঞ্চলকে রাবার চাষে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

ব্যবসায় (Trade): শিল্পোন্নত দেশগুলিতে কৃত্রিম রবারের প্রচলন হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে রবারের চাহিদা আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। বহু ক্ষেত্রে কৃত্রিম রবারের তুলনায় স্বাভাবিক রাবার অধিকতর কার্যকর হওয়ায় এখনও রবারের বাজার তেমন মন্দ নহে। বিশ্বে রবার রপ্তানিকারী দেশগুলির মধ্যে মালয়েশিয়া সর্বপ্রধান এবং ইন্দোনেশিয়া দ্বিতীয়। সিঙ্গাপুর রবার ব্যবসায়ের পুনঃ-রপ্তানী বন্দর (Entrepot Port)। অন্যান্য রবার রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া উল্লেখযোগ্য। রবার আমদানিকারী দেশ হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রবারের উৎপাদন ও মাথাপিছু ব্যবহার দেখান হইল :

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রাবার উৎপাদন ও মাথাপিছু ব্যবহার (১৯৮০)

দেশ		উৎপাদন (ল. মে. ট.)	ব্যবহার (কেজি)
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	প্রাঃ	৫.৮৫	২.৬
	কৃঃ	২০.০০	৮.৮
পঃ জার্মানি	প্রাঃ	১.৭৯	২.৯
	কৃঃ	৪.২১	৬.৮
ফ্রান্স	প্রাঃ	১.৮৭	৩.৫
	কৃঃ	৩.৪১	৬.৪
ভারত	প্রাঃ	১.৭০	০.৩
	কৃঃ	০.৪৬	—
পৃথিবী	প্রাঃ	৩০.০০	১.০
	কৃঃ	৭০.৭৫	২.৩

[Source : UNO Statistical Year Book, 1981.]

প্রাকৃতিক রবারের ভবিষ্যৎ : বর্তমান বিশ্বে শিল্পোন্নত প্রায় প্রতিটি দেশেই কৃত্রিম রবার উৎপন্ন হইতেছে। ইহাদের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই প্রধান। সোভিয়েত রাশিয়া, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশেও কৃত্রিম রবারের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। সুতরাং প্রাকৃতিক রবারের চাহিদা যে হ্রাস পাইবে উহাতে আর সন্দেহ কি? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই এই অবস্থা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আশার কথা যে সাধারণ কার্যে কৃত্রিম রবার

উপযোগী হইলেও বিশেষ বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক রবার অপরিহার্য। ফলে প্রাকৃতিক রবারের চাহিদা সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বরং কিছুটা বৃদ্ধি পাইতেছে। অধিকন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সুষ্ঠু প্রয়োগে প্রাকৃতিক রবারের একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ইহার উৎপাদন-ব্যয় কম পড়িতেছে ও ইহার মানও উন্নত হইতেছে। সুতরাং প্রাকৃতিক রবার কৃত্রিম রবারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইবে। মোট কথা কৃত্রিম রবারের উৎপাদন-ব্যয় প্রাকৃতিক রবারের তুলনায় কোন কোন ক্ষেত্রে কম হইলেও ইহার উৎপাদন জটিল রাসায়নিক কারখানা স্থাপন ও কাঁচামালের সহজলভ্যতার উপর নির্ভরশীল। ইহা ছাড়াও কৃত্রিম রবার সর্বক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা এখনও ইহার উন্নতিসাপেক্ষ। সুতরাং বলা যায় যে কৃত্রিম রবারের শিল্পের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য হওয়ার উপরই প্রাকৃতিক রবারের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে।

[প্রশ্ন : (১) কোন্ বৃক্ষের রস হইতে রবার সংগ্রহ করা হয় ? (২) এই বৃক্ষের অনুকূল জলবায়ু কিরূপ ? (৩) রবারের ব্যবহার আলোচনা কর। (৪) কোন্ কোন্ অঞ্চল হইতে বন্য রবার সংগ্রহ করা হয়। (৫) আবাদী রবার-উৎপাদক দেশগুলির নাম লিখ। (৬) আবাদী রবারের চাষ প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সীমাবদ্ধ হইবার কারণ দর্শাও। (৭) কৃত্রিম রবার কোন্ কোন্ উপাদানের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয় ? কোন্ কোন্ দেশ এই রবার উৎপাদন করে ? (৮) স্বাভাবিক রবারের ভবিষ্যৎ আলোচনা কর। (৯) কোন্ দেশ সর্বাধিক রবার উৎপাদন ও সর্বাধিক রপ্তানি করিয়া থাকে।]

তৈলবীজ (Oil Seeds)

তৈল নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ যে সকল কৃষিজ দ্রব্যের চাষ-আবাদ করা হয় উহাকে তৈলবীজ বলে। তৈলবীজ যেমন নানাপ্রকারের হয় তেমনি ঐ সকল তৈলবীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈলও নানাকার্যে ব্যবহৃত হয়। মানুষের সরাসরি খাদ্য হিসাবে বা মানুষের ভক্ষ্য ঘি মাখন বিবিধ স্নেহজাতীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতে, ঔষধ, রং, বার্নিশ, সাবান, প্রসাধনসামগ্রী প্রভৃতি তৈয়ারিতেও এই সকল তৈল ব্যবহৃত হয়। শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি পিচ্ছিল ও সচল রাখিবার জন্য এবং জ্বালানি হিসাবেও এই তৈলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তৈল নিষ্কাশনের পর বীজের নীরস চূর্ণীকৃত অংশকে খইল (oil cake) বলা হয়। ইহা উত্তম পশু-খাদ্য। তৈলবীজ হিসাবে চীনা-বাদাম, তিসি বীজ, তিল, সরিষা ও রাই, কার্পাসবীজ, জলপাই, এরণ্ড বা রেড়ি, নারিকেল, সয়াবীন. সূর্যমুখী ফুল অন্যতম। ইহা ছাড়া তাল, মহুয়া, জীরা, পোস্ত ইত্যাদি হইতেও তৈল নিষ্কাশন করা হয়।

চীনাবাদাম (Ground Nut) : চীনাবাদাম আলুর মত একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের শিকড়ে মাটির নিচে হইয়া থাকে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ইহা চীনাবাদাম বা মাট কড়াই (Ground Nut) বলিয়া পরিচিত হইলেও দক্ষিণ ভারতে ইহাকে ম্যানিলা কড়াই বলে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহা পী-নাট (Pea-Nut) ও বৃটিশ

যুক্তরাজ্যে মুঙ্কি-নাট (Monkey-Nut) বলিয়া পরিচিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহা পী-নাট হিসাবেই পরিচিত।

ব্যবহার (Uses): চীনাবাদাম পুষ্টিকর খাদ্য অপেক্ষা ভোজ্য তৈল নিষ্কাশনের জন্য অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহা উদ্ভিজ্জ ঘি, মার্গারিণ, প্রসাধনসামগ্রী, ঔষধ প্রভৃতি প্রস্তুতিতেও ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Favourable Conditions of growth): চীনাবাদাম ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলের ফসল। পৃথিবীতে ইহার চাষ ৩৭° উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার চাষে বার্ষিক গড় উত্তাপ প্রায় ২৭° সে. ও বৃষ্টিপাত প্রায় ৭৫ সে মি-১০০ সে মি হওয়া প্রয়োজন। মোটামুটি শুষ্ক আবহাওয়া উর্বর দো-আঁশ মৃত্তিকা চীনাবাদাম চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions): চীনাবাদাম উৎপাদনে এশিয়ার অন্তর্গত ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারতের পরেই চীনের স্থান। ভারতে অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে প্রচুর চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। রাজস্থান ও গুজরাটেও চীনাবাদামের চাষ বিশেষ আশাপ্রদ। ভারতে চীনাবাদামের চাষ দক্ষিণ ভারতেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৫% দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতেই উৎপন্ন হয়। ভারত ও চীন ব্যতীত এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, ফিলিপাইন, আফ্রিকা, নাইজেরিয়া, সুদান, তাঞ্জানিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, সেনেগাল, জাইরে, দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা এবং উত্তর আমেরিকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো উল্লেখযোগ্য চীনাবাদাম উৎপাদক দেশ।

ব্যবসায় (Trade): ভারত ও চীনদেশে আভ্যন্তরীণ চাহিদা বেশি থাকায় এই দুই দেশের রপ্তানির পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। প্রধান রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে নাইজেরিয়া, সেনেগাল, তাঞ্জানিয়া, সুদান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমদানিকারী দেশের মধ্যে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা প্রধান।

তিসি বীজ বা মসিনা (Flax or Linseed): তিসি অতসি জাতীয় এক প্রকার শনগাছের বীজ। ইহার তৈল অতি দ্রুত শুকাইয়া যায় বলিয়া রং ও বার্নিশের কার্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া তেলা কাপড় (oil cloth), লিনোলিয়াম, ছাপার কালি, সাবান, গ্লিসারিণ, ঔষধ প্রভৃতি তৈয়ার করিতেও ইহার প্রয়োজন হয়। ইহা উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ফসল হইলেও মধ্য অক্ষাংশের উষ্ণ ও গ্রীষ্মাঞ্চলেই ইহার ব্যাপক চাষ হইয়া থাকে। তিসি উৎপাদনে এশিয়ায় ভারত, আফ্রিকায় ইথিওপিয়া, উত্তর আমেরিকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকায় আর্জেন্টিনা এবং ওশিয়ানিয়ায় অস্ট্রেলিয়া উল্লেখযোগ্য। ভারতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তিসি-উৎপাদক রাজ্যের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ,

মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান। আন্তর্জাতিক বাজারে তিসির তৈল রপ্তানিতে আর্জেণ্টিনা প্রধান। অন্যান্য রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া, কানাডা, ভারত, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, হল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলিই প্রধানতঃ তিসি তৈল আমদানি করিয়া থাকে।

সরিষা ও রাই (Mustard and Rapeseed) : সরিষা, সরিষার তৈল ও রাই নানাভাবে মানুষের খাদ্য হিসাবেই সর্বাংশিক ব্যবহৃত হয়। সাবান, পাঁউরুটি ও কৃত্রিম রবার তৈয়ারিতেও ইহার ব্যবহার লক্ষণীয়। সরিষা দুইপ্রকার—লাল ও শ্বেত। শ্বেত সরিষাকে রাই বলা হয়। সরিষা ও রাই-এর চাষ উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে ও উষ্ণ অঞ্চলে শীতকালে ইহার চাষ হইয়া থাকে। উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত মধ্যম রকমের হওয়া প্রয়োজন। সরিষা উৎপাদনে ভারত ও রাই উৎপাদনে চীন প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারতের উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান সরিষা-উৎপাদক অঞ্চল।

তিল (Sesamum) : তিল ও তিল তৈল খাদ্য হিসাবেই প্রধানত ব্যবহৃত হয়। ভারতে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিল অপরিহার্য। তিল তিন প্রকারের দেখা যায়—কৃষ্ণ তিল, শ্বেত তিল ও লোহিত তিল। তিল তৈল খুবই স্নিগ্ধ। ইহা রন্ধন কার্যে, সাবান, মার্গারিণ, ঔষধ প্রভৃতি তৈয়ারিতেও ব্যবহার করা হয়। তিলের চাষ ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেই প্রধানত সীমাবদ্ধ। ইহার জন্য তেমন উর্বর জমির প্রয়োজন হয় না। তিল উৎপাদনে চীন প্রথম। চীন ব্যতীত ভারত, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান, সুদান, ইথিওপিয়া, তাঞ্জানিয়া, নাইজেরিয়া, হল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিল রপ্তানিতে সুদান বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। চীন ও ভারত আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া রপ্তানি বাণিজ্যে তেমন অংশগ্রহণ করিতে পারে না। ইউরোপে হল্যাণ্ড প্রধান তিল রপ্তানি-কারী দেশ। তিল আমদানিকারী দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য ইত্যাদি প্রধান।

কার্পাস বীজ (Cotton seed) : কার্পাস বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল, ভেজিটেবল ঘি উৎপাদনে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া গ্রামোফোনের রেকর্ড, মোমবাতি, সাবান, রং এবং মার্গারিণ তৈয়ারিতেও ইহার ব্যবহার হয়। ইহার খইল পশু খাদ্য ও জমির সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বিশ্বের কার্পাস উৎপাদনকারী দেশগুলিতেই কার্পাস বীজ পাওয়া যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, ভারত, চীন, মিশর, সুদান, মেক্সিকো, ব্রেজিল, পেরু, আর্জেণ্টিনা প্রভৃতি দেশে কার্পাস বীজ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কার্পাস বীজ রপ্তানিতে ভারত, মিশর, সুদান, ব্রেজিল, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশ কমবেশি অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। বৃটিশ যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ডেনমার্ক, জাপান প্রধানত কার্পাস বীজ আমদানি করিয়া থাকে।

নারিকেল (Cocoanut) : নারিকেলের শাঁস (copra) হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়। এই তৈল খাদ্য হিসাবে যেমন তেমনি সাবান, মার্গারিণ, ভেজিটেবল ঘি, বাতি প্রভৃতি তৈয়ারিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের প্রতিটি অংশই মানুষের কোন-না-কোন উপকারে আসে। কাঁচ অবস্থায় নারিকেলের জল সুস্বাদু ; নারিকেল শাঁস পুষ্টিকর খাদ্য ও তৈলের উৎস ; ইহার মালা হইতে হুকা, চামচ, বোতাম প্রভৃতি তৈয়ারি হয় ; ইহার ছিবড়া হইতে দড়ি, কার্পেট, গদি প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। নারিকেল, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সমুদ্র বা নদীর তীরেই প্রধানত ভাল হয়। নোনা মাটি ও আর্দ্র আবহাওয়া নারিকেল চাষের পক্ষে উপযোগী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সকল দেশেই কমবেশি নারিকেল হয়। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশে প্রচুর নারিকেল উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত ফিজি, মোজাম্বিক, নিউগিনি তাঞ্জানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রচুর নারিকেল হয়। ভারতে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও লাক্ষাদ্বীপ এবং কেরালা রাজ্যে সর্বাধিক নারিকেল উৎপন্ন হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে আমদানি-রপ্তানিতে আস্ত নারিকেলের তুলনায় নারিকেল শাঁসই (copra) অধিক ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের মালা এবং ছিবড়াও (coir) স্বল্প পরিমাণে লেনদেন হয়। নারিকেল তৈল উৎপাদনে ফিলিপাইন প্রথম। ভারত, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশ হইতে নারিকেল শাঁস রপ্তানি হইয়া থাকে। আমদানিকারী দেশ হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, জার্মানি, হল্যান্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য।

সয়াবীন (Sayabean) : সয়াবীন চীনদেশের স্বাভাবিক শস্য। ইহাকে চলিত ভাষায় 'ভাট কলাই' বলে। পূর্ব এশিয়ায় প্রায় সর্বত্রই সয়াবীনের চাষ হয়। সয়াবীন খুবই পুষ্টিকর খাদ্য। ইহার ময়দা ও তৈল খাদ্য হিসাবে ও সাবান, মার্গারিণ ছাপার কালি, বার্নিশ, গ্লিসারিণ, কৃত্রিম রবার (plastic) প্রভৃতি তৈয়ারিতে ব্যবহার করা হয়। সয়াবীন বিভিন্ন প্রকার হয়। আর্দ্র নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুই ইহার জন্য প্রশস্ত। চীনে সর্বাধিক সয়াবীন উৎপন্ন হয়। চীনের পরেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থান। জাপান, ভারত, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া (ইউক্রেণ) প্রভৃতি দেশেও সয়াবীনের চাষ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সয়াবীনের প্রধান রপ্তানিকারী দেশ। আমদানিকারী দেশ হিসাবে জার্মানি, হল্যান্ড, স্পেন, কানাডা, মিশর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এরণ্ড বা রেড়ি (Castor Seeds) : এরণ্ড বা রেড়ির তৈল ভোজ্য তৈল নহে। ইহা প্রধানতঃ সাবান ও ঔষধ তৈয়ারিতে এবং পিচ্ছিলকারক তৈল, জ্বালানী তৈল ইত্যাদিরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার খইল উত্তম পশু-খাদ্য। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে দো-আঁশ মৃত্তিকায় রেড়ির চাষ ভাল হয়। রেড়ির চাষে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাডু, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর রেড়ির চাষ হয়। অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া,

ইন্দোচীন উপদ্বীপ, ব্রেজিল, এঙ্গোলা, মালাগাসি, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। ভারত ও ব্রেজিল হইতে প্রচুর রেড়ির বীজ রপ্তানি করা হয়। আর ঐ বীজ আমদানিতে প্রধানত অংশগ্রহণ করিয়া থাকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ইতালি, মিশর, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ।

জলপাই (Olive): জলপাই প্রধানত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ফসল। জলপাই তেল 'স্যালাড' তৈল হিসাবে খুবই জনপ্রিয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত জলপাই-এর শতকরা ৯০ ভাগ উৎপন্ন হয় ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে অর্থাৎ, স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি গ্রীস, ফ্রান্স, তুরস্ক, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া প্রভৃতি দেশে।

মহুয়া (Mahua): মহুয়ার ফুল হইতে দেশী মদ্য (country liquor) তৈয়ারি হয় এবং বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়। ইহার খইল জমির উৎকৃষ্ট সার। ভারতে প্রচুর মহুয়া উৎপন্ন হয়।

তাল তৈল (Palm Oil) নারিকেলের মত উষ্ণ আর্দ্র সমুদ্রোপকূলে তাল গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহার তৈল স্থানীয় লোকেরা খাইয়া থাকে। সাবান, মার্গারিন, মোমবাতি প্রভৃতি তৈয়ারিতেও ইহার ব্যবহার হয়। ঘানা, এঙ্গোলা, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর তালগাছ জন্মিয়া থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য এই তৈল আমদানি করিয়া থাকে। ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় তালগাছের প্রাচুর্য থাকিলেও তৈল স্বল্পই সংগ্রহ করা হয়।

[প্রশ্ন : (১) কোন্ কোন্ তৈলবীজ উৎপাদনে ভারতের স্থান প্রথম ? (২) সয়াবীনের ব্যবহার বর্ণনা কর।]

অনুশীলনী

১। কৃষির সংজ্ঞা নির্দেশ কর। কৃষি-নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান উপাদানগুলি কি কি ? প্রত্যেকটি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Define agriculture. What are the Physical frontiers of agriculture ? Comment on each of these elements.]

২। কৃষিকার্যকে মূলতঃ প্রকৃতি-নির্ভর বলা হয় কেন ? বর্তমান কালে ইহাকে প্রাকৃতিক প্রভাবমুক্ত করিবার জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

[Why is agriculture said to be primarily dependent on nature ? Give an account of the steps that have been taken in modern times to relieve agriculture of its natural constraints.]

৩। বিভিন্ন ধরনের কৃষি ব্যবস্থা কি কি ? কি পরিবেশে এবং কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই সকল কৃষি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহা বিশ্লেষণ কর।

[What are the different types of farming ? Examine the conditions under which and the areas where they are practised and show the areas of their concentration.] [W. B. H. S. C. Exam., 1983)

৪। কৃষি পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ কর। যে অবস্থায় এবং যে সকল অঞ্চলে এই সকল কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাহার আলোচনা কর।

[Classify farming. Discuss the conditions under which and the areas where these systems are practised.]

৫। টীকা লিখ: (ক) স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি, (খ) প্রগাঢ় চাষ, (গ) আর্দ্র কৃষি, (ঘ) শুষ্ক কৃষি, (ঙ) মিশ্র কৃষি, (চ) রোপণ প্রথা।

[Write short notes on : (a) Subsistance agriculture, (b) Intensive farming, (c) Humid farming, (d) Dry farming, (e) Mixed farming, (f) Transplantation Method.]

৬। ধানচাষের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধান-উৎপাদক অঞ্চলের বিবরণ দাও। চালের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের বিবরণ দাও।

[Discuss the conditions favourable for the cultivation of Rice. Give an account of the rice producing countries of the world. Discuss the import and export trade in rice.]

৭। গমের ব্যবহার কি কি? গমচাষের অনুকূল পরিবেশ ও পৃথিবীর গম-উৎপাদক অঞ্চলের বর্ণনা কর। আন্তর্জাতিক গম বাণিজ্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[What are the uses of wheat ? Describe the conditions favourable for the cultivation of wheat and also the regions where wheat is grown. Mention in brief the international trade in wheats.]

৮। শীতকালীন ও বাসন্তী গম বলিতে কি বুঝায়? বিশ্বে এই প্রকার গম-উৎপাদক অঞ্চলের বর্ণনা দাও।

[What is meant by winter wheat and spring wheat ? Describe the regions where these types of wheat are grown ?]

৯। বিশ্বে ধানচাষের তুলনায় গমচাষ ব্যাপক হওয়ার কারণ কি? বিশ্বের গম রপ্তানিকারী দেশসমূহের গম উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য ও রপ্তানি সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Account for the wider cultivation of wheat than Rice in the world. Discuss the features of wheat cultivation in the wheat exporting countries of the world and also their exports.]

১০। চা ও কফি চাষের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। বিশ্বের প্রধান প্রধান চা ও কফি উৎপাদক অঞ্চল কি কি? চা ও কফির আমদানি ও রপ্তানিতে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের নাম কর।

[Describe the conditions favourable for the plantation of tea and coffee. What are the principal producing regions of tea and coffee in the world ? Name the countries importing and exporting these two commodities.]

১১। ইক্ষু ও বীট চাষের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। ইহাদের উৎপাদনকারী দেশসমূহের নাম কর। বর্তমানে বীট চাষের প্রসার ঘটার কারণ নির্দেশ কর।

[Describe the conditions suitable for the cultivation of Sugar-cane and Sugar Beet. Mention the countries producing Sugar-cane and Sugar Beet. State the reasons for extension of Beet cultivation in the world in modern times.]

১২। ক্রান্তীয় অঞ্চলে ইক্ষু এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বীটচাষের কারণ বিশ্লেষণ কর। সাম্প্রতিক কালে বীটচাষের অগ্রগতির কারণ কি?

[Analyse the causes for cultivation of Sugar-cane in the tropical areas and Beet in the temperate areas. Indicate the causes for the extension of Beet cultivation in the world in recent years.

১৩। তুলার শ্রেণীবিভাগ কর। ইহার উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। তুলা উৎপাদনে যে সকল দেশের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় ঐ সকল দেশের তুলা চাষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Classify Cotton. Describe the conditions favourable to Cotton cultivation. Give an account of the principal Cotton producing countries of the world.]

১৪। পাটের ব্যবহার আলোচনা কর। বিশ্বে পাটের উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ কেন ? পাট-উৎপাদনকারী দেশসমূহের নাম কর এবং পাটের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

[Discuss the principal uses of Jute. Why is the cultivation of Jute restricted to a particular region ? Name the countries growing Jute and give an account of its International trade.]

১৫। তন্তু হিসাবে পাট বিশেষ সুবিধাজনক হওয়া সত্ত্বেও ইহার বিকল্প বর্তমানে সর্বাধিক আদৃত—ইহার কারণ নির্দেশ কর। পাটের বিকল্প তিনটি তন্তুর নাম কর। পাট ও পাটজাত দ্রব্য আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক দেশসমূহের নাম কর।

["Although as a fibre jute has distinct advantages over its substitutes yet the substitutes enjoy extensive demand."—Point out its reasons. Name three substitutes of Jute. Also mention the names of countries exporting and importing jute and jute goods.]

১৬। নিম্নলিখিত তন্তুসমূহের উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা, উৎপাদনকারী অঞ্চল এবং আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কে আলোচনা কর : (ক) রেশম ও (খ) শন।

[Describe the conditions favourable for the production of, producing regions and International trade of (a) Silk and (b) Hemp.]

১৭। তূলা চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা কর। পৃথিবীর প্রধান প্রধান তূলা উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির নাম উল্লেখ কর।

[Describe the geographical conditions favourable for the cultivation of cotton. Name the major cotton producing regions of the world.]

(W. B. H. S. C. Exam. 1981)

১৮। বিভিন্ন তৈলবীজের ব্যবহার কি কি ? কোথায় কোথায় এইগুলি উৎপন্ন হয় এবং কোন্ কোন্ দেশে এইগুলি রপ্তানি করে।

[What are the uses of different types of oil seeds ? Where are they grown and where are they exported ?]

১৯। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে রেশম উৎপাদন সীমাবদ্ধ হইবার কারণ নির্দেশ কর। ইহার ব্যবহার আলোচনা কর এবং ইহার রপ্তানিকারী দেশসমূহের নামোল্লেখ কর।

[Account for the concentration of silk production in certain countries of the world, Discuss its uses and name the countries exporting silk.]

২০। বন্য রবার, আবাদী রবার ও কৃত্রিম রবারের পার্থক্য নির্দেশ কর। রবার চাষের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। রবার উৎপাদনকারী দেশ ও ইহার আমদানি ও রপ্তানিকারী দেশসমূহের নাম লিখ।

[Distinguish between natural, plantation and synthetic Rubber. Describe the conditions favourable for plantation of Rubber. Name the countries producing Rubber and importing and exporting it.]

২১। শন ও তৈলবীজের ব্যবহার কি ? ইহাদের উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর এবং বিশ্বের শন ও তৈলবীজ উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম লিখ।

[What are the uses of Hemp and Oil-seeds ? Point out the features of their production. Name the producing countries of Hemp and Oil-seeds in the world.]

২২। কৃত্রিম রবারের উপাদান কি কি ? কৃত্রিম রবারের বাণিজ্যিক গুরুত্ব আলোচনা কর। স্বাভাবিক রবার চাষের ভবিষ্যৎ আলোচনা কর।

[What are elements of synthetic rubber ? Discuss the commercial importance of synthetic rubber. Discuss the commercial importance of synthetic rubber. Discuss the features of natural rubber.]

২৩। জলবায়ুর ভিত্তিতে কৃষিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি? নিম্নলিখিত অঞ্চলের কৃষি প্রণালীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর:

(ক) বাংলাদেশ ও ব্রহ্মদেশের কৃষি ব্যবস্থা।

(খ) আমেরিকার টেনেসি ও চীনের সিকিয়াং অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা।

(গ) উত্তর আমেরিকার রকি ও সোভিয়েত রাশিয়ার কিরঘিজিয়ার কৃষি ব্যবস্থা।

(ঘ) ব্রাজিলের কফি চাষ ও মালয়েশিয়ার রবার চাষ।

(ঙ) কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার গম চাষ।

[Classify agriculture on the basis of climate and name the divisions. Discuss the features of agriculture of the following regions—

(a) Agriculture in Bangladesh and Burma.

(b) Farming in Tennessee regions of North America and Sikiang region of China.

(c) Farming in Rocky region of North America and Kirghiz in Soviet Union.

(d) Coffee plantation in Brazil and Rubber plantation in Malayasia.

(e) Wheat cultivation in Canada and Australia.]

২৪। গম, তুলা, কফি, রবার, ইক্ষু ও বীট উৎপাদনের উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রধান উৎপাদক অঞ্চলের পৃথিবীব্যাপী বণ্টন বিশ্লেষণ কর।

[Explain the conditions of growth, areas of production and world distribution of Wheat, Cotton, Coffee, Rubber, Sugar-cane and Sugar Beet.]

(W. B. H. S. C.—Specimen Question, 1981)

১২ | পশুপালন
(Pastoral Farming)

চার্লস ডারউইন (Charles Darwin)-এর বিবর্তনবাদ অনুসরণ করিয়া বলা যায় পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই আবির্ভাব ঘটিয়াছিল পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর। সুতরাং পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর সহিত মানুষের সম্পর্ক আজন্ম। আদিম বন্যমানুষ একদিন ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজনেই বন হইতে ফলমূল আহরণের সহিত পশু শিকারকেও বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। কালক্রমে মানুষের যাযাবর জীবনে পশুই হইল তাহার নিত্য-সঙ্গী। খাদ্যের যোগানে, পরিধেয়ের যোগানে, ভারবহনে, পরিবহণে এবং এমনকি শক্তি ও শ্রমসাধ্য কার্য সম্পাদনেও মানুষ প্রাণিকুলের উপর ক্রমে ক্রমে নির্ভর করিতে ও তাহাকে ব্যবহার করিতে শিখিল। সভ্যতার বিবর্তনের সহিত উদ্ভব হইল জড়শক্তির, বিকাশ ঘটিল যন্ত্র-সভ্যতার। অতীতের পশুশক্তি-নির্ভর বহু কার্যই বর্তমানে জড়শক্তির সাহায্যে করা সহজ ও সুলভ। তথাপি জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে আধুনিক সভ্যমানুষ মনুষ্যেতর প্রাণিকুলের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পশুপালন বর্তমানে বিভিন্ন দেশে একটি সফল বৃত্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতির গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইহার উন্নতি ও প্রসারের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানও সচেষ্ট।

মানুষ আপন প্রয়োজনে যে সকল বন্য পশুকে বশে আনিয়াছে তাহাদের মধ্যে গরু, মহিষ, ঘোড়া, গাধা, অশ্বতর, মেষ, ছাগল-পাঁঠা, উট, হাতি, শূকর, চমরী ইত্যাদি প্রধান। এই সকল পশুকে প্রধানত দুগ্ধ-প্রদায়ী—(গরু, মহিষ, চমরী, ছাগল), মাংস-প্রদায়ী—(মেষ, গরু, উট, শূকর), পশম-প্রদায়ী—(মেষ, আলপাকা), ভারবাহী—(অশ্ব, গাধা, অশ্বতর, হাতি) ইত্যাদি নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

পশুজাত দ্রব্যাদি ও পশুপালনের গুরুত্ব (Pastoral Products and the importance of Pastoral farming) : অতি প্রাচীনকাল হইতেই পশুপালনকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করায় মানুষ নানাবিধ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে সমাজে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার ঘটিয়া চলিয়াছে।

নিম্নে পশুজাত দ্রব্যাদি ও ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করা হইল।

খাদ্য : খাদ্যের প্রয়োজনেই মানুষ প্রথম পশুপালন শুরু করে। পশুর মাংস, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত নানাবিধ দ্রব্যাদি—যেমন ঘি, মাখন, পনীর, ছানা ইত্যাদি ও হাঁস-মুরগীর ডিম, মধু প্রভৃতি মানুষের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মিটায়। গরু, মহিষ, চমরী (Yak), ছাগল, উট, বল্গাহরিণ ইত্যাদি দুগ্ধের জন্য প্রতিপালিত হয়। প্রধানত মাংসের জন্য প্রতিপালিত পশুর মধ্যে মেষ, পাঁঠা, শূকর প্রধান। কিন্তু গরু, মহিষ, উট, ঘোড়া ইত্যাদির মাংসও সুলভ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গরু, মহিষ, ঘোড়া শূকর ইত্যাদি গবাদিপশু সর্বাধিক প্রতিপালিত হয়। মেরু অঞ্চলে বল্গাহরিণ পালন করা হয়।

পরিধেয়: লজ্জা নিবারণের জন্য আদিম মানুষের ব্যবহৃত বিবিধ উপকরণের মধ্যে গাছের পাতা ও বল্কলের পরেই পশুচর্মের স্থান। ক্রমে পশুর লোম বা পশমের সাহায্যে গরম কাপড় ও পোশাক তৈয়ারি করিতে মানুষ শিখিল। শীতপ্রধান অঞ্চলে গরম পোশাকের জন্য মানুষ পশুলোম ও চর্মের উপর একান্ত নির্ভরশীল। পশুচর্ম ও পশম নির্মিত পোশাক যেমন গরম ও তেমনি আরামদায়ক। পশুচর্ম হইতে জুতা, স্যুটকেস্, ব্যাগ, গদি ইত্যাদি বহু বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। পশমের জন্য মেষ, আলপাকা, ইয়াক প্রভৃতি পালন করা হয়। শীতপ্রধান দেশে, প্রধানত উত্তর আমেরিকায় এক প্রকার ছোট জন্তুর গায়ে উষ্ণ আরামদায়ক লোম জন্মায়। ইহাকে ফার (Fur) বলে। শীতবস্ত্র তৈয়ারিতে এক সময় ফারের প্রচুর চাহিদা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কানাডায় ফার সংগ্রহের অধিকার লইয়া ইংরেজ ও ফরাসীর যুদ্ধ Fur War নামে পরিচিত হইয়াছিল। জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি প্রস্তুতে গরু, মহিষ, হরিণ, সম্বর, মেষ, ছাগল প্রভৃতির চামড়াই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। মেষপালন নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের একচেটিয়া। মেরু অঞ্চলের অধিবাসীরা সীল, সিন্ধুঘোটক ইত্যাদির চামড়া দিয়া পোশাক-পরিচ্ছদ ও 'কায়াক' নামক একপ্রকার লম্বা নৌকা ও তাহাদের গ্রীষ্মকালীন আবাস 'টুপিক' নামক তাঁবুও তৈয়ারি করে।

পরিবহণ: অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ পণ্য ও যাত্রী পরিবহণে পশুকে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। মরুভূমি, পাহাড় বা দেশের অভ্যন্তরেও এমন বহু দুর্গম স্থান আছে যে সকল স্থানে আধুনিক রাস্তাঘাট ও যানবাহনের প্রচলন এখনও সম্ভব হয় নাই। ঐ সকল স্থানে আজিও পরিবহণের কার্যে গরু মহিষ, ঘোড়া, গাধা, অশ্বতর প্রভৃতির ব্যবহার হইয়া থাকে। মরু অঞ্চলে উটই একমাত্র বাহন বলিয়া ইহাকে মরু-জাহাজ বলা হয়। দুর্গম পার্বত্য বা বনাঞ্চলে গরু, মহিষ, অশ্ব বা অশ্বতরই বাহন। এশিয়া বা আফ্রিকার গ্রামাঞ্চলে গরু বা মহিষে টানা গাড়ি আজিও পরিবহণের ব্যাপক সাহায্য করে। মেরু অঞ্চলে বল্গা হরিণ বা কুকুরের সাহায্যে শ্লেজ গাড়ি চালান হয়।

শক্তির উৎস: কয়লা, খনিজ তৈল বা জল-নির্ভর জড় শক্তির আবিষ্কারের পূর্বে জমি চাষ করা, কুয়া হইতে জল তোলা, ঘানি ঘোরানো প্রভৃতি কার্যে পশুশক্তির ব্যাপক ব্যবহার হইত। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জড় শক্তির উৎপাদন ও ব্যাপক ব্যবহার সত্ত্বেও পশুশক্তির কদর বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। আজিও বিভিন্ন দেশের গ্রামাঞ্চলে চাষের কার্যে, জলতোলার কার্যে পশুশক্তির বিপুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

শিল্পের কাঁচামাল: পশুপালন দ্বারা শুধু খাদ্য বা পরিবহণের সমস্যাই মেটে না। বর্তমানে ইহার আনুষঙ্গিক নানাবিধ কার্যও হইয়া থাকে। পশুর মাংস, পশম ইত্যাদি ও উহা হইতে ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী প্রস্তুত করিতে বিভিন্ন শিল্পের উদ্ভব ঘটিয়াছে। ইহা ব্যতীত পশুর ক্ষুর, শিং, হাড় ইত্যাদির সাহায্যে চিরুনি, বাট, খেলনা প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়। শূকরের লোম হইতে মোটা ব্রাশ ও অন্যান্য প্রাণীর নরম লোম হইতে নরম তুলি তৈয়ারি করা হয়। পশুর হাড়,

রক্ত ইত্যাদি হইতে সার প্রস্তুত হয় এবং পশুর রক্ত, শিরা প্রভৃতি চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও নানা উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পশুপালন সম্ভবত এশিয়া মহাদেশেই প্রথম শুরু হয়। বনচারী পশুকে বশ করিয়া তাহার দুধ, মাংস, চামড়া, পশম, চর্বি ইত্যাদি মানুষ প্রথমে তাহার দৈনন্দিন নানাবিধ অভাব পূরণের জন্য ব্যবহার করে। ক্রমে সভ্যতার উন্নতির সহিত পশুপালন অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পশুজাত দ্রব্যাদি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় আহরণ ও ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার সংগঠিত শিল্পের সৃষ্টি হয়।

পশু জীবিতাবস্থায় মানবজাতির প্রভূত উপকার করিয়া থাকে। মৃত্যুর পরেও তাহার দেহাবশেষ হইতে শিল্পের প্রভূত কাঁচামাল সংগৃহীত হয়। এই সকল কারণে বিশ্বের সকল দেশেই কমবেশি পশু প্রতিপালিত হয়। ইহা নানাধরনের সম্পদ সৃষ্টির সহায়ক বলিয়া পশুপালন আধুনিক কালে একটি সফল উপজীবিকা। ইহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক। ইউরোপের হল্যান্ড, ডেনমার্ক, ওশিয়ানিয়ার অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশ পশুজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনে বিশেষ অগ্রণী। এই সকল দেশের অর্থনীতি অনেকাংশে পশুজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল।

পশুচারণ ক্ষেত্রসমূহ (Grazing grounds): পৃথিবীর সর্বত্রই কমবেশি পশু প্রতিপালিত হয়। কিন্তু পশু-সম্পদের সার্থক প্রতিপালন ও উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করে ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানের আনুকূল্যের উপর। গৃহপালিত পশুর মধ্যে বেশির ভাগ পশুই তৃণভোজী। সুতরাং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত তৃণভূমিতেই বাণিজ্যিক প্রথায় পশুপালন করা সম্ভব। অধিকন্তু এই সকল তৃণভূমিতে চাষবাস ও কৃষিকার্যের অসুবিধা এবং জনবসতির বিরলতাও পশুপালনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। বিশ্বের প্রধান প্রধান পশুচারণক্ষেত্রগুলি দুইটি তৃণভূমি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ—(১) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি এবং (২) ক্রান্তীয় মণ্ডলের তৃণভূমি। এই তৃণভূমি অঞ্চলের যে সকল স্থানে বড় বড় ঘাস জন্মে সেই সকল স্থানে গবাদি পশু—গরু, মহিষ, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি প্রতিপালিত হয় এবং যে সকল স্থানে ছোট ছোট ঘাস জন্মে সেই সকল স্থানে মেষ, ছাগল ইত্যাদি পালন করা হয়।

নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি: সাধারণত ৩০° হইতে ৫০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যাস্থিত মহাদেশসমূহের মধ্যভাগে এই তৃণভূমি দৃষ্ট হয়। এই সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০ সে.মি.—৭৪ সে.মি. এবং উত্তাপের পরিমাণ ১৪° সে. হইতে ২০° সে.। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা সর্বত্র তেমন উর্বর নহে, জনবসতি খুবই বিরল। এই সকল কারণে স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট কৃষিকার্যের তুলনায় পশুপালন অধিকতর আকর্ষণীয়। এই তৃণভূমি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত পশুচারণক্ষেত্রগুলির মধ্যে উত্তর আমেরিকার কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রেইরি, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল, উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনার অন্তর্গত পাম্পাস, দক্ষিণ আফ্রিকার ভেল্ড,

ইউরেশিয়ার সোভিয়েত রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী, হল্যান্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের অন্তর্গত **স্টেপ** ও ওশিয়ানিয়ার অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত ডাউনস্ তৃণাঞ্চল উল্লেখযোগ্য। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমিতে প্রধানত দুগ্ধবতী গরু, মহিষ ও প্রচুর মেষ প্রতিপালিত হয়। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত ঘি, পনীর, মাখন ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে এই সকল অঞ্চলে উৎপাদিত হয় ও দেশবিদেশে রপ্তানি হয়। মেষের লোম হইতে পশম তৈয়ারি ও পশমের কারবার এই অঞ্চলের আর একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসা। দুগ্ধজাত দ্রব্য ও পশম ব্যতীত এই অঞ্চলে গবাদি পশু ও মেষের মাংস কাটিয়া টিনবন্ধ করিবার শিল্পের সহিত চামড়া সংগ্রহ ও পাকা করা (Tan) এবং পশুর ক্ষুর, শিং, হাড় প্রভৃতির সাহায্যে বিলাসদ্রব্য তৈয়ারির শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে মেরিনো মেষ পালন করা হয়। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি যেমন—মাখন, পনীর, গুঁড়া দুধ ইত্যাদি, পশম ও মাংস রপ্তানিতে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও কানাডা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। আর্জেন্টিনা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির সহিত প্রচুর গোমাংস বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ পশুবধ কারখানা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো শহরে অবস্থিত।

(২) **ক্রান্তীয় মণ্ডলের তৃণভূমি :** ক্রান্তীয় অঞ্চলের তৃণভূমিতে উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশি। ৫° হইতে ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের অন্তর্গত মহাদেশসমূহের মধ্যভাগে এই তৃণভূমি দেখা যায়। ইহাকে সাভানা তৃণভূমিও বলা হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৭৫ সে. মি. হইতে ১০০ সে. মি. এবং উত্তাপ প্রায় ২৫° সে.। ইহার ফলে এই অঞ্চলের ঘাস বেশ লম্বা হয়। আবার কোথাও অধিক উত্তাপ ও স্বল্প বৃষ্টিপাতের ফলে সুসংবদ্ধ তৃণক্ষেত্রের অভাবও পরিলক্ষিত হয়। ভূমির অনুর্বরতা, জলের অভাব, চাষবাসের অসুবিধা ইত্যাদির ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা পশুপালন। পশুর মধ্যে গবাদি পশুই প্রধান। কারণ, গরু, মহিষ অধিক তাপ সহ্য করিতে পারে। বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে পশুপালন এই সকল অঞ্চলে অতিরিক্ত উত্তাপের জন্য প্রায় সম্ভব হয় না। এই অঞ্চলে স্থানে স্থানে শূকর পালন করা হয়। আফ্রিকার সাভানা অঞ্চল (সুদান, উগান্ডা, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, এঙ্গোলা, নাইজেরিয়া প্রভৃতি) অস্ট্রেলিয়ার উত্তর টেরিটোরি, উত্তর কুইন্সল্যান্ড, দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া ও বলিভিয়ার সাভানা, ব্রেজিলের ক্যাম্পোস, ভেনেজুয়েলার **ল্যানোস,** বলিভিয়ার **মন্টানা,** প্যারাগুয়ে ও আর্জেন্টিনার **এল গ্রান চাকো** (El-Gran Chaco) প্রভৃতি ক্রান্তীয় মণ্ডলের তৃণভূমির অন্তর্গত।

ক্রান্তীয় অঞ্চলের গবাদি পশু নিকৃষ্ট শ্রেণীর। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তুলনায় ইহারা কম দুগ্ধপ্রদায়ী। মাংসের জন্যই এই পশু অধিক পালিত হয়। নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি ও ক্রান্তীয় ও মরু অঞ্চলে সাভানা তৃণভূমি ব্যতীত মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তৃণভূমি দেখা যায়।

(৩) **মৌসুমী অঞ্চলের তৃণভূমি :** জনসংখ্যার চাপে কৃষিক্ষেত্রের প্রসারে এই তৃণভূমি ক্রমেই সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। ভারত, চীন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান,

ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়। এই অঞ্চলের গবাদি পশু খুবই নিকৃষ্ট ধরনের। বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে পশুপালন এই অঞ্চলে সামান্যই হইয়া থাকে। মৌসুমী অঞ্চলের পর্বতের ঢালে মেষ ও ছাগ পালন করা হয়। এই সকল মেষের পশম উচ্চমানের হইয়া থাকে।

(৪) **মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের তৃণভূমি** : ক্রান্তীয় মণ্ডলের মহাদেশসমূহের পশ্চিম প্রান্তে মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চল দৃষ্ট হয়। এই সকল অঞ্চলের মরু জলবায়ু তৃণভূমির পক্ষে সহায়ক নহে। ফলে এই অঞ্চলে পশুপালন মানুষের কোন সার্থক জীবিকা হিসাবে গড়িয়া উঠে নাই। মরূদ্যান বা মরু সংলগ্ন অঞ্চলের সামান্য তৃণকে আশ্রয় করিয়া এইসকল স্থানে স্বল্প সংখ্যক উট, মেষ, ছাগ ও ঘোড়া প্রতিপালিত হয়।

[**প্রশ্ন :** (১) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ৫টি বিখ্যাত তৃণভূমির নাম ও উহাদের অবস্থান উল্লেখ কর। (২) আফ্রিকার কোন্ কোন্ দেশে সাভানা তৃণভূমি লক্ষ্য করা যায় ?]

পশম (Wool)

প্রাণীর দেহের লোম হইতে পশম উৎপন্ন হয়। মেষ ব্যতীত ছাগল, উট প্রভৃতি পশুর লোম হইতেও পশম পাওয়া যায়। তিব্বত ও কাশ্মীর অঞ্চলের ছাগলের লোম. দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজের পার্বত্য প্রদেশে ভাইকুনা, লামা, আলপাকা, গুয়ানকো প্রভৃতি পশুর লোম হইতেও পশম সংগ্রহ করা হয়। আফ্রিকার অ্যাঙ্গোরা ছাগলের লোম হইতে মো-হেয়ার নামক উচ্চমানের পশম পাওয়া যায়। বিশ্বের সর্বাধিক পশম মেষের লোম হইতেই উৎপন্ন হয়।

পশমের সাহায্যে গরম পোশাক-পরিচ্ছদ, যেমন শাল, চাদর, জামা, কোট, প্যাণ্ট, কম্বল প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। নিকৃষ্ট পশম হইতে কার্পেট তৈয়ারি হয়। তুলা ও অন্যান্য কৃত্রিম তন্তুর সহিত পশম মিশ্রিত করিয়াও পোশাক প্রস্তুত করা হয়। পশমের গুণাগুণ নির্ভর করে ইহার সূক্ষ্মতা, মসৃণতা ও ঔজ্জ্বল্যের উপর। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যায় মেরিনো জাতের মেষের লোম হইতে।

/ **পশম-প্রদায়ী মেষপালন (Rearing of Wool sheep)** : পশম-প্রদায়ী মেষপালন জলবায়ু দ্বারা সীমাবদ্ধ। অতিরিক্ত শীতল বা উষ্ণ অঞ্চলে মেষপালন সম্ভব নহে। এই কারণে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের যে সকল স্থানে বার্ষিক উত্তাপ ১৬° সে. হইতে ২০° সে. এবং বৃষ্টিপাত ৫০ সে. মি. হইতে ৭৫ সে. মি. ঐ সকল স্থানের তৃণভূমিতে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে পশম-প্রদায়ী মেষ প্রতিপালিত হয়।

মেষপালনের তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

(১) প্রধানত পশমের জন্য মেষপালন—দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টিনা, উরুগুয়ে, ওশিয়েনিয়ার অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ইউরোপের স্পেন প্রভৃতি অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পশমের জন্য মেরিনো জাতের মেষ প্রতিপালিত হয়। এই পশম দীর্ঘ আঁশযুক্ত মসৃণ ও উজ্জ্বল।

(২) অধিক পশম ও মাংসের জন্য মেষপালন—ইউরেশিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা (পেরু), ওশিয়ানিয়া (অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড) ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের তৃণাঞ্চলে একপ্রকার সংকর জাতীয় মেষপালন করা হয়। ইহাদের পশম বাণিজ্যের প্রয়োজনেই সর্বাধিক সংগৃহীত হয়। উৎপন্ন পশমের পরিমাণ অধিক হইলেও ইহা নিম্নমানের। ইহার মাংসও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া এই প্রকার মেষের প্রতিপালন নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের সর্বত্রই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

(৩) মাংসের জন্য মেষপালন—এশিয়া (সোভিয়েত রাশিয়া-সহ) ও আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলে এক ধরনের নিকৃষ্ট মেষ পালিত হয়। ইহাদের পশম হ্রস্ব আঁশ-বিশিষ্ট, কর্কশ ও মোটা। ইহার সাহায্যে গালিচা প্রভৃতি তৈয়ারি করা হয়। ইহার মাংস স্থানীয় অধিবাসীদের চাহিদা মিটাইয়া থাকে।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions) : পশমের জন্য মেরিনো মেষ ও সংকর জাতীয় মেষের প্রতিপালনই সর্বাধিক। মেরিনো মেষ প্রথম স্পেন দেশে দেখা গেলেও বাণিজ্যিক কারণে বর্তমানে ইহারা পৃথিবীর প্রায় সকল তৃণভূমিতেই বিচরণ করে। মেষ প্রতিপালনে উত্তর গোলার্ধের তুলনায় দক্ষিণ গোলার্ধে

চিত্র ১২.১ : পৃথিবীর পশম উৎপাদক অঞ্চলসমূহের নির্দেশক।

অবস্থিত দেশগুলির গুরুত্ব অধিক। কারণ, দক্ষিণ গোলার্ধের জনবিরল তৃণভূমি অঞ্চল মেষপালনের পক্ষে আদর্শ। পশমপ্রদায়ী মেষ অস্ট্রেলিয়া (ডাউনস), নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা (ভেল্ড), স্পেন, আর্জেন্টিনা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (প্রেইরী), কানাডা, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র (স্টেপ) প্রভৃতি দেশের তৃণভূমিতে প্রতিপালিত হয়। মাংসপ্রদায়ী মেষ প্রতিপালনে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চীন, ভারত ও তুরস্ক বর্তমানে মেষ প্রতিপালনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়াছে।

পৃথিবীর মোট পশম উৎপাদন (১৯৮২)

দেশ	উৎপাদন (ল. মে. ট.)	শতকরা হার (%)	দেশ	উৎপাদন (ল মে. ট.)	শতকরা হার (%)
অস্ট্রেলিয়া	৭'২৬	২৫'০৭	দঃ আফ্রিকা	১'০৬	৩'৭১
রাশিয়া	৪'৫০	১৫'৭৬	আঃ যুক্তরাষ্ট্র	০'৫১	১'৭৯
নিউজিল্যাণ্ড	৩'৭০	১২'৯৫	ভারত	০'৩৭	১'৩০
চীন	২'০০	৭'০০			
আর্জেন্টিনা	১'৪৮	৫'১৮	পৃথিবী	২৮'৫৬	১০০

বাণিজ্য (Trade) : পশম রপ্তানিতে অস্ট্রেলিয়া বিশেষ শীর্ষ স্থান অধিকার করে। রপ্তানিকৃত পশমের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশ হইতে আসে। এইসকল দেশ হইতে মাংসও রপ্তানি হয়। উত্তর গোলার্ধের ইউরেশিয়া ও কানাডা সামান্য পশম রপ্তানি করিয়া থাকে। পশম ও মাংস আমদানিকারক দেশের মধ্যে বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ইতালি প্রধান। ভারত, বাংলাদেশ, আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলি স্বল্প পরিমাণে পশম আমদানি করে।

পশম শিল্প বাজার কেন্দ্রিক শিল্প। বাজারের নিকটেই ইহার অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। উত্তর গোলার্ধের শিল্পোন্নত দেশে পশমী বস্ত্রের চাহিদা বেশি হওয়ায় পশম শিল্প ঐ সকল অঞ্চলেই সর্বাধিক সংগঠিত। এই কারণে দক্ষিণ গোলার্ধে সর্বাধিক পরিমাণ পশম উৎপাদন করিলেও উত্তর গোলার্ধের শিল্পাঞ্চলে উহা রপ্তানি করিয়া থাকে।

[প্রশ্ন : (১) পশম-প্রদায়ী মেষপালনের উপযোগী অবস্থা বর্ণনা কর। (২) কোন্ কোন্ দেশে মেরিনো জাতীয় মেষ অধিক পরিমাণে প্রতিপালিত হয়? (৩) কোন্ কোন্ দেশ পশম রপ্তানি করে?]

মাংসশিল্প (Meat Industry)

পৃথিবীর সকল দেশেই খাদ্য হিসাবে মাংস ব্যবহৃত হইলেও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদের ইহা একটি প্রধান খাদ্য। মাংসপ্রদায়ী পশুর মধ্যে প্রধানত গরু, মেষ ও শূকরই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। পশুপালনের উপযুক্ত ক্ষেত্র পৃথিবীর দুইটি তৃণভূমি অঞ্চল—(১) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের তৃণভূমি ও (২) ক্রান্তীয় মণ্ডলের তৃণভূমি। শূকর প্রতিপালনে তৃণভূমির আবশ্যকতা না থাকিলেও উন্মুক্ত প্রান্তরের সুবিধা থাকা আবশ্যক। তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর, উন্নত জাতের পশুর প্রাচুর্য, পশু খাদ্যের সহজ যোগান, ঘনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চলের নৈকট্য, উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থা, পশু বধের যান্ত্রিক ব্যবস্থা, হিমায়ন ব্যবস্থা প্রভৃতির আনুকূল্যেই মাংস শিল্প গড়িয়া উঠে।

গোমাংস (Beef): নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি-অধ্যুষিত ইউরোপ, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রচুর গবাদি পশু প্রতিপালিত হইলেও গোমাংসের উৎপাদনে এইসকল দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। গোমাংস উৎপাদনে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার প্রেইরি অঞ্চলের ভুট্টাবলয়ে প্রচুর মাংসপ্রদায়ী গরু, মহিষ পালিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার নিউসাউথ ওয়েলস ও কুইন্সল্যান্ডের উপকূলীয় অঞ্চলে ও সোভিয়েত ইউনিয়নে মাংসের জন্য গরু পালন করা হয়। এশিয়ার ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড বহু দেশেই ধর্মীয় অনুশাসনে গোমাংস পরিত্যাজ্য। ফলে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই সকল দেশে মাংসশিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

গোমাংস রপ্তানিতে আর্জেন্টিনা বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। উরুগুয়ে, ব্রেজিল, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশ টিনবন্ধ গোমাংস রপ্তানি করিয়া থাকে। আমদানিকারক দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জাপান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মেষ মাংস (Mutton): নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তৃণভূমিই মেষপালনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। মাংসপ্রদায়ী মেষকে উচ্চ প্রোটিনের সাহায্যে মেদবহুল করা হয় এবং উহার মাংস কাটিয়া টিনবন্দী করিয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানি করা হয়। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, চিলি ও ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই মেষ প্রতিপালিত হয়। মেষপালনে অস্ট্রেলিয়া প্রথম, সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় এবং চীন তৃতীয়। মেষ মাংস ও মেষশাবক রপ্তানিতে নিউজিল্যান্ড প্রথম। অন্যান্য রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের আভ্যন্তরীণ চাহিদা অধিক হওয়ায় রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত কমই থাকে। মেষমাংস আমদানিকারী দেশের মধ্যে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শূকর মাংস (Pork, Bacon, Ham): শূকর প্রতিপালনে তৃণভূমির প্রয়োজন হয় না। কারণ শূকর যে-কোন নোংরা আবর্জনা হইতে খাবার খুঁজিয়া খাইয়া বড় হয়। কিন্তু উন্নত জাতের শূকর প্রতিপালনে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও খাদ্যের সরবরাহ বাঞ্ছনীয়। পর্ক, বেকন বা হ্যাম বিভিন্ন গুণ ও স্বাদবিশিষ্ট শূকর মাংসের নাম। চর্বিযুক্ত শূকর পালনে খাদ্য হিসাবে ভুট্টার ব্যবহার অধিক। পক্ষান্তরে চর্বিশূন্য শূকরের জন্য যবের খাদ্য বিধেয়। শূকর কাল ও সাদা রঙের এবং বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। প্রধানত মাংস ও চর্বির জন্য শূকর পালন করা হয়। ভুট্টা ও যব উৎপাদনকারী দেশসমূহেই অধিক শূকর পালিত হইয়া থাকে। শূকর পালনে চীন প্রথম ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়। তৃতীয় স্থান অধিকার করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ইহা ব্যতীত আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, মেক্সিকো, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশেও শূকর পালন করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস ও চিকাগো শহর শূকর মাংসের শিল্পে বিশেষ উন্নত।

শূকরের মাংস ও চর্বি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সর্বাধিক রপ্তানি করিয়া থাকে। আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল হল্যান্ড, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি দেশ হইতেও শূকর মাংস রপ্তানি হইয়া থাকে। শূকর মাংস আমদানিকারক দেশের মধ্যে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, কিউবা, ইতালি প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য মাংসপ্রদায়ী পশুপক্ষী : মাংসের জন্য মানুষ গবাদি পশু, মেষ ও শূকর ব্যতীত যে-সকল পশুপক্ষী পালন করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে হরিণ, উট, দুম্বা, হাঁস, মুরগী ও নানাজাতের পক্ষী প্রধান। মরু অঞ্চলে উট ও দুম্বা প্রতিপালিত হয়। মুরগী প্রতিপালন প্রায় সর্বপ্রকার জলবায়ুতেই সম্ভব বলিয়া মুরগীর আন্তর্জাতিক বাজার গড়িয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর মুরগী প্রতিপালিত হয়।

চর্ম Hides and Skins)

চর্ম বলিতে যে-কোন পশুর গাত্রাবরণকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক ভূগোলের বিশ্লেষণে বৃহৎ পশু যেমন গরু, মহিষ, ঘোড়া, হাতি, গণ্ডার প্রভৃতি পশুর চর্মকে Hides এবং ছোট পশু যেমন মেষ, ছাগল, হরিণ প্রভৃতির চর্মকে Skins বলে। জুতা, স্যুটকেস, ব্যাগ, পোশাক, দস্তানা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে চর্ম ব্যবহার করা হয়। কুমীর, হাঙ্গর, সীল, সিন্ধুঘোটক, সাপ, বাঘ, বানর, শূকর, সিলভার ফক্স প্রভৃতির চর্মও নানাবিধ সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়।

চর্ম-উৎপাদক দেশসমূহ (Producing Regions) : পশুচারণ ক্ষেত্রসমূহই বিশ্বের প্রধান চর্ম উৎপাদন-কেন্দ্র। গবাদি পশু অধিক তাপ সহনশীল বলিয়া গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি সর্বাধিক সংখ্যায় প্রতিপালিত হয় উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, স্পেন, আর্জেন্টিনা, কানাডা প্রভৃতি দেশে প্রধানত মেষচর্ম সংগ্রহ করা হয়। পক্ষান্তরে গরু ও মহিষের চর্ম সংগ্রহের প্রধান অঞ্চলগুলি ভারত, পাকিস্তান, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, চীন প্রভৃতি দেশে অবস্থিত দেখা যায়। ভারতে ছাগল ও মেষের চর্মও প্রচুর সংগৃহীত হয়।

বাণিজ্য (Trade) : চর্ম রপ্তানিতে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, নিউজিল্যান্ড, ব্রেজিল, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য। চর্ম আমদানি-কারক দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী প্রধান।

অন্যান্য প্রাণিজাত দ্রব্য (Other Animal Products)

পশুর দুধ, মাংস ও চর্ম ছাড়া ইহাদের হাড়, শিং, ক্ষুর, লোম, দাঁত, চর্বি, রক্ত শিরা প্রভৃতি হইতে বর্তমানে নানাবিধ সামগ্রী উৎপন্ন হয়। গরু-মহিষের হাড় ও শিং হইতে বোতাম, চিরুনি, খেলনা প্রভৃতি সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। হাতির দাঁত একটি মূল্যবান সম্পদ। ইহার সাহায্যে অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান বিলাসদ্রব্য

তৈয়ারি হয়। হাড়ের গুঁড়া সার হিসাবে এবং লবণ ও চিনি পরিষ্করণে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রাণিজাত অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহারের শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাতীর দাঁত আফ্রিকার একটি বিশেষ রপ্তানি দ্রব্য।

[প্রশ্ন : (১) মাংসের জন্য মানুষ কোন্ কোন্ পশু প্রতিপালন করে? (২) মাটন উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম উল্লেখ কর। কোন্ দেশ সর্বাধিক মাটন রপ্তানি করে? (৩) চর্ম রপ্তানিকারক দেশগুলির নাম লিখ।]

ডেয়ারী শিল্প (Dairy Farming):

দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি অত্যন্ত পুষ্টিকর। সুতরাং জীবনধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে গবাদি দুগ্ধপ্রদায়ী পশু-পালন মানুষের একটি অতি প্রাচীন উপজীবিকা। বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই গবাদি পশু গৃহপালিত পশু হিসাবেই মানুষ প্রতিপালন করে। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের যেমন চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে পশুপালনও তেমনি বাণিজ্যিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি শিল্প হিসাবে গড়িয়া উঠিতে থাকে। আধুনিক কালে বিশ্বের তৃণভূমি অঞ্চলগুলিতে পশুপালন সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রথায় একটি বৃহদায়তন খামার হিসাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আধুনিক পশুখামারে প্রতিপালিত পশুর মধ্যে গরু, মহিষ ও ছাগলই প্রধান। উৎপাদিত বিভিন্ন ডেয়ারী দ্রব্যের মধ্যে দুধ, মাখন, পনীর, ঘি, ছানা, গুঁড়া দুধ, ঘনীভূত দুধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সংগঠনের অনুকূল অবস্থা (Favourable Factors of Organisation): নিম্নলিখিত অবস্থানসমূহের আনুকূল্য ডেয়ারী শিল্প গঠন ও প্রসারের পক্ষে অপরিহার্য —(১) পশুচারণের উপযুক্ত চারণভূমি—এই সকল চারণভূমিতে দীর্ঘ ও পরিমিত বৃষ্টিযুক্ত গ্রীষ্মকাল ও মৃদু শীতকালে তৃণের প্রাচুর্যের সহায়ক। (২) বার্ষিক উত্তাপ ১৬° সে হইতে ২০° সে. এবং বৃষ্টিপাত ৫০ সে.মি. হইতে ১০০ সে.মি. হওয়া বাঞ্ছনীয়। (৩) ভূ-প্রকৃতি বন্ধুর হইলে কৃষিকার্যের অসুবিধা ঘটে ও পশুপালনের পক্ষে সুবিধা হয়। (৪) মৃত্তিকা গভীর ও আদ্র দো-আঁশ জাতীয় হইলে পশুখাদ্য ও তৃণ উৎপাদনের অনুকূল হয়। (৫) দুগ্ধ পচনশীল বলিয়া নিকটবর্তী দুগ্ধের বাজার অর্থাৎ ঘনবসতিযুক্ত জনপদ থাকা আবশ্যক। (৬) সার্থক পশুপালন যথেষ্ট সংখ্যক সুদক্ষ কর্মীর কার্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। (৭) আধুনিক পশুপালন শিল্পে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনের নিমিত্ত প্রচুর মূলধন আবশ্যক। (৮) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি দ্রুত বাজারজাত করিবার জন্য উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ডেয়ারী কেন্দ্রসমূহ: পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ডেয়ারী-শিল্প নিম্নলিখিত চারিটি অঞ্চলে বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত।

(১) **উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চল:** এই অঞ্চল ফ্রান্সের পশ্চিম প্রান্ত

হইতে শুরু করিয়া ইউরোপের উত্তরাংশের সমভূমির মধ্য দিয়া ডেনমার্ক, সুইডেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর-পশ্চিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের অন্তর্গত ফ্রান্স, জার্মানী, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি ডেয়ারী শিল্পে বিশেষভাবে উন্নত। এই অঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, গভীর দো-আঁশ মৃত্তিকা প্রভৃতি একদিকে যেমন সতেজ তৃণভূমি গঠনের সহায়ক তেমনি এই অঞ্চলে ঘনবসতিপূর্ণ শহরে দুগ্ধজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, মূলধনের যোগান ইত্যাদি উন্নত ডেয়ারী শিল্প গঠনের সহায়ক। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সকল দ্রব্যই এই সকল দেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়। গুঁড়া দুধ ও ঘনীভূত দুধ উৎপাদনেই এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ডের অর্থনীতি অনেকাংশে এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল।

(২) **উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চল**: কানাডার দক্ষিণ-পূর্বাংশ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। কানাডার ম্যানিটোবা, অণ্টারিও কুইবেক এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যাণ্ড রাজ্যসমূহ ও মিনেসোটা, উইসকনসিন, মিচিগান, আইওয়া ইলিনয় প্রভৃতি রাজ্যে দুগ্ধশিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্রসমূহ অবস্থিত। এই অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন মৃদু উত্তাপ, ৫০ সে.মি. হইতে ৮৫ সে.মি. বৃষ্টিপাত, বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, ঘন লোকবসতি, কৃষিকার্যের অসুবিধা, উন্নত যানবাহন, সরকারের সহযোগিতার নীতি প্রভৃতি পশুপালন ও ডেয়ারী শিল্পের প্রসারের সহায়ক। মাখন ও পনীর উৎপাদনে এই রাজ্যগুলি বিশিষ্ট।

(৩) **অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড**: পূর্ব অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড এই অঞ্চলের অন্তর্গত। অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জের পশ্চিমাংশে ও নিউজিল্যাণ্ডে প্রচুর গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়। এই অঞ্চলের গরু খুবই উন্নত জাতের। প্রধানত জলবায়ুর কারণেই এই অঞ্চলে ডেয়ারী শিল্পের উন্নতি ঘটিয়াছে। এই সকল অঞ্চলে স্বল্প লোকবসতি বলিয়া গুঁড়া দুধ, ঘনীভূত দুধ, মাখন ও পনীর প্রচুর উৎপাদন করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিবার সুবিধা রহিয়াছে।

(৪) **ব্রেজিল—আর্জেন্টিনা**: দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল ও আর্জেণ্টিনা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়। লোকবসতির স্বল্পতাহেতু ও জলবায়ুর কারণে এই অঞ্চলে ডেয়ারী শিল্পের প্রসার আশানুরূপ নহে। এই অঞ্চলের মাখন, পনীর, গুঁড়া দুধ প্রভৃতি স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া আমেরিকার বাজারে রপ্তানি করা হয়।

বাণিজ্য (Trade): দুগ্ধ তরল টাটকা অবস্থায় কোন দূরবর্তী অঞ্চলে প্রেরণ সম্ভব নহে বলিয়া দুগ্ধ হইতে মাখন, পনীর, ঘি, গুঁড়া দুধ, ঘনীভূত দুধ ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বাজারে প্রেরণ করা হয়। ডেনমার্কের মাখন এবং হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের পনীর বিখ্যাত। মাখন, পনীর ও গুড়া দুধ রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড (নেদারল্যাণ্ডস্), সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেণ্টিনা, কানাডা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ

সকল পণ্যের আমদানিকারী দেশ হিসাবে বৃটিশ যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানী, বেলজিয়াম, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি ইত্যাদি প্রধান।

[প্রশ্ন : (১) ডেয়ারী শিল্প সংগঠনের অনুকূল অবস্থাগুলি কি কি? (২) বিশ্বের ডেয়ারী শিল্পকেন্দ্রগুলি কোথায় কোথায় অবস্থিত? ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।]

অনুশীলনী

১। বাণিজ্যিক চারণক্ষেত্র গড়িয়া উঠার অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক চারণক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা কর এবং উহাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা কর।

[Describe the favourable conditions for the development of commercial grazing areas. Describe the major commercial grazing areas of the world and also discuss the prospects of those areas.]

২। মেষপালনের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থার বর্ণনা কর। পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশম উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম কর।

[Describe the geographical conditions suitable for sheep-rearing. Name the major wool-producing countries of the world.]

৩। (ক) পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে পশুপালন শিল্প অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা সেই সকল অঞ্চলের নাম কর। (খ) কেন এই সকল অঞ্চলে কৃষিকার্যের বদলে পশুপালন শিল্পকে কৃষিকার্যের উপরে স্থান দেওয়া হয়, তাহার কারণ বর্ণনা কর। (গ) পশুপালন শিল্পজাত প্রধান প্রধান দ্রব্যের নাম কর।

[Name the regions of the world where pastoral farming is the main occupation of the people. (b) Account for practising pastoral farming in those regions in preference to growing crops. (c) What are the principal products of pastoral farming ?]
(W. B. H. S. C. Exam., 1982)

৪। পৃথিবীতে পশম ও মেষ মাংস উৎপাদনকারী দেশগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ঐ সকল দেশে পশুপালন শিল্পের উন্নতির কারণ নির্দেশ কর।

[Give a brief account of the countries producing wool and mutton in the world. Point out the causes of the development of pastoral farming in those countries.]

৫। ডেয়ারী শিল্পের অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বিশ্বের ডেয়ারী শিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

[Discuss in brief the Dairy industry in the world and critically examine the favourable geographical and economic conditions of Dairy industry.]

৬। দুগ্ধ সংক্রান্ত শিল্পের উপযোগী ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহ কি কি? পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়? সংক্ষেপে দুগ্ধ শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উল্লেখ কর।

[What are the geographical and economic conditions for the development of Dairy Industry ? What are the regions of the world where Dairy Farming is carried on in an extensive scale ? Mention briefly the world trade in dairy products.]

(Specimen Question, 1981)

৭। কি কি ভৌগোলিক পরিবেশে দুগ্ধজাত শিল্প উন্নতি লাভ করে, তাহা আলোচনা কর। যে-সকল দেশ এই শিল্পে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তাহাদের নাম কর।

[Discuss the geographical conditions for the development of dairy farming and mention the areas of their concentration.]

(W. B. H. S. C. Exam., 1983)

১৩ পরিবহণ ও বাণিজ্য পথ
(Transport and Trade Routes)

অর্থনৈতিক ভূগোল আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে পরিবহণের স্থান দ্বিতীয়। পণ্য-সামগ্রী, মানুষ বা স্থানান্তরযোগ্য অপর কোন জিনিসকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়াকে পরিবহণ বলা হয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, গ্রাম-নগর-শহর বন্দরের সৃষ্টি ও প্রসার যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন ইত্যাদির ফলে উৎপাদনকেন্দ্র ও ভোগকেন্দ্রের মধ্যে সৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে দুস্তর স্থানগত ব্যবধান। এই স্থানগত ব্যবধান দূরীকরণে পরিবহণ অপরিহার্য। শিল্প-বিপ্লবের ফলে উৎপাদনের প্রসার ও বাজারের বিস্তৃতি ঘটায় আধুনিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রেও পরিবহণের গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। পণ্যসামগ্রী ও যাত্রী স্বল্প সময়ে স্বল্প ব্যয়ে একস্থান হইতে অন্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার পরিবহণ-ব্যবস্থা স্থানগত বাধা অপসারণ করিয়া সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করে। পরিবহণের তিনটি প্রধান মাধ্যম, যথা—স্থলপথ, জলপথ ও বিমানপথ। পরিবহণের মাধ্যম যেমন বিভিন্ন তেমনি পরিবহণের উপায়ও বিভিন্ন। আদিম যুগে ভারবহনে মানুষ ও পশু উভয়ের ব্যবহার ছিল। বর্তমান যুগে স্থানবিশেষে যেমন পার্বত্য অঞ্চলে বা মরু ও মেরু অঞ্চলে মানুষ ও পশুই একমাত্র পরিবহণের উপায় হইলেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার পরিবহণের মাধ্যম ও উপায় ব্যবহৃত হয়। নিম্নে পরিবহণের শ্রেণী-বিভাগ দেখান হইল :

পরিবহণের শ্রেণীবিভাগ

পরিবহণ

- স্থলপথ
  - সড়কপথ
    - মানুষ ও পশুবাহিত চক্রযান—(ঠেলা গাড়ি, গরু, ঘোড়া, গাধাটানা গাড়ি ইত্যাদি)
    - ভারবাহী পশু বা মানুষ, গাধা, হাতি, ঘোড়া, উট, ইত্যাদি।
    - জড়শক্তি চালিত লরী, ট্রাক, মোটর, টেম্পো ইত্যাদি।
  - রেলপথ (যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়ি)
- জলপথ
  - আভ্যন্তরীণ
    - নদনদী
    - হ্রদ
    - খাল
    - (নৌকা, স্টীমার, লঞ্চ প্রভৃতি)
  - সামুদ্রিক (জাহাজ)
    - লাইনার (নির্দিষ্ট পথের যাত্রীবাহী জাহাজ)
    - ট্র্যাম্প (অনির্দিষ্ট পথের মালবাহী জাহাজ)
- বিমান পথ (যাত্রীবাহী ও মালবাহী বিমান ও জেট)
- নলপথ (নলযোগে তরল পদার্থ পরিবহণ
- দাঁড়পথ (পার্বত্য অঞ্চলে মাল-পত্র পরিবহণ)

পরিবহণের গুরুত্ব (Importance of Transport)

বৃহদায়তন উৎপাদনব্যবস্থা-নির্ভর আধুনিক শিল্প-সভ্যতার মূল বনিয়াদ পরিবহণ-ব্যবস্থা। কারণ আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদনকেন্দ্র ও ভোগকেন্দ্রের মধ্যে যে দুস্তর স্থানগত ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে উহা দূরীকরণে একমাত্র পরিবহণ-ব্যবস্থাই সমর্থ। প্রাকৃতিক কারণেই বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের স্বাভাবিক সুবিধা বর্তমান। বিশ্বের কোন দেশই অধিবাসীদের বিভিন্নমুখী চাহিদার দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। সুতরাং সকল দেশেই সকল প্রকার পণ্যোৎপাদনের ঝুঁকি গ্রহণ না করিয়া শ্রম বিভাগ ও বিশেষায়ণের নীতি অনুযায়ী বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থায় সর্বাধিক সুবিধাযুক্ত পণ্যসামগ্রী স্বল্পব্যয়ে উৎপাদন করা হয় ও বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশের ভোগকেন্দ্রের মধ্যে ঐ পণ্যসামগ্রী বণ্টন করা হয়। এই উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় পরিবহণ অপরিহার্য। ভারত ও কিউবার চিনি, মালয়েশিয়ার রাবার, ব্রেজিলের কফি ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। আবার আমেরিকা ও ইউরোপের শিল্পদ্রব্য এশিয়া ও আফ্রিকার দেশে দেশে সমাদৃত হয়। জার্মানী, জাপান বা সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রস্তুত ঔষধ, ভারত ও বাংলাদেশের রোগীর প্রাণ রক্ষা করে। সুইডেন ও স্পেন দেশের লৌহ আকরিক বৃটিশ যুক্তরাজ্যের কারখানায় পরিণত হয় ইস্পাতে এবং পরে ঐ ইস্পাত হইতে প্রস্তুত বয়নশিল্পের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় মিশরের বয়নশিল্পে। এই সকলই সম্ভব হইতেছে পরিবহণের উন্নতি ও প্রসারের ফলে।

পরিবহণের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ও গতি উভয়ই বৃদ্ধি পায়, এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। স্থল, জল ও আকাশপথে বিভিন্ন কাঁচামাল উৎপাদনকেন্দ্রে নীত হয় এবং ঐ সকল স্থানে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী আবার বিভিন্ন ভোগকেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। পরিবহণের মাধ্যমেই দেশবিদেশের কৃষিক্ষেত্র, চারণক্ষেত্র, অরণ্য ও খনি হইতে সংগৃহীত কাঁচামাল নীত হয় নিকটবর্তী শিল্প-কারখানায় এবং উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যসমূহই আবার প্রেরণ করা হয় দেশ-বিদেশের ভোগকেন্দ্রে। পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রসারের ফলেই একদা অখ্যাত, অজ্ঞাত ঊষর প্রান্তর বা অরণ্যাঞ্চল রূপান্তরিত হয় বিরাট শিল্পক্ষেত্রে বা সমৃদ্ধ জনপদে। সুতরাং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরিবহণের দান অপরিসীম। ইহার প্রভাবেই সমাজে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাপক প্রসার ঘটিতেছে। ইহাকে আধুনিক অর্থনীতির মূল জীবনীশক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবহণের প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হইল :

কৃষি : কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত খাদ্যশস্য যেমন—ধান, গম ইত্যাদি বাজারজাত করিতে পরিবহণের যেমন প্রয়োজন হয় তেমনি শিল্পের কাঁচামাল তুলা, পাট, ইক্ষু প্রভৃতিও শিল্পক্ষেত্রে, কলে, কারখানায় প্রেরণে পরিবহণ অপরিহার্য। পরিবহণ-

ব্যবস্থা কৃষিপণ্যের বাজারকে প্রসারিত করিয়া অধিক উৎপাদনে উৎসাহ যোগায়। কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার গম, আমেরিকার তুলা, ভারতের চা ইত্যাদি পরিবহণের সুযোগ গ্রহণ করিয়াই বিশ্বের বাজারে সমাদর পাইতেছে।

খনি ও অন্যান্য প্রাথমিক উৎপাদনক্ষেত্র (Primary Sector) : ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত কয়লা, লৌহ আকরিক, খনিজ তেল, তাম্র ইত্যাদি খনিজ পদার্থের ব্যবহার পৃথিবীর সর্বত্র। কিন্তু এই সকল মূল্যবান সম্পদের ভৌগোলিক বণ্টন অতীব বৈষম্যপূর্ণ। এমনকি একটি দেশের ক্ষেত্রেও ইহার সঞ্চিত ভাণ্ডার অঞ্চলবিশেষেই সীমাবদ্ধ দেখা যায়। একমাত্র পরিবহণের সাহায্যে এইসকল সম্পদ দূর-দূরান্তে অবস্থিত শিল্প-কারখানায় ও ভোগকেন্দ্রে প্রেরণ করা সম্ভব হয়। অনুরূপভাবে মৎস্য সম্পদ, বনজ সম্পদ, পশুজাত পশম, মাংস, চর্ম ডেয়ারী সম্পদ প্রভৃতি অঞ্চলবিশেষে উৎপন্ন হইলেও পরিবহণের মাধ্যমে বিশ্বের ভোগকেন্দ্রসমূহে স্বল্পব্যয়ে প্রেরণ করা যায়। আফ্রিকার খনিজ সম্পদ, অস্ট্রেলিয়ার পশুজাত দ্রব্যাদি, নরওয়ে, কানাডা অঞ্চলের বনজ সম্পদের উন্নতি পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রসারের জন্যই সম্ভব হইয়াছে।

যন্ত্রশিল্প (Manufacturing Industries) : যন্ত্রশিল্পের সংগঠন প্রধানত যে-সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে উহাদের মধ্যে পরিবহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কাঁচামালের যোগান ও উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাত করিতে পরিবহণই একমাত্র মাধ্যম এবং এই কারণে পরিবহণ-ব্যয় পণ্যের উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়ামক বলিয়া বিবেচিত হয়। অর্থাৎ পরিবহণের সহজ সুযোগই দেশের শিল্পগঠনে ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। বৃটিশ যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি প্রভৃতি দেশের শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থা।

বাণিজ্য (Trade) : উৎপাদন ও ভোগকেন্দ্রের মধ্যে যোগ স্থাপন করে পরিবহণ-ব্যবস্থা। আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী চাহিদা অনুযায়ী দেশে-বিদেশে সর্বত্রই প্রেরণ করা হয় পরিবহণের মাধ্যমে। ইহাতে চাহিদার ক্রম প্রসারের সহিত উৎপাদনের গতিবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ পরিবহণ-ব্যবস্থা অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতির সহায়ক। উদ্বৃত্ত এলাকা হইতে ঘাটতি এলাকায় পণ্য চলাচলে পরিবহণ অপরিহার্য।

কর্মসংস্থান (Employment) : পরিবহণের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার মাধ্যম ও উপায় ব্যবহার, উহার সংগঠন, নির্মাণ ও পরিচালনে দেশের এক বিরাট সংখ্যক লোক-নিয়োগ আবশ্যক হয়, আবশ্যক হয় নানা প্রকার নির্মাণ-শিল্পের সংগঠন। ফলে দেশে কর্মসংস্থানের যেমন প্রসার ঘটে তেমনি জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়।

প্রতিরক্ষা (Defence) : পরিবহণ-ব্যবস্থা দেশের সকল অঞ্চলের সহিত সহজ যোগাযোগ স্থাপন করে বলিয়া দেশের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনে জল, স্থল, বিমানপথে সর্বত্র সামরিক-ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে দেশের সর্বত্র সৈন্য ও রসদ প্রেরণ যেমন সম্ভব হয় তেমনি আবার দুর্ভিক্ষ মহামারিতে সকল অঞ্চলে খাদ্যপ্রেরণ, ঔষধপত্র ও সেবার যোগান দেওয়াও সহজ হয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিনিময় (Spread of Education and Culture): পরিবহণের উন্নতি ও প্রসারে যেমন বাণিজ্যের প্রসার ঘটে তেমনি দেশে-বিদেশে যাতায়াতের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। ইহাতে সংস্কৃতির বিনিময় ঘটে, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যার নব নব উন্মেষ ঘটে। শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতির সহিত আন্তর্জাতিক ভাববিনিময় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং সভ্যতার দিগন্ত প্রসারিত হয়।

স্থলপথে পরিবহণ (Land Transport)

স্থলপথে পরিবহণের মাধ্যম দুইটি—সড়কপথ ও রেলপথ।

সড়কপথ (Roads): আদিম যুগে স্থলপথেই মানুষের চলাচল ও পণ্য বহন শুরু হয়। তখন না ছিল পাকা রাস্তা না ছিল পণ্য বহনের উপযুক্ত যানবাহন। ফলে মানুষ নিজেই পায়ে চলা পথে পণ্য বহন করিত। ক্রমে পণ্যবহনে পশুর ব্যবহার শুরু হয়। চক্রযানের আবিষ্কার পরিবহণ-শিল্পে বিপ্লবের সূচনা করে। কিন্তু জড় শক্তির আবিষ্কার ও উহার প্রয়োগ শুধু পরিবহণ শিল্পেই নহে অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ব্যাপক বিপ্লব ঘটায়। বর্তমান যুগে রাস্তার উন্নতি ও যানবাহনের উন্নতি শিল্প-সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। সড়কপথে পরিবহণে উন্নত অঞ্চলে মোটর, লরী, ট্রাক, টেম্পো, ভ্যান প্রভৃতির ব্যবহার ব্যাপক হইলেও অনুন্নত অঞ্চলে আজিও গরু, মহিষ, ঘোড়া, অশ্বতর-টানা গাড়ি বা মানুষে টানা গাড়ি ও রিক্সার ব্যবহার লক্ষণীয়। বন্ধুর ভু-প্রকৃতিতে, পার্বত্য অঞ্চলে, মরু বা মেরু অঞ্চলে প্রতিকুল পরিবেশে আজিও মানুষ ও পশুই পরিবহণের আদি ও অকৃত্রিম উপায়, যেমন—পার্বত্য অঞ্চলে মানুষ, অশ্ব ও অশ্বতর মরু অঞ্চলে উট এবং মেরু অঞ্চলে কুকুর ও বল্গা হরিণই পরিবহণ-কার্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

সড়কপথ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত:—(১) জনপথ (রাজপথ) (Highways), (২) শাখাপথ বা পোষক পথ (Branch or Feeder Roads), (৩) গ্রাম্য পথ (Village Road)।

জনপথ (Highways): এই পথগুলি দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। বড় বড় শহর, বন্দর, শিল্পাঞ্চল, কৃষি-অঞ্চল ইত্যাদির মধ্যে সংযোগ-স্থাপন করাই এই প্রকার জনপথ নির্মাণের উদ্দেশ্য। সকল ঋতুতেই যাহাতে পরিবহণের সুযোগ ঘটে ও একই সময়ে যাহাতে অধিকসংখ্যক গাড়ি দ্রুত গতিতে চলাচল করিতে পারে তাহার জন্য এইসকল পথ পাকা ও প্রশস্ত হয়। বর্তমান যুগে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সড়কপথ রেলপথের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। ভারতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, চীনদেশের কুনসিং—লাসিও রোড (বার্মারোড), সোভিয়েত রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ-টিফলিস রোড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

শাখাপথ (Feeder Roads or By-roads): দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত যোগস্থাপনের জন্য জনপথের সহিত যুক্ত অসংখ্য পাকা নাতিপ্রশস্ত

পথ নির্মাণ করা হয়। দেশের অভ্যন্তর ভাগকে বিভিন্ন ধারায় শিল্পবাণিজ্য-কেন্দ্রের সহিত যুক্ত করে বলিয়া ইহাদের শাখা-পথ বা পোষকপথ বলা হয়।

গ্রাম্যপথ (Village Roads): সুদূর পল্লী অঞ্চলে সকলদেশেই ছোট পায়ে-চলা পথ দেখা যায়। ইহাদের অধিকাংশই কাঁচারাস্তা, মানুষ ও পশু চলাচলের উপযোগী। এইসকল পথেই গ্রামে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী নিকটবর্তী হাটে বাজারে প্রেরণ করা হয়। পার্বত্য অঞ্চলে সংকীর্ণ পায়ে চলা পথেই আজিও পণ্য ও যাত্রীর আনাগোনা চলে।

সড়কপথ নির্মাণে সমতলভূমিই প্রশস্ত। বন্ধুর ভূপ্রকৃতি ও প্রতিকূল পরিবেশে রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় অধিক হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথের মোট দৈর্ঘ্য সর্বাধিক। পৃথিবীর সড়কপথের প্রায় ⅓ অংশ এই দেশে বর্তমান। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সড়ক পথের মোট দৈর্ঘ্য ১৫ লক্ষ কি.মি.-এর অধিক। সড়ক-পথের মোট দৈর্ঘ্যে সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিতীয় (১৪ লক্ষ কি.মি.) এবং জাপান তৃতীয় (১০ লক্ষ কি.মি.)। কিন্তু দেশের আয়তনের অনুপাতে সড়কপথের দৈর্ঘ্য বিবেচনা করিলে জাপানের স্থান বিশ্বে প্রথম। দেহের শিরা-উপশিরার মতই আধুনিক সড়ক পথ দেশে দেশে ছড়াইয়া আছে। পশ্চিম ইউরোপ, সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি শিল্পোন্নত অঞ্চলেই সড়কপথের ঘন জাল বিস্তৃত দেখা যায়, ভারতে অতীতে সড়কপথের তেমন বিস্তার ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতের অভ্যন্তরে প্রচুর জনপথ ও শাখাপথের বিস্তার ঘটিয়াছে।

রেলপথ (Railways)

স্থলপথে যোগাযোগ-ব্যবস্থার মধ্যে রেলপথই সর্বাধিক সুবিধাজনক। নিম্নে ইহার সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করা হইল।

রেলপথের সুবিধা—(১) ইহার সাহায্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত এমন কি বিদেশের সহিতও যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব হয়। (২) রেলযোগে একবারে অধিক পণ্য ও যাত্রী চলাচল সম্ভব হয় বলিয়া ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি। (৩) রেলপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের খরচ স্থলপথের অন্যান্য যানবাহনের তুলনায় অনেক কম। (৪) রেলপথের সুষ্ঠু বিন্যাসের উপরই দেশের অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভর করে। কারণ রেলযোগাযোগের উপর শিল্পকেন্দ্রে কাঁচামালের সরবরাহ, উৎপন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন বাজারে বণ্টন বা বিদেশে চালান ইত্যাদি নির্ভর করে। (৫) দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা বা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত সামরিক সংযোগ রক্ষা, সৈন্য ও রসদপ্রেরণ ইত্যাদি রেলপথের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। (৬) দুর্ভিক্ষ, মহামারি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি অবস্থার মোকাবিলা করিতে উপদ্রুত এলাকার সহিত রেলপথেই সহজ যোগাযোগ সম্ভব হয়।

রেলপথের অসুবিধা—(১) রেলপথ নির্মাণের ফলে গ্রামাঞ্চলের সম্পদ শহর ও শিল্পাঞ্চলে চলিয়া যাওয়ায় গ্রামগুলির অবস্থা অনেকস্থলেই শোচনীয় আকার ধারণ করে। (২) শহর ও শিল্পাঞ্চলের দূষিত আবহাওয়া ও শিল্প-সভ্যতার ত্রুটিগুলি ধীরে ধীরে গ্রাম্য পরিবেশকে দূষিত করে। (৩) নদীর উপর সেতু নির্মাণ বা জমির উপর তাড়াতাড়ি রেলপথ নির্মাণের ফলে জলনিকাশের স্বাভাবিক পথ অনেক স্থলে নষ্ট হয়। ফলে কখনও কখনও বন্যার সৃষ্টি হয়। (৪) রেল নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষ।

রেলপথ দুইপ্রকার—(১) **অন্তর্দেশীয় বা আভ্যন্তরীণ রেলপথ** (Internal Railways)—এই রেলপথ দেশের সীমার মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের সংযোগ সাধন করে। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য বর্তমানে সকল দেশেই ইহার বিস্তার ঘটিয়াছে। (২) **মহাদেশীয় রেলপথ** (Trans-Continental Railways): এই রেলপথগুলি মহাদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। বিভিন্ন দেশের নগর, বন্দর, শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতির মধ্যে এই রেলপথ সংযোগ সাধন করে বলিয়া ইহার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব সর্বাধিক।

রেলপথ অর্থনৈতিক দিক হইতে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার নির্মাণে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের আনুকূল্য বিশেষ প্রয়োজন। বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, পার্বত্য অঞ্চল, নিম্ন জলাভূমি, মরু অঞ্চল, তুষারাবৃত মেরু অঞ্চল ইত্যাদি রেলপথ নির্মাণের পক্ষে আদৌ উপযোগী নহে। এমন কি অতি বৃষ্টিপাতযুক্ত সমভূমি বা নদীনালা-সংকুল সমভূমি রেলপথ নির্মাণের পক্ষে উপযোগী নহে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে রেলপথের প্রসার খুবই সীমিত। নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকায় আজিও রেল-যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয় নাই।

প্রাকৃতিক আনুকূল্য ব্যতীত অর্থনৈতিক পরিবেশের আনুকূল্যও রেলপথ নির্মাণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ বা খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য অঞ্চলবিশেষের সমৃদ্ধির কারণ। সুতরাং ঐ সকল সম্পদ দ্রুত আহরণ ও শিল্পকেন্দ্রে বা ভোগকেন্দ্রে প্রেরণ আবশ্যক। আবার রেলযোগাযোগ স্থাপনের ফলে বাণিজ্যের সহজ সুযোগ ঘটে বলিয়া ঐ সকল সম্পদ উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। কানাডার উন্নতির মূলে রহিয়াছে ঐ দেশের রেলপথের বিস্তার (Canada is the making of Railways)। অস্ট্রেলিয়া বা আফ্রিকার খনিজ সম্পদপূর্ণ অঞ্চলগুলি রেলপথ দ্বারা যুক্ত বলিয়াই ঐ সকল অঞ্চলের উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং রেলপথের বিস্তার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। রেলপথ নির্মাণে ভূ-প্রকৃতিগত বা অন্যান্য পরিবেশগত নানা অসুবিধার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আকারের রেলপথ নির্মিত হয়। রেলপথের দুইটি লোহবর্ত্ম বা লাইনের মধ্যবর্তী স্থানকে 'গেজ' (gauge) বলে। পর পৃষ্ঠায় বিভিন্ন দেশের রেলপথে ব্যবহৃত গেজের তালিকা দেওয়া হইল:

রেলপথ	গেজের মাপ	দেশ
ব্রড গেজ (Broad gauge)	১.৫ মিটার (প্রায়)	সোভিয়েত ইউনিয়ন, আর্জেন্টিনা, চিলি, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি।
	১.৬ „ „	শ্রীলংকা, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি।
	১.৭ „ „	ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান।
২। ষ্ট্যাণ্ডার্ড গেজ (Standard gauge)	১.৪ মিটার	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ, চীন, মিশর, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি।
৩। মিটার গেজ (Metre gauge)	১.০ মিটার	ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ফ্রান্স দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি।
৪। ন্যারো গেজ (Narrow gauge)	০ ৬১ সে. মি.	ভারত, চিলি
	০.৭৬ সে. মি.	ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা

[প্রশ্ন : (১) পরিবহণ ব্যবস্থাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি ? (২) অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের ক্ষেত্রে পরিবহণের গুরুত্ব আলোচনা কর। (৩) রেলপথে পরিবহণের সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা কর। (৪) জলপথ, পোষক পথ, গেজ, ন্যারো গেজ, মিটার গেজ—ব্যাখ্যা কর।]

মহাদেশীয় রেলপথ (Trans-Continental Railways)

ইউরেশিয়া : কোন দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথকে মহাদেশীয় রেলপথ বলে। সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনটি উল্লেখযোগ্য মহাদেশীয় রেলপথ বর্তমান।

(১) ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ (Trans-Siberian Railways): বিশ্বের দীর্ঘতম এই রেলপথটি সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর-পশ্চিমে বাল্টিক সাগর সংলগ্ন লেনিনগ্রাদ হইতে দেশের রাজধানী মস্কো, রিয়াজন, কুইবিশেভ, উফা, চেলিয়াবিনস্ক, ওমস্ক, ইর্খুটস্ক, উলানউডে, চিটা, খাবারোভস্ক প্রভৃতি শিল্প-শহর হইয়া পূর্বপ্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী ভ্লাডিভোষ্টক বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই রেলপথের একটি শাখা চিটা হইতে চীনের মাঞ্চুরিয়ার অন্তর্গত সিনকিয়াং (হার্বিন) ঘুরিয়া সরাসরি ভ্লাডিভোষ্টক পৌঁছিয়াছে এবং অপর একটি শাখা সিনকিয়াং হইতে সেনিয়া (মুকডেন) হইয়া চীনের রাজধানী পিকিং পৌঁছিয়াছে। উলানউডে হইতে একটি শাখা মঙ্গোলিয়ার উলানবাটোর গিয়াছে। ইহা ব্যতীত চীনের পূর্ব উপকূলে পীত সাগর সংলগ্ন লুসুন (পোর্ট আর্থার) অপর একটি শাখা-পথ দ্বারা সোভিয়েত মূল রেলপথের সহিত যুক্ত। এই রেলপথের সর্বাধিক দৈর্ঘ্য প্রায় ১১,০০০ কি মি. এবং ভ্লাডিভোষ্টক হইতে লেনিনগ্রাদ পৌঁছাইতে প্রায় ৯ দিন সময় লাগে। এই রেলপথটি সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। ইহা ব্যতীত অর্থনৈতিক দিক হইতেও এই রেলপথটি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পোন্নত ইউরোপীয় রাশিয়ার সহিত কৃষিজ, খনিজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ সাইবেরিয়া তথা সমগ্র পূর্ব রাশিয়ার যোগসাধন করিয়া এই রেলপথ সোভিয়েত দেশের বৈষয়িক উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। এই রেলপথ দ্বারা উরাল অঞ্চলের আকরিক লৌহ. খনিজ তেল, কুজনেৎস্ক অঞ্চলের কয়লা, তৈগা বনাঞ্চলের কাষ্ঠ সম্পদ, সাইবেরিয়া অঞ্চলের গম, যব, বীট প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্য, মধ্য এশিয়ার কার্পাস, প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের মৎস্য ইত্যাদি পরিবাহিত হয়। ইউক্রেন মস্কো, টুলা, উরাল প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলের শিল্প সম্ভার এই পথেই সাইবেরিয়া অঞ্চলে যেমন প্রেরণ করা হয় তেমনি ঐ অঞ্চল হইতেও কৃষিজ, বনজ ও প্রাণিজাত নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার পশ্চিমের শিল্পাঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। এই রেলপথ পশ্চিমে ইউরোপের পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, জার্মানি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত যুক্ত। এই পথেই পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলির সহিত এবং চীন ও কোরিয়ার সহিত সোভিয়েত রাশিয়ার বাণিজ্য চলে।

(২) **ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলপথ (Trans-Caspian Railway):** সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় দীর্ঘতম রেলপথ এইটি। কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বতীরে অবস্থিত ক্রাসনোভোডস্ক হইতে শুরু হইয়া এই রেলপথ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্থান, কাজাকস্তান, প্রভৃতি কার্পাস, গম, ইক্ষু, তরমুজ উৎপাদক অঞ্চলের আসকাবাদ, মার্ভ, বোখারা, সমরখন্দ, তাসখন্দ প্রভৃতি শহরকে যুক্ত করিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া চ্কালভ (Chkalav) বা প্রাচীন ওরেনবুর্গ, শহরের পাশ দিয়ে কুইবিশেভে ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলপথের সহিত যুক্ত হইয়াছে। কুইবিশেভ হইতে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলযোগে ইহা মস্কো ও লেনিনগ্রাদের সহিত সংযুক্ত। এই রেলপথের দক্ষিণে একটি শাখা তুর্কমেনিস্তানের মার্ভ হইতে আফগান সীমান্তে কুস্ক্ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রান্তীয় রেলকেন্দ্র কুস্ক হইতে আফগান-ইরান সীমান্তে অবস্থিত জাহিদানের দূরত্ব মাত্র ৬৪০ কিলোমিটার। এই সামান্য দূরত্বটুকু রেল দ্বারা যুক্ত হইলে ভারতের যে কোন প্রান্ত হইতে রেলযোগে পাকিস্তান. আফগানিস্তান ও ইরান হইয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করা সম্ভব হইবে। বর্তমানে এই রেলপথ নির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু হইয়াছে। ট্রান্স-কাস্পিয়ান রেলপথে সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার কার্পাস, গম, তৈলবীজ, ইক্ষু, খনিজ তেল ও নানাবিধ শিল্পদ্রব্য পরিবাহিত হইয়া থাকে।

(৩) **ট্রান্স-ককেশীয় রেলপথ (Trans-Caucasian Railways):** এই রেলপথটি সোভিয়েত রাজধানী মস্কো হইতে শুরু হইয়া দক্ষিণে কুর্স্ক, খারকভ, আজভ সাগরের তীরে রস্টভ হইয়া কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে বিখ্যাত তেলকেন্দ্র বাকু পর্যন্ত প্রসারিত। ইহার একটি শাখা বাকু হইতে আজারবাইজান ও জর্জিয়া রাজ্যের মধ্য দিয়া কৃষ্ণসাগরের পূর্ব তীরে বাটুম বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে। এই রেলপথটি দৈর্ঘ্যে ছোট হইলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইপথে প্রচুর খনিজ তেল, কয়লা, লৌহ আকরিক, গম, তূলা, চা ও মৎস্য পরিবাহিত হয়।

উত্তর আমেরিকা—(১) ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ (Canadian Pacific Railways)—ইহা কানাডার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত দীর্ঘতম মহাদেশীয় রেলপথ। ইহা এই দেশের পূর্বপ্রান্তে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত সেন্ট জন বন্দরকে রকি পর্বতের কিংহর্স গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ভ্যাংকুভার বন্দরের সহিত যুক্ত করিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,৬০০ কি মি.। একটি শাখা দ্বারা ইহা পূর্ব প্রান্তে নোভাস্কোশিয়া উপদ্বীপের হ্যালিফ্যাক্স বন্দরের সহিত যুক্ত। এই রেলপথে কানাডার পশ্চিমাংশে অবস্থিত বৃটিশ কলাম্বিয়ার কাষ্ঠসম্পদ, মধ্যাঞ্চলের গম ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য, অন্টারিও রাজ্যের খনিজ সম্পদ এবং পূর্ব উপকূলের মৎস্য-সম্পদ পরিবাহিত হয়। বিখ্যাত শহর মন্ট্রিল, রাজধানী ওটাওয়া, নিকেল উৎপাদনকেন্দ্র, স্যাডবেরি, সুপিরিয়র হ্রদ তীরবর্তী বন্দর পোর্ট আর্থার ও ফোর্ট উইলিয়াম, গমকেন্দ্র উইনিপেগ ও অন্যান্য শহর রেজিনা, মেডিসিন হাট, ক্যালগেরী প্রভৃতি এই রেলপথের উপর অবস্থিত।

কানাডার অর্থনৈতিক উন্নতিতে এই রেলপথের অবদান অপরিসীম। কানাডা লোকবসতি-বিরল, কিন্তু উপকূলভাগ মৎস্য-সম্পদে, মধ্যাঞ্চলে আলবার্টা, সাসকাচুয়ান, ম্যানিটোবা প্রভৃতি অঞ্চল কৃষিতে, ও পশ্চিমাঞ্চল বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। রেলপথের বিস্তার এই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, বণ্টনে ও রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। এই সকল কারণেই কানাডার সমৃদ্ধিকে রেলপথের দান বলা হয়।

(২) ক্যানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ (Canadian National Railways) : এই রেলপথটি কানাডা রাজ্যে ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথের উত্তরে অবস্থিত। পূর্বপ্রান্তে হ্যালিফ্যাকস বন্দর হইতে শুরু হইয়া উত্তর-পশ্চিমে জনবিরল গম বলয় অতিক্রম করিয়া রকি পর্বতের ইয়েলোহেড গিরিপথের মধ্য দিয়া পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে পেঁছিয়াছে। দৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় ৪,০০০ কি. মি.। এই রেলপথটি ও ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ উইনিপেগ শহরে মিলিত হইয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইয়েলোহেড হইতে একটি শাখা উত্তরে স্কীনা নদীর মোহনায় অবস্থিত প্রিন্স রুপার্ট পর্যন্ত গিয়াছে। কুইবেক, উইনিপেগ, সাসকাচুয়ান, এডমন্টন প্রভৃতি ইহার উপর অবস্থিত বিখ্যাত শহর। উইনিপেগ হইতে ইহার একটি শাখা উত্তরে হাডসন উপসাগরের তীরে চার্চিল বন্দরের সহিত যুক্ত এবং অপর একটি শাখা দক্ষিণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চিকাগো, বাফেলো প্রভৃতি শিল্পকেন্দ্রের সহিত যুক্ত। এই রেলপথের মাধ্যমে গম, যব, কাষ্ঠ, পশম, মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মৎস্য প্রভৃতি রপ্তানির জন্য বন্দরে প্রেরণ করা হয় এবং ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আমদানিকৃত শিল্পদ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে বণ্টিত হয়।

(৩) নর্দার্ন প্যাসিফিক রেলপথ (Northern Pacific Railways) : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ভাগে অবস্থিত এই রেলপথ পূর্বে আটলান্টিক উপকূলের নিউইয়র্ক বন্দর হইতে শিল্পশহর বাফেলো. চিকাগো, মিলওয়াকি, সেন্টপল প্রভৃতি শিল্পনগরীর মধ্য দিয়া পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে সিয়াটল

ও পোর্টল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। পোর্টল্যান্ড হইতে একটি শাখা রেলপথ স্যানফ্রান্সিসকো বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে। এই রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,২০০ কি.মি.। উত্তরের বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র ও গম-ভুট্টাবলয়ের মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়া এই রেলপথ দেশের পূর্ব ও পশ্চিমের বিখ্যাত বন্দরের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছে বলিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এইটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মহাদেশীয় রেলপথ। এই পথেই সর্বাধিক যাত্রী ও পণ্য পরিবাহিত হয়। এই রেলপথে বিপুল পরিমাণে গম, লৌহ আকরিক, কয়লা, পশুমাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য ও ইস্পাতজাত দ্রব্যাদি পরিবাহিত হয়।

(৪) **ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথ** (Union Pacific Railways): এই রেলপথটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৫০০ কি.মি.। পূর্ব উপকূলের আটলান্টিক বন্দর নিউইয়র্ক হইতে এই রেলপথ পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় বন্দর স্যানফ্রানসিসকো পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দীর্ঘপথে ইহা আইওয়া, নেব্রাসকা. উইয়োমিং, উটা, নিভাডা রাজ্যগুলিকে যুক্ত করিয়াছে এবং একটি দীর্ঘ সেতুর উপর দিয়া গ্রেট বেসিন পার হইয়া ও নিভাডা পর্বত অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থল সানফ্রানসিসকো পেঁছিয়াছে। তথা হইতে একটি শাখা লস্‌এঞ্জেলস পর্যন্ত গিয়াছে। এই রেলপথ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগের কৃষিক্ষেত্র, পশ্চিমের খনিজ পদার্থ উত্তোলনক্ষেত্র প্রভৃতির মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছে।

(৫) **সাদার্ন প্যাসিফিক রেলপথ** (Southern Pacific Railways): আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইহা তৃতীয় মহাদেশীয় রেলপথ। দেশের দক্ষিণপ্রান্তে ইহার অবস্থান। এই রেলপথ স্যানফ্রানসিসকো বন্দর হইতে শুরু হইয়া দক্ষিণে ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকায় লসএঞ্জেলেস বন্দরে পেঁছিয়াছে। তথা হইতে ইহা পূর্ব দিকে মেক্সিকো উপসাগরের তীরে টেক্সাস রাজ্যের গ্যালভাস্টন ও লুইসিয়ানা রাজ্যের নিউঅরলিয়ঁ বন্দর হইয়া মিসিসিপি, আলাবামা, জর্জিয়া, দক্ষিণ ও উত্তর ক্যারোলিনা এবং ভার্জিনিয়া রাজ্য অতিক্রম করিয়া পূর্বপ্রান্তে রাজধানী ওয়াশিংটন পেঁছিয়াছে। ওয়াশিংটন হইতে একটি শাখা বাল্টিমোর, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি বন্দরকে যুক্ত করিয়া নিউইয়র্ক গিয়াছে। এই রেলপথের একটি শাখা নিউঅরলিয়ঁ বন্দরকে উত্তরদিকে সেণ্টলুই শিল্পকেন্দ্রের মধ্য দিয়া চিকাগোর সহিত যুক্ত করিয়াছে। এই রেলপথ একদিকে যেমন উত্তরের শিল্প বলয়কে দক্ষিণের কৃষিবলয়ের সহিত যুক্ত করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি এই উভয় বলয়কেই আবার পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তস্থিত বন্দরের সহিত যুক্ত করিয়াছে। এই রেলপথে পশ্চিম ও দক্ষিণের তুলা, গম, ভুট্টা নানাবিধ ফল, খনিজ দ্রব্য উত্তর-পূর্ব শিল্পাঞ্চলে প্রেরিত হয় এবং শিল্পাঞ্চল হইতে শিল্পজাত দ্রব্যাদি দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে প্রেরিত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা—চিলি-আর্জেন্টিনা রেলপথ (Chile-Argentine Railways): দক্ষিণ আমেরিকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই রেলপথটি আটলান্টিক উপকূলে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস-আয়ার্স হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া আন্দিজ পর্বত অতিক্রম করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে চিলি রাজ্যের বিখ্যাত বন্দর ভ্যাল-

প্যারাইসো পর্যন্ত প্রসারিত। এই রেলপথ ইহার চলার পথে পারানা-প্যারাগুয়ে নদীর অববাহিকার কৃষি অঞ্চল ও প্যাম্পাস পশুচারণক্ষেত্রকে দুই প্রান্তের বন্দরের সহিত যুক্ত করিয়াছে। রোজারিও ও মেন্ডোসা দুইটি কৃষিজ ও প্রাণিজ সম্পদ সরবরাহকারী শহর এই রেলপথের উপর অবস্থিত। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৪২০ কি.মি। চিলির নাইট্রেট, খনিজ তাম্র, ফলমূল, আর্জেন্টিনার গম, পশুমাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি রপ্তানির জন্য এই রেলপথের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। এই দেশের অপর একটি মহাদেশীয় রেলপথ আর্জেন্টিনার সালতা শহরকে চিলির আন্তাফোগাস্তার সহিত যুক্ত করিয়াছে। এই পথেও উভয় দেশের কৃষিজ, খনিজ ও প্রাণিজ দ্রব্যসম্ভার চলাচল করে।

আফ্রিকা—কেপ-কায়রো রেলপথ (Cape-Cairo Railways): আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত কেপ টাউন হইতে উত্তরে মিশরের কায়রো পর্যন্ত এই পথটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪,৪০০ কি.মি.। এই পথটি একটানা রেলপথ নহে। ইহা আংশিক জলপথ, সড়কপথ ও রেলপথের সমষ্টি। ইংরেজ বণিক ও কুটনীতিবিদ স্যার সিসিল রোডস্ এই রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউন হইতে উত্তরে দক্ষিণ রোডেশিয়ার বুলাওয়ে, বুলাওয়ে হইতে জাইরে সাধারণ-তন্ত্রের পোর্ট ফ্রাঙ্কুই পর্যন্ত রেলপথের প্রথম পর্যায়। পোর্ট ফ্রাঙ্কুই জলপথ ও সড়কপথে সুদানের এল-ওবেইদ শহরের সহিত যুক্ত। এল-ওবেইদ হইতে রেলপথের দ্বিতীয় পর্যায় সুদানের রাজধানী খার্তুম হইয়া মিশরের ওয়াদি হালফা পর্যন্ত বিস্তৃত। ওয়াদি হালফা হইতে অসোয়ান পুনরায় জলপথের দ্বারা যুক্ত। অসোয়ান হইতে রেলপথের তৃতীয় বা শেষ পর্যায় শুরু এবং ইহা মিশরের কায়রো শহরে আসিয়া শেষ হইয়াছে। সম্পূর্ণ রেলপথ দ্বারা যুক্ত হইলে ইহাই বিশ্বের দীর্ঘতম রেলপথ হইবে। এই পথে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, জিম্বাবোয়ে দঃ) রোডেশিয়া, জাম্বিয়া, কঙ্গো প্রভৃতি রাজ্যের স্বর্ণ, হীরক, তাম্র, কয়লা, আকরিক লৌহ, মধ্য আফ্রিকার অরণ্য সম্পদ ও চর্ম, পশম ইত্যাদি পশু সম্পদ, সুদান ও মিশরের তুলা প্রভৃতি মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত হয়।

অস্ট্রেলিয়া—ট্রান্স-অস্ট্রেলিয়ান রেলপথ (Trans-Australian Railways): অস্ট্রেলিয়ার এই রেলপথটি পশ্চিম উপকূলের পার্থ বন্দর হইতে শুরু হইয়া পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনি অঞ্চল কুলগার্ডি ও ক্যালগুর্লির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী এডিলেড পৌঁছিয়াছে। এডিলেড হইতে এই পথের কয়েকটি শাখা বিভিন্ন কৃষি ও শিল্পাঞ্চলের দিকে প্রসারিত হইয়াছে। একটি শাখা উত্তর দিকে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা, ব্রোকেনহিল, সিডনি হইয়া ব্রিসবেন গিয়াছে। অপর একটি শাখা দক্ষিণে ভিক্টোরিয়ার রাজধানী মেলবোর্ণের সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই রেলপথে গম, পশম, মাংস, দুগ্ধজাত সামগ্রী, স্বর্ণ ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ দেশের অভ্যন্তর ভাগ হইতে বিদেশে রপ্তানির জন্য বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত হয়।

[প্রশ্ন : (১) অন্তর্দেশীয় রেলপথ কি? তিনটি অন্তর্দেশীয় রেলপথের নাম কর। (২) ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ, ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ, ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথ কোথায় কোথায় অবস্থিত? ইহাদের গুরুত্ব আলোচনা কর। (৩) কেপ-কায়রো রেলপথের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।]

জলপথ (Water ways)

দেশের অভ্যন্তর ভাগে নদ-নদী, নালা খাল ও হ্রদের মাধ্যমে নৌকা, স্টীমার, লঞ্চ, টাগবোট ইত্যাদিযোগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত ও পণ্য প্রেরণ করা যায়। আবার নদী-সমুদ্রের বুকে জাহাজ ভাসাইয়া দেশ-বিদেশের সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা যায়। ভেলা ভাসানোর যুগ হইতে আধুনিক জাহাজ-নির্মাণের যুগে উত্তরণ মানুষের জলপথে বাণিজ্যিক পরিবহণে অসামান্য উন্নতির নিদর্শন। জলপথে পরিবহণ জনপথে পরিবহণের অনুরূপ হইলেও জনপথ মনুষ্য-সৃষ্ট কিন্তু জলপথ প্রকৃতির দান। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অনেক দেশেই খাল খনন করিয়া নদ-নদী ও সমুদ্রের সহিত যোগ স্থাপন করা হয়।

পরিবহণের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে জলপথে পরিবহণই ন্যূনতম ব্যয়সাপেক্ষ। কারণ—(১) জলপথ নির্মাণের কোন ব্যয় নাই; ইহা প্রকৃতিদত্ত। (২) ইহার সংরক্ষণে-ব্যয় সামান্য। (৩) জাহাজ-স্টীমারযোগে, লরী বা রেলযোগে পরিবাহিত পণ্যের অনেকগুণ বেশি পণ্য একবারে বহন করা যায়। (৪) নৌ-পরিবহণে কম ইন্ধন শক্তি ও শ্রমিক লাগে বলিয়া পরিচালন ব্যয় কম। (৫) জলযান নির্মাণের ব্যয় কম। (৬) দূর-দূরান্তের সহিত যোগস্থাপনে কোন অসুবিধা নাই।

নৌ-পথে পরিবহণে ব্যয় কম হইলেও ইহা অত্যন্ত মন্থর ও সামুদ্রিক ঝুঁকির অন্তর্গত। বীমা-ব্যবসায়ের প্রসারের ফলে এই প্রকার ঝুঁকি বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। পচনশীল নহে এমন দীর্ঘস্থায়ী মালপত্রই নৌ-পথে বেশি চলাচল করে। আভ্যন্তরীণ যাত্রী ও মাল পরিবহণে সড়ক ও রেল পরিবহণ-ব্যবস্থা নৌ-পরিবহণের ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী। বিদেশে যাত্রী পরিবহণে বিমানপথের উন্নতি ও প্রসারের ফলে উক্ত বিষয়ে নৌ-পরিবহণের স্থান নগণ্য।

জলপথকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—আভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland water ways) ও সমুদ্রপথ (Ocean Routes)।

আভ্যন্তরীণ জলপথ : আভ্যন্তরীণ জলপথ বলিতে দেশের সীমার মধ্যে নদী, হ্রদ, খাল ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত পরিবহণ ব্যবস্থাকে বুঝায়। এই জলপথের সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে, পার্শ্ববর্তী দেশের সহিত এমনকি বিদেশের সহিতও পণ্য ও যাত্রী চলাচলের সহজ সুযোগ গড়িয়া তোলা যায়। বাণিজ্যিক পরিবহণের উপযোগী আভ্যন্তরীণ জলপথের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক—

(১) অন্তর্দেশীয় নদ-নদী, খাল সুগভীর ও বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক। কঙ্গো, জাম্বেজী, আমাজন প্রভৃতি নদী স্থানে স্থানে সংকীর্ণ হওয়ায় পরিবহণে বিঘ্ন ঘটে। (২) নদীপথে খরস্রোত বা জলপ্রপাত পরিবহণের অন্তরায় হয়। ভারতের ব্রহ্মপুত্র ও মিশরের নীলনদের উচ্চ অংশ জলপ্রপাত ও খরস্রোতযুক্ত হওয়ায় অনেকাংশে পরিবহণের অযোগ্য। (৩) নদ-নদীসমূহে সারাবৎসর পর্যাপ্ত জল থাকা প্রয়োজন। ভারতের দক্ষিণ ভাগের নদীসমূহ জলাভাবে বৎসরের ছয় মাসকাল

পরিবহণের অযোগ্য থাকে। (৪) নদ-নদীসমূহ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতামুক্ত অর্থাৎ বরফ, ঝড়, ঝঞ্ঝা ইত্যাদি হইতে মুক্ত থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় স্বাভাবিক পরিবহণ ব্যাহত হয়। সাইবেরিয়ার নদীসমূহ এই কারণে সুনাব্য নহে। উপকূলীয় সমুদ্র ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ হইলে ইহার সহিত যুক্ত খাল বা নদীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। চীনের গ্র্যাণ্ড ক্যানাল এই কারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। (৫) নদ-নদীর মধ্য ও নিম্নগতি দীর্ঘ হইলে সুনাব্য হয়। (৬) নদ-নদী বা খাল সমুদ্রে বা সমুদ্রযুক্ত হ্রদে পতিত হইলে বাণিজ্যের সুবিধা হয়। (৭) নদ-নদী ও খালপথের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জনবহুল ও সমৃদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইউরোপের রাইন ও দানিয়ুব নদীর বাণিজ্যিক গুরুত্ব লক্ষণীয়।

অন্তর্দেশীয় প্রধান জলপথসমূহ
(Important Inland Waterways)

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র : আমেরিকার কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে অসমান উচ্চতায় পাঁচটি হ্রদ সেণ্ট লরেন্স নদী দ্বারা আটলাণ্টিক মহাসাগরের সহিত যুক্ত হইয়া বিশ্বের একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ জলপথের সৃষ্টি করিয়াছে। সুপিরিয়র, মিচিগান, হিউরণ, ঈরী ও অণ্টেরিও এই হ্রদ পঞ্চকের সংযোগ পথে জলপ্রপাত থাকায় কৃত্রিম খাল খনন করিয়া বাণিজ্যপথ তৈয়ারি করা হইয়াছে। সুপিরিয়র, মিচিগান ও হিউরণ হ্রদের মধ্যবর্তী সল্ট সেণ্ট মেরী জলপ্রপাতকে অতিক্রম করিতে সেণ্ট মেরী (সু-খাল) খনন করা হইয়াছে। হিউরণ ও ঈরী হ্রদের মধ্যে সেণ্ট ক্লেয়ার খাল এবং ঈরী ও অণ্টেরিও হ্রদের মধ্যে অবস্থিত নায়গা জলপ্রপাত এড়াইতে ওয়েল্যাণ্ড খাল কাটা হইয়াছে। এই প্রধান জলপথ ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বের শিল্পাঞ্চলের মধ্যে সংযোগসাধন ও আটলাণ্টিক তীরবর্তী বন্দরের সহিত শিল্পাঞ্চলের যোগ সাধনের উদ্দেশ্যে অসংখ্য সংযোগ-খাল কাটা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঈরী হ্রদ ও হাডসন নদীর মধ্যে ইরি খাল, মিচিগান হ্রদ ও ইল্লিনয় নদীর মধ্যে ইল্লিনয় খাল, মোহওয়াক নদী ও ঈরী হ্রদের মধ্যে ইরি খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হ্রদ পঞ্চক ব্যতীত বাণিজ্যপথ হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি-মিসৌরী, ওহিও, টেনেসি, হাডসন প্রভৃতি নদীর নাম উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেইরি অঞ্চলের গম, ভুট্টা, পশুজাত দ্রব্য, হ্রদ অঞ্চলের লৌহ আকরিক, কয়লা, শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি এই সকল জলপথে শিল্পাঞ্চলে নীত হয় এবং শিল্পাঞ্চল হইতে উৎপাদিত শিল্পপণ্যসামগ্রী রপ্তানির জন্য নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বোষ্টন প্রভৃতি বন্দরে প্রেরণ করা হয়। চিকাগো, গ্যারি, ডুলুথ, ডেট্রয়েট, টলেডো, ক্লীভল্যাণ্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য হ্রদ বন্দর।

বৃটিশ যুক্তরাজ্য : দেশটি আয়তনে ছোট হইলেও শিল্প-বাণিজ্য সমৃদ্ধ। এই দেশের আভ্যন্তরীণ জলপথ খুবই উন্নত। টেমস, হাম্বার, সেভার্ন, মার্সে, টি টাইন, ক্লাইড প্রভৃতি নদী খাল দ্বারা পরস্পর ও সমুদ্রের সহিত যুক্ত। ইহাদের মধ্য দিয়া বড় বড় পণ্যবাহী জাহাজ দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছাইতে পারে। মার্সে নদীর মোহনা

হইতে ম্যাঞ্চেস্টার খাল, লিভারপুল ও হাল-এর মধ্যে ট্রেন্ট ও মার্সে খাল, ল্যাঙ্কাশায়ার ও ইয়র্কশায়ারের মধ্যে লীডস ও লিভারপুল খাল, স্কটল্যাণ্ডের ক্যালিডোনিয়ান খাল, ফোর্থ ও ক্লাইড নদীর খাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য খালপথ। এই সকল পথে কয়লা, কার্পাস দ্রব্য, লৌহ আকরিক, শিল্পদ্রব্য প্রভৃতি চলাচল করে।

ফ্রান্স : ফ্রান্সে আভ্যন্তরীণ জলপথ বিশেষ উন্নত। এই দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলিকে খাল দ্বারা যুক্ত করায় দক্ষিণের কৃষিক্ষেত্রের সহিত উত্তরের শিল্পাঞ্চলের যোগ সাধিত হইয়াছে। উত্তর ফ্রান্সের ইংলিশ চ্যানেলে পতিত শীন নদীর মোহনায় হাভার বন্দর হইতে দক্ষিণ প্রান্তে ভূমধ্যসাগরের তীরে মার্সেই বন্দর নদী ও খালপথে যুক্ত হওয়ায় উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মধ্যে পণ্য চলাচলের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য নদী ও খালপথের মধ্যে রোন, শীন, গ্যারোন, দর্দোন, লয়ার প্রভৃতি নদীপথ ও রাইন-রোন খাল, মার্সাই-রোন খাল, শীন-ইয়োন সংযোজক বার্গাণ্ডি খাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শীন ইয়োন যুক্ত হওয়ায় আটলাণ্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের সংযোগ ঘটিয়াছে। রাইন-মার্স খালের সাহায্যে ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর জলপথে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। সীন নদীপথে বৃহদাকার স্টীমারসমূহ ইংলিশ চ্যানেল হইতে রাজধানী প্যারী পর্যন্ত চলাচল করিতে পারে।

জার্মানী : নদী ও খালের সমন্বয়ে গঠিত জলপথের সুসমঞ্জস ব্যবহার ইউরোপ মহাদেশের জার্মানীতেই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। জার্মানী নদীমাতৃক দেশ। জার্মানীর প্রধান নদীগুলি সকলই খালপথে পরস্পরের সহিত যুক্ত হওয়ায় এই দেশের অর্থনীতিতে এই সকল আভ্যন্তরীণ জলপথের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। জার্মানির মত এত বেশি শিল্পশহর আর কোন দেশের নদীতীরে অবস্থিত নহে। এই দেশের রাইন, দানিয়ুব, ওডার, এলব্‌ ভেসার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সুনাব্য নদী। ওডার নদী বাল্টিক সাগরে এবং রাইন, এলব্‌ ও ভেসার নদী উত্তর সাগরে পতিত হইয়াছে। শীতকালে বাল্টিক সাগর বরফাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত প্রধান বন্দর কিয়েল হইতে কিয়েল খাল কাটিয়া বাল্টিক সাগরের সহিত উত্তর সাগরের যোগ সাধন করা হইয়াছে। রাইন নদী জার্মানির প্রধান জলপথ। ইহার অববাহিকায় জার্মানীর রুঢ় ও ওয়েস্ট ফ্যালিয়ার শিল্পাঞ্চল অবস্থিত। জার্মানির দক্ষিণ প্রান্তের দানিউব হইতে রাইন-মার্ণে-দানিউব খাল পথে উত্তর সাগরে পৌঁছান যায়। আবার ডর্টমুণ্ড-এমস খাল রুঢ় অঞ্চলকে উত্তর সাগরের সহিত যুক্ত করিয়াছে। মিডল্যাণ্ড খাল পূর্ব হইতে পশ্চিমপ্রান্তে ওডার ও রাইন নদীকে যুক্ত করিবার ফলে বার্লিন আভ্যন্তরীণ নদীবন্দর হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন : এই দেশে অসংখ্য নদী ও খাল বর্তমান। ইহাদের মধ্যে ভল্গা, ডন, নিপার, নিষ্টার, ডুইনা, ওব, ইনিসি, লেনা, আমুর প্রভৃতি প্রধান। ভল্গা এই দেশের সর্বপ্রধান নদী ও ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী। নদীগুলি অধিকাংশই উত্তরের আর্কটিক সাগরে পড়িয়াছে। উত্তরে আর্কটিক সাগর শীতকালে বরফাচ্ছাদিত থাকে এবং দক্ষিণে কাস্পিয়ান সাগরের সহিত বহির্বিশ্বের কোন সাগরের

যোগ নাই। এই সকল কারণে দক্ষিণের কৃষ্ণ সাগর ও উত্তর-পশ্চিমের বাল্টিক সাগরের মাধ্যমেই এই দেশের সর্বাধিক বহির্বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ইউরোপীয় রাশিয়ার শিল্পাঞ্চলেই নদী ও খালপথের যোগাযোগ বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশের রাজধানী মস্কো, নদী ও খালপথে বাল্টিক, শ্বেত, আজভ, কৃষ্ণ ও কাস্পিয়ান এই পাঁচটি সাগরের সহিত যুক্ত বলিয়া ইহাকে পঞ্চসাগরের বন্দর (Port of the Five Seas) বলা হয়। গ্রেট ভল্গা স্কীম পরিকল্পনার মাধ্যমে নদীসমূহের উন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উত্তর ডুইনা ও পেচোরা নদী ও লেনিনগ্রাদ বন্দর খালপথে ভল্গার সহিত যুক্ত। ইহাতে উত্তরের তুন্দ্রা অঞ্চল হইতে দক্ষিণের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলের সহিত নৌ-চলাচল সম্ভব হইয়াছে। বাল্টিক-শ্বেত সাগর খাল, মস্কো-ভল্গা খাল প্রভৃতির সাহায্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। উত্তরাঞ্চল হইতে কাষ্ঠ, দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চল হইতে খাদ্য-শস্য, ডন-ভল্গা অববাহিকা হইতে কয়লা ও শিল্পজাত দ্রব্য, ইউরাল অঞ্চল হইতে খনিজ সম্পদ ইত্যাদি জলপথে মস্কো, টুলা, লেনিনগ্রাদ প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে আনীত হয়। এই দেশের মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার নদীগুলি তেমন সুনাব্য নহে।

অন্যান্য আভ্যন্তরীণ জলপথ: দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন, ওরিনকো ও লাপ্লাটা নদী, আফ্রিকার নীল, কঙ্গো, নাইজার, অরেঞ্জ প্রভৃতি এশিয়ার চীনের হোয়াংহো, সি-কিয়াং নদী, গ্র্যাণ্ড ক্যানাল, ভারতের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র, বাংলাদেশের পদ্মা, পাকিস্তানের সিন্ধু, ব্রহ্মদেশের ইরাবতী ও সালুয়েন, থাইল্যাণ্ডের মেকং-মেনাম, ইরাকের টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস এর মিলিত প্রবাহ শাত-এল আরব প্রভৃতি এই সকল দেশের আভ্যন্তরীণ পণ্য পরিবহণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল দেশে শিল্পোন্নত দেশের অনুরূপ কাটা খালের ব্যবহার ও আভ্যন্তরীণ নদীপথের বিশেষ উন্নতি ঘটে নাই।

[প্রশ্ন : (১) অন্তর্দেশীয় জলপথের গুরুত্ব বর্ণনা কর। (২) জার্মানী ও ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ জলপথের বৈশিষ্ট্য কি? (৩) 'পঞ্চসাগরের বন্দর' কোনটি? ইহার ঐরূপ নামকরণের কারণ কি?]

সমুদ্রপথ (Ocean Route)

সমুদ্রপথেই প্রধানত বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসার লাভ করিয়া থাকে। জলপথে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত দেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় বলিয়া সমুদ্রপথের গুরুত্ব অধিক। সমুদ্রপথে প্রধানত তিন প্রকার জাহাজ চলাচল করে। (১) লাইনার (Lin r)—নির্দিষ্ট পথে নিয়মিত যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ করে। (২) ট্র্যাম্প (Tramp)—চুক্তি অনুযায়ী যে-কোন সময় যে-কোন সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণ করে থাকে। (৩) সওদাগরী জাহাজ (Merchant Vessel)—নির্দিষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য পরিবহণে ব্যবহৃত বিরাটকায় জাহাজ ও ট্যাঙ্কার। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ তথা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(১) উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথ (North Atlantic Sea Route): উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথ বিশ্বের সর্বাধিক ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ। এই জলপথ ইতালীয় নাবিক-অভিযাত্রী কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিতে প্রথম ব্যবহার করেন। উত্তর আটলান্টিকের পূর্ব প্রান্তে পশ্চিম ইউরোপীয় শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যগুলি যেমন বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, পর্তুগাল প্রভৃতি অবস্থিত এবং পশ্চিম প্রান্তে উত্তর আমেরিকার কৃষিজ, খনিজ, প্রাণিজ ও শিল্পজাত সম্পদে সমৃদ্ধ কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অবস্থিত। ফলে এই দুই মহাদেশের জনবহুল ও শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে এই জলপথেই বাণিজ্য চলিয়া থাকে। সমগ্র বিশ্বে জলপথে পরিবাহিত পণ্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই পথেই চলাচল করে। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ও বৃহদায়তন জলযানগুলিও এই পথেই সর্বাধিক যাতায়াত করে। পণ্য চলাচল ব্যতীত এই পথে প্রচুর সংখ্যক যাত্রীও নিয়মিত যাতায়াত করে। উত্তর আমেরিকার উপকূল হইতে গম, ভুট্টা, তুলা, তামাক, মৎস্য, কাষ্ঠ, কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রচুর পরিমাণে ইউরোপের বাজারে আসে এবং ইউরোপ হইতে পশমবস্ত্র, প্রসাধন দ্রব্য, কারুশিল্পজাত দ্রব্য, নানাবিধ ভোগ্যপণ্য, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়। উভয় মহাদেশের উপকূলভাগই ভগ্ন ও অভ্যন্তরভাগ স্থলপথ ও আভ্যন্তরীণ জলপথ দ্বারা উপকূল ভাগের সহিত যুক্ত হওয়ায় বন্দর ও পোতাশ্রয় গঠনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং প্রচুর সংখ্যক উন্নত বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল বন্দরের মধ্যে ইউরোপে গ্ল্যাসগো, ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুল, লন্ডন (বৃটিশ যুক্তরাজ্য), আমস্টারডম, রটারডম (নেদারল্যান্ডস), হামবুর্গ (জার্মানী), অ্যান্টোয়ার্প (বেলজিয়াম), লিসবন (পর্তুগাল) প্রভৃতি এবং উত্তর আমেরিকায় হ্যালিফ্যাক্স, সেণ্টজন, মন্ট্রিল, কুইবেক (কানাডা), নিউইয়র্ক, বাল্টিমোর, ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন, গ্যালভাস্টন, নিউ অর্লিয়ঁ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই জলপথের কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। কানাডার বন্দরগুলিতে জ্বালানীর অভাব, নিউফাউন্ডল্যান্ড উপকূলে কুয়াশা এবং উত্তর মেরু অঞ্চল হইতে ভাসিয়া আসা বিরাটকায় হিমশৈল (Icebergs) এই পথের বিশেষ অন্তরায়। এই পথেই বিশ্ববিখ্যাত টাইটানিক জাহাজ প্রথম প্রমোদ ভ্রমণে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করিয়া হিমশৈলের আঘাতে প্রায় ২,০০০ যাত্রীসহ সলিল সমাধি লাভ করে।

(২) দক্ষিণ আটলান্টিক সমুদ্রপথ (South Atlantic Ocean Route): দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বদিকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল এবং পশ্চিম দিকে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা ব্যতীত এই পথে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল ও ইউরোপের পশ্চিম উপকূলও পরস্পর যুক্ত। আফ্রিকার উপকূল অভগ্ন ও উপকূলীয় রাজ্যগুলি অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত না হওয়ায় দক্ষিণ আমেরিকার কৃষিজ, প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ

রাজ্যগুলির সহিত আফ্রিকার তুলনায় অধিক পরিমাণ বাণিজ্য চলিয়া থাকে উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের সহিত। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি রাজ্য হইতে গম, চর্ম, মাংস, পশম, খনিজ দ্রব্য, কফি, কোকো প্রভৃতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইউরোপের বাজারে রপ্তানি হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে এই পথে প্রচুর পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি আমেরিকার বাজারে আমদানি হয়। আমেরিকা ও ইউরোপ হইতে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, নানাবিধ ভোগ্যপণ্য ও শিল্পজাত দ্রব্য দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলীয় দেশগুলিতে আমদানি হইয়া থাকে। আফ্রিকার অভগ্ন উপকূলে উল্লেখযোগ্য বন্দরের মধ্যে কেপটাউন, লাগোস, ফ্রিটাউন প্রধান। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ভাগে বুয়েনস এয়ার্স (আর্জেন্টিনা), মণ্টিভিডিও (উরুগুয়ে), রিও-ডি-জেনিরো, স্যাণ্টোস, সালভাডোর (ব্রেজিল), জর্জটাউন (গিয়ানা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বন্দর।

(৩) **উত্তমাশা অন্তরীপ সমুদ্রপথ (Cape of Good Hope Ocean Route):** ইহাই প্রাচীনতম অন্তর্মহাদেশীয় সমুদ্রপথ। পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে আসিবার জলপথ হিসাবে এইটি আবিষ্কার করেন। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বন্দর হইতে আটলাণ্টিক সমুদ্রপথে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল বরাবর দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন বন্দর বা উত্তমাশা অন্তরীপ পেঁছান যায়। এই অন্তরীপ হইতে পথটি তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। প্রথম শাখাটি আফ্রিকার পূর্ব উপকূল বরাবর ডারবান, জাঞ্জিবার হইয়া আরবের এডেন ও তথা হইতে ভারতের পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই বন্দরে পেঁাছিয়াছে। দ্বিতীয় শাখাটি অন্তরীপ হইতে পূর্ব দিকে প্রসারিত হইয়া ভারতের কোচিন, শ্রীলংকার কলম্বো স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহকে যুক্ত করিয়াছে। তৃতীয় শাখাটি সোজাসুজি পূর্বদিকে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড পেঁাছিয়াছে। এই পথে আফ্রিকার স্বর্ণ, হীরক, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার টিন, রাবার, চা ও অস্ট্রেলিয়ার পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, চর্ম প্রভৃতি ইউরোপের বাজারে প্রবেশ করে। ইউরোপ হইতে প্রধানত ভোগ্যপণ্য, বিলাসদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা আফ্রিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত হয়। এই জলপথের উপর অবস্থিত উল্লেখযোগ্য বন্দরের মধ্যে লণ্ডন, হাল, লিসবন, কেপটাউন, পোর্ট এলিজাবেথ, কলম্বো, সিঙ্গাপুর ফ্রিম্যাণ্টেল প্রভৃতি প্রধান। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল অভগ্ন হওয়ায় উল্লেখযোগ্য বন্দরের যেমন অভাব তেমনি জ্বালানির অভাব এই পথের প্রধান অসুবিধা। সুয়েজ খাল কাটার ফলে এই পথের গুরুত্ব খুবই হ্রাস পাইয়াছে।

(৪) **প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্রপথ (Pacific Ocean Route):** এশিয়া মহাদেশের প্রাচ্য দেশের সহিত আমেরিকা মহাদেশের উভয় অংশের দুস্তর ব্যবধান রচনা করিয়াছে প্রশান্ত মহাসাগর। সুতরাং এই সমুদ্রপথের মাধ্যমেই পূর্বদিকে এশিয়ার চীন, জাপান ও ওশিয়ানিয়ার অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সহিত পশ্চিম দিকে অবস্থিত উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়িয়া

উঠিয়াছে। এই জলপথ তিনটি শাখায় বিভক্ত। প্রথমটি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ড ও অন্তর্বর্তী দ্বীপ বন্দর ফিজি-হনলুলু হইয়া উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে স্যানফ্রান্সিস্কো গিয়াছে। দ্বিতীয় পথটি ফিলিপাইনস-এর ম্যানিলা, বৃটিশ হংকং, চীনের সাংহাই, জাপানের ইওকোহামা হইয়া কানাডার পশ্চিম উপকূলে ভ্যাঙ্কুভার পৌঁছিয়াছে। তৃতীয়টি ম্যানিলা-হংকং-সাংহাই, হনলুলু স্যানফ্রান্সিস্কোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। এই পথে প্রাচ্য দেশ হইতে রেশম, পশম, চা, রবার, রাং, শণ, চিনি, চর্ম, পশুলোম প্রভৃতি আমেরিকার বাজারে রপ্তানি হয় এবং আমেরিকা হইতে গম, তূলা, কাষ্ঠ, মৎস্য, মাংস, খনিজ তেল, লৌহ ইস্পাত দ্রব্য প্রভৃতি আমদানি করা হয়। পানামা খাল খননের পর আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মধ্যে সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমুদ্রপথের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৫) **ভূমধ্যসাগর-অস্ট্রেলিয়া-সুয়েজ খাল জলপথ (Mediterranean-Australia Sea Route via Suez)**: এইটি পৃথিবীর দীর্ঘতম জলপথ। কিন্তু গুরুত্বে ইহার স্থান উত্তর আটলাণ্টিক সমুদ্রপথের পরেই দ্বিতীয়। ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী সুয়েজ যোজক কাটিয়া সংযুক্ত করিবার ফলে ইউরোপ হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ না ঘুরিয়া সংক্ষিপ্ত পথে এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ার দেশসমূহে যাতায়াত করা যায়। উত্তর আমেরিকা হইতেও জাহাজ এই পথে এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ার মধ্যে যাতায়াত করে। সুতরাং উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা, এশিয়া এবং ওশিয়ানিয়া—এই পাঁচটি মহাদেশ এই পথ দ্বারা যুক্ত। উত্তমাশা অন্তরীপ পথের তুলনায় এই পথে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে দূরত্ব প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার হ্রাস পাইয়াছে। ইউরোপ, এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ার বাণিজ্য প্রধানত এই পথেই চলিয়া থাকে।

(৬) **পানামা পথ (Panama Route)**: উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগে পানামা একটি সংকীর্ণ যোজক আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার ফলে আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সহিত জলপথে যাতায়াত দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাজেলান প্রণালী অতিক্রম করিয়া করিতে হইত। পানামা খাল খননের ফলে পূর্ব-পশ্চিম আমেরিকার মধ্যে দূরত্ব ১০।১২ হাজার কি. মি. হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের সহিত দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য এই খাল পথে হইয়া থাকে। ইহাতে আমেরিকার উপকূলীয় বাণিজ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সুয়েজ খাল (Suez Canal): উত্তমাশা অন্তরীপ জলপথে এশিয়ার সহিত ইউরোপের যোগাযোগ সময় সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল ও বিপদ সংকুল হওয়ায় ইউরোপীয় বণিকদল একটি বিকল্প সহজ পথের সন্ধান দীর্ঘদিন যাবৎ করিতেছিল। তাহাদের এই অনুসন্ধান প্রচেষ্টার ফলেই ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপস্ নামে একজন ফরাসী স্থপতি ১৮৫৯ সালে মিশরের সিনাই উপদ্বীপ সংলগ্ন সঙ্কীর্ণ সুয়েজ যোজকের মধ্য দিয়া একটি খাল

খনন করিয়া উত্তরের ভূমধ্য সাগরকে দক্ষিণের লোহিত সাগরপথে ভারত মহাসাগরের সহিত যুক্ত করিবার একটি কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সুয়েজ যোজকের মধ্যে উত্তর হইতে দক্ষিণে মাজালা, টিরাসা, গ্রেট বিটার, লিটল্ বিটার প্রভৃতি কয়েকটি স্বাভাবিক হ্রদ ছিল। খাল খননে এই হ্রদগুলির যোগাযোগ বিশেষ সহায়ক হয়। ১৮৬৯ সালে দশ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় এই খাল খনন সমাপ্ত হয় ও ইউরোপ, এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ার মধ্যে সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সুয়েজ খালের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বিশ্বের অপরাপর খালপথের গুরুত্বের তুলনায় অধিক।

সুয়েজ খাল দৈর্ঘ্যে ১৬২ কি. মি., প্রস্থে ৫৯ মিটার এবং গভীরতায় ১০ মিটার। এই পথ অতিক্রম করিতে একটি জাহাজের ১০-১২ ঘণ্টা সময় লাগে। ভূমধ্য সাগর হইতে এই খালের প্রবেশপথে পোর্ট সৈয়দ বন্দর ও দক্ষিণে সুয়েজ উপসাগরের মুখে সুয়েজ বন্দর অবস্থিত। সুয়েজ খালের কর্তৃত্বভার দীর্ঘকাল একটি ইঙ্গ-ফরাসী সংস্থার উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯৫৬ সালে জাতীয় প্রয়োজনে মিশরের রাষ্ট্রপতি গামাল আবদেল নাসের সুয়েজ খালকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেন। খালপথে যাতায়াতের জন্য প্রদত্ত শুল্ক বর্তমানে মিশর আদায় করিয়া থাকে। ১৯৬৭ সালে আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধের সময় খালটি বন্ধ ছিল। ১৯৭৫ সালের জুন মাস হইতে পুনরায় এই পথে দৈনিক প্রায় ৪০-৪২টি জাহাজ যাতায়াত শুরু করে॥

সুয়েজ পথে পরিবাহিত পণ্য-দ্রব্যের পরিমাণ, যাত্রী সংখ্যা ও চলাচলকারী জাহাজের সংখ্যা বিবেচনায় উত্তর আটলাণ্টিক সমুদ্র-পথের পরেই ইহার গুরুত্ব। ইহা একটি সুদীর্ঘ জলপথ। এই পথে ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, ওশিয়ানিয়া ও আমেরিকা—এই পাঁচটি মহাদেশ যুক্ত হওয়ায় ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্ব অপরিসীম। অধিকন্তু মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদ এই পথের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। আরবের এডেন বন্দর হইতে এই জলপথটি

কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, যেমন—এডেন হইতে করাচী-বোম্বাই ; এডেন হইতে কলম্বো, সিঙ্গাপুর হইয়া অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড ; এডেন হইতে কলম্বো-কলিকাতা-চট্টগ্রাম-রেঙ্গুন—সিঙ্গাপুর-হংকং-সাংহাই-ইয়োকোহামা এবং এডেন হইতে পূর্ব আফ্রিকার মোম্বাসা-দার এস-সালাম-ডারবান।

সুবিধা : (১) সুয়েজ খাল খনন করিবার ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে দূরত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। উত্তমাশা অন্তরীপ পথের তুলনায় এই পথের দূরত্ব ও চলাচলের দিন হ্রাস পাইয়াছে, যেমন—লণ্ডন হইতে কলিকাতা ৪,৫০০ কি মি ও ১৭ দিন, লণ্ডন হইতে বোম্বাই ৭,০০০ কি. মি. ও ২৩ দিন, লণ্ডন হইতে কলম্বো ৪,৬০০ কি. মি. ও ১৮ দিন, লণ্ডন হইতে সিডনি ২,০০০ কি. মি. ও ৪ দিন, লণ্ডন হইতে মোম্বাসা ৩,৬০০ কি. মি. ও ১৩ দিন এবং নিউইয়র্ক হইতে কলিকাতা ৪,০০০ কি. মি. ও ১৫ দিন। (২) এই পথ জনবহুল এবং কৃষিজ খনিজ ও প্রাণীজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশের উপকূলসংলগ্ন হওয়ায় সারা বৎসর পণ্য ও যাত্রীর প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। (৩) জ্বালানীর কোন অভাব হয় না, ইউরোপে কয়লা, মধ্যপ্রাচ্যে খনিজ তেল, ভারতে কয়লা এবং পূর্বপ্রান্তে খনিজ তেল রহিয়াছে। (৪) এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির সহিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগও বৃদ্ধি পাইয়াছে। (৫) এই পথের রাজনৈতিক গুরুত্ব অধিক।

অসুবিধা : (১) এই খালপথ সংকীর্ণ হওয়ায় বৃহদায়তন জাহাজ চলিতে পারে না। সাধারণত ৪০-৪৫ হাজার টনের অধিক জাহাজ এই পথে চলাচল করিতে পারে না। (২) এই খালপথের সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করিতে জাহাজসমূহের ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। ইহা অত্যন্ত বেশি। (৩) এই পথে শুল্কের হার অত্যন্ত বেশি। (৪) আরব দুনিয়ায় রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে এই পথ প্রায়ই অসুবিধাজনক হইয়া উঠে।

বাণিজ্য : সুয়েজ পথে প্রাচ্যদেশ হইতে চা, কফি, রবার, তেলবীজ, তূলা, রেশম, পশম, চর্ম, পাট, পাটজাত দ্রব্য, খনিজ তেল, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি অস্ট্রেলিয়া হইতে পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাংস, চর্ম প্রভৃতি ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে রপ্তানি হয়। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে যন্ত্র, যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রাসায়নিক দ্রব্য, সার ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বাজার সমূহে আমদানি হইয়া থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় ২০ শতাংশ পণ্য এই পথে চলাচল করে।

পানামা খাল (Panama Canal) : উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে সংকীর্ণ পানামা যোজক। ইহার পূর্বপ্রান্তে আটলাণ্টিক মহাসাগর ও পশ্চিমপ্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগর। পূর্বে আমেরিকার পূর্ব উপকূলের সহিত পশ্চিম উপকূলের জলপথে যোগাযোগের একমাত্র উপায় ছিল দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত হর্ণ অন্তরীপ পথ। ইহা যেমন ছিল সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়সংকুল তেমনি ছিল বিপদসংকুল। পানামা যোজকের মধ্য দিয়া পানামা খাল কাটার ফলে দুই মহাসাগরের

মিলন ঘটিয়াছে এবং আমেরিকার উভয় উপকূলের মধ্যে একটি সহজ জলপথে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে।

পানামা যোজকটি পর্বতসংকুল। ঐ অঞ্চলের পূর্ব-পশ্চিমে বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত গাটন ও মিরা ফ্লোরস্ হ্রদ দুইটিকে যুক্ত করিয়া খাল খাটা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পানামা সরকারের নিকট হইতে এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা ইজারা গ্রহণ করে ও নানা প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করিয়া এই খাল পথ নির্মাণ করে। ১৯০৭ সালে ইহার কার্য শুরু হয় এবং ১৯১৪ সালের ১৫ই আগস্ট এই খালপথ জাহাজ চলাচলের জন্য উম্মুক্ত করা হয়। পানামা খাল ৬৫ কি. মি. দীর্ঘ, ৯২ হইতে ৩০৫ মি. প্রশস্ত এবং ১২.৫ মিটার গভীর। এই খাল পথ পার্বত্য অঞ্চল দিয়া নির্মাণ করিবার জন্য ৬টি লকগেটের সাহায্যে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। এই খাল পথ অতিক্রম করিতে একটি জাহাজের ৭-৮ ঘণ্টা সময় লাগে। সুয়েজ খালের তুলনায় এই খাল খননে অনেক বেশি কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পথে দৈনিক গড়ে ১০-১২টি জাহাজ যাতায়াত করে। এই পথ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন।

সুবিধা : (১) পানামা পথে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার উভয় উপকূল নিকটতর হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের নিউইয়র্ক ও পশ্চিম উপকূলে স্যানফ্রান্সিস্কোর মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পাইয়াছে প্রায় ১২,৪৮০ কি. মি.। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের নিউইয়র্ক বন্দর হইতে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে চিলির অন্তর্গত ভ্যালপারাইসো ম্যাজেলান প্রণালী পথে ১৩,৪৪০ কি. মি. কিন্তু পানামা পথে মাত্র ৭.৫৬০ কি মি.। অনুরূপভাবে নিউ ইয়র্ক হইতে নিউজিল্যান্ডের দূরত্ব ম্যাজেলান পথে ১৮,০৮০ কি. মি. এবং পানামা পথে মাত্র ১৩,৬০০ কি মি.। (২) পানামা পথ ইউরোপ হইতে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং এশিয়ার পূর্বপ্রান্তীয় চীন-জাপান প্রভৃতি দেশের দূরত্বও হ্রাস করিয়াছে। (৩) পানামা পথ খোলার ফলে আমেরিকার উপকূলীয় বাণিজ্যের বহুল প্রসার ঘটিয়াছে। ইহা ব্যতীত আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়া ও দূর প্রাচ্যের বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। (৪) দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অর্থনৈতিক উন্নতি সহজ হইয়াছে। (৫) আমেরিকায় প্রচুর কয়লা ও খনিজ তৈল পাওয়া যায় বলিয়া এই পথে জ্বালানীর

অভাব হয় না। (৬) আটলান্টিকের সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের এই পথে সহজ যোগাযোগ রাজনৈতিক দিক হইতেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অসুবিধা : (১) পানামা খাল পথে ৬টি লক গেট থাকায় জাহাজের সহজ চলাচল ব্যাহত হয় এবং মাত্র ৬৫ কি মি দূরত্ব অতিক্রম করিতে জাহাজের ৭-৮ ঘণ্টা সময় লাগে। (২) পানামা খালের উভয় পার্শ্বে অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত অঞ্চলের অভাব। (৩) প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বন্দর ও পোতাশ্রয়ের অভাব আমেরিকা দূরপ্রাচ্য জলপথের উন্নতির প্রতিকূল। (৪) পানামা পথ খোলায় আমেরিকারই সর্বাধিক সুবিধা হইয়াছে। অপরাপর দেশের সুবিধা নগণ্য।

বাণিজ্য : পানামা পথে গম, তুলা, রাবার, কফি, চিনি, কাষ্ঠ, কাষ্ঠমণ্ড, পশুজাত দ্রব্যাদি, মৎস্য, তৈলবীজ, নাইট্রেট, খনিজ তেল ইত্যাদি আমেরিকার বিভিন্ন বন্দরে চলাচল করে। এই পথে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও দূরপ্রাচ্যের মধ্যে পশম, রেশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মৎস্য, মাংস, শিল্পজাত দ্রব্য ইত্যাদির আমদানি-রপ্তানি ঘটিয়া থাকে।

বিমান পথ (Air Routes)

গতিনির্ভর আধুনিক যুগে বিমান পথের ও মাধ্যমের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। মানুষের মনের গতির সহিত পাল্লা দিতেই যেন আধুনিক নানা ধরনের বিমানের আবিষ্কার। ডাকোটা হইতে জাম্বো জেট ও সম্ভাব্য কনকর্ড বিমানের ব্যবহার মানুষের আকাশ বিজয়ের নিরলস সাধনার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। বিমান একসময় দেশরক্ষা ও যুদ্ধের প্রয়োজনেই সর্বাধিক ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বর্তমানে যাত্রী বহন ইহার প্রধান কার্য হইলেও পণ্য পরিবহণেও ইহার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যাইতেছে। আধুনিক বিমানে (জাম্বো জেট বোয়িং ৭০৭) পাঁচ শতাধিক যাত্রী বহন কোন অসাধারণ ঘটনা নহে। হাল্কা হইতে মাঝারি ধরনের নানাবিধ পণ্য যেমন—অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, খাদ্যশস্য, হাল্কা ও মূল্যবান ঔষধপত্র ইত্যাদি বিমানে পরিবাহিত হয়।

বিমান চলাচলের জন্য কোন পথ নির্মাণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিমান অবতরণ ক্ষেত্র (Runway), সংলগ্ন বিমান বন্দর গঠন ও পরিচালনা খুবই ব্যয়বহুল। বিমানের ভাড়া এই কারণেই অনেক বেশি। সুতরাং শিল্পোন্নত দেশ ব্যতীত অন্য কোথাও বিমান ভ্রমণ তেমন জনপ্রিয় নহে। বাণিজ্যিক সাধারণ প্রয়োজনে বিমান ব্যবহার যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ। বিমান পরিবহণের সহিত যুক্ত প্রচুর দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগর থাকা প্রয়োজন। বিমান পরিবহণ আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল বলিয়া খুবই বিপদসংকুল।

সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ৭৩০০টি বিমান বন্দর আছে। ইহার মধ্যে উত্তর আমেরিকায় প্রায় ৪,৬০০টি অবস্থিত। বিমান পরিবহণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। সমগ্র পৃথিবীর বিমান যাত্রীদের মধ্যে প্রায় ৫০% আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যাতায়াত করে। এই দেশের বিভিন্ন বিমান সংস্থার মধ্যে The United Airlines, Trans-World Airlines (TWA), Pan American

Airlines (PAA) এবং Eastern Airlines বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ বিমান বন্দর। অন্যান্য বিমান বন্দরের মধ্যে চিকাগো, ওয়াশিংটন ডি.সি., লস এঞ্জেলস্, সানফ্রান্সিসকো, মিয়ামি, কানাডার মন্ট্রিল, টরন্টো, ভ্যাংকুভার অত্যন্ত ব্যস্ত বিমান বন্দর হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরেই বিমান পরিবহণে পশ্চিম ইউরোপের স্থান। পশ্চিম ইউরোপের আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলির মধ্যে বৃটিশ যুক্তরাজ্যের British Airways, British European Airways, নেদারল্যান্ডসের KLM., পশ্চিম জার্মানীর Lufthansa, ইতালির Alitalia, ফ্রান্সের Air Fance এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার Scandinavian Air Services উল্লেখযোগ্য। লণ্ডন, প্যারী, রোম, বার্লিন, ভিয়েনা, জেনিভা, ম্যাড্রিড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বিমান বন্দর। সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় বিমান সংস্থা Aeroflot দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে পণ্য ও যাত্রী বহন করিয়া থাকে। মস্কো, লেলিনগ্রাড, কিয়েভ, রস্টোভ, ভল্গোগ্রাড উল্লেখযোগ্য বিমান বন্দর।

এশিয়া, আফ্রিকা, ওশিয়ানিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশেও বিমান পরিবহণ ক্রমশ গুরুত্ব পাইতেছে। এই সকল দেশের মধ্যে জাপান, চীন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক বিমানপথ (Trans-World Route) : পৃথিবীতে বর্তমানে নিম্নলিখিত ৬টি আন্তর্জাতিক বিমান পথ বর্তমান।

বিমান পথ	শাখা ও সংযোগকারী বন্দর
(১) ইউরোপ-আমেরিকা বিমানপথ	(১) ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে যোগাযোগকারী আন্তর্জাতিক বিমান পথ। প্যারিস-লণ্ডন হইতে আটলান্টিক অতিক্রম করিয়া কানাডার অটোয়া এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক পৌঁছায়।
(২) ইউরোপ-এশিয়া-অস্ট্রেলিয়া বিমানপথ	(২) ফ্রান্সের মার্সেই হইতে আফ্রিকার ডাকার বন্দর এবং আটলান্টিকের অপর পারে দক্ষিণ আমেরিকার পারনামবুকো হইয়া চিলির স্যান্টিয়াগো পৌঁছায়। ইউরোপ, এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ার মধ্যে যোগসাধনকারী আন্তর্জাতিক বিমানপথ। লণ্ডন-প্যারী হইতে মার্সেই, কায়রো, বাগদাদ, করাচী, দিল্লী, কলিকাতা, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর, ডারউইন হইয়া সিডনি পর্যন্ত এই পথ বিস্তৃত।

বিমান পথ	শাখা ও সংযোগকারী বন্দর
(৩) ইউরোপ-সোভিয়েত ইউনিয়ন-পূর্ব এশিয়া বিমানপথ	(৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেই এই পথ সীমাবদ্ধ। মস্কো হইতে ক্রামশোভস্ক, চিটা, ইর্কুটস্ক হইয়া প্রশান্ত মহাসাগর ভ্রাডিভোস্টক পর্যন্ত সর্বত্র চলাচল করে।
(৪) ইউরোপ-আফ্রিকা বিমানপথ	(৪) ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে সংযোগকারী আন্তর্জাতিক বিমানপথ। লণ্ডন হইতে আফ্রিকার আলেকজান্দ্রিয়া-কায়রো হইয়া দক্ষিণে কেপ টাউন পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার শাখা মহাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে বিস্তৃত।
(৫) আমেরিকা-এশিয়া-প্রশান্ত-মহাসাগরীয় বিমানপথ	(৫) আমেরিকা, এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ার মধ্যে সংযোগসাধক আন্তর্জাতিক বিমানপথ। আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের সানফ্রান্সিসকো, লস এঞ্জেলস ও পোর্টল্যাণ্ড হইতে এশিয়ার টোকিও, সাংহাই, ম্যানিলা, ওশিয়ানিয়ার সিডনি, ওয়েলিংটন পর্যন্ত এই বিমান পথ বিস্তৃত।
(৬) উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা বিমানপথ	(৬) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক হইতে দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনাস আয়ার্স রিয়ো-ডি-জেনিরো, সান্টিয়াগো ইত্যাদি এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হাভানা ও হাইতি পর্যন্ত এই বিমান পথ বিস্তৃত।

নলপথ (Pipeline)

বর্তমান যুগে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহণে নলপথের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। খনিজ তেলক্ষেত্র হইতে শোধনাগারে নলপথেই তেল প্রেরণ করা হয়। জলপথের দৈর্ঘ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট প্রথম এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে জালের মত নলপথ বিস্তৃত। মধ্যপ্রাচ্যেও বহুদূর বিস্তৃত নলপথ দ্বারা তেল-ক্ষেত্রের সহিত তেল রপ্তানিকারী বন্দরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা হইয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন দেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নলপথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

দেশ	নলপথ
সোভিয়েত ইউনিয়ন	(১) ককেশাস অঞ্চলে বাকু হইতে কৃষ্ণসাগরের তীরে বাটুম এবং গ্রজনিও মাইকপ হইতে কৃষ্ণ সাগরের তীরে তুয়াপসে পর্যন্ত তেলবাহী নলপথ।

দেশ		নলপথ
সোভিয়েত ইউনিয়ন	(২)	উরাল অঞ্চলে বাশকিরিয়ার তুইমাঝি হইতে ওমস্ক পর্যন্ত এই দেশের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ তেলবাহী নলপথ।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	(১)	ইণ্ডিয়ানা-ইলিনয় রাজ্য হইতে আটলাণ্টিক উপকূলবর্তী বোস্টন-ফিলাডেলফিয়া পর্যন্ত নলপথ। (২) টেক্সাস হইতে ওকলাহোমা। (৩) টেক্সাস হইতে নিউ অরলিয়ং।
মধ্যপ্রাচ্য	(১)	সৌদি আরবের ধাহরান হইতে বাহেরিন দ্বীপে অবস্থিত শোধনাগার (২) ইরানের তৈলক্ষেত্র মসজিদ-ই-সুলেমান, গাছসারণ হইতে ২৪০ কি মি. দূরে আবাদান শোধনাগার। (৩) ইরাকের কিরকুক মসুল হইতে ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী হাইফা, ত্রিপলি এবং বানিয়াস বন্দর পর্যন্ত।
ভারত	(১)	আসামের নাহারকাটিয়া হইতে বিহারের বারাউনি, উত্তর প্রদেশের কানপুর ও পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া পর্যন্ত। (২) বম্বে হাই ও বরোদা হইতে উত্তর প্রদেশের মথুরা পর্যন্ত।

বিভিন্ন প্রকার পরিবহণ ও উহাদের বৈশিষ্ট্য
(Different Modes of Transport and their Features)

স্থলপথ		জলপথ		আকাশপথ
সড়ক পরিবহণ	রেল পরিবহণ	আভ্যন্তরীণ	সমুদ্রপথ	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক
১। মাধ্যম—মানুষ, ভারবাহী পশু, মোটর, ট্রাক, বাস, টেম্পো, সাইকেল, রিকসা, ভ্যান ইত্যাদি।	১। মাধ্যম—যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়ী ইত্যাদি।	১। মাধ্যম—নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার, টাগ ইত্যাদি।	১। মাধ্যম—জাহাজ; লাইনার, ট্র্যাম্প ইত্যাদি।	১। মাধ্যম—বিমান-এয়ার বাস, বোয়িং, জেট, হেলিকপ্টার ইত্যাদি।
২। পণ্য ও যাত্রী—পণ্যের তুলনায় যাত্রী বেশি। পণ্য পরিমাণে স্বল্প, ওজনে হাল্কা হইতে মাঝারি এবং আকারে ক্ষুদ্র হইতে মাঝারি।	২। পণ্য ও যাত্রী—পণ্য ও যাত্রী প্রায় সমান। পণ্য পরিমাণে অধিক, ওজনে মাঝারি হইতে ভারী এবং আকারেও মাঝারি হইতে বৃহৎ।	২। পণ্য ও যাত্রী—পণ্যই বেশি। ওজনে খুবই বেশি, পরিমাণে অধিক এবং আকারে মাঝারি হইতে বৃহৎ।	২। পণ্য ও যাত্রী—যাত্রীর তুলনায় পণ্য সর্বাধিক। পরিমাণে অপেক্ষাকৃত বেশি, ওজনে মাঝারি হইতে প্রচণ্ড ভারী এবং আকারে মাঝারি হইতে বৃহৎ।	২। পণ্য ও যাত্রী—যাত্রী পণ্যের তুলনায় অধিক। পরিমাণে সর্বাধিক কম, ওজনে সর্বাপেক্ষা কম ও আকারে ক্ষুদ্র হইতে মাঝারি।
৩। গতিবেগ ও দূরত্ব—অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন। স্বল্প দূরত্ব অতিক্রম করে।	৩। গতিবেগ ও দূরত্ব—দ্রুতগতি সম্পন্ন। দেশের মধ্যে অধিক দূরত্ব অতিক্রম করে।	৩। গতিবেগ ও দূরত্ব—গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম। নাব্য পথে স্বল্প দূরত্বে চলাচল করে।	৩। গতিবেগ ও দূরত্ব—গতিবেগ অপেক্ষাকৃত কম। উপকূলভাগে ও মহাদেশের মধ্যে চলাচল করে।	৩। গতিবেগ ও দূরত্ব—সর্বাপেক্ষ অধিক গতিসম্পন্ন। দেশের মধ্যে ও বহির্দেশে চলাচল করে।
৪। বাণিজ্য—প্রধানত অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত।	৪। বাণিজ্য—প্রধানত অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত।	৪। বাণিজ্য—প্রধানত অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত।	৪। বাণিজ্য—প্রধানত উপকূলীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে নিয়োজিত।	৪। বাণিজ্য—দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বাণিজ্যে নিয়োজিত।

বিভিন্ন প্রকার পরিবহণের সুবিধা ও অসুবিধা
(Advantages and Disadvantages of Different Modes of Transport)

স্থলপথ		জলপথ		আকাশপথ
সড়ক পরিবহণ	রেল পরিবহণ	আভ্যন্তরীণ	সমুদ্রপথ	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক
সুবিধা—(১) ইহা দ্রুতগামী, (২) হালকা ও মূল্যবান পণ্য বহনে বিশেষভাবে উপযোগী, (৩) যাত্রীবহনে অধিক উপযোগী ও নিয়মিত, (৪) স্বল্প দূরত্বের ক্ষেত্রে উপযোগী, (৫) ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও নিশ্চিত, (৬) যাতায়াতের সময়সীমা মোটামুটি নির্দিষ্ট, (৭) পণ্য বোঝাই ও খালাসে খরচ কম, (৮) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পক্ষে উপযোগী।	সুবিধা—(১) ইহা দ্রুতগামী, (২) ভারী ও অধিকভারী পণ্যাদি বহনের উপযোগী, (৩) যাত্রীবহনে সর্বাধিক উপযোগী, (৪) বহুদূরবর্তী স্থানের পক্ষেও উপযোগী, (৫) বহুল পরিমাণ পণ্য বহনের উপযোগী, (৬) ভাড়া অপেক্ষাকৃত কম, (৭) যাতায়াত নিরাপদ, (৮) আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উপযোগী।	সুবিধা—(১) অন্যান্য পরিবহণের তুলনায় ভাড়া ন্যূনতম, (২) হালকা হইতে ভারী এবং যে কোন আকারের প্রচুর পণ্য বহনের উপযোগী, (৩) স্বল্প দূরত্বে যাতায়াত অনুযায়ী চলাচলে উপযোগী (৪) যাত্রী অপেক্ষা পণ্যই বেশি চলাচল করে, (৫) জলপথ প্রাকৃতিসৃষ্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে খালপথ মনুষ্যসৃষ্ট। ইহা ব্যয়বহুল নহে, (৬) পরিবহণ ক্ষমতা বেশি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে উপযোগী, (৭) পণ্য-বোঝাই ও খালাস সহজ।	সুবিধা—(১) অন্যান্য পরিবহণের তুলনায় ভাড়া ন্যূনতম, (২) হালকা হইতে ভারী যে কোন প্রকার পণ্য-সামগ্রী বহনে উপযোগী, (৩) অন্যান্য পরিবহণের তুলনায় সর্বাপেক্ষা বেশি পণ্য বহনে সমর্থ, (৪) যাত্রী অপেক্ষা পণ্যই বেশি চলাচল করে, (৫) বহু দূরবর্তী স্থানে পণ্য বহনের উপযোগী, (৬) উপকূলীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিয়োজিত, (৭) পণ্যবোঝাই ও খালাসে যান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ হয়। ইহা ব্যয়বহুল নহে, (৮) সমুদ্রপথ প্রাকৃতিসৃষ্ট তৈয়ারি নির্মাণ ব্যয় নাই।	সুবিধা—(১) ইহা সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী, (২) একমাত্র হালকা ও ছোট আকারের পণ্য বহনের উপযোগী, (৩) বহু দূরবর্তী স্থানের মধ্যে চলাচলে উপযোগী, (৪) পণ্য অপেক্ষা যাত্রী বহনে বিশেষ উপযোগী, (৫) দুর্গম অঞ্চল, পর্বত, সমুদ্র, মরুভূমি অতিক্রমে সমর্থ, (৬) বায়ুপথ পরিবহণ-শীল, (৭) আন্তর্জাতিক যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে নিয়োজিত, (৮) বায়ুপথ প্রকৃতির দান এবং নির্মাণ ব্যয় নাই।

স্থলপথ		জলপথ		আকাশপথ
সড়ক পরিবহণ	রেল পরিবহণ	অভ্যন্তরীণ	সমুদ্রপথ	দেশীয় ও আন্তর্জাতিক
অসুবিধা—১) ব্যয় বেশি, (২) পরিবহণ ক্ষমতা সীমিত, (৩) ভারী ও আকারে বড়ো দ্রব্যাদি বহনে অক্ষম, (৪) ইহার জন্য ভারী রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সাপেক্ষ (৫) দূর দূরান্তে যাতায়াতে উপযোগী নহে।	অসুবিধা (১) ভারী প্রাথমিক মূলধনের জন্য রেলপথ স্থাপন ব্যয়বহুল, (২) পণ্য বোঝাই ও খালাস ব্যবস্থা জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ, (৩) দেশের সকল স্থানে বিশেষ করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে ও মরু অঞ্চলে স্থাপনে অনুপযোগী, (৪) ইহার মাধ্যমে পণ্য প্রেরণে নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী করার জন্য ব্যয় হয়।	অসুবিধা (১) ইহা অপেক্ষাকৃত মন্থর গতি, (২) যাতায়াত সীমাবদ্ধ, (৩) বন্যা ও খরা প্রভাবিত, (৪) জলপথের প্রসার আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল বলিয়া নিয়মিত নিশ্চয়তা কম, (৫) জলপথের নাব্যতার উপর নির্ভরশীল।	অসুবিধা (১) ইহা অপেক্ষাকৃত মন্থর গতি, (২) যাতায়াত নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ, (৩) বন্দর স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সাপেক্ষ, (৪) জলপথের প্রসার আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। এই কারণে বিপজ্জনক, (৫) যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিরোধে ইহার প্রসার ব্যাহত হয়।	অসুবিধা—১) ইহার ব্যয় অপেক্ষা বেশি, (২) ভারী পণ্যবহনে অনুপযোগী, (৩) পরিবহণ ক্ষমতা খুবই সীমিত, (৪) বিমানবন্দর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ, (৫) আকাশপথ আবহাওয়ার জন্য ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য অতিমাত্রায় বিপজ্জনক।

[প্রশ্ন : (১) বিশ্বের সর্বাধিক ব্যস্ত সমুদ্রপথ কোন্‌টি ? উহার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। (২) ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য প্রসারে কোন্ জলপথের গুরুত্ব বেশী ? ঐ পথে পরিবাহিত পণ্য সামগ্রী কি কি ? (৩) সুয়েজ ও পানামা খালের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর। (৪) আন্তর্জাতিক বিমান পথের বর্তমান গুরুত্ব আলোচনা কর।]

অনুশীলনী ১৩

১. পরিবহণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর। স্থলপথ, জলপথ ও আকাশ-পথে পরিবহণের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর।

[Discuss the economic importance of transport. Discuss the advantage and disadvantage of Roadways, Waterways and Airways.]

২. কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরিবহণ-ব্যবস্থার ভূমিকা উপযুক্ত উদাহরণসহ পর্যালোচনা কর।

[Explain with specific examples the influence of transport in the economic development of a region.]
[W. B. H. S. C. Exam., 1979]

৩। (ক) পৃথিবীর অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বন্টনে পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(খ) বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থার পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা আলোচনা কর।

[(a) Discuss the importance of transport in the world distribution of productive activities.

(b) Mention the relative importance of various modes of transport.] [W. B. H. S. C. Exam., 1982]

৪। বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ-ব্যবস্থার পারস্পরিক গুরুত্ব ও অসুবিধার কথা আলোচনা কর।

[Discuss the relative importance and drawbacks of different modes of transport.] [W. B. H. S. C. Exam., 1984]

৫। আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথ কি ? বিশ্বের প্রধান তিনটি আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথের নাম লিখ ও উহাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

[What is Trans-continental Railways ? Name the three major Trans-continental Railways of the world and analyse their economic importance]

৬। আন্তর্দেশীয় জলপথ কি ? দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ইহার ভূমিকা আলোচনা কর। জার্মানী ও ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ জলপথের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

[What is inland water ways ? Discuss its role on the economic development of a country. Discuss the characteristics and importance of inland water ways of Germany and France.]

৭। উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথের বর্ণনা দাও এবং ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণ দেখাও। এই সমুদ্রপথের সুবিধা ভোগ করে এইরূপ পাঁচটি দেশের নাম লিখ।

[Describe the North Atlantic Ocean Route and account for its commercial importance. Name five countries that are benefited by this Ocean route.] [W. B. H. S. C. Exam., 1980]

৮। বাণিজ্যপথ হিসাবে সুয়েজ ও পানামা খালের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[Briefly discuss the economic importance of the Suez and Panama Canal Routes as highways of commerce.]

[W. B. H. S. C. Exam., 1981]

৯। বাণিজ্যিক পরিবহণে নিম্নলিখিত রেলপথ ও জলপথের গুরুত্ব আলোচনা কর। বিভিন্ন পথের উপর অবস্থিত শহর বা বন্দরের নামোল্লেখ কর।

(ক) ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ, (খ) ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ, (গ) উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রপথ, (ঘ) সুয়েজ খাল পথ, (ঙ) পানামা খাল পথ।

[Discuss the importance of the following Railways and Waterways in commercial transport. Point out the name of city or Port situated on these routes : (a) Canadian Pacific Railways, (b) Trans-Siberian Railways, (c) North Atlantic Sea Route, (d) Suez Canal Route, (e) Panama Canal Route.]

১৪ | বাণিজ্য কেন্দ্র—বন্দর ও শহর (Trade Centre—Ports and Cities)

মানুষের সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত বিভিন্ন প্রকার সম্পদের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এই বিপুল চাহিদা পূরণের জন্য মানুষের প্রচেষ্টার অন্ত নাই। আদিম সমাজের ব্যক্তিগত উৎপাদন প্রচেষ্টা ক্রমে ক্রমে সমষ্টিগত বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিণত হইল। শ্রমবিভাগ, বিশেষায়ন ও বিনিময়ের সৃষ্টি হইল। উৎপাদন কেন্দ্র হইতে পণ্য সামগ্রী দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভোগকেন্দ্রে দ্রুত লেনদেনের বা বণ্টনের আবশ্যকতা দেখা দিল। ফলে পণ্য লেন-দেন ও ইহার আনুষঙ্গিক কার্যাবলীকে ঘিরিয়া উদ্ভব হইল ব্যবসা-বাণিজ্যের। আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন কেন্দ্র ও ভোগকেন্দ্রের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে উহা দূর করিতে বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্র হইতে পণ্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভোগকারীগণের নিকট সরবরাহ করাই বাণিজ্যের প্রধান কার্য। যে সকল নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন প্রকার লেন-দেন ঘটে ঐ সকল স্থানকে বলা হয় **ব্যবসাকেন্দ্র বা বাণিজ্য কেন্দ্র**। বর্তমান কালে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য পরিবহণ ব্যবস্থা, পণ্য মজুত রাখিবার গুদাম, ব্যাংক, বীমা, ডাক ও তার প্রভৃতি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিষয়ের সহজও সুলভ ব্যবস্থাপনা একান্ত আবশ্যক। যে সকল স্থানে লোকবসতি ঘন, লোকজন সহজে মিলিত হইতে পারে ও তাহাদের পণ্য দ্রব্যাদি সহজে হস্তান্তর করিতে পারে ঐ সকল স্থানেই বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। আবার পণ্য পরিবহণের সুবিধাকে কেন্দ্র করিয়া রেল, সড়ক, বিমান, জাহাজ প্রভৃতির মিলনস্থলেও ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। খাল, নদী বা সমুদ্রতীরে জলযানসমূহের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে যে সকল বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠে উহাদিগকে বন্দর বলা হয়, এবং দেশের অভ্যন্তরে পণ্যোৎপাদন কেন্দ্রে, শহরে বা রেল-সড়ক যোগাযোগ পথের উপর যে সকল বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয় উহাদিগকে **আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কেন্দ্র** বলা হয়।

বন্দর ও পোতাশ্রয় (Ports and Harbours)

স্থলভাগ হইতে জলপথে এবং জলপথ হইতে স্থলভাগে পণ্য পরিবহণের সুবিধাযুক্ত কেন্দ্রকে বন্দর বলে। এই সকল কেন্দ্র মারফত দেশ-বিদেশে পণ্য প্রেরণ বা দেশ-বিদেশের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত পণ্য সামগ্রী দেশের বিভিন্ন ভোগকেন্দ্রে বণ্টনের বিশেষ সুবিধা হয়। এই কারণে বন্দরকে বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার বলা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কৃষিজ, খনিজ, প্রাণীজ নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার বন্দরের মাধ্যমেই সংগৃহীত হইয়া উৎপাদনকেন্দ্রে প্রেরিত হয় এবং উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী আবার বন্দরের মাধ্যমেই বিভিন্ন ভোগকেন্দ্রে বণ্টিত হয়; বন্দরের মাধ্যমেই বিদেশ হইতে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্যাদি আমদানি করা হয় এবং দেশের রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত

পণ্যাদি বিদেশের বাজারে প্রেরণ করা হয়। কোন কোন দেশ বন্দরের মাধ্যমে এক দেশ হইতে পণ্যসামগ্রী আমদানি করিয়া নিজ দেশে ব্যবহার না করিয়া অন্য দেশে ঐ পণ্য সামগ্রী রপ্তানি করিয়া মুনাফা অর্জন করিয়া থাকে। এই প্রকার বাণিজ্যকে পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য (Entrepot trade) বলে। বন্দরের মাধ্যমে যে বিস্তীর্ণ এলাকায় পণ্যসামগ্রী দেশবিদেশে প্রেরিত হয় বা বিদেশ হইতে সংগৃহীত পণ্যসামগ্রী যে বিস্তীর্ণ এলাকার চাহিদা পূরণ করিয়া থাকে ঐ এলাকাকে বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি বলা হয়। অধিকন্তু বন্দরে জাহাজের মাল খালাস করা বা বোঝাই করা ইত্যাদি কার্যের জন্য যেমন নিরাপদ আশ্রয় প্রয়োজন তেমনি জাহাজসমূহের মেরামতি, জ্বালানী গ্রহণ প্রভৃতি কার্যের জন্য বন্দরসংলগ্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থাযুক্ত নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রও আবশ্যক। এই প্রকার আশ্রয় কেন্দ্রকে পোতাশ্রয় বলা হয়। বন্দর গঠনে পশ্চাদ্‌ভূমি ও পোতাশ্রয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

বন্দরের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Ports): বন্দরের গঠন, অবস্থান ও কার্য অনুযায়ী ইহাকে নানাভাবে ভাগ করা যায়।

গঠন অনুযায়ী বন্দর প্রধানত দুই প্রকার—স্বাভাবিক বন্দর ও কৃত্রিম বন্দর। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য পারিবেশিক আনুকূল্যে যে সকল বন্দর গড়িয়া উঠে উহাদিগকে স্বাভাবিক বন্দর বলে। বোম্বাই, লণ্ডন, ইওকোহামা প্রভৃতি স্বাভাবিক বন্দর। ভৌগোলিক পরিবেশ আদৌ বন্দর গঠনের অনুকূল নহে। কিন্তু অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কারণে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা দূর করিয়া যে বন্দর গঠন করা হয় উহাকে কৃত্রিম বন্দর বলে। ভারতের মাদ্রাজ একটি কৃত্রিম বন্দর।

অবস্থান অনুযায়ী বন্দরকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) **সমুদ্র বন্দর** (Sea Port): সমুদ্র তীরে অবস্থিত বন্দরকে সমুদ্র বন্দর বলে। ভারতের বোম্বাই, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিসকো সমুদ্র বন্দর।

(২) **উপসাগরীয় বন্দর** (Bay Port): উপসাগরের তীরে গঠিত বন্দরকে উপসাগরীয় বন্দর বলে। ভারতে বঙ্গোপসাগরের তীরে বিশাখাপত্তনম, আমেরিকার মেক্সিকো উপসাগরের তীরে গ্যালভাস্টোন উপসাগরীয় বন্দর।

(৩) **নদী বন্দর (Riverine Port):** নদীর তীরে যে সকল বন্দর গড়িয়া উঠে উহাদিগকে নদী বন্দর বলে। যেমন—ভারতে হুগলী নদীর তীরে কলিকাতা বন্দর, ইংলণ্ডে টেমস নদীর তীরে লণ্ডন বন্দর ইত্যাদি।

(৪) **মোহনা বন্দর (Estuary Port):** নদীর মোহনায় গঠিত বন্দরকে মোহনা বন্দর বলে। যেমন—বৃটিশ যুক্তরাজ্যে ক্লাইড নদীর মোহনায় অবস্থিত গ্লাসগো, চীনের সি-কিয়াং নদীর মোহনায় হংকং বন্দর।

(৫) **হ্রদ বন্দর (Lake Port):** হ্রদের তীরে কোন বন্দর গড়িয়া উঠিলে উহাকে হ্রদ বন্দর বলা হয়। আমেরিকায় মিচিগান হ্রদের তীরে চিকাগো, ঈরী হ্রদের তীরবর্তী বাফেলো হ্রদ বন্দরের উদাহরণ।

(৬) **খাল বন্দর (Canal Port)** : বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত খাল পথের উপর অবস্থিত বন্দরকে খাল বন্দর বলা হয়। যেমন—সুয়েজ খাল পথের উপর আল-ইসমাইলিয়া আল-কাবা প্রভৃতি বন্দর।

কার্য অনুযায়ী বন্দরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(১) **আমদানি বন্দর (Importing Port)** : যে সকল বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি অপেক্ষা পণ্যসামগ্রীর আমদানি অধিক হয় উহাদিগকে আমদানি বন্দর বলা হয়। ভারতের বোম্বাই, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন এই জাতীয় বন্দর।

(২) **রপ্তানি বন্দর (Exporting Port)** : কোন বন্দরের মধ্য দিয়া যখন আমদানি অপেক্ষা অধিক পণ্য বিদেশে রপ্তানি হয় তখন ঐ প্রকার বন্দরকে রপ্তানি বন্দর বলা হয়, যেমন—ভারতের পারাদীপ বন্দর।

(৩) **পুনঃরপ্তানি বন্দর (Entrepot Port)** : কোন কোন বন্দরের মাধ্যমে কোন দেশ হইতে আমদানিকৃত পণ্য সামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহার না করিয়া অপর কোন দেশে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে রপ্তানি করা হয়। এই প্রকার বন্দরকে পুনঃরপ্তানি বন্দর বলে এবং বন্দরের এই সকল কার্যকে আমদানি অন্তে রপ্তানি বলা হয়।

বন্দর গঠনের অনুকূল অবস্থা (Conditions for the development of ports) : বন্দর গঠনের অনুকূল অবস্থাসমূহকে প্রধানত ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক এই দুই প্রকার পরিবেশের অন্তর্গত বলা যায়।

ভৌগোলিক পরিবেশ : ভৌগোলিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত অবস্থাসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(১) **ভগ্ন উপকূল** : উপকূলভাগ কঠিন ও ভগ্ন হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ জলরাশি স্থলভাগের গভীরে প্রবেশ করিয়া এক মুখখোলা যে জলভাগের সৃষ্টি করে ঐ সকল স্থানে বন্দর গঠন সহজ হয়। কারণ ঐ জলভাগের অগ্রবর্তী তীরভূমিতে বাহির সমুদ্রের ঢেউ প্রতিহত হয় ও অভ্যন্তর ভাগে জাহাজসমূহ নিরাপদে অবস্থান করিতে পারে। উপকূলভাগ কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত না হইলে তরঙ্গাঘাতে উহা সহজে ক্ষয় হয় ও বন্দরের ক্ষতি হয়। ইউরোপের উপকূলভাগ ভগ্ন ও কঠিন শিলাগঠিত বলিয়া ঐ সকল স্থানে কয়েকটি বিখ্যাত বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে।

(২) **খাঁড়ি ও জলরাশির গভীরতা** : উপকূলভাগ গভীর খাঁড়িযুক্ত কিন্তু নাতিউচ্চ হওয়া উচিত। জলরাশির গভীরতা যথেষ্ট না হইলে বড় বড় জাহাজের পক্ষে তীরে আসা সম্ভব নহে। আবার তীরভূমি জলভাগের সমতল হইতে অতিরিক্ত উচ্চ হইলে জাহাজে পণ্য বোঝাই বা জাহাজ হইতে পণ্য খালাস করা অসুবিধাজনক।

(৩) **পোতাশ্রয়** : বাহিরে সমুদ্রের ঢেউ, ঝড় ঝঞ্ঝা, স্রোত প্রভৃতি হইতে রক্ষা পাওয়া এবং জ্বালানী গ্রহণ, যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় মেরামতি কার্যের জন্য বন্দরে জাহাজের যে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হয় উহাকে পোতাশ্রয় বলে। উন্নত বন্দরের সহিত অবশ্যই পোতাশ্রয় যুক্ত থাকে। পোতাশ্রয় দুই প্রকার—

স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। উপকূলভাগের ভূ-প্রকৃতি যখন ভগ্ন ও খাড়িযুক্ত হয় এবং জাহাজসমূহের নিরাপদ অবস্থানের সহজ ও স্বাভাবিক সুযোগ থাকে তখন ঐ সকল পোতাশ্রয়কে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় বলা হয়। বোম্বাই, লিভারপুল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দর সংলগ্ন স্বাভাবিক পোতাশ্রয় রহিয়াছে। যে সকল স্থানের ভূ-প্রকৃতি ও অন্যান্য অবস্থা পোতাশ্রয় গঠনের পক্ষে অনুকূল নহে কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে বা অন্য কোন কারণে যখন সমুদ্রের মধ্যে কৃত্রিম পাঁচিল তুলিয়া জাহাজসমূহের জন্য নিরাপদ আশ্রয়-কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হয় তখন ঐ সকল কেন্দ্রকে কৃত্রিম পোতাশ্রয় বলা হয়। ভারতের মাদ্রাজ বন্দরে এই প্রকার কৃত্রিম পোতাশ্রয় গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

(৪) **প্রশস্ত স্থান**—একাধিক জাহাজ যাহাতে একই সময়ে বন্দরে নোঙ্গর করিতে পারে বা বড় বড় জাহাজ যাহাতে ঘোরাফেরা করিতে পারে উহার জন্য বন্দর প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক।

(৫) **প্রবেশপথ**: বন্দরে প্রবেশ পথে চড়া বা মগ্ন শৈল থাকা খুবই বিপজ্জনক। প্রবেশপথ বাঁকহীন, সরল, গভীর ও বোতলের মুখের মত বাহিরের অংশ সরু এবং ভিতরের অংশ প্রশস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৬) **জলবায়ু**: বন্দর গঠনে জলবায়ুর প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বন্দর সকল ঋতুতে কুয়াশা ও বরফমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। অতি বৃষ্টিপাত, ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভৃতি জাহাজের নিরাপদ চলাচল এবং বন্দরের স্বাভাবিক কাজকর্মের অন্তরায় সৃষ্টি করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর উপকূলের বন্দর বা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার ফলে আদৌ সমৃদ্ধ নহে। বন্দর অঞ্চলের জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ না হইলে জনবসতি গড়িয়া উঠে না এবং বন্দরের কার্যে শ্রমিকের পর্যাপ্ত যোগান পাওয়াও অসুবিধাজনক হয়।

(৭) **জোয়ার-ভাঁটা**: জোয়ার-ভাঁটায় বন্দরে জলের উচ্চতার তারতম্য অতিরিক্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সাধারণত ৪-৫ মিটারের বেশি তারতম্য উন্নত বন্দরের পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ।

অর্থনৈতিক অবস্থা: বন্দর গঠনের অনুকূল অর্থনৈতিক অবস্থাসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) **পশ্চাদ্‌ভূমি (Hinterland)**: পণ্য চলাচলকেন্দ্র হিসাবেই বন্দরের গুরুত্ব। যে সকল অঞ্চলের পণ্যসামগ্রী কোন একটি বন্দরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয় বা বিদেশে রপ্তানি হয় এবং ঐ বন্দরের মাধ্যমে বিদেশ হইতে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রী যে সকল অঞ্চলের মধ্যে বণ্টিত হয় ঐ সকল অঞ্চলকে বলা হয় ঐ বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। কলিকাতা বন্দর মারফত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, আসাম, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের কৃষিজ, খনিজ ও প্রাণিজ দ্রব্যাদি যেমন সংগৃহীত হয় ও দেশ-বিদেশের বাজারে প্রেরিত হয় তেমনি কলিকাতা বন্দর মারফত বিদেশ হইতে আমদানি করা পণ্য সামগ্রী উপরি-উক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন ভোগকেন্দ্রে প্রেরিত হয়। সুতরাং এই সমগ্র অঞ্চলকে কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি বলা হয়। বন্দরের সমৃদ্ধি নির্ভর করে

পশ্চাদ্‌ভূমির সমৃদ্ধির উপর। পশ্চাদ্‌ভূমি বহু বিস্তৃত জনবহুল হইলে এবং কৃষিজ, খনিজ, প্রাণিজ, বনজ, শিল্পজাত প্রভৃতি সম্পদে সমৃদ্ধ হইলে বন্দরের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। মোটকথা বন্দরের গুরুত্ব যেমন উহার মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণের উপর নির্ভর করে তেমনি বন্দরের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ নির্ভর করে পশ্চাদ্‌ভূমির আয়তন ও সমৃদ্ধির উপর। পশ্চাদ্‌ভূমি দুই প্রকার হইতে পারে—আমদানিপ্রধান (distributive) এবং রপ্তানিপ্রধান (contributive)। ইহা নির্ভর করে পশ্চাদ্‌ভূমিতে প্রাকৃতিক সম্পদের বণ্টন, অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের উপর। কোন কোন বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমির সুনির্দিষ্ট সীমা নির্দেশ করা যায় না। অনেক সময় একই অঞ্চলের পণ্যসামগ্রী স্বল্প দূরত্বে অবস্থিত বিভিন্ন বন্দর মারফত রপ্তানি হইয়া থাকে। জার্মানিতে রাইন অববাহিকার পণ্যসামগ্রী ঐ দেশের ব্রেমেন, নেদারল্যাণ্ডের রটারডাম্ ও বেলজিয়ামের অ্যাণ্টোয়ার্প বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি হইয়া থাকে।

(২) **পরিবহণ ব্যবস্থা**: বন্দরসমূহের সহিত উহার পশ্চাদ্‌ভূমির সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য। পশ্চাদ্‌ভূমি হইতে রপ্তানিযোগ্য পণ্যসামগ্রী বন্দরে আনয়ন এবং বন্দর হইতে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রী ভোগকেন্দ্রে প্রেরণ অধিক ব্যয়সাধ্য হইলে উহা বাণিজ্যের অন্তরায়স্বরূপ হয়। এই কারণে বন্দরের সহিত সংযোগকারী রেল ও সড়ক ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ও সুলভ হওয়া আবশ্যক।

(৩) **বন্দরের অন্যান্য অবস্থা**: (ক) বন্দরের ডক বা জেটিতে পণ্য বোঝাই ও খালাস করিবার সহজ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। বর্তমানে উন্নত বন্দরসমূহে পণ্য বোঝাই ও খালাসে ক্রেন, শোভেল ইত্যাদি যান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। (খ) বন্দরে পণ্য নিরাপদে মজুত রাখিবার জন্য মালগুদাম, হিমঘর প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (গ) জাহাজের মেরামতি কার্যের জন্য বন্দরসংলগ্ন ড্রাই ডক থাকা আবশ্যক। (ঘ) বন্দরে মাল বোঝাই করা, খালাস করা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যের জন্য প্রচুর শ্রমিক ও কারিগরী দক্ষতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। (ঙ) জাহাজ ও পণ্য ইত্যাদির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করিবার জন্য বন্দর সংলগ্ন বীমা ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা আবশ্যক। (চ) বন্দরে প্রচলিত শুল্কের হার কম হওয়া আবশ্যক। কারণ শুল্ক হার বেশি হইলে ব্যবসায়ীদের আমদানি-রপ্তানিতে উৎসাহ হ্রাস পায়। ফলে বন্দরে জাহাজের চলাচল কম হয়। (ছ) জাহাজের প্রয়োজনীয় জ্বালানী ও পানীয় জলের ব্যবস্থা বন্দরে অপরিহার্য।

(৪) **রাজনৈতিক ব্যবস্থা**: দেশের রাজনৈতিক অবস্থার স্থিতিশীলতা ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে সরকারী আনুকূল্য বন্দর গঠন ও পরিচালনায় বিশেষ সহায়ক হয়।

[প্রশ্ন : (১) গঠন অনুযায়ী বন্দরকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ও কি কি? পশ্চাদভূমি কাহাকে বলে? ইহার গুরুত্ব কি? (৩) বন্দর গঠনের অনুকূল অবস্থাগুলি পর্যালোচনা কর।]

শহর ও নগর (Towns and Cities)

'ভগবান গ্রাম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে শহর ও নগর।' এই প্রবচন হইতেই শহর-নগরের উৎপত্তির বিষয় জানা যায়। মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর জটিলতা ও বহুমুখিতা হইতেই শহর প্রভৃতির সৃষ্টি। মানুষের সমাজে উৎপাদন ও বণ্টন ধারার রূপান্তর একদিকে যেমন মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্নমুখী প্রসার ঘটায় অপরদিকে তেমনি ঐ সকল ক্রিয়াকলাপের স্থানীয়করণও ঘটায়। ইহার ফলে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন কেন্দ্রবিন্দুতে গড়িয়া উঠে ঘন জনবসতি। এই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলিই কালক্রমে রূপান্তরিত হয় আধুনিক শহর, নগর, ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রে। সাধারণত নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে শহর-নগর গড়িয়া উঠে। শহর বা নগর গঠনে প্রায় সর্বদাই একাধিক কার্যকারণের যোগ লক্ষ্য করা যায়।

(১) **রাজধানী ও প্রশাসনকেন্দ্র** : অতি প্রাচীন কাল হইতেই রাজশক্তির ছত্রছায়ায় উহার রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া উন্নত শহর ও শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে—ভারতের দিল্লী, সোভিয়েত ইউনিয়নের মস্কো ইত্যাদি। বর্তমানকালে রাজশক্তি রাষ্ট্রশক্তিতে পরিণত হওয়ায় বিভিন্ন প্রশাসনকেন্দ্রে উন্নত শহর, নগর ইত্যাদি গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। ভারতের চণ্ডীগড়, ভুবনেশ্বর ইহার উদাহরণ।

(২) **যোগাযোগ ব্যবস্থার সংযোগ স্থল** : জনপথ, রেলপথ, জলপথ, বিমানপথ প্রভৃতির যোগাযোগস্থলে পণ্য চলাচলকে কেন্দ্র করিয়া শহর ও নগর গড়িয়া উঠে, যেমন—ভারতের বোম্বাই, নাগপুর, ইতালির জেনোয়া, মিলান, পাকিস্তানের করাচি, পেশোয়ার ইত্যাদি।

(৩) **বন্দর ও বাণিজ্যপথ** : জলপথের উপর অবস্থিত বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া বাণিজ্যের প্রয়োজনেই গড়িয়া উঠিয়াছে বন্দরসংলগ্ন শহর ও নগর। আমেরিকার চিকাগো, সানফ্রানসিস্কো, ভারতের মাদ্রাজ, কাণ্ডলা, সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনগ্রাদ, ভোলগোগ্রাদ ইত্যাদি।

(৪) **কৃষিজ পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যকেন্দ্র** : কোন স্থানে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যের বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া শহর গড়িয়া উঠিতে পারে, যেমন—চা উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, আসামের শিবসাগর, নওগাঁও, আখ ও তৈলবীজ কেন্দ্র হিসাবে উত্তরপ্রদেশের কানপুর গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৫) **খনিজ উত্তোলন কেন্দ্র** : খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল হইতে খনিজ উত্তোলনকে কেন্দ্র করিয়া শহর-নগর গড়িয়া উঠে। ভারতের বিহারে অবস্থিত ধানবাদ, কোডার্মা, দক্ষিণ আফ্রিকার জোহান্সবার্গ, অস্ট্রেলিয়ার কালগুর্লি ও কুলগার্ডি প্রভৃতি এই প্রকার শহরের উদাহরণ।

(৬) **শিল্পকেন্দ্র** : যন্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া বহু উন্নত শিল্প শহরের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যেমন—ভারতের, জামশেদপুর, দুর্গাপুর, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গ, ডেট্রয়েট, ইংলন্ডের ম্যাঞ্চেস্টার ইত্যাদি।

(৭) **শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র** : কোন কোন দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চাকে

কেন্দ্র করিয়া শহরের পত্তন ঘটে—ভারতের আলিগড়, বৃটিশ যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ইত্যাদি।

(৮) **তীর্থক্ষেত্র ও ধর্মচর্চার কেন্দ্র** : অতি প্রাচীনকাল হইতেই তীর্থক্ষেত্রগুলিতে বা ধর্মচর্চার কেন্দ্রে শহর গড়িয়া উঠিয়াছে ; যেমন—ভারতের পুরী, গয়া, অমৃতসর, নবদ্বীপ, আরবের মক্কা, ইতালির ভ্যাটিক্যান সিটি ইত্যাদি।

(৯) **স্বাস্থ্য-নিবাস** : পার্বত্য প্রদেশে, সমুদ্র উপকূলে, মালভূমি অঞ্চলে বা নদীতীরে স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বা অবসর বিনোদনের জন্য প্রচুর বিত্তশালী লোক সমাগম ঘটে ও ক্রমে শহরের পত্তন হয়। ভারতে হিমালয়ের ক্রোড়ে কাশ্মীর, দার্জিলিং, ভূমধ্যসাগর সংলগ্ন তীরে কান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(১০) **ঐতিহাসিক স্থান** : এক সময়ের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানেও পরবর্তী যুগে শহর গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। ভারতের আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, পুণা প্রভৃতি ইহার নিদর্শন।

(১১) **সামরিক কেন্দ্র** : সেনানিবাস, সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র বা সীমান্ত রক্ষা কেন্দ্রে সামরিক কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে ব্যবসাকেন্দ্র ও শহর গড়িয়া উঠে। ভারতের মীরাট, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সিঙ্গাপুর, পাকিস্তানের মুলতান, ভূমধ্যসাগরের জিব্রাল্টার প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

[**প্রশ্ন** : (১) শহর ও নগর গঠনের উপযোগী অবস্থাগুলি কি কি ? (২) প্রশাসনকেন্দ্রে, বাণিজ্যকেন্দ্রে এবং সামরিককেন্দ্রে শহর গড়িয়া উঠিবার কারণ কি ?]

অনুশীলনী ১৪

১। বন্দর গঠনের উপযোগী অবস্থাগুলির উদাহরণসহ আলোচনা কর। গঠন অনুযায়ী বন্দরকে ভাগ কর।

[Discuss with example the conditions favourable for the construction of port. Classify the ports according to the modes of development.]

২। পশ্চাদ্‌ভূমি কাহাকে বলে ? সমৃদ্ধিশালী পশ্চাদ্‌ভূমির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। বন্দরের উন্নতিতে পোতাশ্রয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

[What is Hinterland ? Discuss the characteristics of prosperous hinterland. Explain the importance of hinterland to the development of port.

৩। বন্দর গড়িয়া উঠিবার উপযোগী কারণসমূহ বর্ণনা কর। বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি বলিতে কি বুঝ ?

[Describe the conditions suitable for the development of ports. What do you understand by hinterland of a port ?]

[W. B. H. S. C. Exam. 1980]

৪। বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবার উপযোগী ভৌগোলিক কারণগুলি উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

[Describe with suitable illustrations the geographical factors responsible for the growth of trade centres.]

[W. B. H. S. C. Exam. 1979 ; Tripura H. S. Exam. 1981]

১৫ আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন কয়েকটি বন্দর ও শহর
(Some Important International Ports and Cities)

[যুক্তরাজ্য (United Kingdom)] **লণ্ডন** (London) : ইংল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলে টেমস্ নদীর তীরে মোহনা হইতে ৪৮ কি. মি. অভ্যন্তরে অবস্থিত লণ্ডন একটি নদী বন্দর। ইহা যুক্তরাজ্যের রাজধানী ও বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ও জাহাজের নিরাপদ আগমন ও নির্গমনের সুবিধা এই বন্দরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ইহার পশ্চাদ্ভূমি খুবই শিল্পসমৃদ্ধ এবং রেল, সড়ক ও বিমানপথে বন্দরের সহিত যুক্ত। লণ্ডনের নিকটবর্তী অঞ্চলে রেলইঞ্জিন, মোটর গাড়ী, কাগজ, বস্ত্রবয়ন, পশম, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈয়ারির অসংখ্য শিল্প-কারখানা বিদ্যমান। এই শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানি ও উৎপন্ন পণ্যাদির রপ্তানি লণ্ডন বন্দরের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত এই বন্দর মারফত বহু পণ্যসামগ্রী আমদানি অন্তে পুনঃ রপ্তানি করা হয়। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রপ্তানি বন্দর হিসাবে লণ্ডন বিখ্যাত। এই বন্দরের মাধ্যমে চা, কফি, চিনি, রবার, চামড়া, পশম, তামাক, তুলা, ভুট্টা, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি আমদানি ও রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, মোটর, কাগজ, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, ইস্পাতজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করা হয়। চা, কফি, রবার, মশলা প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশসমূহে পুনঃরপ্তানি করা হয়।

চিত্র ১৫.১ : লণ্ডন

লিভারপুল (Leverpool) : ইংল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে আইরিশ উপসাগরের কূলে মার্সে নদীর মোহনায় অবস্থিত এই বন্দর জলপথে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের সহিত যুক্ত। একটি খাল দ্বারা এই বন্দর যুক্তরাজ্যের বয়ন শিল্পকেন্দ্র ম্যাঞ্চেস্টারের সহিত যুক্ত। ইহার পশ্চাদ্ভূমি ল্যাঙ্কাশায়ার, চেশায়ার, স্ট্যাফোর্ডশায়ার প্রভৃতি অঞ্চল লৌহ-ইস্পাত, কার্পাস, পশম বয়ন, রাসায়নিক দ্রব্য বিবিধ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈয়ারির নানাবিধ শিল্পে সমৃদ্ধ। ফলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে পশ্চাদভূমির সহিত সংযুক্ত এই বন্দর যুক্তরাজ্যের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার সহিত এই বন্দর মারফত যুক্তরাজ্যের সর্বাধিক বাণিজ্য হইয়া থাকে। লিভারপুল বন্দরের বিপরীত দিকে অবস্থিত বার্কেনহেড-এ উন্নত পোতাশ্রয় আছে এবং উহা এই বন্দরের অন্তর্ভুক্ত। এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানির মধ্যে কার্পাস, গম, প্রাণিজাত দ্রব্য প্রধান এবং রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কার্পাসবস্ত্র, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, চীনামাটি ও চামড়ার জিনিস প্রধান।

গ্লাসগো (Glassgow): স্কটল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে ক্লাইড নদীর মোহনায় অবস্থিত গ্লাসগো সুন্দর পোতাশ্রয় যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি অঞ্চলে প্রচুর কয়লা ও লৌহ আকরিক পাওয়া যায় বলিয়া এখানে বিরাট লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চল জনবহুল এবং কার্পাস, পশম, কার্পেট, ইঞ্জিনিয়ারিং, রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্পে বিশেষ উন্নত। ক্লাইড নদীর মোহনা গভীর ও প্রশস্ত হওয়ায় গ্রীণক হইতে গ্লাসগো পর্যন্ত নদীর উভয় তীরে প্রায় বিশ মাইল স্থান জুড়িয়া বিশ্বের বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে আমেরিকার সহিত এই বন্দর মারফত বাণিজ্য চলিয়া থাকে। এই বন্দর মারফত আমদানি পণ্যের মধ্যে কার্পাস, পশম, খাদ্যশস্য, কাষ্ঠমণ্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য এবং রপ্তানি পণ্যের মধ্যে নানাপ্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, পশম ও কার্পাস জাত দ্রব্য প্রধান।

হাল (Hull): ইংল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে হাম্বার নদীর মোহনার নিকট উত্তর তীরে অবস্থিত হাল একটি প্রসিদ্ধ মৎস্য বন্দর। এই বন্দরটি খাল দ্বারা লীডস্‌, ওয়েকফিল্ড ও শেফিল্ড-এর সহিত যুক্ত। এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি লৌহ-ইস্পাত, পশম ও কার্পাস বস্ত্র শিল্পে সমৃদ্ধ। আবার ইহার সন্নিকটেই উত্তর সাগরের বিশাল মৎস্যক্ষেত্র অবস্থিত। মৎস্য আহরণ ও মৎস্য রপ্তানিতে এই বন্দর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত রেল ও সড়ক পথে পশ্চাদভূমির সহিত যুক্ত। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে লৌহ, কাষ্ঠ, পশম, প্রধান এবং রপ্তানির মধ্যে কার্পাস ও পশমজাত দ্রব্য, লৌহ-ইস্পাত এবং মৎস্য উল্লেখযোগ্য।

[ফ্রান্স (France)] **মার্সেই (Marsailles):** ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে ভূমধ্যসাগর তীরে রোন নদীর মোহনা হইতে ৪৮ কি মি. পূর্বে এই বন্দর অবস্থিত। রেল, সড়ক, খাল ও নদী পথে ইহা উর্বর ও নানা সম্পদে সমৃদ্ধ রোন অববাহিকার সহিত যুক্ত। এই বন্দরের মাধ্যমে রেশম, পশম, কার্পাস, রবার, চা, কফি, চামড়া, তৈলবীজ, মশলা, খনিজ তেল প্রভৃতি আমদানি করা হয় এবং নানাবিধ বিলাস দ্রব্য, মোটর গাড়ি, মদ্য, আঙ্গুর, জলপাই, প্রসাধন দ্রব্য, রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়।

লা-হাভর (La Havre): ফ্রান্সের উত্তর-পূর্ব উপকূলে সীন নদীর মোহনায় আটলান্টিক মহাসাগর সংলগ্ন লা-হাভর একটি উল্লেখযোগ্য বন্দর। ফ্রান্সের কৃষি-প্রধান অঞ্চল ইহার পশ্চাদভূমি। এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানি দ্রব্য হিসাবে তুলা, গম, কফি, তামাক, রবার উল্লেখযোগ্য এবং রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যই

প্রধান। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার সহিত সর্বাধিক বাণিজ্য এই বন্দর মারফৎ হইয়া থাকে। ইহার সন্নিকটে কয়েকটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

[**ইউরোপের অন্যান্য বন্দর**] **হামবুর্গ** (Hamburg) : পশ্চিম জার্মানীর উত্তরে এলব্‌ নদীর তীরে মোহনা হইতে প্রায় ১১২ কি. মি. অভ্যন্তরে এই বন্দরটি অবস্থিত। উত্তর সাগরের সহিত যুক্ত ইহা পশ্চিম জার্মানীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও প্রসিদ্ধ শিল্পকেন্দ্র। পশ্চিম জার্মানীর নদীগুলি খাল দ্বারা পরস্পর যুক্ত এবং এলব্‌ নদীর মাধ্যমে এই বন্দরের সহিত যুক্ত। কীয়েল খাল দ্বারা ইহা বাল্টিক সাগরের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহার গুরুত্ব অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্প-অধ্যুষিত বিখ্যাত রূঢ় ও সার অঞ্চল ইহার পশ্চাদভূমির অন্তর্গত। রেল, সড়ক, নদী ও খাল পথ সকল মিলিত হইয়া এই বন্দরের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে। জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ মেরামত এই বন্দরাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শিল্প। কফি, কোকো, তুলা, পাট, চিনি, পশম ও নানাবিধ শিল্প দ্রব্য এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করা হয় এবং ইস্পাত যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, লবণ, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি রপ্তানি করা হয়। ইহার মাধ্যমে পুনঃ রপ্তানি কার্যও চলিয়া থাকে।

অ্যান্টোয়ার্প (Antwerp) : বেলজিয়ামের শেলড (Schelde) নদীর মোহনায় উত্তম পোতাশ্রয়যুক্ত এই বন্দর অবস্থিত। রেল, সড়ক ও খাল পথ দ্বারা ইহা বেলজিয়াম, ফ্রান্সের পূর্বাংশ এবং জার্মানীর রাইন ও রূঢ় উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ইহার পশ্চাদভূমির সহিত যুক্ত। এখানে জাহাজ নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। ইহা ইউরোপের একটি বিশিষ্ট পুনঃ রপ্তানি বন্দর। খাদ্যশস্য, তুলা, চামড়া, চিনি, লৌহ আকরিক, কয়লা প্রভৃতি এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করা হয় এবং যন্ত্রপাতি, কাচ, লিনেন বস্ত্র, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি রপ্তানি করা হয়।

রটারডাম (Rotterdam) : রাইন নদীর শাখা নিউমাস নদীর উপর অবস্থিত ইহা হল্যাণ্ডের প্রধান বন্দর ও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। সুগভীর নিউ ওয়াটারওয়ে (New Waterway) খাল দ্বারা বন্দরটি উত্তর সাগরের সহিত যুক্ত। রাইন অববাহিকা ইহার পশ্চাদ্ভূমি। অধিকন্তু হল্যাণ্ড, জার্মানী ও বেলজিয়ামের বিস্তৃত অঞ্চলের সহিত ইহার যোগাযোগ থাকায় ও বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ এই বন্দরে প্রবেশ করিতে পারায় ইহার গুরুত্ব অধিক। চা, চিনি, তুলা, কয়লা, খনিজ তৈল, রাবার প্রভৃতি এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করা হয়। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে নানাপ্রকার শিল্পজাতদ্রব্য, দুগ্ধজাত দ্রব্য ও গবাদি পশু প্রধান।

ডানজিগ (Danzig) : ভিশ্চুলা নদীর মোহনায় বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত ইহা পোল্যাণ্ডের সর্বপ্রধান বন্দর। শিল্পকেন্দ্র ও জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র হিসাবেও ইহা বিখ্যাত। শীতকালে এই বন্দর প্রায়ই বরফাবৃত হওয়ার ফলে বন্ধ থাকে। কাঠ, চিনি, কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে লৌহ আকরিক, তুলা, পশম, নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি উল্লেখ-

যোগ্য। এই বন্দরের মাধ্যমে সুইডেনে কয়লা প্রেরণ করা হয় এবং তথা হইতে লৌহ আকরিক আমদানি করা হয়।

[**সোভিয়েত ইউনিয়ন (U.S.S.R.)**] : **লেনিনগ্রাদ (Leningrad)** : বাল্টিক সাগরের তীরে নীভা নদীর মোহনায় অবস্থিত লেনিনগ্রাদ রাশিয়ার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও শিল্পশহর। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ইহা অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এই বন্দর চারিমাস বরফাবৃত থাকে। ইহার পশ্চাদ্ভূমি ইউক্রেনের উত্তরাংশে ইউরাল ও মস্কো পর্যন্ত বিস্তৃত এবং রেলপথ ও সড়ক পথে ঐ সকল শিল্পাঞ্চলের সহিত যুক্ত। কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম, বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি তৈয়ারির শিল্পে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধ। ইউরোপের সহিত বাণিজ্য এই বন্দর মারফত সর্বাধিক হইয়া থাকে।

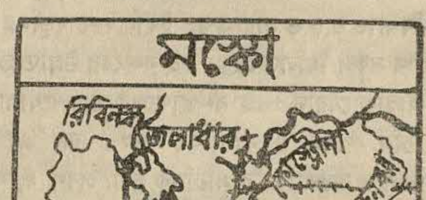

চিত্র ১৫.২ : মস্কো।

মুরমানসক (Murmansk) : রাশিয়ার উত্তরপ্রান্তে কোলা উপদ্বীপে অবস্থিত এই বন্দরটি উষ্ণ সমুদ্র স্রোতের প্রভাবে সারা বৎসর বরফমুক্ত থাকে। ইহা রেলপথ দ্বারা লেনিনগ্রাদের সহিত যুক্ত। এই বন্দরের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কাষ্ঠ, কাষ্ঠমণ্ড, মৎস্য, চর্ম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মস্কো (Moscow) : মস্কোভা নদীর তীরে অবস্থিত মস্কো সোভিয়েত রাশিয়ার রাজধানী, বৃহত্তম শহর ও শিল্পনগরী। বস্ত্রবয়ন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বিমান, রেল, মোটর নির্মাণ শিল্পের সমাবেশ ইহাকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পনগরীর মর্যাদা দিয়াছে। ইহার সুড়ঙ্গ রেল "মেট্রো" এক দর্শনীয় বস্তু। মস্কো দেশের রেল ও সড়ক পথের মিলন স্থল ও আন্তর্জাতিক বিমানকেন্দ্র।

[**আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.)**] **নিউ ইয়র্ক (New York)** : যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে হাডসন নদীর মোহনায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্দর নিউইয়র্ক অবস্থিত। ইহাটোকিওর পরেই বিশ্বের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নগরী। রচেস্টার—ইরি খালপথে ইহা ইরি হ্রদের সহিত যুক্ত। আবার হাডসন-মোহক নদী পথে ইহা আপালেচিয়ান পর্বত ভেদ করিয়া উহার পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পক্ষেত্রের সহিত যুক্ত। ইহার ফলে এই বন্দরের পশ্চাদভূমি উত্তরে নিউ ইংল্যান্ড, পশ্চিমে পেনসিলভ্যানিয়া এবং দক্ষিণে আলাবামা পর্যন্ত বিস্তৃত। উন্নত রেল-সড়ক-জলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বন্দরসংলগ্ন স্বাভাবিক পোতাশ্রয় এই বন্দরের গুরুত্ব অধিক

পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। এই বন্দর এত সমৃদ্ধিশালী যে ইহার পরিধি হাডসন মোহনার নিকটবর্তী নিউজার্সি, লংদ্বীপ ও ম্যানহাটন দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এই বন্দর মারফত হইয়া থাকে। এই বন্দরের বহু প্রকার রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে গম, ভুট্টা, তূলা, তামাক, মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, তাম্র, মোটর গাড়ি, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রধান। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে চা, কফি, চিনি, রাবার, চামড়া, আকরিক লৌহ, টিন, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি প্রধান।

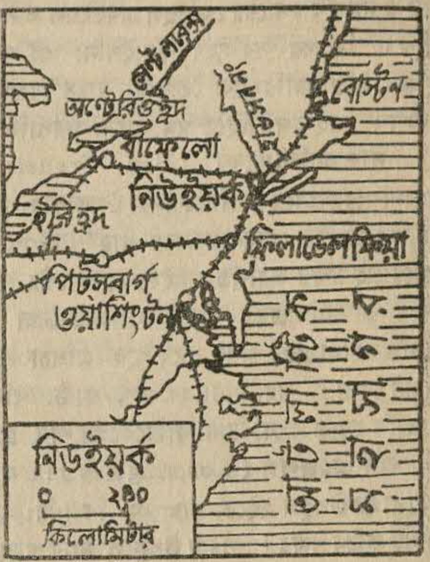

চিত্র ১৫.৩ : নিউ ইয়র্ক

বোস্টন (Boston): যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব প্রান্তে ম্যাসাচুসেটস রাজ্যে আটলাণ্টিক উপকূলে এই বন্দর অবস্থিত। নিউইয়র্ক বন্দরের উত্তরে ইহার অবস্থান হওয়ায় ইহাই ইউরোপীয় বন্দরগুলির নিকটতম বন্দর। নিউইয়র্কের উন্নতির সহিত ইহার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে ইহা পশম বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। নিউ ইংল্যাণ্ড রাজ্যগুলি ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। এই বন্দরের মাধ্যমে প্রধানতঃ পশম, তূলা, চামড়া ইত্যাদি আমদানি করা হয় এবং মেষ মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য, চিনি, কাগজ, কার্পাস দ্রব্য, লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়।

ফিলাডেলফিয়া (Philadelphia): যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পেনসিলভ্যানিয়া রাজ্যে ডেলওয়ার নদীর তীরে অবস্থিত ফিলাডেলফিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। নানাবিধ শিল্পে এই বন্দরাঞ্চল সমৃদ্ধ। তাম্র নিষ্কাশন ও খনিজ তৈল পরিশোধন ব্যতীত এই অঞ্চলের অন্যান্য শিল্পের মধ্যে কয়লা, লৌহ, বস্ত্র, চিনি, চর্ম, রেলগাড়ি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বন্দরের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে তাম্র, খনিজ তেল, লৌহ আকরিক ও শিল্পের অন্যান্য কাঁচামাল প্রধান। কয়লা, লৌহ-ইস্পাত নির্মিত যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিল্পদ্রব্য এখান হইতে রপ্তানি করা হয়।

নিউ অরলিন্স (New Orleans): যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগরের তীরে মিসিসিপি মোহনায় এই বন্দর অবস্থিত। কৃষিজ সম্পদে সমৃদ্ধ মিসিসিপির অববাহিকা এই বন্দরের পশ্চাদভূমি। কার্পাস ও গম রপ্তানি বন্দর হিসাবেই ইহার খ্যাতি। অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ভুট্টা, তামাক, খনিজ তেল মাংস, কাষ্ঠ প্রধান। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কফি, চিনি, পাটজাত দ্রব্য, সার উল্লেখযোগ্য।

চিকাগো (Chicago) : যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান হ্রদের তীরে অবস্থিত চিকাগো উল্লেখযোগ্য শহর ও বন্দর। সেন্ট লরেন্স নদী ও উহার সহিত যুক্ত হ্রদ-পঞ্চকের মধ্য দিয়া বড় বড় সমুদ্রগামী জহাজ এই বন্দরে আসিতে পারে। ইহা প্রেইরি অঞ্চলের গম ও মাংস ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল এবং রেল ও সড়কপথে দেশের সকল অঞ্চলের সহিত যুক্ত। বিশ্বের সর্ববৃহৎ কসাইখানা এই শহরে অবস্থিত। কৃষি, যন্ত্রপাতি, রেল-ইঞ্জিন, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য তৈয়ারি, মাংস সংরক্ষণ, গম পেষাই এই অঞ্চলের প্রধান শিল্প। এই বন্দর হইতে গম, মাংস, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হয়।

সানফ্রান্সিসকো (San Fransisco) : যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকার স্যাক্রামেন্টো ও স্যান জোয়াকুইম নদীর মিলিত স্রোতের মোহনায় "স্বর্ণ দ্বার" (Golden Gate) নামক প্রবেশ পথের দক্ষিণ তীরে এই বন্দর অবস্থিত। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের সর্বপ্রধান রেলকেন্দ্র বন্দর ও পোতাশ্রয়। উর্বর ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকা এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে পূর্ব এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ার সহিত বাণিজ্যের ইহা প্রধান কেন্দ্র। গম, নানাবিধ ফল, কাষ্ঠ, খনিজ তেল, স্বর্ণ এই বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি হয় এবং চা, চিনি, নারিকেলের শাঁস, রেশম প্রভৃতি আমদানি হয়।

লস এঞ্জেলস (Los Angeles) : যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগর উপকূল হইতে প্রায় ৩২ কি. মি. অভ্যন্তরে এই বন্দর অবস্থিত। ইহা একটি কৃত্রিম বন্দর। সমুদ্র উপকূলে সানপেড্রো ইহার মূল বন্দর। এই অঞ্চলের ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অতি মনোরম। এখানে হলিউড বিশ্বের চলচ্চিত্র শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। খনিজ তেল, খনিজ তেলজাত দ্রব্য ও নানাবিধ ফল এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য।

[কানাডা (Canada)] মন্ট্রিল (Montreal) : সেন্ট লরেন্স নদীর মোহনা হইতে প্রায় ১,৫০০ কি. মি. উর্ধ্বদিকে কানাডার দক্ষিণ-পূর্বে সেন্ট লরেন্স ও ওটাওয়া নদীর মিলনস্থলে দেশের অভ্যন্তরে এই শহর ও বন্দরটি অবস্থিত। সমুদ্রগামী জাহাজ আটলান্টিক হইতে এই বন্দর পর্যন্ত অনায়াসে আসিতে পারে। ইহার পোতাশ্রয়টিও বিশেষ উন্নত। এই বন্দর জলপথে সেন্ট লরেন্স সি-ওয়ে (St. Lawrence Seaway) নামক খাল দ্বারা অন্টারিও হ্রদের সহিত এবং হাডসন রিসেলু নদীপথে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের সহিত যুক্ত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত ইহার রেল-সড়ক যোগাযোগ রহিয়াছে। কৃষি ও শিল্প সমৃদ্ধ সেন্ট লরেন্স ও ওটাওয়া নদীর উপত্যকা এই বন্দরের পশ্চাদভূমি। শীতকালে প্রায় পাঁচ মাস এই অঞ্চল বরফাচ্ছন্ন থাকায় নদীপথে বন্দরের সহিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। এই বন্দরের মাধ্যমে গম, কাষ্ঠমণ্ড, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট, তাম্র, নিকেল প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, চা, কফি, চিনি প্রধান।

ভ্যাঙ্কুভার (Vancouver) : কানাডার পশ্চিম উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ব্রিটিশ কলম্বিয়া রাজ্যে ফ্রেসার নদীর মোহনায় অবস্থিত ভ্যাঙ্কুভার এই দেশের

উল্লেখযোগ্য শহর ও বন্দর। ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক ও ক্যানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথের ইহা প্রান্তীয় কেন্দ্র। কানাডার প্রেইরি অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি এবং বন্দর সন্নিহিত অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ, ধাতু নিষ্কাশন, কাগজ, কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্পের সমাবেশ এই বন্দরের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। এই বন্দরের মাধ্যমে চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সহিত সারা বৎসর কানাডার বাণিজ্য চলে। কাষ্ঠ, কাষ্ঠমণ্ড, গম, তাম্র, সীসা, দস্তা, মৎস্য প্রভৃতি এই বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি হয় এবং নানাবিধ শিল্প দ্রব্য, পশমজাত দ্রব্য, চিনি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানি হয়।

[**দক্ষিণ আমেরিকা (South America)**] **রিও-ডি-জেনিরো (Rio-de-geneiro)**: ব্রেজিলের পূর্বপ্রান্তে আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ইহা এই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। মিণাস গেরায়েস, সাওপাওলো, পারানা প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। রবার, কফি, চিনি, কোকো, তামাক, চর্ম, লৌহ-আকরিক প্রভৃতি এই বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি হয়। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে আছে কয়লা, যন্ত্রপাতি, কার্পাস বস্ত্র, খাদ্যশস্য প্রভৃতি।

বুয়েনস আয়ার্স (Buenos Aires): আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে লা-প্লাণ্টা নদীর মোহনায় অবস্থিত ইহা আর্জেণ্টিনার রাজধানী ও প্রধান বন্দর। আর্জেণ্টিনার কৃষিপ্রধান অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। ইহার মাধ্যমে গম, যব, ভুট্টা, পশম, মাংস, চামড়া, তিসি রপ্তানি করা হয় এবং কয়লা, কার্পাস-বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, খনিজ তেল প্রভৃতি প্রধান আমদানি করা হয়।

ভ্যালপ্যারাইসো (Valpariso): প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ইহা চিলির প্রধান বন্দর। সমগ্র চিলি ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। রেলপথ দ্বারা ইহা বুয়েনস আয়ার্সের সহিত যুক্ত। ইহার মাধ্যমে নাইট্রেট, তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, পশম, কাষ্ঠ, গম ইত্যাদি রপ্তানি হয় এবং নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি হয়।

[**আফ্রিকা (Africa)**] **আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandria)**: নীলনদের মোহনায় অবস্থিত ইহা মিশরের শ্রেষ্ঠ বন্দর। সমগ্র নীল উপত্যকা ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। রেলপথ দ্বারা ইহা দেশের রাজধানী কায়রোর সহিত যুক্ত। ইহার মাধ্যমে প্রধানত তুলা ও চাউল রপ্তানি করা হয়। কয়লা, গম, কাষ্ঠ, তামাক, নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ইহার প্রধান আমদানি দ্রব্য।

ডারবান (Durban): দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলনের অন্তর্গত নাটাল রাজ্যের ইহা বৃহত্তম শহর ও বন্দর। রেলপথে ইহা কয়লা খনি অঞ্চল নিউ ক্যাসল, স্বর্ণ ও তাম্রখনি অঞ্চল জোহানেসবার্গ প্রভৃতি স্থানের সহিত যুক্ত। কয়লা, তাম্র, স্বর্ণ, গম, ভুট্টা, পশম, চর্ম ইত্যাদি এই বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি হইয়া থাকে। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রধান। সমুদ্রগামী জাহাজগুলি এখান হইতে কয়লা সংগ্রহ করে।

কায়রো (Cairo): নীলনদের তীরে অবস্থিত কায়রো মিশরের রাজধানী ও আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ শহর। ইহা একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে কায়রো বিখ্যাত।

[এশিয়া (Asia)] করাচি (Karachi): আরব সাগরের তীরে সিন্দুনদের মোহনা হইতে প্রায় ১৬০ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত করাচি পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। জেটি, ডক ও আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থা সমন্বিত ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর হইলেও ইহার পোতাশ্রয়টি কৃত্রিম। সমগ্র পাকিস্তান, আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান ইহার পশ্চাদ্ভূমি। গম, যব, তুলা, তৈলবীজ, চর্ম ও পশম ইহার রপ্তানি দ্রব্য এবং কার্পাস বস্ত্র, চিনি, খনিজ দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ইহার প্রধান আমদানি দ্রব্য। পাকিস্তানের বহির্বাণিজ্যের ইহাই একমাত্র বন্দর।

কলম্বো (Colombo): শ্রীলংকার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ভারত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত কলম্বো এই দেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। সুয়েজ পথে পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াগামী সকল জাহাজ এই বন্দরে কয়লা সংগ্রহ করে। সমগ্র শ্রীলংকা ইহার পশ্চাদ্ভূমি। ইহা পুনঃ রপ্তানি বন্দর হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ। নারিকেল, দড়ি, তেল, ছোবড়া, চা, রবার, মশলা ইত্যাদি এই বন্দর মারফত রপ্তানি করা হয় এবং কয়লা, খনিজ তেল, চাউল, কার্পাস বস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানি করা হয়।

চট্টগ্রাম (Chittagong): বঙ্গোপসাগর উপকূলে বাংলাদেশের কর্ণফুলি নদীর মোহনা হইতে প্রায় ১৬ কি. মি. অভ্যন্তরে এই বন্দর অবস্থিত। বাংলাদেশের ইহা শ্রেষ্ঠ বন্দর। ঘনবসতিপূর্ণ কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্ভূমি। পাট এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে চা, তামাক, সুপারি, মাছ উল্লেখযোগ্য। কয়লা, কার্পাস বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, লৌহ, ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য আমদানি দ্রব্য।

রেঙ্গুন (Rangoon): ইরাবতী নদীর মোহনায় ব-দ্বীপে ইহারই শাখা রেঙ্গুন নদীর তীরে অবস্থিত রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। ইরাবতী ও চিন্দুইন উপত্যকা ইহার পশ্চাদ্ভূমি এবং বন্দরটি রেলপথ ও জলপথ দ্বারা পশ্চাদ্ভূমির সহিত যুক্ত। এই বন্দরের মাধ্যমে চাউল, কাষ্ঠ, খনিজ তেল ও তামাক রপ্তানি করা হয় এবং নানাবিধ শিল্পদ্রব্য, বিলাস সামগ্রী, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি আমদানি করা হয়।

সিঙ্গাপুর (Singapore): মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের সংযোগস্থলে মালাক্কা প্রণালীতে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে সিঙ্গাপুর বন্দর ও পোতাশ্রয় অবস্থিত। ইহা প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ পুনঃ রপ্তানি বন্দর ও আন্তর্জাতিক বিমান ঘাঁটি। এই বন্দরের সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে বৃটেনের একটি নৌঘাঁটি আছে। সমগ্র মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ইহার পশ্চাদ্ভূমি। চাউল, চা, নারিকেল, রাবার, কাষ্ঠ, টিন, টাংস্টেন প্রভৃতি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে খনিজ তৈল, তামাক, কার্পাস বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্য প্রধান।

হংকং (Honkong) : চীনের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সি-কিয়াং নদীর মোহনায় একটি দ্বীপে এই বন্দর অবস্থিত। চীনের মূল-ভূখণ্ডের সহিত ইহা রেলপথ ও নদীপথে যুক্ত। এখানে একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় ও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র আছে। সমগ্র দক্ষিণ চীন ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। চাউল, চিনি, চা, আফিম, কার্পাস, রেশম ইত্যাদি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে গম, কয়লা, কার্পাস বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, ধাতব দ্রব্য ইত্যাদি প্রধান।

সাংহাই (Sanghai): চীনের পূর্ব উপকূলে ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর মোহনায় সমুদ্র হইতে ৭৩ কি. মি. অভ্যন্তরে অবস্থিত সাংহাই এই দেশের অন্যতম বৃহত্তম শহর ও বন্দর। এখানে চীনের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র অবস্থিত। ইয়াং-সি-কিয়াং অববাহিকার বিস্তীর্ণ কৃষি ও শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি। চা, কার্পাস, কার্পাসজাত দ্রব্য, চাউল, রেশম, সয়াবীন প্রভৃতি এই বন্দরের রপ্তানি দ্রব্য।

ইয়োকোহামা (Yokohama): জাপানের হনসু দ্বীপের পূর্ব উপকূলে টোকিও উপসাগরের তীরে এই দেশের প্রসিদ্ধ বন্দর ও পোতাশ্রয় ইয়াকোহামা অবস্থিত। রেলপথ দ্বারা ইহা জনবহুল কৃষি ও শিল্প সমৃদ্ধ কোয়াণ্টো সমভূমির সহিত যুক্ত। এই পশ্চাদ্‌ভূমি লৌহ—ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, কাগজ প্রভৃতি শিল্পে উন্নত। রেশম, কৃত্রিম রেশম, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, কাঁচ, চা, নানা প্রকার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ইহার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এবং লৌহ-আকরিক, খনিজ তেল, চিনি, কার্পাস, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি প্রধান আমদানি দ্রব্য। ইহা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী টোকিও-র বহির্বন্দর।

চিত্র ১৫.৪ : টোকিও

ওসাকা (Osaka) : ওসাকা উপসাগরের তীরে অবস্থিত ইহা জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর ও কিয়োটোর বহির্বন্দর। এই বন্দরাঞ্চলে লৌহ ইস্পাত, কার্পাস, কাগজ, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে কার্পাস শিল্পই প্রধান। এই কারণে ইহাকে জাপানের ম্যাঞ্চেস্টার বলা হয়। এই বন্দর মারফৎ কার্পাস বস্ত্র, কাগজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি রপ্তানি করা হয়।

[ওশিয়ানিয়া (Oceania)] সিডনি (Sydney) : অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্বাংশে নিউ সাউথ ওয়েলস্ এর পূর্ব উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রদেশের রাজধানী ও অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম বন্দর। পোর্ট জ্যাকসন ইহার সংলগ্ন বন্দর ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। ইহার পশ্চাদ্ভূমি সমগ্র দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার গম ও পশুচারণ ক্ষেত্র লইয়া গঠিত এবং বন্দরের সহিত ইহা রেলপথ দ্বারা যুক্ত। অস্ট্রেলিয়ার বহির্বাণিজ্যের 40% এই বন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পশম, দুগ্ধজাত দ্রব্য, গম, মাংস, চর্ম, কয়লা, স্বর্ণ, বক্সাইট প্রভৃতি রপ্তানি পণ্য। আমদানি পণ্যের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যই প্রধান।

মেলবোর্ণ (Melbourne) : অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া প্রদেশে পোর্ট-ফিলিপ উপসাগরের তীরে অবস্থিত সুন্দর পোতাশ্রয়যুক্ত এই বন্দর ও শিল্পনগরী। বস্ত্র শিল্পের জন্য ইহা বিখ্যাত। ব্যালারাট বা বেণ্ডিগো স্বর্ণ-খনি এবং মারে-ডার্লিং অববাহিকার গম ও পশুচারণ ক্ষেত্র ইহার পশ্চাদ্ভূমির অন্তর্গত। খনিজ দ্রব্য, গম, ফল, মাংস, পশম ইহার প্রধান রপ্তানি পণ্য এবং আমদানি পণ্যের মধ্যে যন্ত্রপাতি ও নানা প্রকার শিল্প দ্রব্যই প্রধান।

[প্রশ্ন : নিম্নলিখিত বন্দর ও শহরগুলি কোথায় অবস্থিত এবং কি জন্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কর।

লণ্ডন, গ্লাসগো, রটারডাম, আন্তোয়ার্প, মার্সেই, হামবুর্গ, মস্কো, লেনিনগ্রাদ, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, চিকাগো, সানফ্রান্সিস্কো, মন্ট্রিল, ভ্যালপ্যারাইসো, করাচী, রেঙ্গুন, হংকং, সিঙ্গাপুর, সাংহাই, ইয়োকোহামা, মেলবোর্ণ।]

অনুশীলনী ১৫

১। অবস্থান ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব নির্দেশ করিয়া টীকা লিখ : (বন্দরের ক্ষেত্রে আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যের উল্লেখ কর) লণ্ডন, লিভারপুল, গ্লাসগো, হামবুর্গ, প্যারিস, মার্সেই, মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ভ্লাডিভোস্টক, হংকং, সাংহাই, সিঙ্গাপুর, টোকিও, ইয়োকোহামা, আলেকজান্দ্রিয়া, সৈয়দ বন্দর, কায়রো, নিউ ইয়র্ক, বোস্টন, সানফ্রান্সিস্কো, ওয়াশিংটন, সিডনি, মেলবোর্ন, করাচি, মনট্রিল, রিও-ডি-জেনিরো, ট্রান্সভাল, ব্রাসিলিয়া, ভ্যালপ্যারাইসো, আবাদান, চট্টগ্রাম, জাকার্তা, কলম্বো, জিব্রাল্টার, আমষ্টারডাম, এন্টোয়ার্প।

[Write short notes on the following pointing out the location and commercial importance :

(Mention exports and imports in case of ports)

London, Liverpool, Glasgow, Hamburg, Paris, Marseilles, Moscow, Leningrad, Vladivostak, Hongkong, Sanghai, Singapore, Tokyo, Yeokohama, Alexandria, Port Said, Cairo, New York, Bostan, Sanfransisco, Washington, Sydney, Melbourne, Karachi, Montreal, Rio-de-Jeneiro, Transval, Brailia, Valparaiso, Abadan, Chittagong, Jakarta, Colombo, Gibralter, Amsterdam, Antwerp]

১৬ যন্ত্রশিল্প বা সর্জন শিল্প
(Manufacturing Industries)

পশুশিকার ও পশুপালন-নির্ভর আদিম সমাজ ব্যবস্থা হইতে বর্তমানের যন্ত্রশিল্প-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ মানুষের এক নিরলস শক্তিসাধনার ফল। আর এই শক্তিসাধনা, শক্তি লাভ ও শক্তির সৃজনমূলক সার্থক প্রয়োগের উদ্দেশ্য মানুষের বিভিন্নমুখী অভাব মোচন করা, জীবনকে সহজ ও সুন্দর করা। আদি সমাজে জনসংখ্যা ছিল সামান্য আর তাহাদের চাহিদাও ছিল সীমিত। প্রকৃতির উপর মানুষ ছিল নির্ভরশীল। প্রকৃতি হইতেই প্রত্যক্ষভাবে মানুষ তাহার জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করিত। এই যুগে জীবনসংগ্রামে মানুষের প্রধান অবলম্বন ছিল প্রাণিজ শক্তি (Animate energy) অর্থাৎ আপন দৈহিক শক্তি ও গৃহপালিত পশুশক্তি। কিন্তু এই প্রাণিজ শক্তি ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির চাহিদা পূরণের উপযোগী উৎপাদনের পক্ষে ছিল অপ্রতুল। ফলে মানুষের সমাজে শুরু হইয়াছিল জড়ের সাধনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডে জেমস্ ওয়াটের প্রচেষ্টায় প্রথম আবিষ্কৃত হইল বাষ্প শক্তি (Steam Power)। জড়শক্তি (Inanimate Energy) বিকাশের ইহাই সূচনা। রেলগাড়ি চালনায় ও বয়ন শিল্পে ইহার ব্যবহার শিল্পক্ষেত্রে যে বিপ্লবের (Industrial Revolution) সূচনা করে উহাই নব নব পর্যায়ে মানুষের সমাজে উৎপাদন ধারাকে বহুল ও ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছে। বাষ্পশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি ও আণবিক শক্তি পর্যায়ক্রমে মানুষের শিল্প প্রেরণার উৎস আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার মূল চালিকা শক্তি (Motive Power)। আগামীতে সৌর শক্তির ব্যাপক প্রয়োগ-প্রচেষ্টা সফল হইলে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে সম্ভবত ইহাই হইবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

জড়শক্তির আবিষ্কারের ফলে একদিকে গড়িয়া উঠিল শিল্পকারখানা, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, অপরদিকে সৃষ্টি হইল আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা ও সংগঠিত বাজার। শিল্পকারখানার মাধ্যমে বনজ, কৃষিজ, খনিজ প্রভৃতি নানাবিধ প্রাথমিক উৎপাদনের ফসলকে মানুষ প্রয়োজন অনুসারে নানা বস্তুতে রূপান্তরিত করিয়া তাহার বহুমুখী অভাব পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করিল। লৌহ আকরিক হইতে ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি, তুলা ও পশম হইতে পোশাক-পরিচ্ছদ, ইক্ষু হইতে চিনি, চর্ম হইতে জুতা ইত্যাদি যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমেই উৎপাদিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে প্রত্যক্ষভাবে সংগৃহীত বস্তু-সামগ্রীকে প্রাথমিক উৎপাদন (Primary Production) বলা হয়, যেমন ধান, কাষ্ঠ, মৎস্য, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি। যে উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রাথমিক উৎপন্ন দ্রব্যকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তর ঘটাইয়া নূতন উপযোগ সৃষ্টি করা হয় তাহাকে শ্রম শিল্প (Manufacturing Industries) বলে।

শ্রমশিল্পকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায় :—**ভারী বা গুরু শিল্প (Heavy Industries)**; যেমন, লৌহ ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রাসায়নিক, জাহাজ নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি। (২) **লঘু শিল্প (Light Industries)**; যেমন, বস্ত্র বয়ন, ছোট যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদি তৈয়ারি শিল্প।

শ্রমশিল্প গঠনের উপযোগী উপাদান (Factors necessary for the development of Industries)—পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমশিল্পের বিকাশ ও উন্নতি সমভাবে হয় নাই। কোন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকারখানার প্রভূত সমাবেশ ও উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। কোন অঞ্চলে আবার আদৌ কোন শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠে নাই। ইহার কারণ শ্রমশিল্প সংগঠনে কয়েকটি মৌলিক অনুকূল উপাদানের একত্র সমাবেশ অত্যাবশ্যক। এই সকল উপাদানের অন্ততপক্ষে কয়েকটির সমাবেশ ব্যতিরেকে কোথাও কোন শ্রমশিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে। শিল্প গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে প্রধান তিনটি বিভাগ ও উহাদের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

(ক) **ভৌগোলিক উপাদানসমূহ**—(১) কাঁচামাল, (২) শক্তিসম্পদ, (৩) জলবায়ু। (খ) **অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ**—(৪) চাহিদা ও বাজার, (৫) শ্রমশক্তি, (৬) পরিবহণ, (৭) মূলধন, (৮) প্রাথমিক অবস্থানের আকর্ষণ। (গ) **রাজনৈতিক উপাদানসমূহ**—(৯) সরকারী নীতি। নিম্নে এই উপাদান-গুলির বিশদ আলোচনা করা হইল।

(১) **কাঁচামাল (Raw materials)**: শ্রমশিল্পের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন কাঁচামাল। অরণ্য, কৃষি, খনি প্রভৃতি ক্ষেত্র হইতে আহৃত যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষ কলকারখানার মাধ্যমে ব্যবহারোপযোগী নানাবিধ বস্তুতে রূপান্তরিত করে উহাদিগকে শিল্পের কাঁচামাল বলে। যেমন—ইক্ষু, তূলা, পশম, কাষ্ঠ, রবার, লৌহ আকরিক ইত্যাদি। কাঁচামালের রূপগত পরিবর্তনের সহিত ইহার আয়তন ও ওজন হ্রাস পায়। উৎপাদিত নূতন দ্রব্যকে শিল্পজাত দ্রব্য বলা হয়। শ্রমশিল্পে কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক বলিয়া যে সকল স্থানে শিল্পের কাঁচামাল সুলভ ঐ সকল স্থানেই শিল্প গড়িয়া উঠে। ভারতে কলিকাতার পাটশিল্প, উত্তরপ্রদেশের শর্করাশিল্প, আমেরিকার পিট্সবার্গ ও বার্মিংহামের লৌহ ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি কাঁচামালের সুলভ যোগানের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

(২) **শক্তিসম্পদ (Motive Power)**: আধুনিক শ্রমশিল্প জড়শক্তি-নির্ভর। জড়শক্তির উৎস কয়লা, খনিজ তেল, জলশক্তি, প্রাকৃতিক গ্যাস, আণবিক শক্তি ইত্যাদির সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তি ব্যতিরেকে কোন কলকারখানা চালনা করা সম্ভব নহে। সুতরাং শক্তির সুলভ সরবরাহকে কেন্দ্র করিয়া শিল্পকারখানা গড়িয়া তোলা হয়। তারের সাহায্যে বিদ্যুৎ শক্তি অধিক দূরে লইয়া যাওয়া ব্যয়সাপেক্ষ। এই কারণে শক্তি সম্পদের নিকটবর্তী অঞ্চলেই বিশ্বের উল্লেখযোগ্য শিল্পক্ষেত্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের লৌহ-ইস্পাত শিল্প, আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত শিল্প, মোটর শিল্প, কাগজ শিল্প. সোভিয়েত ইউনিয়নের বয়নশিল্প, ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানকালে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও আণবিক শক্তি পরিচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি দেশের যে কোন অঞ্চলে স্থাপন করা সম্ভব বলিয়া উহার সাহায্যে শিল্প-ক্ষেত্রের বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হইয়াছে।

(৩) **জলবায়ু (Climate)**: জলবায়ু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যন্ত্রশিল্প সংগঠনে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। বস্ত্রশিল্পের পক্ষে আর্দ্র জলবায়ু, ময়দা শিল্পের পক্ষে শুষ্ক জলবায়ু বা সিনেমা শিল্পের পক্ষে রৌদ্রকরোজ্জ্বল জলবায়ু আবশ্যক। জলবায়ুর ইহা প্রত্যক্ষ প্রভাব। কিন্তু বর্তমান যুগে কৃত্রিম পদ্ধতিতে কারখানার অভ্যন্তরস্থ আবহাওয়ার পরিবর্তন করা সম্ভব। এই কারণে শিল্প গঠনে জলবায়ুর প্রত্যক্ষ প্রভাব অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। পরোক্ষভাবে শ্রমিকের কর্মদক্ষতার উপর জলবায়ুর যে প্রভাব বা মানুষের বিভিন্ন চাহিদার উপর জলবায়ুর যে প্রভাব রহিয়াছে উহার পরিবর্তন সম্ভব নহে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শ্রমিকের অধিক কর্মক্ষমতা বা পশম বস্ত্রের সাধারণ চাহিদা, ক্রান্তীয় অঞ্চলে অধিবাসিগণের শ্রম-বিমুখতা বা হাল্কা সুতী বস্ত্রের সাধারণ চাহিদা প্রকৃতই জলবায়ুর প্রভাব দ্বারা সৃষ্ট। ভারত, জাভা, কিউবা অঞ্চলে শর্করা শিল্পের উন্নতি ইক্ষু উৎপাদনের উপযোগী উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর ফল। অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকা অঞ্চলে পশমপ্রদায়ী মেষ পালন বা সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড অঞ্চলে নরম কাষ্ঠ হইতে কাগজ শিল্পের সৃষ্টি একান্তই নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর আনুকূল্যেই সম্ভব হইয়াছে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে জলবায়ুর প্রত্যক্ষ প্রভাব শিল্প ক্ষেত্রে অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু ইহার পরোক্ষ প্রভাব বিশেষভাবেই বিদ্যমান।

(৪) **চাহিদা ও বাজার (Demand and Market)**: মানুষের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যেই শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন। সুতরাং ব্যাপক চাহিদা আছে এমন জিনিসের উৎপাদনই সমাজে বেশি হয়। উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে জনসংখ্যার উপর ও তাহাদের জীবনযাত্রার মানের উপর। ঘনবসতিপূর্ণ সমৃদ্ধ অঞ্চলে মানুষের চাহিদাকে কেন্দ্র করিয়া সংগঠিত ও উন্নত বাজার গড়িয়া উঠে এবং এই বাজারের সন্নিহিত অঞ্চলে বিক্রয়ের সুবিধার জন্য শিল্পকারখানার সমাবেশ ঘটিয়া থাকে। ইহার কারণ শিল্প কারখানা হইতে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজার বা চাহিদা ক্ষেত্রে পৌঁছাইবার খরচ যত কম পড়িবে পণ্যের বিক্রয়মূল্য ততই কম হইবে এবং উহার চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ বা আমেরিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শ্রমশিল্পের প্রসার প্রধানত জনাকীর্ণ স্থানীয় বাজারকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। পচনশীল বা স্বল্পস্থায়ী পণ্যসামগ্রী যেমন দুধ, রুটি, বরফ ইত্যাদির শিল্পকারখানা স্বল্পপরিসর বাজারকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। স্থায়ী দ্রব্যের বাজার বহু বিস্তৃত এমনকি আন্তর্জাতিক পরিধিসম্পন্ন হয়। সুতরাং দেশের মধ্যে জনবহুল

অঞ্চলে বাজারের সান্নিধ্যে যেমন বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠে তেমনি বিদেশে রপ্তানি-যোগ্য পণ্যের শিল্প কারখানা আবার বন্দরের নিকট স্থাপিত হয়। কলিকাতায় পাটশিল্প, বৃটিশ যুক্তরাজ্যে যন্ত্রশিপ বিদেশের বাজারকে লক্ষ্য করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৫) **শ্রমশক্তি (Labour)**: শ্রমশিল্পে যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার হইলেও যন্ত্র পরিচালনা ও আনুষঙ্গিক কার্যের জন্য বহু যন্ত্রবিদ, কারিগর ও শ্রমিক নিয়োগ আবশ্যক হয়। সুলভ ও পর্যাপ্ত শ্রমিকের যোগানের উপর শিল্পের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। জনবহুল দেশে স্বল্প মজুরিতে যথেষ্ট শ্রমিকের যোগান পাওয়া যায় বলিয়া শ্রমিক-নির্ভর বহু শিল্প ঐ সকল দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানকালে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে স্বয়ংক্রিয় বহু যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হওয়ার ফলে শ্রামক নিয়োগের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রম শক্তির অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

(৬) **পরিবহণ (Transport)**: শ্রমশিল্প স্থাপন ও স্থানবিশেষে কোন একটি শিল্পের একত্র সমাবেশের সহিত পরিবহণের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কাঁচামাল শিল্পক্ষেত্রে বহন করিয়া আনা ও শিল্পপণ্য বাজারে প্রেরণ করা উভয়ই পরিবহণের উপর নির্ভর করে। প্রাথমিকভাবে পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত না হইলে দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে পণ্যাদি পরিবহণ করা সম্ভব হয় না। আবার উৎপন্ন পণ্যের মূল্য নির্ধারণে কাঁচামালের ও উৎপাদিত পণ্যের পরিবহণ ব্যয় যুক্ত হয়। এই কারণে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিবহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরিবহণ যে সকল অঞ্চলে উন্নত ও সুলভ সে অঞ্চলে যেমন বাজার গড়িয়া উঠে তেমনি বাজারকে কেন্দ্র করিয়া আবার শিল্পকারখানার সমাবেশ ঘটে। শিল্প স্থাপন ও শিল্পের একদেশীভবনে কাঁচামাল, শক্তি সম্পদ ও পরিবহণ এই তিনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অনুকূল উপাদান। ইহাদের মধ্যে পরিবহণ ব্যয়ই অনেক ক্ষেত্রে মূল উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়। ডঃ ওয়েবারের শিল্প কেন্দ্র স্থাপনের তত্ত্বটি মূলত পরিবহণ ব্যয়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত। রেলপথ, সড়কপথ, নদী-খাল-সমুদ্র পথ ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নত ও সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থা পশ্চিম জার্মানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশকে শিল্পে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

(৭) **মূলধন (Capital)**: শিল্পকারখানা স্থাপনে প্রভূত মূলধনের প্রয়োজন। কারখানা নির্মাণ, যন্ত্রস্থাপন, কাঁচামাল সংগ্রহ, মজুরি প্রদান ইত্যাদির জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। মূলধনের সংগঠন জনসাধারণের আয় ও সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। সমৃদ্ধ দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ তথা মূলধনের পরিমাণ বেশি বলিয়া দরিদ্র দেশের তুলনায় ঐ সকল দেশে শিল্পের প্রসার বেশি লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ শিল্পকারখানা ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি দেশের মধ্যেই অবস্থিত দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক দেশে শিল্প স্থাপন রাষ্ট্রের নিজস্ব নীতি ও তহবিল হইতে বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে বলিয়া দ্রুত শিল্পোন্নতি ঘটে।

(৮) **প্রাথমিক অবস্থানের আকর্ষণ (Attraction of the Early Start)**—শিল্পস্থাপনের পক্ষে অনুকূল পরিবেশের অভাব সত্ত্বেও যদি কোন অঞ্চলে কোন একটি শিল্পকারখানা গড়িয়া উঠে তখন ক্রমে ক্রমে ঐ শিল্পের বা আনুষঙ্গিক শিল্পের আরও কারখানা ঐ অঞ্চলে গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। ইহার কারণ শিল্প স্থাপনের প্রাথমিক অসুবিধাগুলি যেমন শক্তিসম্পদের যোগান, শ্রমিকের যোগান, পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রথম শিল্পস্থাপনের সহিতই সহজ ও উন্নত হইতে থাকে। ফলে আরও শিল্পকারখানা ঐ অঞ্চলে আকৃষ্ট হয় ও কালক্রমে অঞ্চলটি একটি শিল্পাঞ্চলের রূপ পরিগ্রহ করে।

(৯) **সরকারী নীতি (Government Policy)**—দেশে শ্রমশিল্পের প্রসার সরকারী নীতির উপর নির্ভরশীল। দেশে শিল্পস্থাপনের উপযোগী প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকা মানেই শিল্প সমৃদ্ধি বুঝায় না। সরকারী নীতি ও নির্দেশের সহিত ইহার যোগ প্রত্যক্ষ। সরকারী নীতি যদি দেশের শিল্প-নির্ভর অর্থনীতির অনুকূল ও সহায়ক হয় তাহা হইলে দেশে শিল্প কারখানার দ্রুত প্রসার ঘটে এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটে। এই কারণে দেশের অনগ্রসরতা অনেকক্ষেত্রেই সরকারী নীতির প্রতিবন্ধকতার ফল। সরকারী নীতি বলিতে শিল্পস্থাপনে সরকারী পরিকল্পনা, প্রত্যক্ষ উদ্যোগ, লাইসেন্স নীতি, শুল্কনীতি, শিল্পনীতি, শিল্পঋণ নীতি ইত্যাদিকে বুঝায়।

শিল্পের একদেশীভবন ও ওয়েবার তত্ত্ব (Localisation of Industries and Weber Theory)—কোন একটি স্থানে এক জাতীয় শিল্পের অন্তর্গত অধিক সংখ্যক কারখানা বা উহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য শিল্পকারখানার একত্র সমাবেশকে শিল্পের একদেশীভবন বলা হয়। কোন শিল্পের একদেশীভবনের মূলে থাকে ঐ নির্দিষ্ট স্থানে ঐ শিল্প গঠনের উপযোগী উপাদানসমূহের আনুকূল্য। কলিকাতার পাট শিল্প বম্বে-আমেদাবাদে কার্পাস বয়ন শিল্প, আমেরিকার চিকাগো-গ্যারী অঞ্চলে কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাঞ্চেষ্টার অঞ্চলে বয়ন শিল্প ইত্যাদি শিল্পের একদেশীভবনের উদাহরণ। শিল্প গঠনের উপযোগী সকল প্রকার উপাদানসমূহের মধ্যে কয়েকটির একত্র সমাবেশও শিল্পাঞ্চল গঠনে সহায়ক হয়। শিল্প গঠনের অনুকূল মূলে উপাদান বিচারে দীর্ঘকাল যাবৎ নানাবিধ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইলেও জার্মানীর ডঃ ওয়েবার (Dr. Alfred Weber) তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করিয়াছেন—কাঁচামাল, শক্তি ও বাজার। তাঁহার মতে এই তিনটি উপাদানের আনুপাতিক গুরুত্বের উপরই নির্ভর করে শিল্পের অবস্থান। কাঁচামাল কারখানায় বহন করিয়া আনা ও উৎপাদিত পণ্য বাজার জাত করা উভয়ই পরিবহণ ব্যয়সাপেক্ষ। অতএব স্বল্পতম পরিবহণ ব্যয়কেন্দ্রেই শিল্প স্থাপন লাভজনক। কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে আবার শক্তিই প্রধান অবলম্বন, যেমন—অ্যালুমিনিয়াম শিল্প। ইহার অবস্থান-সুলভ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নিকট হওয়াই সর্বাপেক্ষা লাভজনক। এই তত্ত্বটি আলোচনার জন্য ডঃ ওয়েবার কাঁচামালকে

বিশুদ্ধ (রূপান্তরের ফলে যাহার ওজন প্রায় হ্রাস পায় না যেমন, তূলা, পশম, চামড়া) ও অবিশুদ্ধ (রূপান্তরের ফলে যাহার ওজন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় — যেমন লৌহ আকরিক, কয়লা, তাম্র) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ কাঁচামালের ক্ষেত্রে পরিবহণ ব্যয় একই থাকে বলিয়া বাজার, শক্তি কেন্দ্র বা উহার মধ্যবর্তী কোন স্থানে শিল্প স্থাপন করা যায়। অবিশুদ্ধ কাঁচা মালের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ওজনবিশিষ্ট কাঁচামালের কেন্দ্রেই পরিবহণ ব্যয় ন্যূনতম হইবে। ফলে অবিশুদ্ধ কাঁচামাল প্রধান শিল্প কাঁচামাল সরবরাহ কেন্দ্রেই স্থাপন সুবিধাজনক হয়।

[প্রশ্ন : (১) যন্ত্রশিল্প গঠনের মৌল উপাদান কি কি ? (২) যন্ত্র শিল্প গঠনে কাঁচামাল, পরিবহণ ও বাজারের গুরুত্ব বর্ণনা কর। (৩) ওয়েবার তত্ত্ব কি ? শিল্প সংগঠনে ইহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।]

পৃথিবীর প্রধান শিল্পাঞ্চল
(Principal Industrial Regions of the World)

ইংল্যাণ্ডের মাটিতেই প্রথম শিল্প-বিপ্লব ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ১৭৩৯ সালে জেমস ওয়াটের বাষ্প শক্তি (Steam Engine) আবিষ্কারের ফলে জড়শক্তির বিকাশ যেমন শুরু হয় তেমনি শিল্প পরিচালনায় উহার সুষ্ঠু প্রয়োগে পৃথিবীতে নূতন যুগের সূচনা হয়। স্টীভেনসনের বাষ্পীয় শকট অর্থাৎ রেলগাড়ী

চিত্র ১৬.১ : পৃথিবীর প্রধান শিল্পাঞ্চল।

পরিবহণে যুগান্তর আনয়ন করে। হারগ্রীভস্-এর তাঁত, আর্করাইটের কাডিং, ড্রয়িং ও স্পিনিং জেনি এবং কার্টরাইটের পাওয়ারলুম-এর আবিষ্কার বয়ন শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। ইংল্যাণ্ডের সমীপবর্তী পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে ইহার ঢেউ প্রথম লাগে বলিয়া পৃথিবীর প্রথম শিল্পাঞ্চল বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানিকে

ঘিরিয়া গড়িয়া উঠে। আমেরিকা আবিষ্কারের পরে ইউরোপীদের দ্বারা ঐ দেশেও শিল্প প্রসার ঘটে। বর্তমানে পৃথিবীতে পাঁচটি প্রধান শিল্পাঞ্চল দেখা যায়। (ক) পশ্চিম ইউরোপীয় শিল্পাঞ্চল, (খ) উত্তর আমেরিকার মধ্য-পূর্ব শিল্পাঞ্চল, (গ) সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পাঞ্চল, (ঘ) ভারতের শিল্পাঞ্চল ও (ঙ) দূর প্রাচ্যের শিল্পাঞ্চল। এই শিল্পাঞ্চলগুলি উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। দক্ষিণ গোলার্ধে জন-বসতির বিরলতা, শক্তি সম্পদের অভাব, চাহিদা ও বাজারের অসুবিধা ইত্যাদির ফলে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠে নাই। তবে অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা, আফ্রিকার দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন ও অস্ট্রেলিয়ায় নাতি-বৃহৎ তিনটি শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উপরি-উক্ত প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

ক। **পশ্চিম ইউরোপীয় শিল্পাঞ্চল**—এই অঞ্চলটি উত্তর-পশ্চিমে ইংল্যাণ্ডের গ্লাসগো, নরওয়ের বার্জেন, সুইডেনের স্টকহোম, পোল্যাণ্ডের ডানজিগ, হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট, ইতালির ফ্লোরেন্স, স্পেনের বার্সিলোনা ও বিলবাও এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের বেলফাস্ট দ্বারা আবদ্ধ একটি বিস্তৃত শিল্পক্ষেত্র। এই শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে সবুজ কৃষি ক্ষেত্রও দেখা যায়। এই অঞ্চলের অসংখ্য শিল্পপীঠের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল—(ক) বৃটিশ যুক্তরাজ্যের বৃহত্তর লণ্ডন ও স্কটিশ নিম্নভূমির শিল্পক্ষেত্র (খ) ফ্রান্সের বৃহত্তর প্যারী-শিল্পক্ষেত্র (গ) পশ্চিম জার্মানির রুঢ় শিল্পক্ষেত্র এবং (ঘ) বেলজিয়ামের সেম্বার—মিউজ শিল্পক্ষেত্র।

পশ্চিম ইউরোপে এই বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিবার মূলে রহিয়াছে—(১) ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রেরণা। (২) বৃটিশ যুক্তরাজ্য ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম প্রভৃতি অঞ্চলের কয়লা ও ইহার সন্নিহিত লোহ আকরিক। (৩) প্রচুর শ্রমশক্তি ও কারিগরী দক্ষতা। (৪) প্রাক্তন সামন্ত শ্রেণীর প্রচুর মূলধন। (৫) রেলপথ, সড়কপথ ও নদী খালপথের সমন্বয়ে গড়িয়া তোলা উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। ফ্রান্স ও জার্মানিতে নদী ও খালপথের যোগাযোগে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আভ্যন্তরীণ জলপথের সৃষ্টি হইয়াছে। (৬) জনাকীর্ণ ব্যাপক আভ্যন্তরীণ বাজার এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার উপনিবেশের বিস্তৃত বৈদেশিক বাজার। (৭) নাতিশীতোষ্ণ মনোরম জলবায়ু এবং ইউরোপীয় জাতিসমূহের উদ্যোগী মনোভাব।

বৃটিশ যুক্তরাজ্যে লোহ ইস্পাত শিল্প ও ইহার উপর নির্ভরশীল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের ক্লাইড অববাহিকা, পূর্ব উপকূলের টী-টাইন-উইয়ার মোহনা ক্ষেত্র, বৃহত্তর লণ্ডন, ল্যাঙ্কাশায়ার, ওয়েলস্ প্রভৃতি লোহ ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম, রেল ইঞ্জিন, মোটর, কার্পাস ও পশম বস্ত্র বয়ন হইতে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

ফ্রান্সের বৃহত্তর প্যারীর অন্তর্ভুক্ত সীন নদীর উভয় তীরে মোটর তৈয়ারি, তেলশোধনাগার, সিমেন্ট, সার, রবার ও নানারকম সৌখিন দ্রব্যের প্রচুর শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

পশ্চিম জার্মানির রূঢ় অববাহিকা বিশ্বের অন্যতম প্রধান ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত। কয়লা খনি অঞ্চলের কেন্দ্রে আভ্যন্তরীণ জলপথ ও রেলপথের সাহায্যে বহিয়া আনা লৌহ আকরিকের সাহায্যে ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইস্পাত শিল্প ব্যতীত এই অঞ্চলে ইঞ্জিনিয়ারিং, বস্ত্র বয়ন, রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্পেরও সমাবেশ ঘটিয়াছে।

সেম্বার-মিউজ শিল্পক্ষেত্রটি বেলজিয়ামে অবস্থিত। কয়লা ও লৌহ আকরিকের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে এই অঞ্চলে সুলভে ইস্পাত ও ভারী যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের পশম বয়ন শিল্পও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের ইহা একটি অন্যতম প্রধান শিল্পক্ষেত্র।

পশ্চিম ইউরোপীয় শিল্পক্ষেত্রগুলি ব্যতীত দক্ষিণ ও উত্তর ইউরোপে কয়লার অভাবে জলবিদ্যুতের সাহায্যে নরওয়ে, সুইডেন, হাঙ্গেরী, ইতালি, স্পেন, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে ঘড়ি তৈয়ারি, পশম বস্ত্র বয়ন, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈয়ারি, কাগজ প্রস্তুত প্রভৃতি লঘু শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে।

খ। উত্তর আমেরিকার মধ্য-পূর্ব শিল্পাঞ্চল—আমেরিকার এই বিখ্যাত শিল্পাঞ্চলটি কানাডার দক্ষিণ পূর্বাংশ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাংশ লইয়া গঠিত। এই বিস্তৃত শিল্পাঞ্চলকে প্রধান তিনটি অংশে ভাগ করা যায়: (১) দক্ষিণ-পূর্ব কানাডার অন্তর্গত অণ্টেরিও—সেণ্ট লরেন্স নিম্নভূমির শিল্পক্ষেত্র, (২) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব শিল্পক্ষেত্র এবং (৩) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে পিডমণ্ট শিল্পক্ষেত্র। বর্তমান পৃথিবীতে উত্তর আমেরিকার এই শিল্পাঞ্চলটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই শিল্পাঞ্চলের উদ্ভব ও বিকাশে সহায়ক উপাদানগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(১) **কাঁচামালের সুবিধা**—উত্তর আমেরিকার এই অঞ্চলে কয়লা, লৌহ আকরিক, তাম্র, খনিজ তেল প্রভৃতি খনিজ সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে। অধিকন্তু উত্তর হইতে দক্ষিণে জলবায়ুর তারতম্যের জন্য বিবিধ প্রকার শিল্প ফসল যেমন তুলা, তামাক উৎপাদনের সুবিধা। (২) **শক্তি সম্পদের সুবিধা**—উত্তরাঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বাভাবিক সুবিধা। (৩) **জলবায়ুর আনুকুল্য**—এই অঞ্চলের জলবায়ু শুধুমাত্র উন্নত কৃষির পক্ষেই অনুকূল নহে। ইহা শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও দীর্ঘ সময় পরিশ্রমের সহায়ক। (৪) **জনসংখ্যা ও শ্রমিকের যোগান ও চাহিদা**—এই অঞ্চলে ঘনবসতি গড়িয়া উঠায় শ্রমিকের প্রাচুর্য এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সুবিধা রহিয়াছে। (৫) **যোগাযোগ ব্যবস্থা**—পঞ্চ হ্রদ, সেণ্ট লরেন্স নদী ও অসংখ্য খালপথের সমন্বয়ে এবং রেলসড়ক পথের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি শিল্প প্রসারের সহায়ক। (৬) **বন্দরের সুবিধা**—আমেরিকার এই উপকূল বিশেষরূপে ভগ্ন হওয়ায় প্রচুর বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই উপকূল ইউরোপের দিকে মুখ করিয়া থাকায় আটলাণ্টিকের অপর পারে ইউরোপের বাজারে পণ্য রপ্তানির সুবিধা। (৭) **কারিগরী সাহায্য ও উদ্যোগ**—এই দেশে ইউরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশ

স্থাপনে ও রক্তের সংমিশ্রণে এক উদ্যোগী সংকর জাতির সৃষ্টি হয়। ইউরোপের প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এই দেশে আমদানি হয় এবং অতি দ্রুত এক শিল্পোদ্যোগী জাতির অভ্যুত্থান ঘটে। (৮) **সরকারী নীতি**—এই দেশের সরকারের শিল্প-বাণিজ্য নীতি জাতীয় স্বার্থের অনুকূল।

(১) **দক্ষিণ-পূর্ব কানাডার অন্তর্গত অন্টেরিও—সেন্ট লরেন্স নিম্নভূমির শিল্পক্ষেত্র**—এই অঞ্চলে অণ্টেরিও প্রদেশে হ্রদের পশ্চিম তীরে ধাতব শিল্প, যন্ত্রপাতির কারখানা, মণ্ট্রিলে রাসায়নিক শিল্প, কাগজ ও কাগজমণ্ড তৈয়ারির শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য শিল্প কেন্দ্রের মধ্যে টরোণ্টো, হ্যামিলটন, ব্রাণ্টফোর্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(২) **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব শিল্পক্ষেত্র**: উত্তরে হ্রদপঞ্চক ও মেইন দক্ষিণে মেরীল্যাণ্ড, পূর্বে আটলাণ্টিক উপকূল ও পশ্চিমে আইওয়া-মিসৌরী রাজ্য দ্বারা আবদ্ধ এই শিল্পক্ষেত্র বিশ্বের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্র। এই অঞ্চলটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের $\frac{1}{10}$ অংশ ভূ-ভাগে অবস্থিত হইলেও দেশের শিল্প শ্রমিকের ৮০% ও শ্রমশিল্পের প্রায় ৭০% এই অঞ্চলেই পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলটিকে নিম্নলিখিত প্রধান কয়েকটি শিল্পক্ষেত্রে ভাগ করা যায়।

(ক) **পিট্সবার্গ-হুইলিং-ক্লিভল্যাণ্ড শিল্পক্ষেত্র**: পেনসিলভ্যানিয়া অঞ্চলের কয়লা, হ্রদ অঞ্চলের লৌহ আকরিক-সমৃদ্ধ এই শিল্পক্ষেত্রে লৌহ ইস্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পই প্রধান। এই অঞ্চলেই প্রথম খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এই অঞ্চলে লৌহ ইস্পাতের সহিত বয়ন শিল্প, কাঁচ শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের মধ্যে ইয়ংস্টাউন, ক্লিভল্যাণ্ড, হুইলিং প্রধান।

(খ) **দক্ষিণ নিউ-ইংল্যাণ্ড রাজ্য শিল্পক্ষেত্র**: এই অঞ্চলেই ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গগণ প্রথম কলোনী স্থাপন করে এবং ইউরোপে রপ্তানির জন্য পশম, কার্পাস তামাক ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী এই অঞ্চলের বন্দরগুলিতে জমা করে। ক্রমে জল-বিদ্যুতের সাহায্যে এই অঞ্চলে বস্ত্র-বয়ন শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতি বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ম্যাসাচুসেটস্ ও রোড আইল্যাণ্ডের বস্ত্রবয়ন, উরচেস্টারের বয়ন যন্ত্রপাতি, নিউ হ্যাম্পশায়ারে, কানেকটিকাট অঞ্চলের কাগজ ও কাগজের মণ্ড উৎপাদন শিল্প উল্লেখযোগ্য।

(গ) **নিউইয়র্ক-ফিলাডেলফিয়া-বাল্টিমোর শিল্পক্ষেত্র**: প্রধানত আটলাণ্টিক উপকূলের বন্দরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এই শিল্পক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। বস্ত্র বয়ন, রেয়ন প্রস্তুত, খনিজ তেল ও তাম্র পরিশোধন, লৌহ ইস্পাত, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ইত্যাদি এই শিল্পক্ষেত্রের প্রধান শিল্প বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) **ডেট্রয়েট শিল্পক্ষেত্র**: ডেট্রয়েট নদীর তীরে এই শিল্পকেন্দ্র মোটর শিল্পের জন্য বিখ্যাত। সন্নিহিত অঞ্চলে মোটর, রেলবগি, মেশিন টুলস্ নির্মাণের ও রং তৈয়ারির কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ফ্লিট, জ্যাকসন, পণ্টিঅ্যাক প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য শিল্পকেন্দ্র।

(ঙ) **মিচিগান হ্রদ সন্নিহিত চিকাগো গ্যারী শিল্পক্ষেত্র**: ওহিও পেনসিলভ্যানিয়া অঞ্চলের কয়লা, হ্রদ অঞ্চলের লৌহ আকরিক এই অঞ্চলের ইস্পাত ও ইস্পাতজাত যন্ত্রপাতি, রেল ইঞ্জিন, রেলকামরা, কৃষি যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি শিল্প গঠনের প্রধান অবলম্বন। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্রের মধ্যে চিকাগো, মিলওয়াকি, গ্যারী, সাউথ বেন্ড প্রধান।

(চ) **পশ্চিম-মধ্যাঞ্চলের শিল্পক্ষেত্র**: অন্তর্দেশীয় কয়লাখনিসমূহকে কেন্দ্র করিয়া বিক্ষিপ্তভাবে এই শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। খনিজ তেল পরিস্রবণ, কার্পাস সম্প্রেষণ, মাংস হিমায়ন, রাসায়নিক শিল্প, যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শিল্প। মিনিয়াপোলিস, সেন্টপল, সেন্টলুই, কানসাস সিটি, ওমাহা প্রভৃতি প্রধান শিল্পশহর।

(ছ) **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে পিডমেন্ট শিল্পক্ষেত্র**: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে আলাবামা রাজ্যে স্থানীয় লৌহ আকরিক ও কয়লার সাহায্যে ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিলেও এই অঞ্চলে বস্ত্রবয়ন, কাষ্ঠ, কাগজ, তামাক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পই প্রধান। বার্মিংহাম, আটলান্টা, গ্রীনসবরো, নক্সভিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্পশহর।

উত্তর আমেরিকার উপরি-উক্ত শিল্পাঞ্চল ব্যতীত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে নূতন একটি শিল্পক্ষেত্র গড়িয়া উঠিতেছে। খনিজ তেল শোধন, সিনেমা শিল্প, ইস্পাত, জাহাজ ও বিমানপোত তৈয়ারি প্রভৃতি শিল্পের প্রসার অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চলকে আমেরিকার একটি বিশিষ্ট শিল্পক্ষেত্রের মর্যাদা দিবে।

গ। **সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পাঞ্চল**: বিপ্লবের পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পের প্রসার ঘটে নাই। ইউক্রেন ও মস্কো অঞ্চলেই সামান্য কিছু প্রাথমিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিপ্লবের পরে এই দেশে শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং নূতন নূতন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। সোভিয়েত শিল্পকেন্দ্রগুলির বেশির ভাগই ইউরোপীয় রাশিয়ায় অবস্থিত। ককেশাস, মধ্য-এশিয়া ও দূর প্রাচ্যেও কয়েকটি শিল্পক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প সমৃদ্ধি বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঈর্ষার সঞ্চার করে। একটি কৃষি প্রধান দেশ হইতে ৫০ বৎসরের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যুত্থান সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্বই ঘোষণা করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই শিল্পাঞ্চলটি গড়িয়া উঠিবার মূলে রহিয়াছে এই দেশের —(১) কয়লা, লৌহ, খনিজ তেল প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য এবং তুলা, তামাক, তেলবীজ ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য; (২) জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী স্বাভাবিক সুবিধা; (৩) রেলপথ, সড়কপথ ও নদী-খালপথে পঞ্চসাগরের সহিত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা; (৪) দীর্ঘ শ্রম ও উদ্যোগের উপযোগী জলবায়ু; (৫) দেশের অভ্যন্তরে উদ্যোগী ও দক্ষ শ্রমিকের যোগান; (৬) আভ্যন্তরীণ বাজার

ও ইউরোপের বাজারের সুবিধা ; (৭) শিল্পোন্নত ইউরোপের সান্নিধ্য ও প্রযুক্তি-বিদ্যার ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োগ ; (৮) সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির আলোকে ব্যাপক শিল্প পরিকল্পনা।

এই ব্যাপক শিল্পাঞ্চলটি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় সমগ্র ভূভাগ ব্যাপিয়া অবস্থিত হইলেও ইহাকে নিম্নলিখিত ছয়টি প্রধান শিল্পক্ষেত্রে ভাগ করা যায়—(১) সোভিয়েত-ইউরোপীয় শিল্পক্ষেত্র (২) ইউরাল শিল্পক্ষেত্র (৩) সোভিয়েত মধ্য-এশিয়া শিল্পক্ষেত্র (৪) ককেশাস শিল্পক্ষেত্র (৫) কুজনেৎস্ক শিল্পক্ষেত্র ও (৬) সোভিয়েত দূর প্রাচ্য শিল্পক্ষেত্র।

(১) **সোভিয়েত ইউরোপীয় শিল্পক্ষেত্র** : এই শিল্পক্ষেত্রটি উত্তর-পশ্চিমে লেনিনগ্রাদ দক্ষিণ-পশ্চিমে কিয়েভ, ওডেসা, দক্ষিণে রস্টভ ও ভল্গোগ্রাদ এবং উত্তরে মস্কো দ্বারা আবদ্ধ। ইহা রাশিয়ার সর্ববৃহৎ শিল্পাঞ্চল এবং এই দেশের প্রায় ৭০% শিল্প কারখানা এই অঞ্চলে অবস্থিত। ইহাকে চারিটি স্বল্পপরিসর শিল্পকেন্দ্রে ভাগ করা হইয়াছে—(১) দক্ষিণ ইউক্রেন শিল্পকেন্দ্র (২) মস্কোটুল-গোর্কি শিল্পকেন্দ্র (৩) লেনিনগ্রাদ শিল্পকেন্দ্র ও (৪) ভোল্গোগ্রাদ শিল্পকেন্দ্র। এই সমগ্র শিল্পাঞ্চলটি প্রধানত ডোনেৎস অববাহিকার কয়লা, ক্রিভয়রগ ও কার্চ অঞ্চলের লৌহ আকরিক, ইউক্রেন অঞ্চলের কৃষিজ শিল্প ফসল ও স্থানীয় খনিজ দ্রব্য ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, রেলইঞ্জিন নির্মাণ, কাগজ তৈয়ারি, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম তৈয়ারি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত, পশম ও সুতী-বস্ত্র বয়ন, কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প এই অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে। **দক্ষিণ উক্রেন অঞ্চলে** ডোনেৎস্ক, ভরোশিলভগ্রাদ, খারকভ, জাপোরাঝি, **মস্কোটুলা-গোর্কি** অঞ্চলে কালিনিন, ইয়ারস্লাভল, রিয়াজন, লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে লেনিনগ্রাদ ও ভল্গোগ্রাদ অঞ্চলে কুইবিশেভ, সারাটভ, ভেরোনেঝ ইত্যাদি বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র। মস্কো-টুলা অঞ্চলের আইভানোভোকে বয়ন শিল্প উৎকর্ষের জন্য '**সোভিয়েত ম্যাঞ্চেস্টার**' বলা হয়। লেনিনগ্রাদ ইউরোপীয় সীমান্তে একমাত্র সকল ঋতুর উপযোগী বন্দর হওয়ায় জাহাজ শিল্পের প্রায় ৭০%, কাগজ শিল্পের ৩৫% এবং বৈদ্যুতিক শিল্পের প্রায় ৫০% এই বন্দর শিল্প কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

(২) **ইউরাল শিল্পক্ষেত্র** : ম্যাগনেট অঞ্চলের লৌহ আকরিক, কারাগান্ডা ও কুজনেৎস্ক অঞ্চলের কয়লা, তাম্র, খনিজ তেল, বনজ সম্পদ, ইত্যাদি ও স্থানীয় জলবিদ্যুৎ এই অঞ্চলের শিল্পের প্রধান অবলম্বন। লৌহ ইস্পাত তৈয়ারি, খনিজ তৈল শোধন, তাম্রনিষ্কাশন, রেল ইঞ্জিন তৈয়ারি, কৃষি যন্ত্রপাতি তৈয়ারি প্রভৃতি বিবিধ শিল্পের সমাবেশ এই অঞ্চলে দেখা যায়। ম্যাগনিটোগোরস্ক, চেলিয়াবিনস্ক, নিজনিতাগিল, ওস্ক, মলোটভ প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্প কেন্দ্র।

(৩) **সোভিয়েত মধ্য-এশিয়া শিল্পক্ষেত্র** : সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত মধ্য-এশিয়া অঞ্চলে স্থানীয় কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই এই শিল্প কেন্দ্রটি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ইস্পাত তৈয়ারি, যন্ত্রপাতি তৈয়ারি, তাম্র,

সীসা, দস্তা নিষ্কাশন, তুলা সম্প্রেষণ, খাদ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিবিধ শিল্প এই অঞ্চলে সংগঠিত হইয়াছে। তাসখন্দ, সমরখন্দ, বোখারা প্রভৃতি এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শহর।

(৪) **ককেশাস শিল্পক্ষেত্র** : কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী ককেশাস পর্বত সংলগ্ন অঞ্চল প্রধানত খনিজ তেলের জন্যই বিশিষ্ট। এই অঞ্চলে তেলনিষ্কাশন, তেলশোধন শিল্পের সহিত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত, হাল্কা ইস্পাত যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রেশম, পশম সুতীবস্ত্র বয়ন ইত্যাদি শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। বাকু, গ্রজনি, মাইকপ খনিজ তেল শিল্প. টিবলিস হাল্কা যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প. এরিভান কৃত্রিম রবার ও তামাক শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

(৫) **কুজনেৎস্ক শিল্পক্ষেত্র** : ট্রান্সসাইবেরীয় রেলপথের উপর কুজনেৎস্ক অঞ্চলের কয়লা ও লৌহ আকরিক সম্পদের সাহায্যে এই শিল্পক্ষেত্রটি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সোনা, রুপা, দস্তা, সীসা নিষ্কাশন, ইস্পাত ও ভারী যন্ত্রপাতি তৈয়ারি, রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত এই অঞ্চলের প্রধান শিল্প। নোভোসাইবিরস্ক, কেমেরভ, তোমেজ, কুজনেৎসক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প শহর।

(৬) **সোভিয়েত দূরপ্রাচ্য শিল্পক্ষেত্র** : বৈকালহ্রদ সন্নিহিত ইর্কুটস্ক, উলানউদে প্রভৃতি স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পূর্ব প্রান্তে আমুর অববাহিকায় কমসোমোলস্ক, ভরোশিলভ, খাবারভস্ক, ভ্ল্যাডিভোস্টক প্রভৃতি অঞ্চলে সুসংগঠিত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইস্পাত শিল্প, খনিজ তেল শোধন, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান শিল্প। সোভিয়েত শিল্পনীতির পূর্ববিন্যাস ও শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনায় দেশের মধ্য ও পূর্বভাগে উন্নত শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

ঘ। **ভারতের শিল্পাঞ্চল** : দীর্ঘকাল বৈদেশিক শাসন ও শোষণের জর্জর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে শিল্প সম্ভাবনাময় ভারতের আত্মপ্রকাশ বিশ্ব-বাণিজ্যিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ভারতে কয়লা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, বক্সাইট, খনিজ তেল প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণেই সঞ্চিত আছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা প্রাকৃতিক কারণে প্রায় দেশের সর্বত্র বর্তমান। তুলা, পাট, রেশম, তেলবীজ, ইক্ষু প্রভৃতি শিল্প ফসলের প্রাচুর্য, শ্রমিকের সরবরাহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সকল অনুকূল উপাদান ও রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে ভারতে শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি ঘটিয়াছে এবং উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিল্পক্ষেত্রেরও সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্পগুলির মধ্যে লৌহ-ইস্পাত শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, জাহাজ ও মোটর শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, রেশম, পশম, সুতী-বস্ত্র বয়ন শিল্প, পাট ও শর্করা শিল্প ইত্যাদি প্রধান। কলিকাতা-হাওড়া, দুর্গাপুর-আসানসোল, ধানবাদ-রাঁচী, কানপুর-দিল্লী, বম্বে-আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর-কোয়াম্বাটুর-মাদ্রাজ, জামসেদপুর-রাউরকেল্লা-ভিলাই প্রভৃতি বর্তমান ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্পক্ষেত্র।

৬। **দূর-প্রাচ্যের শিল্পাঞ্চল**: এশিয়া মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে জাপান ও চীনকে কেন্দ্র করিয়া এই শিল্পাঞ্চলটি গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপান এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত দেশ এবং চীনেও বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে শিল্পে উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়াছে। জাপানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্র হনসু দ্বীপের টোকিও হইতে ওসাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর কিউসিউতে অপর একটি শিল্পক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ইস্পাত তৈয়ারি, যন্ত্রনির্মাণ, খনিজ তেল শোধন, জাহাজ নির্মাণ, বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি জাপানের প্রধান শিল্প। ইয়োকোহামা, নাগোয়া, কোয়াণ্টো, কোবে, ওসাকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প শহর। জাপানের শিল্পোন্নতির মূলে প্রাকৃতিক আনুকূল্য ব্যতীত জাতীয় চরিত্রের দৃঢ়তা উদ্যোগী মনোভাব ও সরকারী বলিষ্ঠ নীতি বিশেষ সহায়ক। চীনের শিল্পক্ষেত্রগুলির মধ্যে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া, উত্তর চীন, ইয়াংসির নিম্নভূমি ও ক্যাণ্টন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দেশে কয়লা, লৌহ আকরিক যেমন প্রচুর পাওয়া যায় তেমনি শিল্প ফসলও প্রচুর জন্মে। চীনা শ্রমিক উদ্যোগী, দক্ষ ও শ্রমসহিষ্ণু। সরকারী নীতিও দেশের শিল্পোন্নতির সহায়ক। ফলে ভবিষ্যতে এই দেশ শিল্পে প্রভূত উন্নতি করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

[প্রশ্ন: (১) পৃথিবীর প্রধান শিল্পাঞ্চল কয়টি ও কি কি? (২) পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর-পূর্ব ইউরোপে শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠার অনুকূল উপাদানগুলি কি কি? (৩) সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্পক্ষেত্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (৪) "দূর প্রাচ্যের শিল্পাঞ্চলটি সম্ভাবনাময়।"—আলোচনা কর।

অনুশীলনী ১৬

১। যন্ত্রশিল্পের গঠনের উপযোগী উপাদানগুলি কি কি? এই প্রসঙ্গে শক্তিসম্পদ ও পরিবহণের গুরুত্ব বিশদভাবে আলোচনা কর।

[What are the favourable factors for the development of manufacturing industris? In this context discuss fully the importance of power resources and transport.]

২। শিল্পের একদেশীভবন বলিতে কি বুঝ? শিল্পের অবস্থানের উপর প্রভাব-বিস্তারকারী উপাদানগুলির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কর।

[What is meant by localisation of industries? Discuss fully the factors which influence the location of industries.]

৩। শিল্পের অবস্থানের মৌলিক কারণগুলি ব্যাখ্যা কর এবং কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ ও বাজারের নিকট কেন্দ্রীভূত কয়েকটি শিল্পের নাম কর।

[Explain the basic factors for the location of industries and name some industries which are centralised near raw materials, power resources, and markets.]

সীসা, দস্তা নিষ্কাশন, তুলা সম্প্রেষণ, খাদ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিবিধ শিল্প এই অঞ্চলে সংগঠিত হইয়াছে। তাসখন্দ, সমরখন্দ, বোখারা প্রভৃতি এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শহর।

(৪) **ককেশাস শিল্পক্ষেত্র** : কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্তী ককেশাস পর্বত সংলগ্ন অঞ্চল প্রধানত খনিজ তেলের জন্যই বিশিষ্ট। এই অঞ্চলে তেলনিষ্কাশন, তেলশোধন শিল্পের সহিত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত, হাল্কা ইস্পাত যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রেশম, পশম সুতীবস্ত্র বয়ন ইত্যাদি শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। বাকু, গ্রজনি, মাইকপ খনিজ তেল শিল্প, টিবলিস হাল্কা যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, এরিভান কৃত্রিম রবার ও তামাক শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

(৫) **কুজনেৎস্ক শিল্পক্ষেত্র** : ট্রান্সসাইবেরীয় রেলপথের উপর কুজনেৎস্ক অঞ্চলের কয়লা ও লৌহ আকরিক সম্পদের সাহায্যে এই শিল্পক্ষেত্রটি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সোনা, রুপা, দস্তা, সীসা নিষ্কাশন, ইস্পাত ও ভারী যন্ত্রপাতি তৈয়ারি, রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত এই অঞ্চলের প্রধান শিল্প। নোভোসাইবিরস্ক, কেমেরভ, তোমেস্ক, কুজনেৎসক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প শহর।

(৬) **সোভিয়েত দূরপ্রাচ্য শিল্পক্ষেত্র** : বৈকালহ্রদ সন্নিহিত ইর্কটস্ক, উলানউদে প্রভৃতি স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পূর্ব প্রান্তে আমুর অববাহিকায় কমসোমোলস্ক, ভরোশিলভ, খাবারভস্ক, ভ্লাডিভোস্টক প্রভৃতি অঞ্চলে সুসংগঠিত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইস্পাত শিল্প, খনিজ তেল শোধন, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি এই অঞ্চলের প্রধান শিল্প। সোভিয়েত শিল্পনীতির পূর্নবিন্যাস ও শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনায় দেশের মধ্য ও পূর্বভাগে উন্নত শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

ঘ। **ভারতের শিল্পাঞ্চল** : দীর্ঘকাল বৈদেশিক শাসন ও শোষণের জর্জর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যে শিল্প সম্ভাবনাময় ভারতের আত্মপ্রকাশ বিশ্ব-বাণিজ্যিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ভারতে কয়লা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, বক্সাইট, খনিজ তেল প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণেই সঞ্চিত আছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা প্রাকৃতিক কারণে প্রায় দেশের সর্বত্র বর্তমান। তুলা, পাট, রেশম, তেলবীজ, ইক্ষু প্রভৃতি শিল্প ফসলের প্রাচুর্য, শ্রমিকের সরবরাহ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সকল অনুকূল উপাদান ও রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে ভারতে শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি ঘটিয়াছে এবং উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিল্পক্ষেত্রেরও সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্পগুলির মধ্যে লৌহ-ইস্পাত শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, জাহাজ ও মোটর শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, রেশম, পশম, সুতী-বস্ত্র বয়ন শিল্প, পাট ও শর্করা শিল্প ইত্যাদি প্রধান। কলিকাতা-হাওড়া, দুর্গাপুর-আসানসোল, ধানবাদ-রাঁচী, কানপুর-দিল্লী, বম্বে-আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর-কোয়াম্বাটুর-মাদ্রাজ, জামসেদপুর-রাউরকেল্লা-ভিলাই প্রভৃতি বর্তমান ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্পক্ষেত্র।

৬। **দূর-প্রাচ্যের শিল্পাঞ্চল**: এশিয়া মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে জাপান ও চীনকে কেন্দ্র করিয়া এই শিল্পাঞ্চলটি গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপান এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত দেশ এবং চীনেও বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে শিল্পে উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়াছে। জাপানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্র হনসু দ্বীপের টোকিও হইতে ওসাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর কিউসিউতে অপর একটি শিল্পক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ইস্পাত তৈয়ারি, যন্ত্রনির্মাণ, খনিজ তেল শোধন, জাহাজ নির্মাণ, বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি জাপানের প্রধান শিল্প। ইয়োকোহামা, নাগোয়া, কোয়াণ্টো, কোবে, ওসাকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প শহর। জাপানের শিল্পোন্নতির মূলে প্রাকৃতিক আনুকূল্য ব্যতীত জাতীয় চরিত্রের দৃঢ়তা উদ্যোগী মনোভাব ও সরকারী বলিষ্ঠ নীতি বিশেষ সহায়ক। চীনের শিল্পক্ষেত্রগুলির মধ্যে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া, উত্তর চীন, ইয়াংসির নিম্নভূমি ও ক্যাণ্টন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দেশে কয়লা, লৌহ আকরিক যেমন প্রচুর পাওয়া যায় তেমনি শিল্প ফসলও প্রচুর জন্মে। চীনা শ্রমিক উদ্যোগী, দক্ষ ও শ্রমসহিষ্ণু। সরকারী নীতিও দেশের শিল্পোন্নতির সহায়ক। ফলে ভবিষ্যতে এই দেশ শিল্পে প্রভূত উন্নতি করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

[প্রশ্ন: (১) পৃথিবীর প্রধান শিল্পাঞ্চল কয়টি ও কি কি? (২) পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর-পূর্ব ইউরোপে শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠার অনুকূল উপাদানগুলি কি কি? (৩) সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্পক্ষেত্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (৪) "দূর প্রাচ্যের শিল্পাঞ্চলটি সম্ভাবনাময়।"—আলোচনা কর।]

অনুশীলনী ১৬

১। যন্ত্রশিল্পের গঠনের উপযোগী উপাদানগুলি কি কি? এই প্রসঙ্গে শক্তিসম্পদ ও পরিবহণের গুরুত্ব বিশদভাবে আলোচনা কর।

[What are the favourable factors for the development of manufacturing industris? In this context discuss fully the importance of power resources and transport.]

২। শিল্পের একদেশীভবন বলিতে কি বুঝ? শিল্পের অবস্থানের উপর প্রভাব-বিস্তারকারী উপাদানগুলির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কর।

[What is meant by localisation of industries? Discuss fully the factors which influence the location of industries.]

৩। শিল্পের অবস্থানের মৌলিক কারণগুলি ব্যাখ্যা কর এবং কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ ও বাজারের নিকট কেন্দ্রীভূত কয়েকটি শিল্পের নাম কর।

[Explain the basic factors for the location of industries and name some industries which are centralised near raw materials, power resources, and markets.]

৪। (ক) শিল্পাঞ্চল বলিতে কি বুঝায়? (খ) পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থান নির্দেশ করিয়া ইহাদের উন্নতির কারণ ব্যাখ্যা কর।

[(a) What is meant by industrial regions? (b) Identify the major industrial regions of the world and explain the reasons for their development.] [(b) W. B. H. S. C. Exam., 1983]

৫। কোন স্থানে শিল্প গড়িয়া উঠিবার অনুকূল ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর। পশ্চিম জার্মানির রুঢ় অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের একদেশীভবনের কারণ উল্লেখ কর।

[Identify the geographical factors for the localisation of industries in any region. Describe the reasons for the regional concentration of Iron and Steel Industry in Ruhr of West Germany.] [W. B. H. S. C. Exam., 1978]

১৭ পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান শ্রমশিল্প
(Some Important Manufacturing Industries of the World)

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা অনুযায়ী নানাবিধ শ্রমশিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছে। মানুষের বহুমুখী চাহিদা পূরণে ইহাদের গুরুত্ব অসীম। এই সকল শ্রমশিল্পের মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বয়ন শিল্প (কার্পাস, পশম, রেশম, কৃত্রিম রেশম), পাট শিল্প, কাগজ শিল্প ও রাসায়নিক শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে ইহাদের বিষয় আলোচনা করা হইল।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প
(Iron and Steel Industry)

আধুনিক যুগকে লৌহ ও ইস্পাতের যুগ বলা হয়। একদিন যেমন মানুষের জীবন যাপন প্রণালীতে প্রস্তর, তামা বা ব্রোঞ্জের ব্যবহার বিশেষ ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল বর্তমান কালে তেমনি বা ততোধিক ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার। ঘর গৃহস্থালির সাধারণ বাসন-কোষণ হইতে কৃষি যন্ত্রপাতি, কলকারখানায় ব্যবহৃত ভারী ও হাল্কা যন্ত্রপাতি, রেল, মোটর, লরি, বিমান, জাহাজ, নৌকা, লঞ্চ ইত্যাদি যানবাহন, কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, ব্রিজ, গৃহ ইত্যাদি নির্মাণের সরঞ্জাম, সূক্ষ্ম ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিবিধ যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তৈয়ারিতে লৌহ ও ইস্পাতের বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। এককথায় ক্ষুদ্র আলপিন হইতে শত শত বিমানবাহী অতিকায় জাহাজ পর্যন্ত সকল কিছুরই নির্মাণকার্যে লৌহ ও ইস্পাত একটি অপরিহার্য উপাদান। মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে লৌহ ও ইস্পাতের মত আর কোন ধাতব পদার্থই এত বেশি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বর্তমান যুগে কোন দেশের বৈষয়িক উন্নতির ধারা ঐ দেশের লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা নির্ণয় করা হয়।

লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের উপাদানসমূহ—

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের মৌল উপাদান বা প্রধান কাঁচামাল লৌহ কণিকা মিশ্রিত পাথর বা আকরিক লৌহ হইলেও উহা হইতে লৌহ নিষ্কাশন ও লৌহ হইকে ইস্পাত তৈয়ারি করিতে নিম্নলিখিত উপাদানসমূহ অপরিহার্য: (ক) লৌহ নিষ্কাশনের জন্য—(১) লৌহ আকরিক, (২) কোক কয়লা, (৩) চুনাপাথর ও ডলোমাইট, (খ) বিভিন্ন প্রকার ইস্পাত তৈয়ারির জন্য (নিষ্কাশিত লৌহের সহিত মিশ্রিত হয়): ম্যাঙ্গানীজ, মলিবডেনাম, ভ্যানাডিয়াম, নিকেল, ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন প্রভৃতি এক বা

একাধিক লৌহ-সঙ্কর ধাতু ; (গ) সাধারণ উপাদান : (১) জল, (২) বিদ্যুৎ শক্তি, (৩) সুদক্ষ শ্রমিক, (৪) উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, (৫) বাজার ও (৬) মূলধন।

আকরিক লৌহ, চুনাপাথর ও কোককয়লা নির্দিষ্ট অনুপাতে বাত চুল্লীতে (Blast Furnace) উত্তপ্ত বাতাসের সাহায্যে গলান হয়। ইহাতে আকরিকের গাদ (Slag) উপরে ভাসিয়া উঠে এবং তরল লোহা চুল্লীর তলায় জমা হয়। এই তরল লোহাকে ছাঁচে ঢালিয়া ঢালাই লোহা (Cast iron) তৈয়ারি করা হয়। ইহাকে পিগ আয়রণও বলে। লৌহ নিষ্কাশনের প্রথম যুগে ইহার ছাঁচগুলির আকার অনেকটা শূকর ছানার ন্যায় ছিল বলিয়াই হয়তো ইহার নাম পিগ আয়রণ (Pig iron) হইয়াছে। ইহার মধ্যে কিছু খাদ থাকে। ইহার সাহায্যে পাইপ, রেলিং, পয়ঃপ্রণালীর ঝাঁঝরি, কড়াই ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। ঢালাই লোহাকে শোধন করিয়া পেটা লোহা (Wrought iron) তৈয়ারি করা হয়। ইহার সাহায্যে লোহার কড়ি, বরগা, শিক, পাত প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বাত চুল্লীতে ১ মে. টন লৌহপিণ্ড তৈয়ারি করিতে ১.৭ মে. টন আকরিক লৌহ, ০.৯ মে. টন কোক (প্রায় ২.৮ টন কাঁচা কয়লা), ০.৪ মে. টন চুণাপাথর ও ০.২ মে. টন অন্যান্য দ্রব্য এবং প্রচুর বাতাস ব্যবহৃত হয়। প্রতি টন লৌহপিণ্ডের সহিত প্রায় ০.৫ মে. টন গাদ ও প্রচুর গ্যাস উৎপন্ন হয়।

ইস্পাত তৈয়ারি ঢালাই ও পেটা লৌহের সহিত মাঙ্গানিজ ও সিলিকন মিশ্রিত করিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে ইস্পাত তৈয়ারি করা হয়। লৌহের সহিত মিশ্রিত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ কমাইয়া বা বাড়াইয়া কোমল বা কঠিন ইস্পাত তৈয়ারি করা হয়। বিভিন্ন কাজের উপযোগী ইস্পাত তৈয়ারি করিতে আবার নানাপ্রকার খাদও (alloy) ব্যবহার করা হয়। যেমন—টাংস্টেন, ভ্যানাডিয়াম মলিবডেনাম, ক্রোমিয়াম নিকেল, কোবাল্ট, তামা, সীসা ধাতু ইত্যাদি। এই প্রকার ইস্পাতকে সঙ্কর ইস্পাত (Alloy steel) বলা হয়। এই জাতীয় ইস্পাত যেমন কঠিন হয় তেমনি সূক্ষ্ম ও ধারালো যন্ত্রপাতি তৈয়ারির উপযোগী হয়। বর্তমান যুগে এই জাতীয় ইস্পাতের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বর্তমান যুগে নানাপ্রকার পদ্ধতিতে ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। ইহার মধ্যে বেসেমার পদ্ধতি (Besemar Process), সীমেন্স পদ্ধতি (Siemens Process), মার্টিন পদ্ধতি (Martin's Process), ক্রুসিবল পদ্ধতি (Crucible Process), উন্মুক্ত চুল্লী পদ্ধতি (Open Hearth Process) ও বৈদ্যুতিক চুল্লী পদ্ধতি (Electric Furnace or Duplux Proccss) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৬ সালে হেনরি বেসেমার প্রথম লৌহপিণ্ড হইতে ইস্পাত উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করেন এবং পরবর্তীকালে ইস্পাত উৎপাদনের অন্যান্য পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়।

পৃথিবীর লৌহ-ইস্পাত উৎপাদক অঞ্চল—

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কিছু কিছু লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিলেও পৃথিবীর মোট ইস্পাতের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত

ইউনিয়ন, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে উৎপাদিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, ব্রেজিল, ভারত, কানাডা প্রভৃতি দেশেও লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারি হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একযোগে পৃথিবীর মোট লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

পৃথিবীর লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন—১৯৮৩

দেশ	লৌহপিণ্ড মি মে.ট	ইস্পাত মি মে.ট.	দেশ	লৌহপিণ্ড মি.মে.ট.	ইস্পাত মি মে ট.
সোঃ ইউনিয়ন	১০৭ ০	১৫২'৫	বৃটেন	১৩'৫	১৪'৬
জাপান	৪৪'২	৭৫'৪	ব্রেজিল	৯ ৬	১৫'৯
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	৭৪'২	৯৬'৯	বেলজিয়াম	৮'০	১০'২
চীন	২৬'৭	৩৬'১	ভারত	৯'২	১০'১
পশ্চিম জার্মানি	৩৭'৩	৪০'১	পৃথিবী	৫০৯ ০	৭০৫'০

সোভিয়েত ইউনিয়ন—বর্তমান পৃথিবীতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম স্থান অধিকার করে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে এই দেশের স্থান আদৌ উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু বিগত ৫০ বৎসরে

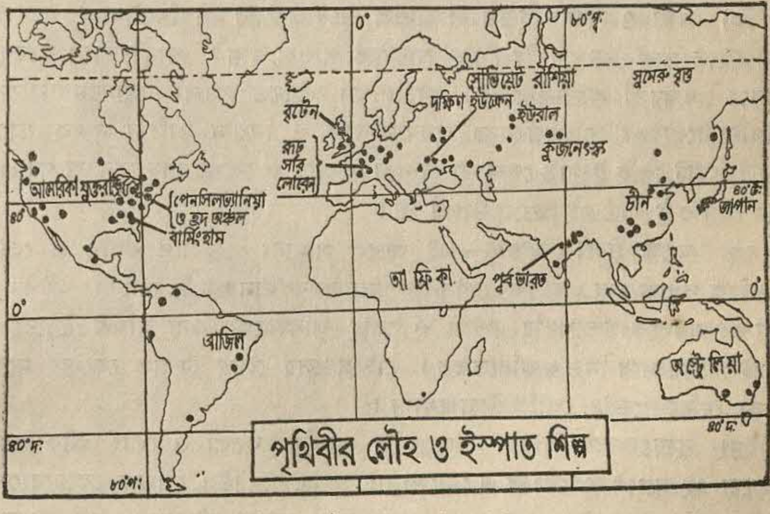

চিত্র ১৭.১ : পৃথিবীর লৌহ ও ইস্পাত শিল্প-নির্দেশক স্থানসমূহ।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নতি ধনতান্ত্রিক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি ঘটিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে কয়লা, লৌহ আকরিক ও ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠত্ব, জল ও বৈদ্যুতিক শক্তির সহজলভ্যতা, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, প্রচুর দক্ষ

শ্রমিকের সহযোগিতা, আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সুষ্ঠু প্রয়োগ, সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও মূলধন এবং আভ্যন্তরীণ প্রযুক্তি ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহে লোহ ও ইস্পাতের ব্যাপক চাহিদা ইত্যাদি। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে চারিটি প্রধান অঞ্চলে লোহ-ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। যথা—(১) দক্ষিণ ইউক্রেন অঞ্চল, (২) মধ্য ও দক্ষিণ ইউরাল অঞ্চল, (৩) মস্কো-টুলা অঞ্চল এবং (৪) কুজনেৎস্ক অঞ্চল।

(১) **দক্ষিণ ইউক্রেন অঞ্চল**—সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লোহ-ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ইউক্রেন রাজ্যের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি দক্ষিণ-পূর্বে কৃষ্ণ সাগর ও আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ডোনেৎসের কয়লা, ক্রিভয়রগ ও কার্চ-এর লোহ আকরিক, নিকোপোলের ম্যাঙ্গানীজ, স্থানীয় জলবিদ্যুৎ, রেল-সড়ক-নদী-খাল পথের উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদির আনুকূল্যে এই বিস্তৃত লোহ-ইস্পাত কেন্দ্রটি গড়িয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ কাঁচা লোহা, ৪০ ভাগ ইস্পাত এই অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। ক্রিভয়রগ, নীপ্রোপেট্রোভস্ক (Dnepropetrovosk), জাডানভ (Zadanov), জাপোর ঝি, কিয়েভ রোস্টভ, ট্যাগনরগ (Taganrog), মাকিভকা ইত্যাদি এই অঞ্চলের প্রধান লোহ-ইস্পাত ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি নির্মাণকেন্দ্র। ক্রিভয়রগ ও নীপ্রোপেট্রোভস্ক এই দেশের বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লোহ-ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র।

(২) **মধ্য ও দক্ষিণ ইউরাল অঞ্চল**—এই অঞ্চলের ম্যাগনিটোনায়া পর্বতের খনি হইতে প্রচুর উচ্চ শ্রেণীর লোহ আকরিক পাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে কয়লার অভাবে দূরবর্তী কুজনেৎস্ক ও কারাগাণ্ডা হইতে কয়লা আনয়ন করিয়া ম্যাগনিটোগোরস্ক, চেলিয়াবিনস্ক, সভেরডলভস্ক ও নিঝনি তাগিল নামক স্থানে বিরাট বিরাট লোহ ইস্পাত কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। দেশের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ পিগ ও ইস্পাত এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়।

(৩) **মস্কো-টুলা অঞ্চল**—এই অঞ্চলে সামান্য পরিমাণে কয়লা ও লোহ আকরিক পাওয়া যায়। কিন্তু লোহ-ইস্পাতের ক্রমবর্ধমান স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য এই অঞ্চলকে উচ্চশ্রেণীর কয়লা ও লোহ আকরিকের জন্য দক্ষিণ ইউক্রেনের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয়। এই অঞ্চলের লোহ ইস্পাত কেন্দ্রের মধ্যে মস্কো, চেরিপোভেটস, গোর্কি উল্লেখযোগ্য।

(৪) **কুজনেৎস্ক অঞ্চল**—উচ্চশ্রেণীর স্থানীয় কয়লা ও লোহ আকরিকের সাহায্যে এই অঞ্চলে কুজনেৎস্ক ও নোভোসাইবিরস্ক, বার্ণাউল, টোমস্ক, কেমেরোভো প্রভৃতি স্থানে লোহ ও ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এই অঞ্চলের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান।

উপরি-উক্ত প্রধান চারিটি অঞ্চল ব্যতীত সোভিয়েত রাশিয়ায় লেনিনগ্রাদ, আজভ-ক্রিমিয়া, বৈকাল হ্রদ সন্নিহিত ও ইর্খুটস্ক ও দূর প্রাচ্যে আমুর নদীর অববাহিকায় কমসোমোলস্ক-এও লোহ-ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—লৌহ ইস্পাত শিল্পে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। এই দেশে উচ্চশ্রেণীর কয়লা ও লৌহ আকরিক প্রচুর পরিমাণে যায়। বিদ্যুৎশক্তি, জল, দক্ষ শ্রমিক, রেল-সড়ক এবং হ্রদ ও নদীপথে শিল্পাঞ্চলের সহিত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, মূলধন এবং দেশের মধ্যে ও ইউরোপের বাজারে লৌহের ব্যাপক চাহিদা এই দেশের ইস্পাত শিল্পের উন্নতিতে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আনুকূল্যে এই দেশে লৌহ-ইস্পাত শিল্প নিম্নলিখিত চারিটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে: (১) পিট্সবার্গ—ইয়ংসটাউন অঞ্চল, (২) উচ্চ ও নিম্ন হ্রদ অঞ্চল, (৩) উত্তর-পূর্ব পেনসিলভ্যানিয়া ও মধ্য আটলান্টিক উপকূল অঞ্চল এবং (৪) বার্মিংহাম অঞ্চল।

(১) পিট্সবার্গ-ইয়ংসটাউন অঞ্চল : ঈরি হ্রদের দক্ষিণ-পূর্বে ও আপালাচিয়ান কয়লা খনি অঞ্চলের উত্তরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য পিগ ও ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র পিট্সবার্গ-ইয়ংসটাউন অঞ্চল অবস্থিত। প্রথমে এই অঞ্চলে স্থানীয় আপালাচিয়ান কয়লা ক্ষেত্রের কয়লা ও লৌহ আকরিকের সাহায্যে পিগ উৎপাদন শুরু করা হইয়াছিল। বর্তমানে হ্রদ ও খালপথের উন্নতির ফলে সুপিরিয়র হ্রদ অঞ্চলের লৌহ আকরিক সুলভে নৌ-পথে এই অঞ্চলের ইস্পাত শিল্পে ব্যবহারের জন্য আনীত হয়। ওহিও, মনোনগহেলা ও অ্যালিঘেনি নদী-উপত্যকায় পিট্সবার্গের ৬৫ কিলোমিটারের মধ্যে অসংখ্য লৌহ-ইস্পাত কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় কয়লা, জল, হ্রদ অঞ্চলের উচ্চমানের আকরিক, দক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি সহজলভ্য হওয়ায় এই অঞ্চলের ইস্পাত শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ পিগ ও ৩৭ ভাগ ইস্পাত এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত ভারী ইস্পাত ও যন্ত্রপাতি উৎপাদন এই অঞ্চলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইয়ংসটাউন, হুইলিং, হান্টিংটন, পোর্টসমাউথ প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্যান্য লৌহ-ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র।

(২) উচ্চ ও নিম্ন হ্রদ অঞ্চল : পঞ্চ হ্রদের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মিচিগান হ্রদের তীরে চিকাগো, গ্যারী, ঈরি হ্রদ সন্নিহিত ডেট্রয়েট, বাফেলো, ক্লীভল্যান্ড, ডুলুথ প্রভৃতি অঞ্চলের লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্রগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলেই বিশ্বের বৃহত্তম ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র অবস্থিত। এই অঞ্চলে স্থানীয় কয়লা বা লৌহ আকরিকের অভাব। কিন্তু লৌহ আকরিক ও কয়লা ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চল হিসাবে পরিবহণের দোলক প্রথার সুযোগে ও স্থানীয় বাজারের প্রয়োজনে ইহার সংগঠন ও বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। এই অঞ্চলের ইস্পাত শিল্প মূলত আপালাচিয়ান কয়লা ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল। কৃষি, যন্ত্রপাতি, রেল-ইঞ্জিন, মোটর গাড়ি, রেলের কামরা, বগী, ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ ইত্যাদি এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।

(৩) উত্তর-পূর্ব পেনসিলভ্যানিয়া ও মধ্য আটলান্টিক উপকূল অঞ্চল : ইহা সাধারণত পূর্বাঞ্চল (Eastern Steel Region) বা মধ্য আটলান্টিক উপকূল অঞ্চল বলিয়া পরিচিত। মধ্য আটলান্টিক উপকূলে মেরীল্যান্ড রাজ্যের বাল্টিমোর

হইতে উত্তরে ম্যাসাচুসেটস্ পর্যন্ত এই অঞ্চল বিস্তৃত। পেনসিলভ্যানিয়া ও পশ্চিম ভার্জিনিয়ার কয়লা ও হ্রদ অঞ্চলের লৌহ আকরিকের সাহায্যে এই শিল্পাঞ্চলের গোড়াপত্তন হইলেও বর্তমানে এই অঞ্চলে ব্রেজিল, চিলি, কিউবা প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানিকৃত লৌহ আকরিক অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কানাডা, স্পেন, আলজিরিয়া প্রভৃতি স্থান হইতেও আটলাণ্টিক পথে লৌহ আকরিক আমদানি করা হয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি করা হয়। নিউ ইয়র্ক, জন্সটাউন, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর ও স্প্যারোসপয়েণ্ট, মরিসভিল, ঈস্টন প্রভৃতি এই অঞ্চলের লৌহ-ইস্পাত, সংশ্লিষ্ট নানাবিধ শিল্পের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র।

(৪) **বার্মিংহাম অঞ্চল**: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত আলাবামা রাজ্যে রেড পর্বতের লৌহ আকরিক ও চুনাপাথর এবং ওয়ারিয়র উপত্যকার কয়লা ও ডলোমাইটের সাহায্যে লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইয়াছে। বার্মিংহাম এই শিল্পকেন্দ্রের মধ্যমণি।

উপরি-উক্ত চারিটি অঞ্চল ব্যতীত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে কলোরাডো, ক্যালিফোর্নিয়া, ঈউটা প্রভৃতি রাজ্যেও বিক্ষিপ্তভাবে লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কলোরাডো রাজ্যের পুয়েব্লো, ক্যালিফোর্ণিয়ার ফণ্টানা এবং ঈউটার প্রোভো উল্লেখযোগ্য লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র।

জাপান: উৎকৃষ্ট কয়লা ও লৌহ আকরিক উৎপাদনে জাপানের স্থান নগণ্য হইলেও ইস্পাত উৎপাদনে ইহার স্থান বর্তমান বিশ্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাপান এশিয়ার বৃহত্তম এবং পৃথিবীর তৃতীয় ইস্পাত-উৎপাদক দেশ। প্রয়োজনের মাত্র শতকরা ১৫ ভাগ লৌহ পিণ্ড এই দেশে উৎপন্ন হইলেও বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানিকৃত কাঁচা মালের সাহায্যে জাপান ইহার সুবৃহৎ ইস্পাত কেন্দ্রগুলি গড়িয়া তুলিয়াছে। এই দেশ ভারত, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, চীন, কানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে লৌহ আকরিক, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে কোককয়লা আমদানি করিয়া থাকে। সুনিপুণ শ্রমিক, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, বন্দরের সান্নিধ্য, সরকারী নীতি ইত্যাদির অনুকূল পরিবেশের ফলে জাপান বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্পাত উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

পশ্চিম জার্মানি: লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে পশ্চিম জার্মানি বর্তমান বিশ্বে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অবিভক্ত জার্মানি ইস্পাত উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় ছিল। এই দেশে স্থানীয় লৌহ আকরিকের অভাবহেতু ফ্রান্স, সুইডেন, স্পেন, কানাডা, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশ হইতে সুলভে আকরিক আমদানি করা হয়। লৌহ-ইস্পাত শিল্প প্রধানত দুইটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত, যথা— (১) নিম্ন রাইন উপত্যকার রুঢ় ও (২) পশ্চিম জার্মানি ও ফ্রান্স সীমান্তে সার অঞ্চল।

(১) **রুঢ় (Ruhr) অঞ্চল**: রুঢ়, রাইন ও লিপে নদীর অববাহিকা অঞ্চলে প্রচুর উচ্চমানের কয়লা মজুত আছে। অধিকন্তু রেল সড়ক ও নদী-খাল পথে সুলভে আকরিক লৌহ আমদানি করিবার সহজ সুযোগ থাকার ফলে এই অঞ্চলেই জার্মানির

গুরুত্বপূর্ণ লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয় আকরিক ব্যতীত ফ্রান্স, সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি দেশ হইতে এই অঞ্চলের জন্য প্রচুর আকরিক আমদানি করা হয়।

(২) **সার (Saar) অঞ্চল** : স্থানীয় কয়লা ও লৌহ আকরিকের উপর এই অঞ্চলের ইস্পাত শিল্প নির্ভরশীল। কিন্তু আকরিকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য ফ্রান্সের লোরেন অঞ্চল হইতে এখানে আকরিক লৌহ আমদানি করা হয়। জার্মানির মোট লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ রূঢ় অঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থানীয় কয়লা, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, সুদক্ষ শ্রমিকের যোগান, সরকারের সহযোগিতা এই দেশের শিল্পোন্নতির প্রধান সহায়ক। এই অঞ্চলের ইস্পাত শিল্প কেন্দ্রগুলির মধ্যে এসেন, ডার্টমুন্ড, ডুসেলডর্ফ, বোচাম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৃটিশ যুক্তরাজ্য (United Kingdom) : বৃটিশ যুক্তরাজ্য বা বৃটেন একসময় লৌহ-ইস্পাত শিল্পে বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করিত। যুক্তরাজ্যে কয়লা, চুনাপাথর ও লৌহ আকরিকের পাশাপাশি অবস্থান অতীতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সাম্প্রতিককালে এই দেশের বহু অঞ্চলে আকরিক প্রায় নিঃশেষিত হওয়ায় ও কয়লার পরিমাণও কমিয়া যাওয়ায় যুক্তরাজ্য লৌহ-ইস্পাত শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব হারাইয়াছে। বর্তমানে ইহার স্থান খুবই নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে। ফ্রান্স, সুইডেন, কানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে যুক্তরাজ্যে আকরিক আমদানি করা হয় বলিয়া বর্তমানে এই দেশের ইস্পাত শিল্প বন্দরকেন্দ্রিক হইয়া পড়িতেছে। যুক্তরাজ্যের লৌহ-ইস্পাত শিল্পকে প্রধানত (১) উত্তর-পূর্ব উপকূল অঞ্চল, (২) মধ্যাঞ্চল, (৩) দক্ষিণ ওয়েলস্ ও (৪) স্কটল্যাণ্ডের মধ্যাঞ্চলের নিম্নভূমি—এই চারিটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) **উত্তর পূর্ব-উপকূল অঞ্চল** : ক্লীভল্যাণ্ড পার্বত্য অঞ্চলের লৌহ আকরিক এবং নর্দাম্বারল্যাণ্ড ও ডারহামের কয়লা খনিকে কেন্দ্র করিয়া এই অঞ্চলের ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে সুইডেন হইতে উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক এই অঞ্চলে আমদানি করা হয়। মিডলস্‌বরো, হার্টল্‌পূল, ডার্লিংটন, নিউক্যাসল্ প্রভৃতি এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র।

(২) **মধ্যাঞ্চল** : পেনাইন পর্বতের পূর্বদিকে নটিংহামশায়ার ও ডার্বিশায়ারের কয়লা খনিকে কেন্দ্র করিয়া মধ্যাঞ্চলের লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। শেফিল্ড, ব্ল্যাক কাণ্ট্রির অন্তর্ভুক্ত বার্মিংহাম, কভেণ্ট্রি, ডাডলি, রেডডিচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য লৌহ-ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র।

(৩) **দক্ষিণ ওয়েলস্** : স্থানীয় কয়লা, চুনাপাথর ও লৌহ আকরিক-নির্ভর এই অঞ্চলের লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্রগুলি কার্ডিফ, সোয়ানসি, টিডভিল, ল্যানলি প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত।

(৪) **স্কটল্যাণ্ডের মধ্যভাগের সমভূমি** : ক্লাইড নদীর খাড়ি অঞ্চলেই এই অঞ্চলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লৌহ-ইস্পাত শিল্প অবস্থিত। স্থানীয় কয়লা, চুনাপাথর

ও লৌহ আকরিক এই অঞ্চলের লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। গ্লাসগো এই অঞ্চলের বিখ্যাত লৌহ-ইস্পাত ও জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। জাহাজ নির্মাণ এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ফ্রান্স : ইউরোপের বিখ্যাত লৌহ আকরিক ক্ষেত্র আলসাস-লোরেন ফ্রান্সে অবস্থিত। লোরেন অঞ্চলেই এই দেশের সর্বাধিক লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। কয়লার অভাব হেতু যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানি প্রভৃতি দেশ হইতে কয়লা আমদানি করিয়া ফ্রান্সে লৌহ-ইস্পাত উৎপাদন করা হয়। লোরেন অঞ্চলের ন্যান্সি, ক্রুজো, নর্মাণ্ডির কায়েন, মধ্যাঞ্চলের সাঁ্যাতেতিএঁ, ভ্যালেঁসিএঁ প্রভৃতি এই দেশের উল্লেখযোগ্য লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র।

চীন : চীনে প্রচুর কয়লা সম্পদ বর্তমান। লৌহ আকরিক কিছুটা বিক্ষিপ্ত। তথাপি সাম্প্রতিক কালে এই দেশ লৌহ-ইস্পাত শিল্পে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। চীনের প্রধান লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্রগুলি মাঞ্চুরিয়া, ইয়াংসি উপত্যকা ও উত্তর চীনে অবস্থিত। মাঞ্চুরিয়ার আনসানে চীনের বৃহত্তম ও এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। চুংকিং, পিকিং, মুকডেন টিয়েনসিন প্রভৃতি চীনের উল্লেখযোগ্য লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র।

উপরি-উক্ত দেশগুলি ব্যতীত অন্তর্দেশীয় বাজারের চাহিদা মিটাইবার জন্য অন্যান্য দেশেও স্থানীয় কয়লা, লৌহ আকরিক প্রভৃতির সাহায্যে লৌহ-ইস্পাত শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

মেক্সিকো : (মনটেরে ও মনক্লোভা সরকারী প্রচেষ্টায় গঠিত ইস্পাত কেন্দ্র), **ব্রেজিল** (ভোল্টা ও বেডোণ্ডা), **ভারত** (জামসেদপুর, বার্নপুর, দুর্গাপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লা ইত্যাদি), **বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ইতালি, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া** প্রভৃতি দেশে ইস্পাত শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়াছে।

বাণিজ্য : এই যুগ ইস্পাত-নির্ভর সভ্যতার যুগ হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লৌহ ইস্পাতের গুরুত্ব অধিক। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ইস্পাতের উৎপাদন যথেষ্ট বেশি হইলেও আভ্যন্তরীণ চাহিদাও খুবই বেশি। লৌহ-ইস্পাতজাত যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদির বাণিজ্যিক লেনদেনই বেশি হয়। বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, পশ্চিম জার্মানি ও ফ্রান্স প্রধান ইস্পাত রপ্তানিকারক দেশ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান ইস্পাত ও ইস্পাতজাত দ্রব্যাদি অধিক রপ্তানি করিয়া থাকে। আমদানিকারক দেশের মধ্যে নরওয়ে, সুইডেন, ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ উল্লেখযোগ্য।

[**প্রশ্ন :** (১) লৌহ-ইস্পাত শিল্প সংগঠনের অনুকূল উপাদান কি কি? (২) ইস্পাত শিল্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার প্রাধান্যের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। (৩) জাপান ও বৃটেনে ইস্পাত শিল্প বন্দর-কেন্দ্রিক হওয়ার কারণ নির্দেশ কর। (৪) সুইডেন, স্পেন, কিউবা, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের আকরিক লৌহ রপ্তানি করার কারণ কি?]

বয়ন শিল্প
(Textile Industries)

আদিম মানুষ প্রথমে গাছের পাতা ও বল্কল পরিধেয় হিসাবে ব্যবহার করিত। ক্রমে কার্পাস তূলা হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া হস্তচালিত তাঁতে কাপড় বুনিতে শেখে। শিল্প-বিপ্লবের ফলেই আধুনিক যন্ত্রচালিত বয়ন শিল্পের প্রথম প্রচলন হয় বৃটেনে। এই সময় প্রথম 'ফ্লাই শাটল' (Fly Shuttle) আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার পর একে একে হারগ্রিভসের 'কার্ডিং মেশিন', আর্করাইট ও ক্রম্পটনের 'স্পিনিং জেনি', কার্টরাইটের শক্তিচালিত তাঁত, হুইটনির বয়ন যন্ত্র, বেলের বস্ত্র ছাপার যন্ত্র ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয় এবং বৃটিশ যুক্তরাজ্যের বয়ন শিল্পে ইহার প্রথম প্রয়োগ হয়। ফলে বয়ন শিল্পে বৃটিশ যুক্তরাজ্য পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। প্রথম দিকে বৃটিশ যুক্তরাজ্য অন্যান্য দেশে এই সকল নবাবিষ্কৃত কারিগরি বিদ্যার প্রসার রোধ করিবার জন্য নানাবিধ বাধানিষেধের ব্যবস্থা করে। কিন্তু উদ্যোগী ব্যবসায়ী ও অভিযাত্রীদের প্রচেষ্টায় ক্রমে ক্রমে এই সকল কলা-কৌশল ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আধুনিক বয়ন শিল্পের কম-বেশি প্রসার ঘটিয়াছে।

বয়ন শিল্পকে কাঁচামালের বিভিন্নতা অনুযায়ী পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়— (১) কার্পাস বস্ত্র বয়নশিল্প, (২) পশম বয়ন শিল্প, (৩) রেশম বয়ন শিল্প এবং কৃত্রিম রেশম বয়ন শিল্প এবং (৫) পাট শিল্প।

কার্পাস বস্ত্র-বয়ন শিল্প
(Cotton Textile Industry)

কার্পাস বস্ত্র-বয়ন শিল্পই সম্ভবত পৃথিবীর **প্রাচীনতম সংগঠিত শিল্প**। ভারতেই এই শিল্পের প্রথম সূচনা হয়। পরবর্তী কালে শিল্প-বিপ্লবে ইহার প্রভূত উন্নতি ঘটে। কার্পাস তুলা হইতে সূতা তৈয়ারি করিয়া উহার দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা হয়। সুতরাং কার্পাস বয়ন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল তুলা। অন্যান্য উপাদানের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি, সুদক্ষ শ্রমিক, মূলধন, যন্ত্রপাতি, বাজার, পরিবহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কার্পাস শিল্প প্রসারের প্রথম যুগে আর্দ্র জলবায়ু এই শিল্পের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। কারণ শুষ্ক আবহাওয়ায় সূক্ষ্ম কার্পাস তন্তু যন্ত্রের আবর্তনের সাধারণ টানাপোড়েনে ছিঁড়িয়া যাইত। বর্তমান কালে কারখানার অভ্যন্তরে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করা যায় বলিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার শুষ্ক আবহাওয়াযুক্ত অঞ্চলেও এই শিল্পের সংগঠন সম্ভব হইয়াছে।

কার্পাস বয়ন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কার্পাস বিশুদ্ধ বস্তু (Pure বা non-weight-loosing material) অর্থাৎ কাঁচা তুলা হইতে সূতা ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা পর্যন্ত ইহার ওজন প্রায় একই থাকে এবং উৎপাদন অঞ্চল হইতে যে কোন স্থানেই কাঁচা তুলা অথবা কার্পাস বস্ত্রের পরিবহণ ব্যয় প্রায় একই পড়ে। এই কারণে কার্পাস বয়ন শিল্প কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলে বা বাজারের সন্নিকটে বা কোন আমদানি-রপ্তানি

বন্দরের নিকট গড়িয়া উঠিতে পারে। এই সুবিধার জন্য এই শিল্পকে **বিচরণশীল শিল্প** (**Foot-loose Industry**) বলা হয়। কার্পাস বস্ত্রাদি ভোগ্যপণ্য বলিয়া সাধারণত ইহা বাজারভিত্তিক এবং বাজারের সন্নিকটেই ইহার অবস্থান বেশি দৃষ্ট

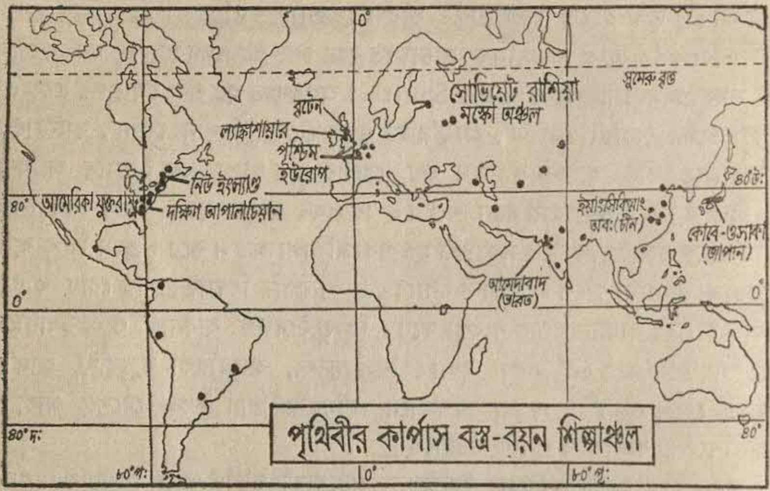

চিত্র ১৭·২ : পৃথিবীর কার্পাস বস্ত্র-বয়ন-নির্দেশক শিল্পাঞ্চলসমূহ

হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি দেশে কার্পাস অঞ্চলেই এই শিল্পের একদেশীভবন ঘটিলেও বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশে কার্পাস বয়ন শিল্প আমদানিকৃত তুলার উপর নির্ভরশীল বলিয়া বাজার বা বন্দরের নিকটবর্তী অঞ্চলেই ইহার সমাবেশ ঘটিয়াছে।

পৃথিবীর কার্পাস বয়ন শিল্পাঞ্চল : তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলের তুলনায় শিল্পোন্নত দেশেই কার্পাস বয়ন শিল্প বেশি প্রসার লাভ করিয়াছে। বর্তমানে এই শিল্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়। কার্পাস বয়ন শিল্পে উন্নত অন্যান্য দেশের মধ্যে চীন, জাপান, ভারত, বৃটেন, ফ্রান্স জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশ উল্লেখযোগ্য।

পৃথিবীতে কার্পাস তন্তু ও বস্ত্রের উৎপাদন

দেশ	তন্তু (ল. মে. ট)		বস্ত্র (মি. মিটার)	
	১৯৮০	১৯৮৩	১৯৮০	১৯৮৩
চীন	২৯ ৩০	৩২·৮৫	১৩,৪৭০	১৫,০০৬
সোঃ ইউনিয়ন	১৬·৩৬	১৬·৪৫	৭,৭১৮	৮,১৪৩
ভারত	১১·৯৯	৯.৫৯	৮,৩১৪	৭,৭৪৩
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	১১·১৯	৯·৮৮	৪,৩৫৫	২,৪২৬
জাপান	৫·৩১	৪·৩৮	২,২০২	২,০৭৮

[Source : UNO Monthly Bulletin of Statistics November, 1984.]

এশিয়া : সোভিয়েত ইউনিয়ন : কার্পাস বয়ন শিল্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন একসময় বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশ ছিল। বর্তমানে ইহার স্থান দ্বিতীয়। ১৯১৭-১৯ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বেও এই শিল্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল। তখন এই দেশে কার্পাস বয়ন শিল্প প্রধানত দেশের রাজধানী মস্কো ও ইউরোপের সম্মুখস্থ বন্দর লেলিনগ্রাদকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার মূলে ছিল চাহিদাযুক্ত বাজারের সুবিধা। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসৃত হওয়ায় বর্তমানে এই শিল্প মধ্য এশিয়ার তুলা উৎপাদক অঞ্চলেই বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। তথাপি প্রাচীন কেন্দ্রগুলির গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। এই দেশের পর্যাপ্ত তুলা, দক্ষ শ্রমিক, জলবায়ু, মূলধন, উন্নত বাজার, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি সরকারী নীতি এই দেশের কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতির বিশেষ সহায়ক। মস্কো অঞ্চলের আইভানোভো রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্পাস বয়ন কেন্দ্র। ইহাকে 'রাশিয়ার ম্যাঞ্চেস্টার' বলা হয়। প্রাচীন অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে মস্কো, ভ্লাদিমির, ইয়ারস্লাভল, লেলিনগ্রাদ বিখ্যাত। মধ্য এশিয়ার তাসখন্দ, ফারগানা ও আশকাবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্পাস বয়ন শিল্পকেন্দ্র। অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে আজারবাইজানের কিরোভাবাদ, আর্মেনিয়ার লনিনকান, ভলগা অঞ্চলের কোমিসিন ও পশ্চিম সাইবেরিয়ার বার্নাউল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চীন : চীন কার্পাস বয়ন শিল্পে বিশেষ উন্নত। স্থানীয় কাঁচা তুলা, পরিশ্রমী ও দক্ষ শ্রমিক, আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও সর্বোপরি বিপ্লবোত্তর সরকারের সমাজতান্ত্রিক নীতি এই দেশকে কার্পাস বয়ন শিল্পে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। ইয়াং-সি-কিয়াং ও সি-কিয়াং নদী অববাহিকা অঞ্চলে প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন হয়। স্থানীয় সুনিপুণ শ্রমিক, উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাপক চাহিদা এবং মূলধন, যন্ত্রপাতির সহজ যোগান এই দেশের কার্পাস বয়ন শিল্পকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়াছে। বর্তমানে ইহা বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই দেশের কার্পাস বয়ন শিল্প উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের সাংহাই, নানকিং, হ্যাংচাও ও তিয়েনসান প্রভৃতি স্থানে বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে লুপে, হোনান, শেনসি ও সিংকিয়াং অঞ্চলেও বহু কার্পাস বয়ন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে চীন কার্পাস বস্ত্রের রপ্তানি বাণিজ্যেও অংশগ্রহণ করিতেছে।

ভারত : কার্পাস বয়ন শিল্পে ভারতের স্থান পৃথিবীতে এক সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমানে ইহার স্থান তৃতীয়। ভারতের ঢাকাই মসলিন ও কেরালার কেলিকো তখন বিশ্বের বিভিন্ন রাজদরবারে সমাদৃত হইত। হস্তচালিত তাঁতেই তখন বস্ত্র উৎপন্ন হইত। আধুনিক যন্ত্রচালিত কার্পাস বয়ন শিল্পের উদ্ভব ঘটে ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। পরে ১৯০৫ সাল হইতে এই শিল্পের ক্রমোন্নতি ঘটে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। স্থানীয় দক্ষ শ্রমিক, আর্দ্র জলবায়ু, ব্যাপক বাজার এই শিল্পের গঠন ও প্রসারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

বর্তমানে ভারতের চারিটি অঞ্চলে কার্পাস শিল্পের একদেশীভবন লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমাঞ্চলে বোম্বাই, আমেদাবাদ, দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাঙ্গালোর, কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই, পূর্বাঞ্চলে কলিকাতা, হুগলী, ২৪-পরগণা ও উত্তরাঞ্চলে দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি স্থানে এই শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। উপরি-উক্ত চারিটি অঞ্চল ব্যতীত স্বাধীনতা উত্তর যুগে অমৃতসর, যোধপুর, নাগপুর, ভুপাল, পাটনা প্রভৃতি শহরে বিক্ষিপ্তভাবে কার্পাস শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছে। আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া ভারত প্রচুর পরিমাণে কার্পাস বস্ত্র ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে রপ্তানি করিয়া থাকে।

জাপান: অতি প্রাচীন কাল হইতেই জাপান কার্পাস বয়ন শিল্পে ও বিশ্বের বাজারে সূতীবস্ত্র রপ্তানিতে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। এই দেশে জলবায়ুর কারণে তুলার অভাব। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, ভারত প্রভৃতি দেশ হইতে এই দেশ প্রচুর তুলা আমদানি করে। দেশের বড় বড় কারখানায় সূতা প্রস্তুত করিয়া কুটির শিল্পে এই সূতা সরবরাহ করা হয় এবং কুটির শিল্পের মাধ্যমে এই দেশের বেশির ভাগ বস্ত্র উৎপন্ন হয়। তুলার অভাব থাকা সত্ত্বেও উন্নত যন্ত্রশিল্প, সুলভ জলবিদ্যুৎ, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, সুদক্ষ ও পরিশ্রমী শ্রমিক এবং সর্বোপরি সরকারী আনুকূল্য এই দেশের কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে। হনসু দ্বীপের কানসাই জিলাতে সর্বাধিক কাপড়ের কল অবস্থিত। এই দেশে টোকিও হইতে কোবে পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় কার্পাস বয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে। এই অঞ্চলের ওসাকা শহরকে প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার বলা হয়। বস্ত্র রপ্তানিতে জাপানি বর্তমানে শীর্ষস্থান অধিকার করে।

আমেরিকা—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র: পৃথিবীতে কার্পাস বয়ন শিল্পে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নবাগত হইলেও ইহার স্থান বর্তমানে চতুর্থ। বৃটিশ ঔপনিবেশিকরাই প্রথমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বভাগে নিউ-ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে কার্পাস বয়ন শিল্প গড়িয়া তোলে। ক্রমে এই দেশের তুলা উৎপাদক দক্ষিণাঞ্চলে ইহার প্রসার ঘটে। স্থানীয় প্রচুর তুলা, আর্দ্র জলবায়ু, শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য, জলপথ, রেলপথ ও সড়কপথে যোগাযোগ ও পরিবহণের সুব্যবস্থা, দক্ষ শ্রমিকের যোগান এবং ব্যাপক চাহিদা ইত্যাদির ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই দেশের কার্পাস বয়ন শিল্প বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করিয়াছে। বন্দরের সুবিধা এই শিল্পকে কার্পাস আমদানি ও বিদেশে বস্ত্র রপ্তানির সুযোগ আনিয়া দিয়াছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কার্পাস বয়ন শিল্পের সূচনা হয় ১৭৯০ সালে। এই সময় স্যামুয়েল স্লেটার নামক একজন ইংরেজ ভাগ্যান্বেষী ইংরেজ সরকারের সকলপ্রকার বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া আমেরিকার নিউ-ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে বসবাস করিতে আসেন ও নিজ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ কার্পাস বয়ন যন্ত্র নির্মাণ করেন। ঐ সময় ইংরেজ ঔপনিবেশিকগণ দক্ষিণাঞ্চলের তুলা ক্ষেত্র হইতে তুলা সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে রপ্তানির উদ্দেশ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্দর সন্নিহিত অঞ্চলে জমা করিত। ফলে ঐ

সহজলভ্য কাঁচামালের সাহায্যে নিউ-ইংল্যাণ্ড রাজ্যেই প্রথম কার্পাস বয়ন শিল্প গড়িয়া উঠে। প্রভিডেন্স, ফলরিভার, নিউবেডফোর্ড, লোয়েল, লরেন্স, হাভারভিল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ১৯২১ সালের পরবর্তী সময়ে এই শিল্প দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জর্জিয়া, আলাবামা, উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা, টেনেসি, ভার্জিনিয়া প্রভৃতি রাজ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। এই অঞ্চলে প্রধান কার্পাস বয়ন কেন্দ্রের মধ্যে অ্যাণ্ডারসন, আটলান্টা, শার্লোট, অগাস্টা কলম্বিয়া, গ্রীনসবরো, গ্রীনভিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ আঁশবিশিষ্ট উন্নতমানের কার্পাস উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও চাহিদা মিটাইতে মেক্সিকো, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ হইতে মধ্যম আঁশযুক্ত কার্পাস আমদানি করিয়া থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার বাজারে প্রচুর সূতীবস্ত্র রপ্তানি করিয়া থাকে।

ইউরোপ—বৃটেন : কার্পাস বয়ন শিল্পের ইতিহাসে বৃটেন বা বৃটিশ যুক্তরাজ্যের নাম চিরস্মরণীয়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে বৃটেনে শুধু বয়ন শিল্পের যন্ত্রপাতিই আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নহে, এই দেশ বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী কাল কার্পাস বয়ন শিল্প সংগঠনে ও উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানিতে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। জলবায়ুর কারণেই এই দেশ কার্পাসহীন। তথাপি মিশর, আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানিকৃত তুলার সাহায্যে উন্নত কার্পাস বয়ন শিল্প গড়িয়া তোলা যেমন কৃতিত্বের তেমনি গৌরবের। বৃটেনের পশ্চিম উপকূলে ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলে আমদানিকৃত তুলা, আর্দ্র জলবায়ু, বিদ্যুৎ শক্তি, দক্ষ শ্রমিক, যন্ত্রপাতি ও মূলধন প্রভৃতির আনুকূল্যে প্রথম কার্পাস বয়ন শিল্প গড়িয়া উঠে। ক্রমে ইহা বিশেষ জনপ্রিয় হয় এবং এশিয়া ও আফ্রিকার কলোনির বাজারে ইহার বিশেষ চাহিদাও দেখা যায়। ফলে বৃটেনে অতি দ্রুত এই শিল্পের প্রসার ঘটে। ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলের ম্যাঞ্চেস্টার পৃথিবীতে কার্পাস বয়ন শিল্পের আদর্শ। বর্তমানে বৃটেনের বিভিন্ন অঞ্চলেই এই শিল্পের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। ল্যাঙ্কাশায়ার ও ইহার সন্নিহিত ওল্ডহাম, বেরি, এসটন, রকডেল, বোল্টন এবং ইহার উত্তরে ম্যাকবার্ণ, বার্ণলে, প্রেস্টন, ব্ল্যাকপুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কার্পাস বয়ন কেন্দ্র। ইহা ব্যতীত চেশায়ার, ডার্বিশায়ার, গ্ল্যাসগো প্রভৃতি অঞ্চলেও কার্পাস বয়ন শিল্পের পত্তন ঘটিয়াছে।

ফ্রান্স : এই দেশে তুলার অভাব হেতু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে তুলা আমদানি করিয়া কার্পাস বয়ন শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সূতী বস্ত্রের উপর সূক্ষ্ম কাজ করা এই অঞ্চলের বিশেষত্ব। আলসাস অঞ্চলের মুল হাউস, ভোজ এবং উত্তরাঞ্চলের কয়লা খনি এলাকায় লীলে রুঁয়ে এই দেশের বিখ্যাত সূতীবস্ত্র কেন্দ্র।

পশ্চিম জার্মানি : এই দেশে যন্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটায় ক্রমে আমদানিকৃত তুলার সাহায্যে কার্পাস বয়ন শিল্প গড়িয়া তোলা হয়। সুনিপুণ শ্রমিক, রূঢ় অঞ্চলের শক্তি সম্পদ, রাইন-এলব প্রভৃতি নদী ও খালপথে যোগাযোগের সুবিধা ও দেশের অভ্যন্তরে চাহিদা জার্মানিতে এই শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে। রূঢ় অঞ্চলের বার্থেন ও এবারফিল্ড উল্লেখযোগ্য কার্পাস বয়ন শিল্পকেন্দ্র।

উপরি-উক্ত প্রধান কার্পাস বয়ন শিল্পকেন্দ্র ব্যতীত ইউরোপে পোল্যান্ড (লোজ), ইতালি (জেনোয়া), হল্যান্ড (গ্রনিঞ্জেন, এনসেডে, এঙ্গেলো, গ্লেডারল্যান্ড, অলডেনজাল), স্পেন (বার্সিলোনা), সুইজারল্যান্ড (জুরিক), বেলজিয়াম (ব্রুসেলস), চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আমেরিকায় কানাডা, মেক্সিকো, ব্রেজিল, আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, এশিয়ায় ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ায়ও কার্পাস বয়ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

বর্তমান অবস্থা ও বাণিজ্য: কার্পাস বয়ন শিল্প পৃথিবীর প্রাচীনতম সংগঠিত শিল্প। বর্তমানে রাসায়নিক তন্তু যেমন, রেয়ন টেরিলিন, পলিয়েস্টার ইত্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশে সূতী বস্ত্রের চাহিদা নিম্নমুখী। কৃত্রিম রাসায়নিক তন্তুর নানাবিধ অসুবিধা থাকায় তুলার সহিত উহার সংমিশ্রণ চলিতেছে। এই কারণে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশের কার্পাস বয়ন শিল্পের কিছুসংখ্যক কারখানার আধুনিকীকরণ করা হইয়াছে ও হইতেছে।

বর্তমানে বিশ্বের বহুদেশে কার্পাস বয়ন শিল্প স্থাপিত হইলেও আন্তর্জাতিক বাজারে সূতা ও সূতী বস্ত্রের চাহিদা প্রচুর। সূতা ও বস্ত্র রপ্তানিতে জাপান প্রথম ও ভারত দ্বিতীয়। ইহার পরেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের স্থান। চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি কার্পাস সূতা ও কার্পাসজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিয়া থাকে। আমদানিকারক দেশের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কাম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশগুলি, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

[প্রশ্ন : (১) কার্পাস বয়ন শিল্পকে বিচরণশীল শিল্প বলা হয় কেন ? (২) কার্পাস বয়ন শিল্প সংগঠনের অনুকূল উপাদান কি কি ? (৩) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কার্পাস বয়ন শিল্প সংগঠনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। (৫) আইভানোভোকে সোবিয়েত ইউনিয়নের ম্যানচেস্টার বলা হয় কেন ?]

পশম বয়ন শিল্প (The Woollen Industry)

অতি প্রাচীন কাল হইতেই শীতপ্রধান দেশে কুটির শিল্প হিসাবে পশম বয়ন শিল্পের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। শিল্প-বিপ্লবের ফলে কার্পাস বয়ন শিল্পের মত এই শিল্পেরও প্রভূত উন্নতি ঘটে। সূতী বস্ত্র প্রায় সকল দেশে সকল ঋতুতে কম-বেশি ব্যবহার করা যায়। পশম বস্ত্র প্রবল শীতের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ব্যবহার করা যায় না। এই কারণে পশম বস্ত্রের চাহিদা শীতপ্রধান দেশের মধ্যেই মুখ্যত সীমাবদ্ধ। অবশ্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বল্পস্থায়ী শীতকালে পশম বস্ত্রের চাহিদা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও বৎসরের অধিকাংশ সময় ইহার কোন চাহিদাই থাকে না।

পশম বয়ন শিল্পের প্রধান কাঁচা মাল পশম মেষের লোম হইতে উৎপন্ন হয়। পশমের গায়ে মেষের চর্বি লাগিয়া থাকে বলিয়া অ্যামোনিয়া মিশ্রিত জলে ইহা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। পশমের যোগান মেষ প্রতিপালনের উপর নির্ভরশীল।

জলবায়ুর কারণে মেষ প্রতিপালন উত্তর গোলার্ধের তুলনায় দক্ষিণ গোলার্ধেই অধিক পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধ জনবিরল। এই কারণে পশমের বাজার জনবহুল উত্তর গোলার্ধেই বিস্তৃত। পশম বয়ন শিল্পের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলির সুষ্ঠু সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন :—(১) কাঁচা মাল—মেষ লোম বা পশম, (২) শক্তি সম্পদ—তাপবিদ্যুৎ বা জলবিদ্যুৎ, (৩) শ্রমিক, (৪) মূলধন—আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রভূত অর্থের যোগান, (৫) বাজার—নিয়মিত চাহিদাযুক্ত ব্যাপক বাজার (৬) পরিবহণ ব্যবস্থা—স্বল্প ব্যয়ে কাঁচা পশম আমদানি ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাজারে প্রেরণের সহায়ক উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা। কাঁচা পশম হইতে নানা প্রক্রিয়ায় সুতা প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে পশমের ওজন কিছুটা পরিমাণে হ্রাস পায়। ইহাকে বিশুদ্ধ কাঁচা মালের পর্যায়ে ধরা হয়. ফলে এই শিল্পের সংগঠন বাজারের অবস্থান ও বিস্তৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

পশম বয়ন শিল্পাঞ্চল : বর্তমানে দক্ষিণ গোলার্ধের অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, আর্জেন্টিনা উরুগুয়ে প্রভৃতি সর্বপ্রধান পশম উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারী (৯৮%) দেশ হওয়া সত্ত্বেও উত্তর গোলার্ধের সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান, বৃটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃ'ত দেশেই পশম বয়ন শিল্পের বিস্ময়কর প্রসার ও উন্নতি ঘটিয়াছে। অন্যান্য পশম বস্ত্র উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে পোল্যাণ্ড, ইতালি, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়াম, রুমানিয়া, নেদারল্যাণ্ডস্, পূর্ব জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, আর্জেন্টিনা, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশেও বর্তমানে স্থানীয় চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে পশম বয়ন শিল্পের প্রসার ঘটিতেছে। পৃথিবীতে উৎপাদিত পশমের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর পশম তন্তু ও বস্ত্রের উৎপাদন

দেশ	তন্তু (ল. মে. ট.)		বস্ত্র (মি. মিটার)	
	১৯৮১	১৯৮৩	১৯৮১	১৯৮৩
সোঃ ইউনিয়ন	৪'৫৭	৪'৭৮	৯৭১'৫০	৯৮৯ ৫০
বৃঃ যুক্তরাজ্য	১'৩১	১'২১	৯৭'০৮	৯৩ ৯৬
ফ্রান্স	১'২৫	১'০৮	১১০'৭৬	৭৫'৯৬
জাপান	১'১৩	১'১০	২৪২'৪০	৩০১'৮০
পোল্যান্ড	০'৮৯	০'৭৪	১০৫'৬০	৯৮'৪০
চীন	০'৭৬	০'৯৩	১৬৬'৬০	১৭৫'০০
বেলজিয়াম	০'৭৮	০'৮৭	৩৫'৬৪	৩৬ ০০
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	০'৬১	০'৬৩	১০৫'০০	১১০'০০

সোভিয়েত ইউনিয়ন : পশম বয়ন শিল্পে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থান বর্তমান বিশ্বে প্রথম। এই দেশে প্রচুর মেষ প্রতিপালিত হয়। কাঁচা পশমের যেমন সহজ যোগান রহিয়াছে তেমনি রহিয়াছে কয়লা, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি শক্তি সম্পদ, সুনিপুণ শ্রমিক, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ ব্যাপক বাজার, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি বিষয়ের আনুকূল্য। এই সকল কারণেই এই দেশের পশম বয়ন শিল্পের দ্রুত উন্নতি লাভ সম্ভব হইয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ইউরোপের অন্তর্গত অঞ্চলেই এই শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটে। মস্কো ও লেনিনগ্রাদ অঞ্চল প্রধানত মিহি পশমী বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। ভল্গা, ইউক্রেন, কাজাকস্থান, ককেসাস প্রভৃতি মোটা পশমী বস্ত্র উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ইউক্রেনে খারকফ ও ক্রমেনটুগ, জর্জিয়ায় কুতায়িসি, টিবলিস এবং কাজাকস্থানে সেমিপ্যালিটিনস্ক বিখ্যাত পশম বয়ন কেন্দ্র।

জাপান : পশম বয়ন শিল্পে জাপান এশিয়ার মধ্যে প্রথম এবং পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। এই দেশে কাঁচা পশম পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না বলিয়া অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আর্জেন্টিনা হইতে প্রচুর পশম আমদানি করিয়া থাকে। দক্ষ শ্রমিক, বন্দরের নৈকট্য, সুলভ জলবিদ্যুৎ, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, ব্যাপক আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজার এবং অনুকূল সরকারী শিল্পনীতি এই দেশে পশম বয়ন শিল্পের সংগঠন ও বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ওসাকা ও আইচি অঞ্চলে জাপানের পশম বয়ন শিল্পের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে।

বৃটেন : বৃটিশ যুক্তরাজ্যের পশম বয়ন শিল্প অতি প্রাচীন। পিনাইন পর্বতের পূর্বঢালে প্রচুর মেষ প্রতিপালিত হয়। এই মেষ ক্ষেত্র হইতে প্রচুর উৎকৃষ্ট পশম পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন হইতেও বৃটেন প্রচুর পশম আমদানি করিয়া থাকে। স্থানীয় কয়লা, সুদক্ষ শ্রমিক, অনুকূল জলবায়ু, বন্দরের নৈকট্য, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, সুবিস্তৃত বাজার ও মূলধনের সহজ যোগান এই দেশের পশম বয়ন শিল্পের প্রসারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। বৃটেনে ইয়র্কশায়ার অঞ্চলেই এই শিল্পের একদেশীভবন ঘটিয়াছে। লীডস, ব্র্যাডফোর্ড, হাডার্সফিল্ড, হ্যালিফ্যাক্স, ডিউসবেরী, ওয়েকফিল্ড প্রভৃতি ইয়র্কশায়ারের উল্লেখযোগ্য পশম বয়ন কেন্দ্র। এই অঞ্চলের অনেক কেন্দ্রেই বিশেষ উচ্চশ্রেণীর পশমবস্ত্র তৈয়ারি করা হয়। ইয়র্কশায়ার ব্যতীত পূর্ব ল্যাঙ্কাশায়ার, উত্তর ও পূর্ব ম্যাঞ্চেস্টার, পশ্চিম ইংল্যাণ্ড (উইটনে, ট্রব্রিজ, ডারসলে), ওয়েলস্‌, লিস্টারশায়ার, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলেও পশম বয়ন শিল্প প্রসারলাভ করিয়াছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র : পশম বয়নশিল্পে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থান কার্পাস বয়ন শিল্পের ন্যায় তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। এই দেশের পশ্চিমাঞ্চলেই প্রধানত মেষ প্রতিপালিত হয়। কিন্তু উৎপন্ন পশম চাহিদার তুলনায় স্বল্প হওয়ায় এই দেশ আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হইতে প্রচুর কাঁচা পশম আমদানি করে। এই দেশে বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনের যুগ হইতেই উত্তর-পূর্বাংশে উত্তর আটলান্টিক তীরস্থ মেইন হইতে মেরীল্যাণ্ড পর্যন্ত রাজ্যগুলিতেই কার্পাস ও পশম

বয়ন শিল্পের প্রসার ঘটে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ পশম বয়ন শিল্প এই উত্তর-পূর্বাংশের দক্ষিণ পেনসিলভ্যানিয়া, নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মেইন ও নিউ-ইংল্যান্ড রাজ্যে অবস্থিত। সুলভ জলবিদ্যুৎ, ইংল্যান্ড হইতে আগত সুদক্ষ কর্মী, বন্দরের নৈকট্য, আভ্যন্তরীণ চাহিদা ইত্যাদি এই অঞ্চলে পশম শিল্পের কেন্দ্রীভবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। ফিলাডেলফিয়া, ক্লীভল্যান্ড, নিউইয়র্ক এই দেশের প্রধান পশম বয়ন শিল্পকেন্দ্র।

বাণিজ্য : পশম বস্ত্রের উৎপাদন ও চাহিদা মুখ্যত শীতপ্রধান উন্নত দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই কারণে ইহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার সামান্যই পরিলক্ষিত হয়। জাপান, বৃটেন, ইতালি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ নিজেদের চাহিদা মিটাইয়া কিছু পরিমাণে পশম বস্ত্র ও সুতা রপ্তানি করিয়া থাকে। আমদানি-কারক দেশের মধ্যে সুইডেন, কানাডা, ডেনমার্ক, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ গোলার্ধে পশম-বয়ন শিল্পের অনুন্নতির কারণ—

পশম-বয়ন শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে পশম উৎপাদন-কারী দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহে এই শিল্প তেমন প্রসার লাভ করে নাই। ইহার কারণ—(১) দক্ষিণ গোলার্ধের দেশসমূহ জনবিরল। পশমী বস্ত্রের চাহিদা খুবই কম ফলে বাজার সীমাবদ্ধ। (২) পশম মুখ্যত বিশুদ্ধ কাঁচা মাল (Pure material)। ইহার পরিবহণ ব্যয় স্থির। এই কারণে পৃথিবীর যে কোন স্থানেই পশম শিল্প সংগঠন সম্ভব। (৩) দক্ষিণ গোলার্ধে শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দক্ষ কারিগরের অভাব। (৪) পশম দীর্ঘদিন গুদামজাত থাকিলেও নষ্ট হয় না। ফলে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ সুবিধাজনক। (৫) রাজনৈতিক কারণে দক্ষিণ গোলার্ধের পশম উৎপাদনকারী দেশগুলির উপর বৃটেন ও আমেরিকার কর্তৃত্ব থাকায় ঐ সকল দেশে পশম-বয়ন শিল্প সংগঠনে উহারা কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। (৬) কাঁচা মালের কারণে পশম শিল্প বিচরণশীল শিল্প (Foot-loose Industry)। ইহার সংগঠন বাজার ভিত্তিক। ফলে দক্ষিণ গোলার্ধের জনবিরল অঞ্চলের তুলনায় উত্তর গোলার্ধের জনবহুল অঞ্চলেই ইহার সংগঠন ব্যাপক হইয়াছে।

[প্রশ্ন : (১) পশম-বয়ন শিল্প সংগঠনের বৈশিষ্ট্য কি? (২) উত্তর গোলার্ধে পশম-বয়ন শিল্পের একদেশীভবনের কারণ কি? (৩) দক্ষিণ গোলার্ধে পশম-বয়ন শিল্পের অনুন্নতির কারণ কি? (৪) বিশ্বের পশম-বয়ন শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

রেশম বয়ন শিল্প (The Silk Industry)

অতিপ্রাচীন কাল হইতেই রেশমের জন্য গুটিপোকা প্রতিপালন এবং ঐ গুটি হইতে রেশম সুতা সংগ্রহ ও বস্ত্রবয়ন চীন ও জাপানে কুটীর শিল্প হিসাবে প্রচলিত

আছে। ক্রমে এই শিল্প অনুকূল জলবায়ুযুক্ত বিশ্বের নানা অঞ্চলে প্রসার লাভ করে ও বর্তমানে ইহা আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন দেশে উন্নত যন্ত্র শিল্প হিসাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বে রেশমের বাজার যেমন উচ্চ ও তেমনি বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বর্তমানে কৃত্রিম রেশমের সহিত প্রতিযোগিতায় রেশমের মূল্য ও বাজার কিছুটা সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে।

রেশম বয়ন শিল্পের প্রধান কাঁচা মাল গুটিপোকার লালা হইতে তৈয়ারি গুটি হইতে নানা প্রক্রিয়ায় সুতা সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং গুটিপোকার ব্যাপক চাষের উপরই রেশমের যোগান নির্ভর করে। রেশম সংগ্রহের জন্য প্রচুর সুলভ সুনিপুণ শ্রমিকের সরবরাহ একান্ত প্রয়োজন। রেশমের সূক্ষ্ম ও নরম সুতা সংগ্রহে নারী শ্রমিক বিশেষ দক্ষ বলিয়া চীন, জাপান প্রভৃতি অঞ্চলে গুটি হইতে রেশম সংগ্রহে নারী শ্রমিকের নিয়োগ সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। রেশম অত্যন্ত হাল্কা ও বিশুদ্ধ কাঁচা মাল বলিয়া ইহার পরিবহণ ব্যয় অত্যন্ত কম। এই কারণে রেশম-উৎপাদক অঞ্চল ব্যতীত শিল্পোন্নত দেশগুলিতে আমদানিকৃত রেশমের সাহায্যে রেশম বয়ন শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে। রেশম বয়ন শিল্পের সংগঠনে কাঁচা মাল, শক্তিসম্পদ, পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদির আনুকূল্য যেমন প্রয়োজন তেমনি বাজার ও নিপুণ শ্রমিকের যোগানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

উৎপাদনকারী অঞ্চল : রেশম বয়ন কুটীর শিল্প হিসাবে এশিয়া মহাদেশের চীন ও জাপান দেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। চীন ও জাপান ব্যতীত এশিয়া মহাদেশে কোরিয়া, ভারত, তুরস্ক ও সিরিয়ায় রেশম বয়ন শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়াছে। ইউরোপে বৃটেন, ফ্রান্স ইতালি, পশ্চিম জার্মানি সুইজারল্যাণ্ড ও আমেরিকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে এই শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

জাপান : খাঁটি রেশম উৎপাদনে জাপান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশ। এই দেশে হনসু দ্বীপেই প্রধানত রেশম শিল্পের একদেশীভাব ঘটিয়াছে। বয়ন শিল্প গঠনের উপযোগী পরিবেশ ও স্থানীয় কাঁচা রেশম আহরণের সহজ সুযোগ এই অঞ্চলের উন্নতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এই অঞ্চলের নাগওয়া, বিওয়া, ওসাকা প্রভৃতি অঞ্চলে গুটি হইতে রেশম সুতা সংগ্রহ করা হয় এবং পশ্চিম উপকূলের কাবাজাওয়া, জিগাটা, কুকুই, কোয়াণ্টো, কিয়োটো ও টোচিগিতে রেশম-বয়ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া স্যভা, হসিকাওয়া, হর্মানিস অঞ্চলেও এই শিল্পের প্রসার লক্ষ্য করা যায়। নাগওয়া-ওসাকা এই শিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র। জাপান হইতে প্রচুর রেশম বস্ত্র ইউরোপ, আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে রপ্তানি হয়।

চীন : চীনদেশেই সম্ভবত প্রথম রেশম বয়ন শিল্প কুটির শিল্পের আকারে গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে ইয়াংসি ও ক্যাণ্টন নদীর উভয় তীরে এবং জে-কোয়ান উপত্যকায় এই শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। জে-কোয়ান, সাংহাই, হ্যাংকৌ,

দক্ষিণ ক্যাণ্টন প্রভৃতি স্থানে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত উন্নত রেশম বয়ন শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে।

ভারত: ভারতে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, কর্ণাটক, তামিলনাডু প্রভৃতি রাজ্যে রেশম শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র: এই দেশে সুতা উৎপন্ন না হইলেও আমদানিকৃত সুতার সাহায্যে রেশম বস্ত্র বয়নে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। জাপান, ইতালি প্রভৃতি দেশ হইতে এই দেশে রেশম সুতা আমদানি করা হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পেনসিলভ্যানিয়া, নিউ জার্সি, নিউইয়র্ক ও নিউ ইংল্যাণ্ড রাজ্যেই এই দেশের রেশম বয়ন শিল্প বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত। নিউ জার্সির প্যাটারসন প্রধান রেশম বয়ন শিল্পকেন্দ্র। অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে স্ক্যাণ্টন, উইলকিসবার, ইস্টন, অ্যালেনটাউন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইউরোপ: ইউরোপ মহাদেশে ইতালি ও দক্ষিণ ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে খাঁটি রেশম সংগ্রহ করা হয়। এশিয়া হইতেও এই মহাদেশে প্রচুর রেশম সুতা আমদানি করা হয়। ফ্রান্সের রোম উপত্যকায় লিয়ঁ সমগ্র ইউরোপে রেশম বয়ন শিল্পের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ইতালি দেশের মিলান, সুইজারল্যাণ্ডের জুরিক ও পশ্চিম জার্মানির ক্রেফেল্ড প্রভৃতি ইউরোপের বিখ্যাত রেশম শিল্পকেন্দ্র। বৃটেনে এই শিল্পের তেমন প্রসার ঘটে নাই। চেশায়ার ও স্ট্যাফোর্ডশায়ারে এই দেশের প্রধান রেশম শিল্প-কেন্দ্র অবস্থিত। স্পেনদেশে মাদ্রিদ ও বার্সিলোনায় রেশম বয়ন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাণিজ্য: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একদিন রেশম বস্ত্রের বিশেষ চাহিদা ছিল। কিন্তু বর্তমানে কৃত্রিম রেশমের আবিষ্কারের ফলে খাঁটি রেশমের বাজার-দর ও চাহিদা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। জাপান, চীন, ফ্রান্স, ইতালি, ভারত প্রভৃতি দেশ স্থানীয় চাহিদা পূরণ করিয়া শিল্পোন্নত ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে কিছু পশমবস্ত্র রপ্তানি করিয়া থাকে। সুতরাং আমদানিকারক দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানি প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলির নাম উল্লেখ্য।

[প্রশ্ন: (১) রেশম শিল্প সংগঠনের উপযোগী পরিবেশ কি কি? (২) জাপান রেশম শিল্পে উন্নত কেন?]

কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন বয়ন শিল্প (The Artificial Silk or Rayon Industry)

সাম্প্রতিক কালে পরিধেয় হিসাবে বহুল ব্যবহৃত রেয়ন একপ্রকার কৃত্রিম রাসায়নিক তন্তু। সাধারণত সরলবর্গীয় বৃক্ষের অন্তর্গত পাইন, স্প্রুস প্রভৃতি নরম কাষ্ঠের মণ্ড (Pulp), পরিত্যক্ত কার্পাসের মণ্ড, করাত-গুঁড়া প্রভৃতি হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেলুলোজ তৈয়ারি করা হয় এবং উহা দ্বারা কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন

দেশে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রেয়ন তৈয়ারি হয়। প্রধানত (১) সান্দ্র বা ভিসকোজ (Viscose), (২) নাইট্রো সেলুলোজ, (৩) কিউপ্রা অ্যামোনিয়াম, (৪) সেলুলোজ অ্যাসিটেট—এই চারি পদ্ধতিতেই সেলুলোজকে দ্রবণে পরিণত করা হয়। ঐ দ্রবণকে বিভিন্ন আকারের সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়া চালিত করা হয় এবং তরল অ্যাসিডপূর্ণ বিরাট পাত্রে সুতার আকারে জমানো হয়। সান্দ্র বা ভিসকোজ পদ্ধতিতে বিশ্বের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ রেয়ন তৈয়ারি হয়। স্বাভাবিক রেশম হইতে এই কৃত্রিম রেশম দামে অনেক সস্তা। এই কারণে খাঁটি রেশমের সহিত ইহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বর্তমানে পশম বা রেশমের সহিত রেয়ন মিশাইয়া নানাপ্রকার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল : কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে যেমন নরম কাষ্ঠমণ্ড প্রয়োজন তেমনি উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত প্রচুর জলেরও প্রয়োজন। ১ পাউণ্ড সান্দ্র বা ভিসকোজ রেয়ন সুতা প্রস্তুত করিতে প্রায় ১৫০-২০০ গ্যালন জল ব্যবহার করিতে হয়। ১৮৯৫ সালে ফ্রান্সে প্রথম রেয়ন প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বিশ্বে উৎপাদিত রেয়নের শতকরা ৫০ ভাগ উৎপন্ন হয় সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, পশ্চিম জার্মানি ও বৃটিশ যুক্তরাজ্যে। ইহা ব্যতীত ফ্রান্স, ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও রেয়ন শিল্প বিশেষভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন : রেয়ন উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই দেশে নরম কাষ্ঠের প্রাচুর্য, পরিষ্কার জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার রেয়ন শিল্পের বর্তমান উন্নতির জন্য দায়ী। এই দেশের রেয়ন শিল্প প্রধানত মস্কো ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত।

জাপান : বর্তমানে রেয়ন উৎপাদনে জাপান পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। জাপানী রেয়ন বিশ্বের বাজারে "ফুজি রেশম" নামেও পরিচিত। বয়ন শিল্পে জাপানের বিশিষ্টতা এই শিল্পেও জাপানকে বিশেষ সুবিধা দিয়াছে। অন্তর্দেশীয় সাগরকূলে ইয়ামাগুচি হইতে কিয়োটো পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে জাপানের রেয়ন শিল্প বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত। এই দেশে বর্তমানে কাঁচামালের অভাবহেতু বিদেশ হইতে কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে হয়। ওসাকা, কিয়োটো, নাগোয়া, সুভা, ফুকুই, কানাজাওয়া প্রভৃতি রেয়ন শিল্পের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র : আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে তৃতীয় প্রধান রেয়ন উৎপাদক দেশ। এই দেশে তূলা, নরম কাষ্ঠ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির কোন অভাব নাই। ইহার সহিত মূলধন, প্রযুক্তিবিদ্যা ও নিপুণ শ্রমিকের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকায় এই দেশ রেয়ন শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মেরীল্যাণ্ড, পেনসিলভ্যানিয়া ও নিউ-ইংল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে টেনেসি, ভার্জিনিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা প্রভৃতি রাজ্যেই রেয়ন শিল্পের বিশেষ প্রসার লক্ষ্য করা যায়।

ভারত : কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন তৈয়ারির প্রয়োজনীয় কাঁচামালের বিশেষ অভাব হেতু বিদেশ হইতে আমদানিকৃত কাঁচামালের সাহায্যে অন্ধ্রপ্রদেশে হায়দ্রাবাদ, কেরালায় রেয়ন পুরম, মহারাষ্ট্রে বোম্বাই, গুজরাটে সুরাট, মধ্যপ্রদেশে ইন্দোর, পশ্চিমবঙ্গে ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে রেয়ন শিল্প গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে।

বাণিজ্য : স্বাভাবিক রেশম অপেক্ষা রেয়ন দামে সস্তা বলিয়া ইহার চাহিদা ব্যাপক। বিশ্বের বাজারে রেয়ন বস্ত্র রপ্তানিতে জাপান প্রথম। অন্যান্য রেয়ন রপ্তানিকারী দেশের মধ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি, পশ্চিম জার্মানির নাম উল্লেখযোগ্য। আমদানিকারীদিগের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহ এবং অস্ট্রেলিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকার বাজারে রেয়ন রপ্তানিতে জাপানের প্রাধান্য অন্যান্য রপ্তানিকারী দেশের ঈর্ষার সঞ্চার করে।

[**প্রশ্ন** : (১) কৃত্রিম রেশমের প্রধান কাঁচামাল কি কি? সাধারণত কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে ইহা উৎপন্ন হয়? (২) কৃত্রিম রেশম উৎপাদনকারী দেশ কি কি? ভারতে কোথায় এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে?]

পাট শিল্প (The Jute Industry)

পাট মৌসুমী জলবায়ু অধ্যুষিত প্রাচীন বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক অর্থকরী ফসল। সংগঠিত শিল্প হিসাবে পাট শিল্পের বিকাশ ঘটে ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমনের পরে। পূর্বে স্থানীয় অধিবাসিগণ পাট তন্তুর সাহায্যে দড়ি, দড়া, সুতা, চট, থলি, কার্পেট, শতরঞ্জি প্রভৃতি প্রস্তুত করিত এবং উহা বিদেশে রপ্তানি করিত। পাটজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ ব্যবসায়িগণ পাটশিল্প সংগঠনে বিষয়ে আগ্রহী হন। ১৮৩৫ সালে ভারত হইতে সংগৃহীত কাঁচা পাটের সাহায্যে স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি (Dundee) শহরে বিশ্বের প্রথম পাট শিল্প স্থাপিত হয়। পরে স্থানীয় কাঁচামালের লাভজনক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভারতে বৃটেনের মূলধনে পাট শিল্প স্থাপিত হয়। বর্তমানে পাটশিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে চট, থলি, কার্পেট, ত্রিপল, শতরঞ্জি, দড়ি, সুতা ইত্যাদি প্রধান। ইহা ব্যতীত কার্পাস, পশম ও রেয়নের সহিতও পাটতন্তু মিশাইয়া নানাবিধ শৌখিন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

আঞ্চলিক বণ্টন : পাটশিল্প সাধারণত পাট উৎপাদনকারী দেশেই বিশেষভাবে সংগঠিত দেখা যায়—যেমন, ভারত ও বাংলাদেশে। ইহা ব্যতীত প্রধানত বাংলাদেশ ও ভারত হইতে আমদানিকৃত পাটের সাহায্যে বিশ্বের নানাদেশে পাটশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল দেশের মধ্যে ইউরোপে বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি ও স্পেন, আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন ও মিশর, দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল এবং এশিয়ায় চীন, জাপান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, ইরাণ ও তুরস্ক উল্লেখযোগ্য। চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ব্রহ্মদেশ ও ব্রেজিলে সামান্য পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়।

ভারত: ভারতে ১৮৫৫ সালে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয় পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত রিষড়া নামক স্থানে। পূর্ববঙ্গ বর্তমান বাংলাদেশ হইতে মেঘনা-পদ্মা-গঙ্গা জলপথে কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে আমদানি করা হইত কাঁচাপাট এবং উহার সাহায্যে হুগলী নদীর উভয় তীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল অসংখ্য পাটকল। ভারতের পাট শিল্পাঞ্চলের মধ্যে রিষড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী, উলুবেড়িয়া, শ্যামনগর, নৈহাটি, জগদ্দল, কামারহাটি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানিতে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করে।

বাংলাদেশ: পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করিলেও পাটশিল্পে ইহার স্থান দ্বিতীয়। দেশবিভাগের পূর্বে এই দেশে পাট শিল্পের বিকাশ ঘটে নাই। ইহার কারণ কয়লা, পরিবহণ, মূলধন, শ্রমিক ইত্যাদির অভাব। পরবর্তীকালে আমদানিকৃত কয়লা, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি শক্তি সম্পদের সহায়তা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে অতি দ্রুত পাটশিল্পের বিকাশ ঘটে। বর্তমানে এই দেশে পাটকলের সংখ্যা ১৪টি। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পাট শিল্পকেন্দ্র। বিশ্বের বাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানিতে বাংলাদেশ ভারতের মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। এই দেশের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট ও স্বয়ংক্রিয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে ইহার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার জন্য এই দেশের পাট শিল্পের আশানুরূপ অগ্রগতি সম্ভব হয় নাই।

বৃটেন: ভারত হইতে আমদানিকৃত পাটের সাহায্যে বৃটেনে স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি (Dundee) শহরে প্রথম পাট শিল্প স্থাপিত হয়। এবং এই দেশের পাটজাত দ্রব্য ইউরোপ, আমেরিকা এবং এমনকি ভারতেও রপ্তানি করা হইত। একসময় পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানিতে বৃটেনই প্রথম স্থান অধিকার করিত। বর্তমানে উচ্চমানের পাটজাত দ্রব্য তৈয়ারি ও পাটতন্তু মিশ্রিত নানাবিধ কার্পাস, পশম ও রেয়নের বস্ত্রাদি তৈয়ারিতে বৃটেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী।

বাণিজ্য: পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিতে ভারত প্রথম ও বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ভারতের কলিকাতা এবং বাংলাদেশের চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দর মারফত সর্বাধিক রপ্তানি সংঘটিত হইয়া থাকে। আমদানিকারী দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রথম। অন্যান্য দেশের মধ্যে কানাডা, বৃটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, কিউবা, অস্ট্রেলিয়া, চীন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে পাটের বিকল্প তন্তু হিসাবে পলিথিন, প্ল্যাষ্টিক প্রভৃতির ব্যবহার পাটশিল্পের প্রসারে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে বিশ্বের পাটশিল্প সামগ্রিকভাবে বিরাট সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। সাধারণ থলি বা চট হিসাবে পাটের ব্যবহার ব্যতীত অন্যান্য লাভজনক বস্তু ব্যবহারে পাটের সফল প্রয়োগের উপরই এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

কাগজ শিল্প (The Paper Industry)

আধুনিক সভ্যতার বিকাশে লিখন প্রণালী উদ্ভাবনের মতই কাগজ প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কারও এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। চীনে জীর্ণ বস্ত্র হইতে প্রথম কাগজ প্রস্তুত করা হয় ১০৫ খ্রীষ্টাব্দে। ক্রমে জার্মানিতে জীর্ণ বস্ত্র ও কাষ্ঠমণ্ডের সংমিশ্রণে এবং বৃটেনে ঘাসের সাহায্যে কাগজ প্রস্তুত করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ১৮৬৫ সালে একমাত্র কাষ্ঠমণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৯০ শতাংশ কাগজ পাইন, স্প্রুস, হেমলক প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের নরম কাষ্ঠের মণ্ড (wood pulp) হইতে প্রস্তুত করা হয়। কাগজ প্রস্তুতের অন্যান্য কাঁচামালের মধ্যে পুরাতন কাগজ, বস্ত্র, বাঁশ, তুলা, পাটের জীর্ণ চট, দড়ি-দড়া, ধানের খড়, ইক্ষুর ছিবড়া, এস্পার্টো, আলফা-আলফা সাবাই, মুঞ্জ প্রভৃতি ঘাস প্রধান। দুইটি পদ্ধতিতে কাষ্ঠমণ্ড তৈয়ারি করা হয়—রাসায়নিক পদ্ধতি ও যান্ত্রিক পদ্ধতি। রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপন্ন কাগজ উচ্চমানের লেখা ও বই ছাপার কাগজ হয় এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিউজ-প্রিণ্ট ও নিকৃষ্ট ধরনের কাগজ, কাগজের বোর্ড, প্যাকিং কাগজ ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

কাগজ শিল্পের সংগঠন ও উন্নতিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি বিশেষ সহায়ক ঃ (১) কাঁচামাল হিসাবে নরম কাষ্ঠের সহজলভ্যতা। (২) প্রচুর পরিষ্কার জল—১ টন নিউজপ্রিণ্ট উৎপাদনে প্রায় ১০০ টন পরিষ্কার জল আবশ্যক। (৩) রাসায়নিক দ্রব্য—কস্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, ক্লোরিণ প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য। (৪) সুলভ শক্তির সরবরাহ—১ টন নিউজপ্রিণ্ট উৎপাদনে প্রায় ২ হাজার কিলোওয়াট ঘণ্টা পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন। (৫) উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা। (৬) দক্ষ শ্রমিক—যান্ত্রিক পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। (৭) বিস্তৃত বাজার। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে নিউজপ্রিণ্ট উৎপাদনের বৃহৎ কারখানাগুলি সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির সন্নিকটে এবং অন্যান্য কাগজ, কাগজের বোর্ড বা প্যাকিং কাগজ ইত্যাদি প্রস্তুতের কারখানাগুলি কাঁচামাল ও সুলভ শক্তি সরবরাহযুক্ত অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত দেখা যায়।

আঞ্চলিক বণ্টন: কাগজ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কম বেশি উৎপন্ন হইলেও বহুল পরিমাণে কাগজ উৎপাদন বিশ্বের দুইটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। প্রথম অঞ্চলটি উত্তর আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের সরলবর্গীয় বৃক্ষ অধ্যুষিত কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র লইয়া গঠিত এবং দ্বিতীয় অঞ্চলটি ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরাঞ্চল লইয়া গঠিত। ইহা ব্যতীত বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, চীন, জাপান, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতিও কাগজ উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পৃথিবীর কাগজ উৎপাদন—১৯৭৫ (মি. মে. ট.)

	কাগজ	নিউজপ্রিণ্ট		কাগজ	নিউজপ্রিণ্ট
কানাডা	৪'৩৭	৮'৬৬	রাশিয়া	৬'৮৬	১'৩৩
যুক্তরাষ্ট্র	৪৯'২১	২'৯২	ফিনল্যাণ্ড	৪'২৯	১'২২
জাপান	১৩'৪১	২'২৩	পৃথিবী	১২৮'৫	২২'৬

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে উৎপন্ন কাগজের প্রায় ৩৩ শতাংশ উৎপাদন করিয়া পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই দেশের উত্তরাংশে অবস্থিত নরম কাষ্ঠের বনভূমি, হ্রদ অঞ্চলের সুলভ জলবিদ্যুৎ ও জল, সহজলভ্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি, দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহ এবং বহু বিস্তৃত বাজার এই দেশের কাগজ শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে। এই দেশের কাগজ উৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে নিউ-ইংল্যাণ্ড রাজ্যগুলি, নিউ ইয়র্ক ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাজ্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওয়াশিংটন, ওরিগন, টেকসাস ও আলবামা রাজ্যেও কাগজের কল গড়িয়া উঠিয়াছে। হ্রদ অঞ্চলের উইসকনসিন এই দেশের বিখ্যাত কাগজ তৈয়ারির কেন্দ্র। এই দেশে উৎপাদিত কাগজের প্রায় ৬০ শতাংশ নিউজপ্রিণ্ট।

কানাডা: কাগজমণ্ড ও নিউজপ্রিণ্ট উৎপাদনে পৃথিবীতে কানাডা শীর্ষস্থান অধিকার করে। এই দেশে সংগঠিত শিল্প হিসাবে কাগজ শিল্পই সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মণ্ট্রিল, কুইবেক, বৃটিশ কলম্বিয়া, ম্যানিটোবা ও সালবার্টা প্রধান কাগজ উৎপাদক অঞ্চল।

সোভিয়েত রাশিয়া: রাশিয়া কাগজ উৎপাদনে ইউরোপে প্রথম। এই দেশের উত্তরাঞ্চল জুড়িয়া নরম কাষ্ঠের তৈগা বনভূমি অবস্থিত। ইহা ব্যতীত স্থানীয় সুলভ জলবিদ্যুৎ, রাসায়নিক দ্রব্য, দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতির যোগান এই দেশের কাগজ শিল্পপ্রসারের অনুকূল উপাদান। লেনিনগ্রাদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাগজ উৎপাদন কেন্দ্র।

নরওয়ে-সুইডেন-ফিনল্যাণ্ড: এই অঞ্চলের নরম কাষ্ঠের প্রাচুর্য, জলবিদ্যুতের সহজলভ্যতা, দক্ষ ও কর্মঠ শ্রমিকের যোগান, পরিবহণের সুব্যবস্থা, নিকটবর্তী মহাদেশীয় বাজারে কাগজমণ্ড ও কাগজের ব্যাপক চাহিদা ইত্যাদি এই অঞ্চলের কাগজ শিল্পের উন্নতির অনুকূল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সুইডেনের সুন্দভাল, ক্যামফর প্রধান কাগজ উৎপাদক অঞ্চল। ফিনল্যাণ্ডে কিইমি নদী অববাহিকায় ও সাইম্মা হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে কাগজ শিল্পের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নিউজপ্রিণ্ট কারখানা ফিনল্যাণ্ডে কোত্‌রার পূর্বদিকে অবস্থিত।

জাপানে কাগজের ব্যবহার খুব বেশি। কিন্তু কাগজ তৈয়ারির কাঁচামালের অভাব হেতু এই দেশ নরওয়ে, সুইডেন, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠমণ্ড আমদানি করা হয়। চীনদেশে খড়ের সাহায্যে এক প্রকার

সস্তা কাগজ তৈয়ারি করা হয়। ভারতে কাগজ তৈয়ারিতে বাঁশ, কাষ্ঠ, সাবাই ও মঞ্জু ঘাস ব্যবহার করা হয়।

বাণিজ্য: কাষ্ঠমণ্ড ও নিউজপ্রিণ্ট রপ্তানিতে কানাডা প্রথম। ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন ও নরওয়ে অন্যান্য কাষ্ঠমণ্ড রপ্তানিকারী দেশ। বিশ্বের মোট উৎপন্ন মণ্ডের প্রায় ১৭% আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। কাগজ রপ্তানিতেও কানাডার স্থান বিশ্বে প্রথম। নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যান্ড হইতেও প্রচুর পরিমাণে কাগজ রপ্তানি হইয়া থাকে। কাষ্ঠমন্ড আমদানিকারী দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সোভিয়েত রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ প্রধান। কাগজ আমদানিকারী দেশের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রধান। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার প্রায় সকল দেশেই কম বেশি কাগজ আমদানি করিয়া থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু কাগজের চাহিদা সর্বাধিক। বিশ্বে উৎপাদিত কাগজের প্রায় ২৫% আন্তর্জাতিক লেনদেনে ব্যবহৃত হয়।

[প্রশ্ন: (১) কাগজ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কি কি? (২) উত্তর আমেরিকা ও উত্তর ইউরোপে কাগজশিল্পের একদেশীভবনের কারণ কি?]

রাসায়নিক শিল্প (The Chemical Industry)

আধুনিক শিল্প সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতি রাসায়নিক শিল্পের বিকাশ ও উন্নতির সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। মানুষের দিনানুদৈনিক খাদ্য, বস্ত্র, নানা প্রয়োজনীয় জিনিস হইতে ঔষধপত্র, বিলাস দ্রব্য, শিল্পের কাঁচামাল পর্যন্ত নানাবিধ সামগ্রী রাসায়নিক শিল্পের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদানের ফল। এই কারণে রাসায়নিক শিল্পের গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

রাসায়নিক শিল্পের প্রত্যক্ষ উপাদান অ্যাসিড (Acid) ও অ্যালক্যালি (Alkali)। কিন্তু প্রধানত জল, বায়ু, কয়লা, গন্ধক, খনিজ লবণ, খনিজ তৈল ও চুনাপাথর হইতেই অধিকাংশ রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাসায়নিক শিল্পে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ও মূলধনের প্রয়োজন খুবই বেশি।

শ্রেণীবিভাগ: রাসায়নিক শিল্পকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) গুরু রাসায়নিক (Heavy Chemicals)—যেমন, সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সোডা অ্যাশ, কস্টিক সোডা, ক্লোরিণ, অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুফার ফসফেট ইত্যাদি। (২) লঘু রাসায়নিক দ্রব্য (Light or Fine Chemicals)। ইহা আবার দুইভাগে বিভক্ত। (ক) সাধারণ লঘু রাসায়নিক দ্রব্য—আলকাতরা, রঞ্জন দ্রব্য, গন্ধ দ্রব্য, বিস্ফোরক দ্রব্য ইত্যাদি, (খ) তড়িৎ বিশ্লিষ্ট লঘু রাসায়নিক দ্রব্য—অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম কারবাইড প্রভৃতি। (৩) পেট্রোরাসায়নিক দ্রব্য (Petro-Chemicals)—খনিজ তৈল হইতে

উপজাত নানাবিধ দ্রব্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে ন্যাপথা হইতে সার তৈয়ারি করা হয়।

অবস্থানের কারণ: (১) বিভিন্ন প্রকার কাঁচামালের সহজ যোগান, (২) পর্যাপ্ত পরিষ্কার জলের সরবরাহ, (৩) সুলভ বিদ্যুতের সরবরাহ, (৪) রাসায়নিক দ্রব্য দূরে পরিবহণ করা বিপজ্জনক বলিয়া নিকটবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক চাহিদাযুক্ত বাজার, (৫) রাসায়নিক শিল্পের পরিত্যক্ত আবর্জনা নিক্ষেপের সুব্যবস্থা, (৬) নির্মল বায়ুযুক্ত সুপরিসর স্থান, (৭) গবেষণার জন্য প্রচুর মূলধন নিয়োগ।

নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

(ক) **সালফিউরিক অ্যাসিড** (Sulphuric Acid): গন্ধক ও আয়রণ পাইরাইট ইহার প্রধান কাঁচামাল। রাসায়নিক সার, রং, বিস্ফোরক দ্রব্য, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি প্রস্তুতে ইহা ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রধান উৎপাদক। টেক্সাস, লুইসিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে ইহা বিশেষভাবে উৎপাদিত হয়। অন্যান্য উৎপাদক দেশের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, বৃটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, ভারত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(খ) **সোডা অ্যাশ** (Soda Ash): কাগজ, কাচ, সাবান ও নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে ইহার বহুল ব্যবহার হয়। লবণ, চুনাপাথর, কোক প্রভৃতি হইতে ইহা প্রস্তুত করা হয়। সোডা অ্যাশ উৎপাদনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রথম। রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, বৃটেন, জাপান, ভারত অন্যান্য উৎপাদনকারী দেশ।

(গ) **কস্টিক সোডা** (Caustic Soda): লবণ হইতে ইহা প্রস্তুত করা হয়। কাগজ, কাষ্ঠমণ্ড, সাবান, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি উৎপাদনে কস্টিক সোডা অপরিহার্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, ইতালি, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, কানাডা প্রভৃতি ইহার গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদক দেশ।

(ঘ) **ক্লোরিণ** (Chlorin): জল পরিশোধক, রঞ্জক দ্রব্য ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি উৎপাদনে ক্লোরিণ ব্যবহৃত হয়। লবণ হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে ইহার উৎপাদন হইয়া থাকে।

পৃথিবীর প্রধান রাসায়নিক উৎপাদন ১৯৭৪ (মি. মে. ট)

	যুক্তরাষ্ট্র	রাশিয়া	পঃ জার্মানি	জাপান	পৃথিবী
সালঃ অ্যাসিড	২৯.৯	১৬.৬	৫.১	৭.১	১০৪.০
কস্টিক সোডা	১০.৩	২.১	২.৮	৩.০	২৭.২
সোডা অ্যাশ	৩.১	৪.৫	১.৪	১.৩	১৮.৫
নাইঃ সার	৮.৬	৬.০	১.৫	২.৩	৪২.৩
ফসফেট	৭.৮	৩.৮	০.৯	০.৭	২৫.৭

(ঙ) **রাসায়নিক সার (Chemical Fertilizer)** : কৃষি জমির উৎপাদন বৃদ্ধিতে সার প্রয়োগ অপরিহার্য। পূর্বে জমিতে সার হিসাবে গোবর, হাড়ের গুঁড়া, পক্ষী ও মনুষ্য পুরীষ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বর্তমানে সারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাসায়নিক সার উৎপাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। রাসায়নিক সার উৎপাদনের তিনটি প্রধান উপাদান—ফসফরাস, পটাসিয়াম ও নাইট্রোজেন। খনিজ ফসফেট (Phosphate rocks) ও হাড়ের গুঁড়া হইতে সুপার ফসফেট জাতীয় সার তৈয়ারি হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইহার প্রধান উৎপাদক। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, বৃটেন, মিশর অন্যান্য উৎপাদক দেশ। পটাশ নামক লবণ দ্রব্য হইতে পটাসিয়াম জাতীয় সার তৈয়ারি হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রধান উৎপাদক দেশ। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি, সোভিয়েত রাশিয়া, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি অন্যান্য উৎপাদক দেশ। সোরা বা Sodium Nitrate হইতে নাইট্রোজেন সার তৈয়ারি হয়। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি রাজ্যে অবস্থিত আটাকামা মরুভূমির একপ্রকার পক্ষীপুরীষ হইতে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক সোরা পাওয়া যায়। ইহাকে **চিলি নাইট্রেট** (Chile Nitrate) বলে। কয়লা ও চুনাপাথর হইতে প্রস্তুত নাইট্রেটের সাহায্যে **অ্যামোনিয়া সালফেট** সার তৈয়ারি করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সোরা সার উৎপাদনেও প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহা ব্যতীত পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, বৃটেন, জাপান, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশেও এই জাতীয় সার উৎপাদন করা হয়।

(চ) **কয়লার আলকাতরাজাত রং (Coal Tar Dyes)** : কয়লার আলকাতরা হইতে বেনজল প্রস্তুত করা হয়। বেনজলের সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া নানাবিধ রং প্রস্তুত করা হয়। ইহা ব্যতীত আলকাতরা হইতে নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য, বিস্ফোরক দ্রব্য ইত্যাদিও প্রস্তুত করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রভূত পরিমাণে রং প্রস্তুত করা হয়।

(ছ) **ঔষধপত্র (Drugs and Medicines)** : বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ রোগ নিরাময়ের জন্য নানাবিধ ঔষধ তৈয়ারি করিতেছে। জার্মানি, ফ্রান্স, বৃটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশ এই সকল দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ অগ্রণী।

(জ) **প্ল্যাস্টিক (Plastic)** : কয়লা, চুনাপাথর, উদ্ভিদের সেলুলোজ প্রভৃতি কাঁচামাল হইতে প্ল্যাস্টিক তৈয়ারি করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্ল্যাস্টিক উৎপাদনে শীর্ষস্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় $\frac{1}{3}$ অংশ এই দেশে উৎপন্ন হয়। পশ্চিম জার্মানি, জাপান, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্ল্যাস্টিকের উৎপাদন হইয়া থাকে।

বাণিজ্য : স্থানীয় শিল্পের চাহিদা মিটাইতেই প্রধানত রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন হইয়া থাকে। এই কারণে উৎপাদিত রাসায়নিক দ্রব্যের শতকরা ৬ ভাগ মাত্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয় এবং এই বাণিজ্য বিশ্বের শিল্পোন্নত

দেশগুলির মধ্যেই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রধান আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশ। বৃটেন, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা রাসায়নিক দ্রব্যের উল্লেখযোগ্য আমদানি ও রপ্তানিকারী দেশ। এই বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভূমিকা খুবই নগণ্য।

[প্রশ্ন : (১) রাসায়নিক শিল্পকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি ? (২) রাসায়নিক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কি কি ? (৩) রাসায়নিক সারের গুরুত্ব কি ? কোন কোন দেশে ইহার উৎপাদন অধিক ?]

অনুশীলনী ১৭

১। লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কি ? এই শিল্প সংগঠনের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এই শিল্পে উন্নতির কারণ নির্দেশ কর।

[What is the principal raw materials of Iron and Steel Industry ? Describe the conditions favourable for the development of this industry. Point out the causes of development of this industry in the U.S.A. and the U.S.S.R.]

২। কোন অঞ্চলে একটি শিল্প গড়িয়া উঠার অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাগুলি কি কি ? পৃথিবীর প্রধান লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রগুলির উল্লেখ কর।

[What are the geographical and economic factors for the location of an industry in a region ? Mention the principal world centres of Iron and Steel production.]

[W. B. H. S. C. Exam , 1980]

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলের বিবরণ দাও এবং ঐ সকল শিল্পাঞ্চলে শিল্পসমাবেশের কারণগুলি বর্ণনা কর।

[Describe the principal industrial regions of the U. S. A. and discuss the causes of localisation of industries in these regions.]

[Tripura H. S. Exam., 1979]

৪। কার্পাস বয়ন শিল্প সংগঠনের অনুকূল উপাদান কি কি ? বিশ্বের কার্পাস বয়ন শিল্পের বিভিন্ন কেন্দ্রের উল্লেখ করিয়া উহার অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। এই শিল্পকে বিচরণশীল শিল্প বলা হয় কেন ?

[What are the favourable factors for the development of cotton textile industry ? Point out the different regions of cotton textile industry in the world and also give an account in brief of its progress. Why is this industry called a foot-loose industry ?]

৫। নিম্নলিখিত কার্পাস বয়ন শিল্পকেন্দ্রগুলির বিষয়ে টীকা লিখ : (ক) ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চল, (খ) ওসাকা-কোবে অঞ্চল, (গ) নিউ ইংল্যাণ্ড স্টেটস অঞ্চল, (ঘ) মস্কো-টুলা-গোর্কি অঞ্চল।

[Write short notes on the following cotton textile industries : (a) Lancashire region, (b) Osaka-Kobey region, (c) New England States region, (d) Moscow-Tula-Gorky region.]

৬। কার্পাস বয়ন শিল্প ল্যাঙ্কাশায়ার অঞ্চলে গড়িয়া উঠিবার কারণগুলি উল্লেখ কর এবং ঐ শিল্পের বর্তমান সমস্যাগুলি আলোচনা কর।

[Discuss the causes of localisation of cotton textile industry in Lancashire region and mention the various problems now being faced by the industry.] [Tripura H. S. Exam., 1979]

৭। (ক) কার্পাস বয়ন শিল্পের অবস্থানের উপর কাঁচামাল ও বাজার চাহিদার প্রভাব আলোচনা কর। (খ) বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ কার্পাস বয়ন শিল্পাঞ্চলগুলির নাম লিখ।

[(a) Discuss the influence of raw materials and market in the location of cotton Textile Industry. (b) Name the important cotton textile goods regions of the world.]

[W. B. H. S. C. Exam., 1982]

৮। পশম বয়ন-শিল্প সংগঠনের বৈশিষ্ট্য কি? দক্ষিণ গোলার্ধে সর্বাধিক পশম উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও উত্তর গোলার্ধের দেশসমূহে পশম শিল্পের একদেশীভবন ঘটিবার কারণ কি?

[What are the features of development of Woollen Industry? What are the causes of concentration of the Woollen Industries in the countries of the Northern Hemisphere although raw wool is mostly available in the Southern Hemisphere ?]

৯। রাসায়নিক শিল্পকে ভাগ কর ও নাম লিখ। রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের নাম লিখ। বর্তমান যুগে রাসায়নিক শিল্পের গুরুত্ব অধিক হওয়ার কারণ বর্ণনা কর। রাসায়নিক সার শিল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা কর।

[Divide and name the Chemical Industry. Name the raw materials used in the chemical industry. Describe the importance of chemical industry in modern times. Critically examine the progress of the Chemical Fertilizer Industry.]

১০। কাগজ শিল্পের কাঁচামাল কি কি? এই শিল্পের সংগঠনের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর। কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনকারী দেশসমূহের নাম কর এবং এই শিল্পের অগ্রগতি বর্ণনা কর।

[What are the raw materials of paper industry ? Describe the favourable factors for the development of this industry.

Name the producing countries of Paper and Newsprint. Also describe the progress of this industry.]

১১। কাগজ শিল্পের উন্নয়নের প্রধান কারণ কি কি? পৃথিবীর মুখ্য কাগজ উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম কর এবং ইহাদের অবস্থানের যৌক্তিকতা সমর্থন কর।

[What are the major factors for the growth of Paper Industry ? Name the important paper producing countries of the world and justify their location.]

[W. B. H. S. C. Exam., 1984]

১২। তেল রসায়ন শিল্প কাহাকে বলে? হালকা বা লঘু রাসায়নিক শিল্প কাহাকে বলে? এই শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল কি কি? ভারী রাসায়নিক শিল্পের গুরুত্ব ও বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর।

[What is meant by Petro-Chemical Industry ? What is meant by fine chemicals ? What are the useful raw materials of this industry ? Discuss the importance of Heavy Chemicals Industry and its present condition.]

১৩। পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী নদীর দুই তীরে পাট শিল্পের একদেশীভবন ঘটিবার কারণ কি? বিশ্বে কোথায় কোথায় পাট শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে? এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর।

[What are the causes of centralisation of Jute Industry on both sides of the Bhagirathi in West Bengal ? Where in the world is Jute Industry found to be located ? Discuss the present condition of this industry.]

১৪। পাটশিল্পের উন্নতিতে কাঁচামালের অবদান আলোচনা কর। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের নাম কর।

[Describe the role of raw materials in the growth of Jute Industry. Name the important centres where this industry is concentrated.] [W. B. H. S. C. Exam., 1983]

১৫। পাটশিল্প গঠনে কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন হয়? হুগলী শিল্পাঞ্চলে চটকল কেন্দ্রীভবনের কারণ নির্দেশ কর।

[What are the raw materials necessary for the growth of Jute Industry ? Account for the concentration of jute mills in the Hooghly Industrial Region.]

[W. B. H. S. C. Exam., 1981]

১৮ বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক অঞ্চল (Trade and Commercial Regions)

বাণিজ্য ও ইহার শ্রেণীবিভাগ (Trade and its Classification) :— সাধারণ অর্থে পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের কার্যকে ব্যবসায় বলা হয়। বাণিজ্য বলিতে বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে পণ্য বিনিময় কার্যাবলীকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু বাণিজ্য কথাটি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মানব সমাজে অভাব পরিতৃপ্তির জন্য নিয়ত পণ্য ও সেবার উৎপাদন, বণ্টন ও উহাদের সহায়ক নানাপ্রকার কার্যধারা সংঘটিত হইতেছে। এই সকল প্রকার কার্যকেই বাণিজ্য বলা হয়। ব্যবসায় উহার অঙ্গীভূত শুধু বিনিময় কার্যকে বুঝায়। মোট কথা, পণ্য বিনিময় মূলক কার্যাবলীই বাণিজ্যের ভিত্তি। এই বাণিজ্যের প্রসারই আধুনিক সমাজে অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দায়ী। ("One of the reasons why people live more comfortably than in the past is the growth of trade,"—Huntigson).

বাণিজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—(১) আভ্যন্তরীণ বা অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য। এই প্রকার বাণিজ্যে পণ্য ও সেবার লেনদেন পাইকারী ও খুচরা হিসাবে দেশের সীমার মধ্যেই নিদিষ্ট থাকে। (২) বৈদেশিক বা বহির্বাণিজ্য—এই প্রকার বাণিজ্যে দেশের স্বার্থে বিদেশ হইতে পণ্যসামগ্রী আমদানি বা দেশ হইতে বিদেশে পণ্য সামগ্রী রপ্তানি করা হয়। কখনও কখনও এক দেশ হইতে পণ্য আমদানি করিয়া ঐ পণ্য অপর দেশে রপ্তানি করা হয়। এই প্রকার কার্যাবলীকে পুনঃরপ্তানি বা আড়তদারি কারবার বলা হয়। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য স্থলপথে, জলপথে এবং এমনকি আকাশপথেও পরিচালিত হইয়া থাকে। জলপথে পরিবহণ ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম বলিয়া জলপথেই বিশ্বের সর্বাধিক বাণিজ্য সংঘটিত হইয়া থাকে।

বাণিজ্য : অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক (Trade—An Index of Economic Development): মানবসমাজে নানাবিধ অভাব পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টা হইতেই উৎপাদনমূলক কার্যাবলীর বিকাশ ঘটে এবং ইহার সার্থক পরিণতি ঘটে উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার বণ্টনে বা বিনিময়ে। সভ্যতার বিকাশের আদিপর্বে এই বণ্টন ব্যবস্থা নিতান্তই পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বা সেবার বিনিময়ে সেবার মধ্যেই ছিল সীমিত। ক্রমে মানুষ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে সাধারণ মাধ্যম হিসাবে মুদ্রার প্রচলন করে। পণ্য বিনিময় বা ইংরাজীতে যাহাকে Bartar System বলে উহা বাণিজ্যের প্রথম স্তর। পরবর্তী কালে মুদ্রা (Currency) ব্যবস্থার প্রচলনই বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের নতুন দিগন্ত উম্মোচিত করে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি মানবসমাজে যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি নানাবিধ সামগ্রীর চাহিদা অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে তেমনি উন্নত ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষাও মানবসমাজে নিত্য নতুন চাহিদারও সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। ইহারই প্রত্যক্ষ ফল উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার

দ্রুত প্রসার ও উন্নতি। বাণিজ্য আধুনিক যুগে আর কোন অঞ্চল বিশেষের মধ্যে সীমিত নহে, বিশ্বজোড়া ইহার ব্যাপ্তি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, যান্ত্রিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ আধুনিক বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতির মূল বনিয়াদ। বাণিজ্যের মাধ্যমেই দেশের বৈষয়িক অগ্রগতি বিস্ময়করভাবে ত্বরান্বিত হয়, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়, দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বণ্টন নিশ্চিত হয়। এই কারণে বলা যায় যে দেশের বৈষয়িক উন্নতি দেশের বাণিজ্যিক অগ্রগতির সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি দেশে মানুষের জীবনযাত্রার মান, চাহিদার ব্যাপকতা, ক্রয়ক্ষমতা ইত্যাদি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। এই বৈষম্যের মূলে রহিয়াছে ঐ সকল উন্নত দেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় উৎপাদন পরিচালনা ও বণ্টনের ব্যাপক ব্যবস্থা তথা বাণিজ্যের প্রসার। তুলনামূলকভাবে এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশে নিম্ন জীবনমান ও অর্থনৈতিক অনুন্নতির জন্য ঐ সকল দেশের অবৈজ্ঞানিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা তথা অনগ্রসর ও অনুন্নত বাণিজ্যিক ব্যবস্থাই মুখ্যত দায়ী। সুতরাং বলা যায় কোন দেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ লক্ষ্য করিয়া ঐ দেশের বৈষয়িক উন্নতি বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ বাণিজ্যকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক বলা হয়।

কোন দেশের বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ও প্রকৃতিকে ঐ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে গ্রহণ করিলে কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। (১) আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ—ইহা কম বা বেশি হইলেও দেশের বৈষয়িক অবস্থা উন্নত বা অনুন্নত হইতে পারে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নির্ভর করে প্রধানত দেশের আয়তন ও জনসংখ্যার উপর। ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট ও স্বল্প লোকসংখ্যাযুক্ত দেশে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ নিঃসন্দেহে জনাকীর্ণ বৃহৎ দেশের তুলনায় কম হইবে। কিন্তু জাপান বা বৃটেনের মত উন্নত দেশে এই বাণিজ্যের পরিমাণ অনুন্নত বৃহৎ দেশের তুলনায় অনেক বেশি। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহার মোট পরিমাণ দ্বারা কখনই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক পরিমাপ করা যায় না। যেমন ভারতের তুলনায় ডেনমার্কের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ কম হওয়া সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ডেনমার্ক ভারতের তুলনায় অধিক উন্নত। কারণ স্বল্পায়তন ডেনমার্কের স্বল্প জনসংখ্যা আবার সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রেও এই মাপকাঠি অচল। সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় ইউরোপের যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানি ও এশিয়ার জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ অধিক। তথাপি রাশিয়ার জনগণের জীবনমান বা ঐ দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আদৌ নিম্ন নহে। কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা অনুযায়ী চাহিদাপূরণে সম্পদের ব্যবহার হইয়া থাকে। এখানে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজন ও সুযোগ খুবই সীমিত। সুতরাং বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণের পরিবর্তে জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণকে দেশের বৈষয়িক উন্নতির সাধারণ নিরীখ হিসাবে গ্রহণ করা

যাইতে পারে। (২) বৈদেশিক বাণিজ্যের মাথাপিছু হার :—ইহার সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃতি নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধাজনক। সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের মাথাপিছু বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৪ ডলার এবং মালয়েশিয়ায় উহার পরিমাণ প্রায় ২৪০ ডলার। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় মালয়েশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা ও জনগণের জীবনমান অনেক বেশি অনুন্নত। অধিকন্তু বিশ্বে মাথাপিছু বাণিজ্যের হার দেখা যায় নিউজিল্যাণ্ড, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় (প্রায় ২৫০ হইতে ৪০০ ডলার) সর্বাধিক। অথচ এই সকল দেশের তুলনায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও পশ্চিম জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা অধিক উন্নত। (৩) বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত পণ্যের প্রকৃতি—বিশ্বে বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত পণ্যের প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় কোন দেশ বিভিন্ন কাঁচামাল আমদানি করে ও শিল্পপণ্য রপ্তানি করে। আবার কোন দেশ শিল্পপণ্য আমদানি করিতে দেশের কাঁচামাল রপ্তানি করিয়া থাকে। কাঁচামাল আমদানিকারী দেশগুলি নিঃসন্দেহে মূলধন, প্রযুক্তিবিদ্যা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক দিক হইতে উন্নত। পক্ষান্তরে অনুন্নত ও অনগ্রসর দেশগুলিই কাঁচামাল রপ্তানি করিয়া থাকে। কারণ তাহাদের শিল্পগঠনের উপযোগী অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ আদৌ অনুকূল নহে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিচারে ঐ দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত পণ্যের প্রকৃতি দ্বারা একটি নির্দিষ্ট মান নিরূপণ করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও ইহার দ্বারা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনমান বিশ্লেষণ করা যায় না।

[প্রশ্ন : বাণিজ্যকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক বলা হয় কেন ?]

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কারণ (Bases of International Trade)

দেশে দেশে পণ্য ও সেবার লেনদেন বা বিনিময়কে বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। ইহার তিনটি ধারা—আমদানি রপ্তানি ও পুনঃরপ্তানি। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে সহাবস্থান ও পারস্পরিক সহযোগিতা গড়িয়া উঠিয়াছে ইহার মূল ভিত্তি বাণিজ্য। বর্তমান যুগে কোন দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। সুতরাং নিঃসম্পর্ক অবস্থায় কোন দেশের পক্ষেই বৈষয়িক উন্নতি লাভ করাও সম্ভব নহে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি অর্থনৈতিক দিক হইতে তুলনামূলক উৎপাদন খরচ (Comparative cost)। কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে খরচের যে বৈষম্য দেখা যায় উহার জন্য নিম্নলিখিত মুখ্য ও গৌণ কারণসমূহ দায়ী।

মুখ্য কারণ : (১) ভৌগোলিক অবস্থান, (২) পরিবেশ, (৩) সম্পদের অসম-বণ্টন, (৪) জনসংখ্যা, (৫) পরিবহণ ব্যবস্থা এবং (৬) অর্থনৈতিক অবস্থা।

গৌণ কারণ : (১) সামাজিক অবস্থা, (২) রাজনৈতিক অবস্থা, (৩) জাতীয় চরিত্র এবং (৪) সরকারী নীতি।

নিম্নে এই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল :—

(১) **ভৌগোলিক অবস্থান** : সমুদ্রবেষ্টিত জাপান ও যুক্তরাজ্যের বিশেষ অবস্থান ঐ দেশের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সহায়ক। পূর্ব গোলার্ধে ভারতের উপদ্বীপীয় অবস্থান এই দেশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য বিস্তারে বিশেষ সুযোগ দিয়া থাকে। শিল্পোন্নত যুক্তরাজ্য বা জার্মানির নিকটবর্তী হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ইতালি প্রভৃতি দেশও ঐ সকল দেশের কারিগরী জ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সুযোগ লাভ করিয়া শিল্পোন্নত হইতেছে। পক্ষান্তরে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলি শিল্পোন্নত ইউরোপ হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া ঐ সহজ সুযোগ হইতে দীর্ঘকাল বঞ্চিত রহিয়াছে। অনুরূপভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিকটবর্তী কানাডা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশ বৈষয়িক উন্নতির সহজ সুযোগ লাভ করিয়াছে।

(২) **পরিবেশ** : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন জলবায়ু পরিমণ্ডলে অবস্থিত হওয়ায় তথাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের ও উৎপন্ন দ্রব্যের তারতম্য ঘটিয়াছে। নিরক্ষরেখায় অবস্থিত মালয়েশিয়া রবার উৎপাদনে ও রপ্তানিতে পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। আবার অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া গম উৎপাদনে ও রপ্তানিতে বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই প্রকার বৈষম্যকে ভিত্তি করিয়াই আঞ্চলিক বিশেষীকরণের সৃষ্টি হয়। যেমন ভারত ও কিউবা চিনি উৎপাদনে এবং ব্রেজিল কফি উৎপাদনে বিশেষ পরিবেশগত সুবিধা ভোগ করে।

(৩) **সম্পদের অসম বণ্টন** : বিশ্বের সকল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের সমবণ্টন ঘটে নাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া কয়লা, খনিজ তৈল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কিন্তু ইতালি, পাকিস্তান, ব্রেজিল বা উত্তর আফ্রিকার অনেক দেশই এই সকল সম্পদ হইতে প্রায় বঞ্চিত। ভারত ও চীন তুলা, তামাক, চা উৎপাদনে ও রপ্তানিতে পরিবেশের বিশেষ আনুকূল্য ভোগ করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশগত কারণেই ঐ সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া থাকে। খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য হেতু যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত রাশিয়া শিল্পোন্নত দেশ এবং মিশর, পাকিস্তান ও থাইল্যাণ্ড খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতাহেতু আজিও শিল্পে অনগ্রসর।

(৪) **জনসংখ্যা** : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যার বণ্টনও নিতান্ত বৈষম্যমূলক। জনবহুল দেশগুলিতে খাদ্য ও বিবিধ কাঁচামালের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে এই সকল দেশকে প্রধানত আমদানির উপর নির্ভর করিতে হয়। জনবিরল দেশগুলিতে খাদ্য ও কাঁচামালের প্রাচুর্য থাকে বলিয়া রপ্তানি বাণিজ্যে উহাদের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি শিল্পোন্নত দেশ। এই সকল দেশে জনবসতির ঘনত্বও কম। ফলে উহারা নানাবিধ শিল্পদ্রব্য রপ্তানি

করিয়া থাকে। অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশ জনবিরল বলিয়াই প্রচুর উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ও প্রাণিজ দ্রব্য রপ্তানি করিয়া থাকে।

(৫) **পরিবহণ ব্যবস্থা :** অর্থনীতি ক্ষেত্রে পরিবহণ ব্যবস্থা স্থানগত বাধা দূর করে বলিয়াই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। রেল, সড়ক, খাল, নদী ও সমুদ্র পথেই প্রধানত পণ্যসামগ্রী চলাচল করিয়া থাকে। বিমানপথের ব্যবহার আজিও খুবই সীমিত। ফলে যে সকল দেশের পরিবহণ ব্যবস্থা যত উন্নত সেই সকল দেশের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিও তত বেশি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশের সমৃদ্ধির মূলে তথাকার উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার অবদান অপরিসীম।

(৬) **অর্থনৈতিক অবস্থা :** প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্তরের অর্থনৈতিক উন্নতি ও কারিগরী জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। শিল্পোন্নত দেশগুলি মূলধনগত সামগ্রী (Capital goods)—যেমন, যন্ত্রপাতি, রেল, মোটর, জাহাজ প্রভৃতি উৎপাদন ও রপ্তানিতে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল কৃষিনির্ভর দেশ নানাবিধ কৃষিজাত কাঁচামাল রপ্তানি করিয়া পরিবর্তে শিল্প পণ্য ও মূলধনগত সামগ্রী আমদানি করিয়া থাকে। ইহার ফলে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সহিত উন্নত দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে।

(৭) **সামাজিক অবস্থা :** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উন্নত জীবনমান উন্নত সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত এবং ইহার ফলে সমাজে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বারা সামাজিক অবস্থা বা মাথাপিছু আয় পরিমাপ করা যায় না।

(৮) **রাজনৈতিক অবস্থা :** বিশ্বে রাজনীতিগত মতাদর্শ বাণিজ্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়া থাকে। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুই শিবিরের মধ্যে একসময় বাণিজ্যিক লেনদেন কার্যত বন্ধ ছিল। কিন্তু বিশ্বমৈত্রী ও সহাবস্থানের প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ দুই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিবির বহির্ভূত কোন কোন দেশ বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধাও ভোগ করিয়াছে। জাতীয় ও পারস্পরিক স্বার্থের প্রয়োজনে একই রাজনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক গোষ্ঠী তথা সীমাবদ্ধ বাজারের সৃষ্টি হয়, যেমন ইউরোপীয় সাধারণ বাজার, কমিকন ইত্যাদি।

(৯) **জাতীয় চরিত্র :** বিভিন্ন দেশে জনসাধারণের মধ্যে চরিত্র, অভ্যাস, রুচি, ধর্ম, প্রথা প্রভৃতি নানা বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ইহার ফলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার পণ্য সামগ্রীর চাহিদা সৃষ্টি হয়। যুক্তরাজ্যের অধিবাসীরা চা ও মাংসপ্রিয়। কিন্তু উহার অভাবহেতু বিদেশ হইতে চা ও মাংস আমদানি করিতে

হয়। মুসলমানগণের ধর্মীয় অনুশাসনে মদ্যপান ও সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। এই কারণে আফ্রিকা ও এশিয়ার মুসলমান অধ্যুষিত দেশে মদ্যশিল্প গড়িয়া উঠে নাই। ঐ সকল দেশের ব্যাংক পরিচালনায়ও বিদেশীরাই অগ্রণী। যে দেশের জাতীয় চরিত্র যত দৃঢ় ও উন্নত সেই দেশের উন্নতিও তত দ্রুত ও নিশ্চিত হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপান ও জার্মানির মাত্র ২৫ বৎসরে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ফিরিয়া পাওয়া এক বিস্ময়কর ঘটনা। ঐ দুই দেশের জাতীয় চরিত্রের প্রভাবেই এই প্রকার অসম্ভব ঘটনা সম্ভব হইয়াছে।

(১০) **সরকারী নীতি**: বহির্বাণিজ্যের প্রসারে সরকারী নীতি অতি গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী শুল্ক নীতি, শিল্প নীতি, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রামান বিষয়ক নীতি প্রভৃতি দেশের শিল্প বাণিজ্যকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনি প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। জাপান ও পশ্চিম জার্মানির বহির্বাণিজ্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নত।

উপরি-উক্ত কারণ ব্যতীত দেশে দেশে রাজনৈতিক চুক্তি, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিনিধি মারফত বিজ্ঞাপন, সহাবস্থান প্রচেষ্টা প্রভৃতি কারণেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়া চলিয়াছে।

[প্রশ্ন : (১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি কি? (২) বিভিন্ন দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যয়ের তারতম্যের কারণ কি?]

পৃথিবীর বাণিজ্যিক অঞ্চল
(Commercial Regions of the World)

আধুনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের প্রত্যক্ষ ফল। এক সময় এই বাণিজ্য পার্শ্ববর্তী দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির সহিত ইহা দূর-দূরান্তে বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু বাণিজ্যের ধারা নিরবচ্ছিন্ন নহে। যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদি নানা কারণে দেশে দেশে সম্পর্কের যেমন অবনতি ঘটে তেমনি বাণিজ্যধারারও পরিবর্তন ঘটে। ইহার ফলে সমস্বার্থের ভিত্তিতে কয়েকটি দেশের মধ্যেই বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হইতে দেখা যায়। এইভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এক-একটি বাণিজ্যিক অঞ্চল গড়িয়া উঠে। এই জাতীয় বাণিজ্যিক অঞ্চলের গঠন ও প্রসার পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই বিশেষভাবে সংঘটিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ ও উহাদের উপনিবেশগুলির মধ্যেই সীমিত ছিল। যেমন শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক বৃটিশ যুক্তরাজ্যকে কেন্দ্র করিয়া কমনওয়েলথভুক্ত ভারত, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশ লইয়া একটি বাণিজ্যিক অঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছিল। আবার

ফ্রান্স, হল্যান্ড, পর্তুগাল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সহিত উহাদের অধিকারভুক্ত বা প্রভাবাধীন দেশসমূহ লইয়া পৃথক পৃথক বাণিজ্যিক অঞ্চল বিস্তৃত ছিল। এই ব্যবস্থায় শিল্পোন্নত দেশগুলি উপনিবেশ হইতে শিল্পের নানাবিধ কাঁচামাল আমদানি করিয়া উৎপন্ন শিল্পপণ্য ঐ সকল দেশে রপ্তানি করিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে উপনিবেশ প্রথা ভাঙ্গিয়া পড়ায় ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আবির্ভাবের ফলে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শোষণের দিন শেষ হয় এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমপ্রসারের ফলে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হয়। এই সংকট হইতে পরিত্রাণের আশায়ই ধনতান্ত্রিক দেশগুলি নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষণের প্রেরণায় বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে নিত্যনতুন বাণিজ্যিক অঞ্চল সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। পক্ষান্তরে সমাজবাদী শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ও জনস্বার্থের ভিত্তিতে নতুন বাণিজ্যিক অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। বর্তমান পৃথিবীতে তিনটি প্রধান বাণিজ্যিক অঞ্চল আছে, যেমন—(১) পশ্চিম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ লইয়া গঠিত বাণিজ্যিক অঞ্চল, (২) সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ লইয়া গঠিত বাণিজ্যিক অঞ্চল এবং (৩) উন্নয়নশীল দেশসমূহ লইয়া গঠিত বাণিজ্যিক অঞ্চল। ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক বিভাগ বর্তমান। কোন কোন দেশ আবার কোন বাণিজ্যিক অঞ্চলেরই অন্তর্ভুক্ত নহে, যেমন ভারত, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান। সমাজবাদী দেশের মধ্যে চীন, ভিয়েৎনাম, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি দেশ কোন বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর সহিত যুক্ত নহে। নিম্নে বিশ্বের বিভিন্ন বাণিজ্যিক অঞ্চল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

শিল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক অঞ্চল :

(১) ইউরোপীয় সাধারণ বাজার (European Common Market) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে শিল্পোন্নত ইউরোপের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারেই ভাঙিয়া পড়ে। ইহার পুনর্গঠনের প্রত্যাশায় ফরাসী বৈদেশিক মন্ত্রী শুম্যানের প্রস্তাবক্রমে ১৯৫০ সালে ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়াম, ইতালি, লুকসেমবার্গ ও নেদারল্যান্ডস্ এই ছয়টি দেশ ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত গোষ্ঠী (European Coal and Steel Community [ECSC]) নামে একটি বাণিজ্য গোষ্ঠী গঠন করে। ইহার ফলে গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে কয়লা, লৌহ আকরিক ও ইস্পাত চলাচলের উপর শুল্ক প্রাচীর ও অন্যান্য বাধা-নিষেধ দূর হয় এবং অবাধ বাণিজ্যের জন্য সাধারণ বাজার স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ সালের ২৫শে মার্চ এই গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ রোমে মিলিত হইয়া ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (European Economic Council [EEC]) এবং ইউরোপীয় পারমাণবিক শক্তি গোষ্ঠী (European Atomic Energy Community [EAEC on EURATOM]) নামে দুইটি সংস্থা গঠন করে। রোম চুক্তি (Rome Treaty) অনুসারে সঙ্ঘবদ্ধ ছয়টি দেশ নিজেদের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ও সঙ্ঘবহির্ভূত দেশের সহিত সমহার শুল্কে

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যে সাধারণ বাজার সৃষ্টি করে উহাই ইউরোপীয় সাধারণ বাজার (European Common Market [ECM]) নামে পরিচিত। এই বাজারের দ্রুত প্রসার ও উন্নতি লক্ষ্য করিয়া সদস্য রাষ্ট্রগুলি ১৯৬৭ সালে 'ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত গোষ্ঠী,' 'ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী' এবং 'ইউরোপীয় পারমাণবিক শক্তি গোষ্ঠী' একত্র করিয়া 'ইউরোপীয় সাধারণ বাজার' নামক একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারী বৃটিশ যুক্তরাজ্য 'আয়ারল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক' এই বাজারে যোগদান করে। ইহা ব্যতীত সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, আইসল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, পর্তুগাল এই বাজারের বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। এই বাজার স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য গোষ্ঠীবদ্ধ দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ক্রমপ্রসার প্রতিরোধ। কারণ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার শংকার কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে এই অর্থনৈতিক প্রতিরোধ যতটা না কার্যকর হইয়াছে তাহার তুলনায় গোষ্ঠীবদ্ধ দেশগুলির বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রে ইহা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হইয়াছে। ইতালির শিল্পোন্নতির প্রধান অন্তরায় ছিল কয়লা। বর্তমানে পশ্চিম জার্মানি ও বেলজিয়াম হইতে এই দেশ বিনা শুল্কে কয়লা আমদানি করিয়া ইস্পাত ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিল্পে বিশেষ উন্নত হইয়াছে। পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, লুকসেমবার্গ, নেদারল্যাণ্ডস শিল্প বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে এই সাধারণ বাজারের মাধ্যমে।

(২) ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংঘ (European Free Trade Association [EFTA]): বৃটিশ যুক্তরাজ্যের আয়ত্তাধীন উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা লাভ ও ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সৃষ্টি যুক্তরাজ্যের সামগ্রিক অর্থনীতিতে গভীর সংকটের সৃষ্টি করে। এই সংকটাবর্ত হইতে পরিত্রাণের আশায় ১৯৬০ সালে যুক্তরাজ্য স্টকহোমে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও পর্তুগাল—এই ছয়টি দেশ লইয়া ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংঘ গঠন করে। এই সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (ক) সভ্য দেশগুলির সহিত শুল্কবিহীন অবাধ বাণিজ্য, (খ) পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিকে লইয়া একটি বৃহৎ বাজার সৃষ্টি এবং (গ) সংঘের অন্তর্ভুক্ত সকল দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি। ১৯৭০ সালে আইসল্যাণ্ড এই সংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করে। ফিনল্যাণ্ডও ইহার সহযোগী সদস্য ছিল। কিন্তু সাধারণ বাজারের উন্নতির তুলনায় ইহার উন্নতি আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। এই কারণে ১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারী যুক্তরাজ্য ও ডেনমার্ক সাধারণ বাজারে যোগদান করে এবং এই সংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ বাজারের সহিত অবাধ বাণিজ্যের চুক্তি করে। এইভাবে ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংঘের ভবিষ্যৎ অবলুপ্তির সূচনা হয়।

(৩) বেনেলাক্স (Benelux): ১৯৬০ সালে ইউরোপের বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্, লুকসেমবার্গ প্রভৃতি কয়েকটি দেশ পারস্পরিক বাণিজ্যিক স্বার্থ

সংরক্ষণের জন্য একটি অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করে। ইহাই বেনেলাক্স নামে পরিচিত। সাধারণ বাজারের প্রসারের ফলে ইহার অস্তিত্বও বিলুপ্তির পথে।

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের বাণিজ্যিক অঞ্চল :

পারস্পরিক অর্থ নৈতিক সাহায্যের কম্যুনিস্ট সংসদ (Council for Mutual Economic Aid—CMEA or COMECON)—সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য সংক্ষেপে 'কমেকন' নামে এই সংসদ গঠন করে। প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লাভাকিয়া, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানি পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও আলবেনিয়া ইহার সদস্য ছিল। ১৯৩২ সালে এই দেশগুলি মস্কোতে মিলিত হয় এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যথা—(ক) সভ্য দেশসমূহের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন, (খ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ, (গ) দ্রুত কারিগরী উন্নতির প্রচেষ্টা চালান, (ঘ) শিল্প ও শিল্প পণ্যের মানোন্নয়ন এবং (ঙ) জীবনমানের উন্নতি নিশ্চিত করা ইত্যাদি। ১৯৬২ সালে আলবেনিয়া এই সংসদ ত্যাগ করে। ইহার পরে মঙ্গোলিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, কিউবা, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ এই সংসদে যোগ দেয়।

'কমেকন'-এর সদস্য দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে ১৯৫০ হইতে ১৯৭০ সালের মধ্যে এই দেশগুলির শিল্পোৎপাদন প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, নতুন নতুন শিল্প স্থাপিত হইয়াছে এবং সর্বোপরি সদস্য রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় সাতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহ (Commonwealth Countries): যুক্তরাজ্য ও ইহার পূর্বতন উপনিবেশ বা প্রভাবাধীন ৩০টি দেশ লইয়া 'কমনওয়েলথ' গঠিত। ইহার সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে শুল্ক হারের বিশেষ বিশেষ সুবিধা ছিল। কিন্তু বর্তমানে কোন কোন দেশ সংরক্ষণমূলক শুল্ক ধার্য করায় বা 'কমনওয়েলথ' বহির্ভূত অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস ইত্যাদি সুবিধা দেওয়ায় 'কমনওয়েলথ'-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্যের বিশেষ অবনতি ঘটে। 'কমনওয়েলথ'-ভুক্ত দেশের মধ্যে যুক্তরাজ্যের নিজস্ব রপ্তানির পরিমাণ বিগত ২৫ বৎসরে ৪৮% হইতে কমিয়া ১৬% দাঁড়াইয়াছে ফলে ইহার ভবিষ্যৎ বিলুপ্তি প্রায় নিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। যুক্তরাজ্যের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে প্রবেশ সম্ভবত ইহার কফিনে সর্বশেষ পেরেক ঠোকার কার্যটি সমাধা করিল।

কলম্বো পরিকল্পনা (Colombo Plan)—দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের উন্নতির জন্য ১৯৫০-৫১ সালে কলম্বোতে একটি বৈঠকে 'কলম্বো পরিকল্পনা' নামে একটি সংগঠন স্থাপিত হয়। এই সংগঠনের সদস্য দেশগুলিকে কারিগরী ও আর্থিক সাহায্য দেওয়াই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। জাপান,

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণকারী দেশ ছিল এবং প্রথম দিকে সদস্য রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে।

উন্নয়নশীল দেশসমূহের বাণিজ্যিক অঞ্চল :

(১) **দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের সংঘ** (Association of South East Asian Nations—ASEAN) : ১৯৬৭ সালে থাইল্যাণ্ডের ব্যাংকক শহরে ইহার জন্ম। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, সিঙ্গাপুর ও ফিলিপাইন এই পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্র। সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার, অর্থনৈতিক উন্নতি, স্থায়িত্ব ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

(২) **আরব অর্থনৈতিক গোষ্ঠী** (Arab Economic Unity—CAEU) : ১৯৬৪ সালে এই সংস্থার জন্ম হয়। মিশর, ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান, কুয়েট প্রভৃতি ইহার সদস্য। সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক শুল্ক প্রত্যাহার, একই হারে বাণিজ্যিক শুল্ক ধার্য, শ্রম ও পুঁজির গতিশীলতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে কুয়েট এই সংস্থা পরিত্যাগ করিলে ১৯৭১ সালে মিশর, ইরাক ও সিরিয়া একটি চুক্তির মাধ্যমে 'সাধারণ বাজার' প্রতিষ্ঠা করে।

(৩) **পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারী সংগঠন** (Organisation of Petroleum Exporting Countries—OPEC) : ১৯৬০ সালে এশিয়া ও আফ্রিকার পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারী দেশসমূহ পেট্রোলিয়াম বাণিজ্য নীতির সমন্বয় ও সংযোজনের জন্য এই সংস্থা গঠন করে। ১৯৬৮ সালে শুধু মাত্র আরব দেশের পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারী দেশগুলির মধ্যে এক চুক্তির ফলে অপর একটি সংস্থার সৃষ্টি হয়। ইহার নাম পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারী আরব দেশসমূহের সংগঠন (OAPEC)।

(৪) **এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন** (Economic Commission for Asia and Far East or ECAFE) : এশিয়ার দূর প্রাচ্যের দেশসমূহ লইয়া এই সংস্থা গঠিত। পশ্চিমী দেশসমূহের সাহায্যপুষ্ট এই সংস্থার কার্যধারা প্রসারের ফলে এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উপরি-উক্ত সংস্থাগুলি ব্যতীত আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে পূর্ব আফ্রিকা গোষ্ঠী (East African Community—EAC) পশ্চিম আফ্রিকা গোষ্ঠী (West African Economic Community—WAEC) নামে দুইটি সংস্থা গঠিত হইয়াছে। আমেরিকায়ও অনুরূপ কয়েকটি সংস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মধ্য-আমেরিকার সাধারণ বাজার (Central American Common Market—CACM) এবং ক্যারিবিয়ান কমিউনিটি (Caribbean Community) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

[প্রশ্ন : (১) বাণিজ্যিক অঞ্চল বলিতে কি বুঝ? (২) পৃথিবীর প্রধান বাণিজ্য অঞ্চলগুলি কি কি? (৩) ব্যাখ্যা কর—ECAFE, COMECON, ECM, EFTA.]

অনুশীলনী ১৮

১। বাণিজ্যের সংজ্ঞা লিখ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সভ্যতার ও জাতীয় উন্নতির সূচক কেন বলা হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।

[Define Trade. Explain why International Trade is treated as an index of civilization and of national prosperity.]

[Specimen Questions, 1980]

২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তিসমূহ আলোচনা কর।

[Discuss the bases of international trade.]

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভৌগোলিক কারণসমূহ নির্দেশ কর। এই বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতির বিবরণ দাও।

[Identify the geographical bases of International Trade. Describe its recent trends.] [W. B. H. S. C. Exam., 1984]

৪। 'বাণিজ্যকে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সূচক বলিয়া গণ্য করা হয়।' —ইহার কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর।

['Trade is treated as an index of economic development of a country.'—Explain the reasons.] [Tripura H. S. Exam., 1981]

৫। পৃথিবীকে প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক অঞ্চলে ভাগ কর। এই সকল অঞ্চলের মধ্যে সংগঠিত বাণিজ্যের ধরন নির্দেশ কর।

[Divide the world into major commercial regions and indicate the pattern of trade carried on among these regions.]

৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (ক) ইউরোপীয় সাধারণ বাজার, (খ) কম্যুনিস্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, (গ) এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন, (ঘ) ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সমিতি।

[Write short notes on : (a) European Common Market, (b) COMECON, (c) ECAFE, (d) EFTA.]

উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনৈতিক ভূগোল

১ | সূচনা
(Introduction)

মাটিকে আশ্রয় করিয়াই মানুষের জীবন ও জীবিকা, তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ভারতের মাটিকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতীয় জীবনধারা। কিন্তু অতীতের ভারতবর্ষের রূপ ও বর্তমান ভারতের রূপ এক নহে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট প্রায় দুইশত বৎসরের বৃটিশ শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্ত হয় ভারতবর্ষ। আর ঐ মুক্তিলগ্নেই রাজনৈতিকভাবে জন্ম হয় বর্তমান ভারতের। প্রাচীন ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব প্রান্তে ও পশ্চিম প্রান্তে প্রধানত মুসলমান-অধ্যুষিত স্বল্প পরিসর দুইটি ভূভাগ পাকিস্তান নাম গ্রহণ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আবার পূর্ব প্রান্তের অংশটি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কবলমুক্ত হইয়া বাংলাদেশ নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষ কিছুটা ভূভাগ হারাইয়া রাজনৈতিক দিক হইতে বর্তমান ভারতে পরিণত হইলেও তাহার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, পরিবর্তিত হয় নাই তাহার সাংস্কৃতিক মূলধারাটি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিমালয়, উত্তরাপথ ও উপকূলসংলগ্ন ভূমিভাগ-সহ দক্ষিণাপথই ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এই দেশটি যেমন বিশাল তেমনি অপূর্ব ইহার ভূ-বৈচিত্র্য। নদ-নদী, হ্রদ, পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, অরণ্যানী, মরুভূমি ইত্যাদি মহাদেশীয় বৈচিত্র্যাবলীর প্রায় সকলই এই দেশে বর্তমান। এই কারণে ইহাকে উপ-মহাদেশ (Sub-continent) বা ক্ষুদ্র পৃথিবী (An epitome of the world) বলা হয়।

ভারতভূমি বিশ্বের সুপ্রাচীন সভ্যদেশগুলির অন্যতম। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা এবং নর্মদা ও তাপ্তী অঞ্চলে খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি ভারতের এক অতি প্রাচীন গৌরবময় উন্নত সভ্যতার কথাই ঘোষণা করে। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাও নানা বৈচিত্র্যে ভরা। এদেশের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ুর বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ এ দেশকে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতির সুযোগ দিয়াছে। অতীতে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি বহু দেশের ঈর্ষার সঞ্চার করিত। কবির ভাষায় বলা যায়—"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।" ফলে যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের মাটিতে বহু বিদেশী জাতির আগমন ঘটে। কিন্তু এদেশের মাটি, জলবায়ু ও সংস্কৃতির বিচিত্র প্রভাবে তাহারা ধীরে ধীরে একদিন ভারতের জনজীবনের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া একাত্ম হইয়া গিয়াছে। পরকে আপন করিবার এক অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ভারতের জল-মাটির রহিয়াছে। এখানে 'শক-হুন দল

পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন'। এইভাবেই ভারতে বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়াছে, বিভেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভারত মহামানবের এক মহামিলনক্ষেত্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতের অতীত ঐশ্বর্যে ও গৌরবে অত্যুজ্জ্বল। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব তাহার বাণিজ্যধারার প্রসারের সহিত বিশ্বের নানা দিকে নানা দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেকালে পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য এবং ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিবিড় যোগ ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষে তৈয়ারী 'ঢাকাই মস্‌লিন' বর্তমানে উপকথায় পর্যবসিত হইলেও একদিন বিশ্বের বাজারে উহার ব্যাপক চাহিদা ছিল। দিল্লীর কুতুবমিনার-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে প্রোথিত কলঙ্কবিহীন লৌহস্তম্ভ আজিও ভারতের এককালের বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের বিস্ময়কর নিদর্শন হিসাবে বিরাজমান। পরবর্তী যুগে বৃটিশ শক্তির আগমন ভারতের সংস্কৃতিকে যদিও কোন কোন দিক হইতে বিশেষভাবে পুষ্ট করিয়াছে, তথাপি ভারতের নিজস্ব অতীত শিল্প-বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়াছে। বিদেশী শাসক-শ্রেণী এই দেশের সকল কিছুকেই নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিবার ফলে ভারত ক্রমে ক্রমে একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, বৃটিশদের আগমনের ফলেই এদেশে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও অনুপ্রবেশ ঘটে। ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে এবং নব-ভারত গঠনে এই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দান নিঃসন্দেহে অপরিসীম। ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ভারতের অর্থ নৈতিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনাকীর্ণ দেশ। জনাকীর্ণতায় চীনের পরেই ভারতের স্থান। বহু যুগ ধরিয়া বিভিন্ন জাতির আগমনে ও সংমিশ্রণে ভারতে বহু জাতি ও উপজাতির মানুষ দেখা যায়। তাহাদের ভাষা, খাদ্য, পোশাক, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ধর্ম ইত্যাদির মধ্যে আপাত পার্থক্য সত্ত্বেও অতীত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে তাহাদের জীবনদর্শনের মূল ধারাটি অভিন্ন এবং সকলে মিলিয়া এক মহাভারতীয় জাতি। সাধারণ মানুষ সহজ, সরল, উদার, ধর্মপরায়ণ ও কঠোর পরিশ্রমী ; কিন্তু ভাবপ্রবণ। ভারতের বড় সম্পদ এই জনসমষ্টি —যাহাদের উত্তম, শৌর্য, বীর্য, ত্যাগ ও তিতিক্ষা অতুলনীয়।

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারত অর্থ নৈতিক দিক হইতে কৃষি-নির্ভর একটি অনুন্নত দেশ ছিল। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী ছিল তাহার নিত্যসঙ্গী। কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, তাম্র, অভ্র প্রভৃতি বিভিন্ন খনিজের ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও ভারত নিতান্ত পশ্চাৎপদ ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে বিগত উনচল্লিশ বৎসরে ভারত পঞ্চবার্ষিক অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগে প্রভূত উন্নতি

করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইন্ধন-শক্তির বিপুল সম্ভার ভারতে শিল্পায়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছে। তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ ও আণবিক শক্তি-সঞ্জাত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে শিল্পোৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ধরনের রাষ্ট্র গঠনে একদিকে সরকারী প্রতিশ্রুতি ও প্রচেষ্টা এবং অপরদিকে জন-উদ্যোগ নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। আশা করা যায় ভারতের সমাজনীতি ও অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য পূরণের পথে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালিত হইলে দেশে সকল ক্ষেত্রে অচিরেই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিবে।

[**প্রশ্ন**: (১) 'ভারতের অর্থ নৈতিক বিবর্তন' সংক্ষেপে আলোচনা কর। (২) ভারতকে 'ক্ষুদ্র পৃথিবী' বলা হয় কেন ?]

অবস্থান, সীমা, আয়তন এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো
(Situation, Boundary, Size and Political Division)

ভারতীয় ইউনিয়ন বা সংক্ষেপে ভারত উত্তর গোলার্ধে এশিয়া মহাদেশে ৮°৪´ উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৩৭°৬´ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৬৮°৭´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হইতে ৯৭°২৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। [প্রকৃতপক্ষে মূল ভূখণ্ডের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত গ্রেট্ নিকোবর দ্বীপের দক্ষিণাংশ ৬°৪৫´ উত্তর অক্ষাংশই ভারতের সর্বদক্ষিণ ভূ-আঞ্চলিক অবস্থান।] ভারতের উত্তরে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণী হিমালয় অবস্থিত। হিমালয়ের ক্রোড়ে নেপাল, ভূটান ও ইহার উত্তরে তিব্বতের বিরাট মালভূমি ভারতের উত্তর সীমা নির্দেশ করে। ভারতের দক্ষিণে শ্রী লংকা দ্বীপ ও ভারত মহাসাগরের সুনীল বিস্তার এবং পূর্ব ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের জলভাগ। ইহার উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মদেশ, নবগঠিত বাংলাদেশ এবং উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান অবস্থিত। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও চীনের সীমান্ত আসিয়া ইহার সীমান্তের সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজনৈতিক দিক হইতে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূভাগের উত্তর দিক প্রশস্ত ও দক্ষিণ দিক ক্রমশ সরু হইয়া ভারত মহাসাগরের উপকূলে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। তিন দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত ভূভাগ হওয়ায় ইহা একটি উপদ্বীপ। এশিয়ার মধ্যে ইহা বৃহত্তম। ভারতের মূল ভূখণ্ড ব্যতীত পূর্বে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিমে কোচিনের অদূরে আরব সাগরে অবস্থিত ছোট ছোট কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি—লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয়, আমিনদিভি প্রভৃতিও ভারতের অন্তর্ভুক্ত। ভারতের মোট আয়তন ৩,২৮৭,৭৮২ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে সপ্তম। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রেজিল

ও অস্ট্রেলিয়ার পরেই ভারতের স্থান। কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩½° উত্তর-অক্ষাংশ) ভারতকে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় সমান দুইটি অংশে ভাগ করিয়া অতিক্রম করিয়াছে। আবার ৮০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ভারতকে পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। পূর্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে

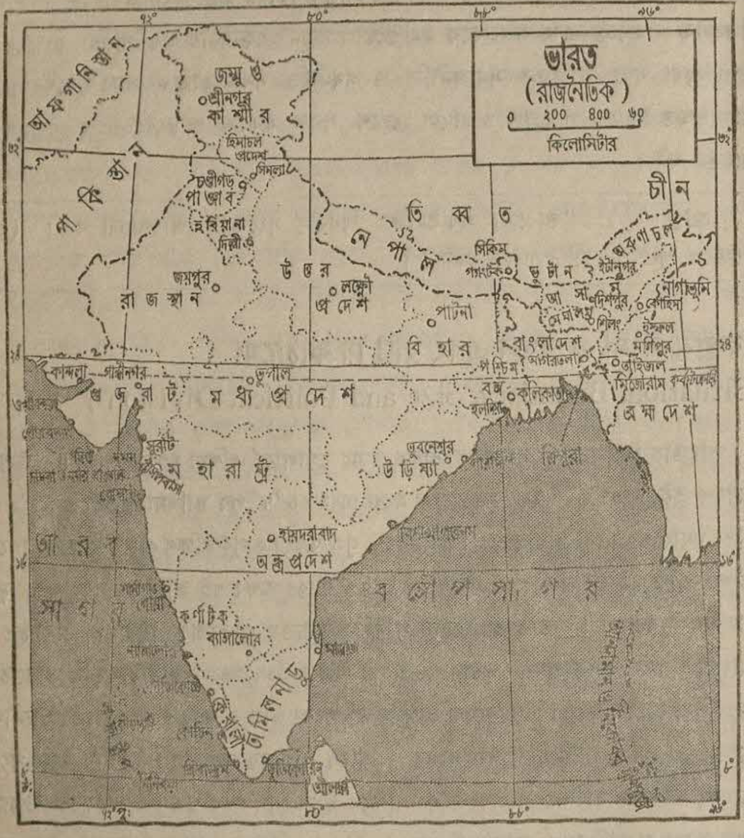

চিত্র ১.১ : ভারতীয় ইউনিয়ন বা যুক্তরাষ্ট্র : রাজনৈতিক বিভাগ।

ইহার বিস্তার যথাক্রমে ৩,২১৪ কিলোমিটার এবং ২,৯৩৩ কিলোমিটার। ভারতের স্থল-সীমার দৈর্ঘ্য ১৫,২০০ কিলোমিটার এবং তিন দিকের উপকূল ভাগের দৈর্ঘ্য ৬,১০০ কিলোমিটার। ভূভাগের মোট আয়তনের তুলনায় জলসীমা বা সৈকত রেখার দৈর্ঘ্যের অনুপাত প্রতি ৬০০ বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ১ কিলোমিটার। এই দেশের লোকসংখ্যা ১৯৮১ সালের আদম-সুমারি অনুযায়ী প্রায় ৬৮·৩৮ কোটি। বর্তমানে লোকসংখ্যা প্রায় ৭০ কোটি এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটার এলাকায় গড়ে ২২১ জন লোক বাস করে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করে। ইহার পর ১৯৭৬ সালে

'সমাজতান্ত্রিক ও ধর্ম-নিরপেক্ষ' আবার ব্যাখ্যাত হয়। বর্তমানে ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ধর্ম-নিরপেক্ষ প্রজাতান্ত্রিক দেশ। এই দেশে ২২টি অঙ্গরাজ্য ও ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে। ইহারাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মূল কাঠামো।

রাজ্য: (১) জম্মু ও কাশ্মীর, (২) হিমাচল প্রদেশ, (৩) হরিয়ানা, (৪) পাঞ্জাব, (৫) রাজস্থান, (৬) উত্তরপ্রদেশ, (৭) গুজরাট, (৮) মহারাষ্ট্র, (৯) মধ্যপ্রদেশ, (১০) কর্ণাটক (১১) কেরালা, (১২) তামিলনাড়ু, (১৩) অন্ধ্রপ্রদেশ, (১৪) ওড়িশা, (১৫) বিহার, (১৬) পশ্চিমবঙ্গ, (১৭) মেঘালয়, (১৮) আসাম, (১৯) নাগাভূমি, (২০) মণিপুর, (২১) ত্রিপুরা (২২) সিকিম।

কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল: (১) দিল্লী, (২) চণ্ডীগড়, (৩) গোয়া, দমন ও দিউ, (৪) দাদরা ও নগর হাভেলি, (৫) পণ্ডিচেরী, (৬) মিজোরাম, (৭) আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, (৮) লাক্ষাদ্বীপ ও (৯) অরুণাচল প্রদেশ।

ভারতের ২২তম রাজ্য সিকিম অতীতে ভারতের সহিত আরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে নির্ভরশীল একটি মিত্ররাষ্ট্র ছিল, কিন্তু ১৯৭৫ সালে সিকিমের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী ইহা ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়।

[**প্রশ্ন**: (১) বাক্যগুলি সম্পূর্ণ কর: (ক) ভারতের মোট আয়তন ......। (খ) পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণে ভারতের বিস্তার যথাক্রমে ... ও ...। (গ) ভারতের দৈর্ঘ্য ... এবং উপকূল ভাগের দৈর্ঘ্য...। (ঘ) এই দেশের মোট লোকসংখ্যা ১৯৮১ সালে ছিল প্রায় ......। (ঙ) এই দেশ ...অঙ্গরাজ্য ও ... কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত। (২) ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিক অঞ্চলগুলির নাম লিখ। কোন্ রাজ্যটি সর্বশেষে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইয়াছে ?]

---

২ পরিবেশ
(Environmental Features)

অবস্থান ও আয়তন এবং ইহার প্রভাব
(Situation and Size : Influence)

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও ইহার আয়তন এই দেশকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে উন্নতির এক বিশেষ সুযোগ দিয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র উত্তর গোলার্ধে প্রধানত গ্রীষ্মপ্রধান উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে সমুদ্র থাকায় ইহার অবস্থান উপদ্বীপীয়। আয়তনে ইহা প্রায় মহাদেশের সহিত তুলনীয়। কর্কটক্রান্তি রেখা এই দেশকে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। ইহার ফলে এই দেশের দক্ষিণ ভাগ অপেক্ষা উত্তর ভাগ শীতলতর। অর্থাৎ দক্ষিণ ভাগ নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী উষ্ণ মণ্ডলে এবং উত্তর ভাগ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত।

(ক) এই প্রকার অবস্থান ও আয়তন দেশের জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিভিন্নতার জন্য দায়ী। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর আনুকূল্যে প্রচুর পরিমাণ ধান, গম, যব, ইক্ষু, তুলা, পাট, চা, তামাক, রবার ইত্যাদি জন্মে। কৃষিব্যবস্থার উন্নতি হইলে এই দেশের পক্ষে বিশ্বের অন্যতম খাদ্যভাণ্ডারে পরিণত হওয়া সম্ভব।

(খ) দেশটির তিনদিকে সমুদ্র ও একদিকে সুউচ্চ পর্বত, এই দেশকে স্বাভাবিক রাজনৈতিক নিরাপত্তার সুবিধা দান করিয়াছে।

(গ) সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে এই দেশের জলবায়ু নিয়ন্ত্রিত। এই উপমহাদেশের বৃষ্টিপাত ও ঝড় ঝঞ্চা ইত্যাদি সমুদ্র হইতে আগত মৌসুমী বায়ু প্রবাহ দ্বারা সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(ঘ) সমুদ্রসংলগ্ন অবস্থান হেতু অধিবাসীদের পক্ষে উপকূলভাগে বন্দর গড়িয়া তোলা ও নৌ-দক্ষতা অর্জন, নৌ-শিল্পে বিশিষ্টতা অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে সুযোগ রহিয়াছে।

(ঙ) নৌ-দক্ষতা ও নৌ-শিল্পে বিশিষ্টতা এই দেশকে অতি প্রাচীন কাল হইতেই আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগ স্থাপনের সুবিধা দান করিয়াছে। এক সময় ভারতীয় বাণিজ্যতরী পণ্যসম্ভার লইয়া নিকট প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করিত। ক্রমে এই সকল অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসার লাভ করিয়াছে। ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আজিও বর্তমান।

(চ) এই দেশের সমুদ্র উপকূলে মৎস্য আহরণ এবং তৎসহ উপযুক্ত জলযান ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের প্রসার ঘটিবার প্রত্যক্ষ সুবিধা আছে।

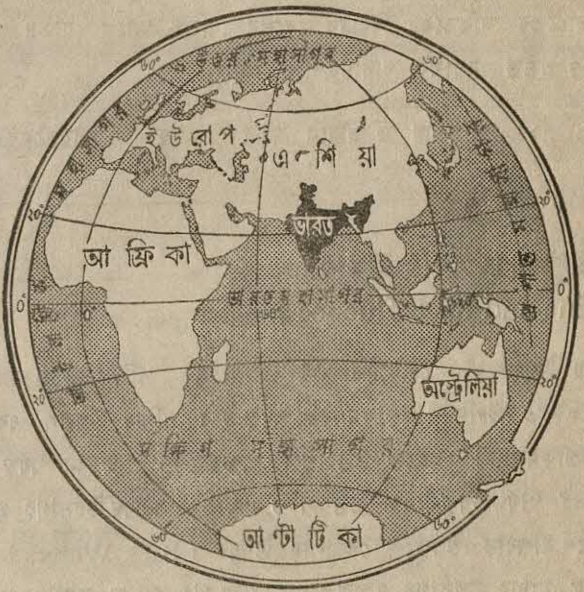

পূর্ব গোলার্ধে ভারতের অবস্থান

চিত্র ২.১ : ভারতের অবস্থান।

(ছ) ভারতের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমে স্থলসীমা রহিয়াছে। উহা সুউচ্চ পর্বত দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় ঐ অঞ্চলের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

(জ) এই পর্বত সীমার মধ্যে স্থানে স্থানে কয়েকটি গিরিপথ বর্তমান। এই গিরিপথের মধ্য দিয়া পূর্বে ভারতের সহিত আফগানিস্থান, মধ্যপ্রাচ্য, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের স্থলপথে বাণিজ্য পরিচালিত হইত। এবং এই পথেই আরব-বণিকদের মারফত ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিত।

(ঝ) পূর্ব গোলার্ধের দেশসমূহের মধ্যস্থলে ভারতের অবস্থান। এই প্রকার অবস্থানের ফলে ভারতের পক্ষে ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ অংশের সহিত সহজ ও নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করা বিশেষ সুবিধাজনক। অধিকন্তু ইউরোপের সহিত সহজ যোগাযোগ এখানে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।

(ঞ) এশিয়ার দক্ষিণ ভাগের দরিয়ার উপর অধিকার সমগ্র এশিয়া খণ্ডে শান্তির অপরিহার্য এক শর্ত। এই কারণে পূর্ব গোলার্ধের কেন্দ্রে ও ভারত মহাসাগরের শীর্ষ দেশে ভারতের অবস্থান সামরিক দিক হইতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

(ট) ভারতের আয়তনের বিরাটত্ব দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার সম্পদ উৎপাদনের ও প্রভূত জনসংখ্যা পোষণের পক্ষে অনুকূল।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতীয় জনজীবনে ভারতের অবস্থান ও আয়তনের প্রভাব বর্ণনা কর।]

সৈকত রেখা এবং ইহার প্রভাব
(Coastline and its Influence)

ভারতের উপকূলভাগ মোটামুটি দীর্ঘ ও অভগ্ন। পশ্চিম প্রান্তে গুজরাট রাজ্যের দক্ষিণ সীমা হইতে সর্বদক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ইহার পশ্চিম উপকূল এবং পূর্বপ্রান্তে দক্ষিণের কন্যাকুমারিকা হইতে উত্তর-পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন পর্যন্ত ইহার পূর্ব উপকূল। এই দীর্ঘ উপকূলরেখা উত্তর-পশ্চিমে কচ্ছ ও ক্যাম্বে উপসাগর, মধ্যে বোম্বাই দ্বীপ ও দক্ষিণে মালবার উপকূলে কেরালার উপহ্রদ (Back Waters) দ্বারা ভগ্ন। দক্ষিণ প্রান্তে মান্নার উপসাগর ও পক প্রণালী এবং পূর্ব প্রান্তে বঙ্গোপসাগর সন্নিহিত চিল্কা, পুলিকট হ্রদ ও কাবেরী, কৃষ্ণা, গোদাবরী, মহানদী ও গঙ্গা নদীর মোহনা অবস্থিত। কিন্তু উপসাগর, নদীমোহনা বা হ্রদ কোনটিই যথেষ্ট গভীর নহে। এই কারণে উপকূলে উল্লেখযোগ্য বন্দর গঠনের পক্ষে এইগুলি তেমন উপযোগী নহে। অধিকন্তু দৈর্ঘ্য অনুযায়ী স্থলভাগের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট জলভাগের (inlets) সংখ্যা ও আয়তন সামান্য। দেশের আয়তনের প্রতি ৫৯৫ বর্গ কিলোমিটার ভূমির অনুপাতে সৈকতরেখা মাত্র এক কিলোমিটার। বৃটিশ যুক্তরাজ্যে ঐ অনুপাত প্রতি ২·৯ বর্গ কিলোমিটার ভূভাগের তুলনায় এক কিলোমিটার সৈকত রেখা। ভারতের পশ্চিম উপকূল বরাবর পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অবস্থিত। ইহার সংলগ্ন পশ্চিমের ভূভাগ খুবই সংকীর্ণ। সমুদ্র এই অঞ্চলে যেমন অগভীর তেমনি বালুকাময় ফলে এই অঞ্চলে **কাণ্ডলা, বোম্বাই, মার্মাগাঁও ও কোচিন** ব্যতীত কোন স্বাভাবিক বন্দর গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিম উপকূলের প্রধান বন্দর করাচী পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইহার বিকল্প বন্দর হিসাবে গুজরাটের কচ্ছ উপসাগরের তীরে কাণ্ডলা বন্দর আধুনিক প্রথায় নির্মাণ করা হইয়াছে। কিন্তু দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যথেষ্ট নহে। আধুনিক বন্দর হিসাবে বোম্বাই ও কাণ্ডলা ব্যতীত অন্যান্য বন্দর তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। এই অঞ্চলের বন্দর গঠনের পক্ষে স্থানীয় জলবায়ুও তেমন অনুকূল নহে। দক্ষিণ-পশ্চিম

মৌসুমী বায়ু প্রবাহে বৎসরের মে হইতে আগস্ট মাস পর্যন্ত এই উপকূলে প্রবল ঝড় হয়। সমুদ্রও অশান্ত আকার ধারণ করে। সুগঠিত পোতাশ্রয়ের অভাবে ইহা জাহাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। সুতরাং বোম্বাই, কাণ্ডলা ও মার্মাগাঁও ব্যতীত অন্যান্য ছোট বন্দর ঐ সময়ের জন্য কার্যত বন্ধ থাকে।

ভারতের পূর্ব উপকূল-সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর অত্যন্ত অগভীর। নদীর মুখগুলিতে খাঁড়ির অভাব। বৃটিশ যুক্তরাজ্যে টেমস্, ক্লাইড, হাম্বার প্রভৃতি নদীর মুখগুলি প্রশস্ত ও গভীর এবং বন্দর গঠনের পক্ষে আদর্শ। ভারতের পূর্ব উপকূলে মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরীর মত বিরাট বেগবতী নদী থাকা সত্ত্বেও বন্দর গঠনের তেমন কোন সুবিধা নাই। উপকূলের হ্রদ ও সমুদ্র খুবই অগভীর। সমুদ্র তরঙ্গসংকুল এবং এখানে আকস্মিক ঝড়ের সৃষ্টি করে। এই অঞ্চলের অন্ধ্রপ্রদেশে **বিশাখাপত্তনম** একমাত্র স্বাভাবিক বন্দর। **মাদ্রাজ** বন্দর বাঁধের সাহায্যে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় গড়িয়া তোলা হইয়াছে। নদী বন্দর হিসাবে গঙ্গা-নদীর মোহনা হইতে ১২০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে **কলিকাতা** একসময় পূর্ব ভারতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ পলি জমিয়া এই বন্দর বর্তমানে প্রায় অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অবনতির ফলে বিকল্প বন্দর হিসাবে ওড়িশায় **পারাদীপ** ও পশ্চিমবঙ্গে **হলদিয়া** বন্দর নির্মাণ করা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের অস্থিরতার জন্য ইহাদের কার্যকারিতা সম্পর্কেও সংশয় দেখা দিয়াছে।

ভারতীয়গণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই নৌ-বিদ্যায় ও উপকূলীয় বাণিজ্যে বিশেষ উন্নত ছিল। জলপথে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক বাণিজ্যের উপযোগী বন্দর গঠনের অসুবিধা ভারতের উপকূলীয় ও বহির্বাণিজ্যের পক্ষে এক বিশেষ প্রতিবন্ধক। পোতাশ্রয় ও বন্দরের স্বল্পতাহেতু ভারতীয়রা আধুনিক নৌবিদ্যায় তেমন পটু নহে ; জাহাজ শিল্পও তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। ফলে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতকে এখনও বিদেশী জাহাজের উপর বেশি নির্ভর করিতে হয়। ভারতে শ্রমশিল্পের অগ্রগতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার এই কারণেই উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটিতে পারে নাই। উপকূল অঞ্চলে মৎস্য শিল্পও বিশেষ উল্লেখযোগ্য-ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই।

ভারতের উপকূল রেখা আদর্শ না হইলেও ইহার উপকূল সংলগ্ন জলভাগ বিশেষ সমৃদ্ধ। মহাদেশীয় সোপান সমেত এই জলভাগের মোট আয়তন প্রায় ১৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার। ইহা মৎস্য ও নানা ধরনের খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পশ্চিম উপকূলে বম্বে-হাই অঞ্চলে ও ক্যাম্বে উপসাগরীয় উপকূলে খনিজ তেলের বিরাট সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানেও তেল সম্পদের সন্ধান চলিতেছে। কেরালার উপকূলে বালুকা হইতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ মোসাজাইট সংগ্রহ

করা হয়। ভারতে সমুদ্রের জল হইতে প্রচুর লবণ, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ব্রোমাইড সংগ্রহ করা সম্ভব। কিন্তু এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না।

[**প্রশ্ন**: (১) ভারতীয় উপকূলভাগের বৈশিষ্ট্য কি? (২) পশ্চিম উপকূলের চারিটি এবং পূর্ব উপকূলের চারিটি প্রধান বন্দরের নাম লিখ। ইহাদের মধ্যে কৃত্রিম বন্দর কোন্‌টি? ভারতের উপকূল-সংলগ্ন মহীসোপানের আয়তন কত? (৪) উপকূলীয় সমুদ্রের কোথায় কোথায় খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে? (৫) উপকূলভাগের অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ 'কি এবং কোথায়'—তাহা উল্লেখ কর।]

ভূ-প্রকৃতি ও ইহার প্রভাব
(Topography and its Influence)

ভারতের ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। কোথাও সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী, কোথাও ঈষৎ ঢেউ খেলানো মালভূমি, কোথাও বা সমভূমির দিগন্ত বিস্তার বা সমুদ্র তরঙ্গাভিঘাতে সিক্ত উপকূলভূমি। এই বিচিত্র ভূ-প্রকৃতিই ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার রীতি-নীতি, জলবায়ু, বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিভিন্নতার জন্য মূলত দায়ী। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সামগ্রিক জীবনধারা ও সংস্কৃতিতে যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় ইহাও ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ফল। কিন্তু সর্বপ্রকার বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা সুসংহত সমন্বয় বর্তমান।

ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী ভারতকে পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—(ক) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল** (The Northern Mountainous Regions), (খ) **মধ্যবর্তী বৃহৎ সমভূমি** (The Great Central Plains), (গ) **দক্ষিণের মালভূমি** (The Southern Plateau), (ঘ) **পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের উপকূল ভূমি** (The Coastal Plains of the East and the West) এবং (ঙ) **দ্বীপভূমি** (Islands)।

(ক) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল (The Northern Mountainous Regions)

ভারতের উত্তর সীমা ব্যাপিয়া বিশাল হিমালয় পর্বত ইহার শাখাপ্রশাখা সহ অবস্থিত। মধ্য এশিয়ার **পামির** মালভূমি (পৃথিবীর ছাদ) হইতে উত্থিত হইয়া হিমালয় পর্বত ভারতে প্রবেশ করিয়াছে ও পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকে ইহা ধনুকের আকারে বাঁকিয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ইহা দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়া ভারতের পূর্ব সীমান্ত রক্ষা করিতেছে। আবার উহার কিছু শাখা-প্রশাখা পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইয়া বিভিন্ন নামে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে। মেঘালয়ের **গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া** এবং নাগাভূমির

নাগা, লুসাই, চীন, পাটকোই হিমালয় পর্বতের শাখা প্রশাখা। ইহার অপর একটি শাখা ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা **আরাকান ইওমা** নামে পরিচিত। ইহার মূল প্রান্তটি ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগরের তলদেশে অদৃশ্য হইয়া আন্দামান-নিকোবর

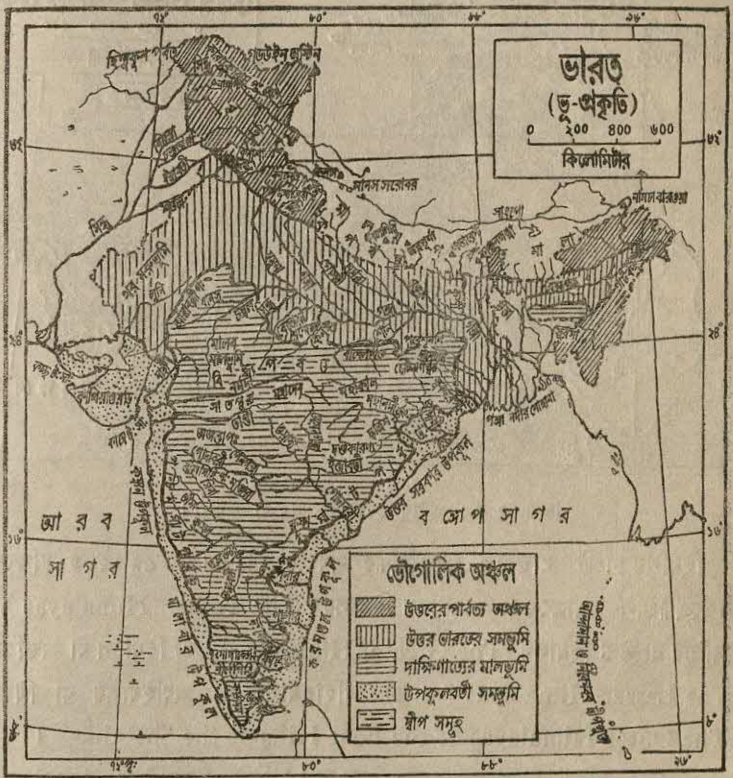

চিত্র ২.২ : ভারত : ভৌগোলিক অঞ্চল।

দ্বীপপুঞ্জে পুনরুত্থিত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে **নাঙ্গাপর্বত** (৮,১২৬ মি.) হইতে উত্তর-পূর্বে **নামচাবারওয়া** (৭,৭৫৭ মি.) পর্যন্ত হিমালয়ের অবস্থান। পূর্ব-পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৫০০ কিলোমিটার, এবং উত্তর-দক্ষিণে ইহার বিস্তার স্থান বিশেষে ২০০ হইতে ৪৫০ কিলোমিটার। এই পর্বতশ্রেণীর পৃথিবী সর্বোচ্চ শৃঙ্গ **মাউণ্ট এভারেষ্ট** ৮,৮৪৮ মিটার। হিমালয় অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। সমগ্র হিমালয়ের প্রায় ২/৩ অংশ ভারতের মধ্যে এবং ১/৩ অংশ নেপাল ও ভূটান রাজ্যের অন্তর্গত। হিমালয়ের উচ্চ শিখরদেশের প্রায় এক-সপ্তমাংশ অঞ্চল চিরতুষারাবৃত। কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত প্রায় ৪০,০০০ বর্গ কি. মি. এলাকা তুষারাবৃত। একমাত্র মেরু অঞ্চল ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও এত তুষার দেখা যায় না। উত্তর ভারতের বিখ্যাত নদ-নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র,

সিন্ধু, শতদ্রু, তিস্তা, কোশী প্রভৃতি এই তুষার-গলাজলেই পুষ্ট বলিয়া সারা বৎসর প্রচুর জল বহন করিয়া থাকে।

চিত্র ২.৩ : উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চল।

হিমালয় চারটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত। উত্তর হইতে দক্ষিণে এই পর্বতশ্রেণীগুলি যথাক্রমে (১) টেথিস হিমালয় (The Tethis Himalayas), (২) হিমগিরি বা উচ্চ হিমালয় (The Greater Himalayas), (৩) হিমাচল বা অন্তর্হিমালয় (The Lesser Himalayas) ও (৪) বহির্হিমালয় বা অবহিমালয় বা শিবালিক (The Outer Himalayas or the Foot Hills or the Shivaliks)।

ভারতের পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিকে এই চারিটি পর্বতশ্রেণী নিরবচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। একমাত্র হিমগিরি ও শিবালিক পর্বতশ্রেণীই ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বরাবর প্রসারিত। হিমালয়ের বিরাটত্ব ও পূর্ব-পশ্চিমে ইহার উচ্চতা, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির বিচ্ছিন্নতার জন্য ইহাকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায় : (১) পূর্ব হিমালয় (The Eastern Himalayas), (২) মধ্য হিমালয় (The Central Himalayas) ও (৩) পশ্চিম হিমালয় (The Western Himalayas)। মধ্য হিমালয় অঞ্চল নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং উহার আলোচনা ভারতের ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত নহে।

পূর্ব হিমালয় (The Eastearn Himalayas) : নেপালের পূর্ব সীমান্ত সিঙ্গালিলা পর্বতশ্রেণী হইতে পূর্বে আসামের **নামচা বারওয়া** (৭,৭৫৭ মি.) পর্বত ও লোহিত নদ পর্যন্ত পূর্ব হিমালয় বিস্তৃত। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলের উত্তর

দিকের উচ্চতম অংশ হিমালয়ের মূল পর্বত শিরা হিমগিরির অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণাংশ শিবালিক শ্রেণীর নাতি-উচ্চ পর্বত লইয়া গঠিত। ইহার নিম্নতর অংশের নাম **তরাই অঞ্চল** (Terai)। ইহা হিমালয়ের প্রবেশদ্বার। পশ্চিমবঙ্গে এই অংশকে ডুয়ার্স বলে। অঞ্চলটির দক্ষিণ ঢাল উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সমভূমির দিকে প্রসারিত। সমগ্র হিমালয় অঞ্চলকে সিকিম হিমালয়, দার্জিলিং হিমালয়, ভূটান হিমালয় এবং অরুণাচল (আসাম) হিমালয় নামে বিভিন্ন আঞ্চলিক বিভাগে ভাগ করা যায়।

এ-অঞ্চলে সমান্তরাল দুইটি পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান—একটি **হিমগিরি** বা উচ্চ হিমালয় এবং অপরটি **শিবালিক শ্রেণীর** অন্তর্গত। কাঞ্চনজঙ্ঘা (৮,৫৯৮ মি.) এই অঞ্চলের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ এই অঞ্চলের পূর্ব প্রান্তের শৈলশিরায় বাধা পাইয়া প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় (বার্ষিক ৩০০ সে. মি. অধিক)। ইহার পর এই বায়ু ক্রমশ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং ক্রমহ্রাসমান হারে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই অঞ্চলের উচ্চতর অংশে তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ, হিমবাহ ও উপত্যকার সবুজ বনভূমি প্রধান দ্রষ্টব্য। সমভূমি অঞ্চলের বহু নদনদী এই সকল হিমবাহ হইতে সৃষ্ট হইয়া পাহাড় কাটিয়া সমভূমিকে সুজলা-সুফলা করিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র এই অঞ্চলের প্রধান নদ এবং তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, মানস, মেচী, রঙ্গিত, ডিহং, সুবর্ণশিরি অন্যান্য নদ-নদী। এই অঞ্চলের জলবায়ু অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে ও অস্বাস্থ্যকর। সমভূমির অভাবে এই সকল স্থানে সাধারণ চাষ-আবাদ বা কৃষিকার্য পরিচালনা সম্ভব হয় না।

উচ্চতানুযায়ী পর্বতগাত্রে নানা জাতীয় উদ্ভিজ্জ জন্মে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পর্বতগাত্রে প্রায় ১,০০০ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় উষ্ণ মণ্ডলের চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। এই বনভূমি খুবই গভীর। ইহা মূল্যবান কাষ্ঠ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। পূর্ব হিমালয়ের এই বনভূমিতে বাঁশ, বেত, শাল, সেগুন প্রভৃতি প্রচুর জন্মে। কাষ্ঠ, মধু, মোম, হরতিকী, ধূনা প্রভৃতি প্রধান বনজ সম্পদ। উচ্চতর অংশে পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দৃষ্ট হয়। ওক, ম্যাপল, পাইন, ফার, বার্চ, সিডার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে বহু ঔষধি গুল্মও পাওয়া যায়। পূর্ব-হিমালয় অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল দীর্ঘ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক বলিয়া তরাই অঞ্চলে পর্বতের ঢালে প্রচুর চা বাগিচা দেখিতে পাওয়া যায়। চা এই অঞ্চলের প্রধান বাগিচা ফসল। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ চা উৎপাদনে পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। পর্বতের ঢালে ধাপ কাটিয়া চা বাগিচা তৈয়ারী করা হয়। ইহা ব্যতীত এই সকল অঞ্চলের মৃত্তিকা মোটামুটি উর্বর বলিয়া ধান, ভুট্টা, কমলালেবু, আনারস প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। পূর্ব প্রান্তে আসামের তরাই অঞ্চলে রেশমকীটের জন্য তুঁতগাছের চাষ করা হয়। এই অঞ্চলে প্রচুর খাঁটি রেশম (Pure silk), মুগা ও এণ্ডি প্রস্তুত করা হয়। মেঘালয় অঞ্চলের খাসিয়া পাহাড়ের ক্যাকটাস বিখ্যাত। এখানে প্রায় ২৫০ প্রকারের ক্যাকটাস দেখিতে পাওয়া যায়। যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত বলিয়া বনজ

সম্পদ আহরণ খুবই দুঃসাধ্য। শিবালিক পর্বতশ্রেণী খনিজ সম্পদের আকর। পূর্ব প্রান্তে খনিজ তেল, চুনা পাথর, বক্সাইট, কয়লা, ইত্যাদি নানা খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আসামের খনিজ তেল, কয়লা ও পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং অঞ্চলের লিগনাইট কয়লা উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের বনভূমিতে গণ্ডার, হাতী, বাঘ ও নানা হিংস্র প্রাণী এবং বিষধর সাপ দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের উত্তরাংশ, অরুণাচল ও সিকিম পূর্ব হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের আবহাওয়া খুবই অস্বাস্থ্যকর এবং যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। এই অঞ্চলে ডাফলা, মিশমি, মিরি, মনপা, আবর প্রভৃতি উপজাতি ও নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা, বাঙ্গালী বাস করে। উত্তরে তিব্বতের রাজধানী **লাসার** সহিত যোগাযোগকারী সড়ক **জেলেপ-লা** ও **নাথু-লা** গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়া গিয়াছে। পূর্ব প্রান্তে **টুজু, অ্যান, টৌনগুপ** প্রভৃতি কয়েকটি গিরিপথের মাধ্যমে ব্রহ্মদেশে যাওয়া যায়। এই সকল অঞ্চলে যন্ত্রশিল্পের প্রসারও উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটে নাই। রেলপথ বা পাকা সড়কপথের বিস্তার খুবই সীমিত। এই সকল কারণে এই অঞ্চলের জনবসতি খুবই কম। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ১৬ জন। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের আবহাওয়া খুবই মনোরম। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গের **দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং** প্রভৃতি স্থানে স্বাস্থ্য নিবাস গড়িয়া উঠিয়াছে। সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক, ভূটানের রাজধানী পুনাখা ও মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল সুন্দর শহর। অরুণাচলের রাজধানী ইটানগর। বোমডিলা সামরিক দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শহর।

আশা করা যায় এই অঞ্চলের বনজ সম্পদ ও খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য অদূর ভবিষ্যতে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইবে এবং ইহার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচিত হইবে।

[**প্রশ্ন :** (১) ভূ-প্রকৃতির দিক হইতে ভারতকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং উহারা কি কি? (২) একটি রেখাচিত্রে হিমালয়ের বিভিন্ন পর্বতশ্রেণী দেখাও। অবস্থান উল্লেখ করিয়া উহাদের নাম লিখ। ইহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ পর্বতশ্রেণী ভারতের উত্তর সীমা বরাবর পশ্চিম হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত? (৩) কোন্ অঞ্চলকে পূর্ব-হিমালয় বলা হয়? এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও সম্পদের বিবরণ দাও। (৪) পূর্ব-হিমালয়ে জনবিরলতার কারণ কি? (৫) এই অঞ্চলের কোন্ কোন্ গিরিপথ দিয়া লাসা যাওয়া যায়? কোন্ কোন্ গিরিপথ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করা যায়?

পশ্চিম হিমালয় (The Western Himalayas): উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম সীমায় গঙ্গা নদীর উৎস হইতে পশ্চিমে কাশ্মীরের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত পশ্চিম

হিমালয় অঞ্চল অবস্থিত। এই অঞ্চলে হিমালয়ের চারিটি পর্বত শ্রেণী অবস্থিত। টেথিস হিমালয়ের **কারাকোরাম, লাডাক, জাস্কর, হিমগিরি,** অন্তঃহিমালয়ের **পীরপাঞ্জাল, ধওলাধব, নাগটিব্বা, মুসৌরী পর্বত** ও বহিঃহিমালয়ের শিবালিক এই অঞ্চলে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সমান্তরালভাবে প্রসারিত। ইহা ক্রমশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঢালু হইয়া **সিন্ধু-শতদ্রু** অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে পর্বতবেষ্টিত উপত্যকার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কাশ্মীর, দুন ও মারে উপত্যকা বিখ্যাত। হিমগিরির গড় উচ্চতা ৭,০০০ মিটারের বেশি এবং হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গগুলির অধিকাংশই এই অঞ্চলেই অবস্থিত। এই অঞ্চলে সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ **গডউইন অষ্টেন** বা K_2 কারাকোরাম পর্বতের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য উচ্চ পর্বত-শৃঙ্গের মধ্যে **নাঙ্গা পর্বত, নন্দা দেবী, কেদারনাথ, কামেত** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শিবালিক শ্রেণীর গড় উচ্চতা প্রায় ১,০০০ মিটার।

পশ্চিম হিমালয়ের জলবায়ু পূর্ব হিমালয় অপেক্ষা শুষ্ক ও শীতলতর। পূর্বাংশের ন্যায় ইহাও মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। বৃষ্টিপাত পূর্ব হইতে পশ্চিমে ক্রমাগত হ্রাস পাইয়া থাকে। কাশ্মীরের উত্তর-পূর্বে লাডাক মালভূমিতে শীত অতিশয় তীব্র। শীতকালে অন্যান্য অঞ্চলে বরফ পড়ে। কিন্তু গ্রীষ্ম বেশ মনোরম। উপত্যকা অঞ্চলে বরফ গলিয়া গেলে নরম তৃণ জন্মে। এই কারণে মধ্যম উচ্চতাযুক্ত অঞ্চলে মেষ ও অন্যান্য পশুচারণভূমি দেখা যায়। জলবায়ুর বিশিষ্টতা হেতু **শ্রীনগর, মুসৌরী, রাণীক্ষেত, সিমলা, ডালহৌসী, দেরাদুন** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এই সকল শহরে লোকবসতিও যথেষ্ট।

অবহিমালয় অঞ্চলে মৌসুমী অরণ্যে শাল, সেগুন, অর্জুন, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য দেখা যায়। উচ্চতর অংশে পর্ণমোচী ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের মিশ্র অরণ্য বর্তমান। এই অঞ্চলের পর্বতগাত্রে ও উপত্যকায় সর্বত্র পাইন, ফার, চীরপাইন, দেবদারু, জুনিপার প্রভৃতি সরলবর্গীয় বৃক্ষের বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়। রডোডেনড্রনও এই অঞ্চলের একটি স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ। বনজ সম্পদে এই অঞ্চল সমৃদ্ধ হইলেও পূর্ব হিমালয়ের মত যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ার ফলে পর্বতের উচ্চতর অংশের কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজসম্পদ আহরণ করা খুবই কষ্টকর।

শিবালিকের নিম্নঢালে ও উপত্যকা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের অভাবে সেচের সাহায্যে প্রচুর ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, আলু, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। দেরাদুনের বাসমতী চাউলের কদর প্রায় বিশ্বের সর্বত্র। পর্বতের ঢালে বাগিচা ফসল এই অঞ্চলের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য। কুলু ও কাংড়া উপত্যকায় চা, সিমলা ও কাশ্মীর অঞ্চলে আপেল, ন্যাসপাতি, পীচ ও চেরী ফল, সরবতী লেবু প্রভৃতির ব্যাপক চাষ হইয়া

থাকে। পর্বতগাত্রে তৃণ ও গুল্ম ভূমিতে মেষ ও দীর্ঘ লোমবিশিষ্ট ছাগ প্রতিপালিত হয়। এই কারণে এই অঞ্চলে পশম শিল্পের প্রসার দেখা যায়।

জ্বালামুখী অঞ্চলে খনিজ তৈল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। জম্মু-কাশ্মীরে কয়লা, লৌহ আকরিক ও বক্সাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। লাডাকে প্রচুর সোহাগা ও গন্ধক আছে।

এই অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত। ৮৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলের উত্তর-দক্ষিণে চলাচলের উপযোগী গিরিদ্বার মাত্র চারিটি—জোজিলা, শিপাকলা, নিটি ও লিপুলেক। শিপকিলা, নিটি ও লিপুলেক গিরিদ্বারের মধ্য দিয়া ভারতের সহিত তিব্বতের যোগ স্থাপিত হইয়াছে। শীতকালে এই গিরিদ্বারগুলি বরফাচ্ছাদিত থাকে। কাশ্মীর উপত্যকার সহিত সমভূমির সংযোগকারী বানিহাল গিরিদ্বারটি শীতকালে বরফে ঢাকা পড়ে বলিয়া এই গিরিদ্বারের দুই মুখে সুড়ঙ্গ কাটিয়া 'জওহর টানেল' নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া সারা বৎসর চলাচলের উপযোগী রাস্তাও তৈয়ারী করা হইয়াছে।

এই অঞ্চলে জনবসতি পূর্বাঞ্চলের তুলনায় অধিক—প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৫৭ জন লোক বাস করে। ইহার কারণ এই যে এখানে হরিদ্বার, হৃষিকেশ, লছমনঝোলা গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, জ্বালামুখী প্রভৃতি হিন্দু তীর্থস্থান এবং দেরাদুন, রাণীক্ষেত, সিমলা, মুসৌরী ইত্যাদি স্বাস্থ্যকর স্থান গড়িয়া উঠিয়াছে। কাশ্মীর ও ইহার নিকটবর্তী গুলমার্গ ও সোনমার্গ ভ্রমণকারীদের নিকট নয়নাভিরাম দ্রষ্টব্য স্থান। পূর্বাঞ্চলের তুলনায় অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহা অনেকটা অগ্রসর। প্রায় প্রতিটি তীর্থকেন্দ্রেই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিতেছে। কিন্তু ইন্ধন শক্তির অভাবে এই অঞ্চলে কোন ব্যাপক যন্ত্রশিল্প গড়িয়া ওঠে নাই। বর্তমানে জলবিদ্যুতের সাহায্যে কিছু কিছু যন্ত্রশিল্প স্থাপনের কার্য শুরু করা হইয়াছে।

[**প্রশ্ন** : (১) হিমালয়ের কোন্ অংশকে 'পশ্চিম হিমালয়' বলা হয়? (২) পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলের পর্বত ও গিরিশৃঙ্গগুলির নাম উল্লেখ কর। (৩) এই অঞ্চলের বনজ সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। (৪) এখানকার কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের বর্ণনা দাও। (৫) এখানে পশমশিল্প উন্নত কেন? (৬) পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প গড়িয়া না উঠিবার কারণ কি? পূর্ব হিমালয়ের তুলনায় এখানে জনসতি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি অধিক হইবার কারণ কি?]

(খ) মধ্যবর্তী বৃহৎ সমভূমি (The Great Central Plains)

ভারতের উত্তরাংশের পার্বত্য ভূমির পাদদেশ হইতে দক্ষিণে মধ্য ভারতের বিন্ধ্য পর্বত ও ছোটনাগপুরের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল সমভূমি পশ্চিমে পাকিস্তান

সীমান্ত হইতে উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা পর্যন্ত ইহা প্রসারিত। পূর্ব-পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য ২,৪০০ কিলোমিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ইহার বিস্তার ২৪০ হইতে ৩২০ কি. মি.। ইহার মোট আয়তন প্রায় ৮ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার বা ভারতের মোট আয়তনের প্রায় ১/৪ ভাগ। এই সমভূমির পশ্চিম দিকে আরাবল্লী পর্বত বরাবর দিল্লীর শৈলশিরা (Delhi Ridge) সিন্ধু-শতদ্রু সমভূমি ও গাঙ্গেয় সমভূমির মধ্যে একটি জলবিভাজিকা বিশেষ। ইহার পশ্চিম প্রান্তে রাজস্থানের বিস্তীর্ণ মরু অঞ্চল। পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্রের ধারা আসিয়া বাংলাদেশে পদ্মা নামে পরিচিত গঙ্গার ধারার সহিত মিলিত হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিম হইতে পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই ভূভাগ প্রধানত সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও ইহাদের উপনদীসমূহের দান। ইহাদের আনীত পলি দ্বারাই এই সমভূমি গঠিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমভূমিও বলা হয়। ইহা পৃথিবীর পলিময় সমভূমিগুলির অন্যতম। পলির গভীরতা প্রায় ৪০০ মিটার। কিন্তু ইহার অধিকাংশ স্থানই সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৫০ মিটারের বেশি উচ্চ নহে। এই সমভূমির পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিভিন্ন অংশে জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও উৎপন্ন দ্রব্যের তারতম্যের জন্য ইহাকে চারিভাগে ভাগ করা যায় :

(১) **পাঞ্জাবের সমভূমি** (The Punjab Plain), (২) **গাঙ্গেয় সমভূমি** (The Gangetic Plain), (৩) **ব্রহ্মপুত্র সমভূমি** (The Brahmaputra Plain) ও (৪) **পশ্চিমে রাজস্থানের মরু অঞ্চল** (Western Desert Plains of Rajasthan)।

এই বিরাট সমভূমি অঞ্চল ভারতীয় মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত হইলেও পূর্ব হইতে পশ্চিমে জলবায়ুর বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। গ্রীষ্মকালীন উত্তাপ পূর্ব হইতে পশ্চিমে যেমন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, শীতকালীন উত্তাপ তেমনি হ্রাস পাইতে থাকে। আবার বৃষ্টিপাত পূর্ব হইতে পশ্চিমে ক্রমহ্রাসমান হারে ঘটিয়া থাকে। এই কারণে পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষাকৃত শুষ্ক ও চরমভাবাপন্ন। পূর্বাঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বার্ষিক গড় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথাক্রমে ২৭° সে. এবং ৩০০ সে. মি.। কিন্তু পশ্চিমদিকে পাঞ্জাব সমভূমিতে বার্ষিক গড় উত্তাপ ৩১° সে. ও বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪৪ সে. মি. মাত্র। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এইপ্রকার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে ধান, পাট, চা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলে ধানের পরিবর্তে গমের ও পাটের পরিবর্তে ইক্ষুর প্রাধান্য দেখা যায়। ডাল, তৈলবীজ, তুলা ও তামাকের চাষ মধ্যগঙ্গা সমভূমি অপেক্ষা উর্ধ্বগঙ্গা ও পাঞ্জাব সমভূমিতে অধিক পরিলক্ষিত হয়। পূর্বাঞ্চলের বনভূমি গভীর ও ব্যাপক। এই অঞ্চলে শাখা-প্রশাখা সমন্বিত উচ্চ বৃক্ষের প্রাধান্য। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে হাল্কা বনভূমি ও মধ্যে মধ্যে তৃণভূমি দেখা যায়। পশুপালন

ও দুগ্ধশিল্প এই অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি বিশেষ উপজীবিকা। এই সকল কারণে ভারতের এই বিশাল সমভূমিকে গঠন-বৈচিত্র্যে ক্রমপরিবর্তনশীল (Transitional in character) বলা হয়।

(১) **পাঞ্জাবের সমভূমি** (The Punjab Plain): উত্তর ভারতের যমুনা নদীর পশ্চিম তীর হইতে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ লইয়া এই সমভূমি গঠিত। উত্তরে ইহা শিবালিকের দক্ষিণ ঢাল পর্যন্ত প্রসারিত। কেন্দ্রশাসিত দিল্লী এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানা ইহার অন্তর্ভুক্ত। আয়তনে ইহা ৯৫,৭১৪ বর্গ কিলোমিটার। সিন্ধু নদের প্রধান চারিটি উপনদী—শতদ্রু, ইরাবতী, বিপাশা ও চন্দ্রভাগার পলি দ্বারা গঠিত এই সমভূমি, ভারতের মধ্যবর্তী বৃহৎ সমভূমির অংশবিশেষ। ভারতের মধ্যবর্তী বৃহৎ সমভূমি অঞ্চলের ইহাই সর্বোচ্চ অংশ। মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত হইলেও ভারতের পূর্বাঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলের জলবায়ু শুষ্ক ও চরমভাবাপন্ন। এই অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ২৩° হইতে২৫° সে. (সর্বোচ্চ উত্তাপ—৩৪·৫° সে.—নতুন দিল্লী) এবং শীতকালীন গড় উত্তাপ ১১·৮° হইতে ১৪° সে. (সর্ব নিম্ন উত্তাপ—৩·৯০° সে. —হিসার) বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নহে। উত্তরাংশের তুলনায় দক্ষিণাংশ শুষ্ক। উত্তরাঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০ হইতে ৭৫ সে. মি. কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে মাত্র ৩০ সে মি.। মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয়। শীতকাল প্রায় শুষ্ক।

বৃষ্টিপাতের স্বল্পতাহেতু স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও বনভূমির প্রসার খুবই কম। একমাত্র উত্তরে শিবালিকের ঢালু অংশেই মোট বনাঞ্চলের প্রায় শতকরা ৬৮ ভাগ দেখা যায়। গুল্ম ও কাঁটা জাতীয় গাছই বেশি। পর্বতের ঢালে কিছু দেবদারু গাছও জন্মে। ইহা ছাড়া মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের মধ্যে স্থানীয় জাল, জুন্দ, কোপার, শিষম, ঢক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমভূমি ও পর্বতের ঢালে তৃণভূমিতে মেষ প্রতিপালিত হয়। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা খুবই উর্বর। জলের অভাবে অতীতে এই অঞ্চলে কৃষি জীবিকাসত্তাভিত্তিক ছিল। কিন্তু উচ্চ বারিদোয়াব খাল, শিরহিন্দ খাল প্রভৃতির সাহায্যে ও বর্তমানে ভাকরা-নাঙ্গাল বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার দরুন এই অঞ্চলে ব্যাপক সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে কৃষির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছে। ধান, গম, জোয়ার, যব, ভুট্টা, তুলা, তৈলবীজ, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং এই অঞ্চল হইতে ভারতের অন্যান্য ঘাটতি অঞ্চলে গম ও চাল সরবরাহ করা হয়। ভারতের কৃষিবিপ্লবের (সবুজ বিপ্লব—'Green Revolution') ইহা অন্যতম পীঠস্থান। কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ-আকরিক প্রভৃতি এই অঞ্চলে না থাকায় ভারী শিল্পে ইহা অনুন্নত। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে চুনাপাথর (আম্বালা ও মহেন্দ্রনগর) ও স্লেট (গুরগাঁও ও মহেন্দ্রনগর) প্রধান। সামান্য পরিমাণে লৌহ-আকরিক আরাবল্লী সন্নিহিত ধানকোলি ও নরনউল

অঞ্চলে সঞ্চিত আছে। এই অঞ্চলের রেশম, পশম, কার্পাস ও চর্মশিল্প বেশ উন্নত। শতদ্রু নদীর উপর নাঙ্গাল বাঁধ হইতে সুলভে জলবিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে এখানে হাল্কা যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈয়ারের প্রচুর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার লক্ষণীয়। অমৃতসর, লুধিয়ানা, জলন্ধর, রূপার, গুরুদাসপুর, ফিরোজপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

[**প্রশ্ন :** (১) পাঞ্জাব সমভূমির একটি ভৌগোলিক বিবরণ লিখ। (২) ভারতের একটি রেখাচিত্রে মধ্যবর্তী সমভূমির বিভাগগুলি দেখাও।]

২) **গাঙ্গেয় সমভূমি** (The Gangetic Plain) : উত্তর প্রদেশের উত্তরাখণ্ড ও নেপাল-হিমালয়ের পাদদেশ হইতে গঙ্গা-সমভূমি দক্ষিণে ভারতের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে যমুনা নদী হইতে দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত এই সমভূমি দেখিতে অনেকটা ধনুকের আকারে বাঁকানো। পূর্ব-পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭০০ কি.মি.। উত্তর-দক্ষিণে ইহার বিস্তার সর্বত্র সমান নহে। গড়ে ইহা প্রায় ৩০০ কি.মি.। প্রায় ৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই সমভূমির ঢাল উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নামিয়াছে।

ইহা পলিগঠিত এক অখণ্ড সমভূমি। পশ্চিম প্রান্তে যমুনা নদী হইতে পূর্বপ্রান্তে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ভূমির ঢাল মাত্র ২০০ মিটার বা প্রতি ৮ কিলোমিটারে ১ মিটার মাত্র এবং ভূ-বৈচিত্র্য তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

এই বিরাট সমভূমি অঞ্চলের সর্বত্র জলবায়ু একপ্রকার নহে। পূর্বপ্রান্তের তুলনায় পশ্চিমপ্রান্তে অধিক উষ্ণতা ও স্বল্প বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যায়। ফলে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও উৎপাদিত কৃষিপণ্যের যেমন পার্থক্য দেখা যায় তেমনি অন্যান্য অর্থ নৈতিক কার্যাবলী ও জনবসতির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নগঙ্গা-সমভূমিতে ধান ও পাট প্রধান ফসল কিন্তু মধ্য ও ঊর্ধ্ব গঙ্গা অঞ্চলে গম, ইক্ষু ও তুলা প্রধান কৃষিজ পণ্য। নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমিতে কৃষির সহিত ব্যাপক ভারী শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে এবং ঐ অঞ্চলের অর্থনীতিতে কৃষির তুলনায় শিল্পের প্রসার খুবই কম। ফলে কৃষি অর্থনীতিই ঐ সকল অঞ্চলের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য।

এই সকল কারণে এই বিরাট সমভূমিকে ঊর্ধ্বগঙ্গা, মধ্যগঙ্গা ও নিম্নগঙ্গা সমভূমি,—এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। এই বৃহৎ সমভূমি ভারতীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। ইহার পূর্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে যত অগ্রসর হওয়া যায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ততই কমিতে থাকে এবং উত্তাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বৃষ্টিপাত প্রধানত বর্ষাকালেই হইয়া থাকে। শীতকাল শুষ্ক ও প্রায়ই বৃষ্টিহীন। নিম্নগঙ্গা সমভূমিতে অবস্থিত কলিকাতায়

বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যখন ১৫৮ সে. মি. মধ্য গঙ্গা সমভূমিতে অবস্থিত বারাণসীতে ও উর্ধ্বগঙ্গা সমভূমিতে অবস্থিত এলাহাবাদে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথাক্রমে ১০৫ সে. মি. ও ৭১ সে. মি.। ইহার পশ্চিমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও কম।

উর্ধ্বগঙ্গা সমভূমিতে গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ যখন ৩০° সে. হইতে ৪০° সে., মধ্য ও নিম্ন গঙ্গা সমভূমিতে তখন গড় উত্তাপ যথাক্রমে ৩০° হইতে ৩৩° সে. ও ২৫° হইতে ৩১° সে.। শীতকালীন গড় উত্তাপের ক্ষেত্রে আবার ইহার বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যেমন উর্ধ্বগঙ্গা সমভূমিতে শীতকালীন গড় উত্তাপ যখন ১৪° সে.—১৬° সে. এবং মধ্য ও নিম্ন গঙ্গা সমভূমিতে তখন উহা যথাক্রমে ১৬·৫° সে.—১৭·৯° সে. ও ১৭°সে.—২১°সে.। উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য এই বিরাট সমভূমি অঞ্চলের পূর্বপ্রান্তে নিবিড় বনভূমির সৃষ্টি হইলেও পশ্চিমপ্রান্তে ইহা ধীরে ধীরে তৃণভূমির সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

গঙ্গা-সমভূমি ভারতের শ্রেষ্ঠ কৃষি অঞ্চল। ইহাকে ভারতের **শস্যাগার** (Granary of India) বলা হয়। এই সমভূমি গঠনে যেমন হিমালয় হইতে উদ্ভূত গঙ্গা ও ইহার উপনদীসমূহের দান অসামান্য তেমনি ইহার কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধির পশ্চাতে ঐ সকল নদীবাহিত পলি ও জলধারার দানই প্রধান। গঙ্গার প্রধান উপনদী যমুনা। ইহা গঙ্গার দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া এলাহাবাদে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অন্যান্য নদীর মধ্যে শোন নদী উল্লেখযোগ্য। গঙ্গার বামতীরে অসংখ্য নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া সরাসরি গঙ্গার সহিত অথবা গঙ্গার কোন না কোন উপনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই বরফ-গলা জলে পুষ্ট। ফলে গঙ্গার স্বাভাবিক জলধারা ইহাদের মিলিত জলধারায় সারাবৎসরই পুষ্ট থাকে। এই উপনদীগুলির মধ্যে রামগঙ্গা, ঘাগরা (সরযূ), রাপ্তী, গণ্ডক, কোশী, মহানন্দা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গঙ্গা ও ইহার উপনদীসমূহের মধ্যবর্তী ভূভাগকে দোয়াব বলা হয়। এই প্রকার দোয়াব এক একটি বিশিষ্ট কৃষি অঞ্চল, যেমন গঙ্গা-যমুনা দোয়াব, গঙ্গা-ঘাগরা দোয়াব ইত্যাদি। এই সকল অঞ্চলের মৃত্তিকা নতুন ও পুরাতন পলল দ্বারা গঠিত, হাল্কা ও উর্বর। সমগ্র ভারতের চাষের জমির প্রায় শতকরা ৬৭ ভাগ চাষের জমি একমাত্র গঙ্গা-সমভূমিতেই দেখা যায়। সমগ্র চাষের জমির তুলনায় ধান-জমির প্রায় শতকরা ৪৩ ভাগ ও গম-জমির প্রায় ২৮ ভাগ এই গঙ্গা-সমভূমিতেই অবস্থিত। ধান, গম ব্যতীত এই অঞ্চলে ভূট্টা, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু, পাট, শন, তৈলবীজ, ডাল, তামাক, তুলা, চীনাবাদাম ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। নিম্ন গঙ্গা-সমভূমি অঞ্চলের চাষের জমি, ধান-জমি ও গম-জমির পরিমাণ সম্পর্কে একটি সাম্প্রতিক বিবরণী দেওয়া হইল :

ভূ-ভাগ	চাষের জমি (ব. কি. মি.)	সমগ্র অঞ্চলের শতকরা	ধান-জমি (ব. কি. মি.)	সমগ্র কর্ষিত জমির শতকরা	গম-জমি	সমগ্র কর্ষিত জমির শতকরা
সমগ্র গঙ্গা-						
সমভূমি	২২৯,৭১৭	৪৭	৯৮,৫২৩	৪৩	৬২,২২৮	২৮
ঊর্ধ্ব	১০৫,৯৭৮	৬৮	২২,৪৪৬	২১	৩২,৫০৩	৩৭
মধ্য	১০৬,৩৯৪	৬৮	৬২,২০১	৫৮	২০,৮৮৭	২০
নিম্ন	৫৬,৬৬০	৭০	১৩,৮৭৬	৮০	১,৮৩৮	১৬

গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলে শীতকাল শুষ্ক ও মৌসুমী বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত বলিয়া গঙ্গা ও ইহার উপনদীসমূহ হইতে দীর্ঘ ও নাতিদীর্ঘ অসংখ্য সেচ-খাল কাটিয়া ব্যাপকভাবে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিকন্তু এই অঞ্চলে কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদি না থাকায় ঐ সকল নদীর উচ্চগতিতে বাঁধ দিয়া বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার মাধ্যমে জল-বিদ্যুৎও উৎপাদন করা হয়। ঊর্ধ্ব-মধ্য সমভূমি অঞ্চলে শিল্পায়নে ও শিল্পক্ষেত্র-গঠনে এই জলবিদ্যুতের অবদান অসামান্য। দিল্লী, কানপুর, আগ্রা, মীরাট, এলাহাবাদ, পাটনা, মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলের রেশম, পশম ও সূতীবস্ত্র, পাট, চর্ম, কাগজ ও দিয়াশলাই শিল্প, হাল্কা যন্ত্রশিল্প উল্লেখযোগ্য। গোরক্ষপুর, ফয়জাবাদ, সারণ, চম্পারন, মজঃফরপুর প্রভৃতি ভারতের বিখ্যাত চিনি শিল্পকেন্দ্র এই সমভূমিতেই অবস্থিত।

নিম্নগঙ্গা সমভূমি-সন্নিহিত মালভূমি অঞ্চলে প্রচুর কয়লা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানীজ, চুনাপাথর, অভ্র প্রভৃতি থাকায় এই অঞ্চলে কৃষির সহিত শিল্পেরও ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। লৌহ-ইস্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, পাট ও বস্ত্রশিল্প, রেল-ইঞ্জিন ও মোটরগাড়ি শিল্প, কাগজ ও রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি নানা ধরনের শিল্পে এই অঞ্চল বিশেষ উন্নত। পাট শিল্পের একদেশীভবন নিম্নগঙ্গা সমভূমিতেই সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়।

সংগঠিত বনভূমির মধ্যে নিম্নগঙ্গা সমভূমিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বনভূমি হইতে শাল, সেগুন, বাঁশ, হলুদ, সুন্দরী বা সুঁদরি প্রভৃতি নানা জাতীয় কাষ্ঠ আহরণ করা হয় এবং মধু, মোম, লাক্ষা ও নানা বন্যপ্রাণী সংগ্রহ করা হয়।

গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলের নদীগুলি মৎস্য আহরণ ও আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানকালে বেশির ভাগ নদীই পলি ও বালিতে ভরাট হইয়া ইহাদের নাব্যতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই কারণে প্রায় প্রতি বৎসর বর্ষাকালে অনেক স্থানেই বন্যা দেখা দেয়। রেলপথ, সড়কপথ বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সহজ সুন্দর যোগ-স্থাপন করায় আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের দিক হইতে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল

কারণে এই অঞ্চলে লোকবসতি খুবই ঘন এবং ভারতের প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক এই সমভূমিতে বসবাস করে।

[**প্রশ্ন** : (১) গঙ্গানদীর উদাহরণ উল্লেখ করিয়া মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর নদীর প্রভাব বর্ণনা কর। (২) ভৌগোলিক কারণ দর্শাইয়া ব্যাখ্যা কর—"কৃষিকার্যে, শিল্পে ও বাণিজ্যে গাঙ্গেয় সমভূমি ভারতের শ্রেষ্ঠতম অঞ্চল।" অথবা "গাঙ্গেয় সমভূমি ভারতের বৃহত্তম জনবহুল অঞ্চল।" (৩) একটি রেখাচিত্রে গাঙ্গেয় সমভূমির উচ্চ, মধ্য নিম্ন সমভূমি অঞ্চল দেখাও, দিল্লী, বারাণসী, পাটনা, এলাহাবাদ, কলিকাতা চিহ্নিত কর এবং প্রধান প্রধান নদীগুলি রেখার সাহায্যে নির্দেশ কর।]

(৩) **ব্রহ্মপুত্র-সমভূমি** (The Brahmaputra Plain) : উত্তরে পূর্ব হিমালয়ের সু-উচ্চ পর্বতশ্রেণী এবং দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া ও মিকির পর্বতমালা দ্বারা আবদ্ধ ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরের ভূ-ভাগ এই সমভূমির অন্তর্গত। ইহার আয়তন প্রায় ৫৬,২৭৪ বর্গ কিলোমিটার। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। ভারতের এই অঞ্চলেই বায়ুর আর্দ্রতা সর্বাধিক। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ২৭° সে. এবং শীতকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ১২° সে.। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২৫০ সে. মি.। এই সমগ্র অঞ্চলটি ব্রহ্মপুত্র নদের পলিমাটি দ্বারা গঠিত বলিয়া চাষ-আবাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ধান ও পাট এখানকার প্রধান ফসল। কিছু পরিমাণ তৈলবীজও উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া এই অঞ্চলে প্রচুর কমলালেবু উৎপন্ন হয়। এখানে খনিজ সম্পদের মধ্যে লিগনাইট কয়লা ও খনিজ তৈল প্রধান। নাজিরা ও মাকুম অঞ্চলে কয়লা, লখিমপুর জিলার ডিগবয়, ডিহং, ডিব্রুগড় অঞ্চলে খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়। নাহার-কাটিয়া হুগরিজান অঞ্চলেও প্রচুর খনিজ তৈল পাওয়া যায়। ভারতের অন্যতম তৈলখনি এই সমভূমির পূর্বাংশে অবস্থিত।

এই অঞ্চলে বনজ সম্পদের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের বিপুল সম্ভার ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার একটি বিশিষ্ট সম্পদ। শাল, গামারি, ধুপ, অগরু, আমারি, হলং, নাহার, মেকাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ধূপ ও অগরু গাছ হইতে যথাক্রমে ধুনা ও অগরু সুগন্ধী পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার মোট বনভূমির আয়তন প্রায় ১৭,৫০,০০০ হেক্টর। এই অঞ্চলের জলবায়ু অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা অনুন্নত। এই কারণে বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হইতেছে না। ব্রহ্মপুত্র নদের ভয়াবহ বন্যাও এই অঞ্চলের একটি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। জলবায়ুর কারণেই এই অঞ্চলের জনবসতিও কম। ডিগবয়, নাহার-কাটিয়া, গৌহাটি, পাণ্ডু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

[**প্রশ্ন** : (১) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণ দাও। (২) প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হইলেও এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সেইরূপ না হইবার কারণ কি ?]

(৪) **পশ্চিমে রাজস্থানের মরু অঞ্চল** (Western Desert Plains of Rajasthan) : ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমাংশ হইতে পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত সমভূমিই ভারতের বৃহৎ মরু অঞ্চল। এই মরু অঞ্চল বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত 'থর' মরু অঞ্চলের অন্তর্গত। আবার সমভূমি হিসাবে ইহা ভারতের মধ্যবর্তী বৃহৎ সমভূমিরও অন্তর্গত। জলবায়ুর কারণেই ইহাকে আলাদা-ভাবে আলোচনা করা হইল। ইহার আয়তন ১৯৬,১৪৭ বর্গ কিলোমিটার। আরাবল্লী সন্নিহিত ঢালু অঞ্চলে পাহাড় হইতে নির্গত কয়েকটি ছোট নদীর পলি দ্বারা গঠিত অঞ্চলকে **রোহি** এবং ইহার পশ্চিমে স্থানে স্থানে সবুজ গাছপালাশোভিত কৃষিক্ষেত্রকে **বাগর** বলে। ইহার পশ্চিমে বালি ও বালির পাহাড় চিহ্নিত **মরুস্থলী**।

এই অঞ্চলের জলবায়ু সম্পূর্ণরূপে চরমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ—৪২° সে. হইতে দেখা যায়। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫০° সে. মি.-এরও কম। কিন্তু আরাবল্লী এলাকায় কখনও কখনও হঠাৎ প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে।

মরু অঞ্চলের প্রধান নদী লুনী ও ইহার একমাত্র শাখানদী সুক্রী। আজমীরের কাছে উৎপন্ন হইয়া এই নদী কচ্ছের 'রান' অঞ্চলে পড়িয়াছে। আরও কয়েকটি নদী মরু অঞ্চলের নিম্ন এলাকায় বালির মধ্যে হঠাৎ থামিয়া যায়। সূর্যের উত্তাপে জল শুকাইয়া গেলে ঐ সকল নিম্ন জলভূমিতে লবণ জমিয়া থাকে। এইভাবেই সাম্ভর, দিদওয়ানা, পচ্চপদ্রার মত লবণ-হ্রদের সৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ কূপের জলও লবণাক্ত। মাটি অনুর্বর হইলেও সেচের সাহায্যে চাষ করা যায়। জলের অভাব সত্ত্বেও এককোটি হেক্টর জমির প্রায় শতকরা ৪৮ ভাগ জমি চাষ করা হয়। বাগর অঞ্চলে গম, জোয়ার, বাজরা, তুলা ইত্যাদির চাষ ভালই হয়। শতদ্রু নদী হইতে গাংখাল নামক খালের সাহায্যে জল আনিয়া এখানে চাষের ব্যাপক ব্যবস্থা করার ফলে তুলা, গম ও ইক্ষু, যব, ছোলা ইত্যাদির ফলন প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাকরা বাঁধ হইতে অপর একটি খাল বিকানীর পর্যন্ত কাটা হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইহাকে জয়সলমীরের উত্তর-পশ্চিমে রামগড় পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইবে। ইহা হইলে রাজস্থানের মরু অঞ্চলেও উদ্বৃত্ত ফসলের সমারোহ দেখা দিবে। পশুপালন অধিবাসীদের একটি সহযোগী উপজীবিকা। মরু-জাহাজ উটের ব্যবহার এখানে সর্বত্র। গাংখাল ও বিকানীর খালের জলধারা রাজস্থানের মরু অঞ্চলে নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়াছে। গঙ্গানগর জিলার সুরথ গড় কৃষি খামার ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বর্তমানে এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিকানীর অঞ্চলের কয়লা, ক্ষেত্রীও খারিবো অঞ্চলের তাম্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজস্থান অঞ্চলে অভ্রও পাওয়া গিয়াছে। মাকরানার মার্বেল পাথর বিখ্যাত। এই অঞ্চলে লোকবসতি কম। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ৪৭ জন। রোহি অঞ্চলে সর্বাধিক জনবসতি দেখা যায়, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮৮ জন। বাগর ও মরুস্থলী অঞ্চলে প্রতি বর্গ মিটারে যথাক্রমে ৫৮ ও ১৬ জন লোক বাস করে। শিল্পের প্রসার এখনও উল্লেখযোগ্য নহে। যোধপুর, বিকানীর, গঙ্গানগর, জয়পুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। আবু পাহাড় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপূর্ব। প্রচুর ভ্রমণকারী প্রতি বৎসর আবু পাহাড়, জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে আসেন।

[**প্রশ্ন** : (১) রাজস্থান মরু অঞ্চলের একটি ভৌগোলিক বিবরণ লিখ। (২) রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলের জনবসতির ঘনত্বের তারতম্যের কারণ নির্দেশ কর। (৩) ভারতের একটি রেখাচিত্র অংকন করিয়া উহাতে মরু অঞ্চল দেখাও।]

(গ) দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চল (The Southern Plateau)

এই মালভূমি অঞ্চল ভারতের মধ্যবর্তী বৃহৎ সমভূমি অঞ্চলের দক্ষিণ সীমান্তে বিন্ধ্য-কাইমুর-মাইকাল-রাজমহল পার্বত্যাঞ্চল হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত ক্রমশ সরু হইয়া বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার পূর্বদিকে পূর্বঘাট পর্বতমালা বা মহেন্দ্র পর্বত এবং পশ্চিম দিকে পশ্চিমঘাট বা সহ্যাদ্রি পর্বত অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে সহ্যাদ্রি পর্বত এবং উত্তর-পূর্ব দিক হইতে মহেন্দ্র পর্বত তামিলনাড়ু রাজ্যে নিলগিরি পর্বতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে আন্নামালাই, পালনি, এলামালাই বা কার্ডামম পাহাড় ও অগস্ত্যমালাই সম্মিলিত হইয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত প্রসারিত। তিন দিকে পর্বত দ্বারা আবদ্ধ এই ভূ-অঞ্চল একটি ত্রিভুজাকৃতি মালভূমি। ইহার গড় উচ্চতা প্রায় ৬০০ মিটার। কঠিন আগ্নেয় শিলা দ্বারা গঠিত এই মালভূমি পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু হইয়া নামিয়াছে। সহ্যাদ্রি পর্বত উত্তর-দক্ষিণে একটানা চলিয়াছে। ইহার মধ্যে **থলঘাট** ও **ভোরঘাট** গিরিদ্বার এবং **পালঘাট** ফাটলের মধ্য দিয়া পশ্চিমের উপকূল ভূমি অঞ্চলের সহিত দাক্ষিণাত্যের মূল ভূ-খণ্ডের যোগাযোগ স্থাপন সহজ হইয়াছে। সহ্যাদ্রি পর্বতের গড় উচ্চতা ৯১৫ মিটার—১,২২০ মিটার। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম **কলসুবাই** (১৪৬ মি.)। পূর্বঘাট পর্বতমালা (গড় উচ্চতা ৬০০ মিটার) উত্তর-দক্ষিণে সমভাবে প্রসারিত নহে। এই পর্বতমালাকে স্থানে স্থানে কাটিয়া দাক্ষিণাত্যের প্রধান নদী গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। গোদাবরী ব-দ্বীপের উত্তরে এই পর্বতের নাম মহেন্দ্রগিরি। আবার অন্ধ্র ও তামিলনাড়ু রাজ্যে

ইহার নাম পাইয়ান ঘাট। নীলগিরি পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম **ডোডাবেটা** (২,৬৩০ মিটার),। এই মালভূমির উচ্চতর অংশের প্রধান নদী নর্মদা ও তাপ্তী, মধ্যভাগের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম দিকে আরব সাগরে পড়িয়াছে। দক্ষিণাংশের নদী-গুলির মধ্যে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রধান। গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী সহ্যাদ্রি পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্য অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। আঞ্চলিক জলবহনে, ঐতিহাসিক গুরুত্বে ও বাণিজ্যিক পরিবহণে গঙ্গা নদীর পরেই গোদাবরী ভারতের উল্লেখযোগ্য নদী। দাক্ষিণাত্যের এই নদীগুলি মোটামুটি দীর্ঘ হইলেও বৃষ্টির জলে পুষ্ট বলিয়া খরার সময় যেমন জলাভাবে শুকাইয়া যায় তেমনি বর্ষার জলধারায় স্ফীত হইয়া ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে।

মালভূমিকে নিম্নলিখিত চারটি ভাগে ভাগ করা যায় :

(অ) মধ্যভারতের মালভূমি অঞ্চল—বিন্ধ্যপর্বত, মহাদেব, মাইকাল, সাতপুরা প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী ও ইহাদের সংলগ্ন উচ্চ ভূ-ভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(আ) উত্তর-পূর্ব মালভূমি অঞ্চল—মহানদী ও গোদাবরী উপত্যকা এবং ছোটনাগপুরের উচ্চ ভূ-ভাগ এই অঞ্চলের অংশ।

(ই) কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল—দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিম প্রান্তে গুজরাটের দক্ষিণভাগ মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশে অন্ধ্র ও কর্ণাটকের কিয়দংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(ঈ) দাক্ষিণাত্য অঞ্চল—কর্ণাটকের দক্ষিণাংশ অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর মধ্যবর্তী অংশ ইহার অঙ্গীভূত।

মালভূমি অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাতের তারতম্য দেখা যায়। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অনুবাত অংশে (Leeward) অবস্থিত দাক্ষিণাত্য অঞ্চল একটি বৃষ্টিচ্ছায় ক্ষেত্র (Rain Shadow Area)। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৭৫ সেন্টি-মিটার। মধ্য ভারতের মালভূমি অঞ্চলেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ সেন্টিমিটারের বেশি নহে। কিন্তু উত্তর-পূর্ব মালভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সর্বাধিক ১০০ সে. মি.—১৫০ সে. মি.। বৃষ্টিপাতের তারতম্য ও অনিশ্চয়তার জন্য এই মালভূমি অঞ্চলে কূপ, পুষ্করিণী ও নদী হইতে জলসেচ দ্বারা নানাপ্রকার কৃষিজ পণ্য উৎপাদিত হয়। উৎপন্ন কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান, গম, তুলা, ইক্ষু, জওয়ার, বাজরা, তৈলবীজ প্রধান। কোন কোন স্থানে পশুপালন করা হয়। কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল লাভা দ্বারা গঠিত এবং ইহা ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ তুলা উৎপাদক অঞ্চল। এই অঞ্চলের মধ্যভাগ হইতে দক্ষিণে প্রসারিত বিরাট পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য হইতে মূল্যবান কাষ্ঠ ও নানাজাতীয় বনজ সম্পদ আহরণ করা হয়। চন্দন কাষ্ঠ, রবার ও কাজু বাদাম দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের বিশিষ্ট সম্পদ। **কর্ণাটকের অন্তর্গত বনভূমিতে চন্দন গাছ হইতে চন্দন কাষ্ঠ ও চন্দন তৈল সংগ্রহ করা হয়।** বনভূমিতে বন্যপ্রাণী ও পাখীর বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়। গুজরাট অঞ্চলের গির

অরণ্যে সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের এই মালভূমি অঞ্চল খনিজ সম্পদে খুবই সমৃদ্ধ। কয়লা, লৌহ, তাম্র, বক্সাইট, চুণাপাথর, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, স্বর্ণ, ডোলোমাইট প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থের বেশির ভাগই এই অঞ্চলের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই সকল খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া টাটানগর, বোকারো প্রভৃতি স্থানে লৌহ-ইস্পাত, রাচী, মুরী প্রভৃতি স্থানে বৈদ্যুতিক শিল্প, অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, ভূপাল, নাগপুর, ব্যাঙ্গালোরে বয়ন শিল্প, ভারী যন্ত্র নির্মাণ-শিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে কয়লার অভাব জলবিদ্যুতের সাহায্যে পূরণ করা হয়। কোলারের স্বর্ণখনি, আমেদাবাদ, বোম্বাই অঞ্চলের বয়ন শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, মোটর গাড়ি-শিল্প, খনিজ তৈল-শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক দিক হইতে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে এই মালভূমি অঞ্চলের মধ্যভাগ বিশেষ করিয়া উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ আদৌ উন্নত ছিল না। শিল্পকারখানাও ছিল না বলিলেই হয়। অদূর ভবিষ্যতে ইহার আরও উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই অঞ্চলের জনবসতি মধ্যম প্রকার। পূর্বে এই সকল অঞ্চল হইতে প্রচুর লোক জীবিকার সংস্থানে মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে ভিড় করিত। বর্তমানে নানা দিক হইতে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটায় জনবসতির মধ্যে স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়।

[**প্রশ্ন :** (১) দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চলের একটি সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ লিখ। (২) দক্ষিণের মালভূমির ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ কি কি? (৩) দক্ষিণের মালভূমি অঞ্চলের খনিজ ও বনজ সম্পদ বর্ণনা কর। (৪) দক্ষিণের মালভূমির নদীগুলি পূর্ববাহিনী কেন?]

(ঘ) পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমভূমি (The Coastal Plains of the East and the West :

মালভূমির পূর্ব প্রান্তে ও পশ্চিম প্রান্তে যথাক্রমে বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর সংলগ্ন যে সংকীর্ণ সমতল ভূমি বিদ্যমান উহাকেই উপকূলবর্তী সমভূমি বলা হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলভাগ গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও কেরালা এই চারিটি রাজ্যের পশ্চিমাংশ এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল—গোয়া, দমন, দিউ এবং দাদরা, নগর-হাভেলী লইয়া গঠিত। শিল্প-বাণিজ্যের দিক হইতে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই উপকূলভূমি মুখ্যত নর্মদা তীরে ভারুচ বন্দর হইতে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইলেও গুজরাটের উপকূল ভূমিও ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই উপকূলভাগ প্রায় ১৬০০ কি. মি. দীর্ঘ। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে আরবসাগর পর্যন্ত ইহার গড় বিস্তার প্রায় ৪৫ কি.মি.—৬৪ কি. মি.।

পশ্চিম উপকূলের উত্তরাংশ নর্মদার মোহনা হইতে গোয়া পর্যন্ত **কঙ্কণ উপকূল,** গোয়া হইতে কর্ণাটক পর্যন্ত **কর্ণাটক উপকূল** এবং কেরালার উপকূলভাগ **মালাবার**

উপকূল নামে পরিচিত। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সহ্যাদ্রি পর্বতে বাধা পায় ও এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ২৫০ সে. মি. হইতে ৩০০ সে. মি। বৃষ্টিপাত প্রধানত জুন হইতে সেপ্টেম্বর এই চারি মাসে ঘটিয়া থাকে। মালাবার উপকূলে এপ্রিল মাসেও প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। গুজরাটের উপকূল-ভাগ অপেক্ষাকৃত শুষ্ক এবং ভূমিভাগ প্রায়শ অনুর্বর। মালাবার উপকূলে কোচিনের

চিত্র ২.৪ : ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল।

উপহ্রদ অঞ্চলে প্রায় ২০০০ কি. মি. আভ্যন্তরীণ জলপথ আছে। ইহা ভারতের মোট আভ্যন্তরীণ জলপথের শতকরা ২০ ভাগ। এই উপকূলে ছোট ছোট খরস্রোতা নদী পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া উপকূলের বালিয়াড়িতে বাধা পাইয়া জলাভূমির সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল নদীমুখে তেমন উল্লেখযোগ্য ব-দ্বীপ গঠিত হয় নাই। এই অঞ্চলের নদী তীরবর্তী অঞ্চলে ও কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে প্রচুর তুলা, গম, জোয়ার, বাজরা, ধান উৎপন্ন হয়। উত্তরাংশে তুলা ও দক্ষিণাংশে ধান প্রধান ফসল। মালাবার উপকূলে প্রচুর নারিকেল ও সুপারি জন্মে। এই অঞ্চলে খনিজ সম্পদের খুবই অভাব। খরস্রোতা নদী হইতে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। মালাবার উপকূলে প্রচুর মোনাজাইট পাওয়া যায়। ইহা হইতে আণবিক শক্তির উৎস ইউরেনিয়াম আহরণ করা হয়।

পশ্চিমঘাট পর্বতের ঢালে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য হইতে শাল, সেগুন, আবলুস, চন্দন প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ঠ ও বনজ সম্পদ আহরণ করা হয়। দক্ষিণাংশের উপকূলে প্রচুর রবার, মসলাদ্রব্য, আদা, মরিচ, দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। উপকূলভাগ সংকীর্ণ ও অভগ্ন হওয়ায় বন্দর গঠন ও পোতাশ্রয় নির্মাণের বিশেষ অসুবিধা। স্বাভাবিক বন্দর হিসাবে বোম্বাই সর্বপ্রধান। ইহা ছাড়া গুজরাটের কচ্ছ উপসাগরের তীরে কাণ্ডলা, গোয়ায় মার্মাগাঁও ও কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোর, কেরালার কোচিন ও ত্রিবান্দ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুজরাটের আমেদাবাদ ও মহারাষ্ট্রের বোম্বাই ভারতের বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এই অঞ্চলে জলপথ, সড়কপথ, রেলপথ ও বিমানপথ বিশেষ উন্নত এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত সহজ যোগাযোগ রহিয়াছে। সারা বৎসর আরব সাগরের অগভীর অংশে প্রচুর মৎস্য ধরা হয়। মৎস্য আহরণ ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট নানা শিল্পের প্রসারের ফলে এই অঞ্চলের উপকূলবর্তী অধিবাসীদের জীবিকার সহজ সুযোগ ঘটিয়াছে। এই সকল কারণে এই অঞ্চলে জনবসতি বেশ ঘন। কেরালাতে ভারতের সর্বাধিক ঘনবসতি দেখা যায়। এই অঞ্চলে বহু জনাকীর্ণ শহর ও বাণিজ্য-কেন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভারতের পূর্ব উপকূলভাগ দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা হইতে উত্তর-পূর্বে মহানদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত তামিলনাড়ু, অন্ধ্র ও উড়িষ্যা রাজ্যের পূর্বাংশ লইয়া গঠিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ কি. মি. এবং পূর্বঘাট পর্বতমালা হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ইহার গড় বিস্তার প্রায় ৮০ কি. মি. হইতে ২৪০ কি. মি.। ইহার দুইটি অংশ—দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা হইতে কৃষ্ণা নদীর মোহনা পর্যন্ত **করমণ্ডল বা কর্ণাট উপকূল** এবং কৃষ্ণা নদীর মোহনা হইতে মহানদীর মোহনা পর্যন্ত **নর্দার্ন সার্কাস বা উড়িষ্যা উপকূল**। এই উপকূলভাগ অনেকাংশে বালুকাময় এবং বঙ্গোপসাগরের অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত প্রস্তরময়। এই উপকূলে চিল্কা ও পুলিকট উল্লেখযোগ্য হ্রদ। এই উপকূলভাগ প্রশস্ত ও ভূমি-ভাগের ঢাল পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে হওয়ায় দাক্ষিণাত্য মালভূমি হইতে নির্গত প্রধান নদীগুলির মোহনায় ব-দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে, যেমন মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ব-দ্বীপ। এই সকল ব-দ্বীপ দাক্ষিণাত্যের উল্লেখযোগ্য কৃষি অঞ্চল।

পশ্চিম উপকূলের ন্যায় এই উপকূলেও সামুদ্রিক প্রভাব বর্তমান। শীত গ্রীষ্মে উত্তাপের তারতম্য কম। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ২০° সে.। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু দাক্ষণাংশে তামিলনাড়ুর উপকূলে প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে শীতকালে বর্ষাকালের তুলনায় অধিক বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১০০ সে. মি.। উত্তরাংশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১৫০ সে. মি.। মাদ্রাজ অপেক্ষা পুরীতে বৎসরে প্রায় ২১·৪ সে. মি. বেশি বৃষ্টিপাত ঘটে। এই উপকূলভাগ পলিগঠিত ও ব-দ্বীপ পলি-সমৃদ্ধ হওয়ায় ধানচাষের বিশেষ

উপযোগী। সমগ্র পূর্ব তটভূমির প্রায় ৫০ হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে ধানচাষ হইয়া থাকে। মহানদী ব-দ্বীপ অঞ্চলে ধান ও পাট, গোদাবরী ব-দ্বীপে ধান ও ফলের চাষ প্রধান। কৃষ্ণা ও কাবেরী ব-দ্বীপ অঞ্চলে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার জন্য অসংখ্য সেচ-খালের সাহায্যে জমিতে জলসেচ করা হয় এবং প্রচুর ধান ও তুলা উৎপাদন করা হয়। উন্নত প্রণালীতে জলসেচের ব্যবস্থা ভারতে কাবেরী ব-দ্বীপেই প্রথম করা হয়। কাবেরী ব-দ্বীপ এক সময় **দাক্ষিণাত্যের শস্যভাণ্ডার** বলিয়া পরিচিত ছিল। ধান, পাট, তুলা ও ফলের চাষ ছাড়া পূর্ব উপকূলের এই সকল ব-দ্বীপ অঞ্চলে গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু, চীনাবাদাম, তামাক প্রভৃতি প্রচুর জন্মে।

পূর্বঘাট পর্বতের পাদদেশে ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি হইতে শাল, সেগুন, সিঙ্কোনা প্রভৃতি বনজ সম্পদ প্রচুর আহরণ করা হয়। তীরভূমিতে নারিকেল ও সুপারিও প্রচুর জন্মে। পূর্ব উপকূলভাগের সমুদ্রাঞ্চল ও হ্রদ ভারতের উল্লেখযোগ্য মৎস্য আহরণকেন্দ্র। চিল্কা হ্রদ হইতে প্রচুর গলদা চিংড়ি ধরা হয় এবং বিদেশে চালান দেওয়া হয়। তীরভূমি অভগ্ন হওয়ায় স্বাভাবিক বন্দর গঠনের বিশেষ অসুবিধা। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বন্দরের মধ্যে একমাত্র অন্ধ্র প্রদেশের বিশাখাপত্তনমে স্বাভাবিক বন্দর ও পোতাশ্রয় আছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ জাহাজ-নির্মাণকেন্দ্র বিশাখাপত্তনমে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। বর্তমানে এখানে একটি লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র নির্মাণ করা হইতেছে। করমণ্ডল উপকূলের প্রধান বন্দর মাদ্রাজ কৃত্রিম বন্দর। উড়িষ্যা উপকূলে নবগঠিত পারাদ্বীপ বন্দর হইতে জাপানে লৌহ-আকরিক রপ্তানি করা হয়। তুতিকোরিন, ম্যাঙ্গালোর, পণ্ডিচেরী অন্যান্য ছোট বন্দর। পুরী, ওয়ালটেয়ার, বিজয়ওয়াদা স্বাস্থ্যকর স্থান। কটক, মাদ্রাজ বিখ্যাত বস্ত্রশিল্পকেন্দ্র। কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যে এই অঞ্চল বিশেষ সমৃদ্ধ। এই সকল কারণে এ অঞ্চলে জনবসতি বেশ ঘন।

[**প্রশ্ন**: (১) পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার কত? (২) পূর্ব উপকূলের উল্লেখযোগ্য ব-দ্বীপ কি কি? (৩) পশ্চিম উপকূলে ব-দ্বীপ না থাকার কারণ কি? (৪) কেরালার উপহ্রদ কি? (৫) চিল্কা কি ও কি জন্য বিখ্যাত? (৬) পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের ৩টি করিয়া উল্লেখযোগ্য বন্দরের নাম কর। (৭) ভৌগোলিক কারণ দেখাও—(ক) পশ্চিম উপকূলে অধিক বৃষ্টিপাত ঘটে। (খ) কাবেরী ব-দ্বীপকে দক্ষিণ ভারতের শস্যভাণ্ডার বলা হয়? তামিলনাড়ু উপকূলে বৎসরে দুইবার বৃষ্টি হয়। (খ) কেরালা ভারতের সর্বাধিক ঘনবসতি অঞ্চল? (৮) পশ্চিম উপকূলের একটি ভৌগোলিক বিবরণ দাও। (৯) ভারতের উপকূলভাগের মৎস্য শিল্পের বিবরণ দাও। (১০) ভারতের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়া পূর্ব উপকূলের ব-দ্বীপ ও উভয় উপকূলের প্রধান প্রধান বন্দর দেখাও।]

(ঙ) **দ্বীপভূমি (Islands)**: ভারতের পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিম উপকূলে আরবসাগরে অবস্থিত **লাক্ষাদ্বীপ, আমিনিদিভি দ্বীপপুঞ্জ, মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ** (আরবসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অধুনা একত্রে লাক্ষা দ্বীপ নামে অভিহিত) লইয়া ভারতের উপকূলীয় দ্বীপভূমি গঠিত। শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে দ্বীপভূমি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। সর্বমোট ২৪৭টি ছোট-বড় দ্বীপ লইয়া ভারতের দ্বীপভূমি গঠিত।

ভারতের দ্বীপভূমিকে নিম্নলিখিত প্রধান কয়েকটি আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—**বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ**— ক) **আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ**—উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আন্দামান। (খ) **নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ**—উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ নিকোবর। **আরবসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ**—(ক) **আমিনদিভি,** (খ) **লাক্ষাদ্বীপ,** (গ) **মিনিকয়**।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—২২২টি দ্বীপ লইয়া গঠিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন ৮,২৯৩ বর্গ কি. মি. এবং লোকসংখ্যা ১·৮৮ লক্ষ। গ্রেট আন্দামান, লিট্‌ল্ আন্দামান, বারাটং, রাটল্যাণ্ড, লং আইল্যাণ্ড আন্দামান দ্বীপসমষ্টির অন্তর্গত প্রধান দ্বীপ এবং চউড়া, পুলোমিলো, নানকৌরী, কার নিকোবর, গ্রেট নিকোবর ইত্যাদি নিকোবর দ্বীপসমষ্টির প্রধান দ্বীপ। বিভিন্ন অংশে গঠিত উচ্চ পাহাড় ও বালুকা মিশ্রিত সমতল ভূভাগ এই অঞ্চলের ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য।

মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে বৎসরে ৩০০ সে. মি.-এর অধিক বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। বার্ষিক গড় উত্তাপ প্রায় ৩০° সে.। নিম্ন মধ্যাঞ্চলে **মৌসুমী পর্ণমোচী** এবং পর্বত গাত্রে **চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি** বিদ্যমান। **শাল, সেগুন, চাপ, হলুদ, শিরিষ** প্রভৃতি কাষ্ঠ এই অঞ্চলের প্রধান বনজ সম্পদ। কৃষিজ সম্পদের মধ্যে **ধান, ডাল, নারিকেল, মসলা, কলা** ও **বিভিন্ন ফল** প্রধান। **রবার ও তালতেলের** আবাদ শুরু হইয়াছে। **বার্ণানালাচীনাতাপু** নারিকেল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

আন্দামান অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা নেগ্রিটো জাতীয় এবং নিকোবর দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত মোঙ্গল জাতীয়। বর্তমানে এই অঞ্চলে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু, পাঞ্জাবী, তামিল প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে। বৃটিশ যুগে আন্দামান ছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বীপান্তরভূমি ও বন্দীশিবির। আন্দামানের **সেলুলার জেল** ছিল কুখ্যাত। বর্তমানে ইহার পরিবর্তন হইয়াছে। সভ্যতা-বর্জিত এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী **সোম্পেন, ভাণ্টু, মোপলা, ওঙ্গে** প্রভৃতি আজিও শিকার, ফলমূল আহরণ প্রভৃতির সাহায্যে আদিম জীবনধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা প্রসারের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। **পোর্টব্লেয়ার** আন্দামানের রাজধানী। এইখানের **এলফিনস্টেনলি হারাবার** বিখ্যাত পোতাশ্রয়। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ১২৪৮ কি. মি.।

লাক্ষাদ্বীপ-আমিনদিভি-মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ—পশ্চিম উপকূলের কেরালা রাজ্যের

কোঝিকোড হইতে মাত্র ১০৮'৮ কি. মি. দূরে অবস্থিত। এই দ্বীপের আয়তন ৩২ বর্গ কি. মি. ও লোকসংখ্যা ৪৪,০০০। এই অঞ্চলের অধিকাংশ দ্বীপই প্রবাল দ্বারা গঠিত ও জনবসতি হইতে বর্জিত। **আমিনি, চেতলাত, কিওয়াণ, কাদামথ, কালপেনি, কাভারত্তি, মিনিকয়** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দ্বীপ। **কাভারত্তি** এই অঞ্চলের প্রধান কার্যলয়।

মৌসুমী বায়ু এইস্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে **নারিকেল, নানাজাতীয় ফল** প্রধান। কিছু **জোয়ার, বাজরা** জাতীয় দানাশস্য ছাড়া এই অঞ্চলে ধান ও গমের চাষ আদৌ হয় না। মূল ভূ-খণ্ড হইতে খাদ্য আমদানি করা হয়। ধান চাষের জন্য পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। মৎস্য, প্রবাল ও অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ অধিবাসীদিগের প্রধান উপজীবিকা। নারিকেল দড়ি তৈয়ারীর কারখানাই এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে আন্দামানীদিগের তুলনায় এই অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিক অগ্রসর। মালবার উপকূলের **মোপলা** জাতীয় অধিবাসীর সংখ্যাই এই অঞ্চলে সর্বাধিক।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতের দ্বীপভূমির শ্রেণীবিভাগ কর। (২) আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ কি কি? (৩) সেলুলার জেল কোথায় ছিল এবং কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইত? (৪) বার্জাশালা চীনাতাপু কিজন্য বিখ্যাত? (৫) আন্দামানের রাজধানী ও প্রধান পোতাশ্রয় কোথায়? (৬) আরব সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের সংগঠন কি? (৭) লাক্ষাদ্বীপ ইত্যাদির সদর কার্যালয় কোথায়?]

ভারতের নদ-নদী (Rivers of India)

ভারতের উত্তরাংশের সুউচ্চ হিমালয় পর্বত এবং মধ্যভাগের বিন্ধ্য, সাতপুরা, মাইকাল প্রভৃতি পর্বতশ্রেণীকে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে প্রধান জলবিভাজিকা ধরিয়া ভারতের নদ-নদীকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে: (ক) উত্তর ভারতের নদ-নদী এবং (খ) দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী।

উত্তর ভারতের নদ-নদী—উত্তর ভারতের নদ-নদীর অধিকাংশই হিমালয়ের উচ্চ অঞ্চলের কোন হ্রদ বা হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া ভূমিভাগের ঢাল অনুযায়ী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগরে অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আরব সাগরে পড়িয়াছে। মধ্যবর্তী বিন্ধ্য, কাইমুর, মাইকাল পর্বত অঞ্চল হইতে উৎপন্ন কয়েকটি নদী—শোন, চম্বল ইত্যাদি উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া উত্তর ভারতের সমভূমির প্রধান নদী গঙ্গা-যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। হিমালয়ে উৎপন্ন নদ-নদী বরফগলা জলে পুষ্ট বলিয়া সারাবৎসরই প্রায় বহমান থাকে। ইহা ছাড়া দীর্ঘ সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া এই সকল নদী কম খরস্রোতা হয় এবং দীর্ঘ পথ নাব্য থাকে। উত্তর ভারতের নদীসমূহকে

(ক) **বঙ্গোপসাগরে পতিত নদ-নদী** এবং (খ) **আরব সাগরে পতিত নদ-নদী** —এই দুইটি বিভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) **বঙ্গোপসাগরে পতিত নদ-নদীর** মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং ইহাদের উপনদী-সমূহই প্রধান। **গঙ্গা**—হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গা উত্তর-প্রদেশ ও বিহার অতিক্রম করিয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে এবং মুর্শিদাবাদ জিলার ধুলিয়ানের নিকট **পদ্মা** ও **ভাগীরথী** নামে দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ভাগীরথী পশ্চিম-বঙ্গের সমগ্র দক্ষিণ অংশ অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পদ্মা বাংলাদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। গঙ্গার গতিপথে দক্ষিণতীরে **যমুনা, শোন, দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, রূপনারায়ণ, কংসাবতী** প্রভৃতি উপনদী মিলিত হইয়াছে। বামতীরে হিমালয় হইতে নির্গত নদীগুলির মধ্যে **রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কোশী** ইত্যাদি উপনদী যুক্ত হইয়াছে। গঙ্গার প্রধান উপনদী **যমুনা** হিমালয়ের **যমুনোত্রী হিমবাহ** হইতে সৃষ্ট হইয়া উত্তরপ্রদেশে **এলাহাবাদের** নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণের উচ্চ ভূ-ভাগ হইতে নির্গত **চম্বল, কান, বেতোয়া, ধাসান** প্রভৃতি যমুনার প্রধান উপনদী। **দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী** প্রভৃতি দক্ষিণের মালভূমিতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। গঙ্গার অববাহিকা ভারতের উর্বরতম কৃষি অঞ্চল এবং গঙ্গার পলিগঠিত ব-দ্বীপ, **যুক্তভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ**। উৎস হইতে মোহনা পর্যন্ত গঙ্গা ২,৪০০ কি. মি. দীর্ঘ এবং মোহনা হইতে ইহার প্রায় ১,৬০০ কি.মি. নাব্য। গঙ্গার তীরে **হরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, পাটনা, ভাগলপুর, কলিকাতা** বিখ্যাত শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ও বন্দর। **যমুনার** তীরে ভারতের রাজধানী **দিল্লী** ও বিখ্যাত শহর **আগ্রা** এবং **গোমতী** তীরে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী **লক্ষ্ণৌ** অবস্থিত।

ব্রহ্মপুত্র—হিমালয়ের মানস সরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া তিব্বত মালভূমি অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র আসামের **সদিয়ার** নিকটে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। তিব্বতে ইহার নাম **সাংপো**। ব্রহ্মপুত্র সমগ্র আসামের মধ্য দিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়া পরে দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার পর চূড়ান্ত পর্যায়ে আসিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে উপনদীসমূহের মধ্যে **সুবর্ণশিড়ি, মানস, তোরসা, তিস্তা, করতোয়া** প্রধান এবং বাম তীরের উপনদীসমূহের মধ্যে **তিহং, তিবং, লোহিত, ধানসিড়ি** উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মপুত্র প্রায় ২,৬৮৮ কি.মি. দীর্ঘ। মোহনা হইতে ইহার মাত্র ১,২৮০ কি.মি. নাব্য। ভারতের ব্রহ্মপুত্র ও ইহার উপনদীসমূহই সর্বাপেক্ষা বেশী জল বহন করিয়া থাকে। অতিরিক্ত পলি বহনের ফলে ব্রহ্মপুত্র খুবই অগভীর এবং আসাম অঞ্চলে প্রতি বৎসরই নিয়মিত বন্যা হয়। ব্রহ্মপুত্রের পলিগঠিত **মাজুলী**, পৃথিবীর

সর্ববৃহৎ নদী-গঠিত ব-দ্বীপ। **ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটি, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী** প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য শহর ও ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্র। তিস্তার তীরে **জলপাইগুড়ি** এবং **তোরসার তীরে কোচবিহার** উল্লেখযোগ্য জেলাশহর।

(খ) **সিন্ধু**—আরব সাগরে পতিত নদ-নদীসমূহের মধ্যে **সিন্ধু** ও ইহার উপনদী **শতদ্রু** প্রধান। হিমালয়ের মানস সরোবরের নিকটবর্তী কয়েকটি প্রস্রবণ হইতে উৎপন্ন হইয়া কাশ্মীর হিমালয়ে গভীর গিরিখাত সৃষ্টি করিয়া পাকিস্তানের মধ্য দিয়া সিন্ধু আরব সাগরে পতিত হইয়াছে। **শতদ্রু** ও তাহার উপনদী **ঝিলাম** এবং **চন্দ্রভাগা, ইরাবতী** ও **বিপাশা** সিন্ধুর প্রধান উপনদী। শতদ্রু নদীর উপর ভারতের বিখ্যাত **ভাকরা** বাঁধ ও **নাঙ্গাল বাঁধ** তৈয়ারী হইয়াছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতিতে সিন্ধু ও **শতদ্রু** নদীর গুরুত্ব অপরিসীম।

দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী—দক্ষিণ ভারতের উত্তরের উচ্চ ভূ-ভাগ এবং পশ্চিমে সহ্যাদ্রি পর্বতমালা এই অঞ্চলের প্রধান জলবিভাজিকা। সুতরাং দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) বঙ্গোপসাগরে পতিত নদ-নদী এবং (খ) আরব সাগরে পতিত নদ-নদী। সম্বৎসর এই সকল নদীতে জল থাকে না। বর্ষাকালে এই সকল নদীতে ঢল নামে ও নদীগুলি খুবই খরস্রোতা হয়। দক্ষিণ ভারতের নদ-নদীর মধ্যে উত্তরাংশে **নর্মদা, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরী** এবং দক্ষিণাংশে **কৃষ্ণা, কাবেরী** উল্লেখযোগ্য।

আরব সাগরে পতিত নদ-নদী—(১) **নর্মদা** মধ্যভারতের **অমরকণ্টক** পর্বত হইতে সৃষ্ট হইয়া জব্বলপুরের মার্বেল শিলাস্তর অতিক্রম করিয়া আরবসাগর সন্নিহিত **ক্যাম্বে উপসাগরে** পড়িয়াছে। (২) **তাপ্তী**—মধ্যভারতের **মহাদেব পাহাড়ের** পশ্চিম ঢালে উৎপন্ন হইয়া **ক্যাম্বে উপসাগরে** পতিত হইয়াছে। আরব সাগরে পতিত অন্যান্য নদীর মধ্যে **মাজী, সবরমতী, লুনী, পেরিয়ার** ও **চন্দ্রগিরি** উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গোপসাগরে পতিত নদী—(১) **মহানদী**—মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার **সিজাওয়া উচ্চভূমি** হইতে উৎপন্ন হইয়া ছত্রিশগড় উপত্যকা পার হইয়া উড়িষ্যা রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার মোহনায় একটি ব-দ্বীপ রহিয়াছে। **কটক** ও **সম্বলপুর** মহানদীর তীরবর্তী প্রধান শহর। (২) **গোদাবরী**—দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা ও ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী গোদাবরী পশ্চিমঘাট পর্বতাঞ্চলের **ত্র্যম্বক পাহাড়** হইতে উৎপন্ন হইয়া মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের ভিতর দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। **প্রাণহিতা, ইন্দ্রাবতী** ও **মঞ্জীরা** ইহার প্রধান উপনদী। গোদাবরীর মোহনায় একটি বিরাট ব-দ্বীপ সৃষ্ট হইয়াছে। **রাজমহেন্দ্রী** ইহার তীরে উল্লেখযোগ্য শিল্প শহর। (৩) **কৃষ্ণা**—পশ্চিমঘাট পর্বতে উৎপন্ন হইয়া এই নদী মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্য দিয়া

বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। **ভীমা, তুঙ্গভদ্রা, মালপ্রভা** ও **ঘটপ্রভা** ইহার প্রধান উপনদী। কৃষ্ণার তীরে সাতারা ও বেজোয়াদা উল্লেখযোগ্য শহর। (৪) **কাবেরী**—কর্ণাটক রাজ্যে উৎপন্ন হইয়া তামিলনাড়ু অতিক্রম করিয়া কাবেরী নদী বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার গতিপথে **শিবসমুদ্রম** উল্লেখযোগ্য জলপ্রপাত। **হিমবতী, বেদবতী, ভবানী, কোলেরুণ** প্রভৃতি ইহার উপনদী। কর্ণাটকে কাবেরী নদীর উপর **কৃষ্ণরাজ** বাঁধ এবং তামিলনাড়ু রাজ্যে **মেট্টুর বাঁধ** নির্মাণ করিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও জলসেচের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের পূর্ববাহিনী উল্লেখযোগ্য অন্যান্য নদীর মধ্যে **উত্তর ও দক্ষিণ পেনার ও ভাইগাই** বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদ-নদীর তুলনা (Rivers of North and South India—a comparison):

উত্তর ভারতের নদ-নদী	দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী
(১) সুউচ্চ হিমালয়ের তুষারগলা জলে পুষ্ট বলিয়া সারা বৎসর জল থাকে।	(১) অনুচ্চ পর্বতগাত্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া একমাত্র বৃষ্টির জলেই পুষ্ট। এই সকল নদ-নদীতে সারা বৎসর জল থাকে না। শীতে শীর্ণকায়া এবং বর্ষায় কূলপ্লাবনী ইহাদের রূপ।
(২) বিস্তীর্ণ সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া পার্বত্য রূপ, সমভূমি রূপ ও ব-দ্বীপ রূপ, তিনটি রূপই বর্তমান। দীর্ঘ সমভূমি অতিক্রম করে বলিয়া স্রোতবেগ স্তিমিত হইয়া আসে। ফলে মোহনায় ব-দ্বীপ গড়িয়া ওঠে।	(২) মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত নদীর তিনটি গতি বা রূপ প্রায়ই থাকে না। সংকীর্ণ সমভূমির উপর দিয়া প্রবল বেগে সমুদ্রে পড়ে বলিয়া মোহনায় ব-দ্বীপ তৈরী হয় না। মহানদী ও গোদাবরী প্রশস্ত ও ক্রমঢালু পূর্ব উপকূল অতিক্রম করিবার জন্য মোহনায় বিরাট ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে।
(৩) নদীখাত অপেক্ষাকৃত অগভীর কিন্তু প্রশস্ত। ফলে সারা বৎসর জল থাকে ও নৌবহনযোগ্য এবং বাণিজ্যিক পরিবহণের সহায়ক। জল সেচেরও সুবিধা হয়।	(৩) বর্ষাকালে খুবই খরস্রোতা এবং অন্য সময়ে প্রায় শুষ্ক। ফলে নৌ-চলাচলের অযোগ্য ও বাণিজ্যিক পরিবহনে সহায়ক নহে। সেচের সুবিধা কম। কঠিন শিলাভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত বলিয়া নদীখাত খুব গভীর হয় না।

উত্তর ভারতের নদ-নদী	দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী
(৪) নদীর স্রোতবেগ কম ও গতিপথে উচ্চ জলপ্রপাত ইত্যাদি না থাকায় জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের অসুবিধা। পার্বত্য অংশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা বর্তমান।	(৪) নদীগুলি খরস্রোতা ও স্থানে স্থানে জলপ্রপাত থাকায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী।
(৫) নদীগুলি নবীন ও প্রচুর পলি বহন করে বলিয়া মাঝে মাঝে গতি পরিবর্তন করে।	(৫) বয়সে প্রাচীন এবং কঠিন শিলাময় ভূ-ভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত বহিয়া গতিপথ নির্দিষ্ট।
(৬) নদীগুলি মোটামুটি দীর্ঘ এবং তীরে বহু গুরুত্বপূর্ণ শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।	(৬) নদীগুলি তেমন দীর্ঘ নহে এবং তীরে উল্লেখযোগ্য শহরের সংখ্যাও কম।

[প্রশ্ন : (১) ভারতের নদ-নদীর শ্রেণীবিভাগ কর। (২) গঙ্গানদীর উপনদী ও শাখানদীসমূহের নাম লিখ। (৩) দক্ষিণ ভারতের নদ-নদীগুলির বৈশিষ্ট্য কি ? (৪) দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা কোন্ নদীকে বলা হয় ? (৫) দক্ষিণ ভারতের প্রধান নদ-নদীগুলির নাম লিখ এবং (৬) শস্যাগার কোন্ অঞ্চলকে বলা হইত ? (৭) গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত প্রধান কয়েকটি শহরের এবং (৮) কৃষ্ণা ও গোদাবরীর কয়েকটি উপনদীর নাম লিখ।]

ভারতের অর্থ নৈতিক কার্যাবলীর উপর নদ-নদীর প্রভাব

(Influence of Rivers on the Economic Activities)

ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও গোদাবরী নদীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দানে গড়িয়া উঠিয়াছে। নদীমাতৃক দেশ ভারতের জনজীবনে ও তাহাদের অর্থ নৈতিক কার্যধারায় নদ-নদীর দান অপরিসীম। ভারতের নদী-ব্যবস্থাকে দুইটি প্রধান ধারায় ভাগ করা যায়, যথা—উত্তর ভারতের নদী ব্যবস্থা এবং দক্ষিণ ভারতের নদী ব্যবস্থা। উত্তর ভারতের নদ-নদীগুলির মধ্যে সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদী ও ইহাদের অসংখ্য উপনদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহারা সারা বৎসর বরফগলা জলে পুষ্ট থাকে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির মধ্যে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, পেরিয়ার প্রভৃতি নদী ও ইহাদের উপনদীসমূহ দাক্ষিণাত্যের নাতি-উচ্চ পর্বত বা মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই সকল নদীতে সারাবৎসর পর্যাপ্ত জল থাকে না। ইহারা বর্ষাকালে বৃষ্টিধারায় পুষ্ট। বর্ষাকালে ইহারা কূলপ্লাবিনী কিন্তু শীতে শীর্ণকায়া। ভূ-প্রকৃতির পার্থক্য অনুযায়ী দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি অধিক খরস্রোতা। উত্তর ভারতের নদীগুলি একমাত্র পার্বত্য প্রবাহে খরস্রোতা। নিম্নে ভারতের নদ-নদীর বহুমুখী প্রভাব আলোচনা কর হইল।

(১) **সমভূমি ও ব-দ্বীপ গঠন**—উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি—সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি—সিন্ধু-গঙ্গা ও ইহাদের উপনদীসমূহ দ্বারা পরিবাহিত বালি, কাঁকর ও পলি দ্বারা গঠিত। এই সমভূমি অঞ্চলই ভারতের আর্য সভ্যতার পীঠস্থান এবং আধুনিক যুগে ভারতের সর্বাপেক্ষা উন্নত কৃষি অঞ্চল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আসামের বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল ব্রহ্মপুত্র ও ইহাদের উপনদী দ্বারা গঠিত। গঙ্গানদীর মোহনায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ ও বর্তমান বাংলাদেশ গঙ্গার দানে গঠিত বিশাল ব-দ্বীপ।

(২) **বিপুল জলসম্পদ ও কৃষি**—ভারতে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের শতকরা প্রায় ৭৪ ভাগ বর্ষাকালে, ১০ ভাগ গ্রীষ্মকালে, ১৩ ভাগ শরৎকালে এবং ৩ ভাগ শীতকালে ঘটিয়া থাকে। বৃষ্টিহীন ঋতুতে চাষবাসের প্রয়োজনে বর্ষার এই বিপুল জল সঞ্চয়খালের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেচের ব্যবস্থা করা হয়। নদীর খাতে বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলাধার সৃষ্টির সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করিবার ফলে ভারতে কৃষির বিশেষ উন্নতি সম্ভব হইয়াছে।

(৩) **মৎস্যচাষ, নৌ-পরিবহন ইত্যাদির সুবিধা**—ভারতের নদীগুলি মোহনা হইতে বহুদূর অভ্যন্তর পর্যন্ত নাব্য। ফলে নদীর তীরে তীরে অনেক উন্নত বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। জলসেচ, পরিবহন ব্যতীত মৎস্য আহরণ ও পর্যটনেও ইহাদের গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি। **গঙ্গার তীরে** কলিকাতা, বারাণসী, এলাহাবাদ, পাটনা, **যমুনার তীরে** দিল্লী, **নর্মদার তীরে** জব্বলপুর, **ব্রহ্মপুত্রের তীরে** গৌহাটি, **সবরমতীর তীরে** আহমেদাবাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য শিল্প বাণিজ্যকেন্দ্র।

(৪) **বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন** — ভারতে কয়লা সর্বত্র পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে কয়লার একান্ত অভাবহেতু এই অঞ্চলে খরস্রোতা নদীর প্রবাহকে কাজে লাগাইয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এই জলবিদ্যুতের সাহায্যে এই অঞ্চলে ব্যাপক শিল্পের প্রসার ঘটান সম্ভব হইয়াছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে নদীর জলের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন ইত্যাদি নানা-বিধ উদ্দেশ্যে গঠিত এই পরিকল্পনা ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করিয়াছে। উত্তর ভারতে ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা পাঞ্জাব-হরিয়ানা-রাজস্থান অঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের প্রসার ঘটাইয়াছে। দামোদর পরিকল্পনা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উন্নতিতে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। পশ্চিম ভারতে কয়না, কাঁকরাপাড়া পরিকল্পনা, দক্ষিণ ভারতে নাগার্জুনসাগর প্রকল্প, তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প এবং মধ্যভারতে চম্বল পরিকল্পনা ইত্যাদি স্থানীয় অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে।

(৫) **নদী-অববাহিকায় কৃষির উন্নতি**—কৃষিকার্য পরিচালনায় মৃত্তিকার

গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ সমভূমি এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদী-অববাহিকা অঞ্চলগুলি নদীবাহিত পলি-গঠিত সমভূমি। এই পলি-গঠিত সমভূমি অঞ্চলে ভারতের সর্বাধিক ধান, গম, পাট, তৈলবীজ, ইক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। গোদাবরী অববাহিকা অঞ্চলকে কৃষিজ সম্পদের জন্য দাক্ষিণাত্যের শস্যভাণ্ডার বলা হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা গঙ্গার ব-দ্বীপ পশ্চিমবঙ্গ কৃষিকার্যে বিশেষ উন্নত।

(৬) **শিল্প ও শহরের অবস্থান**—জলপথে পরিবহন সর্বাপেক্ষা সুলভ। এই কারণে পরিবহনের সুবিধার জন্য নানাবিধ শিল্প নদীর তীরে গড়িয়া উঠে। কলিকাতা, আহমেদাবাদ, কানপুর প্রভৃতি শিল্প, শহর নদীর তীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্প কারখানায় প্রচুর জলের প্রয়োজন। নদী হইতেই এই জল সংগ্রহ করা হয়। আধুনিক যুগে সকল শহরেই নদী হইতে জল সংগ্রহ করিয়া পরিস্রুত করিয়া অধিবাসীদের ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়। ইহার জন্য বিরাট পানীয় জল প্রকল্প রূপায়ণ করা হয়।

[প্রশ্ন : ভারতের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর নদ-নদীর প্রভাব বর্ণনা কর।]

জলবায়ু ও ইহার প্রভাব
(Climate and its influence)

ভারত উত্তর গোলার্ধে বিষুব রেখা সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা ইহাকে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। ফলে, উত্তর ভারতের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় এবং দক্ষিণ ভারতের জলবায়ু উষ্ণমণ্ডলীয় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বত এবং দক্ষিণে তিনদিকে সমুদ্র থাকায় ইহার কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় এবং এই ব্যতিক্রমই ভারতীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। ভূমিভাগের উচ্চতা ও সমুদ্র-সান্নিধ্যহেতু দক্ষিণ ভারতের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। আবার উত্তরে উচ্চ হিমালয় পর্বতের অবস্থান হেতু উত্তর মেরু অঞ্চলের শীতল বাতাস সরাসরি ভারতের সমভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাতে উত্তর ভারতের জলবায়ু ঐ একই অক্ষাংশে অবস্থিত পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উষ্ণতর। কর্কটক্রান্তি রেখা হইতে উত্তরে ক্রমশ উত্তাপের আধিক্য দেখা যায়। ভারতের পশ্চিমাংশে রাজস্থান মরু অঞ্চলে উত্তাপ সর্বাধিক। বৃষ্টিপাতের আধিক্যের ফলেও বহু অঞ্চলের উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক কম হয়। ভূমির উচ্চতা, সমুদ্র হইতে দূরত্ব, পর্বতের অবস্থান ইত্যাদির ফলে ভারতে জলবায়ুর বৈচিত্র্য দেখা যায়।

ভারত মৌসুমী জলবায়ুর দেশ। 'মৌসুম' শব্দের অর্থ ঋতু। বৎসরে এক বিশেষ সময়ে আগত বায়ু-প্রবাহ দেশের সামগ্রিক জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়াই ইহাকে **মৌসুমী জলবায়ু** বলা হয়। ভারতে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উত্তাপ, বায়ু-প্রবাহ, বৃষ্টিপাত

ইত্যাদির তারতম্য খুবই স্পষ্ট। এই কারণে ভারতের জলবায়ুকে চারটি প্রধান ঋতু-পর্যায়ে ভাগ করা হয়। যেমন :—

গ্রীষ্মকাল—(মার্চ-মে) ২১শে মার্চের পর হইতে সূর্যের উত্তরায়ণের ফলে ভারত তথা সমগ্র মধ্য-এশিয়া অঞ্চলে একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হইতে থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধের উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে বাতাস ধীরে ধীরে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। রাজস্থানের মরু অঞ্চলে এই সময় উত্তাপ প্রায় ৪৮° সে. এবং পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের উত্তাপ প্রায় ৪০° সে. হয়। দুপুরে প্রচণ্ড উত্তপ্ত 'লু' প্রবাহিত হয় এবং প্রায়ই বিকালের দিকে বৃষ্টিহীন 'ধূলি ঝড়' হয়। পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে ঐ ধূলি ঝড়কে **আঁধি** বলে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও তামিলনাড়ু অঞ্চলে এই ঝড়ের সহিত সামান্য বৃষ্টিপাতও হয়। ইহার ফলে দিনের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। ঐ বৃষ্টিপাত ধান, আম ও কফি উৎপাদনের সহায়ক। পশ্চিমবঙ্গে এই ঝড়কে **কালবৈশাখী**, আসামে **ধান্য-বর্ষণ**, তামিলনাড়ুতে **আম্র-বর্ষণ** ও নীলগিরি অঞ্চলে **কফি-বর্ষণ** বলা হয়। এই সময় পার্বত্য অঞ্চলের আবহাওয়া বেশ মনোরম থাকে। উত্তর ভারতের শ্রীনগর, সিমলা, দার্জিলিং দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি অঞ্চলের উতকামণ্ডে তাপমাত্রা ১৪° সে. হইতে ১৬° সে. এর মধ্যে থাকে।

বর্ষাকাল (জুন-সেপ্টেম্বর) এই সময় সর্বত্র প্রচণ্ড উত্তাপ ও ব্যাপক বৃষ্টিপাত লক্ষ্য করা যায়। ২১শে জুন সূর্যের উত্তরায়ণ শেষ হয়। ফলে ভারত ও মধ্য এশিয়া অঞ্চলে যে বিরাট নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় উহার দিকে দক্ষিণ গোলার্ধের উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে প্রবল বেগে বাতাস বহিতে থাকে। ইহাই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। প্রচুর জলকণাবাহী দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারতে দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া প্রবেশ করে—একটি আরব সাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত আরবীয় শাখা এবং অপরটি বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া আগত বঙ্গোপসাগরীয় শাখা। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আরবীয় শাখা পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় বাধা পাইয়া কঙ্কণ ও মালাবার উপকূলে প্রায় ২৫০ সে. মি. হইতে ৩০০ সে. মি বৃষ্টিপাত ঘটায়। কিন্তু পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূর্বদিকের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে পূর্ব মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু প্রভৃতি অঞ্চলে ৭০ সে. মি. হইতে ৮০ সে. মি. বৃষ্টিপাত ঘটায়। উত্তরাঞ্চলে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের পাদদেশে নর্মদা ও তাপ্তী অববাহিকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে। এই আরবীয় শাখা যত উত্তরে অগ্রসর হয় ততই বৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে। রাজস্থানের আরাবল্লী অঞ্চলে সামান্য বৃষ্টিপাত ৫০ সে. মি. হইতে ৬০ সে. মি হইলেও পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্র ২০ সে. মি.।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর জলীয় বাষ্পপূর্ণ বঙ্গোপসাগরীয় শাখা উত্তর-পূর্ব হিমালয়ে বাধা পাইয়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ৩০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত ঘটায়। খাসিয়া-জয়ন্তিয়ার দক্ষিণ ঢালে **মৌসিনরাম** ও **চেরাপুঞ্জি** অঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের

গড় প্রায় ১,৩০০ সে. মি.। বিশ্বে আর কোথাও এত অধিক বৃষ্টিপাত হয় না। এই শাখা সু-উচ্চ হিমালয় অতিক্রম করিতে পারে না বলিয়া ক্রমে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং ক্রমহ্রাসমান হারে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে (১৫০ সে. মি. হইতে ২০০ সে. মি), বিহারে

চিত্র ২.৫ ; ভারতের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত অঞ্চল।

(১০০ সে. মি. হইতে১৫০ সে. মি.), উত্তরপ্রদেশে (৭৫সে. মি. হইতে ১০০ সে. মি বৃষ্টিপাত ঘটায়। দিল্লীর নিকট এই শাখা আরব সাগরীয় শাখার সহিত মিলিত হইয়া উত্তরে কাশ্মীর অঞ্চলে প্রবেশ করে। তখন ইহা প্রায় বৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে। ভারতের এই বৃষ্টিপাতই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রভাবে ভারতের প্রধান প্রধান শস্য, যেমন— ধান, পাট, ইক্ষু, তুলা প্রভৃতির চাষ-আবাদ হইয়া থাকে। মোটকথা ভারতের কৃষি অর্থনীতি এই বৃষ্টিপাতের উপর সর্বাংশে নির্ভরশীল।

শরৎকাল (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর)—২৩শে সেপ্টেম্বরের পর হইতে সূর্যের দক্ষিণায়নের সহিত বায়ুর চাপ-বলয়গুলিও স্থান পরিবর্তন করে। দক্ষিণ গোলার্ধে নিম্নচাপ বৃদ্ধির সহিত ভারতে মধ্য এশিয়ার উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে বাতাস ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। ইহাকে **অপসৃয়মাণ মৌসুমী বায়ু বা প্রত্যাবৃত্ত মৌসুমী** বায়ু বলে। ইহার প্রভাবে বঙ্গোপসাগরে ও ইহার উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। তামিলনাড়ুতে ইহার প্রভাবে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত ঘটে। উড়িষ্যা উপকূলেও সামান্য বৃষ্টি হয়।

শীতকাল (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী)—সূর্যের দক্ষিণায়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে দক্ষিণ গোলার্ধে একটি বিরাট সৃষ্টি নিম্নচাপের হয়। উত্তর গোলার্ধের উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে স্বাভাবিকভাবেই বাতাস নিয়মিতভাবে এইদিকে প্রসারিত হয়। উত্তর-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহা উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু। হিমালয় অতিক্রমকালে ইহা কিছু জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে এবং ভরেতের পার্বত্য অঞ্চলে ও মধ্যবর্তী সমভূমি অঞ্চলে হাল্কা বৃষ্টিপাত ঘটায়। ইহার প্রভাবেই কাশ্মীর, সিমলা ,দার্জিলিং প্রভৃতি অঞ্চলে তুষারপাত ও নিম্নভূমিতে হাল্কা বৃষ্টিপাত হয়। এই উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় প্রচুর জলকণা সংগ্রহ করে এবং তামিলনাড়ুর উপকূলে ভারী ধরনের বৃষ্টিপাত ঘটায়। ভারতের একমাত্র তামিলনাড়ু অঞ্চলেই বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত ঘটে। এই সময় ভূমধ্যসাগরীয় পশ্চিমাবায়ুর একটি শাখা ভারতের উত্তর-পশ্চিমভাগে প্রবেশ করে এবং মধ্যবর্তী সমভূমি অঞ্চল পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও কিছু কিছু বৃষ্টিপাত ঘটায়। ইহা শীতকালীন শান্ত আবহাওয়াকে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত করে বলিয়া ইহাকে **পশ্চিম ঝামেলা** (Western Disturbances) বলা হয়। এই সময় ভারতের সমভূমি ও মালভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আকাশ মেঘমুক্ত ও আবহাওয়া শুষ্ক থাকে। শীতকালে উত্তর ভারতের পূর্ব অংশ অপেক্ষা পশ্চিম অংশেই শীতের প্রকোপ বেশি। দক্ষিণ ভারতে শীতের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম। হিমালয়ের উচ্চতর অংশে তাপমাত্রা অনেক স্থলে হিমাঙ্কের নিচে নামিয়া আসে। ভারতের সমভূমিতে এই সময় গড় তাপমাত্রা ১৪° সে. হইতে ১৬° সে., মালভূমি অঞ্চলে ২০° সে. হইতে ২২° সে. এবং পার্বত্য অঞ্চলে ৫° সে. হইতে ১০° সে. এর মধ্যে থাকে। ২১শে ডিসেম্বরের পর সূর্য মকরক্রান্তি রেখা হইতে বিষুবরেখার দিকে সরিয়া আসে। ফলে উত্তর গোলার্ধের এই অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বাতাসেও উষ্ণতার স্পর্শ লাগে ও রুক্ষ, শুষ্ক আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। এই অবস্থাকেই বসন্ত কাল বলা হয়, কিন্তু ইহা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। অতিদ্রুত তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটে ও গ্রীষ্মকাল শুরু হয়।

[প্রশ্ন : (১) কাহাকে বলে—আঁধি, কালবৈশাখী, আম্রবর্ষণ, কফিবর্ষণ, পশ্চিমী ঝামেলা ? (২) প্রত্যাবৃত্ত মৌসুমী বায়ু কি ও ইহা কখন প্রবাহিত হয় ? (৩) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমন ও ইহার প্রভাব বর্ণনা কর। (৪) শীতকালীন বৃষ্টিপাত ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে হয় এবং কেন হয় ?]

ভারতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব (Effects of Monsoon in India)

ভারত কৃষিনির্ভর দেশ। আজিও কৃষিকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতীয় অর্থনীতির মূল বনিয়াদ রচিত। কিন্তু ভারতীয় কৃষি একান্তভাবেই মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং মৌসুমী বৃষ্টিপাতকে ভারতীয় কৃষির প্রাণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ভারতের মৌসুমী বায়ুর আগমন, নির্গমন, স্থিতি ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমন ঘটে সাধারণত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং জুন মাস হইতে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইহার স্থিতিকাল। অর্থাৎ আগস্টের শেষ হইতেই ইহার তীব্রতা কমিয়া আসে। কিন্তু কোন বৎসর ইহার আগমনে বা নির্গমনে বিলম্ব ঘটে, কোন বৎসর নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ইহার আগমন বা নির্গমন ঘটে ; কোন বৎসর আবার দ্রুত আগমন ও বিলম্বে নির্গমন বা বিলম্বে আগমন ও দ্রুত নির্গমন ঘটে। ইহার কোনটিই স্বাভাবিক নহে।

আঞ্চলিক বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও ভারতীয় মৌসুমী বায়ুর অসামঞ্জস্য লক্ষণীয়। মৌসুমী বৃষ্টিপাত সাধারণত ভূ-প্রকৃতিগত কারণেই অধিক ঘটিয়া থাকে। ভারতের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ঘটে। ভারতের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১০৭ সে. মি.। কিন্তু কোন বৎসর ইহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া সর্বনিম্ন ৭৭ সে. মি. হয়। কোন বৎসরে আবার ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ঊর্ধ্বপক্ষে ১৩৫ সে. মি.-ও হয়। ইহা ছাড়া ভারতের সকল অঞ্চলে সমভাবে বৃষ্টিপাত হয় না। ভারতের পশ্চিম উপকূলে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে ও আন্দামান-নিকোবর অঞ্চলে যখন গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৩০০ সে. মি. তখন পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ সে. মি.-এর নিচে। রাজস্থানের মরু-অঞ্চল বাদ দিলে ও পশ্চিম ভারতের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬০ সে. মি.। শীতকাল অত্যন্ত শুষ্ক। অধিকন্তু বিগত দশকে প্রতি বৎসর বৃষ্টিপাতের অসম বন্টনের ফলে পর্যায়ক্রমে ভারতের কোন প্রান্তে খরা ও কোন প্রান্তে অতি বৃষ্টিপাতজনিত প্লাবন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

জলবায়ু সকল দেশের জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ভারতের মত মৌসুমী বায়ুর এমন সুদূরপ্রসারী প্রভাব পৃথিবীতে অন্য কোথাও দেখা যায় না। মৌসুমী বায়ুর দুইটি প্রধান প্রবাহকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের কৃষিকাল বিন্যস্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর সহিত ভারতের **খারিফ কৃষি** অর্থাৎ বর্ষাকালীন কৃষিকার্যের আরম্ভ এবং উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুকে কেন্দ্র করিয়া **রবি কৃষি** অর্থাৎ শীতকালীন কৃষিকার্যের সূচনা। ভারতের প্রধান কৃষি ধান, পাট, ইক্ষু, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, তুলা ইত্যাদি খারিফ কৃষির অন্তর্ভুক্ত এবং গম, যব, ছোলা, চীনাবাদাম, তৈলবীজ, ডাল, লঙ্কা ইত্যাদি রবি কৃষির অন্তর্ভুক্ত। ভারতের চা, কফি, রবার, তামাক, নানা জাতীয় ফল ইত্যাদি বাগিচা কৃষিও খারিফ মরসুমের বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। ভারতের পশ্চিম উপকূলের বনভূমি ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বনভূমিজাত বনজ সম্পদও বৃষ্টিপাতের দান।

ভারতের কার্পাস বয়নশিল্প, শর্করাশিল্প, পাটশিল্প, চা-কফিশিল্প ইত্যাদি সকলই প্রত্যক্ষভাবে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টিপাতের তারতম্যের উপর নির্ভর করিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধান, গম, জোয়ার, ইক্ষু, পাট, তামাক প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্যের চাষ আবাদ করা হয়। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে ভারতীয় কৃষির সমৃদ্ধি তথা ভারতীয় অর্থনীতির স্থিতিশীলতা। বৃষ্টিপাতের অভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে যখন খরা দেখা যায় তখন গোটা দেশের অর্থনীতির কাঠামো বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। জনজীবনে অভিশাপের মত নামিয়া আসে দুর্ভিক্ষ, বেকারি এবং মড়ক। ভারতে এই ধরনের অবস্থা কয়েক বৎসর অন্তরই প্রায় ঘটে। আবার যখন দেশের সর্বত্র সময় মত পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটে তখন সবুজ ফসলে মাঠ ভরিয়া উঠে ও জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি ঘটে। কৃষির উন্নতির সহিত সরকারী আয়, দেশের শিল্প-বাণিজ্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কৃষির উন্নতি যেমন শিল্পের কাঁচামালের যোগান সহজ ও স্বাভাবিক করে তেমনি শিল্পপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করিয়া শিল্প ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটায়। ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং সরকারী আয়বৃদ্ধি পায়। নির্দিষ্ট সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাতের অভাবে ইহার বিপরীত অবস্থাই দেখা যায়। এই সকল কারণেই ভারতীয় অর্থনীতিকে মৌসুমী বায়ুর খেয়ালিপনার উপর নির্ভরশীল বলা হয়। আবার যুগ যুগ ধরিয়া মৌসুমী বায়ু মানুষের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলে বলিয়া ভারতীয়রা স্বভাবত অদৃষ্টবাদী। বর্তমানে বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে সেচের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। সরকারী উদ্যোগে সার প্রয়োগ ও উন্নত কৃষিপ্রণালী গ্রহণ করা হইতেছে। বৃটিশ যুগে ভারতের মোট কৃষিজমির শতকরা ৬ ভাগ মাত্র সেচযুক্ত ছিল। আশা করা যায় অদূর

ভবিষ্যতে মৌসুমী জলবায়ুর উপর ভারতীয় কৃষির একান্ত নির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাইবে।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতীয় অর্থনীতিতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব বিশদভাবে বর্ণনা কর। অথবা ভারতের অর্থনীতিকে মৌসুমী বায়ুর খেয়ালিপনার উপর নির্ভরশীল বলা হয় কেন ?]

ভারতের বৃষ্টিপাত অঞ্চল (Rainfall Regions of India)

ভারতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ একমাত্র বর্ষাকালেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ঘটে। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবেও স্থানে স্থানে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই আঞ্চলিক বৃষ্টিপাতের বিশেষ তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতের কোন অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০০ সে. মি. বা ইহার অধিক। আবার কোন অঞ্চলে ইহার পরিমাণ মাত্র ২০ হইতে ২৫ সে. মি.। এই প্রকার বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে ভারতকে নিম্নলিখিত বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ভাগ করা যায় :

(ক) **অতি-বৃষ্টিপাত অঞ্চল** : ২০০ সে. মি.-এর অধিক বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। ভারতে পশ্চিমাঞ্চলে কঙ্কণ ও মালাবার উপকূল সংলগ্ন মহারাষ্ট্র-কর্ণাটকের পশ্চিম অংশ ও কেরালা, উত্তর-পূর্বে আসাম, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরা ও বঙ্গোপসাগরীয় আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ইহার অন্তর্ভুক্ত। পার্বত্য অঞ্চলে চা ও নদী-অববাহিকায় ধান ও পাট প্রধান ফসল।

(খ) **অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চল** : ১০০ হইতে ২০০ সে. মি. বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ অঞ্চল, উত্তর-পূর্ব বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য-প্রদেশের পূর্বাংশ, অন্ধ্র উপকূল, তামিলনাড়ুর পূর্ব উপকূলভাগ প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই সকল অঞ্চলে ধান, পাট, ইক্ষু, গম, তৈলবীজ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই অঞ্চলে কখনও কখনও খরা বা অতিবৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়।

(গ) **মধ্যম বৃষ্টিপাত অঞ্চল** : ৬০ হইতে ১০০ সে. মি বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। পশ্চিম বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, পাঞ্জাবের কতকাংশ, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, তামিলনাড়ুর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, গুজরাটের পূর্বাংশ, পূর্ব-মহারাষ্ট্র ইত্যাদি এই বৃষ্টিপাত অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এই অঞ্চলে প্রচুর তূলা, তামাক, গম, ইক্ষু, তৈলবীজ উৎপন্ন হয়।

(ঘ) **অল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চল** : ২০ হইতে ৬০ সে. মি. বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। রাজস্থানের পশ্চিমাংশ, পাঞ্জাবের উত্তরাংশ, জম্মু ও কাশ্মীর,

মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। গম, ইক্ষু, তুলা প্রভৃতি এই অঞ্চলে সেচের সাহায্যে উৎপন্ন করা হয়।

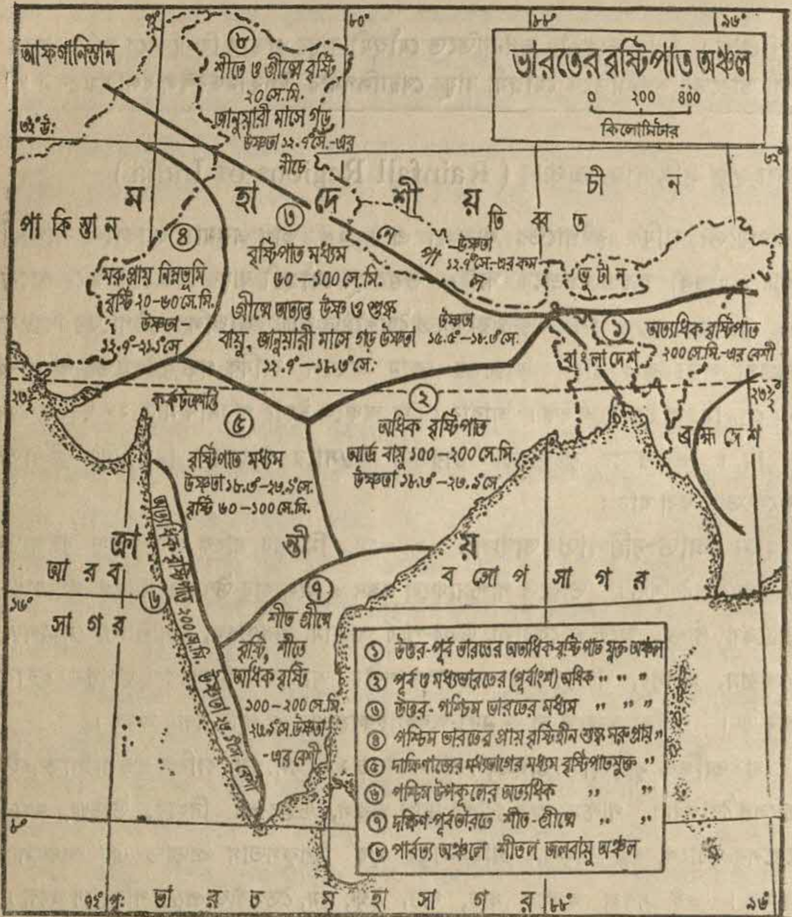

চিত্র ২.৬ : ভারতের বৃষ্টিপাত অঞ্চল

(ঙ) **অতি অল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চল** : ২০ সে. মি.-এর কম বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। রাজস্থানের মরুস্থলী, হিমালয়ের উচ্চতর অংশ, লাডাক ও কারাকোরাম অঞ্চল ইহার অন্তর্গত। এই অঞ্চল কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত। রাজস্থানের সুরতগড় অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০ সে. মি.-এর কম। কিন্তু শতদ্রু নদী হইতে **গাংখাল** কাটিয়া নিয়মিত জলসেচের সাহায্যে এই অঞ্চলে চাষ আবাদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় সুরগড়ে বিরাট কৃষিখামার গড়িয়া তোলা হইয়াছে। গম তূলা ও ইক্ষুর ফলন বিশেষ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন বৃষ্টিপাত অঞ্চল: (ক) ৩০০ সে. মি.-এর বেশি উত্তর-পূর্বে মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, পশ্চিম উপকূলে কঙ্কণ ও মালাবার উপকূল, (খ) ২০০ হইতে ৩০০ সে. মি.—নাগাল্যাণ্ড, আসামের উত্তর-পূর্বাংশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, মিজোরাম, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, পশ্চিম উপকূলের উত্তর-পূর্বাংশ। (গ) ১২০ হইতে ২০০ সে. মি.—পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ব্যতীত সকল অংশ, বিহার উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ, তামিলনাড়ুর পূর্ব উপকূল এবং অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্বাংশ। (ঘ) ৫০ হইতে ১০০ সে. মি.—তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, উত্তর-প্রদেশের পশ্চিমাংশ, পাঞ্জাবের পূর্বাংশ, রাজস্থান ও গুজরাটের পূর্বাংশ, মহারাষ্ট্র (সহ্যাদ্রি পর্বতের পূর্বাংশ), কর্ণাটকের পূর্বাংশ। (ঙ) ৫০ সে. মি.-এর কম—রাজস্থানের মরু অঞ্চল, লাডাক, কচ্ছ, পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ ও কাশ্মীর।

[প্রশ্ন : ভারতের একটি রেখাচিত্রে বৃষ্টিপাত অঞ্চলগুলি চিহ্নিত কর।]

মনুষ্য সম্পদ ও সংস্কৃতি
(Human Resources)

দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ইহার অধিবাসী। দেশের কাম্য জনসংখ্যা, ইহার বণ্টন, ইহার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ের উপর দেশের বৈষয়িক উন্নতি বহুলাংশেই নির্ভর করে। জন-সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবার অধিবাসীদের উদ্যোগ, বিচক্ষণতা, কর্মক্ষমতা, কর্মদক্ষতা ও চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত সুযোগ ও ব্যবহারের অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের মত জন-সম্পদেরও অপব্যয় হইতে পারে। অর্থাৎ ইহার কার্যকরী ক্ষমতা ও দক্ষতাও হ্রাস পাইতে পারে।

ভারত একটি উপমহাদেশ। বিরাট বিপুল ইহার আয়তন ও জনসংখ্যা। যুগ যুগ ধরিয়া নানা বাধা, বিপত্তি ও প্রতিকূলতার মধ্যেও শৌর্য, বীর্য, কর্ম ত্যাগ ও সহিষ্ণুতায় ভারতীয় জনচরিত্র উজ্জ্বল ও মহীয়ান। ভারতীয় জনচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই ভারতীয় মহাজাতিকে বিশ্বে এক বিশেষ গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী করিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলো একদিন বিশ্বের বহুদূর অন্ধকার প্রান্তেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা এই উপমহাদেশের বাহিরে শ্রী লঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের দেশসমূহে এবং পূর্ব আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যের বহু দেশে আজিও বহমান। বহু ভারতীয় বংশানুক্রমে বর্তমানে ঐ সকল দেশের স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত হইয়াছে।

সুদূর অতীতকাল হইতেই ভারতে নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা মত ও নানা

পরিধানের মধ্যে এক বিচিত্র ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া 'বিবিধের মাঝে' এক 'মিলন মহান' ঘটিয়াছে। ফলে এক মহাভারতীয় জাতির অভ্যুত্থান সম্ভব হইয়াছে। অতীতে ভারতীয় ঐশ্বর্যের টানেই বহু বিদেশী জাতি ভারতে আসিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে তাহারা সকলেই ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া নিজেদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা মহান ভারতীয় সংস্কৃতিকে আরও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণে একদিকে যেমন ভারতে নানা গোষ্ঠী, উপজাতি ও জাতির সৃষ্টি করিয়াছে অপরদিকে তেমনি জনসংখ্যারও প্রসার ঘটিয়াছে। রাজনৈতিক দিক হইতে ভারত বহুসংখ্যক রাজ্যে বিভক্ত হইলেও সকল বিভিন্নতা ও আঞ্চলিকতা এক অভিন্ন অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনেই সুন্দর ও সার্থকভাবে নিয়োজিত হইয়াছে।

১৯৮১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতে মোট জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৬৮·৩৮ কোটি। ভূমিভাগের আয়তন অনুপাতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মনুষ্য-বসতির ঘনত্ব দেখা যায় ২২১। কিন্তু ইহা ভূমিভাগের আয়তন ও জনসংখ্যার গাণিতিক অনুপাত মাত্র। ভারতে কর্ষণযোগ্য ভূমিভাগের আয়তনের অনুপাতে জনবসতির ঘনত্ব বর্তমানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯০০ জনের অধিক। অনেকের মতে ভারত অতি জনাকীর্ণ দেশ এবং ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য এই অতি জনাকীর্ণতাই দায়ী। কাহারও মতে আবার ভারতের সম্পদ সম্ভাব্যতার তুলনায় জনসংখ্যার চাপ এমন কিছু বেশি নহে। সম্পদের সঠিক ও পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার দ্বারা জনসংখ্যার চাপ-জনিত সমস্যাবলীর সমাধান বহুলাংশে সম্ভব। এই মতকে মানিয়া লইলেও বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে জনসংখ্যার চাপ যে অপেক্ষাকৃত বেশি ইহা অস্বীকার করা যায় না।

জাতি ধর্ম ও ভাষার বিভিন্নতা এই দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রধান উপাদান। যুগ যুগ ধরিয়া নানা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর এই দেশে আগমন, নানা ধর্মমতের উদ্ভব ও বিভিন্ন ধর্মগুরু ও চিন্তানায়কদের বহুবিধ কর্ম ও প্রেরণার ফলেই এক মহাগৌরবময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। ভারতের মত বিশ্বের আর কোন দেশে এত বহিরাগত জাতির সংমিশ্রণ ঘটে নাই। ভারতে নিগ্রোজাতীয় অধিবাসী দেখা যায় রাজমহল পাহাড়ে ও আন্দামান অঞ্চলে। ভারতের কোল, সাঁওতাল, খাসিয়া প্রভৃতি উপজাতির আদি পুরুষ অস্ট্রিক সম্প্রদায়। আবার দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের বেশির ভাগই দ্রাবিড় জাতির বংশধর। এই দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আর্যসম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারাই সর্বশেষে ভারতে প্রবেশ করে। কাশ্মীর, রাজস্থান, সিন্ধু-গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত আর্যবংশসম্ভূত। ভারতে জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ ও জৈনই প্রধান। ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮২·৭২ ভাগ হিন্দু,

১১·২০ ভাগ মুসলমান, ২·৬০ ভাগ খ্রীষ্টান, ১·৮৯ ভাগ শিখ। ভারতের বিগত দশকগুলির জনগনণার বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্রমবর্ধমান মুসলমান জনসংখ্যার তুলনায় হিন্দু ও অন্যান্য জনসংখ্যার অনুপাত ক্রমহ্রাসমান! ভারতে মোট ভাষার সংখ্যা ১,৬৫২টি। ইহাদের মধ্যে ১৫টি ভাষাকে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে হিন্দীকে মর্যাদা দেওয়া হইলেও ইহা জাতীয় স্বীকৃতি পায় নাই। ইংরাজী সরকারী ভাষা হিসাবে আজিও দ্বিতীয় প্রধান ভাষার গুরুত্ব পাইয়া থাকে। জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে সর্বজনগ্রাহ্য একটি উন্নত ও সকল উদ্দেশ্যসাধক ভাষাকেই সর্বস্তরে যোগাযোগের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

ভারতে বহু জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মহামিলন ঘটিয়াছে। অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব কম নহে। নানা জাতির নানা প্রকার রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনধারাকে পুষ্ট করিয়া এক সুসংহত রূপ দিয়াছে।

[প্রশ্ন : (১) ভারতের জন-সম্পদের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

অনুশীলনী ১

১। (ক) ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের বর্ণনা দাও।

(খ) ভারতের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর এইরূপ অবস্থানের প্রভাব আলোচনা কর।

[(a) Describe the geographical location of India.
(b) Discuss the role of such location on the economic life of Indian People.] [W.B.C. H. S. Exam. 1981]

২। যে কোন তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব আলোচনা কর।

[Discuss the significance of the geographycal location of India with reference to any three features of such location.]

৩। ভারতের তটরেখার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর এবং ভারতীয়দের অর্থনৈতিক জীবনের উপর ইহার প্রভাব বর্ণনা কর।

[Discuss the features of coast line of India and give an account of its influence on the life and economy of Indian People.]

৪। ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী ভারতকে বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ কর এবং যে কোন একটি অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী আলোচনা কর।

[Divide India into topographical regions and discuss the features and economic activities in any of the regions.]

৫। ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনা কর এবং ইহা দ্বারা ঐ অঞ্চলের অর্থ নৈতিক কার্যাবলী কিরূপে প্রভাবিত হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা কর। উদাহরণ সহ উল্লেখ কর।

[Describe the natural environment of Gangetic valley of India and explain how it has influenced the economic activities in this region. Give illustrations.]

৬। ভারতের মধ্যবর্তী সমভূমিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী বিভক্ত কর এবং যে-কোন একটি অঞ্চলের অর্থ নৈতিক কার্যাবলী আলোচনা কর।

[Divide the Central Plain of India into natural regions and discuss the economic activities of any of those regions.]

৭। নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্ণনা কর এবং এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর ইহার প্রভাব আলোচনা কর।

[Describe the natural environment of the Lower Gangetic Plain and discuss its effects on the economic activities of this region.]

৮। ভারতের উত্তরে অবস্থিত হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the economic significance of the northern mountaineous region of India.]

৯। ভারতের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনের উপর (ক) ভূ-প্রকৃতি ও (খ) নদ-নদীর প্রভাব আলোচনা কর।

[Discuss the influence (a) Topography and (b) Rivers on the economic life of the People of India.]

[H. S. Council : Specimen Question, 1981]

১০। ভারতের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য লিখ। ভারতকে জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ কর এবং প্রত্যেক বিভাগের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ এবং প্রধান কৃষিজাত পণ্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Point out the features of Indian climate. Divide India into climatic belts and discuss the natural vegetation and principal agricultural crops of each regien.] [W. B. C. H. S. Exam. 1981]

১১। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তিনটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়া জলবায়ু কিভাবে মানুষের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহা আলোচনা কর।

[Discuss how climate influences the economic activities of man with the help of three examples from different parts of India.]

১২। ভারতের অর্থনীতিতে মৌসুমী-বায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর।

[Discuss the significance of the Monsoon climate in Indian economy.]

১৩। ভারতকে বৃষ্টিপাত অঞ্চলে বিভক্ত কর এবং প্রতিটি অঞ্চলের কৃষিকার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

[Divide India into rainfall regions and describe the agricultural products of each region.]

১৪। পাঞ্জাব সমভূমি ও নিম্ন-গাঙ্গেয় সমভূমির তুলনামূলক আলোচনা কর। ইহাদের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরিত্য দেখাও।

[Draw a comparison between the Punjab Plain and the Lower Gangetic Plain. Point out the contrasting features of their economic activities.]

১৫। ভারতের উপকূলবর্তী সমভূমির ভূ-প্রকৃতি ও অর্থনৈতিক পরিবেশ আলোচনা কর।

[Discuss the topography and the economic environment of the Coastal Plains of India]

৩ | কৃষিকার্য
(Agriculture)

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব সর্বাধিক। এই দেশের মোট জনসমষ্টির শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৪৪ ভাগ কৃষি ও ইহার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র হইতেই উপার্জিত হয়। ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, পেট্রো-ক্যামিক্যাল ইত্যাদি কয়েকটি ভারী শিল্প বাদ দিলে সর্জন শিল্পের এক বিরাট অংশই ইহাদের কাঁচামালের যোগানের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। যেমন :—তুলা, পাট, ইক্ষু ইত্যাদি। ভারতের আভ্যন্তরীণ বৈদেশিক বাণিজ্যেও কৃষি পণ্যের গুরুত্ব কম নহে। দেশের অভ্যন্তরে রাজপথ, রেলপথ ও জলপথে বাহিত পণ্যের মধ্যে কৃষিজ পণ্যের পরিমাণ সর্বাধিক। অধিকন্তু এই সকল আনুষঙ্গিক কার্যে জননিয়োগের সংখ্যাও ন্যূন নহে। ভারত হইতে প্রতি বৎসর বিদেশে প্রচুর পরিমাণে পাট, তুলা, চা, কফি, তৈল-বীজ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। রপ্তানি পণ্যের মূল্য হিসাবে পাটের পরেই চায়ের স্থান। সুতরাং ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির খাদ্য, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের কাঁচামাল এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সহায়ক বহু পণ্য ইত্যাদি ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র হইতে পাওয়া যায় বলিয়া কৃষিকেই ভারতীয় অর্থনীতির মূল বনিয়াদ বলা যায়।

ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ সফল কৃষিকার্য পরিচালনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কৃষির প্রধান প্রয়োজন উর্বর সমভূমি, পর্যাপ্ত বৃষ্টির জল বা সেচের জল, প্রচুর সূর্যালোক এবং দক্ষ কৃষক। ভারতের মধ্যবর্তী সমভূমি, দাক্ষিণাত্যের উপকূলভাগ ও মহানদী, কৃষ্ণা, গোদাবরী, কাবেরী প্রভৃতি নদী ব-দ্বীপ অঞ্চলগুলি পলিগঠিত সমভূমি। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কৃষিকার্যের পক্ষে সহায়ক। অধিকন্তু প্রচুর জল বহনকারী নদী হইতে সহজ ও সুলভ সেচের ব্যবস্থা গড়িয়া তোলারও বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। সারা বৎসর উজ্জ্বল সূর্যালোক এই দেশের কৃষির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে কৃষিকার্যে লিপ্ত। ফলে তাহারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের কৃষকদের তুলনায় কম দক্ষ নহে। অবশ্য বর্তমান যান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতির জ্ঞান তাহাদের কম। সর্বোপরি ভারতের বিরাট আয়তন ও বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি এই দেশের বিভিন্ন অংশে জলবায়ুর আপাত তারতম্যের কারণ। আবার ইহার ফলেই ভারতে নানা প্রকার কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতে কৃষিকার্যের গুরুত্ব আলোচনা কর। (২) ভারতে কৃষিকার্যের অনুকূল অবস্থাগুলি কি কি ?]

ভূমির ব্যবহার ও কৃষির বর্তমান অবস্থা (Land use and Present condition of Agriculture)

ভারতের মোট আয়তন ৩২ কোটি ৮৮ লক্ষ হেক্টর। ইহার মধ্যে কৃষিকার্যে নিয়োজিত ভূমির পরিমাণ ১৪ কোটি ২৯ লক্ষ হেক্টর বা মোট ভূমিভাগের শতকরা প্রায় ৪৬'৮ ভাগ। স্বাধীনতা লাভের পূর্ববর্তী সময়ে মোট কৃষিজমির পরিমাণ ছিল মোট ভূভাগের মাত্র ৩৩%। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর যুগে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকন্তু পূর্বে একাধিকবার ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণও নিতান্ত নগণ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে ভারতে ভূমির ব্যবহার সম্পর্কিত একটি সারণী দেওয়া হইল।

ভারতে ভূমির ব্যবহার (কোটি হেক্টর)

	আয়তন ১৯৫০-৫১	শতাংশ	আয়তন ১৯৮১-৮২	শতাংশ
মোট ভৌগোলিক আয়তন	৩২'৬৮	১০০	৩২'৮৮	১০০
প্রাপ্ত তিসাবানুযায়ী ব্যবহার	২৮'৪৩	৮৭'০	৩০'৪৭	৯২'৭
১. বনভূমি	৪'০৫	১২'৩	৬'৭৪	২২'১
২. কৃষিকার্যে ব্যবহৃত নহে	৪'৭৫	১৩'৬	৩'৯৩	১৩'১
৩. পতিত ব্যতীত অনাবাদী	৪'১৫	১২'৭	৩'৩১	১০'৮
৪. পতিত	২'৮১	৮'৬	২'২০	৭'২
৫. নীট কৃষিজমি	১১'৮৭	৩৬'৩	১৪'২৯	৪৬'৮
৬. একাধিকবার কর্ষিত জমি	১'৩২	৪'০	৩'২২	১০'৫
৭. মোট কর্ষিত জমি (৫+৬)	১৩'১৯	৪০'৩	১৭'৫১	৫৭'৩

[Source : India, 1982]

কৃষিকার্যে নিয়োজিত ভূমির পরিমাণ হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পরেই ভারতের স্থান। ভারতের কৃষি ব্যবস্থা এখনও দেশের সর্বাধিক জনসমষ্টির জীবন ধারণের উপায় মাত্র। অর্থাৎ ভারতীয় কৃষি আজিও জীবিকা সত্তাভিত্তিক। বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থার প্রসার তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। এই কারণে কৃষিকার্যে প্রযুক্ত ভূমির প্রায় শতকরা ৮২ ভাগ ভূমি খাদ্যশস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং মাত্র ১৮ ভাগ ভূমিতে বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদিত হয়। ভারতে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান :—

কৃষিজাত পণ্য

ভক্ষ্য ফসল

খাদ্যশস্য—ধান, গম, যব, জোয়ার, ভুট্টা, বাজরা, রাই, সয়াবীন, ছোলা, ডালকলাই ইত্যাদি।

পানীয় ফসল—চা, কফি ইত্যাদি।

অন্যান্য ফসল—আলু, কলা, আনারস, আঙ্গুর, আপেল, আম, নারিকেল ইত্যাদি।

শিল্প ফসল

তন্তু ফসল—তুলা, পাট, শন, মেস্তা ইত্যাদি।

অন্যান্য ফসল—রবার, চীনাবাদাম, তিল, তিসি, রেড়ী প্রভৃতি তৈলবীজ, ইক্ষু, তামাক, সিঙ্কোনা, মসলা, আফিং, লাক্ষা ইত্যাদি।

ভারতের ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্যই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভারত ইক্ষু, চিনাবাদাম, লাক্ষা ও মেস্তা উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম, ধান ও চা উৎপাদনে ভারত চীনের পরেই দ্বিতীয় এবং পাট উৎপাদনে বাংলাদেশের পরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইহা ছাড়া তুলা, গম, তামাক, জোয়ার, কফি প্রভৃতি উৎপাদনেও ভারত পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

ভারতের কৃষি ব্যবস্থা ইংরেজ আমল হইতেই বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হয়। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় দেশের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কমই হইত। প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত এবং অনাহারে প্রচুর লোক প্রাণ হারাইত। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি আবশ্যিক দিক ছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় সবিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অধিক ফলনশীল ও উন্নত বীজবপন, সার প্রয়োগ, সেচের সুবন্দোবস্ত ইত্যাদির ফলে ভারতীয় কৃষিতে যে সবুজ বিপ্লব ঘটিয়াছে উহা ভারতের বৈষয়িক উন্নতির নতুন যুগের সূচনা করে। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পাইলেও জনসংখ্যার চাপ অতিরিক্ত মাত্রায় থাকিবার ফলে আজিও ভারতে খাদ্য ঘাটতি দেখা যায়; এবং ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে মোট উৎপাদিত দানাশস্যের (খাদ্যশস্য) পরিমাণ ছিল প্রায় ৪·৫৮ কোটি মেট্রিক টন; ১৯৮৩-৮৪ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫·১ কোটি মেট্রিক টন। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় ধান এবং গমের উৎপাদনই সর্বাধিক ঘটিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ধান ও গমের উৎপাদন

যথাক্রমে ২২০ ও ৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন ছিল। কিন্তু ১৯৮৩-৮৪ সালে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে যথাক্রমে ৫·৯৭ ও ৪·২৭ কোটি মেট্রিক টন। অর্থাৎ বিগত প্রায় তিন দশকে ধানের উৎপাদন আড়াই গুণ এবং গমের উৎপাদন প্রায় সাত গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণও ঐ সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিয়োজিত ভূমির পরিমাণ ছিল মোট ৭·৮ কোটি হেক্টর এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৩ কোটি হেক্টর। কৃষিতে সার প্রয়োগ, বিশেষ করিয়া রাসায়নিক সার প্রয়োগ, ভারতে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বর্তমানে অ্যামোনিয়াম সালফেট, ফসফেট, ইউরিয়া, নাইট্রোজেন সার ইত্যাদির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে বর্তমানে একর প্রতি প্রায় ৭ কেজি সার প্রয়োগ করা হয়। পৃথিবীতে জাপানে একর প্রতি সর্বাধিক সার (১২৩ কেজি) প্রয়োগ করা হয়। ভারতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহারের ফলে ইতিমধ্যেই কৃষি পণ্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার জন্য সেচের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু বৃটিশ যুগে ভারতের মোট কৃষি-জমির মাত্র ৬ শতাংশ সেচের সুবিধাযুক্ত ছিল। বর্তমানে উহার পরিমাণ প্রায় ২৫ শতাংশ হইয়াছে। আশা করা যায় ভারত কৃষিতে আরও প্রভূত উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে এবং গতানুগতিক খাদ্য ঘাটতি এলাকার পরিবর্তে খাদ্যে স্বয়ম্ভর এলাকা রূপেই ভারত আগামী দিনের পৃথিবীর মানচিত্রে চিহ্নিত হইবে।

[প্রশ্ন: (১) ভারতের ভৌগোলিক আয়তন উল্লেখ কর। উহার কত শতাংশ বর্তমানে কৃষিকার্যে নিয়োজিত? (২) ভারতে একাধিক বার ফসল উৎপাদক জমির পরিমাণ কত? (৩) বৃটিশ যুগে ভারতীয় কৃষির অবস্থা কিরূপ ছিল? (৪) স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে ভারতীয় কৃষির উন্নতির বিষয় সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। (৫) শ্রেণী ভাগ করিয়া ভারতে উৎপাদিত কৃষি ফসলগুলির নাম উল্লেখ কর। কোন্ কোন্ ফসল উৎপাদনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে?]

মৃত্তিকা (Soil)

ভারত একটি বিরাট দেশ। বিচিত্র ইহার ভূ-প্রকৃতি। পার্বত্য অঞ্চল, সমভূমি, মালভূমি ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী মৃত্তিকাও বিভিন্ন প্রকার দেখা যায়। কৃষিকার্যের পক্ষে মৃত্তিকা অপরিহার্য। ইহার গুণাগুণের উপর কৃষির সাফল্য নির্ভর করে অনেকাংশে। সুতরাং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মৃত্তিকার গঠন ইহার অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন জৈব ও রাসায়নিক পদার্থের ভিত্তিতে মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী ভারতের মৃত্তিকাকে প্রধান তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(ক) **পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকা**—পর্বতের বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি ও উর্বরতায় বৈচিত্র্য দেখা যায়। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে হিমরেখার ঠিক নিম্নাংশে কাঁকর ও বালুকামিশ্রিত ঈষৎ উর্বর এক প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহাকে হিমবাহ মৃত্তিকা (Glacial Soil) বলে। ইহার নিম্নাংশে ক্ষয়ীভূত পাথরের নুড়ি মিশ্রিত মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহাকে প্রস্তরবহুল মৃত্তিকা (Boulder Clay) বলে। প্রস্তরবহুল মৃত্তিকার নিম্নাংশে অম্লধর্মী পোডসল মৃত্তিকা দেখা যায়। এই অঞ্চলে প্রধানতঃ সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য জন্মে। পর্বতের ঢালে প্রায় সর্বত্র অবশিষ্ট মৃত্তিকা (Residual Soil) লক্ষ্য করা যায়। হিমালয় পর্বতের বিভিন্ন উচ্চতায় ও পর্বত গাত্রে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়।

(খ) **সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা**—ভারতের মধ্যবর্তী সমভূমি ও উপকূল ভাগের সমভূমি মূলত নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত। ইহাই ভারতের সর্ববৃহৎ মৃত্তিকা অঞ্চল। ইহার মোট আয়তন প্রায় ৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। সময়ের ব্যবধানে ও জলবায়ুর তারতম্যের ফলে ইহারও প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলের মৃত্তিকাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন পলিগঠিত মৃত্তিকা (Old Alluvium) ও নতুন পলিগঠিত মৃত্তিকা (New Alluvium)।

(১) **প্রাচীন পলিগঠিত মৃত্তিকা বা "ভাঙ্গর" ক্ষয়িত মৃত্তিকা**—ইহা সাধারণত নদী হইতে দূরে বা ৫০-৭০ মিটার উচ্চে পর্বতের সানুদেশে বা দুইটি উপত্যকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়। ইহা প্রাচীন এবং কিছুটা অনুর্বর। এই মৃত্তিকা গম, যব, আলু, ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি উৎপাদনের উপযোগী। পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ ও উত্তর বিহারের উচ্চতর অংশ এই মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত।

(২) **নতুন পলিগঠিত মৃত্তিকা বা "খাদর" বৃদ্ধিযুক্ত মৃত্তিকা**—ইহা নদী তীরবর্তী প্লাবন ভূমিতে দেখা যায়। ইহার রং ধূসর, হাল্কা বাদামী বা হরিদ্রাভ হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, [বঙ্গ], আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে নদী তীরবর্তীস্থানে এই মৃত্তিকা বিদ্যমান। দক্ষিণ ভারতে নর্মদা, তাপ্তী, গোদাবরী, কৃষ্ণা অববাহিকায় এই মৃত্তিকার রং অনেকটা কালো। ইহা অত্যন্ত উর্বর, ইহাতে পটাস জাতীয় সার থাকে। কিন্তু যবক্ষার, হিউমাস ও ফসফরাসের ভাগ কম থাকে। ইহা ধান, গম, তুলা, ইক্ষু, সুপারি, নারিকেল ইত্যাদি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

নতুন পলিমাটি সর্বত্র সমান নহে। বালি ও কর্দমের অনুপাত অনুযায়ী আবার ইহাকে বেলেমাটি, এঁটেল মাটি ও দোআঁশ মাটি এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বেলে-মাটি হাল্কা। ইহার জলধারণ ক্ষমতা কম। আলু, ফুটি, তরমুজ, শসা ইত্যাদি এই জমিতে ভাল জন্মে। এঁটেল মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশি। ইহা খুব উর্বর। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় এই প্রকার মৃত্তিকায় ধান, গম, যব, ভুট্টা, ইক্ষু প্রভৃতির ব্যাপক

চাষ হইয়া থাকে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এই মৃত্তিকাঞ্চলে রবিশস্যের চাষ ভাল হয়। দোআঁশ মাটি কাদা, বালি, পলি ও হিউমাস প্রধান। ইহা খুবই উর্বর। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার অঞ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকায় ইক্ষু, তুলা ও রবিশস্যের চাষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

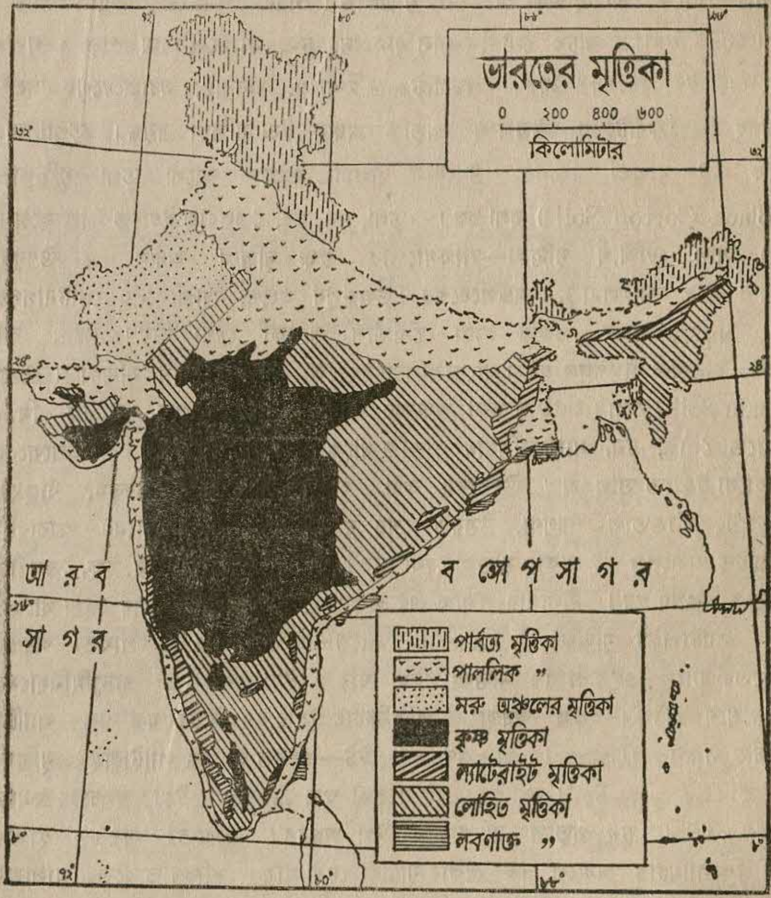

চিত্র ৩.১ : ভারতের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ।

মধ্যবর্তী সমভূমির পশ্চিমে, রাজস্থানের মরু অঞ্চলে লবণাক্ত ধূসর বালুকাময় মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ইহা অনুর্বর, ইহাতে জৈব পদার্থ প্রায় থাকে না। ইহাকে সিয়েরোজেম (Sierozem) বলে। কিন্তু সেচের সাহায্যে ঐ মৃত্তিকায় গম, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে স্থানে স্থানে লবণাক্ত বালুকাময় মৃত্তিকা বিদ্যমান। ইহা চাষের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী। কিন্তু এই মৃত্তিকায় সুপারি, তাল, নারিকেল প্রভৃতি গাছ জন্মে।

(গ) **মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা**—দক্ষিণ ভারতের মালভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। (১) কৃষ্ণ মৃত্তিকা—এই মালভূমির পশ্চিমদিকে লাভা গঠিত মৃত্তিকা বিদ্যমান। ইহাই ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মৃত্তিকা অঞ্চল। আয়তনে ইহা প্রায় তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গ কিলোমিটার। ইহার রং কালো বলিয়া ইহাকে কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা রেগুর মৃত্তিকাও (Black Soil or Regur Soil) বলা হয়। ইহাতে প্রচুর লৌহ, এ্যালুমিনিয়াম, চুন, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি পদার্থ থাকে। ইহা বিশেষ উর্বর। গুজরাটের দক্ষিণাংশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের অংশ-বিশেষ ও কর্ণাটকের উত্তরাংশ প্রভৃতি অঞ্চল কৃষ্ণ মৃত্তিকা সমৃদ্ধ। তুলাচাষের পক্ষে এই মৃত্তিকা বিশেষ উপযোগী বলিয়া ইহাকে কালো তুলা মৃত্তিকাও (Black Cotton Soil) বলা হয়। তুলা, গম, যব, তৈলবীজ ইহাতে ভাল জন্মে। (২) লাল দোআঁশ মৃত্তিকা—দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল ও উপকূল অঞ্চল বাদে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে, মধ্যপ্রদেশের ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় এই প্রকার হাল্কা দোআঁশ মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহার বর্ণ লাল, হরিদ্রাভ বা পিঙ্গল হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে লাল দোআঁশ মৃত্তিকা (Red Loam Soil) বলে। এই মৃত্তিকা অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৩ লক্ষ বর্গ কি. মি.। ইহাতে লৌহ, চুন, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি থাকে। বৃষ্টিপাতের ফলে বা জলসেচের সাহায্যে ইহাতে ভাল শস্য উৎপাদন করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম, বাঁকুড়া, বিহারের সাঁওতাল পরগণা, উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, রাজস্থানের আরাবল্লী সন্নিহিত অঞ্চলেও এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মৃত্তিকায় ভুট্টা, গম, ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। নীলগিরি অঞ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকায় কফির আবাদ হইয়া থাকে। (৩) ল্যাটারাইট মৃত্তিকা (Laterite Soil)—দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে পর্বতের ঢালে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা লৌহ ও এ্যালুমিনিয়ামের সংমিশ্রণে গঠিত। কিন্তু অম্লজানের প্রতিক্রিয়ায় ইহার বর্ণ ইটের মত লাল। ল্যাটিন ভাষায় ল্যাটার (Later) এর অর্থ লাল ইট—এইজন্য ইহাকে ল্যাটারাইট মৃত্তিকা মৃত্তিকা (Laterite Soil) বলা হয়। এই মৃত্তিকা সূক্ষ্ম ছিদ্রবহুল। ইহার জলধারণ ক্ষমতা নাই। পটাশ, চুন প্রভৃতি না থাকায় ইহা অনুর্বর। ভারতের প্রায় ৮০ হাজার বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে, পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতের ঢালে, ওড়িশা ও আসামের স্থানে স্থানে এবং বঙ্গের মেদিনীপুর অঞ্চলেও এই প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। জলসেচের সাহায্যে কিছু চাষ আবাদ এই অঞ্চলেও করা হয়। এই মৃত্তিকায় প্রধানত গম, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদি চাষ হয়।

[**প্রশ্ন** : (১) ভূ-প্রকৃতি অনুসারে ভারতে মৃত্তিকাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং উহারা কি কি ? (২) ভারতের সমভূমি অঞ্চলের বিবরণ লিখ। (৩) কোন্ কোন্ অঞ্চলে কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা যায় ? ইহার বৈশিষ্ট্য কি ?]

ভূমিক্ষয় (Soil Erosion)

ভূ-ত্বকের উপরের অংশ নানা প্রকার খনিজ ও জৈব পদার্থে সমৃদ্ধ থাকে। ফলে ইহা উর্বর। ভূ-ত্বকের এই উপরের অংশ নানা কারণে ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্রমাগত চাষ আবাদের ফলে জমির উর্বরতা শক্তির পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, জলস্রোত, মরুভূমির আগ্রাসন, সমুদ্র-নদী তরঙ্গ গোচারণ, বন-উৎসাদন প্রভৃতি কারণে ভূমির ক্ষয় ঘটে। ভারতে ভূমিক্ষয় একটি পুরাতন সমস্যা। উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্বতসংলগ্ন অঞ্চলে, দাক্ষিণাত্যের মধ্যভাগে, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের বহু অঞ্চলে ভূমিক্ষয় এক ভয়াবহ সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে।

ভারতে ভূমিক্ষয়ের কারণ প্রধানত তিনটি—বৃষ্টিপাতজনিত জলস্রোত, সমুদ্র ও নদী তরঙ্গ এবং মরুভূমির আগ্রাসন। জল দ্বারা ভূমিক্ষয় আবার তিন প্রকারে ঘটিয়া থাকে (১) অতি বৃষ্টির ফলে ভূমির উপরিভাগের ১-২ সে. মি. গভীর মৃত্তিকার স্তর ক্ষয়িত হয়। ইহাকে **সমপরিমাণ ক্ষয়** (Sheet Erosion) বলে। উত্তর বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলে এই প্রকার ভূমিক্ষয় ব্যাপক। (২) বৃষ্টির জল ভূমির ঢাল অনুযায়ী ছোট ছোট নালার সৃষ্টি করিয়া প্রচুর ভূমিক্ষয় করে। ইহাকে **নালা ক্ষয়** (Rill Erosion) বলে। বিহার, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে এই প্রকারে ভূমিক্ষয় ঘটে। (৩) বৃষ্টির জলবহনকারী ছোট নালা ক্রমে বড় আকার ধারণ করে ও আশে-পাশের প্রচুর ভূমিক্ষয় করে। ইহাকে **গালি ক্ষয়** (Gully Erosion) বলে। উত্তর-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের পূর্বাংশ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে গালি ক্ষয়ের ফলে প্রচুর ভূমি নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত পাঞ্জাব ও রাজস্থানের বহু অঞ্চলে **বায়ু তাড়িত ভূমিক্ষয়** (Wind Erosion) লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গ, আসাম, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে নদীর ভাঙ্গনে প্রতি বৎসর বহু জমি নষ্ট হয়। রাজস্থানের মরুভূমি ক্রমাগত প্রসার লাভ করিবার ফলেও প্রতি বৎসর বহু কৃষিজমি প্রায় ৬০-৭০ বর্গ কি. মি. স্থান মরু কবলিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ভারতের উপকূলভাগে সমুদ্র তরঙ্গ তাড়িত বালুকা প্রায়ই বহু চাষের জমি নষ্ট করে। পশ্চিম উপকূলেই ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতে অবিবেচনাপ্রসূত বন-উৎসাদন, পশুচারণ, আদিবাসীদের ঝুম-চাষ ও সাধারণভাবে অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদের ফলেও প্রতি বৎসর প্রচুর ভূমি ক্ষয় ঘটে।

[**প্রশ্ন** : (১) ভূমিক্ষয় কাহাকে বলে ? ইহার অপকারিতা কি ? (২) ভারতের কোন্ অঞ্চলে কি প্রকারের ভূমিক্ষয় হইয়া থাকে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।]

ভূমি সংরক্ষণ (Soil Conservation)

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতে ভূমিক্ষয় রোধ ও মৃত্তিকা সংরক্ষণের বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ছিল না। কোন কোন অঞ্চলে জমির মধ্যে আল নির্মাণ বা পর্বত-গাত্রে ধাপ কাটিয়া জলস্রোত নিয়ন্ত্রণ বা কাটা নালার সাহায্যে কিছু কিছু ভূমিক্ষয় রোধের ব্যবস্থা গৃহীত হইলেও প্রয়োজনের তুলনায় উহা নিতান্তই সামান্য ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ভূমিক্ষয় রোধ ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিষয়টি সরকারী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এই বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

১৯৫৩ সালে একটি **কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংস্থা** (Central Soil Conservation Board) গঠিত হয়। প্রতি রাজ্যেও মৃত্তিকার ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কে এক একটি সংস্থা (Land Utilisation and Soil Conservation Board) গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে UNESCO-এর সাহায্যে রাজস্থানের মরুভূমির প্রসার রোধ, বন রচনা ও ঐ অঞ্চলের মৃত্তিকা সম্পর্কে গবেষণার জন্য যোধপুরে একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। বিগত চারিটি পরিকল্পনাকালে ভারতে মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হইয়াছে।

(১) কেন্দ্রীয় সংস্থার মাধ্যমে মৃত্তিকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন পাশ করা হইয়াছে এবং জনসাধারণ বিশেষ করিয়া চাষী ভাইদের এই বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(২) জলস্রোত দ্বারা ভূমিক্ষয় রোধের জন্য ব্যাপকভাবে কনট্যুর, বাঁধ নির্মাণ, খাল সৃজন, প্রণালী পূরণ ও পর্বতাঞ্চলে ধাপ সৃজনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৩) পশ্চিম ভারতে বালিয়াড়ী অপসারণ, পূর্ব-ভারতের নদী-উপত্যকায় বন রচনা ও বনভূমিতে গোচারণ রোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মালাবার উপকূলে ৭২ কি. মি. সমোন্নত বাঁধ নির্মাণ দ্বারা সামুদ্রিক বন্যার হাত হইতে কৃষিজমি রক্ষার এক বিরাট পরিকল্পনা কার্যকর হইয়াছে।

(৪) নদীর করাল গ্রাস হইতে ভূমি ভাগ রক্ষার জন্য উন্নত ধরনের বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। মরুভূমির আগ্রাসন রোধের জন্য প্রতি বৎসর নতুন অরণ্য রচনা করা হইতেছে।

(৫) বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অন্তর্গত জলাধার সন্নিহিত অঞ্চলে নতুন অরণ্য বলয় রচনা দ্বারা তথাকার ভূমি সংরক্ষণের কার্যকরী ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৬) পশ্চিম অবহিমালয় অঞ্চলের দেরাদুনে, চম্বল ও যমুনা এলাকার কোটায়, গুজরাট ও কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলের বেলারীতে এবং ভাসাদে এবং নীলগিরি অঞ্চলের

উত্তকামণ্ডে স্থানীয় মৃত্তিকার ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য পাঁচটি আঞ্চলিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

(৭) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলা ও লবণাক্ত জমি পুনরুদ্ধার, শুষ্ক কৃষিপ্রথার প্রবর্তন, বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষয়ীভূত ভূমি ভাগের পুনরুদ্ধার ইত্যাদির সাহায্যে ভূমির ক্ষয় রোধ ও সংরক্ষণ করা হইতেছে।

(৮) নতুন অরণ্য রচনার ক্ষেত্রে 'বন মহোৎসব' একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। ইহার ফলে ভূমিক্ষয় যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে আশা করা যায়।

[**প্রশ্ন** : (১) কিরূপে মৃত্তিকা সংরক্ষণ করা সম্ভব ? (২) স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে তাহার বিবরণ দাও।]

ফসলের ঋতু (Cropping Season)

ভারতে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সহিত কৃষিকার্য অতি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত বলিয়া বৃষ্টিপাতের সহিত কৃষিকালকে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমনে অর্থাৎ বর্ষারম্ভে যে সকল ফসল বোনা হয় এবং হেমন্তে সংগ্রহ করা হয় উহাদিগকে **খারিফ শস্য** বলা হয়। ধান, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, পাট, তুলা ইক্ষু, তামাক, বাদাম, রেড়ী প্রভৃতি খারিফ শস্য। শীতের প্রারম্ভে বীজ বপন করিয়া গ্রীষ্মের প্রারম্ভে সংগ্রহ করা হয় এমন ফসলকে **রবিশস্য** বলা হয়। গম, যব, ছোলা, তৈলবীজ, অতসী প্রভৃতি রবিশস্য।

কৃষি পদ্ধতি (Methods of Farming)

ভারত আয়তনে বিরাট ও বিপুল। ইহার ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা সর্বত্র একপ্রকার নহে। সুতরাং ইহাদের বিভিন্নতা অনুসারে ভারতের বিভিন্ন অংশে কৃষি পদ্ধতির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য কৃষিপদ্ধতি প্রধানত বৃষ্টিনির্ভর বলিয়া ইহাকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। **আর্দ্র কৃষি**—ভারতের যে সকল অঞ্চলে ২০০ সে. মি. এর অধিক বৃষ্টিপাত হয় সে সকল অঞ্চলের কৃষি প্রথাকে আর্দ্র কৃষি বলে। এই সকল অঞ্চলে আর্দ্র কৃষি প্রথায় ধান, পাট, মেস্তা, ইক্ষু, চা প্রভৃতির চাষ হয়। ১০০-২০০ সে. মি. বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের কৃষি পদ্ধতিও প্রায় আর্দ্র কৃষি পদ্ধতির অনুরূপ। কেহ কেহ ইহাকে স্বল্পার্দ্র কৃষি পদ্ধতি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই পদ্ধতিতে ধান, পাট, ইক্ষু, কার্পাস, চা, ভুট্টা, তৈলবীজ প্রভৃতির চাষ করা হয়। **সেচন কৃষি**—ভারতের যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ সে. মি.-এর কম সে সকল অঞ্চলে জলসেচের সাহায্যে ধান, গম, কার্পাস, ইক্ষু, ভুট্টা প্রভৃতির চাষ করা হয়। **শুষ্ক কৃষি**—ভারতের যে সকল অঞ্চলে ৫০ সে. মি.-এর কম বৃষ্টিপাত সে সকল অঞ্চলে ঐ সামান্য বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিয়া শুষ্ক প্রথায় চাষ আবাদ করা হয়।

মিশ্র কৃষি—ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন অংশে বৎসরের এক সময়ে কৃষিকার্য ও অবশিষ্ট সময়ে পশুপালন দ্বারা কিছু সংখ্যক অধিবাসী জীবনধারণ করিয়া থাকে। এই প্রথাকে মিশ্র কৃষি বলে। ভারতে ইহা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। বর্তমানে ভারতের কৃষি ব্যবস্থায় প্রগাঢ় (Intensive) পদ্ধতিতে চাষের প্রবর্তন ঘটায় ভারতীয় কৃষি পদ্ধাততে ব্যাপক কৃষি (Extensive Agriculture) এবং প্রগাঢ় কৃষি (Intensive Agriculture) এই দুই ভাগেও ভাগ করা যায়। **কৃষি অঞ্চল**—ভারতের সকল অঞ্চল ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি কারণে কৃষির পক্ষে অনুকূল নহে। ভারতের **কৃষিপ্রধান অঞ্চল** বলিতে প্রধানত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি, পাঞ্জাব সমভূমি, মহানদী-গোদাবরী-কৃষ্ণা-কাবেরী ব-দ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর-প্রদেশ, বিহার, বঙ্গ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং আসাম ও মধ্য-প্রদেশের অংশবিশেষকে বুঝায়। বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, গভীর অরণ্য ইত্যাদি কারণে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে, রাজস্থানের মরুস্থলী, পশ্চিম উপকূলের কোন কোন স্থানে, মধ্যপ্রদেশে ও ওড়িশার স্থানে স্থানে কৃষিকার্য পরিচালনা প্রায় অসম্ভব। এই সকল অঞ্চলকে **কৃষিকার্যের অযোগ্য অঞ্চল** বলা যায়। এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী অবস্থাযুক্ত কোন কোন অঞ্চল দেখা যায় যেখানে বহু চেষ্টা ও যত্নের সহিত কিছু কিছু কৃষিকার্য পরিচালনা সম্ভব। ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য স্থানীয় রোগের প্রকোপযুক্ত ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশের অঞ্চলবিশেষ, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের অনুর্বর মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চল ও রাজস্থানের কিয়দংশে চেষ্টা, যত্ন ও বিশেষ পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করার সম্ভাবনা আছে।

জলসেচ (Irrigation)

জলসেচ ব্যবস্থা ও ইহার প্রয়োজনীয়তা—ভারত কৃষিনির্ভর দেশ। কৃষিকার্য জলের স্বাভাবিক ও নিয়মিত যোগানের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। সময়মত পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত বা কোন কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় জলের সরবরাহ কৃষির পক্ষে অপরিহার্য। ভারত মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে বৃষ্টিপাত স্থান, কাল ও পরিমাণের দিক হইতে খুবই অনিশ্চিত। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এদেশে বৃষ্টিপাতের জন্য মুখ্যত দায়ী। কিন্তু মৌসুমী বৃষ্টিপাত নানা বিষয়ে ত্রুটিবহুল।

প্রথমত, ভারতে মৌসুমী বায়ুর আগমন, স্থিতি ও নির্গমন কোনটিই নিয়মিত নহে। বরং মৌসুমী বায়ুর নির্দিষ্ট সময়ে আগমন, নির্দিষ্টকাল স্থিতি ও নির্দিষ্ট সময়ে নির্গমন অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, ভারতে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০৫ সে. মি. হইলেও এই বৃষ্টিপাতের প্রায় ৯০ শতাংশ বর্ষাকালের চার মাসেই ঘটিয়া থাকে। শীতকাল প্রায়

শুষ্ক থাকে। ইহাতে বর্ষাকালীন কৃষিকার্যের অর্থাৎ শস্যোৎপাদনের সুবিধা হইলেও শীতকালীন রবিশস্য উৎপাদনের জন্য জলের অভাব দেখা যায়। আবার বর্ষাকালীন অতিবৃষ্টি অনেক সময় ফসলের বিশেষ ক্ষতিও করে।

তৃতীয়ত, বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত ভারতের সর্বত্র সমানভাবে হয় না। কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও অনাবৃষ্টি। এদেশের মোট ভূ-ভাগের শতকরা প্রায় ১১ ভাগ অঞ্চলে ১৫০ সে. মি. এর বেশি, ৫৮ ভাগ অঞ্চলে ৭৫ সে. মি. এর কম বৃষ্টিপাত ঘটিয়া থাকে। রাজস্থানে ও পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ৫০ সে. মি. এর কম বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের এইরূপ অসংগতি কৃষির অন্তরায় নিঃসন্দেহে।

চতুর্থত, ধান, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য এককালীন অতি বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে নিয়মিত পরিমাণমত বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের মাত্র কয়েকটি অঞ্চল ব্যতিরেকে প্রায় সর্বত্র এই প্রকার বৃষ্টিপাত হয় না।

পঞ্চমত, এদেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এমনকি বর্ষাকালেও খারিফ শস্য উৎপাদনের অনুকূল বৃষ্টিপাত ঘটে না।

ষষ্ঠত, জলসেচের ফলে কৃষি উৎপাদন বহু গুণ বৃদ্ধি পায়।

সর্বশেষে, বৃষ্টিপাত প্রাকৃতিক কারণে ঘটে। ইহার উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ এখনও কার্যকর নহে। সুতরাং স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে জলের প্রয়োজন একমাত্র জলসেচের দ্বারা মিটানো সম্ভব।

উপরোক্ত কারণসমূহের জন্যই সারা বৎসর কৃষিকার্য পরিচালনার প্রয়োজনে ভারতে জলসেচ যেমন অপরিহার্য তেমনি ভারতীয় কৃষিতে ইহার গুরুত্বও সর্বাধিক।

ভারতে সম্ভাব্য জল সম্পদ—প্রতি বৎসর ভারতের নদীগুলি যে পরিমাণ জলবহন করে তাহার পরিমাণ প্রায় ১,৬৭,৩০০ হইতে ১,৮৮,১০০ কোটি ঘন মিটার এবং ভূগর্ভস্থ জল সম্পদেরও পরিমাণ প্রায় ৪২,৪০০ কোটি ঘন মিটার। ১৯৭২ সালে ভারতের জলসেচ কমিশন কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য সম্ভাব্য জল সম্পদের যে আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ভারতে বাৎসরিক প্রায় ৮৭,০০০ কোটি ঘন মিটার জলসেচের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু এদেশে ব্যবহৃত জল সম্পদের পরিমাণ ১৯৫০ সালে ছিল ১৭,২৫০ কোটি ঘন মিটার। ১৯৮০ সালে ব্যবহৃত জল সম্পদের পরিমাণ হয় ৩৪,৩০০ কোটি ঘন মিটার।

সেচ-ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সুবিধা—ভারতে জলসেচের বহুবিধ প্রাকৃতিক সুবিধা বিদ্যমান। উত্তর ভারতের প্রধান নদীগুলি ও ইহাদের উপনদীসমূহ হিমালয়ের উচ্চতর অংশ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় সারা বৎসর বরফ-গলা জলে পুষ্ট থাকে এবং বর্ষাকালেও ইহা প্রচুর বৃষ্টির জল বহন করে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি উচ্চ ভূ-ভাগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহারা বরফ-গলা জলে পুষ্ট নহে। কিন্তু বর্ষাকালে ইহারাও

প্রচুর বৃষ্টির জল বহন করে। ঐ জল বাঁধের সাহায্যে জলাধারে আটকাইয়া সারা বৎসর চাষের জন্য ব্যবহার করা চলে। ভারতের বিভিন্ন অংশে ভূ-ভাগ স্বাভাবিক ঢালযুক্ত সমতল বা প্রায় সমতল হওয়ায় সেচের প্রয়োজনে খাল-নালা খনন অপেক্ষাকৃত সহজ ও কম ব্যয়সাপেক্ষ। ভারতের সমভূমি অঞ্চল পলিগঠিত হওয়ায় পলি চুয়াইয়া জল ভূত্বকের নিম্নাংশে কর্দমাক্ত স্তরে জমা থাকে। প্রয়োজনমত কূপ খনন করিয়া বা পাম্পের সাহায্যে ঐ জল সেচের প্রয়োজনে ব্যবহার সহজ ও সুলভ। ভারতে বৃষ্টিপাত ত্রুটিবহুল হইলেও সেচের এই সকল সুবিধার জন্য ভারত বিশ্বে কৃষিতে সেচ-ব্যবস্থা গ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতীয় কৃষিতে জলসেচের গুরুত্ব আলোচনা কর। (২) ভারতের জল সম্পদ ও উহা সেচকার্যে ব্যবহারের সুবিধাগুলি বর্ণনা কর।]

জলসেচ পদ্ধতি—ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-প্রকৃতির বিভিন্নতা ও সেচের জলের সুবিধা অনুযায়ী নিম্নলিখিত চারি প্রকার সেচ পদ্ধতি দেখা যায়—(১) ইঁদারা, (২) পুষ্করিণী বা জলাশয়, (৩) নলকূপ ও (৪) খাল। উত্তর ভারতে ইঁদারা, নলকূপ ও খালের সাহায্যেই প্রধানত জলসেচ করা হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতে সেচ-ব্যবস্থায় পুষ্করিণী ও খালের ব্যাপক ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

(১) **ইঁদারা**—উত্তর ভারতের পলিগঠিত সমভূমির অভ্যন্তরে কর্দমস্তরে প্রচুর জল সঞ্চিত থাকে। এই কারণে অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই অঞ্চলে ইঁদারা খনন করিয়া জলসেচ করা একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি হিসাবেই চলিয়া আসিতেছে। ভূত্বকের ১৫ হইতে ২০ মিটারের মধ্যেই সাধারণত জল পাওয়া যায়। উত্তরপ্রদেশের কোথাও কোথাও মোগল আমলের ৩০-৪০ মিটার গভীর ইঁদারা দেখা যায়। গো-বাহিত যন্ত্র বা কপিকলের সাহায্যে জল তোলা হয়। স্বল্প ব্যয়ে ইঁদারা খনন সম্ভব। বর্তমানে নলকূপের প্রচলন হওয়াতে ইঁদারার ব্যবহার অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। তথাপি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের অভ্যন্তরভাগে সেচের কার্যে এখনও ইঁদারার ব্যবহার দেখা যায়।

(২) **পুষ্করিণী বা জলাশয়**—ভূ-প্রাকৃতিক কারণে দক্ষিণ ভারতের বহু অঞ্চলে কূপ খননের সুবিধা না থাকায় কৃষিক্ষেত্রের অভ্যন্তরে বিরাট বিরাট জলাশয় খনন করিয়া বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় এবং বৃষ্টিহীন শুষ্ক সময়ে ঐ জলাশয় হইতে জলসেচ করা হয়। ছোট ছোট নালা কাটিয়া তাল গাছের ডোঙ্গা, টিনের ডোঙ্গা বা সেঁচুনির সাহায্যে জলসেচ করা হয়। এই প্রকার সেচ-ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা এই যে, গ্রীষ্মের খরতাপে অনেক জলাশয় শুকাইয়া যায়। আবার কয়েক বৎসর অন্তর এই সকল জলাশয় সংস্কার না করিলে এইগুলি মজিয়া যায় ও ইহাদের জলধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের বৃষ্টিবিরল অঞ্চলে বিহার ও ওড়িশার স্থানে স্থানে

এই প্রকার জল সেচ-ব্যবস্থা দেখা যায়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে পুষ্করিণী বা জলাশয়ের সাহায্যে প্রায় ৩৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হইত। ১৯৮০-৮১ সালে প্রায় ৪৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলাশয় হইতে জলসেচ করা হয়। খাল, বিল, নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে নানাভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবৎসর আরও প্রায় ২৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়।

(৩) **নলকূপ**—ভারতে নলকূপের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। ভূ-ত্বকের গভীরে যে জলসঞ্চিত হয় উহা নলকূপের সাহায্যে তুলিয়া কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। নলকূপ সাধারণত ৫০-৭০ মিটারের বেশি গভীর হয় না। এবং হস্তচালিত পাম্পের সাহায্যেই জল তোলা হয়। কিন্তু বর্তমানে সেচের প্রয়োজনে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে অগভীর নলকূপ (Shallow Tubewell) বা চলতি কথায় Shallow ও গভীর নলকূপ খনন করিয়া (Deep Tubewell) পাম্পের সাহায্যে সেচের জল তোলার ব্যাপক ব্যবস্থা হইয়াছে। অগভীর নলকূপ সাধারণত ব্যক্তিগত মালিকানায় কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে বসান হয়। গভীর নলকূপ সরকারী পরিচালনায় থাকে এবং উহার সাহায্যে নিকটবর্তী ২৫০-৩০০ একর পরিমিত জমিতে জলসেচ করা হয়। ইহার জন্য জমির মালিককে নিয়মিত জলকর দিতে হয়। এই প্রকার সেচ-ব্যবস্থা প্রধানত পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, দক্ষিণ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে (বঙ্গে) বহুল প্রচলিত। মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর অঞ্চলবিশেষেও এই ব্যবস্থা দেখা যায়। ১৯৫০-৫১ সালে নলকূপ দ্বারা প্রায় ৬৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হইত। ১৯৮০-৮১ সালে ঐ প্রকার সেচযুক্ত জমির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১·২৮ কোটি হেক্টর।

কূপের সাহায্যে জলসেচ সুবিধাজনক ও কম ব্যয় সাপেক্ষ হইলেও ইহার কতকগুলি অসুবিধা রহিয়াছে, যেমন—(১) কূপের সাহায্যে জলসেচ স্বল্প পরিসর জমিতে সম্ভব। বহুদূর বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে কূপের সাহায্যে জলসেচ সম্ভব নহে। (২) কূপের জলে সাধারণত লবণের ভাগ বেশি থাকে। সুতরাং দীর্ঘকাল এই জলসেচের ফলে জমি লোনা হয় ও ইহার উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়। (৩) গ্রীষ্মকালে বহু কূপ শুকাইয়া যায়। (৪) কূপের সাহায্যে ক্রমাগত জল তুলিলে ভূ-অভ্যন্তরস্থ জলসীমা ক্রমেই নামিয়া যায়। ইহার ফলে জলাভাবে ধীরে ধীরে বৃক্ষরাজি মরিয়া যায় ও জমি উষর হয়। অধিকন্তু, ভূ-ভাগের স্বাভাবিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃষ্টিপাতও হ্রাস পায়।

(৪) **খাল**—খালের সাহায্যে জলসেচ সকল দেশেই বিশেষ সুবিধাজনক। কারণ দীর্ঘ খালের সাহায্যে জলসেচ অতি প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল। উত্তর ভারতের পূর্ব যমুনা খাল মোগল বাদশাহ শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে খনন করা হয়। নদীর সহিত যুক্ত খালকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—যেমন (ক) প্লাবন খাল ও (খ) নিত্যবহ খাল।

(ক) **প্লাবন খাল**—যে সকল খালে সারা বৎসর সেচের উপযোগী জল থাকে না, কেবল কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রচুর জল পাওয়া যায় ঐগুলিকে প্লাবন খাল বলা হয়। কোন কোন নদীতে একমাত্র বর্ষাকালেই প্রচুর জল বৃদ্ধি পায়, ফলে অতিরিক্ত জল খাল পথে কৃষিক্ষেত্রে নামিয়া আসে। গ্রীষ্ম বা শীতের সময়ে ঐ সকল নদীতে জল

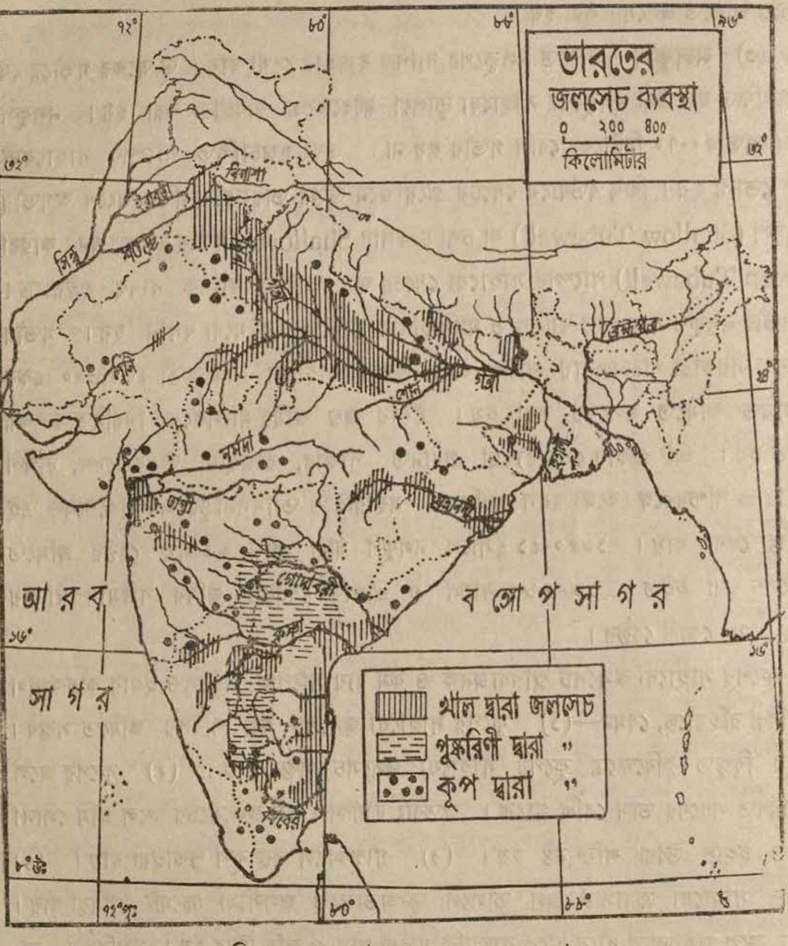

চিত্র ৩.২ : ভারতের জলসেচ ব্যবস্থা।

কম থাকে বলিয়া খালগুলি প্রায়ই শুষ্ক থাকে এবং উহা হইতে জলসেচ সম্ভব হয় না। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি বর্ষাপুষ্ট বলিয়া নদীর উচ্চতর অংশ হইতে প্রসারিত খালগুলির বেশির ভাগই প্লাবন খাল। বর্তমানে নদীতে বাঁধ দিয়া বিরাট জলাধার সৃষ্টি করিয়া বহু প্লাবন খালকে নিত্যবহ খালে পরিণত করা হইয়াছে।

(খ) **নিত্যবহ খাল**—নদীর সহিত যুক্ত যে সকল খালে সারা বৎসরই সেচের

উপযোগী কম-বেশি জল পাওয়া যায় ঐগুলিকে নিত্যবহ খাল বলে। উত্তর ভারতের প্রধান নদীগুলি বরফ-গলা জলে পুষ্ট বলিয়া সারা বৎসরই কম-বেশি জল থাকে। যদিও বর্ষাকালেই জলস্ফীতি ঘটে, তথাপি বৎসরের অন্যান্য সময়ও সেচের জন্য জল পাওয়া যায়।

নদীর সহিত যুক্ত খালের সাহায্যে ভারতে সর্বাধিক পরিমাণ কৃষিজমিতে জলসেচ করা হয়। ভারতে বৃটিশ যুগের পূর্ব হইতে এই প্রকার সেচ-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই প্রকার সেচ-ব্যবস্থা উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রধানত উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চলে সর্বাধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমানে বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার প্রসার ঘটিয়াছে।

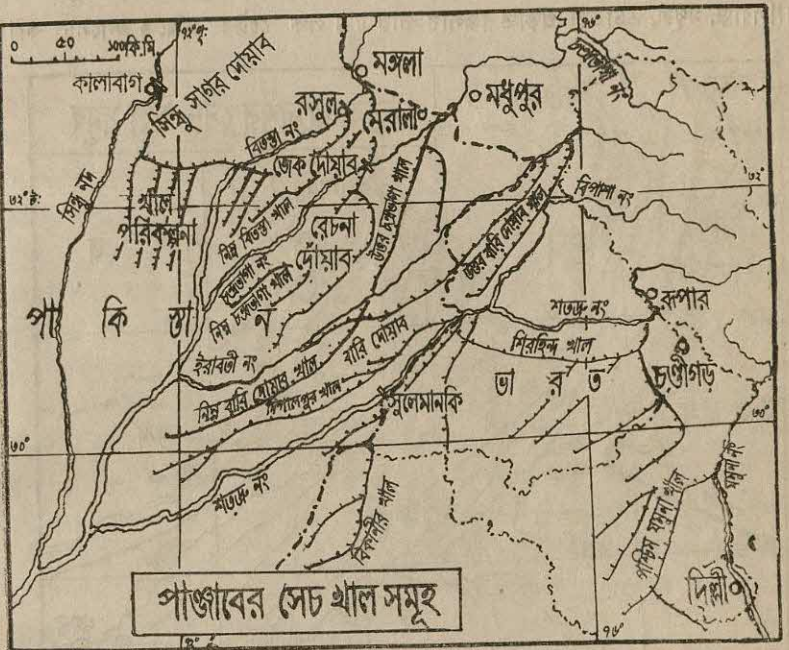

চিত্র ৩.৩: পাঞ্জাবের প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ সেচখাল।
ইহার ব্যবহার ক্রমবর্ধমান।

পুরাতন সেচ খাল—পুরাতন সেচ খালের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির সংস্কার করা হইয়াছে এবং এখনও প্রভূত পরিমাণে সেচের জন্য ব্যবহার করা হইতেছে। (১) **পাঞ্জাব রাজ্যে** (ক) **শিরহিন্দ খাল** মোগল যুগে শতদ্রু নদী হইতে রূপারের নিকট ইহা খনন করা হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য মোট ২,১৬৫ কি.মি.। ইহার সাহায্যে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের প্রায় ৫.৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়। সেচপ্রাপ্ত এলাকার

মধ্যে লুধিয়ানা, হিসার, নাভা, ফিরোজপুর প্রভৃতি জিলা উল্লেখযোগ্য। (খ) **পশ্চিম যমুনা খাল**—দিল্লীর নিকট যমুনা নদীর পশ্চিম তীর হইতে ইহা খনন করা হয়। ইহার দৈর্ঘ্য সর্বমোট প্রায় ৩,০৬০ কি. মি.। ইহার সাহায্যে রোটক, হিসার, পাতিয়ালা, ঝিন্দ প্রভৃতি এলাকায় প্রায় ৩·৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়। (গ) **উচ্চ বারিদোয়াব খাল**—ইরাবতী নদী হইতে মধুপুরের নিকট এই খালটি কাটা হয়। ইহার সাহায্যে ইরাবতী ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে অমৃতসর ও গুরুদাসপুর জিলায় প্রায় ৩·৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়।

(২) **উত্তরপ্রদেশ**—(ক) **উচ্চগঙ্গা খাল**—হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা নদী হইতে এই খালটি কাটা হয়। ইহার সাহায্যে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর, মজঃফরপুর, মীরাট, বুলন্দশর, আলিবাড়, মথুরা, এটাওয়া প্রভৃতি জিলায় প্রায় ৪·৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা

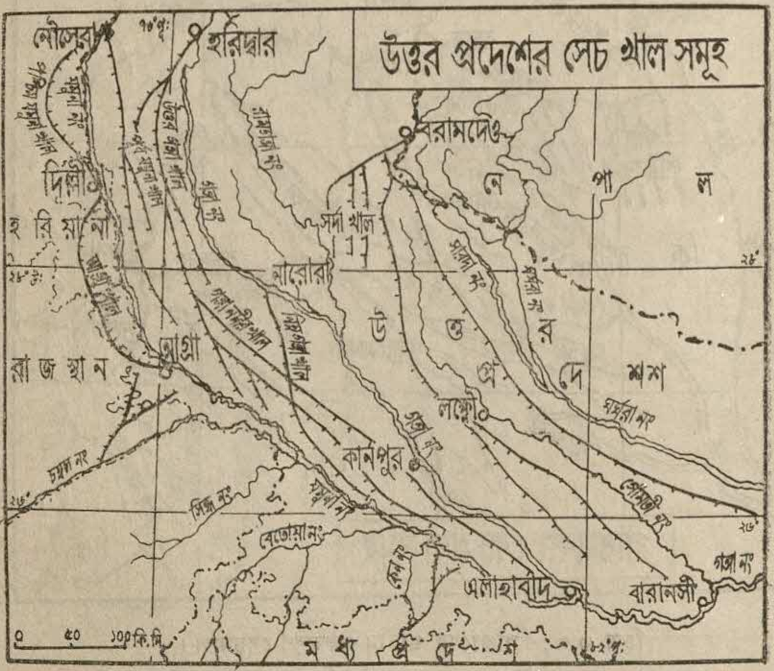

চিত্র ৩.৪ : উত্তর প্রদেশের প্রাচীন গুরুত্বপূর্ণ সেচখাল।
ইহার ব্যবহার ক্রমবর্ধমান।

হয়। (খ) **নিম্নগঙ্গা খাল**—বুলন্দশর জিলার নারোয়ার নিকট গঙ্গা নদী হইতে এই খালটি কাটা হয়। ইহার সাহায্যে এটাওয়া, আলিগড়, মৈনপুরী, কানপুর, ফতেপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ৪·৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়। (গ) **সারদা খাল**—নেপাল সীমান্তে বনবাসার নিকট সারদা নদী হইতে এই খাল কাটা হয়। এই খালের জল

দ্বারা হরদোই, পিলভিত, এলাহাবাদ, সাজাহানপুর, খেয়া, সীতাপুর প্রভৃতি জিলায় প্রায় ৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়। (ঘ) **পূর্ব যমুনা খাল**—ফৈজাবাদের নিকট যমুনা নদী হইতে এই খাল কাটা হয়। সাহারানপুর, মজঃফরপুর, মীরাট প্রভৃতি এলাকার প্রায় ১.২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ইহার সাহায্যে জলসেচ করা হয়। (ঙ) **আগ্রা খাল**—দিল্লীর নিকট ওখলা নামক স্থানে যমুনা নদী হইতে এই খালটি কাটা হয়। ইহার সাহায্যে দিল্লী, পাঞ্জাবের গুরগাঁও, উত্তরপ্রদেশের মথুরা, আগ্রা প্রভৃতি এলাকার প্রায় ১.৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা হয়।

উত্তরপ্রদেশে এই পাঁচটি প্রধান খাল ব্যতীত যমুনা নদীর বিভিন্ন শাখানদী হইতে **বেতোয়া খাল, কান খাল, ধাসান খাল** কাটিয়া বিস্তৃত এলাকায় সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শতদ্রু নদী হইতে প্রসারিত **গাংগাল রাজস্থানের** বিস্তীর্ণ ঊষর ভূমিকে (গঙ্গানগর) শস্যশ্যামল করিয়াছে। বর্তমানে আর একটি খাল (**রাজস্থান খাল**) খনন করা হইতেছে। এই খালের কার্য সমাপ্ত হইলে রাজস্থানের মরুস্থলীর নিকটবর্তী জয়শলমীর পর্যন্ত বিরাট ভূভাগ সোনালী ফসলের অপূর্ব সমারোহে ভরিয়া উঠিবে। **পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর খাল, দামোদর খাল, ইডেন খাল, বক্রেশ্বর খাল, ময়ূরাক্ষী খাল, ওড়িশার মহানদী খাল, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের পেরিয়ার খাল, কুর্নুল-কুডাপ্পা খাল, গোদাবরী ব-দ্বীপ খাল ও পৈনী-পালার ও সৈয়ার খাল, কৃষ্ণা ব-দ্বীপ খাল, বার্কিংহাম খাল** ইত্যাদি ঐ সকল অঞ্চলে সেচের দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে বৃটিশ যুগে মোট কৃষি জমির শতকরা মাত্র ৬ ভাগ জমিতে জলসেচ করা হইত। কিন্তু বর্তমানে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ ভাগ হইয়াছে। ইহার কারণ স্বাধীনতা উত্তর যুগে শুধু পুরাতন খালগুলির সংস্কার করা হয় নাই, অধিকন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে অসংখ্য সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ ও রূপায়ণ করা হইয়াছে। ইহাতে সেচের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। সেচ ও অন্যান্য কার্যের সহায়ক উল্লেখযোগ্য নদী পরিকল্পনা হিসাবে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি উল্লেখযোগ্য :

সেচ-প্রকল্পের নাম	নদীর নাম	উপকৃত অঞ্চল
১। ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা	শতদ্রু	হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা পাঞ্জাব, দিল্লী।
২। বিয়াস পরিকল্পনা	বিপাশা	পাঞ্জাব, হরিয়ানা।
৩। গণ্ডক পরিকল্পনা	গণ্ডক	রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার।
৪। সার্দা সহায়ক প্রকল্প	ঘাঘর	উত্তরপ্রদেশ।
৫। রামগঙ্গা প্রকল্প	রামগঙ্গা	উত্তরপ্রদেশ।

সেচ-প্রকল্পের নাম	নদীর নাম	উপকৃত অঞ্চল
৬। কোশী প্রকল্প	কোশী	বিহার।
৭। দামোদর প্রকল্প	দামোদর	পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার।
৮। ময়ূরাক্ষী প্রকল্প	ময়ূরাক্ষী	পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার।
৯। কংসাবতী প্রকল্প	কংসাবতী ও কুমারী	পশ্চিমবঙ্গ।
১০। হীরাকুঁদ ও মহানদী ব-দ্বীপ প্রকল্প	মহানদী	ওড়িশা।
১১। নাগার্জুন সাগর প্রকল্প	কৃষ্ণা	অন্ধ্রপ্রদেশ।
১২। তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প	তুঙ্গভদ্রা	অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক।
১৩। কাকড়াপাড়া প্রকল্প	তাপ্তী	গুজরাট।
১৪। ঘটপ্রভা ও মালপ্রভা প্রকল্প	ঘটপ্রভা ও মালপ্রভা	কর্ণাটক।
১৫। চম্বল প্রকল্প	চম্বল	মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান।
১৬। তাওয়া প্রকল্প	তাওয়া	মধ্যপ্রদেশ।

১৯৫১ সালে ভারতে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ৯৭ লক্ষ হেক্টর। মোট চাষের জমির তুলনায় ইহা অতি নগণ্য। ১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে সেচের প্রভূত অগ্রগতি ঘটিয়াছে। পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্র বৃহৎ ৬৯০টি সেচ-প্রকল্পের মধ্যে ৪২১টি প্রায় বা আংশিকভাবে সম্পূর্ণ হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সেচ-প্রকল্পে মোট ৯,৫০০ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। নিম্নের সারণীতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভারতে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ও সম্ভাবনা দেখানো হইল।

ভারতে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ও সম্ভাবনা (কোটি হেক্টর)

	১৯৫০-৫১	১৯৭০-৭১	১৯৮০-৮১
খাল (নদী প্রকল্প)	০·৯৭	১·২৫	২·৮২
কূপ ও নলকূপ	০·৬৩	১·১৮	৩·০০
পুষ্করিণী	০·৩৬	০·৪৫	
অন্যান্য	০·৩০	০·২৪	
মোট	২·২৬	৩·১২	৫·৮৮
সম্ভাবনা	৮·২০	৮·২০	৮·২০

[প্রশ্ন : (১) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত জলসেচ পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিখ। (২) নিত্যবহ খাল কাহাকে বলে ? (৩) জলাশয় বা পুষ্করিণী হইতে জলসেচ ভারতের কোন্ অঞ্চলে অধিক হইয়া থাকে ? কোন্ কোন্ নদী অবলম্বন করিয়া নাগার্জুন সাগর ও কাকড়াপাড়া প্রকল্প রচিত হইয়াছে ?]

ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা ও খাদ্য-সমস্যা

ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান: ভারতীয় অর্থনীতি মূলত কৃষি অর্থনীতি। ভারতের কৃষি ব্যবস্থা বিশ্বের প্রাচীনতম কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম। তথাপি ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা আজিও অনুন্নত, অনগ্রসর এবং গতানুগতিক অবৈজ্ঞানিক সংস্কার দ্বারা আবদ্ধ। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী যুগে বিশেষ করিয়া বিগত দুই দশকে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের কৃষি ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির জন্য নানাবিধ কার্যকরী পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই স্বল্প সময়ে কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হইলেও আশানুরূপ ফললাভ এখনও সময়-সাপেক্ষ। ভারতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষির গুরুত্ব যে সর্বাধিক ইহা বলাই বাহুল্য। ইহা ছাড়া ভারতের বৃহৎ শিল্পগুলির অন্যতম কার্পাস বয়ন শিল্প, পাট শিল্প, শর্করা শিল্প প্রভৃতি ইহাদের কাঁচামালের জন্য একান্তভাবে কৃষি-নির্ভর। বিশ্বের বাজারে ভারতীয় কোন কোন কৃষিপণ্যের চাহিদা নিতান্ত কম নহে। আবার বহু কৃষিপণ্য-নির্ভর শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সকল কারণে ভারতীয় কৃষির সমস্যাবলীর সমাধান আবশ্যক।

ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার সমস্যাগুলি নিম্নরূপ:

(১) **প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা**: প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় কৃষি মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। দেশের সর্বত্র সারা বৎসর সমভাবে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ভারতে কৃষিকার্য পরিচালনা খুবই আয়াসসাধ্য। অধিকন্তু কোথাও অনাবৃষ্টি এবং কোথাও অতিবৃষ্টি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়ায় ইহা কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে জলসেচ অপরিহার্য। কিন্তু ভারতের মোট কৃষিজমির মাত্র ২৫% জমিতে সেচের সুবিধা আছে। বিশ্বে ইহাই সর্বোচ্চ হইলেও ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় ইহা সামান্য। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অংশে বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই অবস্থার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা আংশিকভাবে ফলবতী হইয়াছে।

(২) **ত্রুটিপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থা**: কৃষি ব্যবস্থার মূলভিত্তি কৃষক। ভারতে বহু যুগ ধরিয়াই জমির মালিকানা ও জমির চাষকারীর মধ্যে বিচ্ছেদ। অর্থাৎ চাষী চাষ করে, ফসল ফলায় আর ঐ ফসলের সিংহভাগ ভোগ করে অপর একজন। এই অবস্থায় কৃষি ব্যবস্থার অবনতি কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। ইহার পরিবর্তনের জন্য সর্বক্ষেত্রে "লাঙ্গল যার জমি তার" আন্দোলন দীর্ঘকাল চলিয়াছে। ভারতের পরিকল্পনা কমিশনও নীতিগতভাবে ইহা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু ইহা এখনও সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয় নাই। ভারতে জমিদারী উচ্ছেদ, জমির ঊর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণ, বিধি-বহির্ভূত

মালিকানার জমি উদ্ধার ও কৃষকদের মধ্যে ঐ জমির বন্টন ইত্যাদি নীতিসমূহ ভূমি ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ দূর করিবার উদ্দেশ্যেই গৃহীত ও কার্যকর করা হইতেছে।

(৩) **ভূমিক্ষয়** : ভারতে প্রতি বৎসর নানা কারণে প্রচুর ভূমিক্ষয় হয়। অতি বৃষ্টিপাতের ফলে জলধারার সহিত ভূমির উপরিভাগের কিছু অংশ নিয়তই ক্ষয় হয়। বায়ু প্রবাহের ফলেও কৃষিক্ষেত্রের উপরের শুষ্ক মাটি সরিয়া যায় বা কৃষিক্ষেত্রে সমুদ্র তীরবর্তী বালুকারাশি উড়িয়া আসে ও চাষের জমিকে অনুর্বর করে। পর্বতসংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রে ধ্বস, মরুভূমির আগ্রাসন, গোচারণ, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ ইত্যাদির ফলেও প্রতিনিয়ত ভূমিক্ষয় ঘটে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ১·২ কোটি হেক্টর জমি এইভাবে কৃষির অযোগ্য বলিয়া অনাবাদী পড়িয়া থাকে। বর্তমানে ভূমিক্ষয় রোধে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত যে সকল প্রকল্প গঠন করা হইয়াছে উহার ফলে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হইবে।

(৪) **ভূমির আয়তন ও খণ্ডীভবন** : ভারতে একদিকে যেমন জনসংখ্যার চাপ অতিরিক্ত অপর দিকে তেমান ভারতের উত্তরাধিকার আইনের দুর্বলতার জন্য কৃষিজমির আয়তন ক্রমাগত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে। একজন কৃষক মারা গেলে তাহার জমি ঐ কৃষকের তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। ঐ তিন পুত্রের জমি আবার তাহাদের ৩×৩=৯ পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। এই প্রকারে ভারতে কৃষি-জমির আয়তন ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। ভারতে জনপ্রতি কৃষিজমির পরিমাণ মাত্র ০·২৯ হেক্টর এবং পরিবার প্রতি উহা মাত্র ৩·০ হেক্টর। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ডেনমার্কে পরিবার পিছু ঐ জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৮৬ হেক্টর, ২৬ হেক্টর এবং ১৫ হেক্টর। জাপানে ইহার পরিমাণ মাত্র ০·৮০ হেক্টর। আয়তনে ক্ষুদ্র জমিতে লাভজনকভাবে চাষ আবাদ করা বা যান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা কখনই সম্ভব হয় না। ইহার অভাবে আবার কৃষির উন্নতিও ঘটে না। **ভারতে যৌথ খামার পদ্ধতি প্রবর্তন এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে পারে।** কিন্তু যৌথ খামার প্রবর্তনের বিষয়টি এখনও পর্যালোচনার স্তরেই সীমাবদ্ধ।

(৫) **হেক্টর প্রতি স্বল্প কৃষিপণ্য উৎপাদন** : ভারতে বিভিন্ন প্রকার কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু হেক্টর প্রতি উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ভারতে খুবই কম। নিম্নে কয়েকটি দেশের সহিত ভারতের প্রধান প্রধান কৃষিজ দ্রব্যের হেক্টর প্রতি উৎপাদনের একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হইল—

হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন (মেট্রিক টনে)

দেশ	ধান	গম	ভুট্টা	তুলা
সোভিয়েত রাশিয়া	৩.৮৫	১.৬১	২.৬৯	০.৯০
চীন	৪.৮৭	২.৮৪	৩.২২	০.৮০
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৫.১৫	২.৬৫	৫.১২	০.৫০
জাপান	৫.৭০	৩.২৫	—	—
ভারত	১.৪৫	১.৮৩	১.১৬	০.১৪

ভারতে হেক্টর প্রতি কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণ কম হওয়ার জন্য মুখ্যত দায়ী আধুনিক কৃষি বিজ্ঞান ও কৃষি পদ্ধতি বিষয়ে এ দেশের কৃষকদের অজ্ঞতা। কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের উপর। ভারতে সবেমাত্র চাষের কার্যে ট্রাক্টর ব্যবহার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ শুরু হইয়াছে। ভারতে বৎসরে গড়ে প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৬ কিলোগ্রাম সার ব্যবহার করা হইতেছে।

(৬) **কৃষক সমাজের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা**: ভারতীয় কৃষক সমাজ দরিদ্র। কৃষক সমাজের দারিদ্র্যের ফলে কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত। আবার অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থার ফলে কৃষক সমাজের দারিদ্র্যেরও অবসান হয় না। ভারতীয় কৃষির অব্যবস্থার মূলে এই দুষ্ট চক্র। কৃষির প্রতি জমির মালিক ও সরকারের ঔদাসিন্যও কৃষক সমাজের দারিদ্র্যের কারণ ভারতে সাধারণ ও বৃত্তিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা আজিও অনগ্রসর ও অনুন্নত। অধিকন্তু ইহা আদৌ ব্যাপক নহে। ফলে ভারতীয় কৃষকগণ সাধারণ শিক্ষা ও কৃষি শিক্ষা উভয় প্রকার শিক্ষার সুযোগ হইতেই দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকার ফলে পুরুষানুক্রমে গড়িয়া উঠা সংস্কারের ভিত্তিতেই কৃষিকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। কৃষিবিষয়ক আধুনিক শিক্ষার অভাবে কৃষকগণ উন্নত কৃষি পদ্ধতি, সঙ্কর বীজ ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে খুবই অজ্ঞ। অবশ্য বর্তমানে সরকারী প্রচেষ্টায় কৃষক সমাজের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কার্যকর পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

(৭) **মূলধনের অভাব**: ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হইলে কৃষি ব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণ একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ভারতীয় কৃষক সমাজ এতই দরিদ্র যে তাহাদের পক্ষে কৃষি যন্ত্র ব্যবহার ত দূরের কথা সাধারণ হাল বলদ রক্ষা করাই কঠিন। অধিক ফলনশীল বীজ ব্যবহার, সার ব্যবহার ইত্যাদির জন্যই প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। বর্তমানে গ্রাম্য ব্যাংক স্থাপন ও কৃষি ঋণে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অংশগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে মূলধনের যোগানের কার্যকর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

[**প্রশ্ন** : ভারতীয় কৃষির সমস্যা ও উহার সমাধান বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।]

ভারতের খাদ্য-সমস্যা ও ইহার সমাধান : ভারতের খাদ্য-সমস্যা নতুন কোন সমস্যা নহে। ইহা অতি পুরাতন ব্যাধি। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ শাসনকালেই ইহার সৃষ্টি হয়। কৃষি সমস্যা হইতেই ইহার উদ্ভব। ব্রহ্মদেশ যতদিন ভারতের সহিত যুক্ত ছিল ততদিন ভারতের খাদ্য ঘাটতি অনেকাংশে ঐ দেশের উৎপাদনের দ্বারা পূরণ করা হইত। ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার পর হইতে ভারতের খাদ্য-সমস্যার তীব্রতা বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। ১৯৪৭ সালে নবভারতের জন্মলগ্নে ক্ষমতা হস্তান্তরের সহিত খাদ্য-সমস্যাও হস্তান্তরিত হয়। বৃটিশ শাসনে ভারতের খাদ্য-সমস্যা প্রায়ই ভয়াবহ আকার ধারণ করিত। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী তখন ছিল নিত্যসঙ্গী। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে ঐ অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। ১৯৫০-৫১ সাল হইতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হয়। পর পর চারিটি পরিকল্পনাকাল শেষ হইলেও খাদ্যে ভারত আজিও স্বয়ম্ভর হইতে পারে নাই, যদিও খাদ্যোৎপাদনে বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে।

খাদ্য-সমস্যার উদ্ভব হয় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত খাদ্যোৎপাদনের অসংগতি হইতে। ভারতে এই অসংগতি নিম্নলিখিত জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের বিবরণী হইতে লক্ষ্য করা যায়—

জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদন বিষয়ক সারণী

বৎসর	জনসংখ্যা মিলিয়ন	বৃদ্ধির বার্ষিক হার (%)	খাদ্যোৎপাদন মি. মে. ট.	বৃদ্ধির বার্ষিক হার (%)
১৯৫০-৫১	৩৬১	১.৩৩	৫৫.০	২.৮
১৯৬০-৬১	৪৩৯	২.১৬	৮২.০	৪.৯
১৯৭০-৭১	৫৪৮	২.৪৮	১০৬.০	৩.০
১৯৮০-৮১	৬৮.৫১	২.২৩	১২৯.৬	২.২
১৯৮৩-৮৪	৭০০		১৫১.০	৫.৫

১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৮৩-৮৪ সালে খাদ্যোৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ঐ সময়ে জনসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় নাই। তাহা হইলে সমস্যাটা কোথায়? ইহা মনে রাখা কর্তব্য যে খাদ্য ঘাটতি লইয়াই ভারতের যাত্রা শুরু। অধিকন্তু আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ক্যালোরীভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ ভারতীয়দের পক্ষে কোন কালেই সম্ভব হয় নাই। ১৯৬১ সালে জনপ্রতি দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ ছিল ৪৬৮.৭ গ্রাম। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ইহার পরিমাণ দৈনিক ৫০০ গ্রাম হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইহা আজিও সম্ভব হয় নাই। ১৯৮১ সালে জনপ্রতি খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল দৈনিক ৪৫৩.৪ গ্রাম। ১৯৮৪ ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় দৈনিক ৪৩৮ গ্রাম। এই অবস্থায় ক্রমাগত জন-

সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভারতের পক্ষে অতীতের খাদ্য ঘাটতি মিটাইয়া নতুন আগন্তুকদের জন্য পর্যাপ্ত আহারের সংস্থান করা আজিও সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। ইহা ছাড়া স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রার মানেরও পরিবর্তন ঘটে। ইহাতেও খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত পঁচিশ বৎসরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ উৎপাদন আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে পারে নাই। ফলে ভারতকে প্রতি বৎসরই বাহির হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইয়াছে। এই আমদানির পরিমাণ ১৯৫১ সালে ছিল ৪·৭৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ১৯৬১ সালে ৩·৫ মি. মে. ট, ১৯৭১ সালে ২·১ মি. মে. ট. এবং ১৯৭৪ সালে ৪·৮ মি. মে. ট. (১ মি.=১০ লক্ষ)। বিগত কয়েক বৎসরে খাদ্যের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইবার ফলে খাদ্য আমদানি বন্ধ আছে।

ভারতের খাদ্য-সমস্যার প্রধান কারণ জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ—অনেকেই এই মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। 'জনসংখ্যার চাপ' কথাটি দেশের ভূমিভাগের পোষণ ক্ষমতার সহিত সংশ্লিষ্ট। দেশের ভূমিভাগের পোষণ ক্ষমতা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌছায় এবং বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ বহনে অক্ষম হয় তখনই 'জনসংখ্যার চাপ' কথাটি প্রযোজ্য হয়। ভারতের কৃষি ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি এমনই প্রাথমিক স্তরের যে উহার সামান্যতম সমাধান করা গেলে কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। পরিকল্পনার প্রথম দশকের উৎপাদন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চলতি দশকে বহু অসম্পূর্ণ প্রকল্পের কার্য শেষ হইলে কৃষি উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার আশা আছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৫·১৫ কোটি মেট্রিক টন হইয়াছে। ইহা ভারতের সর্ব কালের রেকর্ড উৎপাদন।

ভারতে ১৯৫০-৫১ সাল হইতে কৃষি উৎপাদন গড়ে শতকরা ২·৯ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এই হার খুবই কম। বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি ভারতে এখনও প্রায় অজ্ঞাত। ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য অনেক কিছুই করা হইলেও অনেক কিছুই আবার করার অপেক্ষায়ও আছে। ভারতের খাদ্য-সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে খাদ্যোৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে উৎপাদনের হার আরও বৃদ্ধি ঘটিবে।

(১) **অতিরিক্ত জমি খাদ্যশস্য উৎপাদনে ব্যবহার**—১৯৫০-৫১ সালে ভারতে মোট ৯·৭ কোটি হেক্টর জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ আবাদ হইত। ইহার মধ্যে ৩·০ কোটি হেক্টর জমিতে ধান ও ০·৯ কোটি হেক্টর জমিতে গমের চাষ করা হইত। ১৯৮৩-৮৪ সালে খাদ্যশস্যের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে মোট ১৩·০৩ কোটি হেক্টর; ইহার মধ্যে ধান ও গম জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৪·০৯ কোটি

হেক্টর ও ২'৪৪ হেক্টর। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ধান উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না পাইলেও গম জমির পরিমাণ দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির প্রাথমিক কারণ হিসাবে ইহার গুরুত্ব কম নহে। নিম্নে ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিয়োজিত জমি ও খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ দেখান হইল—

খাদ্যশস্য উৎপাদন বিষয়ক সারণী

	১৯৫০-৫১		১৯৮৩-৮৪	
খাদ্যশস্য	নিয়োজিত জমি মি. হেক্টর	উৎপাদন মি. মে.ট.	নিয়োজিত জমি মি. হেক্টর	উৎপাদন মি. মে. ট.
		[১ মি.=১০ লক্ষ]		
ধান	৩০'৮১	২২'০৬	৪০'৯০	৫৯'৭৭
গম	৯'৭৫	৬'৮২	২৪'৪০	৪৫'১৫
জোয়ার	১৫৫৭	৬'২৫	১৬'২৬	১১'৯৩
বাজরা	৯'০২	২'৬৮	১১'৮১	৭'৬২
ভুট্টা	৩'১৫	২'৩৬	৫'৮৯	৭'৯২
ছোলা	৭.৫৭	৩'৮২	৭'৩১	৪'৭৫
মোট খাদ্যশস্য	৯৭'৩২	৫৫'০১	১৩০'৩৫	১৫১'৫৪

[Source : Economic Survey of India : 1984-85]

(২) **একাধিকবার চাষযুক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি**—ভারতে মোট কৃষি-জমির তুলনায় একাধিকবার কর্ষিত জমির পরিমাণ খুবই নগণ্য ছিল। ১৯৫০-৫১ সালে মাত্র ১'৩২ কোটি হেক্টর জমিতে একাধিকবার ফসল ফলান হইত। ১৯৭৩-৭৪ সালে ইহার পরিমাণ হয় ২'৪৬ কোটি হেক্টর এবং মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ হয়—১৬'৯০ কোটি হেক্টর। পঞ্চম পরিকল্পনায় একাধিকবার কর্ষিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ১৮'০ কোটি হেক্টর করিবার লক্ষ্য সীমা ধার্য হইয়াছে।

(৩) **সেচের সুযোগ বৃদ্ধি**—বৃটিশ যুগে ভারতে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ মোট কৃষিজমির মাত্র শতকরা ৬ ভাগ ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ৬৯০টি বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প রচিত হয় ও উহার রূপায়ণ শুরু হয়। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বহুমুখী নদী পরিকল্পনা কার্যসহ প্রায় ৪২১টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রকল্পের রূপায়ণ সম্ভব হয়। ইহার ফলে বর্তমানে ভারতে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ মোট কৃষিজমির প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ

হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে নানা পদ্ধতিতে সেচযুক্ত জমির পরিমাণ ছিল ২'২৬ কোটি হেক্টর। ১৯৮০-৮১ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪'৪০ কোটি হেক্টর।

(৪) **সার ও উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার**—ভারতের কৃষিক্ষেত্রে সার ও উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার বহুকাল অজ্ঞাত ছিল। এখনও ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের ব্যবহার তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ইহার ব্যবহার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে জৈবিক সারের ব্যবহার ছিল হেক্টর প্রতি মাত্র ০'৫ কিলোগ্রাম। ১৯৮০-৮১ সালে হেক্টর প্রতি সার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৬ কিলোগ্রাম এবং ইহার বেশির ভাগই রাসায়নিক সার। দেশী ও উচ্চ ফলনশীল সংকর বীজ ব্যবহারে ফলনের বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ১৯৬৬-৬৭ সালের পর হইতে এই দেশে সংকর বীজের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নে দেশী ও সংকর বীজের উৎপাদন বৈষম্য দেখান হইল—

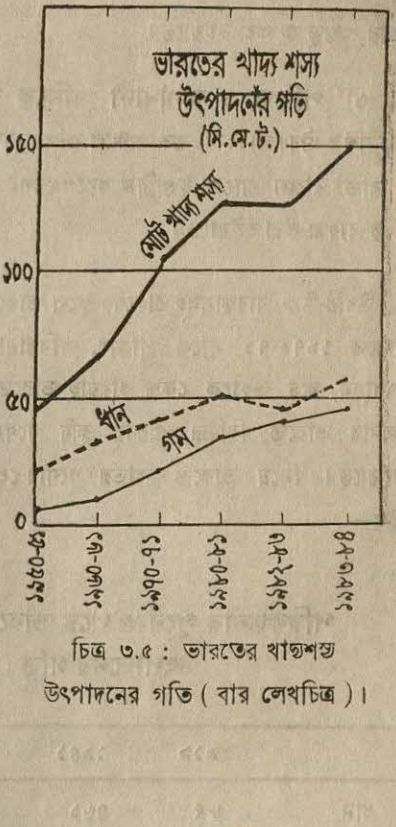

চিত্র ৩.৫ : ভারতের খাদ্যশস্য উৎপাদনের গতি (বার লেখচিত্র)।

দেশী ও সংকর বীজের হেক্টর প্রতি উৎপাদন (১০০ কিলোগ্রাম)

শস্য	দেশী	সংকর বীজ	শস্য	দেশী	সংকর বীজ
ধান	১১	৫০	বাজরা	৪	৩২
গম	১২	৬০	ভুট্টা	১০	৩৭
জোয়ার	৫	৩৫	তুলা	১'২	৮

সংকর বীজ ব্যবহারের ফলে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতে ইহার ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৫) **নিবিড় চাষ**—ভারতে কৃষিজমির আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্রমেই সীমিত হইয়া আসিবার ফলে বর্তমানে ব্যাপক চাষের পরিবর্তে নিবিড় চাষ পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন, ব্যাপক সার ও সেচের ব্যবহার এবং কৃষিপণ্য বিপননের সুব্যবস্থা ও মূলধন সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়কে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

(৬) **পতিত ও অনাবাদী জমিকে** যথাসম্ভব কৃষির অধীনে আনা, ব্যাপক কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার, শুষ্ক অঞ্চলে কৃত্রিম চাষ, কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপক ব্যবস্থা ও বিভিন্ন রাজ্যে এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশন স্থাপনের সাহায্যে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উপরি-উক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণের ফলে ভারতে কৃষি বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে বলা যায়। ভারতে ১৯৭০-৭১ সালে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও তামিলনাড়ুতে কৃষি পণ্যের যে ব্যাপক উৎপাদন ঘটে উহাকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতে **সবুজ বিপ্লবের** সূচনা হয়। অতীতের তুলনায় ভারতে বিভিন্ন প্রকার কৃষি পণ্যের উৎপাদন প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে ভারতে বিভিন্ন পণ্যের হেক্টর প্রতি উৎপাদনের গতি-প্রকৃতি দেওয়া হইল—

পরিকল্পনার পূর্বে ও পরে ভারতে হেক্টর প্রতি কৃষিপণ্যের উৎপাদনের গতি (কিলোগ্রাম)

	১৯১৯	১৯৪১	১৯৫১	১৯৭২-৭৩	১৯৮২-৮৩
ধান	৭৮৫	৭৬১	৬৬৮	১,০৭২	১,২৩১
গম	৭৯২	৭২০	৬৬৩	১,২৫৪	১,৮১৬
তুলা	৮৫	১১৩	৬৮	১২৮	১৪৪
পাট	১,৩৩৮	১,১৩৭	১,০৪৩	১,২৪২	১,৪৭০
ইক্ষু (গুড়)	—	—	৩,২৪২	৫,০৯৫	৫৬,৪৪০

[Source : Economic Survey of India, 1984-85]

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও কৃষি—নিম্নে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ ও সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয়-বরাদ্দ ও উৎপাদন বৃদ্ধির হিসাব একটি সারণীতে দেখান হইল—

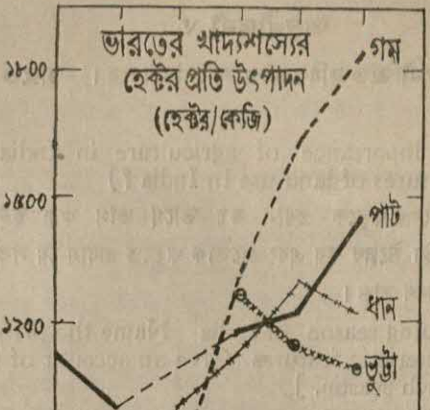

চিত্র ৩.৬ : ভারতের খাদ্যশস্যের উৎপাদন—হেক্টর প্রতি কিলোগ্রাম : (বার লেখচিত্র)।

কৃষি ও সেচখাতে পরিকল্পিত ব্যয়-বরাদ্দ ও সাফল্য বিষয়ক সারণী

	কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়		সেচ ও বন্যা নিরোধ		সাফল্য
	বরাদ্দ কোটি টাকা	মোট বরাদ্দের শতকরা	বরাদ্দ কোটিটাকা	মোট বরাদ্দের শতকরা	সূচক ১৯৫০-৫০
প্রথম পরিকল্পনা	২৯০	১৪.৮	৪৩৪	২২.২	১২২.২
দ্বিতীয় "	৫৪৯	১১.৭	৪৩০	৯.২	১৪৮.৭
তৃতীয় "	১,০৮৯	১২.৭	৬৬৫	৭.৮	১৩৯.২
চতুর্থ "	২,৩৫৩	১৫.০	১২৭২	৮.১	১০৫.১
পঞ্চম "	৪,৭৩০	১২.৩	২৬৮০	৯.৮	১৩০.০
ষষ্ঠ "	১১,০৫৯	১১.৩	১২,১৬০	১২.৫	১৪২.৫

[প্রশ্ন : ভারতের খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর।]

অনুশীলনী ৩

১। ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব আলোচনা কর। ভারতে ভূমির ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য কি কি ?

[Discuss the inportance of agriculture in Indian Economy. What are the features of land use in India ?]

২। ভারতে ফসলের ঋতুকে প্রধান কয় ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ও কি কি ? প্রতিটি বিভাগের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর এবং প্রত্যেক ঋতুতে প্রধান যে সকল ফসল তোলা হয় উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Divide cropping season of India. Name the principal seasons with their characteristic features. Give an account of the principal crops raised in each season.]

৩। ভারতের কৃষি পদ্ধতির বিবরণ দাও এবং ভারতকে প্রধান প্রধান কৃষি অঞ্চলে ভাগ কর এবং প্রতিটি বিভাগের প্রধান প্রধান ফসলের নাম লিখ।

[Give an account of the farming methods of India. Divide India into principal agricultural regions and name the principal crops raised in each region.]

৪। ভারতের বিভিন্ন মৃত্তিকা অঞ্চলে কর। মৃত্তিকা কিভাবে কৃষিকার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

[Name the different soil regions of India. Discuss how soil does exercise its influence on agriculture with examples for different parts of India.] [W. B. C., H. S. Exam., 1981]

৫। ভারতে ভূমিক্ষয়ের কারণ নির্দেশ কর। ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অবলম্বিত ভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[Indicate the causes of soil erosion in India. Examine briefly the soil conservation programme introduced in India during Five Year Plan Period.] [W. B. C.—Specimen Question, 1981]

৬। ভারতে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার বণ্টন দেখাও। সাম্প্রতিক কালে মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা কর।

[Give the distribution of different types of soil in India. Briefly examine soil conservation programme introduced in India in recent years.] [W. B. C.—Specimn Question, 1981]

৭। ভারতে কৃষিজ উৎপাদনের সমস্যাসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর। উহার উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?

[Discuss fully the problems of agricultural production in India. What methods have been introduced for its improvement ?)

৮। ভারতে কৃষ্ণ মৃত্তিকা ও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার আঞ্চলিক বণ্টন দেখাও এবং ঐ মৃত্তিকা অঞ্চলে যে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করা হয় তাহার বিবরণ দাও।

[Give the regional distribution of Black soil and Lateritic soil

and give an account of the different types of crops raised in those soil regions.]

৯। ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব পর্যালোচনা কর। এই দেশে অনুসৃত সেচ পদ্ধতিগুলি কি কি? ভারতে সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অবলম্বিত কার্যক্রম পর্যালোচনা কর।

[Examine the importance of irrigation in India. What are the modes of irrigation practised in India ? Examine the various irrigation development programmes introduced in India.]

[Specimen Question—W. B. H. S. Council]

১০। ভারতে অনুসৃত বিভিন্ন জলসেচ ব্যবস্থা কি কি? কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা বেশি অনুসৃত হয় এবং কেন?

[What are the different modes of irrigation practised in India ? Which one is most widely practised ? Give reasons.]

[W. B. H. S. Council—H. S. Exam. 1978]

১১। প্লাবন খাল ও নিত্যবহ খালের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সেচ ব্যবস্থার বিবরণ দাও।

[Distinguish between Innundation canal and Perennial canal. Give an account of the irrigation system of North-Westen India.]

১২। ভারতের খাদ্য-সমস্যার কারণ নির্দেশ কর। খাদ্য-সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ দাও।

[Account for the food crisis in India. Give an account of the steps taken for early solution of the food problem of India.]

১৩। ভারতের অন্তত পাঁচটি প্রধান জলসেচ প্রকল্পের নাম কর এবং ঐ সকল প্রকল্প দ্বারা ভারতের যে সকল অঞ্চল উপকৃত হইতেছে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

[Name at least five principal Irrigation Projects in India and give a brief account of the regions which are benefited by these projects.]

১৪। ভৌগোলিক ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) তামিল নাড়ুর উপকূলে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয় কেন?

(খ) পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢাল অপেক্ষা পূর্ব ঢালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়।

(গ) ভারতীয় কৃষিকে মৌসুমী বায়ুর দান বলা হয় কেন?

[Write geographical notes :

(a) Why does the coast of Tamil Nadu receive rainfall twice a year ?

(b) The eastern slope of the Western Ghat receives much lesser rainfall than its Western slope.

(c) Why is Indian agriculture called a gift of the Monsoon.

অনুশীলনী ৩

১। ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব আলোচনা কর। ভারতে ভূমির ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য কি কি?

[Discuss the inportance of agriculture in Indian Economy. What are the features of land use in India ?]

২। ভারতে ফসলের ঋতুকে প্রধান কয় ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ও কি কি? প্রতিটি বিভাগের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর এবং প্রত্যেক ঋতুতে প্রধান যে সকল ফসল তোলা হয় উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Divide cropping season of India. Name the principal seasons with their characteristic features. Give an account of the principal crops raised in each season.]

৩। ভারতের কৃষি পদ্ধতির বিবরণ দাও এবং ভারতকে প্রধান প্রধান কৃষি অঞ্চলে ভাগ কর এবং প্রতিটি বিভাগের প্রধান প্রধান ফসলের নাম লিখ।

[Give an account of the farming methods of India. Divide India into principal agricultural regions and name the principal crops raised in each region.]

৪। ভারতের বিভিন্ন মৃত্তিকা অঞ্চলে কর। মৃত্তিকা কিভাবে কৃষিকার্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

[Name the different soil regions of India. Discuss how soil does exercise its influence on agriculture with examples for different parts of India.] [W. B. C., H. S. Exam., 1981]

৫। ভারতে ভূমিক্ষয়ের কারণ নির্দেশ কর। ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অবলম্বিত ভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[Indicate the causes of soil erosion in India. Examine briefly the soil conservation programme introduced in India during Five Year Plan Period.] [W. B. C.—Specimen Question, 1981]

৬। ভারতে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার বন্টন দেখাও। সাম্প্রতিক কালে মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা কর।

[Give the distribution of different types of soil in India. Briefly examine soil conservation programme introduced in India in recent years.] [W. B. C.—Specimn Question, 1981]

৭। ভারতে কৃষিজ উৎপাদনের সমস্যাসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর। উহার উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে?

[Discuss fully the problems of agricultural production in India. What methods have been introduced for its improvement ?)

৮। ভারতে কৃষ্ণ মৃত্তিকা ও ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার আঞ্চলিক বন্টন দেখাও এবং ঐ মৃত্তিকা অঞ্চলে যে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করা হয় তাহার বিবরণ দাও।

[Give the regional distribution of Black soil and Lateritic soil

and give an account of the different types of crops raised in those soil regions.]

৯। ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব পর্যালোচনা কর। এই দেশে অনুসৃত সেচ পদ্ধতিগুলি কি কি? ভারতে সেচ-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অবলম্বিত কার্যক্রম পর্যালোচনা কর।

[Examine the importance of irrigation in India. What are the modes of irrigation practised in India? Examine the various irrigation development programmes introduced in India.]

[Specimen Question—W. B. H. S. Council]

১০। ভারতে অনুসৃত বিভিন্ন জলসেচ ব্যবস্থা কি কি? কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা বেশি অনুসৃত হয় এবং কেন?

[What are the different modes of irrigation practised in India? Which one is most widely practised? Give reasons.]

[W. B. H. S. Council—H. S. Exam. 1978]

১১। প্লাবন খাল ও নিত্যবহ খালের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সেচ ব্যবস্থার বিবরণ দাও।

[Distinguish between Innundation canal and Perennial canal. Give an account of the irrigation system of North-Westen India.]

১২। ভারতের খাদ্য-সমস্যার কারণ নির্দেশ কর। খাদ্য-সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ দাও।

[Account for the food crisis in India. Give an account of the steps taken for early solution of the food problem of India.]

১৩। ভারতের অন্তত পাঁচটি প্রধান জলসেচ প্রকল্পের নাম কর এবং ঐ সকল প্রকল্প দ্বারা ভারতের যে সকল অঞ্চল উপকৃত হইতেছে উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

[Name at least five principal Irrigation Projects in India and give a brief account of the regions which are benefited by these projects.]

১৪। ভৌগোলিক ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) তামিল নাড়ুর উপকূলে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয় কেন?

(খ) পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢাল অপেক্ষা পূর্ব ঢালে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়।

(গ) ভারতীয় কৃষিকে মৌসুমী বায়ুর দান বলা হয় কেন?

[Write geographical notes :

(a) Why does the coast of Tamil Nadu receive rainfall twice a year?

(b) The eastern slope of the Western Ghat receives much lesser rainfall than its Western slope.

(c) Why is Indian agriculture called a gift of the Monsoon.

8 ভারতীয় কৃষি ফসল
(Agricultural Crops of India)

খাদ্যশস্য (Food Crops)

ধান (Rice)

ধান ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য। এদেশে ধান উৎপাদনের সঠিক ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় করা কঠিন। ভারতের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা বরাবরই ধান চাষের অনুকূল বলিয়া অনুমান করা হয়।

খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ৩০০০-১০০০ বৎসর পূর্বেও ভারত তথা এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধানের চাষ প্রচলিত ছিল। ধান উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। চীনের পরই ভারতের স্থান। পৃথিবীতে উৎপাদিত ধানের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভারতে উৎপাদিত হয়। ভারতে মোট কর্ষিত জমির শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ জমিতে ধানের চাষ হইয়া থাকে।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Conditions of growth): উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুযুক্ত সমতলভূমিতে প্রধানত ধান জন্মায়। ভারতের পার্বত্য অঞ্চলেও ধানের চাষ হয়। গুণানুসারে পার্বত্য অঞ্চলের ধানই সর্বোৎকৃষ্ট। ভারতের 'দুন' ও 'কাংড়া' উপত্যকার 'বাসমতী' চাল বিখ্যাত। ভারতের সমভূমি অঞ্চলে যে সকল স্থানে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২০° সেন্টিগ্রেডের অধিক এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ সেন্টিমিটারের অধিক সেই সকল অঞ্চলেই প্রধানত ধানচাষ হইয়া থাকে। সেচের সুব্যবস্থা থাকিলে কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলেও ধানচাষ করা সম্ভব। নদী-উপত্যকায় পলিসমৃদ্ধ নিম্ন সমভূমিই ধানচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ধানের জমিতে কিছু জল জমিয়া মাটি ভিজা ও সরস থাকিলে ভাল হয়। পার্বত্য অঞ্চলে ও পর্বতগাত্রে ধাপ কাটিয়া ছোট ছোট আলের সাহায্যে জল আটকান হয়।

ধানের শ্রেণীবিভাগ (Classification): উৎপাদনের ঋতু অনুযায়ী ভারতের তিন প্রকার ধানের চাষ হইতে দেখা যায়—আউশ, আমন ও বোরো। বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে ইহাদের চাষ হইয়া থাকে। **আউশ বা আশু ধান**—চৈত্র-বৈশাখ (এপ্রিল-মে) মাসে নিচু জমিতে ইহার চাষ হয় এবং ভাদ্র-আশ্বিন (আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পাকা ধান কাটা হয়। ইহাতে সামান্য জলের প্রয়োজন হয় এবং ইহা পাকিতে সময়ও কম লাগে। কালবৈশাখীর সামান্য বৃষ্টিপাত বা সামান্য সেচই ইহার পক্ষে যথেষ্ট। **আমন বা শালি বা হৈমন্তিক ধান**—এই ধান আষাঢ়-শ্রাবণ (জুন-আগস্ট) মাসে রোপণ প্রথায় চাষ করা হয় এবং পৌষ-মাঘ (ডিসেম্বর-

জানুয়ারী) মাসে পাকা ফসল তোলা হয়। এই ধান চাষের জন্য জলের প্রয়োজন হয় বেশি। ইহা পাকেও দেরিতে। আমন ধানই ভারতের প্রধান ফসল।

বোরো ধান : এই ধান সাধারণত শীতকালে অর্থাৎ পৌষ-মাঘ মাসে চাষ করা হয় এবং গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কাটা হয়। নদীর চরে বা স্যাঁতসেঁতে নিচু জমিতে এই ধানের চাষ হয়। ইহাতে জলের তেমন প্রয়োজন হয় না। ইহা অতি নিকৃষ্ট ধরনের এবং ইহার ফলনও কম।

উৎপাদন পদ্ধতি : ভারতে ধানের চাষ প্রধানত দুইটি প্রথায় হইয়া থাকে—বপন প্রথা ও রোপণ প্রথা। **বপন প্রথায়** জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া বীজ হাতে বা সম্ভব হইলে যন্ত্রের সাহায্যে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। গাছ পুষ্ট হইলে শীষ বাহির হয়। শীষ পরিপক্ব অবস্থায় কাটিয়া আহরণ করা হয়।

রোপণ প্রথা : প্রথমে ছোট একখণ্ড জমিতে বীজ ছড়াইয়া বপন করা হয়। ইহাকে বীজতলা বলা হয়। পরে ঐ ছড়ান বীজ হইতে গাছ এক ফুটের মত উচ্চ হইলে উহাকে তুলিয়া অন্যত্র কর্দমাক্ত নিচু জমিতে সারি সারি বসান হয়। ইহাতে প্রচুর কৃষি মজুরের প্রয়োজন হয়। কখনও কখনও অতিবৃষ্টিতে এই প্রকার বীজতলা নষ্ট হইয়া গেলে সাধারণ পলিথিনের চাদরের উপর জলে ভিজান বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয় ও কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় চারা রোপণের উপযোগী বড় করা হয়। ইহাকে 'ড্যাপোগ' প্রথা বলা হয়। ভারতে আমন ধানের চাষ রোপণ প্রথায় হইয়া থাকে।

জাপানী পদ্ধতি : ভারতে দীর্ঘকাল যাবৎ হেক্টর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম হওয়ায় জাপানের অনুকরণে ধানচাষে উচ্চ ফলনশীল বীজ, সেচের জল ও কৃত্রিম রাসায়নিক সার, এ্যামোনিয়াম সালফেট ও সুপার ফসফেট ব্যবহার করা হইতেছে। ইহাকে জাপানী পদ্ধতি বলা হয়। ইহা ছাড়াও তাইচুং নামক এক প্রকার অধিক ফলনশীল বীজ বপন করার জন্য ইহাকে তাইচুং পদ্ধতি বলা হয়। ইহাতে বৎসরে প্রায় ৩ বার ফসল ফলান সম্ভব হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions) **:** ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই কম-বেশি ধানের চাষ হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, তামিল নাড়ু, ওড়িশা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ একত্রে মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ উৎপাদন করে। নিম্নগঙ্গা সমভূমি, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা ও দাক্ষিণাত্যের নদী ব-দ্বীপ অঞ্চল ধান উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। আসাম, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও ত্রিপুরা রাজ্যেও ধান জন্মায়। সাম্প্রতিক কালে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যে ধান উৎপাদনের বিশেষ অগ্রগতি ঘটিয়াছে।

উত্তর ভারত : পশ্চিমবঙ্গে নতুন পলিগঠিত মৃত্তিকা, প্রচুর বৃষ্টিপাত ধানচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ধান উৎপাদনে ভারতে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থান অধিকার করিত।

বর্তমানে ইহার স্থান **দ্বিতীয়**। অগভীর নলকূপের সাহায্যে সেচের ব্যাপক প্রসার এবং জাপানী প্রথায় উন্নত বীজের ব্যবহার দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং আশা করা যায় ধান উৎপাদনে শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ তাহার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে। এই রাজ্যে বর্ধমানে, ২৪-পরগণা, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কুচবিহার প্রভৃতি জিলায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়।

চিত্র ৪.১ : ভারতের ধান উৎপাদক অঞ্চল।

উত্তরপ্রদেশে ধান উৎপাদনের প্রসার ঘটিয়াছে। বর্তমানে এই রাজ্য ধান উৎপাদনে ভারতে **তৃতীয় স্থান** অধিকার করে। গঙ্গা-যমুনা দোয়াব ও পূর্ব-দক্ষিণাংশেই ধান চাষের বিশেষ প্রসার লক্ষ্য করা যায়। গঙ্গা, যমুনা ও ইহাদের বিভিন্ন উপনদী হইতে খাল কাটিয়া সেচের সুবন্দোবস্ত করিবার ফলেই এই রাজ্যে ধানচাষের বর্তমান উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। ফয়জাবাদ, গোণ্ডা, সুলতানপুর, প্রতাপগড়, রায়বেরিলি, বরাবাঁকি, মুজঃফরনগর, এলাহাবাদ, বুদাউন, যমুনাপার, বারাণসী, জৌনপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ধান উৎপাদক অঞ্চল।

বিহার রাজ্যে ধানের চাষ দক্ষিণাংশেই সর্বাধিক হইয়া থাকে। কৃষিকার্যের নিয়োজিত জমির প্রায় ৪৫% ধান চাষে নিয়োজিত। উৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে গয়া, সাহাবাদ, পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা, চম্পারণ, বুড়ি-গণ্ডক ও কোশী অববাহিকা উল্লেখযোগ্য,। **ওড়িশার** মহানদী বদ্বীপ অঞ্চলে কটক, পুরী, সম্বলপুর, আসামের কামরূপ, গোয়ালপাড়া প্রধান ধান উৎপাদক ক্ষেত্র। ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ নির্মাণের ফলে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানে বর্তমানে ধান চাষের ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি ঘটিয়াছে। **পাঞ্জাবের** অমৃতসর, ফিরোজপুর গুরুদাসপুর, পাতিয়ালা, আম্বালা, **হরিয়ানার** রোটক, কার্ণাল, এবং **রাজস্থানের** গঙ্গানগর উল্লেখযোগ্য ধান উৎপাদক ক্ষেত্র। **পাঞ্জাব ও হরিয়ানায়** হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদনের গড় পরিমাণ যথাক্রমে ৩০৬২ ও ২৪৮৫ কেজি।

দক্ষিণ ভারত : অন্ধ্রপ্রদেশ বর্তমানে ধান উৎপাদনে ভারতে **প্রথম স্থান** অধিকার করে। এই রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই ধানের চাষ হইলেও গোদাবরী ব-দ্বীপ

অঞ্চলেই সর্বাধিক পরিমাণ ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রের মধ্যে হায়দরাবাদ, ওয়ারঙ্গল, মেডক, মাদ্রাজ, মহবুবনগর, নলগোণ্ডা, নেল্লোর, গুন্টুর, রায়লসিমা, নিজামাবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল ২১১০ কেজি। **তামিল নাডু** ধান উৎপাদনে ভারতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা (**চতুর্থ স্থান**) পালন করিয়া থাকে। পূর্বঘাট পর্বতমালার পূর্বাংশে নদী অববাহিকা ও উপকূল ভাগেই ধান উৎপাদনের বিশেষ প্রসার লক্ষ্য করা যায়। চিংলিপেট, তাঞ্জোর, কানাড়া প্রভৃতি ধান উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। **কেরালা, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ** ও **মহারাষ্ট্রেও** ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভারতে ধান উৎপাদন একসময় পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে ধানের উৎপাদন উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও মধ্য ভারতেও প্রসার লাভ করিয়াছে। ভারতে হেক্টর প্রতি ধান উৎপাদনে, ১৯৮৩-৮৪ সালের হিসাবে, **পাঞ্জাব প্রথম** (৩,১৪৪ কেজি), **হরিয়ানা দ্বিতীয়** (২৬০৭), **অন্ধ্র তৃতীয়** (২১১০ কেজি), এবং **তামিলনাড়ু চতুর্থ** (১৮৫৯ কেজি)।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ধান উৎপাদনের গতি প্রকৃতি

	১৯৮৩-৮৪			১৯৮০-৮১	১৯৭৮-৭৯
	উৎপাদন	হেক্টর/কেজি	বপিত এলাকা	মোট উৎপাদন	
রাজ্য	মি. মে. ট.		মি. হেক্টর	মি. মে. ট.	মি. মে. ট.
অন্ধ্র	৮·৫৬	২১১০	৪·০৭	৭·০১	৭·৪৩
উত্তরপ্রদেশ	৬·৭৯	১১১৫	৫·৩৭	৫·৫৭	৫.৯৬
পশ্চিমবঙ্গ	৭·৯৪	১০১৮	৫·৩৭	৭·৪৬	৬·৬৭
তামিল নাড়ু	৪·৪৪	১৮৫৯	২·২৮	৪·১৬	৫·৫৫
বিহার	৪·৯৮	৬৮১	৪·৯০	৫·৬৩	৫·৪৯
ওড়িশা	৫·০৪	৭২৮	৪·৩৬	৪·৩০	২·৯১
মধ্যপ্রদেশ	৪·৭২	৭১১	৪·৮৮	৪·০৫	১·৮২
পাঞ্জাব	৪·৫৩	৩১৪৪	১·৪৮	৩·২২	৩·০৪
হরিয়ানা	১·৩২	২৬০৭	০·৫৩	১·২৩	১·২৩
সর্ব-ভারতীয়	৫৯·৭৭	১২৩০	৪০·৯৯	৫৩·৬৩	৫৩·৭৭

[Source : Agricultural Situation in India—October, 1984
Economic Survey (India), 1983-84.]

ভারতে ধান উৎপাদন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। সময়োচিত বৃষ্টি না হওয়া, খরা বা অতিবৃষ্টি অনেকাংশেই ব্যাপক শস্যহানির কারণ। আবার উন্নত বীজ ও সার অভাবে হেক্টর প্রতি উৎপাদনও খুবই কম। কিন্তু বিগত তিন দশকে ভারতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে উহার ফলে ধানের মোট এবং হেক্টর প্রতি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চিত্র ৪.২ : ভারতের ধান উৎপাদনের গতি—বারগ্রাপ।

ভারতের ধান উৎপাদনের প্রগতি

বৎসর	উৎপাদন		বপিত এলাকা
	মি. মে. ট.	হেক্টর প্রতি/কেজি	মি. হেক্টর
১৯৭০-৭১	৪২'২৩	১১২৩	৩৭'৫৯
১৯৭৮-৭৯	৫৩'৭৭	১৩২৮	৪০'৪৮
১৯৮০-৮১	৫৩'৬৩	১৩৩৬	৪০'১৫
১৯৮২-৮৩	৪৭'১২	১২৩০	৩৭'৭৯
১৯৮৩-৮৪ *	৫৯'৭৭	১৪৫৮	৪০'৯৯

[Source : Economic Survey, (India), 1984-85 *Estimate.]

ভারতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে যে সকল ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইল—(ক) বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ও নানা সেচ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সেচ ব্যবস্থা; বর্তমানে ভারতে মোট ধান জমির শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ জমি সেচের সুবিধাযুক্ত। (খ) সংকর বীজ, বিশেষ করিয়া জাপানী উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার; এই সকল বীজের মধ্যে তাইচুং, রত্না, জয়া, বিজয়া, তাইনান, I. R. 8, N. C. 678, সবরমতি, পদ্মা প্রভৃতি প্রধান। (গ) জাপানের চাষ পদ্ধতি অবলম্বন ও রাসায়নিক সারের ব্যাপক ব্যবহার। (ঘ) উচ্চভূমিতে বীজতলা প্রস্তুত বা কৃত্রিম বীজতলা সৃষ্টি। (ঙ) কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও ব্যাংক ঋণের সুযোগ প্রদান।

ভারতে কৃষিকার্যে নিয়োজিত জমির পরিমাণ প্রায় ১৮০ মি. হেক্টর। ইহার মধ্যে মাত্র ৪০.৯০ মি. হেক্টর জমিতে ধান চাষ হইয়া থাকে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন খুবই কম। জাপানে ও চীনে হেক্টর প্রতি ধানের উৎপাদন যথাক্রমে ৫৭০০ কেজি ও ৪৮৭০ কেজি। ভারতে ঐ উৎপাদনের গড় মাত্র ১৪৫৮ কেজি। অধিকন্তু জাপানী প্রথায় চাষ ও উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহারে ধানের উৎপাদন হেক্টর প্রতি বর্তমানের প্রায় ৫/৬ গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু এই সকল উন্নত কৃষি ব্যবস্থার তেমন উল্লেখযোগ্য প্রসার আজিও সম্ভব হয় নাই। বিগত ১৯৭০-৭১ সালে ভারতে উচ্চফলনশীল বীজের অধীন জমির পরিমাণ ছিল ৫.৫৯ মিঃ হেক্টর। ১৯৮২-৮৩ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮.৬৭ মি. হেক্টর এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে ২২.৫০ মি. হেক্টর। ভারতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে জাপানী প্রথায় চাষ, উচ্চফলনশীল বীজ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার ও জলসেচের ব্যাপক প্রসার অপরিহার্য।

ব্যবসায়—ভারতে উৎপাদিত ধানের মাত্র ¼ অংশ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লেনদেন হয়। অবশিষ্ট ¾ অংশ উৎপাদক রাজ্যেই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রধান উৎপাদক অঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যার চাপ বেশি হওয়ায় বিনিময় যোগ্য অতিরিক্ত শস্য প্রায় থাকেই না। পশ্চিমবঙ্গ, তামিল নাড়ু, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল প্রভূত উৎপাদন সত্ত্বেও **ঘাটতি এলাকা**। **উদ্বৃত্ত অঞ্চলের** মধ্যে ওড়িশা, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, আসাম উল্লেখযোগ্য। পূর্বে চালের অভাব মিটাইবার জন্য নেপাল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, কাম্পুচিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে চাল আমদানি করা হইত। বর্তমানে চালের পরিবর্তে গমই প্রধানত আমদানি করা হয়। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে হইতে গমের পরিবর্তে ৭৭ হাজার টন চাল আমদানি হয়। এই গম বাংলাদেশকে ১৯৭৯ সালের গম/চাল চুক্তি অনুযায়ী ধার দেওয়া হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৭ সালের পর হইতে ভারতে চাল আমদানির কোন প্রয়োজন দেখা দেয় নাই।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতে কত প্রকার ধানের চাষ হয়? (২) রোপণ প্রথা ও বপন প্রথার মধ্যে পার্থক্য কি কি? (৩) ভারতে ধান উৎপাদন অঞ্চলগুলি কি কি? (৪) ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে? (৫) একটি মানচিত্রে ভারতের ধান উৎপাদক অঞ্চলগুলি দেখাও। (৫) একটি চার্টের সাহায্যে ধান উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি দেখাও ও কয়েকটি উচ্চফলনশীল বীজের নাম লিখ।]

গম (Wheat)

খাদ্যশস্য হিসাবে ধানের পরেই ভারতে গমের স্থান। গম ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলির অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। বর্তমানে ভারতে চালের

অভাবহেতু সর্বত্রই গমের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে গম চাষের স্বাভাবিক সুবিধা থাকায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে গম চাষের প্রচলন ছিল। এমনকি সিন্ধু সভ্যতার যুগেও ভারতে যে গম চাষ প্রচলিত ছিল তাহার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতের খাদ্যশস্যে নিয়োজিত জমির শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ জমি গম চাষে নিযুক্ত এবং উৎপাদনের পরিমাণও মোট খাদ্য-শস্যের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ। ভারতে প্রধানত দুই প্রকার গমের চাষ হইয়া থাকে। সাধারণত খাদ্য হিসাবে রুটির উপযুক্ত গম এবং ময়দাজাত বিভিন্ন খাবার তৈয়ারির উপযুক্ত **'ম্যাকারোনি'** (Macarone) গম।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Favourable Conditions of growth)—গম নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের ফসল। অল্প বৃষ্টিপাত ও শীতল আবহাওয়া গম চাষের পক্ষে উপযোগী। গম চাষের জন্য ১২°—২০° সে. উত্তাপ ও ৭৫—১০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। বৃষ্টিপাত কম হইলে সেচের সাহায্যেই গম চাষ করা সম্ভব। ভারতে দুইটি ঋতুতে, শীত ও গ্রীষ্মকালে, গম চাষ হইয়া থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সম-ভূমিতে শীতকালীন গমের (নভেম্বর—এপ্রিল) ব্যাপক চাষ হইয়া থাকে। শীতকালীন গম চাষে প্রথমে কম উত্তাপ ও পাকিবার সময় বেশি উত্তাপ প্রয়োজন। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও পার্বত্য ভূমিতে বসন্তকালীন গমের (এপ্রিল—আগস্ট) চাষ করা হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত কম সময়েই তোলা যায়। ভারতে গম চাষে সাধারণত ৪—৬ মাস সময় প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইওরোপের কোন কোন অঞ্চলে গম চাষে প্রায় ৮—৯ মাস সময় প্রয়োজন হয়। ভারতে বেশির ভাগ গমের চাষ শীতকালেই হয় বলিয়া জলসেচ অপরিহার্য। অধিক বৃষ্টিপাত গম চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক বলিয়া কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সেচের সাহায্যে গম চাষ সুবিধাজনক। গম চাষে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয় বলিয়া নিবিড় বসতিযুক্ত অঞ্চলেই গমের চাষ লক্ষ্য করা যায়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions): পূর্বে গম উৎপাদন ভারতের কয়েকটি রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বর্তমানে গম চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটায় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা, গুজরাট ও রাজস্থানের মরুপ্রায় অঞ্চলেও গম উৎপাদিত হইয়া থাকে। ভারতে গম উৎপাদনে নিয়োজিত জমির শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা—এই পাঁচটি রাজ্যে দেখা যায় এবং মোট গম উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৮১ ভাগ ঐ পাঁচটি রাজ্য হইতে আসে। ভারতে সাধারণ রুটির উপযুক্ত গম প্রধানত **পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার** প্রভৃতি অঞ্চলের সেচযুক্ত অঞ্চলে জন্মায়। ম্যাকারোনি গম চাষে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ও এঁটেল মাটি

বিশেষ উপযোগী। এই কারণে **মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ** ও **অন্ধ্রপ্রদেশের** পশ্চিমাংশের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলেই ইহার ব্যাপক চাষ হইয়া থাকে। হেক্টর প্রতি গম উৎপাদনে **পাঞ্জাব প্রথম** (৩০০৭ কেজি), **হরিয়ানা দ্বিতীয়** (২৫২৩ কেজি), **পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয়** (২২৭৫ কেজি) এবং **উত্তরপ্রদেশ চতুর্থ** (১৮৬০ কেজি)।

উত্তর ভারত : উত্তরপ্রদেশে প্রায় সর্বত্রই গম চাষ হইয়া থাকে। মোট উৎপাদনের ভিত্তিতে ১৯৮৩-৮৪ সালে এই রাজ্য ভারতে গম উৎপাদনে শীর্ষস্থানের অধিকারী। এই রাজ্যের মোট উৎপাদনের মধ্যে মোরাদাবাদ, মীরাট, বুদাউন একত্রে প্রায় ৫০% উৎপাদন করিয়া থাকে। অন্যান্য উৎপাদক ক্ষেত্রের মধ্যে সুলতানপুর, মুজাঃফরনগর, প্রতাপগড়, ফতেপুর, এলাহাবাদ, বুলান্দসর, এটাওয়া, আগ্রা, বারাণসী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। **পাঞ্জাব** গম উৎপাদনে ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই রাজ্যের গম উৎপাদক ক্ষেত্রের মধ্যে উচ্চ বারি দোয়াব, ফিরোজপুর, জলন্ধর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। হরিয়ানা রাজ্যে পানিপথ, ভাতিন্দা কার্ণাল, রোটক ইত্যাদি প্রধান গম উৎপাদক ক্ষেত্র। **রাজস্থানের** সুরথগড় ও গঙ্গানগর অঞ্চলে বর্তমানে সেচ ও সারের প্রয়োগের ফলে গমের উৎপাদন আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। **পশ্চিমবঙ্গে** অতীতে গমের চাষ ছিল না। বিগত দশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে গম উৎপাদনের বিশেষ অগ্রগতি ঘটিয়াছে। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, বীরভূম ও মালদহে গমের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। **বিহারে** দ্বারভঙ্গা (বাগমতী), মুঙ্গের, গয়া, সাহাবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গম উৎপাদক ক্ষেত্র। **গুজরাটের** নর্মদা ও তাপ্তী অববাহিকায় গমের চাষ হয়। সুরাট, পাচ মহল, ভাদোদরা, আহমেদাবাদ প্রধান উৎপাদন ক্ষেত্র।

চিত্র ৪.৩ : ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল।

দক্ষিণ ভারত : দক্ষিণ ভারতে ধানের তুলনায় গমের চাষ অনেকটা সীমাবদ্ধ। অবশ্য ইহার জন্য জলবায়ু প্রধানত দায়ী। মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রের দক্ষিণাংশ, মহারাষ্ট্রের পূর্বাংশে গমের চাষ হইয়া থাকে।

ভারতে গম উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি

রাজ্য	উৎপাদন মি. মে. ট.	হেক্টর/কেজি ১৯৮৩-৮৪	বপিত এলাকা মি. হেক্টর	উৎপাদন (মি. মে. ট.) ১৯৮০-৮১	১৯৭৮-৭৯
উত্তরপ্রদেশ	১৬'২৫	১৮৬০	৮'৫৮	১৩'৩৮	১১'৪৫
পাঞ্জাব	৯'৪১	৩০০৭	৩'১২	৭'৬৭	৭'৬২
হরিয়ানা	৪'৪৭	২৫২৩	১'৭৯	৩'৪৯	৩'৪০
মধ্যপ্রদেশ	৪'০৯	১০৯২	৩'৫৯	৩'১৪	৩'৫২
রাজস্থান	৩'৪৫	১৮৩০	২'১৬	২'৩৯	২'৮৭
বিহার	২'৭৫	১৩৪২	১'৭৭	২'৩০	২'৫০
মহারাষ্ট্র	১'১৪	৭৮৫	১'১	০'৯৩	'৯৫
পশ্চিমবঙ্গ	০'৮৫	২২৭৫	০'৩৩	০'৪৭	০'৯৯
সর্ব-ভারতীয়	৪৫'১৫	১৮৫১	২৪'৩৯	৩৬'৩১	৩৫'৫১

[Source : Agricultural Situaion in India, October, 1984 ; Economic Survey (India), 1983-84]

ভারতীয় কৃষি ব্যবহার পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলে মোট উৎপাদন ও হেক্টর প্রতি উৎপাদন উভয়ই যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় ভারতে হেক্টর প্রতি গমের উৎপাদন খুবই সামান্য ছিল। ১৯৫০-৫১ সালের ভারতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন মাত্র ৬৬৩ কি.গ্রা. ছিল। কিন্তু ভারতে খাদ্যোৎপদন বৃদ্ধির জন্য জলসেচের প্রসার, রাসায়নিক সার ও উচ্চ ফলনশীল সংকর বীজের ব্যবহার এবং কৃষি বিজ্ঞান ও গবেষণার উন্নতির ফলে গমের ফলন খুবই দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ভারতে হেক্টর প্রতি গমের উৎপাদন দাঁড়াইয়াছে ১৮৫১ কে.জি.। বর্তমানে রাজস্থান ও গুজরাটের মরুপ্রায় অঞ্চলে সংকর বীজের সাহায্যে গম চাষের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটান সম্ভব হইয়াছে। পুষার কেন্দ্রীয় গম গবেষণাকেন্দ্র ফলন বৃদ্ধিবিষয়ক গবেষণায় গৌরবময় ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে মাথাপিছু গম জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় জনপ্রতি প্রায় ১ হেক্টর গম জমি এবং ইতালি ও ফ্রান্সে প্রতি সাত জনে এক হেক্টর গম জমি বিদ্যমান। ভারতে ঐ জমির পরিমাণ প্রতি ২৫ জনে মাত্র এক হেক্টর। ভারতে অন্যান্য খাদ্য ফসলের চাষ গম জমিকম হওয়ার একটি কারণ। উত্তর পশ্চিম ভারতে ভাকরা-নাঙ্গাল বহুমুখী নদী পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ার ফলে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যে গমের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। গুজরাট অঞ্চলে তাপী নদীর উপর কাকরাপাড়া বাঁধ নির্মিত হওয়ায় সেচের

সাহায্যে বর্তমানে গমের যে সকল সংকর বীজ ব্যবহার হয় তাহাদের মধ্যে হীরা, মতি, কল্যাণ ২২৭, সোনালিকা, I. R. 8, H. D. 155 প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিগত ১৯৮০-৮১ সালে ভারতে ১৬·১০ হেক্টর জমিতে উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার করা হইয়াছিল। ১৯৮২-৮৩ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮·০৭ মি. হেক্টর। আশা করা যায় ১৯৮৪-৮৫ সালে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ১৯·০ মি. হেক্টর দাঁড়াইবে। [১ মি.= ১০ লক্ষ]

ভারতে গম উৎপাদনের প্রগতি

বৎসর	উৎপাদন মি. মে. ট.	হেক্টর/কেজি	বপিত এলাকা মি. হেক্টর
১৯৭০-৭১	২৩·৮৩	১৩০৭	১৮·২৪
১৯৭৮-৭৯	৩৫·৫১	১৫৬৮	২২·৬৪
১৯৮০-৮১	৩৬·৩১	১৬৩০	২২·২৮
১৯৮২-৮৩	৪২·৫০	১৮৩৬	২৩·১৫
১৯৮৩-৮৪	৪৫·১৫	১৮৫১	২৪·৩৯

[Source : Econmic Survey (India), 1983-84
Agricultural Situation in India, October, 1984.]

ব্যবসায় (Trade) : প্রধানত গমভোজী জনসংখ্যার বিচারে ভারত গম উৎপাদনে স্বয়ংম্ভর বলা যায়। কিন্তু অন্যান্য খাদ্যাঞ্চলে খাদ্য ঘাটতি থাকায় গমের চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। গম উৎপাদক অঞ্চলে মোট উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ গম খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট শতকরা ৫০ ভাগ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে খাদ্য ঘাটতি এলাকা গুলিতে বণ্টন করা হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি উদ্বৃত্ত এলাকাগুলি হইতে পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, তামিল নাড়ু, রাজস্থান, কর্ণাটক প্রভৃতি ঘাটতি এলাকায় গম প্রেরণ করা হয়।

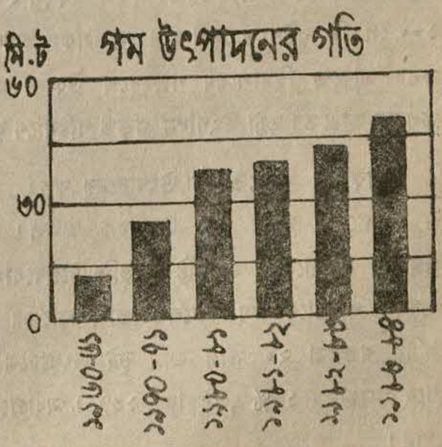

চিত্র ৪.৪ : ভারতের গম উৎপাদনের গতিবারগ্রাফ।

ভারতে খাদ্য ঘাটতিজনিত অসুবিধা দূর করিতে বিদেশ হইতে প্রায় প্রতি বৎসর

গম আমদানি করা হইত। বর্তমানে দেশে যথেষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপে সামান্য পরিমাণে গম আমদানি করা হয়। ১৯৭৬ সালে আমদানির পরিমাণ ছিল ৫.৯৮ লক্ষ মে. টন। কিন্তু ১৯৮২ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ২.০৯ মে. টন। আশা করা যায় ভারতের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে নূতন করিয়া আর খাদ্য আমদানির প্রয়োজন হইবে না। এই আমদানি প্রধানত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া হইতেই করা হইয়া থাকে।

[**প্রশ্ন** : (১) 'ম্যাকারোনি' গম ও সাধারণ গমের পার্থক্য কি ? উভয় প্রকার গম উৎপাদনে জলবায়ুগত তারতম্য আলোচনা কর। (২) ভারতের গম অঞ্চল বলিতে কোন অঞ্চলকে বুঝায় ? (৩) ভারতের গমের আঞ্চলিক বণ্টন আলোচনা কর। (৪) গম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলি আলোচনা কর। (৫) একটি মানচিত্রে ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল দেখাও।]

ভুট্টা (Maize)

ভুট্টা ভারতের প্রায় সর্বত্র অল্পবিস্তর জন্মিয়া থাকে। কিন্তু উত্তর ভারতেই ইহার চাষ বেশি হয়। ভারতে স্বল্পবিত্ত মানুষেরা ইহা গমের পরিপূরক খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া বর্তমানে ভুট্টা হইতে সামান্য পরিমাণে গ্লুকোজ ও স্টার্চ তৈয়ারি করা হয়। ভারতের যে সকল অঞ্চলে ২৭° হইতে ৩০° সে. উত্তাপ ও ৬৫ হইতে ১০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত দেখা যায় সে সকল অঞ্চলেই প্রধানত ভুট্টার চাষ হইয়া থাকে। উত্তর ভারতে হিমালয়ের পাদদেশে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ভুট্টা ভাল জন্মে। পূর্বের তুলনায় ভারতের ভুট্টা উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্ষাকালই ভারতে ভুট্টা উৎপাদনের ঋতু। ভারতের উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার ও মধ্যপ্রদেশ প্রধান ভুট্টা উৎপাদক অঞ্চল। অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে অন্ধ্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীর, কুলু, কুমায়ুন, ও দার্জিলিং অঞ্চলে পরিমাণে কম হইলেও ভাল জাতের ভুট্টা জন্মে। উত্তরপ্রদেশের মোট কৃষি জমির শতকরা ২০ ভাগ জমি ভুট্টা উৎপাদনে নিয়োজিত দেখা যায়। উত্তরপ্রদেশের পরে রাজস্থান (১৫%), বিহার (১৩%), মধ্যপ্রদেশ (১০.৫%) ও অন্ধ্রপ্রদেশের (৭%) স্থান।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions) : **উত্তরপ্রদেশ**—বারাণসী, জৌনপুর, মথুরা, বুলন্দাসর এটাওয়া, শাহজাহানপুর, ইত্যাদি। **বিহার**—সারণ, চম্পারণ, দ্বারভাঙ্গা,

সহর্ষ, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের ইত্যাদি। **পাঞ্জাব**—জলন্ধর, আম্বালা, হোসিয়ারপুর, লুধিয়ানা, অমৃতসর। **রাজস্থান**—গঙ্গানগর, বিকানীর। **গুজরাট**—নর্মদা ও তাপ্তী অববাহিকা, রাজকোট, ভাবনগর ইত্যাদি। **অন্ধ্রপ্রদেশ**—মহবুবনগর, জলগোণ্ডা, নেল্লোর, গুন্টুর ইত্যাদি।

ভারতে ভুট্টা উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি

রাজ্য	বপিত এলাকা (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মে. ট.)	হেক্টর/কেজি	উৎপাদন ১৯৮২-৮৩
		১৯৮৩-৮৪		
উত্তরপ্রদেশ	১১·৬৩	১১·২০	৯৬০	৮·৩৭
বিহার	৮·১৫	৯·৫০	১১৬৬	৯.৩৭
মধ্যপ্রদেশ	৮·০২	১১·০৯	১৩৮২	৮·০৪
অন্ধ্র	৩·৩২	৫·০০	১৫০৬	৭·৪৪
রাজস্থান	৮·৯৩	১২·২৯	১৩৬৬	৬·৫৮
গুজরাট	৩·১৩	৪·৭৫	১৫১৭	৩·০৬
সর্ব-ভারতীয়	৫৮·৮৮	৭৯·২৪	১৩৪৫	৬৫·৪৮

[Source : Agricultural Situation in India, October, 1984.]

ভুট্টা স্থানীয়ভাবে ব্যবহারের জন্যই উৎপাদিত হয়। সুতরাং আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে ভুট্টার স্থান নগণ্য। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে খাদ্যাভাব দূরীকরণে ভুট্টার চাহিদা ও গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভুট্টা উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত মোট উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে খাদ্য সমস্যা ও অপুষ্টিজনিত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারতের অনুকূল জলবায়ু ও মৃত্তিকা ভুট্টাচাষের প্রসার দ্রুত ঘটান বিশেষ প্রয়োজন। কারণ বিশ্বের ভুট্টা উৎপাদক অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন অতি সামান্য। পক্ষান্তরে ভারতে ভুট্টাচাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ আদৌ নগণ্য নহে। নিম্নের সারণী হইতে ইহার সপক্ষে যুক্তি মিলিবে।

ভুট্টাচাষের গতিপ্রকৃতি—১৯৮৩

দেশ	বপিত এলাকা মি. হে.	উৎপাদন কেজি/হেক্টর	উৎপাদন মি. মে. ট.
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	২০.৮৫	৫১২০	১০৬.৭৮
চীন	১৯.৯০	৩২২৩	৬৪.১৩
ব্রেজিল	১০.৭৫	১৭৪৫	১৮.৭৫
মেক্সিকো	৮.৪০	১৬৫৭	১৩.৯৩
ভারত	৬.০০	১১৬৭	৭.০০

[**প্রশ্ন** . (১) ভারতে ভুট্টার ব্যবহার আলোচনা কর। (২) ভারতে ভুট্টা উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম কর এবং একটি মানচিত্রে ভুট্টার এলাকা-বন্টন দেখাও।]

মিলেট (Millets)

জোয়ার, বাজরা, রাগী ইত্যাদিকে একত্রে মিলেট (millets) বলা হয়। এই সকল শস্য শুষ্ক ও উষ্ণ অঞ্চলে অতি স্বল্প সময়ে উৎপন্ন হয়। ইহাদের চাষের জন্য অধিক জলের প্রয়োজন হয় না। মধ্য ও পশ্চিম ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে (৫০—৭৫ সে. মি. ও বৃষ্টিপাত ৩০° সে. উত্তাপ) ইহাদের চাষ হইয়া থাকে।

জোয়ার — ইউরোপ ও আমেরিকায় জোয়ার 'সোরগম' নামে পরিচিত। ভারতে ইহা মানুষের খাদ্য ও ইহার খড় পশু-খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় জোয়ারের চাষ হইয়া থাকে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতেও জোয়ারের চাষ হয়। জোয়ারে

চিত্র ৪.৫ : ভারতের জোয়ার ও বাজরা উৎপাদক অঞ্চল।

উৎপাদনে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইহা ছাড়া গুজরাট, রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশে জোয়ারের চাষ হইয়া থাকে। জোয়ার উৎপাদনে মহারাষ্ট্রের স্থান প্রথম, (মোট উৎপাদনের ৩৮%) কর্ণাটক দ্বিতীয় (১৭%), এবং অন্ধ্রপ্রদেশ তৃতীয় (১২%)। মহারাষ্ট্রের শোলাপুর, পুনা, বেলগাঁও প্রভৃতি প্রধান জোয়ার উৎপাদক অঞ্চল।

সাম্প্রতিক কালে ভারতে জোয়ার উৎপাদনে নিয়োজিত জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ উভয়ই উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নের হিসাব হইতে ইহার পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাইবে।

ভারতে জোয়ার উৎপাদনের গতি প্রকৃতি

রাজ্য	বপিত এলাকা মি. হেক্টর	উৎপাদন মি. মে. ট. ১৯৮৩-৮৪	হেক্টর/কেজি	উৎপাদন মি. মে.ট. ১৯৮২-৮৩
মহারাষ্ট্র	৬·৫৪	৪·৬৭	৭১৪	৪·৬৫
কর্ণাটক	২·১৯	১·৭৯	৮৬৩	১·৬০
অন্ধ্রপ্রদেশ	১·৯৪	১·০৮	৫৬০	১·৫২
মধ্যপ্রদেশ	২·১০	১·৯৬	৯৩৩	১·৪১
গুজরাট	০·৯৪	০·৫৮	৬১৭	০·৪৮
তামিলনাড়ু	০·৬৮	০·৫৪	৮০০	০·৩৮
উত্তরপ্রদেশ	০·৬৫	০·৫৪	৮৩০	০·২৮
সর্ব-ভারতীয়	১৬·২৬	১১·৯৩	৭৪৪	১০·৭৫

[Source : Agricultural Situation in India. October, 1984]

বাজরা (Bazra)—জোয়ারের মত বাজরাও উষ্ণ ও শুষ্ক অঞ্চলের ফসল। ইহার চাষে জলের তেমন প্রয়োজন হয় না। ইহা অত্যন্ত কম সময়ে উৎপাদিত হয়। ইহা প্রধানত স্থানীয় অধিবাসীদের পরিপূরক খাদ্য হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।

বাজরা রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলেই বিশেষ ভাবে উৎপাদিত হয়। অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চলের মধ্যে হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাজরা উৎপাদনে রাজস্থান প্রথম। রাজস্থানে মোট কৃষি জমির শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বাজরা উৎপাদনে নিয়োজিত হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ

দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ। গুজরাটের স্থান দ্বিতীয়। ইহার উৎপাদন নিয়োজিত জমির তুলনায় অধিক। কারণ গুজরাটে হেক্টর প্রতি উৎপাদন অধিক। গুজরাটের মোট কৃষি জমির শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ বাজরা উৎপাদনে নিয়োজিত দেখা যায় এবং উৎপাদনের পরিমাণ দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ। গুজরাটের ভাবনগর অঞ্চলে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ কৃষিজমি বাজরা উৎপাদনে নিয়োজিত। সবরকষ্ঠ, মেসানা, ভাবনগর প্রধান উৎপাদন ক্ষেত্র।

সম্প্রতিকালে বাজরা উৎপাদনে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। নিম্নে ভারতে বাজরা উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি দেখান হইল।

ভারতে বাজরা উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি

রাজ্য	বপিত এলাকা লক্ষ হেক্টর	উৎপাদন লক্ষ মে. ট. ১৯৮৩-৮৪	হেক্টর/কেজি	উৎপাদন মি. মে. ট ১৯৮২-৮৩
রাজস্থান	৫০'০৪	২৪'৫৬	৪৯১	১৩'৯০
গুজরাট	১৪'৩৭	১৬'০৭	১১১৮	১১'৭৮
উত্তরপ্রদেশ	১০'২৮	৮'৫৭	৮৩৩	৭'৪১
মহারাষ্ট্র	১৮'১২	৯'০৮	৫০১	৪'৪৫
হরিয়ানা	৮'৪১	৫'৫২	৬৫৬	৫'০৬
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪'৮৭	৩'৫০	৭১৮	২'৫৯
কর্ণাটক	৫'৭৮	২'৮৮	৪৯৮	২'১২
সর্ব-ভারতীয়	১১৮'১০	৭৬'২৪	৬৪৫	৫১'৩১

[Source : Agricultural situation in India, October, 1984,]

রাগী (Ragi)—ভারতে রাগী শস্যের চাষ স্থানীয় অধিবাসীদের পরিপূরক খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য হয়। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, বিহার, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে রাগীর চাষ হইয়া থাকে।

[প্রশ্ন : (১) 'মিলেট' কি ও ইহার ব্যবহার কি ? (২) ভারতে কোথায় কোথায় জোয়ার ও বাজরা উৎপন্ন হয় ?]

পানীয় ফসল (Reverages)

চা (Tea)

মৃদু উত্তেজক পানীয় হিসাবে চা ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। চা উৎপাদনে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। চীনের পরেই ভারতের স্থান। চা ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে একটি উল্লেখযোগ্য রপ্তানি দ্রব্য। ১৮২৫ সালে ব্রুস (Bruce) ভ্রাতৃদ্বয় উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিংফু হইতে প্রথমে চায়ের বীজ আনিয়া আসামের সদিয়া অঞ্চলে চাষ শুরু করে। ঐ সময় চীন হইতে বীজ, চারাগাছ ও চীনা শ্রমিকও আমদানি করা হইত। ১৮৩৬ সালে প্রথম ভারতবর্ষে ব্যবহারযোগ্য চা উৎপন্ন হয় এবং ১৮৩৮ সালে বৃটেনে প্রথম ভারতবর্ষ চা রপ্তানি করে। ক্রমে ভারতীয় চায়ের কদর বৃদ্ধি পায় ও একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়। ফলে বৃটিশ মূলধন ও কারিগরী দক্ষতা উত্তরোত্তর চা শিল্পের প্রসারে নিয়োজিত হইতে থাকে।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Favourable Conditions of growth) ; চা একটি চিরহরিৎ বৃক্ষের পাতা। মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত আর্দ্র অংশে পর্বতের ঢালে ইহার চাষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইহার উৎপাদনে প্রায় ২৭° সে. উত্তাপ ও ২০০° সে. মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। উর্বর ঢালু জমি চা চাষের পক্ষে অপরিহার্য। চায়ের চারার যত্ন লওয়া, চা আহরণ করা ইত্যাদি কার্যে প্রচুর সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি অঞ্চলে এ সকল সুবিধা বিদ্যমান।

চিত্র নং ৪.৬ : ভারতের চা, কফি ও রবার উৎপাদক অঞ্চল।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions) : চা উৎপাদনে ভারতের দুইটি অঞ্চল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য —(ক) উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে **আসাম, পশ্চিমবঙ্গ** ও **ত্রিপুরা** ; এবং দক্ষিণ ভারতের **নীলগিরি পর্বতের সন্নিহিত তামিলনাড়ু** ও **কেরালা**। এই দুইটি প্রধান অঞ্চল ছাড়া বিহারের **রাঁচী, হাজারিবাগ** ও **পুর্ণিয়া**

জেলা, উত্তরপ্রদেশের **আলমোড়া** ও **গাড়োয়াল**, পাঞ্জাবের **কাংড়া উপত্যকা** এবং **কর্ণাটকের কুর্গ** অঞ্চলে চায়ের চাষ প্রসার লাভ করিয়াছে। **আসামের** শিবসাগর, দারাং, লক্ষীনপুর ও সুরমা উপত্যকা বা কাছাড় চা উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক চা আসামে উৎপন্ন হয়। আসাম চায়ের স্বাদ ও গন্ধ উল্লেখযোগ্য নহে। চা উৎপাদনে আসাম ভারতে প্রথম। রেলপথ ও ব্রহ্মপুত্রের জলপথে আসাম চা কলিকাতার বন্দরে আনা হয়। **পশ্চিমবঙ্গের** দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জিলা চা উৎপাদনের কেন্দ্র। দার্জিলিং চা স্বাদ ও গন্ধে অতুলনীয়। এই রাজ্যে ভারতের প্রায় ¼ অংশ চা উৎপাদিত হয়। দার্জিলিং অঞ্চলের বৃটিশ চা উৎপাদন-কারীগণের অনেকেই বর্তমানে এই ব্যবসা হইতে বিদায় গ্রহণ করায় দার্জিলিং, চায়ের গুণের বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। আসাম চায়ের সহিত দার্জিলিং চা মিশ্রিত করিয়া বাজারজাত করা হয়। দাক্ষিণাত্যের **কেরালা** রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলে কানন দেভনস, ওয়েনাদ, কোচিন ও মালাবারে প্রধানত চা উৎপাদিত হয়। **তামিলনাড়ুতে** নীলগিরি, মাদুরাই, কোয়াম্বাটুর ও আন্নামালাই অঞ্চলে প্রধানত চা উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া **হিমাচল প্রদেশ, মহারাষ্ট্র** ও **কর্ণাটক** অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণ চা জন্মে। দাক্ষিণাত্যের চা বিশেষ সুগন্ধযুক্ত। ভারতে উৎপন্ন চায়ের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে উৎপন্ন হয়।

ভারতে প্রায় ৪০০০ চায়ের বাগিচা আছে। আয়তনে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের চায়ের বাগিচাগুলি বড়। পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের চায়ের বাগিচাগুলি আয়তনে মাত্র ৪.৫ একর। ভারতের চায়ের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ চা উত্তর ভারতেই উৎপন্ন হয়। ভারতীয় চা উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। ইহার প্রায় অর্ধেক শ্রমিক আসামের বাগিচাগুলিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারতের চা শিল্পের সহিত পরোক্ষভাবে আরও প্রায় ১০ লক্ষ লোক যুক্ত রহিয়াছে।

ভারতের চা উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি

	নিয়োজিত জমি লক্ষ হেক্টর	উৎপাদন লক্ষ মে. ট.	হেক্টর কি. গ্রা.
১৯৫০-৫১	৩.১৪	২.৭৫	৮৭৫
১৯৭০-৭১	৩.৫৪	৪.১৯	১,১৮২
১৯৭৯-৮০	৩.৭৪	৫.৫২	১৪৭৬
১৯৮০-৮১	৩.৭৮	৫.৭৫	১৫২১
১৯৮৩-৮৪	৩.৯৩	৫.৯১	১৫০৩

সমস্যা ও বাণিজ্য (Problem and Trade) : ভারতীয় চা রপ্তানি বাণিজ্যের উপর একান্ত নির্ভরশীল। বর্তমানে ভারতে চায়ের আভ্যন্তরীণ চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে তথাপি প্রায় ৫২ শতাংশ চা বিদেশে রপ্তানি করা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শ্রীলংকা, বাংলাদেশ এবং জাপানের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারত অনেকটা পিছাইয়া আসিয়াছে। ইহার কারণ ভারতীয় চায়ের গুন-বৈগুণ্য, উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি, চায়ের প্যাকিং বাক্সের অভাব ইত্যাদি। বর্তমানে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারের প্রসারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হইয়াছে :

(ক) চা বাগিচায় আরও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ; (খ) বাগিচায় অব্যবহৃত জমিতে ফলের গাছ রোপণ ; (গ) যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ; (ঘ) প্যাকিং বাক্স নির্মাণের জন্য প্লাইউডের সরবরাহ ; (ঙ) চায়ের বাজারের প্রসারের জন্য চা বোর্ড (Tea Board) স্থাপন ও নতুন নিলাম বাজার স্থাপন ; (চ) চা রপ্তানির জন্য দেশী জাহাজের অধিক ব্যবহার ; (ছ) রুগ্ন চা বাগিচা অধিগ্রহণ বা সরকারী সাহায্য ইত্যাদি।

চা ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দিক হইতে দ্বিতীয়। চা রপ্তানি করিয়া ভারত বৎসরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ভারতীয় চায়ের প্রধান ক্রেতা **গ্রেট বৃটেন** ও **আমেরিকা**। ইহা ছাড়া **অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মিশর, পশ্চিম জার্মানী**ও ভারত হইতে চা ক্রয় করিয়া থাকে। ভারতীয় চায়ের বাজার এক সময় বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত হইত। বর্তমানে বহু দেশী প্রতিষ্ঠান চায়ের ব্যবসায়ে যোগ দেওয়ায় বিদেশী আধিপত্য হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৮১-৮২ সালে ভারত ৩৭৩ কোটি টাকার চা রপ্তানি করিয়াছে। ১৯৮০-৮১ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ৪২৫.৫ কোটি টাকা। ভারতীয় চায়ের প্রধান ক্রেতা বৃটিশ যুক্তরাজ্য ১৯৭৩ সালে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে (ECM) যোগ দেওয়ার ফলে ভারতের চা রপ্তানি কিছুটা ব্যাহত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে ECM-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি তাহাদের দেশে চা-এর উপর আমদানি শুল্ক হ্রাস করায় চায়ের রপ্তানি কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশের বাজারে ভারতীয় চায়ের প্রধান প্রতিযোগী শ্রীলংকা। চায়ের উৎপাদন ব্যয় কমাইতে না পারিলে ভবিষ্যতে বিদেশে চা রপ্তানিতে ভারতের যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। কলিকাতার এ. টস, এস. চক্রবর্তী, এস. চ্যাটার্জী, বি. কে. পাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান চায়ের বাজারের উল্লেখযোগ্য অংশীদার।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতে চা উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম কর। (২) আসাম চা ও দার্জিলিং চায়ের পার্থক্য কি ? (৩) ভারতের চা শিল্পের সংকট কি ? ইহা নির্গমের জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে ? (৪) আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় চায়ের পিছু হটার কারণ কি ? (৫) একটি মানচিত্রে ভারতের চা উৎপাদক অঞ্চলগুলি নামসহ দেখাও।]

কফি (Coffee)

উত্তেজক পানীয় হিসাবে ভারতে চায়ের পরেই কফির স্থান। চায়ের তুলনায় ইহা অধিকতর উত্তেজক। ১৮৩০ সাল হইতে ভারতের কর্ণাটক (প্রাচীন মহীশূর) অঞ্চলে নিয়মিত কফির চাষ শুরু হয়। জলবায়ুর কারণে কফির চাষ আজিও ভারতের দক্ষিণ অংশেই সীমাবদ্ধ।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Favourable Conditions of growth): দক্ষিণ ভারতের আর্দ্র উষ্ণ জলবায়ু (৩০° সে. উত্তাপ, ১৫০-১০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত) লৌহ মিশ্রিত উর্বর মৃত্তিকা ও জলনিকাশী ঢালু ভূপ্রকৃতি কফি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দাক্ষিণাত্যের নীলগিরি, কার্ডামম ও আন্নামালাই পর্বতের পার্শ্বদেশে ৬৫০-১৩০০ মিটার উচ্চতায় ভারতের প্রধান কফি বাগিচাগুলি অবস্থিত। ভারতে বর্ষাকালেই কফির বীজ লাগান হয়। কফি বাগিচায় চারা গাছগুলির জন্য ছায়া প্রয়োজন। এই কারণে কদলি ও ঐ জাতীয় দীর্ঘ পত্রবিশিষ্ট বহু গাছ লাগান হয়। কফি গাছগুলিতে ৩-৫ বৎসরেই ফল ধরে এবং একাদিক্রমে প্রায় ৩০ বৎসর পর্যন্ত গাছগুলি ফল দেয়। সাধারণত অক্টোবর মাসে ফল পাকিতে শুরু করে এবং জানুয়ারী পর্যন্ত ফল আহরণ করা হয়। ঐ ফল শুকাইয়া, ভাজিয়া ও গুঁড়া করিয়া বন্ধ টিনে বাজারে প্রেরণ করা হয়। কফি গাছের রক্ষণাবেক্ষণ, যত্ন ও ফল আহরণের জন্য প্রচুর সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। দক্ষিণ ভারতে এই সকল সুবিধা থাকায় কফির আবাদ প্রসার লাভ করিয়াছে।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions): ভারতে প্রধানত দুই প্রকার কফির চাষ করা হয়—**অ্যারাবিকা** (Arabica) ও **রোবাস্তা** (Robusta)। "অ্যারাবিকা" কফি কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে চাষ করা যায় বলিয়া কর্ণাটকে সহ্যাদ্রির পূর্ব ঢালেও ইহার চাষ হইয়া থাকে। ইহা স্বাদ গন্ধে উৎকৃষ্ট। ভারতে মোট উৎপাদনের প্রায় ৬০% "অ্যারাবিকা" কফি। 'রোবাস্তা' কফি কেরালা ও তামিলনাড়ুর বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে চাষ করা হইয়া থাকে।

ভারতের কফি বাগিচাগুলি **কর্ণাটক, কেরালা** ও **তামিলনাড়ু** রাজ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ। **মহারাষ্ট্রের সাতারা জিলায়ও** সামান্য কফি উৎপাদিত হয়। ভারতে মোট উৎপাদিত কফির প্রায় ৬০% কফি কর্ণাটক রাজ্যে উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের মালনাদের অন্তর্গত **কাডুর, শিমোগা, বাবাবুদান, হাসান** ও **কুর্গ** অঞ্চলেই বেশির ভাগ কফি বাগিচা অবস্থিত। ভারতে প্রায় ৭০০০ কফি বাগিচা বিদ্যমান। ইহার মধ্যে একমাত্র কর্ণাটকেই প্রায় ৪৬০০ বাগিচা দেখিতে পাওয়া যায়। কফি উৎপাদনে কর্ণাটকের পরেই কেরালা ও তামিলনাড়ুর স্থান। ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২১ ভাগ ও ১৮ ভাগ যথাক্রমে কেরালা ও

তামিলনাড়ুতে উৎপাদিত হয়। কেরালায় অধিকাংশ কফি বাগিচা পূর্বাংশে পর্বতের ঢালে পালজি, শেভারয় প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। তামিলনাড়ু রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে **নীলগিরি** ও **আন্নামালাই অঞ্চলেই** সর্বাধিক কফি উৎপন্ন হয়। বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশের **আরাকু উপত্যকা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম** ও **আন্দামান** অঞ্চলেও কফির আবাদ প্রসারের ব্যাপক প্রচেষ্টা চলিতেছে।

উৎপাদন ও বাণিজ্য (Production and Trade) : ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ভারতে কফি চাষের জন্য নিয়োজিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত মোট উৎপাদন ও হেক্টর প্রতি উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে কফি বাগিচার জন্য নিয়োজিত জমির পরিমাণ খুব উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি না পাইলেও হেক্টর প্রতি উৎপাদন অনেকাংশেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে হেক্টর প্রতি উৎপাদনে কর্ণাটক প্রথম। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু অঞ্চলে কফি বাগিচা প্রসারের এখনও প্রভূত সুযোগ বর্তমান।

ভারতীয় কফির আভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমবর্ধমান। দেশের মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতেই ব্যয়িত হয়। অবশিষ্ট শতকরা ৫০ ভাগ রপ্তানি করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রেজিলীয় কফির প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কফির বাজার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উৎপাদন ব্যয়ের তারতম্যই ইহার বড় কারণ। দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে চাহিদা বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারাভিযান চালানর জন্য "দি ইণ্ডিয়ান কফি বোর্ড" গঠন করা হইয়াছে। দেশের বড় বড় শহরে ও শিল্পকেন্দ্রে "কফি হাউস" স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় কফি প্রধানত বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানি করা হয়। দক্ষিণ ভারতের **ব্যাঙ্গালোর** বন্দর কফি রপ্তানিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। অন্যান্য বন্দরের মধ্যে তেলিচেরী, কালিকট ও মাদ্রাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৮১-৮২ সালে ভারত কফি রপ্তানি করিয়া ১৩২.৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছে।

[**প্রশ্ন** : ভারতের কফি উৎপাদক অঞ্চলগুলি বর্ণনা কর। (২) কফি উৎপাদন দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ হইবার কারণ ব্যাখ্যা কর।]

তন্তু ফসল (ibre Crops)

তুলা (Cotton)

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বই ভারতের তুলা চাষের প্রাচীনত্বের বড় নিদর্শন। সিন্ধু সভ্যতার যুগে বা তাহার পূর্বেও ভারতে তুলার চাষ প্রচলিত ছিল। বর্তমানে ভারত তুলা উৎপাদনে বিশ্বে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান (চতুর্থ) অধিকার করে। ভারতে উৎপাদিত শিল্প ফসলের মধ্যে তুলার স্থান প্রথম এবং জাতীয় অর্থনীতিতে তুলার উপর নির্ভরশীল

বস্ত্র বয়ন শিল্পের গুরুত্বও খুবই বেশি। কারণ একক শিল্প হিসাবে সূতী বস্ত্র শিল্প ভারতে সর্বাধিক জননিয়োগকারী সংস্থা। এই শিল্পে প্রায় ১০ লক্ষ লোকনিযুক্ত আছে।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Favourable Conditions of growth): তূলা ক্রান্তীয় মণ্ডলে উষ্ণ ও স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত (২৮০ সে. উত্তাপ ও ৭৫ সে. মি. বৃষ্টিপাত) লাভা বা কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে ভাল জন্মে। বৃষ্টির পরিমাণ কম হইলে জলসেচের সাহায্যেও তূলার চাষ করা যায়। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে ও দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি তূলা চাষের পক্ষে প্রাকৃতিক কারণেই বিশেষ উপযোগী। ভারতের পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের আধিক্য তূলা চাষের পক্ষে ক্ষতিকর।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতে ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তূলার চাষ শতকরা ৬০ ভাগ ছিল। সাগর দ্বীপীয় তূলার চাষ এখানে নগণ্য। দীর্ঘ ও মধ্যম আঁশযুক্ত তূলার চাষ ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৩ ভাগ ও ২৯ ভাগ। কিন্তু বর্তমানে ইহার বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতে এখন দীর্ঘ আঁশযুক্ত তূলার চাষ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এবং মধ্যম ও ছোট আঁশযুক্ত তূলার চাষ যথাক্রমে ৪০ ভাগ ও ১০ ভাগ।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions): ভারতীয় তূলার প্রায় ৬০ শতাংশ **গুজরাট, মহারাষ্ট্র** এবং **পাঞ্জাব**—এই তিনটি রাজ্যেই উৎপাদিত হয়। অবশিষ্টাংশের বেশীর ভাগ তূলা **তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান** ও **অন্ধ্রপ্রদেশে** উৎপাদিত হয়। ভারতে তূলার চাষ উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে তামিলনাড়ুর তিনেভেলী জিলা পর্যন্ত বিস্তৃত। তূলা সাধারণত শুষ্ক অঞ্চলের ফসল। এবং যে সকল স্থানে জলধারণে সমর্থ কাল মৃত্তিকা দেখা যায় সেই সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হইলেও সেচের সাহায্যে তূলার চাষ করা সুবিধাজনক। পশ্চিম ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিমাংশের লাভা বা কাল মৃত্তিকা তূলা চাষের পক্ষে আদর্শ।

ভারতের দীর্ঘ আঁশযুক্ত (২.৯+সে. মি.) তূলার চাষ প্রধানত মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে হইয়া থাকে। রাজস্থান, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে প্রধানত মধ্যম আঁশযুক্ত (২.২-২.৯ সে. মি.) তূলার চাষ হয়। ভারতের এই সকল অঞ্চলের সর্বত্রই কম-বেশি ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তূলার চাষও হইয়া থাকে। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশে, পশ্চিমবঙ্গে, আসামে ও মণিপুরে ক্ষুদ্র ও মধ্যম আঁশযুক্ত তূলার চাষ প্রসার লাভ করিয়াছে। পাঞ্জাবে নাঙ্গাল বাঁধ, রাজস্থানে চম্বল বাঁধ ও গুজরাটে কাক্‌রাপাড়া বাঁধ সম্পূর্ণ হওয়ায় এই সকল অঞ্চলে জলসেচের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং ইহার ফলে তূলার উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে হেক্টর প্রতি তূলার উৎপাদন বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এক সময় অতি নগণ্য (মাত্র ৬৮ কেজি প্রতি হেক্টরে) ছিল। কিন্তু বর্তমানে মোট উৎপাদনের সহিত হেক্টর প্রতি উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি (১৫৮ কেজি প্রতি হেক্টরে) পাইয়াছে।

ভারতে তুলা চাষের আঞ্চলিক বণ্টন (১৯৮২-৮৩

রাজ্য	নিয়োজিত জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ বেল*)	হেক্টর/কিগ্রা
উত্তরপ্রদেশ	৩৬˙৫	২৭˙৫	১৩৫
মহারাষ্ট্র	২৬˙৫	১৬˙২	১১০
গুজরাট	১৪˙৯	১৫˙৪	১৮৬
পাঞ্জাব	৭˙২	১২˙১	৩০২
হরিয়ানা	৩˙৯	৮˙৪	৩৮৭
কর্ণাটক	১০˙৮	৬˙৫	১০৮
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪˙৪	৫˙৮	২৩৭
রাজস্থান	৩˙৯	৫˙৫	২৫০
মধ্যপ্রদেশ	৬˙০	৩˙৩	৯৯
সর্ব-ভারতীয়	৮০˙৭	৭৭˙১	১৭১

[Source : Agricultural Situation in India, March, 1984.]

[* ১ বেল = ১৮০ কেজি]

বাণিজ্য ও সমস্যা (Trade and Problems) : ভারতে উৎপাদিত দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নহে। এক সময় ভারত পৃথিবীতে তুলা রপ্তানিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। বর্তমান দেশে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ভারত বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর ৩/৪ লক্ষ বেল দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা আমদানি করিয়া থাকে। ভারতে 'দি ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল কটন কমিটি' নামে এক সংস্থা বর্তমানে দেশের মধ্যে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক গবেষণা চালাইতেছে। ভারতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন এখনও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা মিশরের তুলনায় যথেষ্ট কম। ভারত হইতে প্রতি বৎসর

চিত্র ৪.৭ : ভারতে তুলা উৎপন্নের গতির বার গ্রাফ।

ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত নিকৃষ্ট মানের তুলা উলের সহিত মিশ্রিত করিবার জন্য জাপান, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানি প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, সুদান, কেনিয়া, টাঙ্গানাইকা, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে কিছু পরিমাণ ভাল জাতের তুলা আমদানি করা হয়। ভারতে তুলার উৎপাদন বিশেষ আশাপ্রদ। তুলার আভ্যন্তরীণ যোগানে ভারতের বৈদেশিক নির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতে তুলা উৎপাদনে গতিপ্রকৃতি

	নিয়োজিত জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ বেল)	হেক্টর/কেজি
১৯৫০-৫১	৫৮·৮২	২৮·৭০	৬৮
১৯৭০-৭১	৭৬·০৫	৪৪·৯৯	১০৬
১৯৮০-৮১	৭৮·২০	৭০·১০	১৫২
১৯৮২-৮৩	৮০·৭০	৭৭·২০	১৬২

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতে তুলা চাষের আঞ্চলিক বণ্টন বর্ণনা কর। (২) ভারতের দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা কোন অঞ্চলে অধিক চাষ হইয়া থাকে ? (৩) বাণিজ্যিক ফসল হিসাবে তুলা চাষের গুরুত্ব আলোচনা কর।]

পাট (Jute)

ভারতীয় অর্থনীতিতে পাটের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষিজাত ফসল প্রেরণের উপযোগী থলে, চট, ক্যানভাস, কার্পেট ইত্যাদি তৈয়ারির জন্য পাটজাত তন্তুর চাহিদা একদিন বিশ্বজোড়া ছিল। আর ঐ চাহিদার ভিত্তিতেই ভারতের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় পাটের চাষ ও পাটশিল্পের প্রসার ঘটে। বর্তমান কালে অত্যন্ত সুলভ রাসায়নিক তন্তুর আবিষ্কার পাটশিল্পের প্রসারে প্রচণ্ডতম আঘাত হানিয়াছে। তথাপি পাটের সমতুল্য অন্য কোন সুলভ তন্তু না থাকায় এবং পাটের বিকল্প বহুবিধ ব্যবহার থাকায় পাটের চাষ এখনও লাভজনক। পাটের চাষ মূলত ভারত উপমহাদেশে সীমাবদ্ধ হওয়ায় এই বিষয়ে ভারতের একাধিপত্য আজিও বিদ্যমান। কাঁচাপাট ও পাটজাত চট, থলে, কার্পেট ইত্যাদি রপ্তানি করিয়া ভারত প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিয়া থাকে ;

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Favourable conditions of growth): পাট ক্রান্তীয় অঞ্চলের বল্কল জাতীয় তন্তু (Bast Fibre) ফসল। ইহা ২৭° সে. উত্তাপ ও ২০০ সে. মি. বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের নদী-বদ্বীপে পলল মৃত্তিকায় ভাল জন্মে। বর্ষার

জলে বা নদীর বানে পাটক্ষেতে জল দাঁড়ান পাটের বৃদ্ধির সহায়ক। এই সকল প্রাকৃতিক কারণে পাট চাষ পৃথিবীতে ভারতের নিম্ন-গাঙ্গেয় সমভূমিতে ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়! পাট গাছ লম্বায় ৩ হইতে ৪ মিটার হয়। পাট চাষে প্রচুর সুলভ শ্রমিক ও জলের প্রয়োজন হয়। পাটের চাষ পশ্চিমবঙ্গে এপ্রিল-মে মাসে বিহার ও আসামে মার্চ-এপ্রিল মাসে এবং ওড়িশাতে মে-জুন মাসে, হইয়া থাকে। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই সর্বত্র পাট তোলা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions): ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারত উপমহাদেশের বাংলাদেশ পাট উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। ভারতে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে কিছু কিছু পাট চাষ ছিল। কিন্তু দেশ বিভাগের পরে কাঁচাপাটের অভাবে ভারতের বহু পাটকল বন্ধ হইয়া যায়। পাট শিল্পের এই দুরবস্থায় দেশের অর্থনীতির উপরও বিরাট

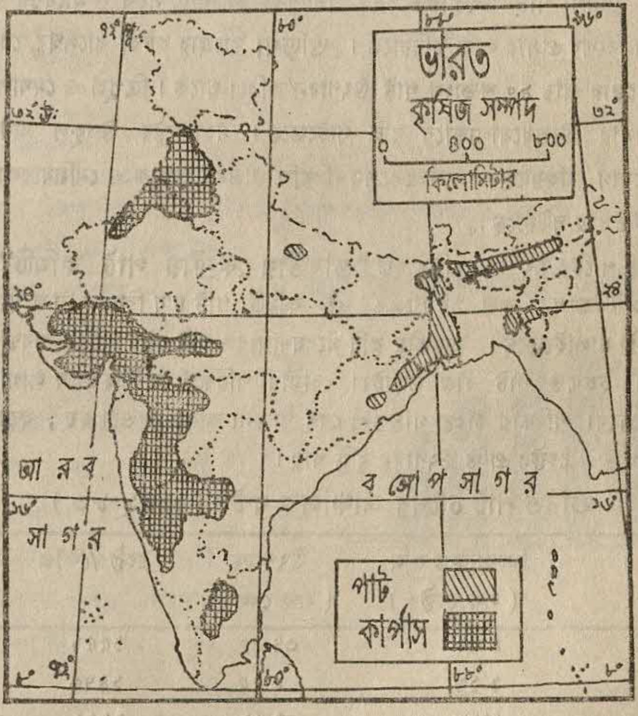

চিত্র ৪.৮ : ভারতের পাট ও তুলা (কার্পাস) উৎপাদক অঞ্চল।

চাপ পড়ে। এই কারণে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে পাট ও ইহার সহিত পাটের পরিপূরক তন্তু হিসাবে মেস্তার ব্যাপক চাষের ব্যবস্থা করা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সার-সেচ-বীজ প্রকল্পের রূপায়ণের ফলে ভারতে পাট ও মেস্তার উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রভূত পরিমাণে পাট উৎপাদিত হওয়ায় ইহা বিশ্বের দ্বিতীয়

বৃহত্তম পাট উৎপাদন অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। ভারতের পাট উৎপাদনে **পশ্চিমবঙ্গ প্রথম, আসাম দ্বিতীয়, বিহার তৃতীয়** ; ইহা ছাড়া ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্যেও পাটের চাষ হইয়া থাকে। **পশ্চিমবঙ্গের** ২৪ পরগণায়, বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, মেদিনীপুর ও কুচবিহার জেলাতে পাটের চাষ উল্লেখযোগ্য। **আসামে** পাট চাষের উপযোগী জলবায়ু ও মৃত্তিকা বিদ্যমান। এখানে গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নওগাঁ ও তেজপুর বিখ্যাত পাট উৎপাদক অঞ্চল। আসামে পাট চাষের আরও প্রসারের সম্ভাবনা রহিয়াছে। **উত্তরপ্রদেশে** অবহিমালয় সন্নিহিত ঘাঘর ও সরযূ নদীর উপত্যকা (তরাই অঞ্চল) খেরি বাহারাইচ, সীতাপুর, গোণ্ডা, বিজনোর ইত্যাদি পাট চাষের জন্য উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের নিচু জমিতে প্রায় ৪ হইতে ৫ মাস কাল নদীর জল জমিয়া থাকে। **বিহারের** পূর্ণিয়া জিলাতেই এই রাজ্যের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ পাট উৎপাদিত হয়। বিহারের কাটিহার, সহর্ষ ও মাধেপুর অঞ্চলেও পাটের চাষ বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। **ওড়িশা** রাজ্যের কটক, বালেশ্বর, কেওঞ্ঝর ও পুরী ঐ রাজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ পাট উৎপাদন করিয়া থাকে। ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে পাট চাষের প্রসার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। মহারাষ্ট্রের উপকূল অঞ্চলে পাট চাষের সুযোগ রহিয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশের বিমলি পওনথ তালুক ও নেল্লিমারলা অঞ্চলে পাটচাষের প্রসার ঘটিয়াছে।

ভারতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য **"ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটি"** নামক একটি কমিটি স্থাপন করা হইয়াছে। এই কমিটি পাট চাষ বিষয়ক নানা গবেষণা ও বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাইতেছে। ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারও পাট চাষের নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়াছে। ইহাতে পাট বীজ ছড়াইয়া বোনার পরিবর্তে শ্রেণীবদ্ধভাবে লাগান হয়। যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার করিয়া গাছগুলি বেশ পাতলা করিয়া দেওয়া হয় ; ফলে গাছের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে ও হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

ভারত পাট চাষের আঞ্চলিক বণ্টন (১৯৮২-৮৩)

রাজ্য	নিয়োজিত জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ বেল)	হেক্টর/কেজি
পশ্চিমবঙ্গ	৪'৩৯	৩৭'৮২	১৫৫১
আসাম	১'১৬	৯'৫৫	১৪৭৬
বিহার	১'১৯	৭'৩৯	১১১৬
ওড়িশা	০'৪৬	৩'৩৮	১৩০৫
উত্তরপ্রদেশ	০'০৬	০'৬২	১৭০৪
মেঘালয়	০'০৫	০'৪৭	১৫২৮
সর্ব-ভারতীয়	৭'৩৭	৫৯'৫৭	১৪৫৪

[Source : Agricultural Situation in India, March, 1884]

বাণিজ্য ও সমস্যা (Trade and Problems) : আন্তর্জাতিক বাজারে রাসায়নিক তন্তুর প্রতিযোগিতার ফলে পাটের চাহিদা ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য পাট শিল্প সরকারী আনুকূল্য পায় এবং আভ্যন্তরীণ বাজারের মূল্য বৃদ্ধির সুবিধা ভোগ করে। কিন্তু অনুরূপ সুবিধা পাট চাষীরা ভোগ করে না। অধিকন্তু সরকার নির্ধারিত কাঁচা পাটের সর্বনিম্ন দরও পাটচাষীদের স্বার্থের পরিপন্থী। ইহা ছাড়া, খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পাটের পরিবর্তে খাদ্যশস্যের চাষই অধিকতর লাভজনক। এই সকল কারণেই রাজ্যগুলিতে সাম্প্রতিক কালে পাট চাষের নিয়োজিত জমির পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে পাটের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছুটা সংশয় দেখা দেওয়ায় পাটচাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে।

ভারতে পাট উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি

বৎসর	নিয়োজিত জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ বেল)	হেক্টর (কিগ্রা)
১৯৫০-৫১	৫৭.১	৩৪.৯	১১০০
১৯৭০-৭১	৭৫.০	৪৯.৪	১১৮৬
১৯৮০-৮১	৯৪.০	৬৫.১	১২৪৫
১৯৮২-৮৩	৭৩.৪	৫৯.৫	১৪৫৪
১৯৮৩-৮৪	৭৪.০	৬০.৬	১৪৭০

[Source : Economic Survey of India, 1984-85]

ভারতে উৎপাদিত পাট দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল, ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় কাঁচা পাটের অংশগ্রহণ প্রায় অসম্ভব। দেশীয় পাটকলগুলির চাহিদা মিটাইতে বর্তমানে ভারত বাংলাদেশ হইতে বৎসরে প্রায় ২ লক্ষ মেট্রিক টন পাট আমদানি করে। ভারত হইতে নিকৃষ্ট ধরনের সামান্য পরিমাণ পাট কলিকাতা বন্দর মারফত ইউরোপে রপ্তানি করা হয়।

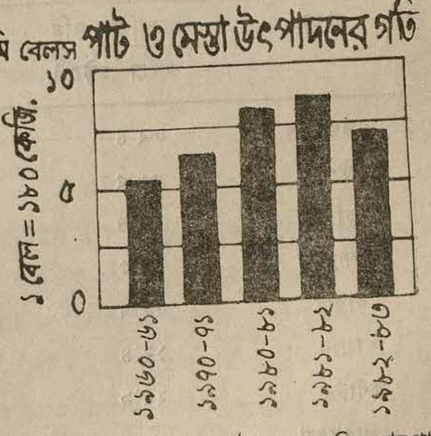

চিত্র ৪.৯ : ভারতে পাট ও মেস্তা উৎপন্নের গতির বারগ্রাফ।

[**প্রশ্ন** : (১) পাট উৎপাদনের ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা কর। (২) বর্তমান ভারতে পাট চাষের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। (৩) পাট চাষের উন্নয়নকল্পে ভারতে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ? (৪) ১৯৭৪-৭৫ সালে পাটের উৎপাদন হ্রাস পাইবার কারণ আলোচনা কর। বাংলাদেশ হইতে ভারত বৎসরে কি পরিমাণ পাট আমদানি করে এবং কেন করে ?]

মেস্তা (Mesta)

মেস্তা পাটের পরিপূরক বস্কল জাতীয় তন্তু। পাট চাষের অনুরূপ ভৌগোলিক পরিবেশে মেস্তা জন্মে। বরং পাট চাষের তুলনায় কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলেও মেস্তার চাষ করা সুবিধাজনক। এই কারণে পাটের অভাব পূরণের জন্য বর্তমানে ভারতে মেস্তার ব্যাপক চাষ শুরু হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মেস্তা বিভিন্ন নামে পরিচিত; যেমন—পশ্চিমবঙ্গে **মেস্তা**, মহারাষ্ট্রে **'আম্বাদী'**, অন্ধ্রপ্রদেশে **'বিমলি'**, হায়দরাবাদ অঞ্চলে দাক্ষিণাত্যের **'শন'** এবং বিহারে **'পুষার শন'**।

পাটের মত মেস্তা চারাও ৩ হইতে ৪ মিটার লম্বা হয় এবং ইহাকে কাটিয়া জলে পচাইয়া তন্তু লওয়া হয়। পাটের তুলনায় মসৃণতায় ও শক্তিতে ইহা নিকৃষ্ট। মেস্তা উৎপাদনে ভারতে **অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথম, ওড়িশা দ্বিতীয়, বিহার তৃতীয়** এবং **পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ**। মেস্তা উৎপাদক অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে মহারাষ্ট্র, আসাম, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ ও ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য। হেক্টর প্রতি উৎপাদনে **অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথম** এবং **পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয়**।

ভারতে মেস্তা চাষের আঞ্চলিক বণ্টন (১৯৮২-৮৩)

রাজ্য	নিয়োজিত জমি (সহস্র হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ বেল)	প্রতি হেক্টর (কে. জি.)
অন্ধ্রপ্রদেশ	৮২.৪	৫.১০	১১১৬
ওড়িশা	৩৬.৫	১.৮০	৮৮৭
বিহার	২৭.৪	১.৩৩	৮৭৩
পশ্চিমবঙ্গ	২০.৫	১.০৩	৯০২
মহারাষ্ট্র	৫৮.৭	১.০২	৩১৫
আসাম	১২.৪	০.৫১	৭৩৮
কর্ণাটক	২৫.৯	০.৪১	২৯০
মধ্যপ্রদেশ	৮.৮	০.১৪	২৮৫

[Source : Agricultural Situation in India, March, 1984]

ভারতে কাঁচা পাটের অভাব মিটাইবার জন্যই মেস্তার চাষ প্রসারলাভ করিয়াছিল। বর্তমানে পাটের আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় ভারতের পাটকলে কার্যক্রমেও কিছুটা মন্দা দেখা দিয়াছে। ভারতে পাট ও মেস্তা উৎপাদনের জন্য এই কারণে নিয়োজিত জমির পরিমাণ বর্তমানে হ্রাস পাইতেছে। ভবিষ্যতে রাসায়নিক তন্তুর সহিত পাট ও

মেস্তার সাফল্যজনক সংমিশ্রণ ও ব্যবহারের নতুন ক্ষেত্র উদ্ভাবনের উপর মেস্তা উৎপাদনের ভবিষ্যত অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে।

ভারতে মেস্তা উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি

বৎসর	নিয়োজিত জমি (লক্ষ. হেক্টর)	মোট উৎপাদন (লক্ষ বেল)	প্রতি হেক্টর (কে.জি.)
১৯৭০-৭১	৩.৩	১.২৬	৬৮৪
১৯৭৯-৮০	৩.৮	১.৮৯	৮৮৮
১৯৮০-৮১	৩.৬	১.৬৫	৮২৮
১৯৮২-৮৩	২.৯	১.২২	৭৬৮
১৯৮৩-৮৪	২.৯	১.৩৬	৮৫০

[Source : Economic Survey of (India), 1984-85]

[১ বেল = ১৮০ কেজি]

[প্রশ্ন : (১) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মেস্তা কি কি নামে পরিচিত ? (২) ভারতে মেস্তা চাষের গুরুত্ব ও আঞ্চলিক বণ্টন লিখ।]

ইক্ষু (Sugarcane)

চিনি উৎপাদনের প্রধানতম কাঁচামাল ইক্ষু। পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ চিনি উৎপাদিত হয় তাহার শতকরা ৬৫ ভাগ ইক্ষু হইতে এবং অবশিষ্ট ৩৫ ভাগ বীট হইতে উৎপন্ন হয়। ইক্ষু ক্রান্তীয় এবং বীট নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ফসল। ভারত ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু মণ্ডলের অন্তর্গত হওয়ায় ইক্ষু চাষের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা এখানে প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান। শীতকালে এখানে সামান্য পরিমাণ বীট উৎপাদিত হয়। ভারতে ইহার বাণিজ্যিক গুরুত্ব অতি নগণ্য। বীট চাষের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে এবং হেক্টর প্রতি ইহার উৎপাদনও বেশি। এই কারণে ভবিষ্যতে ভারতে শীতকালে বীট চাষের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ইক্ষু উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারতের চিনি শিল্প বিদেশে চিনি রপ্তানি করিয়া প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়া থাকে। অধিকন্তু ইক্ষু উৎপাদনে, চিনি শিল্প ও আনুষঙ্গিক মত্ত শিল্পে প্রচুর লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারতে ইক্ষুর চাষ নতুন নহে। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার

বৎসর পূর্বেও ভারতে যে ইক্ষুর চাষ প্রচলিত ছিল ইহার বহু নিদর্শন ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। ভারত ও চীন হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইক্ষুর চাষ প্রসার লাভ করে।

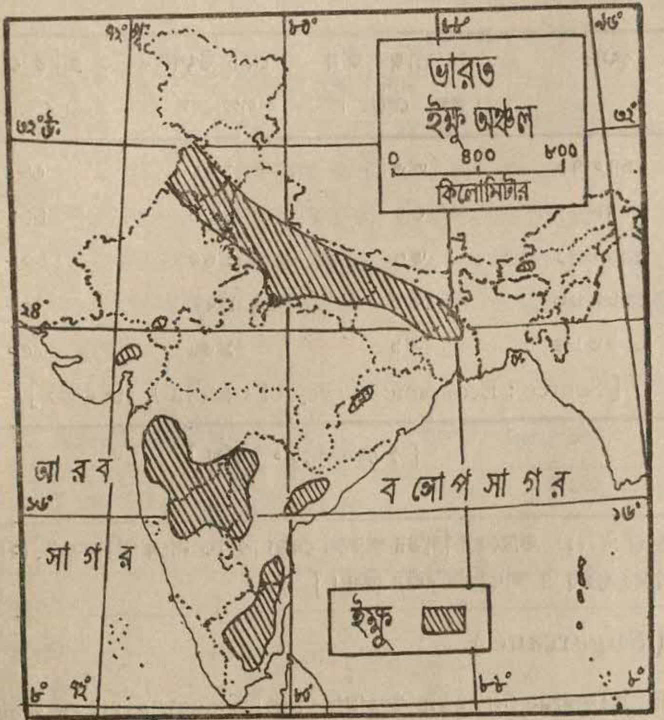

চিত্র ৪.১০ : ভারতের ইক্ষু উৎপন্নের অঞ্চল

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা (Favourable conditions of growth) : ইক্ষু উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপযোগী জলবায়ু (২৭° সে. উত্তাপ এবং১০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত) এবং চূণ ও লবণ মিশ্রিত উর্বর দোআঁশ মৃত্তিকা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে দেখা যায়। বৃষ্টিপাত ও মাটির জলধারণ ক্ষমতা সর্বত্র সমান নহে। অনেক স্থলে সেচের সাহায্যে ইক্ষুক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions) : ভারতের প্রতি রাজ্যেই কম-বেশি ইক্ষু উৎপাদিত হয়। কিন্তু ভারতে ইক্ষুর শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ একমাত্র উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে, যেমন—উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা পাঞ্জাব, ও পশ্চিমবঙ্গে জন্মে। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক ভারতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল। ইক্ষু ক্ষেত্রে প্রচুর সার ব্যবহার করা প্রয়োজন। ইক্ষু উৎপাদনে **উত্তর প্রদেশ** ভারতে প্রথম।

এখানে ভারতের প্রায় ৪০% ইক্ষু উৎপাদিত হয়। এই অঞ্চলের সাহারানপুর, শাহজাহান-পুর, ফৈজাবাদ, গোরক্ষপুর, আজমগড়, বালিয়া, জৌনপুর, বারাণসী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ইক্ষু উৎপাদন কেন্দ্র। **মহারাষ্ট্র** ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইক্ষু উৎপাদক অঞ্চল। মহারাষ্ট্রের আহমদনগর, পুণার অন্তর্গত বারামতী-ইন্দপুর, সাতারা, কোলাপুর এবং সাঙ্গালি, **বিহারের** চম্পারণ, সারণ, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর প্রভৃতি, **পশ্চিমবঙ্গের** বীরভূম, নদীয়া ও বর্দ্ধমান জিলা এবং **পাঞ্জাবের** অমৃতসর, জলন্ধর ও রোটক প্রভৃতি অঞ্চলে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। ভাকরা বাঁধ নির্মিত হওয়ায় পাঞ্জাবে ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। **কর্ণাটকের** মাণ্ড্য অঞ্চল ও **তামিলনাড়ুর** কাবেরী, পেরিয়ার ও ভাইগাই নদী-তীরবর্তী অঞ্চলেও প্রচুর ইক্ষুর চাষ হয়। **অন্ধ্রপ্রদেশের** নলগোণ্ডা, মহাভূবনগর, ওয়ারঙ্গল, মেডক, খাম্মাম প্রভৃতি অঞ্চলে ইক্ষুর চাষ হয়। ইহা ছাড়া **কেরালা, গুজরাট রাজস্থান, ওড়িশা,** প্রভৃতি রাজ্যে ইক্ষুর চাষ হয়। জলবায়ুর দিক হইতে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি ইক্ষু উৎপাদনের পক্ষে আদর্শ। ঐ সকল অঞ্চলে ইক্ষুর উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতে ইক্ষুর হেক্টর প্রতি উৎপাদন বিশ্বের অন্যান্য উৎপাদক অঞ্চলের তুলনায় কম। ভারতে বর্তমানে হেক্টর প্রতি উৎপাদন মাত্র ৫০ মেট্রিক টন। কিন্তু হাওয়াই ও জাভা অঞ্চলে ইহার পরিমাণ যথাক্রমে ১৫৫ ও ১৪৪ মেট্রিক টন। বর্তমানে ভারতের সকল অঞ্চলে উন্নত ও অধিক চিনি উৎপাদক ইক্ষুর চাষ করা হইতেছে।

ভারতে ইক্ষু উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি

রাজ্য	বপিত এলাকা (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (১০ লক্ষমে. ট.)	প্রতি হেক্টর (কেজি)	উৎপাদন (মি.মে.ট.)
	১৯৮৩-৮৪		১৯৮২-৮৩	
উত্তরপ্রদেশ	১৭·০৪	৭৮·৯৬	৪৬,৩৪১	৮১·৩৮
মহারাষ্ট্র	২·৯৪	২৬·৫৫	৯০,৩১২	৩১·৩৬
কর্ণাটক	১·৮৩	১৩ ৪১	৭৩,২৮৯	১৪·৯১
অন্ধ্রপ্রদেশ	১·৪১	৯·৬৮	৬৮,৬৫২	১২·৬০
পাঞ্জাব	০·৮৪	৫·২০	৬১,৯০৪	৬·৩৪
হরিয়ানা	১·৩৪	৫·৯৩	৪৪,২৭৬	৫·৫০
বিহার	১·২৭	৩ ৮৮	৩০·৫৬৬	৪·৪৬
পশ্চিমবঙ্গ	০·২০	১·০২	৫১, ১৫০	১·৫৯
সর্ব-ভারতীয়	৩১·৭০	১৭৭·০২	৫৫,৯০৪	১৮৯.৫০

[Scource : Agricultural Situation in India, October, 1684]

বাণিজ্য ও সমস্যা (Trade and Problems) : ভারতে ইক্ষু উৎপাদনে বিশেষ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইক্ষু উৎপাদন তেমন উন্নত নহে। ইহার কারণ ভারতের কৃষি ব্যবস্থার কুফল, জলসেচ ও সারের অব্যবস্থা। বর্তমানে এই সকল বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হওয়ায় পূর্ব অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতে উৎপাদিত ইক্ষুর শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ গুড় ও খান্দেশারীতে ব্যবহৃত হয়। মোট উৎপাদনের শতকরা ২৫।৩০ ভাগ ইক্ষু চিনিকলে প্রেরিত হয়। ভারতে যানবাহন ব্যবস্থার অনুন্নতির ফলেও চিনিকলে ইক্ষু প্রেরণে বিলম্ব ঘটে এবং ইক্ষুর রস শুকাইয়া চিনির উৎপাদন কম হয়। এই অসুবিধাগুলি দূর করিয়া ইক্ষুর রসে চিনির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য **জাভা পদ্ধতিতে** ইক্ষু চাষের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ভারতে গুড় প্রস্তুত করিবার সময় সুরাসার (Alcohol) তৈয়ারি ও ছিবড়া (Baggassce) হইতে কাগজ তৈয়ারির সুবন্দোবস্ত না থাকায়ও ইক্ষু উৎপাদনকারীরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। Indian Central Sugar Committee ভারতে ইক্ষু চাষের উন্নতি বিধানের জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা করিতেছে।

চিত্র ৪.১১ : ভারতের ইক্ষু উৎপাদের গতির বারগ্রাফ।

ভারতের ইক্ষু উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি

বৎসর	নিয়োজিত জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টঁ.	প্রতি হেক্টর (মে.টঁ)
১৯৫০-৫১	১৭'০৭	৭০'৫০	১৩,৪২৫
১৯৭০-৭১	২৬'১৫	১২৬'৩৭	৪৮,৩২২
১৯৮০-৮১	২৫'৬৭	১৫৪'২৫	৫৭,৮৪৪
১৯৮২-৮৩	৩১'৯২	১৮৬'৩৬	৫৮,৩৫৯
১৯৮২-৮৩	৩৩'৭০	১৮৯'১৩	৫৬,২০৮

[প্রশ্ন : (১) ইক্ষু উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা কি ? ভারতের কোন্ কোন্ রাজ্যে ইক্ষু উৎপাদিত হয়। (২) ইক্ষু উত্তরপ্রদেশের প্রধান বাণিজ্যিক ফসল হইবার কারণ ব্যাখ্যা কর। (৩) "ইক্ষু উৎপাদনে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি অধিকতর উপযুক্ত"—কারণ ব্যাখ্যা কর। (৪) হেক্টর প্রতি ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমানে কি কি পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে।]

রবার (Rubber)

প্রাকৃতিক রবার নিরক্ষীয় জলবায়ু মণ্ডলের হেভিয়া নামক স্বাভাবিক এক প্রকার বৃক্ষের কষ বা তরুক্ষীর (Latex) হইতে পাওয়া যায়। ভারতের দক্ষিণপ্রান্ত নিরক্ষীয় মণ্ডলের নিকটবর্তী হওয়ায় ঐ অঞ্চলের জলবায়ু রবার চাষের পক্ষে উপযোগী। ভারতের কেরালা রাজ্যে পেরিয়ার নদীর উপত্যকায় ১৯০২ সালে প্রথম রবারের আবাদ শুরু হয়। দক্ষিণ আমেরিকার পারা রবারের বীজ ইংলণ্ড মারফত এদেশে আমদানি করা হইয়াছিল। প্রথম দিকে রবারের উৎপাদন তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতেই ভারতীয় রবারের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা ও উৎপাদক অঞ্চল (Conditions of growth and Producing regions): ভারতের দক্ষিণ ভাগের অতি উষ্ণ ও আর্দ্র (৩০° সে. উত্তাপ ও ২০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত) জলবায়ু এবং গভীর ও ভারী দোআঁশ মৃত্তিকা রবার চাষের অনুকূল। ভারতে উৎপাদিত রবারের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ একমাত্র **কেরালা** রাজ্যেই উৎপাদিত হয়। কেরালা ব্যতীত **তামিলনাড়ু** ও **কর্ণাটক** রবারের আবাদ হইয়া থাকে।

ভারতের রবার উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি

বৎসর	নিয়োজিত জমি সহস্র হেক্টর	উৎপাদন সহস্র মে. ট.	প্রতি হেক্টর (কেজি)
১৯৫০-৫১	৫৮	১৪	২৪২
১৯৭০-৭১	২০৩	৮০	৫৩২
১৯৮০-৮১	২৭৯	১৩৩	৬৪৩
১৯৮২-৮৩	২৮৭	১৪৪	৬৭৮
১৯৮৩-৮৪	২৯২	১৫২	৭০২

বাণিজ্য ও সমস্যা (Trade and Problems): ভারতের উৎপাদিত রবারের পরিমাণ বিশ্বের মোট উৎপাদিত রবারের শতকরা এক ভাগ মাত্র। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন স্বল্প হওয়ায় প্রতি বৎসর ভারতে প্রচুর রবার আমদানি করা হয়। ভারতে রবার শিল্পের উন্নতি, রবারের আমদানি নিয়ন্ত্রণ, মূল্য নিরূপণ ইত্যাদি কার্যের ভার **ভারতীয় রবার বোর্ডের** (Indian Rubber Board) উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। **কোট্টায়ামে** ইহার প্রধান কার্যালয়। ইহা ছাড়া আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার জন্য **কৃত্রিম রবারের** একটি কারখানা উত্তর প্রদেশের বেরিলিতে স্থাপন করা হইয়াছে।

ভারতে নতুন রবার বাগিচা সৃষ্টির জন্য **ত্রিপুরা** ও **আন্দামান** অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে রবার চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রবার গাছ হইতে ৬।৭ বৎসরের পূর্বে ল্যাটেক্স পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা সময়-সাপেক্ষ। বর্তমানে রবারের হেক্টর প্রতি উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে রবার উৎপাদনে ভারতের প্রভূত অগ্রগতির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতে কোথায় রবার উৎপাদিত হয়? (২) রবারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে?]

তামাক (Tobaco)

নেশার সামগ্রী হিসাবে তামাকের চাহিদা বর্তমানে ক্রমবর্ধমান। ভারত তামাক উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সহিত একত্রে ভারত বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ তামাক উৎপাদন করিয়া থাকে। পর্তুগীজগণ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে তামাকের বীজ আনিয়া ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে তামাকের আবাদ করে। ভারতে প্রধানত দুই প্রকার তামাকের চাষ হয়—'নিকোটিনা ট্যাবুকাম' এবং 'নিকোটিনা রাষ্টিকা'। 'নিকোটিনা ট্যাবুকাম' প্রধানত সিগারেট ও চুরুট তৈয়ারিতে ব্যবহৃত হয় এবং 'নিবোটিনা রাষ্টিকা'র সাহায্যে হুকার তামাক, নস্যি, জর্দা প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। ভারতে ভার্জিনিয়া জাতীয় উচ্চ মানের তামাকের পরিমাণ মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ; অবশিষ্টাংশ নিম্নমানের এবং বিভিন্ন প্রকার আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে উহার ব্যবহার হয় বেশি।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা ও উৎপাদক অঞ্চল (Conditions of growth and Producing regions): ভারতের উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু তামাক চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। দক্ষিণ ভারতের মধ্যভাগের অত্যধিক উত্তাপ ও মাঝারি পরিমাণের বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ভারতের তামাকের চাষ জুন হইতে আগস্টের মধ্যে হয় এবং ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ফসল তোলা হয়। জমির উর্বরতা ও পরিমিত বৃষ্টিপাত তামাকের স্বাদ, গন্ধ ও হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক। ভারতে তামাকের চাষ দুইটি প্রধান অঞ্চলে সীমাবদ্ধ—**উত্তরাঞ্চলে** গুজরাট, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং **দক্ষিণাঞ্চলে** তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র। এই দুইটি অঞ্চলের বাহিরে পাঞ্জাবের জলন্ধর, হোসিয়ারপুর ও গুরুদাসপুরে এবং রাজস্থান অঞ্চলেও তামাকের কম-বেশি: চাষ হয়। তামাক উৎপাদনে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথম এবং গুজরাট দ্বিতীয়। **অন্ধ্রপ্রদেশে** গুন্টুর, প্রকাশম, বিশাখাপত্তনম, পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী, খাম্মাম, নেল্লোর, কুর্ণল প্রভৃতি অঞ্চলে ভাল

জাতের তামাক উৎপন্ন হয়। **তামিলনাড়ু** রাজ্যের ডিণ্ডিগাল, মাদুরাই, থাঞ্জাভুর, তিরুচিরাপল্লী, কোয়াম্বাটুর তামাক উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। **বিহারে** মজঃফরপুর বৈশালি, সমস্তিপুর, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, কাটিহার এবং **পশ্চিমবঙ্গে** জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জিলায় প্রচুর তামাক উৎপন্ন হয়। **মহারাষ্ট্রের** সাঙ্গলি, কোলাপুর, শোলাপুর এবং **উত্তরপ্রদেশের** এটাওয়া, মৈনপুরী, বারাণসী প্রভৃতি অঞ্চল তামাক উৎপানের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র।

ভারতে তামাক চাষের আঞ্চলিক বণ্টন (১৯৮২-৮৩)

রাজ্য	নিয়োজিত জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মে. ট.)	হেক্টর/কেজি
অন্ধ্রপ্রদেশ	২.৫৩	২.৬৯	১০৬৩
গুজরাট	১.১০	২.০৯	১৯০০
কর্ণাটক	০.৪৮	০.৩১	৬৪৫
ওড়িশা	০.১৫	০.০৭	৪৬৬
পশ্চিমবঙ্গ	০.১৬	০.১৫	৯৩৭
মহারাষ্ট্র	০.১২	০.০৭	৫৮৩
তামিলনাড়ু	০.০৮	০.২৩	২৮৭৫
সর্ব-ভারতীয়	৫.০১	৫.৯৪	১১৮৫

বাণিজ্য সমস্যা (Trade and Problems) : ভারতে উৎপাদিত তামাকের প্রায় ২০ শতাংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বৃটেন, মিশর, রাশিয়া, জাপান, এডেন, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া ভারতীয় তামাকের প্রধান ক্রেতা। অন্ধ্রপ্রদেশের গুণ্টুর ভারতীয় তামাকের প্রধান বাজার এবং মাদ্রাজ বন্দর হইতেই ভারতের রপ্তানিকৃত তামাকের শতকরা প্রায় ৬০ শতাংশ বিদেশে প্রেরিত হয়।

ভারতীয় তামাকের পাতা পুরু, রং কালো ও স্বাদ কড়া। এই কারণে ইহা সিগারেট প্রস্তুতে বিশেষ উপযোগী নহে। ভারতে একমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশ সিগারেট তৈয়ারির উপযুক্ত ভার্জিনিয়া তামাক উৎপন্ন হয়। ভারতে হেক্টর প্রতি তামাকের উৎপাদনও কম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনে হেক্টর প্রতি তামাকের উৎপাদন যথাক্রমে ২২০০ ও ১৩০০ কিলোগ্রাম। ভারতে ইহার পরিমাণ মাত্র ৯৬৫ কিলোগ্রাম। অতীতের তুলনায় ভারতে হেক্টর প্রতি উৎপাদন বর্তমানে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে তামাক চাষের উন্নতির জন্য Indian Central Tobacco Committee গঠন করা হইয়াছে। ইহার সহযোগিতায় তালিনাড়ুর ভেদাসনদাস, বিহারের পুষা, পশ্চিমবঙ্গের দিনহাটায়, এবং গুজরাটে তামাকের আঞ্চলিক গবেষণাগার স্থাপন করা হইয়াছে। ভারতীয় তামাক শিল্পে এখনও বিদেশী মূলধনের প্রভাব প্রায় ৮০ শতাংশ। ভারতীয় তামাকের স্বাদ ও গুণের উন্নতি ঘটাইতে পারিলে ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভবনাময় হইয়া উঠিবে।

ভারতে তামাক উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি

বৎসর	নিয়োজিত জমি (লক্ষ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মে: ট.)	প্রতি হেক্টর (কেজি)
১৯৫০-৫১	৩'৫৭	২'৫৭	৭২০
১৯৭০-৭১	৪'৪৭	৩'৬২	৮১০
১৯৮০-৮১	৪'৫২	৪'৮১	১০৭০
১৯৮২-৮৩	৫'০১	৫'৯৪	১১৮৫

[প্রশ্ন : ভারতে কত প্রকার তামাকের চাষ হয় ও কি কি ? (২) ভারতের তামাক উৎপাদক অঞ্চল কি কি ? (৩) ভারতে তামাকের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?]

তৈলবীজ (Oil Seeds)

তৈলবীজ উৎপাদনে ভারত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ইহা দেশের একটি অন্যতম প্রধান অর্থ নৈতিক ফসল। তৈলবীজ হইতে ভক্ষ্য তেল, সালাড, খাদ্য দ্রব্য, রং সাবান, বার্নিশ, ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। ভারতে ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য দুই প্রকার তৈলবীজ উৎপাদিত হয়। **ভক্ষ্য তৈলবীজ**—চীনাবাদাম, সরিষা, তিল, সয়াবীন ও কার্পাস বীজ। **অভক্ষ্য তৈলবীজ**—তিসি, রেড়ী ইত্যাদি। বিদেশের বাজারে প্রধানত ইউরোপে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, বেলজিয়াম-এর বাজারে ভারতীয় তৈলবীজের চাহিদা রহিয়াছে। পূর্বে তৈলবীজ হিসাবেই বেশি রপ্তানি করা হইত। বর্তমানে তেল নিষ্কাশন করিয়া এবং বীজ আকারেও ইহা রপ্তানি করা হয়। **ভারতীয় কেন্দ্রীয় তৈলবীজ কমিটি** ভারতে তৈলবীজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করিতেছে। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল ও আর্জেন্টিনা হইতে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় তৈলবীজের বৈদেশিক বাজার কিছুটা সংকুচিত হইয়াছে। নিম্নের সারণীতে ভারতের প্রধান তৈলবীজগুলির আলোচনা করা হইল।

ভারতে তৈলবীজের উৎপাদন

বৎসর	নিয়োজিত (মি. হেক্টর)	উৎপাদন (মি. মে. ট.)	হেক্টর/কেজি
১৯৭০-৭১	১৬'৬৪	৯'৬৩	৫৭৯
১৯৮১-৮২	১৯'০৬	১২'১৯	৬৪০
১৯৮২'৮৩	১৯'১০	১০'৫৫	৫৫২
১৯৮৩-৮৪	১৮'৬৯	১২'৮১	৬৮৫

[Source : Economic Survey (India) : 1984-85]

ভারতে তৈলবীজের ব্যবহার ও বণ্টন (১৯৮৩-৮৪)

তৈলবীজ	ব্যবহার	উৎপাদক অঞ্চল	উৎপাদক মি. মে. ট.	হেক্টর/ কি.গ্রা.
চীনাবাদাম (Ground-nut)	বনস্পতি তেল, কেশতেল, সাবান ও নানা ধরনের খাবার প্রস্তুতে ব্যবহৃত।	মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক।	৭.২	৯৫৩
সরিষা (Mustard and Rape-Seeds)	রন্ধনকার্যে সাবান, বনস্পতি প্রস্তুতে ও গাত্রমর্দনে ব্যবহৃত।	উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ওড়িশা।	২.৫৬	৬৫৯
তিল (Sesamum)	রন্ধনকার্যে, কেশতেল প্রস্তুতে ব্যবহৃত।	মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট উত্তরপ্রদেশ।	০.৬২	২৮৩
কার্পাসবীজ (Cotton-Seeds)	রন্ধনকার্যে, বনস্পতি প্রস্তুতে ব্যবহৃত।	মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, গুজরাট, কর্ণাটক তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ।	৩.৯	৫১৮
রেড়ী (Castor-seed)	ঔষধ, সাবান, কেশ তেল, পিচ্ছিলকরণ তেল প্রস্তুতে ব্যবহৃত	মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু।	০.৪০	৬৩৭
তিসি (Linseed)	রং বার্নিশ, অয়েল-ক্লথ, ইত্যাদি প্রস্তুতে ব্যবহৃত।	মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ।	০.৪৪	৩০০
নারিকেল (Cocoanut)	ভক্ষ্যতেল, কেশতেল, দড়ি, ছোবড়া, জাজিম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত।	কেরালা, তামিলনাড়ু, আন্দামান, অন্ধ্র, পশ্চিমবঙ্গ।	...	...

অনুশীলনী ৪

১। ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য কি কি? যে কোন দুইটি প্রধান খাদ্যশস্য যে ভৌগোলিক অবস্থায় জন্মায় তাহা বর্ণনা কর।

[What are the major foodcrops of India ? Describe the geographical conditions under which any two principal crops are grown.]

২। (ক) ভারতে কত প্রকার ধানের চাষ হয়? (খ) ধান চাষের ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা কর? ভারতের ধান উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির নাম লেখ।

(a) How many types of rice are cultivated in India ? (b) Describe the geographical conditions favourable for the cultivation of rice. Name: the principal producing States of rice in India.]

[W.B. H. S. C. Exam. 1982]

৩। গম চাষের অনুকূল অবস্থাগুলি আলোচনা কর। ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল-গুলির নাম লেখ। গম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলি আলোচনা কর।

[Discuss the favourable conditions for wheat cultivation. Name the producing areas of wheat in India. Discuss the steps taken to increase the production of wheat.]

৪। ভারতের প্রধান প্রধান বাগিচা ফসল কি কি? উহাদের যে কোন একটি ফসলের উৎপাদনের উপযোগী ভৌগোলিক পরিবেশ ও উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির কেন্দ্রীভবন সম্পর্কে লেখ।

[What are the principal plantation crops of India ? Select any one of them and describe the geographical environment favourable for its production and the areas of its concentration.]

[W. B. H. S. C. Exam. 1983]

৫। ভারতের চা ও কফি চাষের ভৌগোলিক অবস্থাগুলি বর্ণনা কর ও ইহাদের উৎপাদক অঞ্চলের নাম লেখ। কফি উৎপাদন দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ হইবার কারণ ব্যাখ্যা কর।

[Discuss the geographical conditions of tea and coffee plantation in India and name their producing regions. Explain the causes of concentration of coffee plantation in southern India.]

৬। (ক) ভারতের পাট ও কার্পাস চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থাগুলি বর্ণনা কর। (খ) ভারতের পাট ও কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম লেখ।

[Describe the geographical conditions favourable for the cnltivation of Jute and Cotton in India. Name the producing areas of Jute and Cotton in India.]

[(a)—W. B. H. S. C. Exam. 1980]

৭। ভারতে পাট চাষের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা কর। এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই ফসল কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে ?

[Discribe the favourable geographical conditions for the cultivation of Jute in India. How does the crop help in the economic development of this country.] [W. B. H. S. C. Exam. 1984]

৮। কি কি ধরনের অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় ভারতে পাট ও চা উৎপাদন করা হয় বর্ণনা কর। ভারতে কোন্ কোন্ রাজ্য পাট ও চা উৎপাদনে অগ্রণী ?

[Describe the favourable geographical and economic conditions under which Jute and Tea are grown in India. Which States of India lead in the production of Jute and Tea ?]

[W. B. H. S. C. Exam. 1982]

৯। ইক্ষু উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশগুলির বর্ণনা দাও। অধিক ইক্ষু উৎপাদনশীল ভারতীয় রাজ্যগুলির নাম লিখ। ভারতে ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধির পন্থা নির্দেশ কর।

[Describe the geographical conditions favourable for the cultivation of sugarcane. Name the Indian states where sugarcane is lrrgely produced. Suggest measnres to increace the production of sugarcane in India.] [W. B. H. S. C. Exam. 1981]

১০। রবার ও তামাক উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা আলোচনা কর। ইহাদের উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম লেখ।

[Give an account of the favourable conditions of Rubber and Tobacco production. Name their producing areas.]

৫ ভারতে পশু সম্পদ ও পশুপালন (Pastoral Resources and Animal Husbandry)

পশু সম্পদ (Pastoral Resources)

ভারতের কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠির পরিপূরক উপজীবিকা পশুপালন। কৃষিকার্য বা অন্যান্য প্রাথমিক উপজীবিকার অভাবেও মানুষ পশু পালনকে স্থানবিশেষে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। পশু সম্পদে ভারত খুবই সমৃদ্ধ। এই দেশে গরু, মহিষ, মেষ, ছাগল, ও হাঁস-মুরগী উল্লেখযোগ্য পশু সম্পদ। ইহা ছাড়া ঘোড়া, গাধা, অশ্বেতর, উট, শূকরও প্রতিপালিত হয়। গবাদি পশু পালনে ভারতের স্থান প্রথম এবং মেষ পালনে পঞ্চম। ১৯৮০-৮১ সালে ভারতে প্রায় ২০ কোটি গরু, ৫·৬ কোটি মহিষ, ৪·৩৯ কোটি মেষ, ৬ কোটি ছাগল, ১ কোটি ভারবাহা পশু ও ঘোড়া, ১৩ কোটি হাঁস-মুরগী ও প্রায় ১ কোটি অন্যান্য পশু প্রতিপালিত হয়।

শিল্প হিসাবে পশুপালন দেশের জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। এই কারণে নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিতে পশুপালন শিল্প বিশেষ উন্নত। ভারত ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত হওয়ায় এদেশে সুসংগঠিত তৃণভূমির বড়ই অভাব। **মধ্যবর্তী সমভূমি, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও হিমালয়ের পাদদেশে ও পর্বতের ঢালে** বিক্ষিপ্ত ভাবে যে সকল তৃণাঞ্চল দেখা যায় ঐ সকল স্থানে এবং **কৃষি অঞ্চলে** অসংগঠিত ভাবে পশু পালন করা হয়। ভারতে প্রতি ১০০ হেক্টর কৃষিজমিতে ১২৮টি গবাদি পশু পালিত হয়। উত্তরপ্রদেশে ইহার অনুপাত ১৫০ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে মাত্র ১১। গবাদি পশুর সংখ্যা সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায় উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে। ভারতের শতকরা ২০ ভাগ গবাদি পশু এই সকল রাজ্যে প্রতিপালিত হয়।

উপজাত দ্রব্য (By-products): পশু পালন উন্নত কৃষি ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংগ। কৃষি ব্যবস্থার সহিত পশুপালনের সমন্বয় ফসল আবর্তন, জমির উৎপাদিকা শক্তি সংরক্ষণ, কৃষকদের প্রচ্ছন্ন বেকারী দূরীকরণ ইত্যাদি পরোক্ষ কার্যাবলী দ্বারা কৃষি ব্যবস্থাকেই সুসংগঠিত করে। পশু জাত দ্রব্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) **দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি এবং পশম।** গরু, মহিষ, ছাগল, উট ইত্যাদি পশুর জীবদ্দশায় দীর্ঘকাল ইহাদের দুগ্ধ সংগ্রহ করা যায় ও দুগ্ধ হইতে ছানা, ক্ষীর, দধি, ঘি, মাখন, গুঁড়া দুধ ইত্যাদি পাওয়া যায়। অধিকন্তু মেষ, উট প্রভৃতি পশুর লোম বা পশমও দীর্ঘকাল আহরণ করা যায়। (২) **মাংস, চর্ম, চর্বি ইত্যাদি।** গরু, মহিষ, মেষ, পাঁঠা, হাঁস, শূকর ইত্যাদি বধ করিয়া ইহাদের মাংস, চর্ম, চর্বি, হাড়, শিং, খুর প্রভৃতি আহরণ

করা হয়। বিভিন্ন শিল্পে এই সকল দ্রব্যের ব্যবহার বিশেষ লাভজনক। পশুজাত দ্রব্যকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে একদিকে যেমন দুগ্ধ শিল্প এবং পশম শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে অপর দিকে তেমনি চর্ম শিল্প এবং হাড়ের গুঁড়া হইতে সার শিল্পেরও প্রসার ঘটিয়াছে।

আঞ্চলিক বণ্টন (Regional Distribution): ভারতে মধ্যবর্তী সমভূমি অঞ্চলেই সর্বাধিক গরু ও মহিষ পালন করা হয়। দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে গবাদি পশু প্রতিপালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা রাজ্যে মহিষের সংখ্যা অধিক। ভারতের গবাদি পশু নিকৃষ্ট শ্রেণীর। আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড ও ইউরোপের তুলনায় এদেশের গরুর দুগ্ধ ও মাংস প্রদানক্ষমতা খুবই কম। এদেশে মহারাষ্ট্রের পুণা, উত্তরপ্রদেশের আগ্রা, এলাহাবাদ, কানপুর, অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্ণুল, গুন্টুর, তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা ও দার্জিলিং, পাঞ্জাবের অমৃতসর, গুজরাটের রাজকোট অঞ্চলে এবং দিল্লীর শহর এলাকায় দুগ্ধশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতে উৎপাদিত দুগ্ধের শতকরা৪৩**ভাগ গাভী হইতে** এবং ৫৭ **ভাগ মহিষ হইতে** পাওয়া যায়। ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রতিটি গাভী হইতে বৎসরে গড়ে প্রায় ৪০০০ লিটার দুধ পাওয়া যায়। ভারতে রমাণ মাত্র ১৭৫ লটার। ভারতে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে উন্নত পদ্ধতিতে গবাদি পশু পালন ও দুগ্ধ উৎপাদনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। বর্তমানে দেশে **২০৬টি** উন্নত মানের দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৮০-৮১ সালে ভারতে দৈনিক দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩১ লক্ষ লিটার। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে **অমৃতসর, ঝিন্দ, চণ্ডীগড়, আনন্দ, আলিগড়, মোরাদাবাদ, মাহসিনা, আহমেদাবাদ, বরোদা, রাজকোট, হুবলী ধারওয়ার, বাঙ্গালোর, কোয়েম্বাটুর** এবং পশ্চিমবঙ্গের **হরিণঘাটা, ডানকুনি, বেলগাছিয়া, দার্জিলিং** উল্লেখযোগ্য।

মাংস ও পশম উৎপাদনের জন্য মেষ পালন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ ও দক্ষিণ ভারতের আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলেই প্রধানত মেষ প্রতিপালিত হয়। জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের গুর্জর, গদ্দী, কিন্নর, কালপী, গাড়োয়ালী, কুমায়ুনী প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় উন্নত শ্রেণীর পশু পালন করিয়া থাকে। কুলু, কাংড়া, চাম্বা, কাশ্মীর প্রভৃতি উপত্যকায় উন্নতমানের মেষ প্রতিপালিত হয়। ১৯৮০-৮১ সালে ভারতে প্রায় ৫০০০ টন পশম উৎপন্ন হইয়াছিল। চর্মশিল্পে উত্তর-প্রদেশের লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আগ্রা, গুজরাটের আনন্দ, তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা এবং দিল্লীর নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতে মেষ পালনে ও পশম শিল্পে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশের উত্তরাখণ্ড, বিহার, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। এদেশে উৎপন্ন পশম নিকৃষ্ট শ্রেণীরই বেশি। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা, জলন্ধর, অমৃতসর, উত্তর

প্রদেশের কানপুর, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, ভূপাল, গুজরাটের আমেদাবাদ, কাশ্মীরের শ্রীনগর, মহারাষ্ট্রের বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি বিশিষ্ট পশমশিল্প কেন্দ্র। এই সকল শিল্পে বোনার উল, কার্পেট, শাল, কম্বল, প্যান্ট-কোটের গরম কাপড় ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। ভারতে উলের উৎপাদন যদিও খুবই কম কিন্তু ইহার উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভারতে ছাগল হইতে মাংস, চর্ম ও দুগ্ধ পাওয়া যায়। উটের দুধ ও লোম রাজস্থান এবং গুজরাটে স্বল্প পরিমাণে আহরণ করা হয়। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাঁস-মুরগী প্রতিপালন করা হয়। ইহাদের ডিম ও মাংসের চাহিদা ক্রমবর্ধমান।

সমস্যা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা (Problems and Development Efforts): ভারতে বিভিন্ন জাতীয় পশু অধিক সংখ্যায় প্রতিপালিত হইলেও পশুজাত দ্রব্য এবং ইহার উপর নির্ভরশীল শিল্প ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে নাই। ইহার কারণ—

(১) এদেশে জলবায়ুর কারণে পশুপালনের উপযোগী বিস্তীর্ণ তৃণভূমির অভাব। উৎকৃষ্ট পশুখাদ্যের অভাব পূরণেরও তেমন কোন ব্যবস্থা নাই।

(২) উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু গবাদি পশু ও মেষ পালনের পক্ষে অনুকূল নহে এবং ক্রান্তীয় অঞ্চলের রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব বেশি। উন্নত পশু প্রজনন-কেন্দ্র ও পশু চিকিৎসালয়েরও যথেষ্ট অভাব।

(৩) পশুপালন শিক্ষার তেমন ব্যবস্থা নাই। পশুপালন বিক্ষিপ্তভাবে কৃষির সহায়ক জীবিকা হিসাবেই করা হয়। ফলে একক শিল্প হিসাবে ইহার প্রসার ঘটে নাই।

(৪) জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নিচু হওয়ায় মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের চাহিদা কম। অধিকন্তু ইহার বৃদ্ধিকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থার অভাব এবং আধুনিক পশু-পালনের উপযোগী ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদিরও অভাব। ধর্মীয় অনুশাসনে গরুর মাংস ও শুকরের মাংস নিষিদ্ধ হওয়ায় মাংস শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হয়।

এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া পশুপালনকে একটি স্বনির্ভর শিল্প হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হইয়াছে :

(১) ব্যাপক গ্রাম্য গোপালন কেন্দ্র ও পশু চিকিৎসালয় স্থাপন এবং পশু খাদ্য উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(২) উন্নত ধরনের জার্সি ও ফ্রেসিনা সংকর জাতীয় গরু আমদানি করিয়া এদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ৫টি কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সংকর জাতীয় গরুর মধ্যে **'রেড সিন্ধ'**, **'থরপার্কার'** এবং **'জার্সি'** এবং মহিষের মধ্যে **'মুরা'** ও **'সুর্তি'** উল্লেখযোগ্য।

(৩) মেষের উন্নতিকল্পে অষ্ট্রেলিয়া হইতে **'করিডেল'** জাতীয় মেষ আমদানি করা হইয়াছে এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশে

সংকর জাতীয় মেষ প্রজনন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। বিহার এবং মধ্যপ্রদেশেও অনুরূপ কেন্দ্র খোলা হইবে। সোভিয়েত রাশিয়া হইতেও প্রচুর সংখ্যক **মেরিনো** মেষ আমদানি করা হইয়াছে।

(৪) সরকারী প্রচেষ্টায় হাঁস ও মুরগী প্রতিপালনে যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও উন্নত খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

(৫) শুকর প্রতিপালনেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশের গন্নাভরম শুকর প্রতিপালনের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শুকর প্রতিপালন কেন্দ্র করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

(৬) আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশুবধের জন্য ভারতে গোয়ার পানাজি, কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর, অন্ধ্রের হায়দরাবাদ, পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি ও তামিলনাড়ুর মাদ্রাজে আধুনিক পশু বধশালা (Modern Slaughter House) স্থাপন করা হইবে।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতের দুগ্ধ শিল্প ও পশম শিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির নাম উল্লেখ কর। (২) ভারতে পশুপালন শিল্পের সমস্যা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।]

৬ ভারতের মৎস্য সম্পদ ও মৎস চাষ
(Fish Resources and Fishing)

তিন দিকে সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় এবং দেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল থাকায় ভারতে মৎস্য সম্পদের উজ্জ্বল সম্ভাবনা বর্তমান। ব্যবহার ও গুরুত্বে কৃষি ও পশুপালনের পরেই মৎস্য চাষের গুরুত্ব। ভারতে স্বাদু জলের মৎস্য ও সামুদ্রিক মৎস্য উভয় প্রকার মৎস্যই পাওয়া যায়।

স্বাদু জলের মৎস্য (Sweet water fish) : আভ্যন্তরীণ নদী-নালা, খাল-বিল ঝিল-পুষ্করিণী ও জলাধার হইতে এই সকল মৎস্য আহরণ করা হয়। ইহার মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, বোয়াল, আড়, চিতল, ভেটকি, ইলিশ, বাটা, চিংড়ি, কই, মাগুর, শোল ইত্যাদি প্রধান। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, আসাম, উত্তর প্রদেশ, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের আভ্যন্তরীণ জলভাগ হইতেই এই সকল মৎস্য ধৃত হয়। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদীর নিম্নগতিতে ব-দ্বীপের মুখে স্বাদু জলের বিস্তৃত মৎস্যক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই গড়িয়া উঠে। এই সকল মৎস্য আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে ব্যবহৃত হয়। মৎস্য ভারত স্বয়ংভর নহে। তথাপি আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে নদী মোহনার এই সকল মৎস্যক্ষেত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। কেরালার Back-water এবং ওড়িশার চিল্কা হ্রদ মৎস্যক্ষেত্র হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যপ্রদেশের ভূপালে নর্মদা-বেতোয়া-পার্বতী ও ইহাদের উপনদীসমূহে উন্নত মৎস্য চাষ কেন্দ্র গড়িয়া তোলার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে।

সামুদ্রিক মৎস্য (Sea Fish) : ভারতের নাতিদীর্ঘ উপকূলভাগে মৎস্য শিল্প গড়িয়া তোলার অপূর্ব সুযোগ বর্তমান! ভারতে সামুদ্রিক মৎস্যের মধ্যে স্যামন, হেরিং, ম্যাকারেল, পমফ্রেট, চান্দা, চিংড়ি, ভেটকি প্রধান। ভারতের উপকূলভাগে বসবাসকারী অধিবাসীদের মধ্য ছাড়া অন্যত্র সামুদ্রিক মৎস্যের চাহিদা আজিও খুব উল্লেখযোগ্য নহে। সামুদ্রিক মৎস্য প্রধানত মহারাষ্ট্র, বোম্বাই, গোয়া, কর্ণাটক ও কেরালা সংলগ্ন আরব সাগরের উপকূলে এবং তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের উপকূলেই ধৃত হয়।

মৎস্য শিল্পের সমস্যা (Problems of Fishing Industry) : ভারতে সুসংগঠিত মৎস্য চাষ তেমন প্রসার লাভ করে নাই। কারণ দীর্ঘকাল ধর্মীয় অনুশাসনে ভারতের এক বিরাট জনগোষ্ঠী নিরামিষাশী।

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ও উপকূলীয় রাজ্যগুলিতে অধিকসংখ্যক মৎস্যাশী

লোকের বাস বলিয়া ঐ সকল অঞ্চলে মৎস্য চাষের সীমিত প্রসার লক্ষ্য করা যায়। ভারতে সামুদ্রিক মৎস্য চাষ প্রসারে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলিই প্রধান—

(১) ভারত ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া ইহার উপকূলভাগে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মত স্বাভাবিক মৎস্যচারণক্ষেত্র গড়িয়া উঠে নাই। বিষাক্ত মৎস্যের প্রাদুর্ভাবও বেশি।

(২) ভারতে কৃষির সহজ সুযোগ বর্তমান থাকায় উপকূলীয় অধিবাসীবৃন্দ একমাত্র জীবিকা হিসাবে মৎস্য আহরণকে গ্রহণ করে নাই।

(৩) নিরামিষাশী ভারতীয়গণের মধ্যে মৎস্যের চাহিদা কম হওয়ায় মৎস্যশিল্পে অতীতে অর্থ বিনিয়োগও খুবই কম ছিল। অবশ্য বর্তমানে মৎস্যাশী লোকের সংখ্যার সহিত মৎস্যের চাহিদাও ক্রমবর্ধমান।

(৪) ভারতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বৎসরে গড়ে পাঁচ মাস (সেপ্টেম্বর-জানুয়ারী) সম্ভব। অন্য সময় সমুদ্রে অস্থিরতার জন্য মৎস্য আহরণ প্রায় সম্ভব হয় না।

(৫) ভারতের অধিকাংশ লোক কয়েকটি বিশেষ ধরনের মৎস্য ব্যবহারেই অভ্যস্ত।

(৬) পর্যাপ্ত মূলধন, হিমঘর, আধুনিক যন্ত্রপাতি, জাহাজ-ট্রলার' ড্রিপটার ও উন্নত ধরনের কারিগরী দক্ষতার অভাব। ধীবরগণের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতাও এই শিল্পের প্রসারের প্রতিবন্ধক।

(৭) ভারতের তটরেখা অভগ্ন বলিয়া বন্দর গঠনের অসুবিধাও মৎস্য শিল্পের প্রসারের অন্তরায়।

(৮) মৎস্য টিনবন্দী করিবার উপযুক্ত শিল্পের অভাব ও দেশের অভ্যন্তরভাগে দ্রুত মৎস্য প্রেরণ উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব।

(৯) মৎস্য হইতে বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থার অভাব।

[প্রশ্ন : (১) ভারতে মৎস্য-শিল্পের সমস্যাগুলি উল্লেখ কর।]

উৎপাদন ও প্রসার (Production and Extension) **:** স্বাধীনতালাভের পরবর্তীকালে ভারতে মৎস্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ স্বাদু জলের মৎস্যক্ষেত্রের উন্নতি ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের প্রসারের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে মৎস্য আহরণে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে আহৃত মৎস্যের মোট পরিমাণ ছিল ৭'৫২ লক্ষ টন। ইহার মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ শতাংশ। ১৯৭৩-৭৪ সালে ভারতে মোট ১৯'৫৮ লক্ষ টন মৎস্য আহরণ করা হয়। ইহার মধ্যে ১২'১০ লক্ষ টন সামুদ্রিক মৎস্য। ১৯৮০-৮১ সালে ইহার পরিমাণ ২৪'২৪ লক্ষ টন হইয়াছে। ইহার মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্যের পরিমাণ ১৪'৪১ লক্ষ টন এবং স্বাদুজলের মৎস্যের পরিমাণ ৯'৮৩ লক্ষ টন।

সাম্প্রতিক অগ্রগতি (Recent Progress) : ভারতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি ঘটিয়াছে। ১৯৮২-৮৩ সালে যান্ত্রিক নৌযানের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৮,১৩৫ এবং গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের উপযোগী জলযানের সংখ্যা ১১৪। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের সুবিধার জন্য কোচিন, রায়চক, বিশাখাপত্তনম বন্দর অঞ্চলে মৎস্য আহরণকারী জলযানের জন্য বন্দর ও পোতাশ্রয় গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া মৎস্যশিকারী জলযানের জন্য মাদ্রাজ, মালপে, কোদিয়াকাড়াই, করঞ্জা প্রভৃতি ছোট ছোট পোতাশ্রয় নির্মিত হইতেছে। বম্বে, মাঙ্গরোল, ভেরাবল, পোরবন্দর, কাঁকিনাড়া, নিজাপত্তনম, নীলেশ্বরম, ম্যাঙ্গালোর, দীঘা প্রভৃতি বন্দরে মৎস্যশিকারী জলযানের পোতাশ্রয় নির্মিত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ জলভাগের মৎস্যাহরণও বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৭২ সালে আভ্যন্তরীণ উৎস হইতে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ছিল ৬·৯ লক্ষ টন। ১৯৮১ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯·৫ লক্ষ টন। ভারতে মৎস্য চাষ ও আহরণে বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ভারতে বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রের উন্নতি নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে লক্ষ্য করা যায় —

(১) **অন্ধ্র ও তামিলনাডু উপকূল**—এই অঞ্চলের সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রের আয়তন প্রায় ৬০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এই অঞ্চলে প্রায় ১ লক্ষ টন সামুদ্রিক মৎস্য ও ৫০ লক্ষ টন স্বাদু জলের মৎস্য ধৃত হয়। এই অঞ্চলের সামুদ্রিক মৎস্যের মধ্যে সার্ডিন, জুফিশ, রিবণ-ফিশ, ম্যাকরেল ইত্যাদি প্রধান। এই অঞ্চলের মৎস্যক্ষেত্রের মধ্যে পূর্ব-উপকূলে গঞ্জাম, গোপালপুর, বিশাখাপত্তনম, নেলোর, মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, নেগাপত্তম এবং পশ্চিম উপকূলে কোঝিকোড, ম্যাঙ্গালোর সন্নিহিত উপকূল উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি এই অঞ্চলে গভীর সমুদ্রেও মৎস্য আহরণ করা হয়।

(২) **কেরালা-কর্ণাটক উপকূল**—এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক মৎস্য ধৃত হয়। ধৃত মৎস্যের মধ্যে সার্ডিন, ম্যাকারেল, চিংড়ি প্রধান। নরওয়ের সহযোগিতায় কেরালা মৎস্যক্ষেত্রের প্রসার ঘটান সম্ভব হইয়াছে। কর্ণাটকে আভ্যন্তরীণ জলভাগ হইতে প্রচুর মৎস্য ধৃত হয়।

(৩) **পশ্চিম-ওড়িশার উপকুলভাগ**—এই অঞ্চলে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার টন। আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় ইহা খুবই সামান্য। কলিকাতা এই অঞ্চলের প্রধান মৎস্যের বাজার এবং পশ্চিমবঙ্গেই মৎস্যের চাহিদা সর্বাধিক। সামুদ্রিক মৎস্যের মধ্যে এখানে পমফ্রেট, ভেটকি, চিংড়ি, তপসী, চান্দা, রিবণফিশ ইত্যাদি প্রধান। এই অঞ্চলে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য ব্যাপক প্রকল্প রচনা করা হইয়াছে।

(৪) **মহারাষ্ট্র উপকূল**—এই অঞ্চলে বিশেষ উন্নত মৎস্য শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে বৃহৎ বোম্বাই, ব্রোচ, রত্নগিরি ও চান্দা অলঙ্ককে কেন্দ্র করিয়া। ধৃত মৎস্যের মধ্যে

পমফ্রেট, ভারতীয় স্যামন, মুলে, ম্যাকরেল ইত্যাদি। এই অঞ্চলে মৎস্য আহরণ ও মৎস্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক সুবিধা বর্তমান।

(৫) **গুজরাট উপকূল**—এই উপকূলে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। ধৃত মৎস্যের মধ্যে পমফ্রেট, চিংড়ি, ভারতীয় স্যামন, জুফিশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গুজরাটের ভেরাবল মৎস্য শিল্পের প্রধান কেন্দ্র।

ভারতের মৎস্য আহরণের গতিপ্রকৃতি (মি. মে. ট)

	১৯৮০	১৯৮১	১৯৮২
ভারত	২·৪৪	২·৪৪	২·৩৪
চীন	৪·২৪	৪·৩৭	৪·৯৩
জাপান	১০·৪২	১০·৬৭	১০·৭৭
বিশ্ব	৭২·৩৭	৭৪·৭৬	৭৪.৭০

প্রশ্ন : [ভারতে মৎস্যের উৎপাদন ও উহার ভৌগোলিক বণ্টন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

উন্নয়ন প্রচেষ্টা (Development Programme): মৎস্য শিল্পের উন্নতির জন্য যেসকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে উহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

(ক) গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের উপযোগী সাজসরঞ্জামের সরবরাহে সরকারী আনুকূল্য। (খ) সমুদ্রোপকূলে হিমঘর, হিমায়নযন্ত্র, গুদামঘর নির্মাণ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি। (গ) মৎস্যের উপজাত দ্রব্যসমূহের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার। অর্থাৎ হাড়, কাঁটা ও অখাদ্য মৎস্য দ্বারা সার তৈয়ারিকরণ, চর্বি, আঁশ ও অন্যান্য উপজাত দ্রব্যের সদ্ব্যবহারকরণ। (ঘ) সামুদ্রিক মৎস্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তনের প্রচেষ্টা।

(ঙ) মৎস্য আহরণ, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য কেন্দ্র স্থাপন।

বাণিজ্য (Trade): ভারতে আহৃত মৎস্য আভ্যন্তরীণ চাহিদার পক্ষে যথেষ্ট নহে। পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ হইতে ভারত কিছু পরিমাণে মৎস্য আমদানি করিয়া থাকে। ভারত প্রতি বৎসর গলদা চিংড়ি, ভেটকি, নানা জাতের কাঁকড়া ইত্যাদি কিছু মাছ ইউরোপ ও জাপানের বাজারে রপ্তানি করিয়া থাকে। ১৯৮১-৮২ সালে ভারত প্রায় ২৮৬ কোটি টাকা মূল্যের ৭০,১০০ টন মৎস্য বিদেশে রপ্তানি করিয়াছিল।

[**প্রশ্ন** : ভারত মৎস্য-শিল্প উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ? (২) ভারতে মৎস্যের বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।]

৭ | ভারতে অরণ্য ও অরণ্য সম্পদ (Forest and Forest Products in India)

অরণ্য সম্পদে ভারত বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এই দেশের অরণ্যভূমি ইহার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ও উপজাত দ্রব্যের বিভিন্নতায় অতুলনীয়। ভারতের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ বা ৭৪.৮ মিলিয়ন হেক্টর ভূ-ভাগ অরণ্যাবৃত। এই অরণ্যাঞ্চলে প্রায় ৫০০০ প্রকারের বৃক্ষলতাদি দেখা যায়। ভূমি সংরক্ষণের দিক হইতে ভারতীয় বনভূমিকে **খাস বন** (Reserve Forest) বা **সরকারী বন, সংরক্ষিত বন** (Protected Forest) বা **সরকারী বনরক্ষকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বন** এবং **অশ্রেণীভুক্ত বন** (Unclassified Forest) এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সরকারী বনে সাধারণের পশুচারণ বা কাষ্ঠ সংগ্রহ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সংরক্ষিত বনে বনরক্ষকের অনুমতি সাপেক্ষে সাধারণের পক্ষে পশুচারণ ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করা সম্ভব। অশ্রেণীভুক্ত বনে কোন প্রকার বাধা-নিষেধ নাই। ভারতের অরণ্যভূমি প্রধানত সরকারী মালিকানার অধীন হইলেও বেসরকারী মালিকানায়ও কিছু কিছু অরণ্য দেখা যায়।

অরণ্য ভূমির শ্রেণীবিভাগ (Classification of Forests): ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর সহিত স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও অরণ্যের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। ইহার উপরই অরণ্যের বিস্তার নির্ভর করে। ভারতভূমি ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্গত। বৃষ্টিপাত এই দেশে ঋতুগত এবং সর্বত্র সমভাবে বণ্টিতও নহে। অধিকন্তু পার্বত্য অঞ্চল, মালভূমি ও কৃষিপ্রধান সমভূমি এই দেশের উল্লেখযোগ্য ভূ-বৈচিত্র্য। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধানত বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা ও ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী নানা জাতীয় অরণ্য দেখা যায়।

ভারতে বনভূমির বণ্টন (মি. হেক্টর)

বনভূম	১৯৭৭-৭৮	১৯৭৯-৮০
(১) সরলবর্গীয়	৭.৪৬	৭.৮০
(২) চিরহরিৎ ও বাঁশ ঝাড়সমেত অন্যান্য	৬৬.৬৭	৬৭.০০
	৭৪.১৩	৭৪.৮০

নিম্ন ভারতের বিভিন্ন জাতীয় অরণ্য ও ইহার আঞ্চলিক বণ্টন আলোচিত হইল।

(১) **চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণ্য** (Evergreen Forest): ভারতে অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল (বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় ২০০ সে. মি. এর অধিক, বার্ষিক গড় উত্তাপ ২৫°—২৭° সে. ও বার্ষিক গড় আর্দ্রতা ৭০% এর অধিক) যেমন—পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে আসাম, অরুণাচল, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে, পশ্চিম উপকূলের

সহ্যাদ্রির পশ্চিম ঢালে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে এই প্রকার অরণ্য দৃষ্ট হয়। এই অরণ্যাঞ্চলের বৃক্ষরাজির মধ্যে মূল্যবান কাষ্ঠের জন্য শিশু, গর্জন, চাপলাশ, চিকরাশি, তেলসুর, গোলাপ গন্ধ, তুন, পুন, নাহার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া বাঁশ, বেত, জাম, রবার প্রভৃতিও প্রচুর জন্মে। এই অঞ্চলে এক স্থানে এক জাতীয় বৃক্ষের সমাবেশ কম। জলবায়ু অতিমাত্রায় উষ্ণ ও আর্দ্র হওয়ায় স্যাতসেঁতে ও অস্বাস্থ্যকর, যানবাহনের অসুবিধা এবং অরণ্য গভীর বলিয়া বনজ সম্পদ আহরণ অতিমাত্রায় কষ্টসাধ্য।

(২) **মৌসুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য** (Monsoon Deciduous Forest) : ভারতের মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে (১০০ হইতে ২০০ সে. মি. বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত, ২৮° হইতে ৩০° সে. বার্ষিক গড় উত্তাপ) **অবহিমালয় অঞ্চলে, উত্তরের সমভূমির স্থানে স্থানে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমাংশে** এই প্রকার অরণ্যের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ভারতের অরণ্যভূমির মধ্যে পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই অরণ্যে শাল, সেগুন, আবলুস, গামারি, তুঁত, জারুল, অর্জুন, বহেড়া, শিরীষ, শিমুল, হরীতকী, মহুয়া, পলাশ কুসুম, প্রভৃতি অতি মূল্যবান কাষ্ঠের বৃক্ষ জন্মে। এই অঞ্চলে জলবায়ু ও যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি উন্নত বলিয়া কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদের আহরণ সহজ।

(৩) **গুল্ম ও তৃণভূমি** (Shrubs and Grasslands) : ভারতে স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে (৫০-৭৫ সে. মি. বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত এবং শীত ও গ্রীষ্ম তীব্র) উত্তর-পশ্চিম **ভারতের পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাটে, মধ্য ভারতের মালভূমি অঞ্চলে** এবং **পার্বত্য অরণ্য অঞ্চলেও** বিক্ষিপ্তভাবে তৃণভূমি ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের বিস্তার দেখা যায়। বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার জন্যই নিবিড় অরণ্যের সৃষ্টি হইতে পারে না। তৃণভূমি পশুচারণের উপযোগী এবং এই অঞ্চলের সাবাই ও নানা জাতীয় ঘাস হইতে কাগজ ও দড়ি প্রস্তুত করা যায়। বিভিন্ন ধরনের গুল্ম আয়ুর্বেদের ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

(৪) **মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ** (Desert Shrubs) : ভারতের প্রায় বৃষ্টিহীন অঞ্চলে (৫০ সে. মি. এর কম বার্ষিক বৃষ্টিপাত, গড় উত্তাপ ৩০° সে.)—**রাজস্থানে, উত্তর প্রদেশে ও পাঞ্জাবের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে** শাঁসালো ডাঁটা ও দীর্ঘ মূলবিশিষ্ট ছোট ছোট বাবুল, তেশিরা, ফনিমনসা ইত্যাদি কাঁটা গাছ জন্মে। জ্বালানী হিসাবেই ইহাদের ব্যবহার সর্বাধিক। বাবুল গাছ হইতে গঁদ পাওয়া যায়।

(৫) **জলাভূমির অরণ্য বা তটদেশীয় অরণ্য** (Mangrove or Coastal Forest) : ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে এবং গঙ্গা-কৃষ্ণা-কাবেরী নদীর ব-দ্বীপে লোনা জলবায়ু অঞ্চলে এক বিশেষ ধরনের অরণ্য দৃষ্ট হয়। তাল, নারিকেল, সুপারী, পুগুর, সুন্দরী, কেয়া প্রভৃতি এই অরণ্যের অন্তর্গত। এই প্রকার অরণ্যে মধু, মোম, চর্ম রঞ্জক দ্রব্য ইত্যাদি প্রচুর পাওয়া যায়।

(৬) **পার্বত্যাঞ্চলের অরণ্য** (Hill Forest) : ভারতে পার্বত্যাঞ্চলের অরণ্য একমাত্র হিমালয় পর্বতেই দৃষ্ট হয়। এই পর্বতের বিভিন্ন উচ্চতায় জলবায়ুর তারতম্যের জন্য বনভূমিরও তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। হিমালয়ের অরণ্যাঞ্চলকে **পূর্ব হিমালয়ের অরণ্য** এবং **পশ্চিম হিমালয়ের অরণ্য** এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এই দুই অরণ্যের উচ্চতা অনুযায়ী বনভূমিও ইহার অন্তর্গত বৃক্ষলতাগুল্মাদির নাম নিম্নের ছকে দেখান হইল—

হিমালয়ের উচ্চতা অনুযায়ী উদ্ভিদের বিন্যাস

	তুষার
	৫৫০০ মিটার
তুষার	শীর্ষদেশীয় উদ্ভিদ—তৃণ ও পুষ্প
৪০০০ মিটার	৪০০০ মিটার
শীর্ষদেশীয় উদ্ভিদ—তৃণ, পুষ্প ও রডোডেনড্রন	সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য—পাইন, ফার, স্প্রুস, জুনিপার ইত্যাদি
৩৩০০ মিটার	৩৩০০ মিটার
নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য—ওক, স্প্রুস, বার্চ-দেওয়ার, ম্যাপল প্রভৃতি	নাতিশীতোষ্ণ চিরহরিৎ অরণ্য—ওক, ম্যাপল, এলম, চেস্টনাট ইত্যাদি
২২০০ মিটার	২২০০ মিটার
ক্রান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্য—চির, ওক প্রভৃতি	ক্রান্তীয়, পর্ণমোচী, অরণ্য—অলডার, বার্চ, পাইন, ওক ইত্যাদি
১১০০ মিটার	১১০০ মিটার
নিরক্ষীয় পার্বত্য অরণ্য—শিশু, গর্জন, শাল, পলাশ, মেহগনি, শিরীষ, টুন, বাঁশ, বেত, চা, আপেল, লেবু ইত্যাদি।	নিরক্ষীয় পার্বত্য অরণ্য—মেহগনি শাল, শিশু, সেগুন, জারুল, বেত, বাঁশ, গর্জন, চা, কমলালেবু ইত্যাদি।
সমুদ্রপৃষ্ঠ	সমুদ্রপৃষ্ঠ
পশ্চিম হিমালয় প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ	**পূর্ব হিমালয় প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ**

[প্রশ্ন : (১) ভারতের বনভূমির শ্রেণীবিভাগ কর। (২) ভারতীয় বনাঞ্চলের আঞ্চলিক বণ্টন দেখাও।]

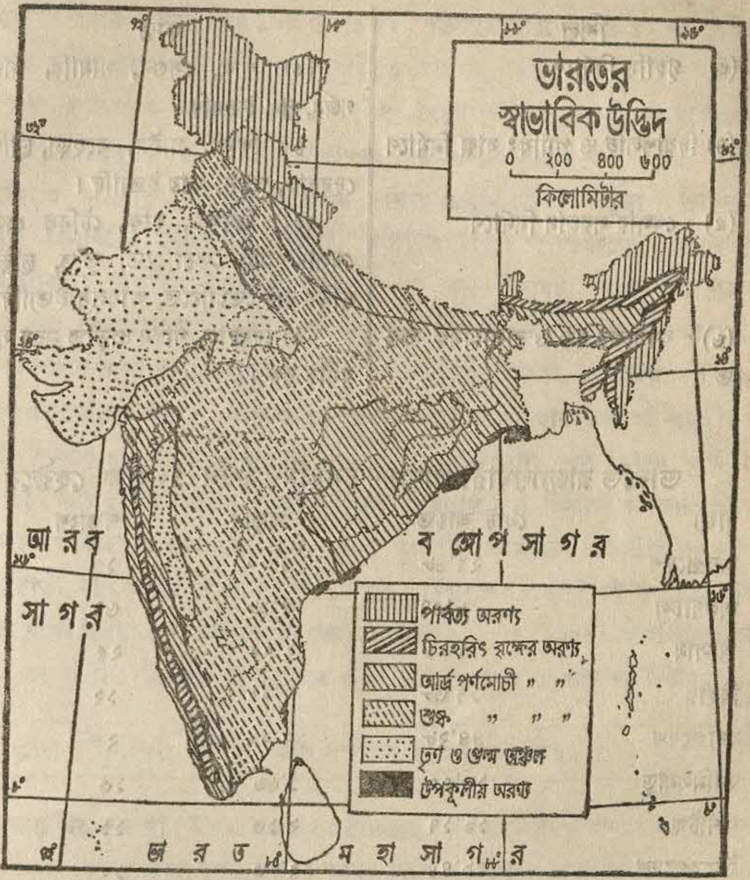

চিত্র ৭.১ : ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ অঞ্চল

বনজ সম্পদ ও ইহার ব্যবহার (Forest Products and their uses) : ভারতীয় বনজ সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—প্রধান বনজ সম্পদ ও অপ্রধান বনজ সম্পদ।

প্রধান বনজ সম্পদ—ইহা প্রধানত নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত কাষ্ঠ ও জ্বালানীকে বুঝায়। নিম্নের ছকে কাষ্ঠের ব্যবহার দেখান হইল।

শিল্প	কাষ্ঠ
(১) রেলপথ, জাহাজ, নৌকা ইত্যাদির পাটাতন, স্লিপার, মাস্তুল প্রভৃতি নির্মাণে	(১) শাল, সেগুন, গর্জন, গোলাপ গন্ধ, তেলসুর, অর্জুন, চাপলাশ, জারুল, পাইন, স্প্রুস ইত্যাদি।
(২) আসবাবপত্র নির্মাণে	(২) শাল, সেগুন, মেহগনি, গামারি, আবলুস, শিরীষ, চাপলাস, তুন, বার্চ ইত্যাদি।

শিল্প	কাষ্ঠ
(৩) গৃহাদি নির্মাণে	(৩) শাল, সেগুন, গামারি, জারুল, গর্জন, পুন: ইত্যাদি।
(৪) দিয়াশলাই ও প্যাকিং বাক্স নির্মাণে	(৪) শিমুল, পাইন, বহেড়া, ছাতিম, দেবদারু, স্প্রুস, ফার ইত্যাদি।
(৫) খেলার সরঞ্জাম নির্মাণে	(৫) ক্রিকেট, হকি, টেনিস প্রভৃতি খেলার ব্যাট তৈয়ারিতে, তুঁত, ছড়ি ও ছড়ির বাট তৈয়ারিতে, আবলুস ইত্যাদি।
(৬) কাগজের মণ্ড ও রাসায়নিক তন্তু প্রস্তুতে	(৬) দেবদারু, পাইন প্রভৃতি নরম সরল-বর্গীয় বৃক্ষ।

ভারতে রাজ্যানুযায়ী সাধারণ বনভূমির বণ্টন (১০ লক্ষ হেক্টরে)

রাজ্য	মোট আয়তন	বনভূমি	শতাংশ
অন্ধ্রপ্রদেশ	২৭.৬৮	৪.৮০	১৭
অরুণাচল	৮.৩৭	৫.১৮	৬২
আসাম	৭.৮৪	২.০০	২৫
বিহার	১৭.৩৮	২.০০	১২
মধ্যপ্রদেশ	৪৪.২৮	১২.০০	২৭
তামিলনাডু	১৩.০০	১.৬৬	১৩
কর্ণাটক	১৯.১৭	২.১৩	১১
উত্তরপ্রদেশ	২৯.৪৪	২.৮৩	১০
মহারাষ্ট্র	৩০.৭৭	৫.৫৬	১৮
পশ্চিমবঙ্গ	৮.৭৮	০.৬৯	৮

অপ্রধান বনজ সম্পদ (Minor Forest Products) ; ভারতের বনভূমি হইতে যে সকল উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাকে অপ্রধান বনজ সম্পদ বলা হয়; যেমন, লাক্ষা, তার্পিন, ধূনা, হরীতকী, সিঙ্কোনা, মধু, মোম, তাল, সুপারী, নারিকেল, খেজুর, বাঁশ, বেত, চন্দন কাষ্ঠ, চন্দন ও তেল প্রভৃতি। **লাক্ষা**—স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত উপক্রান্তীয় অঞ্চলে পলাশ, বার, কুসুম প্রভৃতি গাছে বাসা বাঁধে এক প্রকার কীট। ইহাদের মুখ হইতে নিঃসৃত লালাই লাক্ষা। ইহারা ঐ সকল গাছের কচি পাতা, রস ইত্যাদি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। অসংখ্য এই কীট বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশে, উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে, মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশে এবং ওড়িশা ও আসামের কয়েকটি অঞ্চলে দেখা যায়। বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে

ভারতে উৎপাদিত লাক্ষার প্রায় ৬০% উৎপন্ন হয়। বর্তমানে ভারতে প্রায় ৪১,০০০মেট্রিক টন লাক্ষা উৎপন্ন হয়। এই উৎপাদন পৃথিবীতে মোট উৎপাদনের প্রায় ৭৫%। লাক্ষার সাহায্যে গ্রামোফোন রেকর্ড, গালা, বার্নিস, বৈদ্যুতিক ইনসুলেশন, লিথোগ্রাফের কালি প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। ভারতীয় লাক্ষার প্রায় ৬০% রপ্তানি করা হয়। বৃটিশ যুক্তরাজ্য ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় লাক্ষার প্রধান ক্রেতা। **ধুনা ও তার্পিন** প্রধানত হিমালয়ের অরণ্যাঞ্চল হইতে সংগৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং ও তামিলনাড়ুর নীলগিরি অঞ্চলে **সিঙ্কোনার** চাষ হয়। চামড়া পাকা করা, রঞ্জক দ্রব্য ও ঔষধ তৈয়ারিতে **হরীতকীর ব্যাপক ব্যবহার** হয়। ইহা তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পাওয়া যায়। ওড়িশা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রচুর **বাঁশ** জন্মে। কাগজমণ্ডের জন্য কাগজ কলে ইহার চাহিদা সর্বাধিক। মরুপ্রায় অঞ্চলে ও পশ্চিমবঙ্গের ব-দ্বীপ অঞ্চলে হোগলা, সোলা, খস, মাদুর কাটি ও ঘাস প্রচুর জন্মে। ইহা হইতে নানাবিধ কুটীর শিল্পজাত দ্রব্য, হিমালয় অঞ্চলের ভেষজ উদ্ভিদ হইতে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। ভারতীয় বনভূমিতে নানাবিধ বন্য প্রাণী বানর, হাতী, বাঘ, গণ্ডার, ইত্যাদি পাওয়া যায়। বিদেশের বাজারে এই সকল প্রাণীর চাহিদা যথেষ্ট রহিয়াছে। ভারতে বিগত ১৯৮০, ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে উৎপাদিত সাইজ করা কাঠের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২·২০, ২·২৪ এবং ২·২৮ লক্ষ ঘন মিটার।

[**প্রশ্ন :** সংক্ষেপে ভারতীয় বনজ সম্পদের ব্যবহার বর্ণনা কর।]

বনভূমির সমস্যা (Problems of Forest) : ভারত বনজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অরণ্যাঞ্চলে দুর্গম, কাষ্ঠের ব্যাপক চাহিদার অভাব, যোগাযোগ ও যান-বাহনের অসুবিধা এবং একই স্থানে একজাতীয় বৃক্ষের অভাব ইত্যাদি কারণে ভারতে কাষ্ঠ শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে নাই। অধিকন্তু ভারতে অধিক বৃষ্টিপাত, অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ, বিবেচনাহীন বৃক্ষ ছেদন, বনভূমিতে আগুন লাগা ইত্যাদি কারণে বনভূমির বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। দেশের অর্থনীতিই শুধু নহে দেশের জলবায়ুর সমতা রক্ষার কারণে ও জনজীবনে প্রাকৃতিক নিরাপত্তার কারণেও বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। বৈজ্ঞানিক বিবেচনায় দেশের আয়তনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি হওয়া উচিত। এই কারণে ১৯৫২ সালে ভারতে বন-সম্পর্কিত জাতীয় নীতি গৃহীত হয় এবং ক্রমে ভারতের বনভূমির পরিমাণ ৩৩·৩ শতাংশ করিবার সিদ্ধান্ত হয়। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত শহরের প্রসার ও নতুন শিল্প নগরীর পত্তন, কৃষি জমির প্রসার ইত্যাদির ফলেও বনভূমি সঙ্কুচিত হইতেছে।

উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রচেষ্টা (Development and conservation

programmes) : দেশের উন্নতিতে বনভূমির অপরিমেয় দানের কথা স্মরণ রাখিয়াই বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বনভূমির সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য বিবিধ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। ধীরে ধীরে ভারতের হিমালয় ও দাক্ষিণাত্যের পার্বত্যাঞ্চলের ৬০% ও সমভূমির ২০% ভূভাগে বনরচনার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। দেরাদুনের বন বিজ্ঞান গবেষণাগারের সম্প্রসারণ ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য "Indian Board for Wild Life" নামক নতুন সংস্থাও গঠিত হইয়াছে। ভারতীয় বনজ সম্পদের ব্যবহার ও উহার উৎপাদন সম্পর্কিত গবেষণা, বনভূমির প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রধান কয়েকটি কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে—

(১) কাষ্ঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদের আহরণের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নতুন সড়ক নির্মাণ। (২) নতুন বনভূমি রচনা করিয়া মূল্যবান বৃক্ষের চাষ বৃদ্ধি। (৩) কাগজ ও কৃত্রিম রেশম শিল্পে ব্যবহৃত ওয়াটল ও ব্লুগাম এবং বেব (Biab) ঘাসের চাষ বৃদ্ধি। (৪) ব্যাঙ্গালোর ও কোয়েম্বাটুরে বনজ সম্পদের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বৃক্ষ চাষ সম্পর্কে গবেষণার জন্য কেন্দ্র স্থাপন। (৫) ভারতে বাঁশ, বেত ও ভেষজ উদ্ভিদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। (৬) বন বিজ্ঞান-সম্পর্কিত শিক্ষার প্রসার ও আঞ্চলিক গবেষণাগার স্থাপন। (৭) নিকৃষ্ট কাষ্ঠের নানাবিধ অর্থনৈতিক ব্যবহার সৃষ্টি। (৮) বার্ষিক বনমহোৎসব অনুষ্ঠানের সাহায্যে নতুন বন রচনা ও বনভূমি সম্পর্কে গণচেতনা সৃষ্টি। (৯) নতুন পশুশালা, জাতীয় উদ্যান (National Forest), অভয়ারণ্য সৃষ্টি ইত্যাদি দ্বারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ। (১০) বনাঞ্চলের পশ্চাদ্‌পদ অধিবাসীদের উন্নয়ন ও বনজ শিল্পে শ্রমিকদের সমবায় আদর্শে উদ্বুদ্ধকরণ।

[প্রশ্ন : (১) ভারতীয় বনভূমির সমস্যা কি কি? (২) ভারতীয় বনভূমির উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা বর্ণনা কর।]

অনুশীলনী ৫, ৬ ও ৭

অধ্যায় ৫ : ভারতে পশু সম্পদ ও পশুপালন

১। ভারতে পশুপালনের গুরুত্ব আলোচনা কর। ভারতে উৎপন্ন প্রধান প্রধান পশুজাত দ্রব্যের উল্লেখ কর।

[Discuss the importance of animal rearing in India. Mention the principal pastoral products of India.]

২। ভারতে পশুপালন সংগঠিত অর্থনিতিক কার্য হিসাবে কোন্ কোন্ অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে? ঐ সকল অঞ্চলে পশুজাত দ্রব্যের উপর ভিত্তি করিয়া যে-সকল শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার নাম কর।

[Where in India has animal rearing developed as an organised economic activity ? Name the industries which have been developed there to use tne pastoral products.]

৩। ভারতের দুগ্ধ সংক্রান্ত শিল্পের সাফল্যজনক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান-সমূহের বর্ণনা কর।

[Describe the factors that account for the successful development of dairy farming in India.]

৪। ভারতে পশুপালনের বর্তমান সমস্যা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

[Give a brief account of the present problem and developmental efforts of animal rearing in India.]

অধ্যায় ৬ : ভারতের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য চাষ

১। ভারতীয় মৎস্যশিল্পের সমস্যাগুলি উল্লেখ কর। ইহার উৎপাদন ও ভৌগোলিক বণ্টন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[Point out the problems of Indian fishing. Discuss in brief its production and geographical distribution.

২। ভারতে মৎস্য-শিল্প উন্নয়নের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ? ভারতে মৎস্যের বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

[What steps have been taken for the improvement of fishing industry in India ? Give an account of foreign trade in fishing in India.]

৩। (ক) ভারতের মৎস্য শিকারের বিভিন্ন উৎসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। (খ) ভারতের মৎস্যশিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর।

[(a) Briefly describe the different sources of fishing in India. (b) Examine the present position of fishing in India.]

[W. B. H. S. C. Exam. 1981]

৪। ভারতের প্রধান প্রধান মৎস্যক্ষেত্রগুলির অবস্থানের যথার্থতা নির্দেশ কর। মৎস্য সম্পদে ভারতের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর।

[Justify the location of principal fishing grounds of India. Discuss the present position of this resources in Inbia.]

[W. B. H. S. C. Exam. 1984]

৫। ভারতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর মৎস্যক্ষেত্র দেখা যায় ? এই দেশে মৎস্য-চাষের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?

[What are the different types of fisheries found in India ?

What are the different types of fisheries found in India? What measures have been taken to improve the condition of fishing industry in the country?]

[Specimen Question, 1980 & 1981]

অধ্যায় ৭ : ভারতে অরণ্য ও অরণ্য সম্পদ

১। ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর অরণ্য কি কি? ভারতের অরণ্যজাত প্রধান প্রধান দ্রব্যের নাম কর।

[What are the different types of forests found in India? Name the important products of Indian forests.]

২। ভারতের অরণ্যগুলির শ্রেণীবিভাগ কর এবং এগুলি কোন্ কোন্ অঞ্চলে দেখা যায় তাহার উল্লেখ কর। ভারতের প্রধান অরণ্যজাত দ্রব্যগুলি কি কি?

[Classify the forests of India and mention the areas. Where these are found to grow? What are the principal forest products of India?] [W. B. H. S. C. Exam. 1980.]

৩। ভারতের বনজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ কর এবং ইহাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

[Classify the forest resources of India and narrate their economic importance.] [W. B. H. S. C. Exam. 1983]

৪। শ্রেণীবিভাগ করিয়া ভারতীয় বনভূমির আঞ্চলিক বণ্টন দেখাও এবং বনজ সম্পদের বিবরণ দাও।

[Classify Indian forests and give a geographical distribution of the same. Give an account of the forest products of India.]

৫। ভারতীয় বনভূমির সমস্যা কি কি? বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বনভূমি সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা পর্যালোচনা কর।

[What are the problems of Indian forests? Examine the forest conservation programme introduced in India during Five-Year-Plan period.]

৮ ভারতের খনিজ সম্পদ
(Mineral Resources of India)

খনিজ সম্পদে ভারত খুবই সমৃদ্ধ। শিল্পোন্নতির জন্য অপরিহার্য খনিজ সম্পদের বেশির ভাগ খনিজই পর্যাপ্ত পরিমাণে ভারতে বিদ্যমান। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতে খনিজ সম্পদের উত্তোলন ও ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে তৎকালীন শাসক দেশ, গ্রেট বৃটেনের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হইত। এই কারণে ভারত দীর্ঘকাল শিল্পে অনুন্নত এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে অনগ্রসর ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত জাতীয় খনিজ নীতি (National Mineral Policy) গ্রহণ করে। ফলে খনিজ সম্পদের উত্তোলন ও ব্যবহার দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত হওয়ায় বর্তমানে ভারত শিল্পোন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে শিল্পে সমৃদ্ধ একটি দেশ হিসাবে ভারতের চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

ভারতের খনিজ সম্পদকে ইহার আভ্যন্তরীণ যোগান, চাহিদা ও বহির্বাণিজ্যের সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) **যে সকল খনিজ সম্পদে ভারত স্বয়ংভর এবং রপ্তানিযোগ্য উদ্‌বৃত্ত বিদ্যমান**—লৌহ-আকরিক, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, জিপসাম, টাইটেনিয়াম, মোনাজাইট, সিলিকা প্রভৃতি (খ) **যে সকল খনিজ সম্পদে ভারত মোটামুটি স্বয়ংভর**—কয়লা, বক্সাইট, স্বর্ণ, ক্রোমাইট, তাম্র, চুনাপাথর, ডোলোমাইট, পাইরাইট, ব্যারাইট, ভ্যানাডিয়াম প্রভৃতি এবং (গ) **যে সকল খনিজ সম্পদে ভারত বিদেশ হইতে আমদানির উপর নির্ভরশীল,**—রৌপ্য, নিকেল, খনিজ তেল, সীসা, দস্তা, টিন, পারদ, টাংস্টেন, মলিবডেনাম, গ্রাফাইট, প্লাটিনাম প্রভৃতি।

জাতীয় অর্থনীতির দিক হইতে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। কিন্তু ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ বিষয়ে ব্যাপক কোন অনুসন্ধান বা গবেষণা হয় নাই। সুতরাং বিভিন্ন পরিকল্পনায় ভরেতের খনিজ সম্পদের ব্যবহার, সঞ্চিত ভাণ্ডার ও উত্তোলন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক সমীক্ষা, অনুসন্ধান ও উন্নতির জন্য প্রভূত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ভারতে অবস্থিত খনিজ সম্পদের পরিমাণ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান, আধুনিক পদ্ধতিতে উত্তোলন ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভারত সরকার যে সকল জাতীয় সংস্থা স্থাপন করিয়াছে তাহাদের মধ্যে **ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা**(Geological Survey of India), **তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন** (Natural Oil and Gas Commission), **ভারতীয় খনি সংস্থা** (Indian Bureau of Mines), **জাতীয় খনি উন্নয়ন**

কর্পোরেশন (National Mineral Development Corporation); **কেন্দ্রীয় কাঁচ এবং সিরামিক গবেষণা কেন্দ্র** (Central Glass and Ceramic Research Institute), **জাতীয় ধাতু গবেষণাগার** (National Metallurgical Laboratary) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নতুন নতুন খনিজ অঞ্চলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ সকল খনি এলাকা হইতে খনিজ সম্পদের আহরণও দ্রুত হারে হইতেছে। ইহাদের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের **সিঙ্গরাউলি** ও **কোরবা** অঞ্চলের কয়লা খনি, ওড়িশার **কিরিবুরু** ও মধ্যপ্রদেশের **দ্রুগ, বাস্তার** অঞ্চলের লৌহ খনি, রাজস্থানের **ক্ষেত্রী** ও **দারিবো** অঞ্চলের তাম্র খনি, গুজরাটের **ক্যাম্বে**, মহারাষ্ট্রের উপকূলে **বম্বে-হাই** ও আসামের **নাহারকাটিয়া** অঞ্চলের খনিজ তৈল খনি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভারতে খনিজ সম্পদের আঞ্চলিক বণ্টনে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য লক্ষণীয়। ভারতের মোট খনিজ সম্পদের শতকরা প্রায় **৬০ ভাগ বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলেই** অবস্থিত। কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, বক্সাইট, চুনাপাথর প্রভৃতির উৎপাদন এই অঞ্চলেই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। ইহার ফলে ভারতের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ভারী শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার এখনও ঘটে নাই। পূর্বে খনিগুলি বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত হওয়ায় খনিজ উন্নয়ন ও সম্পদের সংরক্ষণ আদৌ হয় নাই। ইহার ফলে প্রভূত পরিমাণে খনিজ সম্পদের অপচয় ঘটিয়াছে; কারিগরী দক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামের অভাব, যানবাহনের অসুবিধা, বিভিন্ন খনিজের উপজাত দ্রব্যের নিষ্কাশন ও ব্যবহার বিষয়ে অজ্ঞতা ভারতে খনিজ সম্পদের অপচয় ও উৎপাদনের স্বল্পতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। বর্তমানে ইহা অনেকাংশে রাষ্ট্রের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে আসিয়াছে।

ভারতে বিভিন্ন পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিজ পদার্থের উন্নয়নের জন্য সরকারী খাতে যে পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা দেখান হইল :—

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বরাদ্দ অর্থের হিসাব (কোটি টাকায়)

পরিকল্পনা	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ
বরাদ্দ অর্থ	৫৫	৯৩৮	১,৭২৬	২,৮৬৪	৮,৯৩৯	১৫,০১৭
পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের শতাংশ	২·৮	২০·১	২০·১	১৮·৩	২২·৫	১৫·৪

পরিকল্পনায় বরাদ্দকৃত অর্থ কয়লা, লৌহ আকরিক, খনিজ তেল, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, তাম্র, দস্তা, সীসা, অভ্র, জিপসাম, ক্রোমাইট, পাইরাইট প্রভৃতি খনিজ

পদার্থের সঞ্চিত ভাণ্ডার ও নতুন নতুন খনির অনুসন্ধান এবং এই সকল খনিজ সম্পদের সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়। ইহার ফলশ্রুতিস্বরূপ অতীতের কৃষি নির্ভর ভারতের স্থলে **কৃষি ও শিল্পে** সমভাবে অগ্রসরমান এক নতুন ভারতের অভ্যুত্থান সম্ভব হইয়াছে। আশা করা যায় বর্তমানে নীতি হিসাবে গৃহীত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সুষ্ঠু রূপায়ণে ভারতের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হইবে।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতে কোন কোন খনিজের রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত রহিয়াছে? (২) কোন্ কোন্ খনিজ দ্রব্য ভারত বিদেশ হইতে আমদানি করে? (৩) অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কালে কোথায় কোথায় খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে?]

লৌহ-আকরিক (Iron ore)

শিল্প-সভ্যতার মূল ভিত্তি লৌহ-ইস্পাত শিল্প। ইস্পাত শিল্পের অপরিহার্য কাঁচামাল লৌহ আকরিকের সঞ্চিত ভাণ্ডার ও বাৎসরিক উত্তোলন জাতীয় অর্থনীতির দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে উত্তোলিত আকরিক লৌহের বেশির ভাগই উচ্চমানের **হেমাটাইট** জাতীয়। এখানে **ম্যাগনেটাইট** ও **নিকৃষ্টমানের লৌহসঙ্করও** (Iron Stone) সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতীয় লৌহ-আকরিকে ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ হওয়ায় ইহা ইউরোপীয় আকরিকের তুলনায় অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর। ভারতে আকরিক লৌহের সঞ্চিত ভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ১,০৫৭০ কোটি মেট্রিক টন। এখানে লৌহ খনিগুলির নিকটে কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, চূণা পাথর ও ডোলোমাইট পাওয়া যায় বলিয়া লৌহ ইস্পাত শিল্প গঠনে বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। লৌহ-আকরিক উত্তোলনে ভারত বর্তমানে পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

উৎপাদক অঞ্চল (Mining Regions) : ভারতের আকরিক লৌহের আঞ্চলিক বণ্টন ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল-সহ দক্ষিণ ভারতেই সীমাবদ্ধ। উত্তর ভারতে আকরিক লৌহের উল্লেখযোগ্য ভাণ্ডার আজিও পাওয়া যায় নাই। ভারতে লৌহ-আকরিক প্রধানত নিম্নলিখিত তিনটি অঞ্চলেই পাওয়া যায়।

(১) **বিহার-ওড়িশা অঞ্চল**—লৌহ-আকরিক উত্তোলনে এই অঞ্চল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে আকরিক লৌহের খনিগুলি একটানা বহুদূর বিস্তৃত ও প্রায় পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। ভারতের মোট লৌহ-আকরিক উত্তোলনের শতকরা ৩৬ ভাগ ওড়িশা এবং ২৬ ভাগ বিহার রাজ্য হইতে পাওয়া যায়। ওড়িশা রাজ্যে কেওনঝড় জিলার (ক) **বাগিয়াবুরু** এবং **বোনাই** অঞ্চল এবং (খ) ময়ূরভঞ্জ জিলার

গুরুমহিশানী, সুলাইপাত ও বাদাম পাহাড় উল্লেখযোগ্য আকরিক লৌহ উৎপাদনের কেন্দ্র। বোনাই অঞ্চল হইতে বিহারের সিংভূম জিলার কলহান মহকুমা পর্যন্ত প্রায় ৪৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত পাহাড় শ্রেণী এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান লৌহ-আকরিকের ভাণ্ডার। বিহার রাজ্যে সিংভূম জিলার অন্তর্গত (ক) **গুয়া, নোয়ামুণ্ডি,** (খ) **বুদাবুরু,** (গ) **পানশিরা বুরু** আকরিক ক্ষেত্রগুলি হইতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ-আকরিক উত্তোলিত হয়। এই অঞ্চলের আকরিক হেমাটাইট বর্গীয় সর্বোৎকৃষ্ট।

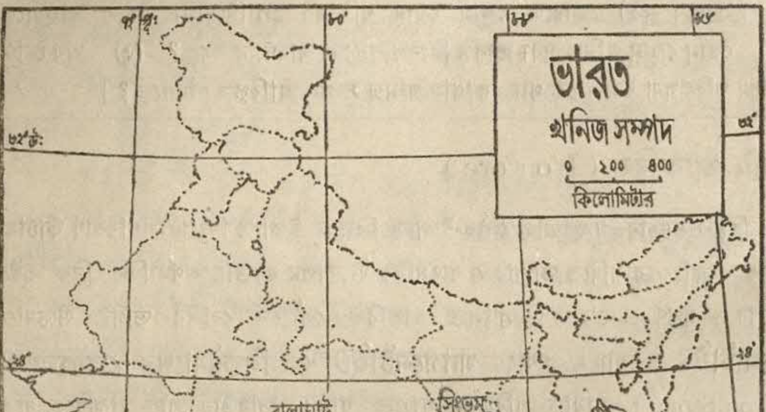

চিত্র ৮.১ : ভারতের খণিজ সম্পদ : লৌহ-আকর ও ম্যাঙ্গানিজ অঞ্চল।

বিহার ও ওড়িশা রাজ্যের লৌহ-আকরিক ক্ষেত্রগুলি কয়লা, চুনাপাথর, ডোলোমাইট ও ম্যাঙ্গানিজ খনিসমূহের নিকটে অবস্থিত। ইহাতে ঐ অঞ্চলে লৌহ-ইস্পাত শিল্প স্থাপন সহজ হইয়াছে। সম্প্রতি ওড়িশার **কিরিবুরু** অঞ্চলে উচ্চমানের আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। জাপানে রপ্তানির উদ্দেশ্যে ঐ দেশের সহযোগিতায় এই খনি

হইতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আকরিক উত্তোলন করা হইতেছে। এই খনি-অঞ্চলে সঞ্চিত আকরিকের পরিমাণ প্রায় ১৭·৯ কোটি মেট্রিক টন। বিহার-ওড়িশা অঞ্চলের লৌহ-আকরিকের ক্ষেত্রগুলি পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের বার্ণপুর ও দুর্গাপুর, বিহারের জামসেদপুর ও বোকারো এবং ওড়িশার রাউরকেল্লা ইস্পাতকেন্দ্রের সহিত যুক্ত।

(২) **মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র অঞ্চল**—প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এই অঞ্চলের খনিগুলির বিশেষ উন্নতি ঘটে নাই। স্বাধীনতালাভের পরবর্তী সময়ে ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে নতুন নতুন লৌহ-আকরিকের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে উচ্চমানের আকরিক লৌহ প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত আছে। এই রাজ্যে দ্রুগ জিলার **ডালি** ও **রাজহারা** পাহাড়ে এবং **বাস্তার** অঞ্চলে প্রচুর আকরিক বিদ্যমান। **জব্বলপুর** ও **নরসিংহপুর** অঞ্চলেও লৌহ-আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই ক্ষেত্রগুলি হইতে উত্তোলিত আকরিক প্রধানত ভিলাই ইস্পাত কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। এই রাজ্যের **বাইলাডিলা** লৌহ-আকরিকের খনিতে জাপানের সহযোগিতায় সম্পূর্ণ যান্ত্রিক কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রের (চান্দাজেলায়) **লোহারা, পিপলগাঁও** এবং **রত্নগিরি** ও **রেডি** অঞ্চলে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। রেডি অঞ্চলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্ধ্রপ্রদেশের **কুর্নুল, কুডাপ্পা** ও **নেলোর** উল্লেখযোগ্য লৌহ-আকরিক উত্তোলনের কেন্দ্র।

(৩) **কর্ণাটক-তামিলনাড়ু-গোয়া অঞ্চল**—এই অঞ্চলের কর্ণাটকেই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে একমাত্র আকরিক লৌহের উৎপাদন-কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে তামিলনাড়ু অঞ্চলে **সালেম** ও **তিরুচিরাপল্লীতে** প্রচুর লৌহ-আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গোয়ার **বিকোলিম** ও **সানগুয়েম তালুকেও** প্রচুর আকরিক পাওয়া যায়। গোয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই অঞ্চলের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কর্ণাটক অঞ্চলে **বাবাবুদান** পাহাড়, **কেমাংগুণ্ডি, কাঁদুর, বেলারী** ও **চিকমাগালুর** অঞ্চলে প্রচুর উৎকৃষ্ট হেমাটাইট জাতীয় আকরিক পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ আকরিক ভদ্রাবতী ইস্পাতকেন্দ্রে ব্যবহৃত হয় এবং কিছু অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। কয়লার অভাবে এখানে কাঠকয়লার সাহায্যে লৌহ আকরিক গালানো হয়। সম্প্রতি এই রাজ্যের **কুদ্রেমুখ** ও **দ্রোনীমালাই** অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে লৌহ-আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

উপরি-উক্ত তিনটি অঞ্চল ব্যতীত বিক্ষিপ্তভাবে উত্তর প্রদেশের আলমোড়া অঞ্চলে, পাঞ্জাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং অঞ্চলে নিম্নমানের কিছু লৌহ-আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা ব্যবহারের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা এখনও গৃহীত হয় নাই।

ভারতে লৌহ আকরিক উত্তোলনের গতিপ্রকৃতি

বৎসর	মিলিয়ন (মে. টন)	বৎসর	মিলিয়ন (মে. টন)
১৯৫০	৩·০০	১৯৮১	৪১·৪৬
১৯৭১	৩৪·৩১	১৯৮৩	৪১·৬০

ভারতে উত্তোলিত লৌহ-আকরিকের আঞ্চলিক বণ্টন ও ব্যবহার

রাজ্য	খনিক অঞ্চল	ব্যবহার	রপ্তানি বন্দর
ওড়িশা	বাগিয়াপুর, বোনাই, গুরুমাহিষানি স্থলাই পাত, বাদাম পাহাড়, কিরিবুরু স্থকিণ্ডা ও দইতারী।	জামসেদপুর, বার্ণপুর, দুর্গাপুর, রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানা ও রপ্তানি।	পারাদীপ ও হলদিয়া
বিহার	গুয়া, নোয়ামুণ্ডি, বুদা-বুরু, পানাশিরাবুরু।	বার্ণপুর, দুর্গাপুর, জাম-সেদপুর ইস্পাত কারখানা,	——
মধ্যপ্রদেশ	ডালি, রাজহারা, বাস্তার, জব্বলপুর, বাইলাডিলা ও বিলাসপুর।	ভিলাই ইস্পাত কারখানা, ও রপ্তানি।	বিশাখা-পত্তনম
অন্ধ্রপ্রদেশ	কুর্নুল, কুডাপ্পা, অনন্তপুর ও নেলোর।	ভদ্রাবতী (কর্ণাটক) ইস্পাত কারখানা	বিশাখা-পত্তনম
মহারাষ্ট্র	চান্দা, রত্নগিরি ও রেডি।	রপ্তানি	বোম্বাই
কর্ণাটক	কেমাংগুণ্ডি (বাবাবুদান পাহাড়), চিকমাগালুর, কাঁদুর ও বেলারী।	ভদ্রাবতী ইস্পাত কার-খানা ও রপ্তানি	ম্যাঙ্গালোর ও মাদ্রাজ
তামিলনাড়ু	সালেম ও মাদুরাই।		মাদ্রাজ
গোয়া	বিকোলেম ও সানগুয়েম।		মার্মাগাঁও

বাণিজ্য (Trade) : ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতে উত্তোলিত আকরিক লৌহের বেশির ভাগ বিদেশে রপ্তানি করা হইত। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কালে ভারতে সরকারী মালিকানায় ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রপ্রদেশে একটি করিয়া ইস্পাত কারখানা স্থাপন করায় লৌহ-আকরিকের আভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভবিষ্যতে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে আরও দুইটি কারখানা স্থাপন করার কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে দেশের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহা সত্ত্বেও ভারতে আকরিক লৌহের উত্তোলন উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হওয়ায় প্রচুর লৌহ আকরিক বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে লৌহ-আকরিকের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু ১৯৭৯-৮০ সালে ইহা দাঁড়াইয়াছে ২৪৮ লক্ষ মে. টন এবং ১৯৮২-৮৩ সালে রপ্তানির পরিমাণ হয় ২০৭ লক্ষ মে. টন। ইহার মূল্য ৩৮৪ কোটি টাকা। ভারতে বৎসরে প্রায় ২০০ লক্ষ মেট্রিক টনের কিছু অধিক আকরিক আভ্যন্তরীণ ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উত্তোলনের অবশিষ্টাংশ বিদেশে রপ্তানি করিয়া ভারত প্রভূত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়া থাকে। ভারতে রপ্তানিকৃত আকরিকের প্রায় ৫০-৫৫ ভাগ **জাপানে** রপ্তানি করা হয়। বাকি অংশ **পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, পূর্ব জার্মানী** ও **ইতালিতে** রপ্তানি হয়। ভারতে লৌহ-আকরিক রপ্তানি বিষয়টি বর্তমানে **ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশন** নামক একটি সংস্থার উপর ন্যস্ত আছে। ভারতের জাতীয় খনি উন্নয়ন কর্পোরেশন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন খনির উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাইতেছে।

[**প্রশ্ন :** (১) ভারতের লৌহ-আকরিক প্রধানত কোন্ শ্রেণীর এবং ইহাতে ধাতব লৌহের পরিমাণ কিরূপ থাকে ? (২) ভারতে সঞ্চিত লৌহ-আকরিকের পরিমাণ কত ? (৩) একটি তালিকার সাহায্যে লৌহ-আকরিকের আঞ্চলিক বণ্টন ও ব্যবহার দেখাও। (৪) ১৯৮২-৮৩ সালে ভারত কি পরিমাণ লৌহ-আকরিক রপ্তানি করিয়াছে। কোন্ কোন্ দেশ ভারতের লৌহ আকরিক ক্রয় করে ? কোন্ দেশ ভারতীয় আকরিকের বৃহত্তম ক্রেতা ? (৫) তিনটি রপ্তানিকারক লৌহ-খনি ও বন্দরের নাম উল্লেখ কর।]

ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)

লৌহ-ইস্পাতকে পরিশ্রুত ও দৃঢ় করিবার জন্যই ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার সর্বাধিক। ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের শতকরা প্রায় ৯০-৯১ ভাগই লৌহ ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ এনামেল, কাচ, ব্লিচিং পাউডার ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। ভারতে সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ প্রায় ১১৬৬ কোটি মেট্রিক টন। ইহার মধ্যে শতকরা ৪০-৪৫ ভাগ উচ্চমানের এবং বিশ্বের বাজারে ইহার চাহিদা প্রচুর। অবশিষ্টাংশ নিম্নমানের এবং আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রকার চাহিদার উপযোগী। ভারত ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনে পৃথিবীর ষষ্ঠ স্থানের অধিকারী। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনে পৃথিবীতে প্রথম ছিল।

ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজ আকরিককে তিনভাগে ভাগ করা যায় : (১) খনিজ ম্যাঙ্গানিজ—ইহাতে ধাতব ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৪০-৬০ ভাগ থাকে।

(২) **ফেরুজিনাস ম্যাঙ্গানিজ**—ইহাতে ১০-৩০ ভাগ খনিজ ম্যাঙ্গানিজ থাকে এবং (৩) **ম্যাঙ্গানিজ ফেরাস ওরস্**—ইহাতে লৌহের ভাগই বেশি থাকে।

উৎপাদক অঞ্চল (Mining Regions) **:** ভারতে ম্যাঙ্গানিজ আকরিক রহিয়াছে প্রধানত **মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, ওড়িশা, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে।** ইহা ছাড়া রাজস্থানেও সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। ভারতে ম্যাঙ্গানিজ আকরিক উৎপাদনে **মধ্যপ্রদেশ প্রথম, ওড়িশা দ্বিতীয়** এবং **মহারাষ্ট্র তৃতীয়।** অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম বন্দরের উন্নতি ও ইহার সহিত দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের ফলে মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদন ও রপ্তানি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের ম্যাঙ্গানিজ আকর লৌহ আকরের নিকটেই অবস্থিত হওয়ায় লৌহ ইস্পাত শিল্পের উন্নতির বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ওড়িশার আকরিক বেশির ভাগই নিম্নমানের। বিহার অঞ্চলের উৎপাদন বর্তমানে বেশি না হইলেও ইহার ভবিষ্যত সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভারতে খনিজ ম্যাঙ্গানিজের আঞ্চলিক বণ্টন

রাজ্যসমূহ	খনি অঞ্চল
মধ্যপ্রদেশ	বালাঘাট, ছিন্দওয়ারা, জব্বলপুর ও ঝাবুয়া,
	ময়ূরভঞ্জ, কালাহাণ্ডি ও গাংপুর, বোনাই।
ওড়িশা	কেওনঝর।
মহারাষ্ট্র	পাঁচমহল জিলার রত্নগিরি, ভাণ্ডারা, নাগপুর ও ছোট উদয়পুর।
বিহার	গুয়া, মনোহরপুর ও চাইবাসা।
অন্ধ্রপ্রদেশ	বিশাখাপত্তনম, কুর্ণুল ও শ্রীকাকুলাম।
কর্ণাটক	কাদুর, শিমোগা, চিত্রদুর্গ, উত্তর কানাড়া ও তুমকুর।
রাজস্থান	বনস্ওয়ারা।

ভারতে ম্যাঙ্গানিজ আকরিক উত্তোলনের গতিপ্রকৃতি (লক্ষ মে. টন)

বৎসর	উত্তোলন লক্ষ মে. ট.	বৎসর	উত্তোলন লক্ষ মে. ট.
১৯৫০	৮'০৯	১৯৮১	১৫'২৪
১৯৬১	১৪'০৪	১৯৮৩	১২'৬০
১৯৭১	১৮'৩৬		

বাণিজ্য (Trade) ভারতে ম্যাঙ্গানিজের উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা কম, বৎসরে কম-বেশি ১ লক্ষ মেট্রিক টন। ফলে ম্যাঙ্গানিজের উত্তোলনের গতিপ্রকৃতি বৈদেশিক বাণিজ্যের উপরই অনেকাংশে নির্ভরশীল। ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের প্রধান ক্রেতা **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।** ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের অন্যান্য আমদানিকারী দেশের মধ্যে **বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি ও জাপানের** নাম উল্লেখযোগ্য। একসময় বিশ্বের বাজারে ভারতই প্রধান ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানিকারী দেশ ছিল। বর্তমানে ব্রাজিল, গ্যাবন, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানিতে অংশ গ্রহণ করায় ভারতের রপ্তানি বাজার বিশেষভাবে সংকুচিত হইয়াছে। ভারতের রপ্তানিকৃত ম্যাঙ্গানিজের বেশির ভাগই **কলিকাতা, বিশাখাপত্তনম, বোম্বাই** ও **মার্মাগাও** বন্দর মারফত বিদেশে চালান যায়। ১৯৭০-৭১ ও ১৯৮০-৮১ সালে ভারতের ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬·৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন ও ৬·০৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৮২-৮৩ সালে মোট ৪·৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন ম্যাঙ্গানিজ আকরিক রপ্তানি করা হয়। দেশে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রসার ও বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস করা হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নতুন খনি আবিষ্কার, নিকৃষ্ট আকরিকের অধিকতর কার্যকরী ব্যবহার ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতে ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের আঞ্চলিক বণ্টন তালিকার সাহায্যে দেখাও। ভারতে সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ কত? (২) কোন্ কোন্ দেশ ভারতের ম্যাঙ্গানিজ ক্রয় করে? কোন্ কোন্ বন্দরের মাধ্যমে ইহা রপ্তানি করা হয়? (৩) ১৯৮২-৮৩ সালে ভারত কী পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি করিয়াছে?]

তাম্র (Copper)

ভারতে তাম্রের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে। আধুনিক বৈদ্যুতিক শিল্পে তাম্র ব্যবহৃত হইবার বহু পূর্বেই ভারতে তাম্রের সাহায্যে বাসনপত্র, অলংকার, এমনকি অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদিও প্রস্তুত করা হইত। ভারতে একসময় পিতল ও মুদ্রা তৈয়ারি করিতে তাম্রের ব্যাপক ব্যবহার হইত। বর্তমান ভারতে বৈদ্যুতিক শিল্প, যানবাহন ও টেলিকম্যুনিকেশান ব্যবস্থার উন্নতির ফলে তাম্রের চাহিদা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে তাম্রের সঞ্চিত ভাণ্ডার ও বার্ষিক উত্তোলনের পরিমাণ খুবই কম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও বৃটিশ যুক্তরাজ্যে জনপ্রতি তাম্র ব্যবহারের পরিমাণ যথাক্রমে ৮ ও ৭ কিলোগ্রাম। ভারতে জনপ্রতি তাম্রের ব্যবহার মাত্র ০·১১ কিলোগ্রাম। সুতরাং শিল্পোন্নতির সহিত ভারতে তাম্রের ভবিষ্যৎ চাহিদা যে বিস্ময়কর

হারে বৃদ্ধি পাইবে ইহা বলাই বাহুল্য। ভারতে তাম্র আকরিকের সঞ্চিত ভাণ্ডারের পরিমাণ আনুমানিক ৪৫·৫২ কোটি মেট্রিক টন।

উৎপাদক অঞ্চল (Mining Regions) : ভারতে বিহারের সিংভূম জিলাতে যে প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্বেও তাম্র আকরিত হইত ইহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কখন এবং কি অবস্থায় ইহার উত্তোলন বন্ধ হইয়াছিল ইহার বিশদ বিবরণ অনুমান-সাপেক্ষ। আধুনিক যুগে ১৮৩৯ সালে উইলিয়াম জোনস্ নামে একজন ইংরেজ সিংভূম জিলার সেই অতি পুরাতন খনিটির পুনরাবিষ্কার করেন। বিহারের এই খনিটি ১৩০ কিলোমিটার বিস্তৃত। ইহার অন্তর্গত **ঘাটশিলা, মোসাবনি ও ধোবানি** উল্লেখযোগ্য তাম্র উৎপাদন-কেন্দ্র। ঘাটশিলার নিকট **মহুভাণ্ডারে** Indian Copper Corporation Ltd. নামক সংস্থার একটি তাম্র নিষ্কাশনের কারখানা আছে। বিহার ব্যতীত **অন্ধ্রপ্রদেশ** (অগ্নিগুণ্ডালা), **কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ** (মালাঞ্জ খণ্ড), **রাজস্থানের ক্ষেত্রী** ও দারিবো অঞ্চলে তাম্র আকরিত হয়। ভারতে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সহিত সংহতিবিধানের জন্য বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে ভারতের আরও কয়েকটি রাজ্যে নতুন খনির আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রাজস্থান, সিকিম, কাশ্মীর, আসাম, পাঞ্জাব, গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতে তাম্র আকরিকের আঞ্চলিক বণ্টন

রাজ্য	খনি অঞ্চল	রাজ্য	খনি অঞ্চল
বিহার	মোসাবনি, ধোবানি, বাদিয়া, হাজারিবাগ, খরসোয়ান, ইত্যাদি।	গুজরাট	বনসকণ্ঠ।
		রাজস্থান	ক্ষেত্রী, দারিবো, আলোয়ার, সিরোহি, ভিলওয়ারা, ঝুনঝুনু।
মধ্যপ্রদেশ	ইন্দোর, বেগুয়া, বালাঘাট, জব্বলপুর, ইত্যাদি।	সিকিম	রংপো, ভোটাঙ্গ ও দিকচু।
অন্ধ্র, প্রদেশ	গুন্টুর, আম্মাম, নেলোর ও কুর্নুল।	পাঞ্জাব	কুলু ও কাংড়া।
		কাশ্মীর	রিয়াসি, গায়েত্তী।
কর্ণাটক	চিত্রদুর্গ, চিকমাগালুর, হাসান, রায়চুর।	আসাম	আভর পাহাড়, লেরকা-মতি।
উত্তরপ্রদেশ	গাড়োয়াল, আলমোড়া।	পশ্চিমবঙ্গ	দার্জিলিং ও জলপাই-গুড়ি।

বাণিজ্য ও সমস্যা (Trade and Problems): ভারতে চাহিদার তুলনায় তাম্রের উৎপাদন খুবই কম। এদেশে বর্তমানে তাম্রের বার্ষিক চাহিদার পরিমাণ প্রায় ১$\frac{১}{২}$ লক্ষ মেট্রিক টন। এই কারণে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে বিদেশ হইতে আমদানির উপর নির্ভর করিতে হয়। সম্প্রতি উৎপাদনের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বিদেশ হইতে তাম্র আমদানির উপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পাইবে। ভারতের মোট তাম্র আমদানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র** হইতে আসে। **বৃটেন, ক্যানাডা, চিলি, বেলজিয়াম** প্রভৃতি দেশ হইতে চাহিদার অবশিষ্ট অংশ আমদানি করা হয়। সিকিম ভারতের অঙ্গ রাজ্যে পরিণত হওয়ায় ঐ অঞ্চলের তাম্র আকরিক ভারতে সরাসরি ব্যবহারের স্থবিধা হইয়াছে। হিন্দুস্থান কপার লিঃ নামক একটি সংস্থার উপর নবাবিস্কৃত কয়েকটি তাম্র খনির উন্নয়নের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রাজস্থানের ক্ষেত্রী, দারিবো, বিহারের রাখা, অন্ধ্রপ্রদেশের অগ্নিগুণ্ডালা খনির নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতে তাম্র উত্তোলনের গতিপ্রকৃতি

বৎসর	উত্তোলন লক্ষ মে. ট	বৎসর	উত্তোলন লক্ষ মে. ট
১৯৫০-৫১	৭.১	১৯৮০-৮১	২১.৮
১৯৬০-৬১	৮.৫	১৯৮১-৮২	২৪.৭
১৯৭০-৭১	৯.৩	১৯৮২-৮৩	২৯.৪

[**প্রশ্ন**: (১) ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে তাম্র পাওয়া যায়? (২) তাম্র উত্তোলনে ভারতের অবস্থা আলোচনা কর। (৩) স্বাধীনতার পরে আবিষ্কৃত কয়েকটি তাম্র খনির নাম লিখ।]

বক্সাইট (Bauxite)

অ্যালুমিনিয়ামের প্রধান কাঁচামাল বক্সাইট। করাণ্ডাম ও কায়ানাইট হইতেও সামান্য পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশিত হয়। আধুনিক যুগে বিমানপোত, বৈদ্যুতিক শিল্পে, যানবাহন, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ও অন্যান্য বহু প্রকার কার্যে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। তাম্র, নিকেল, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর সহিত অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রিত করিয়াও নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। বক্সাইট আকরিক হইতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনে প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতে জলবিদ্যুতের উৎপাদন খুবই সামান্য ছিল। ফলে ভারতে উত্তোলিত বক্সাইটের বেশির

ভাগই বিদেশে রপ্তানি করা হইত। বর্তমানে দেশে জলবিদ্যুৎ সুলভ ও সহজলভ্য হওয়ায় অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে বক্সাইটের মোট সঞ্চিত ভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ২৪.৯ কোটি মেট্রিক টন।

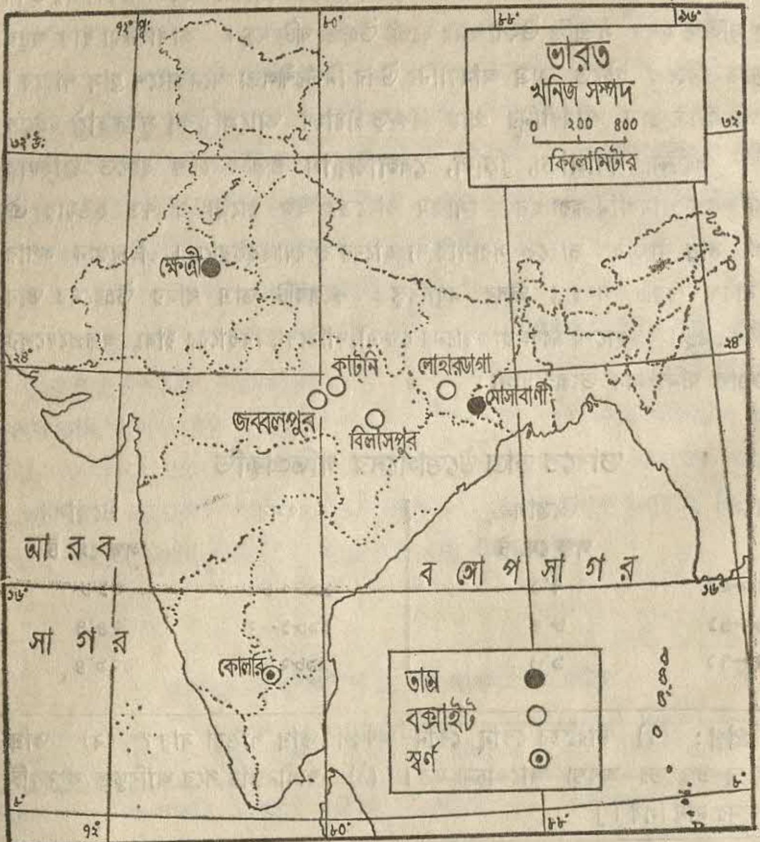

চিত্র ৮.২ : ভারতের খনিজ সম্পদ : তাম্র, বক্সাইট ও স্বর্ণ উৎপাদক অঞ্চল।

উৎপাদক অঞ্চল (Mining Regions): ভারতে বক্সাইট উৎপাদক রাজ্যগুলির মধ্যে বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র প্রধান। ইহা ছাড়া তামিলনাড়ু, গুজরাট, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলেও বক্সাইট উত্তোলিত হয়। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বক্সাইটের নতুন সঞ্চিত ভাণ্ডার আবিষ্কার, চালু খনিগুলির উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। ফলে গুজরাটের কৈরা ও জামনগর, তামিলনাড়ুর সালেম ও কাশ্মীরের পুরু অঞ্চলে নতুন খনির সন্ধান মিলিয়াছে। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া, কেরালা ও উত্তরপ্রদেশে সম্ভাবনাময় বক্সাইট আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ভারতে বাক্সাইট আকরিকের আঞ্চলিক বণ্টন

(Regional Distribution)

রাজ্য	খনি অঞ্চল	রাজ্য	খনি অঞ্চল
বিহার	লোহারদাগা (রাঁচি) ও পালামৌ।	তামিলনাড়ু	সালেম (সেভরা পাহাড়)।
		মহারাষ্ট্র	থানা (টঙ্গুর পাহাড়)। কোলাপুর।
ওড়িশা	সম্বলপুর ও কালাহাণ্ডি।	কাশ্মীর	জম্মু ও পুরু।
মধ্যপ্রদেশ	বালাঘাট, জব্বলপুর, বিলাসপুর, অমরকণ্টক, সারগুজা, ইত্যাদি।	গুজরাট	কৈরা ও জামনগর।

ভারতে বক্সাইট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন যথেষ্ট নহে। এক মেট্রিক টন আলুমিনিয়াম তৈয়ারি করিতে প্রায় ৪ মেট্রিক টন বক্সাইট, $\frac{১}{২০}$ মেট্রিক টন ক্রায়োলাইট, $\frac{১}{২০}$ মেট্রিক টন কষ্টিক সোডা ও ২৪,০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুতের প্রয়োজন। বিদ্যুতের অতিরিক্ত প্রয়োজন বলিয়া অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন সুলভ জলবিদ্যুতের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর বক্সাইট আকরিকের সঞ্চিত ভাণ্ডারের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ২৪৮·৯১ কোটি মেট্রিক টন।

ভারতে বক্সাইট ও অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি

	উৎপাদন (লক্ষ মে. ট)			উৎপাদন (লক্ষ মে. ট)	
বৎসর	বক্সাইট	অ্যালুমিনিয়াম	বৎসর	বক্সাইট	অ্যালুমিনিয়াম
১৯৫০	০·৬৪	০·৪	১৯৮১	১৯·২৩	১·৯৯
১৯৬১	৪·৮০	০·১৮	১৯৮২	১৮·৫৪	২·০৬
১৯৭১	১৫·১২	১·৬৭			

বাণিজ্য ও সমস্যা (Trade and Problems): অতীতে সুলভ জলবিদ্যুতের অভাবে ভারতে অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের বিকাশ ঘটে নাই। ঐ সময়ে এদেশে উত্তোলিত আকরিকের বেশির ভাগই বিদেশে রপ্তানি করা হইত। বর্তমান দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বহুমুখী নদী পরিকল্পনার মাধ্যমে জলবিদ্যুতের যোগান সহজ ও সুলভ হওয়ায় এই শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বেলুড় অ্যালুমিনিয়াম ওয়ার্কস্ পূর্বে আমদানিকৃত অ্যালুমিনিয়াম পিণ্ড ব্যবহার করিত। বর্তমানে দেশের মধ্যে উৎপাদিত অ্যালুমিনিয়াম

পিণ্ডই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নতুন অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন কেন্দ্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আসানসোলের নিকট অনুপনগর, বিহারের মুরী, কেরালার আলওয়ে, তামিলনাড়ুর মেতুর, ওড়িশার সম্বলপুর, মহারাষ্ট্রের কয়না প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা এই কারণে প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে বক্সাইট রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

[**প্রশ্ন** : (১) বক্সাইটের চাহিদা বৃদ্ধির কারণ কি ? (২) ভারতে কোন্ কোন্ অঞ্চলে বক্সাইট পাওয়া যায় ? (৩) অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে ভারতের প্রধান অসুবিধা কি ছিল ?]

অভ্র (Mica)

অভ্র খনিজাত অধাতব পদার্থ। প্রাচীন কালে ভারতে অভ্রের ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল ঔষধে প্রস্তুতে, রং ও সাজসজ্জা তৈয়ারিতে। বর্তমান কালে বিদ্যুৎ শিল্প, যানবাহন শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভ্রের ব্যবহার সর্বাধিক। এই কারণে শিল্পোন্নত দেশেই অভ্রের চাহিদা ব্যাপক। অভ্র উৎপাদনে ভারত বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। পৃথিবীর মোট অভ্র উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ অভ্র ভারতে উত্তোলিত হয়। ভারতে অভ্র শিল্পে প্রায় ৪০ হাজার লোক নিযুক্ত রহিয়াছে। ভারতে উত্তোলিত অভ্রের বেশির ভাগই মাস্কোভাইট জাতীয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Mining Regions) : ভারতে অভ্রের উত্তোলন প্রধানত তিনটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ—**বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ** ও **রাজস্থান**। **বিহারে** গয়া, হাজারিবাগ, মুঙ্গের ও মানভূম জিলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অভ্র আকরিত হয়। ভারতে বিহার রাজ্য অভ্র উত্তোলনে ও বাণিজ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিহারে সর্বোৎকৃষ্ট 'রুবি' জাতীয় অভ্র উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। ভারতীয় অভ্রের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ বিহার রাজ্যেই আকরিত হয়। **অন্ধ্রপ্রদেশে** নেলোর জিলার গুণ্টুর, কাভালি, আত্মাকুর ও রাজপুর অঞ্চলেই এই রাজ্যের বেশির ভাগ অভ্র পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের অভ্র ঈষৎ হরিদ্রাভ ও বিহারের অভ্রের তুলনায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর। **রাজস্থানে** আজমীড় ও জয়পুর অঞ্চল অভ্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। এই অঞ্চলের অভ্র বাজারোপযোগী বিন্যস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিহারে প্রেরণ করা হয়।

উপরি-উক্ত তিনটি অঞ্চল ব্যতীত কর্ণাটকের হাসান জিলায়, তামিলনাড়ুর নিলগিরি অঞ্চলে ও কেরালায় ইরিনিয়ান অঞ্চলেও সামান্য পরিমাণে অভ্র পাওয়া যায়।

ভারতে অভ্র উত্তোলনের গতিপ্রকৃতি (সহস্র মে. ট.)

বৎসর	উত্তোলন	বৎসর	উত্তোলন
১৯৫১	৩০·০	১৯৮১	১২·৬
১৯৬১	২৯·০	১৯৮২	১২·৯
১৯৭১	১৬·০		

বাণিজ্য ও সমস্যা (Trade and Problems) : ভারতে অভ্র ব্যবহারকারী বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য শিল্পের তেমন প্রসার না ঘটায় অভ্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদা এখনও খুবই কম। ভারতীয় অভ্র শিল্পের উন্নতি রপ্তানি-নির্ভর। এই কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে অভ্রের চাহিদার সহিত ভারতে অভ্র উত্তোলনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। বর্তমানে অভ্র আমদানিকারী বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম অভ্র—যেমন, পাটিন্যাক্স, ব্যাকেলাইট, প্যাক্সোলিন, ফরমালাইট প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে ভারতীয় অভ্রের বাজার সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। অধিকন্তু কানাডা, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশও অভ্রের রপ্তানিতে অংশ গ্রহণ করিতেছে। কৃত্রিম অভ্রের মূল্য স্বাভাবিক খনিজ অভ্রের তুলনায় এখনও বিশেষ সস্তা নহে বলিয়াই বিদেশে ভারতীয় অভ্রের চাহিদা বিদ্যমান। ভারতীয়অভ্রের প্রধান ক্রেতা **আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইতালি, অস্ট্রেলিয়াও** ভারত হইতে কিছু **অভ্র** আমদানি করে। ভারতীয় রপ্তানির বেশির ভাগ কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে চালান দেওয়া হয়। একটি **অভ্র উপদেষ্টা কমিটি** (Mica Advisory Committee) এবং অভ্র রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতে একটি **অভ্র রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা** (Mica Export Promotion Council) গঠিত হইয়াছে। অধিকন্তু বিহারের ঝুমরী-তিলাইয়া ও মধ্যপ্রদেশের ভূপালে অভ্রকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

[প্রশ্ন : (১) রুবি অভ্র কি ? ইহা কোথায় পাওয়া যায় ? (২) ভারতের একটি মানচিত্র অঙ্কন করিয়া অভ্র উৎপাদক অঞ্চল দেখাও। ভারতের কোথায় কোথায় অভ্র কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।]

চুনাপাথর (Lime Stone)

লৌহ-ইস্পাত শিল্পে, ধাতু নিষ্কাশনে, সিমেন্ট শিল্পে, গৃহাদি নির্মাণে চুনাপাথরের ব্যবহার বহুল ও ব্যাপক। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চুনাপাথর পাওয়া যায়। স্থানীয়-ভাবেই চুনাপাথরের ব্যবহার বেশি হয় বলিয়া ইহার আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য খুবই নগণ্য।

ভারতে চুনাপাথরের আঞ্চলিক বণ্টন

রাজ্য	খনি অঞ্চল	রাজ্য	খনি অঞ্চল
বিহার	সাহাবাদ, পালামৌ হাজারিবাগ, সিংভূম।	মধ্যপ্রদেশ	বিলাসপুর, দ্রুগ, ইয়োত-মল
ওড়িশা	সম্বলপুর, কোরাপুট, সুন্দরগড়।	রাজস্থান	উদয়পুর, যোধপুর, বুন্দি।
অন্ধ্রপ্রদেশ	কুর্নুল।	তামিলনাড়ু	সালেম।
		কর্ণাটক	সিমোগা।

উপরি-উক্ত অঞ্চল ব্যতীত উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, আসাম ও মহারাষ্ট্রেও সামান্য পরিমাণে চুনাপাথর পাওয়া যায়। ভারতে ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে চুনাপাথরের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩.১৮ ও ৩.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

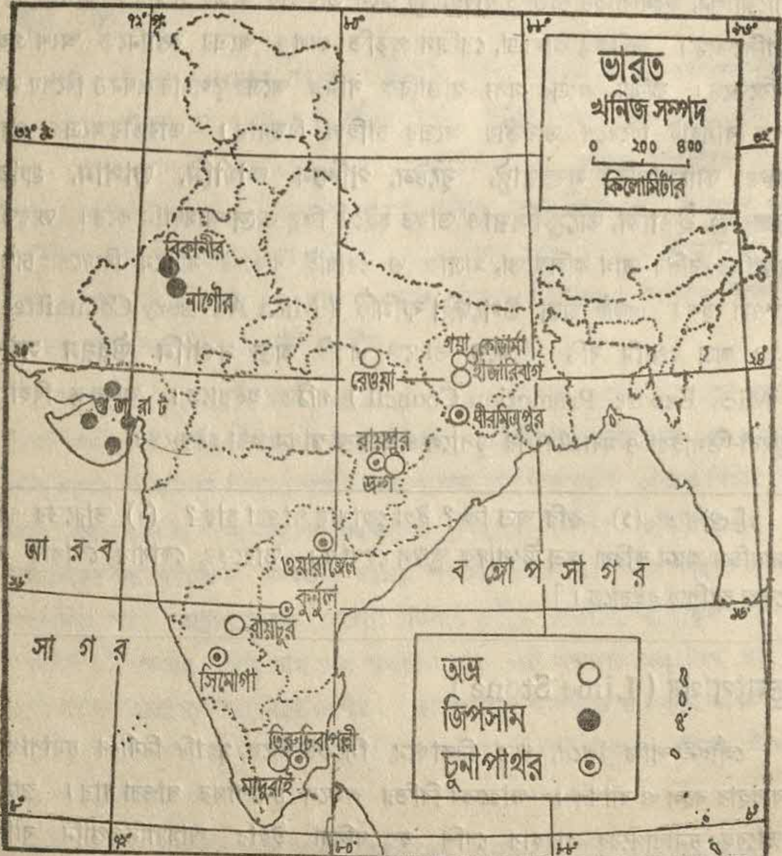

চিত্র ৮.৩ : ভারতের খনিজ সম্পদ : তাম্র, জিপসাম ও চুনাপাথর উৎপাদক অঞ্চল।

জিপসাম (Gypsum)

রাসায়নিক সার, সিমেন্ট, সালফিউরিক অ্যাসিড তৈয়ারিতে জিপসামের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে সঞ্চিত জিপসামের পরিমাণ প্রায় ১২০˙৪৫ কোটি মেট্রিক টন। **রাজস্থানের** বিকানীর, নাগোর, জয়সলমীর ও যোধপুর, **তামিলনাডুর** তিরুচিরাপল্লী অঞ্চলে সর্বাধিক জিপসাম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া গুজরাট, কাশ্মীর ও পাঞ্জাব অঞ্চলেও জিপসাম আকরিত হয়। ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে ভারতে উত্তোলিত জিপসামের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯˙৪৮ ও ৯˙৭০ লক্ষ মেট্রিক টন।

সীসা ও দস্তা আকরিক (Lead and Zinc Ores)

ভারতে সীসা ও দস্তার উৎপাদন খুবই সামান্য, প্রয়োজনের তুলনায় ইহা নগণ্য। বিদেশ হইতে আমদানির সাহায্যেই আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটান হইয়া থাকে। ভারতে **অন্ধ্রপ্রদেশের** অগ্নিগুণ্ডালা ও **ওড়িশার** সারগিপল্লে অঞ্চলে **সীসা** পাওয়া যায়। **গুজরাট** ও **রাজস্থানে** সামান্য দস্তা পাওয়া যায়। ভারতে প্রায় ৩৫ কোটি টন সীসা ও দস্তার সঞ্চিত ভাণ্ডার আছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

স্বর্ণ (Gold)

ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে অতি স্বল্প পরিমাণে হইলেও কিছু পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। ভারতে প্রধানত তিনটি অঞ্চলেই স্বর্ণ সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য : **অন্ধ্রপ্রদেশে** অনন্তপুর জিলার রামগিরি অঞ্চল, **কর্ণাটকের** কোলার জিলার কোলার এবং রাইচুর জিলার হাত্তি অঞ্চল। ইহা ছাড়া **তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার** ও **ওড়িশা** রাজ্যের নদীবাহিত পলি ছাঁকিয়া স্থানীয় অধিবাসীরা সামান্য পরিমাণে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। ওড়িশার সিংভূম জিলা, পাঞ্জাবের আম্বালা, উত্তরপ্রদেশের বিজনোর ও আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অঞ্চল এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

কোলার স্বর্ণ খনি অঞ্চলে চারিটি প্রধান খনি লক্ষ করা যায়—চ্যাম্পিয়ন রীফ মাইন, উরিগাম মাইন, মাইশোর মাইন, এবং নান্দীদুর্গ মাইন। ইহাদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন ও নান্দীদুর্গ খনি সর্বাপেক্ষা বেশি গভীর। ইহাদের স্বাভাবিক গভীরতা প্রায় ৩০০০ মিটার। কর্ণাটকে ব্যাঙ্গালোর শহরের পশ্চিমে **বেজারা** খনি হইতেও বর্তমানে স্বল্প পরিমাণে স্বর্ণ উত্তোলিত হয়। সম্প্রতি তামিলনাড়ু রাজ্যে **সালেম** ও **চিতুর** জিলাতেও সামান্য পরিমাণ স্বর্ণের সঞ্চিত ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ভারতে সঞ্চিত স্বর্ণ ভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন আকরিক। ইহার

মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ প্রায় ৬৪·১৩ মেট্রিক টন। একমাত্র কর্ণাটক রাজ্যেই সঞ্চিত আকরিকের পরিমাণ প্রায় ৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে স্বর্ণের পরিমাণ ৪১·২৪ মেট্রিক টন।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতের কোথায় কোথায় চুনাপাথর পাওয়া যায়? (২) সীসা ও দস্তা ভারতের কোন্ কোন্ রাজ্যে উত্তোলিত হয়। (৩) ভারতের স্বর্ণ খনি অঞ্চলের নাম লিখ। (৪) চ্যাম্পিয়ন রীফ মাইন ও মাইশোর মাইন কোথায় অবস্থিত?]

হীরক (Diamond)

হীরক অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। ভারতে ইহা খুব সামান্যই পাওয়া যায়। হীরক উত্তোলনের সর্বপ্রধান ক্ষেত্র হিসাবে **মধ্যপ্রদেশের** পান্না, ছাতারপুর ও সাতনা এবং **উত্তরপ্রদেশের** বান্দা জিলায় অবস্থিত খনি উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতে **অন্ধ্রপ্রদেশের** অনন্তপুর, কুডাপ্পা, কুর্নুল, কৃষ্ণা ও গোদাবরী জিলা এবং **কর্ণাটকের** বেলারীতে সামান্য হীরক পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ওড়িশার সম্বলপুর ও মহারাষ্ট্রের চান্দা জিলায়ও সামান্য হীরক পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্তমানে ভারতের পান্না খনিই হীরক উত্তোলন করিয়া থাকে। ভারতে সঞ্চিত হীরক ভাণ্ডারের পরিমাণ ৫·৭৯ লক্ষ ক্যারেট।

ইরেনিয়াম ও থোরিয়াম (Uranium and Thorium)

পারমাণবিক শক্তির উৎস হিসাবেই ইহাদের ব্যবহার বর্তমানে সর্বাধিক। ইহা ছাড়া গ্যাস ম্যান্টেল তৈয়ারিতেও থোরিয়াম ব্যবহৃত হয়। ভারতে কেরালার সমুদ্রতীরে মোনাজাইট নামক প্রচুর বালুকণার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থোরিয়াম পাওয়া যায়। মোনাজাইট হইতে থোরিয়াম নিষ্কাশন করিয়া পারমাণবিক চুল্লীতে ব্যবহার করা হয়। বিহারের ঘাটশিলার নিকট **যাদুগুড্ডা** নামক স্থানে প্রচুর ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। গোদাবরী ব-দ্বীপ ও চিল্কা হ্রদ অঞ্চলেও মোনোজাইট পাওয়া যায়।

৯ ভারতের শক্তি সম্পদ
(Power Resources of India)

আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রধান নির্ভর ইন্ধন-শক্তি। ইহার সহজ ও সুলভ যোগানই দেশের শিল্পোন্নতির মূল ভিত্তি। ইন্ধন-শক্তির উৎস কয়লা, খনিজ তৈল, প্রবহমান জলধারা, এমনকি আধুনিক শক্তির আধার ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়ামও কম-বেশী ভারতে পাওয়া যায়। কয়লা সম্পদে ভারত বর্তমানে স্বয়ম্ভর। কিন্তু কয়লার সঞ্চিত ভাণ্ডারের পরিমাণ তেমন আশাপ্রদ নহে। খনিজ তৈল উত্তোলনে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় হইলেও বর্তমানে আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ আমদানির সাহায্যে মিটান হইয়া থাকে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা ভারতে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। ভারতে মোট জলশক্তির শতকরা ৮-১০ ভাগ মাত্র বর্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা ছাড়া ভারতে ইউরেনিয়াম-সমৃদ্ধ প্রচুর মোনাজাইট পাওয়া যায়। সুতরাং পারমাণবিক শক্তি সম্পদে ভারত স্বয়ম্ভর বলা যায়। কয়লা এবং খনিজ তৈলের অভাব ও আঞ্চলিক বন্টনের বৈষম্যজনিত অসুবিধা জলবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে দূর করা সম্ভব হইবে।

কয়লা (Coal)

শক্তির উৎস হিসাবে কয়লার গুরুত্ব আজিও সর্বাধিক। ভারতে খনিজ সম্পদের মধ্যে পরিমাণ ও মূল্যের বিচারে কয়লাই সর্বশ্রেষ্ঠ। ১৮১৪ সালে ভারতে পশ্চিমবঙ্গে আসানসোলের নিকটবর্তী **সীতারামপুর** অঞ্চলে প্রথম কয়লা উত্তোলন করা হয়। ইহার পর রেলপথ নির্মিত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়লা পরিবহণের সুবিধা হয় এবং কয়লার উত্তোলন বৃদ্ধি পায়। ভারতে জ্বালানী হিসাবে কয়লার ব্যবহার ঘরে ঘরে। শক্তির ইন্ধন হিসাবে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে, বস্ত্রবয়ন, পাট, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শ্রমশিল্পে, রেল ও জাহাজ পরিবহণে, লৌহ-ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতব শিল্পে, কাঁচামাল হিসাবে, কৃষি-সার ও লঘু রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে কয়লা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রেলে ও লৌহ-ইস্পাত শিল্পেই কয়লার ব্যবহার সর্বাধিক। কয়লা উৎপাদনে ভারত বর্তমানে পৃথিবীতে ষষ্ঠ স্থানের অধিকারী। ভারতে প্রধানত তিন শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়—**বিটুমিনাস, লিগনাইট ও পীট**। ভারতীয় কয়লায় বেশির ভাগই নিম্ন মানের। ইহাতে কার্বনের ভাগ কম। ফলে ইউরোপ ও আমেরিকার কয়লার তুলনায় ইহার তাপ সৃষ্টির ক্ষমতা কম। ভারতে কয়লা ও লিগনাইটের সঞ্চিত

ভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ৮,৬৪৩ কোটি মেট্রিক টন। ইহার মধ্যে কয়লার পরিমাণ প্রায় ৮,৪৩৩ কোটি মেট্রিক টন ও লিগনাইটের পরিমাণ প্রায় ২১০ কোটি মেট্রিক টন। ভারতে পীট কয়লা গঙ্গার ব-দ্বীপ ও তরাই অঞ্চলে কিছু পাওয়া যায়।

[**প্রশ্ন**: (১) ভারতে শক্তি সম্পদ কি কি পাওয়া যায়? (২) ভারতে কত প্রকার কয়লা পাওয়া যায় ও কি কি?]

উৎপাদক অঞ্চল (Mining Regions): ভূতাত্ত্বিক অবস্থান অনুযায়ী ভারতীয় কয়লাক্ষেত্রগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ক) গণ্ডোয়ানা কয়লাখনি—

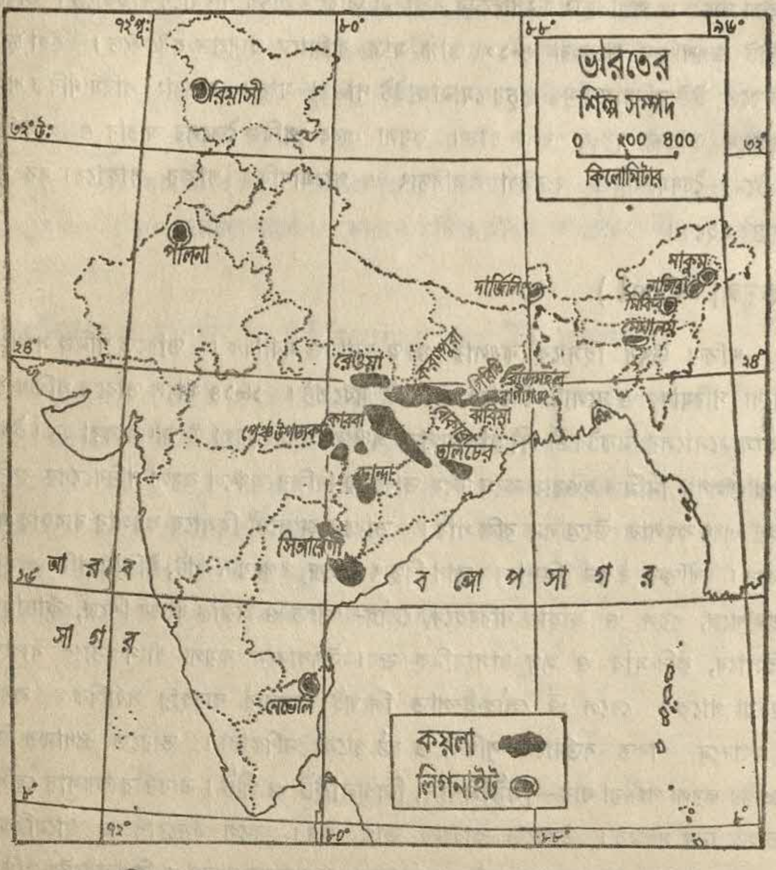

চিত্র ৯.১: ভারতের শিল্প সম্পদ: কয়লা উৎপাদক অঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও **মধ্যপ্রদেশে** এবং বিক্ষিপ্তভাবে **মহারাষ্ট্র** ও **অন্ধ্রপ্রদেশে** বিস্তৃত; (খ) টার্শিয়ারি কয়লাখনি—উত্তর ভারতে **হিমালয়ের**

পাদদেশে বিক্ষিপ্তভাবে **অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, আসাম, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং** অঞ্চলে বিস্তৃত। **কাশ্মীর ও রাজস্থান** অঞ্চলে এবং দক্ষিণ ভারতের **তামিলনাড়ু** ও **কেরালা** রাজ্যে লিগনাইট পাওয়া যায়। মেঘালয়ের গারো পাহাড় অঞ্চলে সম্প্রতি খুব উচ্চ শ্রেণীর বিটুমিনাস জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং সরকারী মালিকানায় এই খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের ব্যবস্থা হইতেছে। ইহা ছাড়া বিহারে ও মধ্যপ্রদেশেও বহু নতুন কয়লাক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ভারতে কয়লাক্ষেত্রগুলির আঞ্চলিক বণ্টনে বিশেষ বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। ইহার ফলে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তীর্ণ এলাকায় শিল্পের প্রসার প্রধানত জল-বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। কয়লাকে কেন্দ্র করিয়াই **পশ্চিমবঙ্গে** (১) হুগলী নদীর উভয় তীরে ব্যাপ্ত কলিকাতা-হাওড়া শিল্পাঞ্চল, (২) আসানসোল শিল্পাঞ্চল এবং **বিহারে** (১) ধানবাদা-ঝরিয়া শিল্পাঞ্চল, (২) জামসেদপুর শিল্পাঞ্চল, (৩) শোন উপত্যকার শিল্পাঞ্চলসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে এই সকল শিল্পাঞ্চলের যেমন প্রসার ঘটিয়াছে তেমনি আবার দুর্গাপুর, বোকারো ও রাঁচীর মত নতুন শিল্পাঞ্চলও গড়িয়া উঠিতেছে।

ভারতে কয়লাক্ষেত্রের আঞ্চলিক বণ্টন

রাজ্য ও অংশ	কয়লাক্ষেত্র (গণ্ডোয়ান শ্রেণী)	ব্যবহার
পশ্চিমবঙ্গ ২০%	রাণীগঞ্জ, আসানসোল, বরাকর। সম্প্রতি আবিষ্কৃত: বাঁকুড়া ও পশ্চিম-দিনাজপুর।	পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে কলিকাতা, হাওড়া ও বর্দ্ধমানের শিল্পাঞ্চলের সহিত যুক্ত। ইস্পাত শিল্প, কোকচুল্লী, তাপবিদ্যুৎ ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
বিহার ৪১%	ঝরিয়া, বোকারো, রামগড়, উত্তর ও দক্ষিণ করণপুরা, গিরিডি, রাজমহল ও শোন, পালামৌ অঞ্চলের অন্তর্গত ডালটনগঞ্জ, হুটার, ঔরঙ্গা, ইত্যাদি।	পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের দ্বারা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের দামোদর অববাহিকার শিল্পাঞ্চলের সহিত যুক্ত। লৌহ-ইস্পাত, সিমেন্ট, তাপবিদ্যুৎ, কোকচুল্লী, সার ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

রাজ্য ও অংশ	কয়লাক্ষেত্র (গণ্ডোয়ান শ্রেণী)	ব্যবহার
ওড়িশা ৩%	তালচের, রামপুর ও হিমগির	দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা মহানদী অববাহিকার শিল্পাঞ্চলের সহিত যুক্ত। লৌহ-ইস্পাত, তাপবিদ্যুৎ ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
মধ্যপ্রদেশ ২১%	ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু কয়লাক্ষেত্র শোন উপত্যকার শোনাপতি, চিরিমিরি, কোরিয়া গড় ইত্যাদি। রেওয়া ছত্রিশগড় অঞ্চলে তাতপানী, ঝিলিমিলি, বিশ্রামপুর, কোরবা, রামগড়, লক্ষ্মণপুর, রায়গড় ইত্যাদি। নর্মদা উপত্যকার মোহপনী, পেঞ্চভ্যালি, কনহানভ্যালি, কাম্‌প্তি ইত্যাদি। বিন্ধ্য অঞ্চলের উমারিয়া, সোহাগপুর, জোহিলা, সিঙ্গরৌলী ইত্যাদি।	মধ্যপ্রদেশের বস্ত্রবয়ন, কাগজ, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, লৌহ-ইস্পাত, অন্যান্য শ্রম শিল্পে, আমেদাবাদ শিল্পাঞ্চলে ও বিশাখাপত্তনমের জাহাজ নির্মাণ শিল্পে এই কয়লা ব্যবহৃত হয়। প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা শিল্পাঞ্চলগুলির সহিত যুক্ত।
মহারাষ্ট্র ৪%	ওয়ার্ধা উপত্যকার অন্তর্গত বল্লারপুর, ওয়ারোরা, চান্দা, উন, ভাণ্ডার, ঘুমঘুষা, ওয়ামনপল্লী, ইয়োতমল ইত্যাদি।	মধ্য রেলপথ দ্বারা যুক্ত ওয়ার্ধা অববাহিকার শিল্পক্ষেত্রে ও রেলপথে ব্যবহৃত।
অন্ধ্রপ্রদেশ ৯%	সিঙ্গারেণী, বেদ্দাদানল, তান্দুর, সাস্তি, চিন্নুর, আল্লাপল্লী ইত্যাদি।	দক্ষিণ ও দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ দ্বারা দক্ষিণ ভারতের শিল্পক্ষেত্রের সহিত যুক্ত। রেলপথ, লৌহ-ইস্পাত, তাপবিদ্যুৎ ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত।

রাজ্য	টার্শিয়ারি শ্রেণী	ব্যবহার
আসাম	নাজিরা, মাকুম	রেলপথে ও স্থানীয় শিল্পে ব্যবহৃত।
মেঘালয়	খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও গারো পাহাড়	

ভারতে লিগনাইট ক্ষেত্রের আঞ্চলিক বণ্টন

রাজ্য	লিগ্নাইট ক্ষেত্র	রাজ্য	কয়লাক্ষেত্র
তামিলনাড়ু	দক্ষিণ আর্কট।	রাজস্থান	বিকানীর, পালনা।
পণ্ডিচেরী	কাড্ডালোর।		
কেরালা	ভারকালো, কুইলন, কানান্নোর।		
কাশ্মীর	শালীগঙ্গা, রিয়াসি।		

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতের বিভিন্ন প্রকার কয়লা ক্ষেত্রের আঞ্চলিক বণ্টন আলোচনা কর। (২) শিল্পাঞ্চলের সহিত কয়লা ক্ষেত্রের যোগাযোগ বর্ণনা কর। (৩) ভারতে কয়লা সম্পদের আঞ্চলিক বণ্টনের বৈশিষ্ট্য কি কি? (৪) ভারতের একটি মানচিত্র অঙ্কন করিয়া কয়লার বণ্টন দেখাও।]

সমস্যা (Problems) : কয়লা উত্তোলনে ও ব্যবহারে ভারতের সমস্যা অনেক। (১) কয়লার সাধারণ মান নিম্নশ্রেণীর। ধাতব শিল্পে ব্যবহারে পর্যায়করণ ও ধৌতিকরণ নিঃসন্দেহে ব্যয়-সাপেক্ষ। (২) যানবাহানের অসুবিধার ফলে প্রায়ই উত্তোলন ব্যাহত হয়। (৩) কয়লাক্ষেত্রসমূহ স্বল্প পরিসর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হওয়ায় শিল্পায়নের অগ্রগতি দ্রুত হারে সম্ভব নহে। (৪) কয়লার বিভিন্ন উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার এদেশে সীমিত, ফলে প্রভূত অপচয় হইয়া থাকে। (৫) কয়লা উত্তোলনের অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও ভূগর্ভের শূন্যস্থানে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বালি দ্বারা পূর্ণ না করায় ও উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করায় দুর্ঘটনা ও তজ্জনিত প্রচুর সম্পদের অপচয়। (৬) কয়লা শিল্পে নিয়মিত শ্রমিকের অভাব। (৭) আধুনিক যন্ত্রপাতি ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার অভাবে ভারতে জনপ্রতি কয়লার উত্তোলন অন্যান্য দেশের তুলনায় কম।

উন্নয়ন প্রচেষ্টা (Development Plans) : পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত খনিজ পদার্থের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যের ফলে কয়লার বার্ষিক উত্তোলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়লা শিল্পে শ্রমিক নিরাপত্তা, কয়লা সম্পদের সংরক্ষণ, কয়লার শ্রেণীবিভাগ, ধৌতিকরণ ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে ব্যাপক উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কয়লার উত্তোলন বৃদ্ধি, কয়লাখনিগুলির উন্নয়ন এবং জাতীয় স্বার্থে কয়লার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে দেশের ২১৪টি কোকিং কয়লা উৎপাদনকারী খনি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে দেশের অন্যান্য সমস্ত কয়লাখনিও রাষ্ট্রীয় অধিকার ও নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং Coal Mines Authority Ltd. নামক একটি নব-গঠিত সংস্থার কর্তৃত্বাধীন করা হয়। ১৯৭৫ সালে Coal India Ltd. নামক একটি হোল্ডিং কোম্পানি এবং ইহার অধীনে কতকগুলি আঞ্চলিক

সংস্থা গঠন করিয়া সমস্ত কয়লাখনি পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নের সারণীতে বিভিন্ন কয়লাখনি পরিচালক সংস্থা, ইহাদের আঞ্চলিক অধিকার ও উৎপাদন দেখান হইল :

	সংস্থা	আঞ্চলিক অধিকার	উৎপাদন (১০ লক্ষ মে.ট.) ১৯৮২-৮৩
১।	Eastern Coalfields Ltd.	রাণীগঞ্জ, আসানসোল	২২˙৭
২।	Central Coalfields Ltd.	বিহার, ওড়িশা	৩৩˙১
৩।	Western Coalfields Ltd.	মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র	৩৪˙৩
৪।	North-Eastern Coalfields Ltd.	আসাম, মেঘালয়	০˙৭
৫।	Bharat Coking Coal Ltd.	বিভিন্ন অঞ্চলে কোক কয়লার খনি	২৪˙০
৬।	Coal India Ltd.	বিহার ও মধ্যপ্রদেশের কতকগুলি খনি	১৪˙৮
৭।	Singarene Collieries Company Ltd.	অন্ধ্রপ্রদেশের কয়লা খনি	১২˙৩
৮।	অন্যান্য	কর্ণাটক ও অন্যান্য অঞ্চলের খনি	৩˙৫
		মোট	১৪৫.৪

১৯৭২ ও ১৯৭৪ সালে পর্যায়ক্রমে ভারতের ২১৪টি কোক কয়লা ও ৭১১টি সাধারণ কয়লাক্ষেত্র রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে ; কয়লা শিল্পের উন্নতির জন্য "কোল বোর্ড", বিহারের ধানবাদে "ফুয়েল রিসার্চ ইনস্‌টিট্যুট" স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট কয়লাকে ধৌতিকরণের সাহায্যে ধাতু শিল্পে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য দুর্গাপুর (পশ্চিমবঙ্গ), কারগলি (বিহার), দুগদা, ভোজুদি প্রভৃতি অঞ্চলে কয়লা ধৌতাগার স্থাপিত হইয়াছে। অধিকন্তু কয়লা শ্রমিকদিগকে আধুনিক কয়লা উত্তোলন পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য কারগলি, গিরিডি, তালচের, কুরশিরা প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্রও স্থাপন করা হইয়াছে। জলবিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা রেলপথে কয়লার ব্যবহার কমানো ও শিল্পক্ষেত্রে কাঁচামাল হিসাবে কয়লার ব্যবহারের দ্বারা অধিকতর লাভজনক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, বিহারের বোকারো প্রভৃতি স্থানে এই কারণে "কার্বোক-মপ্লেক্স" গঠন করা হইয়াছে।

ভারত কয়লা সম্পদে স্বয়ম্ভর, উৎপাদন আভ্যন্তরীণ চাহিদার অনুপাতে যথেষ্ট। দেশে শিল্পায়নের গতি দ্রুত হওয়ার ফলে ক্রমশ কয়লার চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতেছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বর্তমানে ভারতে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় ইহার উন্নতি ত্বরান্বিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

উৎপাদন ও ব্যবহার (Output and Uses) :

ভারতে উত্তোলিত কয়লাকে ব্যবহারের ভিত্তিতে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) ধাতব শিল্পে ব্যবহারোপযোগী কয়লা—ইহা পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ, বিহারের ঝরিয়া, বোকারো ও গিরিডি অঞ্চলে আকরিত হয়। (২) উচ্চ শ্রেণীর স্টীম কয়লা—ইহার উৎস প্রধানত **পশ্চিমবঙ্গের** রাণীগঞ্জ, **বিহারের** বোকারো, করণপুরা, **ওড়িশার** তালচের ও **মধ্যপ্রদেশের** কোর্বা, মোহপানি ও রেওয়া-ছত্রিশগড় অঞ্চলের ক্ষেত্রসমূহ। (৩) টার্শিয়ারি কয়লা—আসাম, রাজস্থান ও কাশ্মীর অঞ্চলেই প্রধানত পাওয়া যায়। (৪) নিম্ন শ্রেণীর স্টীম কয়লা—ইহা প্রায় গণ্ডোয়ানা কয়লা ক্ষেত্রের সর্বত্র পাওয়া যায়। (৫) লিগনাইট—ভারতের তামিলনাডু অঞ্চলে পাওয়া যায়।

[**প্রশ্ন** : ভারতীয় কয়লা শিল্পের বর্তমান সমস্যা কি ? উহা সমাধানের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ? (২) 'কার্বোকমপ্লেক্স' কি ? কোথায় কোথায় ইহা স্থাপন করা হইয়াছে ?]

ভারতের কয়লা উত্তোলনের গতিপ্রকৃতি

বৎসর	উত্তোলন মি. মে. ট.	বৎসর	উত্তোলন মি. মে. ট.
১৯৫০-৫১	৩২.৮	১৯৮০-৮১	১১৮.৮
১৯৬০-৬১	৫৬.১	১৯৮২-৮৩	১৩৬.৯
১৯৭০-৭১	৭৬.৩	১৯৮৩-৮৪	১৪৪.৯

ভারতে বেশির ভাগ কয়লা আজিও রেলপথেই ব্যবহৃত হয়। ইহার পরেই লৌহ-শিল্পের স্থান। কয়লা খনিতে ও অন্যান্য শিল্প-কারখানায় কয়লা ব্যবহারের পরিমাণও কম নয়। ভারতে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে, গৃহস্থালির কার্যে ব্যবহৃত কয়লার পরিমাণ যথেষ্ট। কয়লার এই প্রকার ব্যবহার আধুনিক শিল্পযুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে খুবই অবৈজ্ঞানিক। রেলপথে, গৃহস্থালিতে ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যাপক ব্যবহার কমাইয়া কয়লা-নির্ভর শিল্পস্থাপনই দেশের অগ্রগতির পক্ষে বাঞ্ছনীয়। নিম্নের সারণীতে ভারতে কয়লার ব্যবহার দেখান হইল :

চিত্র ৯.২ : ভারতে কয়লা উৎপাদনের গতিপ্রকৃতির বারগ্রাফ।

ভারতে কয়লার ব্যবহার (মোট উৎপাদনের শতাংশ)

রেলপথ	১৩	সিমেন্ট শিল্প	৫
তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন	২২	কৃষিসার ও রাসায়নিক শিল্প	৪
লৌহ ইস্পাত ও ধাতু নিষ্কাশন	২০	অন্যান্য শ্রম শিল্প ও কয়লাখান	১৬
গৃহস্থালি	১০	জাহাজ, রপ্তানি, বিবিধ	১০
			মোট—১০০

বর্তমানে ভারত নিকটবর্তী দেশসমূহে প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ লক্ষ টন কয়লা রপ্তানি করিয়া থাকে। আমদানিকারক দেশের মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা ও সিঙ্গাপুর উল্লেখযোগ্য।

[**প্রশ্ন** : ভারতে কয়লা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় ? (২) ব্যবহারের ভিত্তিতে কয়লাকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি ? (৩) একটি চার্টের সাহায্যে কয়লা উত্তোলনের গতিপ্রকৃতি দেখাও।]

খনিজ তেল (Petroleum)

গতিনির্ভর আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার প্রসারে খনিজ তেলের কার্যকারিতা বিস্ময়কর। খনিজ তেল ও ইহার নানাবিধ উপজাত দ্রব্য—যেমন গ্যাসোলিন, ডিজেল, কেরোসিন, পিচ্ছিলকারক পদার্থ, ন্যাপথা প্রভৃতির ব্যবহার বিমান, মোটর, রেল, জাহাজ ইত্যাদি পরিবহণ শিল্পে, বিভিন্ন প্রকার সর্জন শিল্পে, কৃষিসার-শিল্পে বহুল ও ব্যাপক হওয়ার ফলে ইহার গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইহা দুষ্প্রাপ্য তরল খনিজ সম্পদ হওয়ায় সোনার সহিত তুলনা করিয়া ইহাকে **তরল সোনা** (Liquid gold) বলা হয়।

ভারতে খনিজ তেলের উত্তোলন শুরু হয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে, আসামের ডিগবয় অঞ্চলে। অবশ্য আসাম অঞ্চলে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই। কিন্তু ঐ সময়ে এই সম্পর্কে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে Geological Survey of India-র একজন সদস্য, H. B. Medlicot, আসামের মারঘেরিটা অঞ্চলে কয়লার সন্ধান করিতে গেলে পুনরায় তেলের সন্ধান পান। ঐ বৎসরই নাহার পঙ এলাকায় প্রথম কূপ খনন করা হয়। ইহার ফল তেমন আশাপ্রদ না হওয়ায় ঐ প্রচেষ্টা বাতিল করা হয়। ইহার কয়েক বৎসর পর Geological Survey of India-র অপর একজন সদস্য F. R. Mellet, এ অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান চালান এবং তাহার প্রচেষ্টার ফলেই ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিগবয়ে প্রথম খনিজ তেল উত্তোলন শুরু

হয়। কূপ খননের সমস্ত ব্যয় বহন করে Assam Railway & Trading Co.। কার্যত তাহাদের পরিচালনায়ই ভারতে প্রথম সফল তেল কূপ খনন করা হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Mining Regions): ভারতে খনিজ তেলের উত্তোলন বর্তমানে দুইটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ—(১) **উত্তর-পূর্বে আসাম রাজ্যের** লক্ষিমপুর জিলার ডিগবয়, বাপ্পাপুং, হানসাপুং, নাহারকাটিয়া ও রুদ্রসাগর অঞ্চল এবং সুরমা উপত্যকার বদরপুর, মসিমপুর এবং পাথরিয়া অঞ্চল। সুরমা উপত্যকার তেল গুণগত বৈশিষ্ট্য নিম্নমানের। (২) **পশ্চিম ভারতে গুজরাটে** কচ্ছ ও ক্যাম্বে উপসাগরীয় অঞ্চলে অ্যাঙ্কলেশ্বর, কালোল ও ক্যাম্বে এবং **মহারাষ্ট্রের** বোম্বাই বন্দর সন্নিহিত আরব সাগরে **বম্বে-হাই** অঞ্চল।

খনিজ তেল উত্তোলনে বিশ্বে ভারতের স্থান আজিও নগণ্য। ভারতে খনিজ তেলের উত্তোলন প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে একমাত্র আসাম অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি ও বিশ্বের বাজারে ইহার অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ভারতে ১৯৫৫ সালে **তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন** স্থাপিত হয়। এই সংস্থা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশের বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় ভারতে তেল ও গ্যাস সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালায়। ইহার ফলে ভারতের তেল সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। অনুমান করা হয় যে হিমালয়ের সানুদেশে উত্তর-পূর্বে আসাম হইতে উত্তর-পশ্চিমে জম্মু পর্যন্ত এবং ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে বঙ্গোপসাগর ও আরব-সাগরের অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত তেল বহনকারী শিলা বিদ্যমান। ইহা ছাড়া দেশের অভ্যন্তর ভাগেও ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে খনিজ তেলের লুক্কায়িত ভাণ্ডার আছে বলিয়া আশা করা যায়। বঙ্গোপসাগরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ও আরব সাগরে লাক্ষাদ্বীপেও খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। নিম্নের সারণীতে ভারতে খনিজ তেলের বর্তমান উৎপাদন ক্ষেত্র ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি দেখান হইল :

ভারতে খনিজ তেল উৎপাদক অঞ্চল ও সম্ভাব্য ক্ষেত্র

রাজ্য	উৎপাদক অঞ্চল	রাজ্য	সম্ভাব্য ক্ষেত্র
আসাম	ডিগবয়, বাপ্পাপুং, হানসাপুং, মোরান, হুরিজান, নাহার-কাটিয়া, বদরপুর, মসিমপুর, পাথরিয়া।	আসাম	রুদ্রসাগর, লাকওয়া, কাছাড়, ছারগোলা।
		ত্রিপুরা	কাঞ্চনপুর।

রাজ্য	উৎপাদক অঞ্চল	রাজ্য	সম্ভাব্য ক্ষেত্র
গুজরাট	ক্যাম্বে, অ্যাঙ্কলেশ্বর, কালোল।	গুজরাট	বরোদা, নওগাঁও, কোসাম্বা, আমেদাবাদ, কাদি।
মহারাষ্ট্র	বম্বে-হাই।	নাগাল্যাণ্ড	ছামপঙ।
অন্ধ্র	গোদাবরী ব-দ্বীপ	পশ্চিমবঙ্গ	কালনা, ক্যানিং, সুন্দরবন, গলসী।
		উত্তরপ্রদেশ	বাদাউন, উজ্জয়িনী।
		পাঞ্জাব	হোসিয়ারপুর।
		হিমাচল-প্রদেশ	জ্বালামুখী।
		অন্ধ্রপ্রদেশ	গোদাবরী ব-দ্বীপ।

উপরি-উক্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্র ব্যতীত তামিলনাড়ু (অন্ধ্র), ওড়িশা উপকূল, লাক্ষাদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও খনিজ তেলের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। ভারতের নতুন ও পুরাতন তেল ক্ষেত্রগুলিকে একত্রে বিবেচনা করিলে তেল উৎপাদক অঞ্চলের মোট আয়তন দাঁড়ায় প্রায় ১০·৩৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।

উৎপাদন (Output): ১৯৪৮ সালে ভারতে অপরিশ্রুত খনিজ তেলের উৎপাদন ছিল মাত্র ২·৫১ লক্ষ মেট্রিক টন। ইহার দ্বারা দেশের মোট চাহিদার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র পূরণ করা সম্ভব হইত। এই কারণে অবশিষ্ট শতকরা ৯৫ ভাগ তেল বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। বিগত ৩০ বৎসরে দেশে খনিজ তেল উত্তোলনে বিশেষ অগ্রগতি ঘটে এবং উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় (১৯৮৩-৮৪ সালে ২৬০ লক্ষ মেট্রিক টন)। কিন্তু আভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিদেশ হইতে আমদানি (চাহিদার প্রায় ৬০ ভাগ) আজিও অব্যাহত। ভারতে খনিজ তেলের উত্তোলন, পরিশ্রুতকরণ ও বণ্টন সম্পর্কে বিভিন্ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি মৌল নীতি গ্রহণ করা হয় ও এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি সংস্থা গঠন করা হয়। (১) **তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন**—নতুন খনির সন্ধান, কূপ খনন ও তেল উৎপাদন সম্পর্কিত সকল প্রকার দায়িত্ব ইহার উপর ন্যস্ত। (২) **ইণ্ডিয়ান রিফাইনারীজ লিঃ**—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তেল পরিশোধন কেন্দ্র স্থাপন, উহার কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ক কার্যাবলী ইহার উপর ন্যস্ত। (৩) **ইণ্ডিয়ান অয়েল কোং লিঃ**—ভারতে খনিজ তেল ও ইহার উপজাত দ্রব্যের বণ্টন ইহার কার্যধারার অন্তর্ভুক্ত।

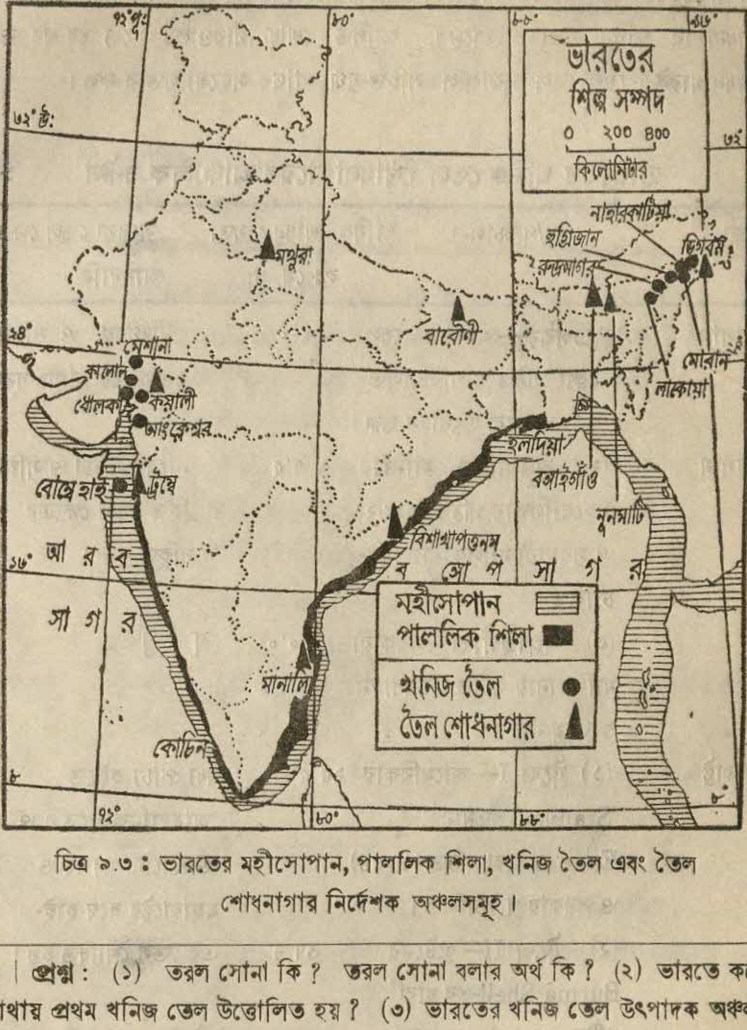

চিত্র ৯.৩ : ভারতের মহীসোপান, পাললিক শিলা, খনিজ তৈল এবং তৈল শোধনাগার নির্দেশক অঞ্চলসমূহ।

[**প্রশ্ন** : (১) তরল সোনা কি ? তরল সোনা বলার অর্থ কি ? (২) ভারতে কবে কোথায় প্রথম খনিজ তেল উত্তোলিত হয় ? (৩) ভারতের খনিজ তেল উৎপাদক অঞ্চল-গুলি কি কি ? (৪) ভবিষ্যতে ভারতে কোথায় খনিজ তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ? (৫) খনিজ তেল অনুসন্ধান, বণ্টন ইত্যাদির জন্য কি কি সংস্থা গঠিত হইয়াছে ?]

শোধনাগার (Refineries) : খনিজ তেলের মূল্য বিগত দুই দশকে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিস্রুত তেলের আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে আসাম অয়েল কোং পরিচালিত একটিমাত্র তেল শোধনাগার ছিল। অপরিস্রুত তেল আমদানি করিয়া দেশে পরিশোধন করা হইলে একদিকে যেমন খনিজ তেলের বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য পাওয়া যাইবে অপর দিকে তেমনি ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পও গড়া সম্ভব হইবে। ইহাতে পরিস্রুত তেলের মূল্যও অপেক্ষাকৃত

কম পড়িবে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন অংশে নতুন নতুন তেল শোধনাগার স্থাপন করা হইয়াছে। স্থাপিত শোধনাগারগুলির মধ্যে বেশির ভাগ শোধনাগারই বিদেশী তেল সংস্থাগুলির সহিত যুগ্ম আর্থিক সহযোগিতার ফল।

ভারতের খনিজ তেল শোধনাগারের আঞ্চলিক বণ্টন ১৬৬

রাজ্য	গঠন/পরিচালনা	বার্ষিক শোধন ক্ষমতা লঃ মে. ট.	সংযুক্ত তেল ক্ষেত্র/ আমদানি
আসাম	(১) **ডিগবয়**—আসাম অয়েল কোং গঠিত ও পরিচালিত ১৯০০ সালে উৎপাদন শুরু।	৫˙০	ডিগবয় ও সন্নিহিত ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত।
আসাম	(২) **নূনমাটি**—রুমানিয়ার সহযোগিতায় গঠিত (১৯৬২) ও সরকারী মালিকানায় পরিচালিত।	৭˙৫	নাহারকাটিয়া ও সন্নিহিত তেল ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত।
	(৩) **বঙ্গাইগাঁও**—সরকারী মালিকানায় গঠিত। উৎপাদন শুরু হয় নাই।	১০˙০	[ঐ]
মহারাষ্ট্র	(১) **ট্রম্বে I**—আমেরিকার 'Stanvac' বর্তমান Esso-এর দ্বারা গঠিত (১৯৫৪) ও সরকার পরিচালিত।	২৫˙৫	মধ্য প্রাচ্য হইতে আমদানিকৃত তেল ও গুজরাটের ক্যাম্বে ও মহারাষ্ট্রের বম্বে-হাই-এর তেল শোধিত হয়।
	(২) **ট্রম্বে II**—বৃটেনের Burma Shell-এর দ্বারা গঠিত (১৯৫৫) ও সরকার পরিচালিত।	৩৭˙৭	[ঐ]
অন্ধ্র	**বিশাখাপত্তনম**—আমেরিকার Caltex কর্তৃক গঠিত (১৯৫৭) ও সরকার পরিচালিত।	৫˙০	আমদানিকৃত তেল শোধন করা হয়।
বিহার	**বারাউনি**—রাশিয়ার সহযোগিতায় গঠিত (১৯৬৪) ও সরকার পরিচালিত।	৩০˙০	আসামের নাহারকাটিয়া ও সন্নিহিত ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত।

রাজ্য	গঠন পরিচালনা	বার্ষিক শোধন ক্ষমতা লঃ মে. টি.	সংযুক্ত তেল ক্ষেত্র/ আমদানি
গুজরাট	কয়ালি—রাশিয়ার সহযোগিতায় স্থাপিত (১৯৬৫) ও সরকার পরিচালিত।	৭০.০	ক্যাম্বে ও অ্যাঙ্কলেশ্বরের তেল ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত।
কেরালা	কোচিন—আমেরিকার Philips Petroleum Co-এর সহিত যুগ্ম-উদ্যোগে গঠিত (১৯৬৬) ও সরকার পরিচালিত	২৫.০	মধ্য প্রাচ্য হইতে আমদানিকৃত তেল শোধিত হয়।
তামিলনাড়ু	মানালি—National Union Co., American International Co. এবং ভারত সরকারের যুগ্ম উদ্যোগে গঠিত (১৯৬৯)।	২৫.০	আমদানিকৃত তেল শোধন করা হয়।
উত্তরপ্রদেশ	মথুরা-সরকারী মালিকানায় গঠিত (১৯৮১)	৬০.০	আমদানিকৃত ও বম্বে-হাই ক্ষেত্রের তেল পাইপ-যোগে আনিয়া শোধন করা হয়।
পশ্চিমবঙ্গ	হলদিয়া—রুমানিয়া, ফ্রান্স ও ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে গঠিত (১৯৭২)। উৎপাদন শুরু হয় নাই।	২৫.০	আমদানিকৃত তেল শোধন করা হইবে। আসামের তৈল ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত।

উপরি-উক্ত তেল শোধনাগারগুলিতে পেট্রল ও পেট্রলজাত প্রায় সব রকম উপজাত দ্রব্যেই উৎপাদিত হয়। আসামের নামরূপে গ্যাস হইতে সার তৈয়ারি হয়। মহারাষ্ট্রের ট্রম্বেতে লিউব ইণ্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে পিচ্ছিলকারক পদার্থের আর একটি কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার উৎপাদন ক্ষমতা ১.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন। পেট্রোলিয়ামজাত বিশেষ ধরনের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য লুব্রিজল কর্পোরেশনের সহায়তায় ভারতে আর একটি নতুন কারখানা স্থাপন করা হইতেছে। ইহা ছাড়া গুজরাটে নতুন একটি তেল শোধনাগার স্থাপনের প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে।

ভারতের তেল খনিগুলি হইতে অপরিশোধিত তেল ছাড়া প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাসও

পাওয়া যায়। আসামের রুদ্রসাগর, নাহারকাটিয়া, হুগ্রিজান, হিমাচল প্রদেশের জালামুখী, গুজরাটের মাঙ্কেশ্বর, খোম্বা, ভালেজের প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাসের সঞ্চিত ভাণ্ডার আছে। পশ্চিমবঙ্গে এবং ত্রিপুরায়ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ভারতের খনি অঞ্চলের সহিত তেল শোধনাগারের নলপথে সহজ যোগাযোগ স্থাপন করিবার জন্য কয়েকটি নলপথ নির্মাণ করা হইয়াছে, যেমন—(১) আসামের নাহারকাটিয়া তেলক্ষেত্র হইতে নূনমাটি ও বারাউনি শোধনাগার; (২) গৌহাটি—শিলিগুড়ি; (৩) বারাউনি শোধনাগার হইতে কানপুর; (৪) বারাউনি হইতে মৌরীগ্রাম হইয়া হলদিয়া নির্মীয়মাণ শোধনাগার; (৫) গুজরাটে অ্যাঙ্কেলেশ্বর—ক্যাম্বে হইতে কয়ালি শোধনাগার; (৬) আমেদাবাদ হইতে কয়ালি শোধনাগার। (৭) বম্বে-হাই হইতে মথুরা শোধনাগার।

বিগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত তেল শিল্পের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যধারার ফলে ভারতে খনিজ তেলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে উৎপাদনের গতি-প্রকৃতি দেখান হইল:

ভারতের তৈল উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি

বৎসর	উত্তোলন মি. মে. ট.	বৎসর	উত্তোলন মি. মে. ট.
১৯৪৮	০·২৫	১৯৮০-৮১	১০·৫
১৯৬০-৬১	০·৪৪	১৯৮২-৮৩	২১·১
১৯৭০-৭১	৭·১৯	১৯৮৩-৮৪	২৬·০

[Source : Economic Survey of India, 1984-85]

বাণিজ্য (Trade): ভারতে খনিজ তেলের স্বল্প উৎপাদনের জন্য বরাবরই বিদেশ হইতে আমদানির উপর নির্ভর করিতে হয়। সম্প্রতি খনিজ তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। অধিকন্তু অপরিশ্রুত তেল আমদানি করিয়া দেশে শোধন করায় তেলের মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে রাশিয়া, রুমানিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, ইরাণ, বাহ্‌রিন, কুয়েট, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে অপরিশ্রুত তেল আমদানি করা হয়। আশার কথা, ভারত সম্প্রতি কিছু পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিতে সমর্থ হইয়াছে। খনিজ

তেলের উৎপাদন কম হওয়ায় ভারতে ইহার বিকল্প ইক্ষু হইতে সুরাসার (Alcohol) ও লিগনাইট হইতে কৃত্রিম তেল (Synthetic Oil) উৎপাদনের চেষ্টা করা হইতেছে। ইক্ষু হইতে বর্তমানে বৎসরে প্রায় ৫ কোটি লিটার সুরাসার প্রস্তুত হইতেছে। তামিলনাড়ুর নিভেলিতে লিগনাইট হইতে কৃত্রিম তেল তৈয়ারির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কৃত্রিম তেল পেট্রোলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মোটরে ব্যবহার করা যায়। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে খনিজ তেল উত্তোলনে ভারতের বৈদেশিক নির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইবে।

চিত্র ৯.৪ ভারতের খনিজ তৈল উত্তোলনের গতির গাঢ়গ্রাফ।

[প্রশ্ন : ভারতের খনিজ তেল শোধনাগার স্থাপনের তাৎপর্য কি ? (২) ভারতে কোথায় কোথায় খনিজ তেল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে ? (৩) পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প কি ? (৪) খনিজ তেলের বিকল্প হিসাবে ভারতে কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করা হইতেছে ? (৫) একটি মানচিত্রে ভারতের খনিজ তেল উৎপাদক অঞ্চল ও তেল শোধনাগারগুলির অবস্থান দেখাও।]

জলবিদ্যুৎ (Hydroelectricity)

বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার পরেই ভারতে প্রবহমান জলধারার স্থান। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে কয়লা ও খনিজ তেলের একান্ত অভাবই একদিন ঐ সকল অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক প্রেরণা যোগায়। পরবর্তী কালে শ্রমশিল্পের অধিকতর প্রসার ও উহার বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামাঞ্চলে কুটীর শিল্পের উন্নয়ন, যানবাহন পরিচালনা এবং সর্বোপরি ক্রমক্ষীয়মাণ কয়লা সম্পদের সংরক্ষণ, জলবিদ্যুতের ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে।

ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ অনুকূল। দেশের বিভিন্ন অংশে প্রচুর মৌসুমী বৃষ্টিপাত, বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, পর্বত ও উচ্চ মালভূমি হইতে নির্গত অসংখ্য খরস্রোতা নদ-নদী, শ্রমশিল্প গঠনের উপযোগী প্রভূত কৃষিজ ও খনিজ কাঁচামাল, যানবাহন ও গৃহস্থালীর জন্য বিদ্যুতের ব্যাপক চাহিদা এবং কয়লা ও খনিজ তেলের অভাব ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী প্রবহমান জলশক্তিকে

ভারত বিশেষভাবে সমৃদ্ধ সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃষ্টিপাত ঋতুগত হওয়ায় ভারতীয় নদী-সমূহের জলপ্রবাহ অবিরাম ও সুনিয়ন্ত্রিত নহে। ইহার ফলে বিদ্যুতের যোগান অব্যাহত রাখার জন্য যেমন বৃহদাকার কৃত্রিম জলাধার নির্মাণ প্রয়োজন তেমনি বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সহায়ক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনও অত্যাবশ্যক।

উত্তর-ভারতে হিমালয়ের পাদদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহজ সুযোগ বর্তমান। এখানে নদীগুলি বরফ-গলা জলে পুষ্ট ও নিত্যবহ এবং নদীর ঢাল আদর্শ। কিন্তু পর্বতাঞ্চলে নদীসমূহ অস্বাভাবিক খরস্রোতা, রাস্তাঘাট নির্মাণ দুঃসাধ্য এবং জলাধার নির্মাণও অসুবিধাজনক। মধ্যবর্তী সমভূমিতে নদীর ঢাল খুবই কম। এই অঞ্চলে কৃত্রিম জলপ্রপাত সৃষ্টির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বিশেষ অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য। এই কারণে উত্তর ভারতে শ্রমশিল্পের প্রসার অনেকাংশে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কয়লার উপর নির্ভরশীল।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারত বিশেষ অগ্রণী। দক্ষিণ-ভারতে কয়লার অভাব, পশ্চিমঘাট পর্বত ও উচ্চ মালভূমি হইতে নির্গত খরস্রোতা নদী ও স্থানে স্থানে জলপ্রপাত এবং খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য হেতু শিল্পায়নের ব্যাপক চাহিদা প্রভৃতি জল বিদ্যুতের সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। এই অঞ্চলের বেশির ভাগ শিল্প সম্পূর্ণরূপে জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল হইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের নদীগুলি প্লাবনধর্মী হওয়ায় বৃহদাকার কৃত্রিম জলাধার নির্মাণ করিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরাধীন ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের আয়োজন খুবই সীমিত ছিল। স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য ছোট-বড় বহুমুখী নদী-প্রকল্পের মাধ্যমে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্য চলিতেছে।

উৎপাদক অঞ্চল (Generating Regions)—**কর্ণাটক** ভারতে প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদক কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯০২ সালে। কর্ণাটকে (প্রাচীন মহীশূর) কাবেরী নদীর জলপ্রপাত হইতে **শিবসমুদ্রম** নামক উৎপাদন কেন্দ্রে প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং এই কেন্দ্র হইতেই 'কোলার' স্বর্ণখনি ও ব্যাঙ্গালোর শহরে প্রথম বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। বিদ্যুতের অধিকতর চাহিদা পূরণের জন্য ১৯৪০ সালে ইহার নিকটবর্তী **সীমসা** ও **যোগ** নামক আরও দুইটি জলপ্রপাত অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া মোট ৭২,০০০ কি. ও. করা হয় এবং ইহার নাম দেওয়া হয় 'The Mahatma Gandhi Hydroelectric Works.', এই রাজ্যে সরাবতী নদীর উপর লিঙ্গনমাক্কীতে বাঁধ নির্মাণ করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য **সরাবতী জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা** নামে আর একটি প্রকল্পের কাজ শুরু করা হইয়াছে।

মহারাষ্ট্র : এই রাজ্যে ভারতের দ্বিতীয় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯১৫ সালে সহ্যাদ্রি পর্বতের উপরে অবস্থিত **লোনাভ্‌লা**, **ওয়াল-ওয়ান** ও **সিরাওয়াটা** হ্রদের সঞ্চিত জল হইতে **খপোলিতে** বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ইহার পরে অন্ধ্র নদীতে বাঁধ দিয়া **ভিবপুরীতে** (১৯২২) এবং নিলামুলা নদীর স্রোত হইতে **ভীরাতে** (১৯২৭) বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। ১৯২৯ সালে এই তিনটি কেন্দ্রকে Tata Hydroelectric Agency নামক একটি নতুন সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। এই তিনটি কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুতের সাহায্যে (২,৪৪,০০০ কি. ও.) এই অঞ্চলের শিল্প-কারখানা, রেল-ট্রাম চালান হয় ও শহর আলোকিত করা হয়। পরিকল্পনাকালে এই রাজ্যের কলহান ও সাতারা জিলায় যথাক্রমে **চোলা** ও **কয়না** নামক আরও দুইটি বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হয়।

উত্তরপ্রদেশ : এই রাজ্যে গঙ্গা সমভূমি অঞ্চলে গঙ্গা নদীর ১১টি স্বল্পোচ্চ জলপ্রপাতের মধ্যে ৭টি প্রপাতকে ব্যবহার করিয়া 'The Ganges Canal Hydro-electric Grid'-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে ১৯২৬ সালে **বাহাদুরাবাদ**, **মহম্মদপুর**, **চিতোরা**, **শালাওয়া**, **ভোলা**, **পালরা**, **সুমেরায়** বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ইহা ভারতের তৃতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। এই বিদ্যুতের সাহায্যে উত্তর-প্রদেশের ১৪টি জিলায় শিল্প ও কৃষিকার্য পরিচালনা করা এবং শহর আলোকিত করা হয়। পরিকল্পনার কার্যকালে হরিদ্বারের নিকট গঙ্গার উপর পাথরী (২০,৫০০ কি. ও.) ও সার্দা নদীর উপর সার্দা প্রকল্প (৪১,৪০০ কি. ও.) কার্যকর করা হয়। বর্তমানে যমুনা ও ইহার উপনদী, টোনস্‌-এর উপর বাঁধ দিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য 'The Jamuna Hydel Scheme' এবং শোন নদীর উপনদী রিহান্দ-এর উপর বাঁধ দিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য রিহান্দ পরিকল্পনা কার্য চালু করা হইয়াছে।

তামিলনাড়ু : এই রাজ্যে নীলগিরি জেলার অন্তর্গত পাইকারা নদীর গতিপথে একটি জলপ্রপাত হইতে ময়ার কেন্দ্রে The Paikara Hydroelectric Scheme (১৯৩২), কাবেরী নদীর উপর The Mettur Hydroelectric Scheme (১৯৩৭), তাম্রপর্ণী নদীর একটি জলপ্রপাত হইতে The Papnasham Hydro-electric Scheme নামে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ইহাদের সম্মিলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১,০০,০০০ কি. ও। এই তিনটি কেন্দ্রের বিদ্যুৎ কোয়েম্বাটুর, ত্রিচিনাপল্লী, ইরোদ, তাঞ্জোর, নেগাপত্তম, আর্কট, চিতুর, তিনেভেলী, মাদুরা, তেনকাশী প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে সরবরাহ করা হয়। মেতুরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। পরিকল্পনা কালে মেতুর কেন্দ্রের সম্প্রসারণ করা হয় ও Mettur Tunnel Hydroelectric Scheme নামে নতুন একটি প্রকল্পের কাজও শুরু করা হয়।

কেরালা : এই রাজ্যে মুদিরপুঝা নদীর জলপ্রপাত হইতে 'Pallivasal Hydro-electric Scheme' পরিচালিত হয় ও উৎপাদিত বিদ্যুতের (৩৬,০০০ কি. ও.) সাহায্যে এই অঞ্চলের অ্যালুমিনিয়াম শিল্প ও অন্যান্য শিল্পকারখানা চালান হয়। পরিকল্পনা কালে এখানে 'সেঙ্গুলাম' ও 'ইড্ডিকী' (পেরিয়ার নদীর উপর) জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কার্যকর হইয়াছে।

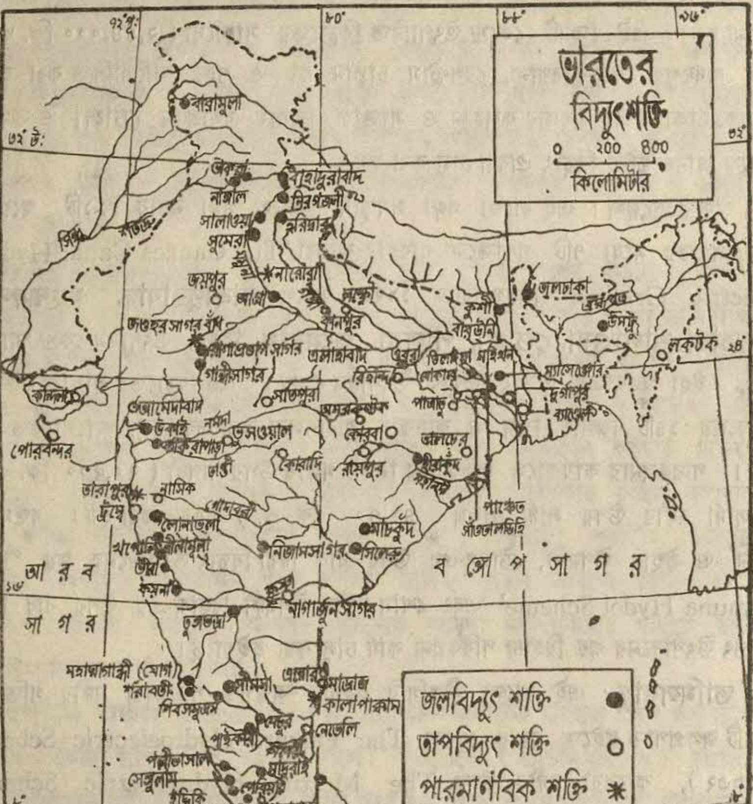

চিত্র ৯.৫ : ভারতের জলবিদ্যুৎ, তাপবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক শক্তি সম্পদ উৎপন্নের নির্দেশক অঞ্চলসমূহ।

কাশ্মীর : স্থানীয় শহর আলোকিত করা ও গৃহস্থালীতে ব্যবহারের জন্য বারমূলাতে ঝিলম নদীর স্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। বর্তমানে 'জম্মু' ও 'সালাল' নামে দুইটি প্রকল্পের কাজ শুরু হইয়াছে। আসাম উমত্রু প্রপাত হইতে স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

পাঞ্জাব—এই রাজ্যে যোগীন্দ্রনগরের নিকট উল নদীর স্রোত হইতে মাণ্ডিপরিকল্পনায়

(১৯৩৩) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পরিকল্পনা কালে ভাকড়া-নাঙ্গাল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে প্রচুর বিদ্যুৎ (৪৮,০০০ কি. ও.) উৎপাদিত হয় ও ইহার সাহায্যে রেল, শিল্পকারখানা চালান হয় ও শহর আলোকিত করা হয়।

উপরি-উক্ত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ব্যতীত বিগত চারিটি পরিকল্পনায় ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে ব্যাপকভাবে জল উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অন্তর্গত অসংখ্য প্রকল্প কার্যকর করা হয়। ইহাদের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের মাচকুন্দ, শ্রীসেলাম ও নিম্ন সিলেরু, বিহারের কোশী, পশ্চিমবঙ্গ বিহারের দামোদর ও ময়ূরাক্ষী এবং হিমাচল প্রদেশের বৈরা-সিউল, ওড়িশার হীরাকুঁদ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের রানা প্রতাপসাগর, গুজরাটের কাকরপাড়া ইত্যাদি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের নাম উল্লেখযোগ্য।

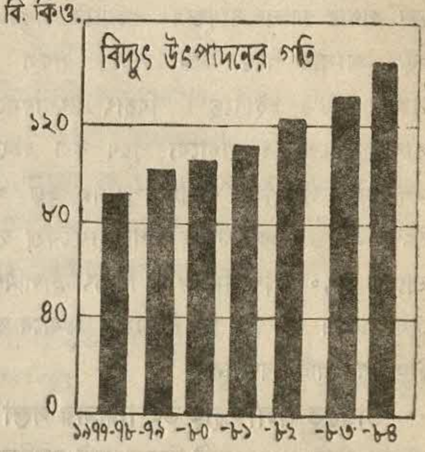

চিত্র ৯.৬ : ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদনের গতি।
[১ বি. কিও. ১০০ কোটি কিলোওয়াট]

ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের গতি-প্রকৃতি

বৎসর	উৎপাদন ক্ষমতা মি. কি. ও.	উৎপাদন (মি. কি. ও. ঘণ্টা)			
		তাপবিদ্যুৎ	জলবিদ্যুৎ	আণবিক শক্তি	মোট উৎপাদন
১৯৫১	১·৮৪	২৫০	২,২৩৮	—	৪৮৮
১৯৬১	৪·৬৫	৭৫৯	৬৫৩	—	১,৪১২
১৯৭১	১৪·৭১	২,৩৪৭	২,১০৪	২০১	৪,৬৫২
১৯৮১	৩০·২১	৫,১০৯	৩,৮৭৮	২৫০	৯,২৩৭
১৯৮৩	৩৫·৩৬	৬,৭৭২	৪,০২০	১৬৮	১০,৯৬০

[Source : Monthly Abstract of Statistics, November, 1984]

চক্রপ্রথায় বিদ্যুৎ সরবরাহ (Grid System) : জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে ৪৫০-৫০০ কি. মি.-এর অধিক দূরে সরবরাহ করা খুবই অসুবিধাজনক ও

ব্যয়সাধ্য। অসুবিধা দূর করিবার জন্য চক্র প্রথার মাধ্যমে প্রত্যেকটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যোগাযোগ স্থাপন করিবার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, কেরালা ও তামিলনাড়ুর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি চক্র প্রথায় পরস্পর সংযুক্ত। বর্তমানে কাশ্মীর হইতে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত হইয়া আসাম পর্যন্ত চক্র প্রথায় সকল বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রকে যুক্ত করিবার প্রকল্প রচিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলির অন্তর্বর্তী দূরত্ব স্থানে স্থানে তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের সাহায্যে পূরণ করা হইবে। ইহা ছাড়া গ্রীষ্ম বা খরার সময় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি পূরণের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে সহায়ক তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র এবং সুপার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইবে। ১৯৫০ সালে ভারতে ২৯,০০০ কি. মি. দীর্ঘ বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন লাইন ছিল। ১৯৮০ সালে ইহার দৈর্ঘ্য ৯.৯৭ লক্ষ কি. মি. দাঁড়ায়। বর্তমানে ভারতে ৩৪টি আন্তরাজ্য ও আন্ত-আঞ্চলিক ট্রান্সমিশন লাইন বর্তমান।

ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা (Prosplets) : বিজ্ঞানীগণের মতে ভারতে মোট ৪.১১ কোটি কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা বিদ্যমান। ভারতের সম্ভাব্য জলশক্তি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি কমিশন (Central Water and Power Commission) ১৯৫৩-৫৮ সালে একটি সমীক্ষা করে। নিম্নের সারণীতে ভারতের বিভিন্ন নদী-অববাহিকা অঞ্চলে সম্ভাব্য জলশক্তির পরিমাণ দেখান হইল। মোট ৪.১১ কোটি কি. ও. জলশক্তির মধ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ২.৬ কোটি কি. ও. শক্তি আহরণ করা সম্ভব বলিয়া অনুমান করা হয়।

ভারতে সম্ভাব্য জলশক্তির পরিমাণ

	১০ লক্ষ কিলোওয়াট
১। পশ্চিমাঞ্চল—পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে নির্গত পশ্চিমবাহিনী নদ-নদী	৪.৩
২। উত্তরাঞ্চল (নেপাল বাদে গঙ্গা অববাহিকা)	৪.৮
৩। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (সিন্ধুর উপনদী শতদ্রু ও অন্যান্য উপনদী)	৬.৬
৪। মধ্যাঞ্চল (মধ্য ভারতের নদ-নদী)	৪.৩
৫। দক্ষিণাঞ্চল (দক্ষিণ ভারতের পূর্ববাহিনী নদ-নদী)	৮.৬
৬। উত্তর-পূর্বাঞ্চল (ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য নদ-নদী)	১২.৫
মোট	৪১.১

১৯৭২-৭৩ সালে অধ্যাপক ভি. কে. আর ভি. রাও-এর অনুসন্ধান অনুযায়ী ভারতে সম্ভাব্য জলশক্তির পরিমাণ ৬'২৩ কোটি কি. ও. বা ৬২৩ মেগাওয়াট। ১৯৮০ সালে ভারতের সম্ভাব্য জলশক্তির পরিমাণ ছিল ৭৫'৩৭ মি. ও.। নিম্নে সম্ভাব্য জলবিদ্যুৎ শক্তির আঞ্চলিক বণ্টন দেখান হইল।

উত্তর-ভারত—২৮'০১	পূর্ব-ভারত—৭'০৩
পশ্চিম-ভারত—৭'১৯	উত্তর-পূর্ব ভারত—২০'১৪
দক্ষিণ-ভারত—১৩'০০	সর্ব-ভারতীয়—৭৫'৩৫

জলবিদ্যুতের ব্যবহার—ভারতে জলবিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। বহু অঙ্গরাজ্যে বর্তমানে তাপ বিদ্যুতের উৎপাদন সীমিত হইয়া আসিয়াছে। জলবিদ্যুতের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। নিম্নের সারণীতে ইহা দেখান হইল।

জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুতের ব্যবহার

প্রধানত তাপবিদ্যুৎ (১)	প্রধানত জলবিদ্যুৎ (২)	তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ (৩)
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ	তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা	অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম

পারমাণবিক শক্তি (Atomic Energy)

ভারতে কয়লা ও খনিজ তেলের সঞ্চয় যথেষ্ট নহে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও খুবই অনিশ্চিত। এই সকল কারণে শক্তি উৎপাদনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে পারমাণবিক চুল্লী স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। পারমাণবিক শক্তির প্রধান উৎস ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম ভারতে কেরালা, বিহার ও ওড়িশা-অন্ধ্র অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ভারতে প্রথম পারমাণবিক চুল্লী মহারাষ্ট্রের তারাপুরে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহার উৎপাদন ঐ অঞ্চলের শিল্পক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতে অপর দুইটি অঞ্চলে—তামিলনাড়ুর কালাপাক্কাম ও রাজস্থানের কোটায় দুইটি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। রাজস্থানের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যাইতেছে। ১৯৮৩ সালে তারাপুর ও কোটা কেন্দ্রে মোট ১৩'৮ কোটি কি.ও. বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদিত হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশের নারোরাতে চতুর্থ পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রের নির্মাণ কার্য শুরু হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অনুশীলনী ৮ ও ৯

অধ্যায় ৮ : ভারতের খনিজ সম্পদ

১। আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও যোগানের দিক হইতে ভারতের খনিজ দ্রব্যগুলির শ্রেণী বিভাগ কর ও নাম লিখ। বর্তমান চাহিদার তুলনায় ভারতে যে সকল খনিজ দ্রব্য বেশী উত্তোলিত হইয়া থাকে তাহাদের নাম লিখ।

[Classify the minerals of India according to their internal demand and supply and mention their names. Name the minerals which are raised in India in larger quantities than its present demand.]

২। লৌহের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ভারতের যে সকল অঞ্চলে আকরিক লৌহ পাওয়া যায় তাহাদের নাম লিখ। লৌহ আকরিক উত্তোলনে ভারতের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর।

[Describe the importance of Iron. Name the regions in India where Iron-ore is mined. Discuss the present position of India in Iron-ore raising.]

৩। ভারতের লৌহ আকরিক ক্ষেত্রের বণ্টন দেখাও। ভারত হইতে কোন কোন দেশে এবং কোন কোন বন্দর মারফত লৌহ আকরিক রপ্তানি করা হয় তাহাদের নাম লিখ।

[Discuss the regional distribution of Iron-ore in India. Name the countries where Iron-ore exported from India. Also mention the names of the ports which handle those exports.]

৪। লৌহের ব্যবহার লিখ। ভারতের লৌহ খনিগুলির সম্বন্ধে আলোচনা কর।

[Mention the uses of Iron. Give the location of Iron-ore mining centres its India.] [Tripura H. S. Exam. 1981]

৫। ভারতে নিম্নলিখিত খনিজ পদার্থসমূহের ব্যবহার বণ্টন ও উত্তোলনের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর :—(ক) তাম্র, (খ) ম্যাঙ্গানিজ, (গ) অভ্র।

[Discuss the present condition of mining, distribution and uses of the following minerals in india—(a) Copper, (b) Manganese and (c) Mica.]

৬। (ক) অ্যালুমিনিয়ামের প্রধান আকরিক কি ? (খ) অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার উল্লেখ কর। (গ) ভারতে যে সকল রাজ্যে ইহা উত্তোলিত হয় উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[(a) What is the main ore of Aluminium ? (b) Point out the uses of Aluminium. (c) Discuss in brief the States in India where it is mined.]

৭। (ক) তাম্র ও অভ্রের ব্যবহারের বর্ণনা দাও। (খ) ভারতের যে সকল অঞ্চলে এইগুলি উত্তোলন করা হয় তাহাদের নাম লিখ।

[(a) Describe the uses of copper and mica. (b) Name the areas in India where these are mined.]

[W. B. H. S. C. Exam. 1981]

অধ্যায় ৯ : ভারতের শক্তি সম্পদ

১। কয়লার গুরুত্ব আলোচনা কর। ভারতে কয়লাখনিগুলির বণ্টন পর্যালোচনা কর।

[Discuss the importance of coal. Examine the distribution of coal-mines in India.]

২। ভারতের মুখ্য কয়লা উৎপাদক খনিসমূহের অবস্থান সবিস্তারে বর্ণনা কর। ভারতে কয়লা প্রধানত কি কি ব্যবহারে লাগে ?

[Give a detailed account of the distribution of coal-mines in India. What are the important uses of co al in the country ?]

[W. B. H. S. C. Exam. 1979]

৩। ভারতে শিল্পাঞ্চল গঠনের সহিত কয়লাখনির বণ্টনের সম্পর্ক আলোচনা কর। ভারতে কয়লা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে ?

[Discuss the relation between the distribution of coal mines and development of industrial regions in India. What steps have been taken in India for the proper uses of coal-resources ?]

৪। খনিজ তেলের ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্য কি কি ? ভারতে খনিজ তেল উত্তোলনকারী অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

[What are the uses and by products of mineral oil ? Describe in brief the mining regions of mineral oil in India.]

৫। তৈল শোধনাগার কাহাকে বলে ? ভারতে খনিজ তেলের ব্যাপক অনুসন্ধান ও শোধনাগার স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে কেন ?

[What is meant by oil refineries ? Why special stress has been given for prospecting of mineral oil in India and development of oil refineries ?]

৬। ভারতের খনিজ তৈলক্ষেত্রগুলির ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ কর। তৈলশোধন শিল্পে ভারতের অগ্রগতির রূপরেখা বর্ণনা কর।

[Give the geographical distribution of the oil fields in India. Mention the progress of petroleum refining industry in this country.] [W. B. H. S. C. Exam. 1978]

৭। নিম্নলিখিত বিবৃতিটি ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: যদিও ভারতে অনেকগুলি খনিজ তৈল পরিশোধন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি এই দেশে খনিজ তৈল অল্পই উৎপাদিত হয়।

[Write short notes explaining the following: There are a number of refineries in India though she produces small amount of petroleum.] [W.B. H. S. C. Exam. 1979]

৮। ভারতের খনিজ তৈলক্ষেত্রগুলির এবং তেল শোধনাগারগুলির ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণনা কর। খনিজ তেল উৎপাদনে ভারত কি স্বয়ংসম্পূর্ণ ?

[Give the geographical distribution of oil fields and refineries of India. Is India self-sufficient in petroleum production ?]
[W. B. H. S. C. Exam. 1980]

৯। ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে তৈলখনিসমূহ অবস্থিত, তাহা পর্যালোচনা কর। এই দেশের তৈল পরিশোধন শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে লিখ।

[Examine the distribution of oil fields in India. Give the present position and future prospects of oil refining industry in this country.] [Specimen Question of H S C, 1980]

১০। জলবিদ্যুৎ কাহাকে বলে ? জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কি কি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুকূল থাকা প্রয়োজন ? ভারতে ঐ অবস্থা কতটা অনুকূল আলোচনা কর।

[What is meant by water power ? What geo-economic factors are necessary for the generation of hydel power ? Discuss how far these conditions are favourable in India.]

১১। ভারতীয় অর্থনীতিতে জলশক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। জলশক্তি উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশগুলি লিপিবদ্ধ কর এবং ভারতের সেই সকল অঞ্চলে এইরূপ পরিবেশ বিদ্যমান তাহাদের নাম যিখ।

[Account for the importance of hydel power in Indian economy. Enumerate the geographycal conditions favourable to harness hydel power and name the areas in India where such conditions are found.] [W. B. H. S. C. Exam. 1981]

১২। ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান প্রকল্পগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অগ্রগতি আলোচনা কর।

[Discuss the necessity of generating hydroelectricity in India. Give a brief note of principal projects of generating hydel power in India and also discuss the progress of generating hydel power.]

১৩। ভারতে পারমাণবিক শক্তির গুরুত্ব আলোচনা কর। ভারতের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

[Discuss the importance of atomic energy in India. Give an account of the atomic energy centres of India.]

১০ ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা
(Multipurpose River-Valley Projects)

ভারত নদীমাতৃক কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ও তারতম্যের জন্য সুদূর অতীত কাল হইতেই কৃষিকার্যে জলসেচ প্রচলিত আছে। ভারত অতি প্রাচীন দেশ এবং নদীগুলিও সুপ্রাচীন। খাতগুলি পলি ও বালিতে বুজিয়া অত্যন্ত অগভীর হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষাকালে এই সকল নদীতে প্রচণ্ড জলস্ফীতি ঘটে এবং ব্যাপক বিধ্বংসী বন্যার সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গের দামোদর, অজয়, বিহারের কোশী, আসামের ব্রহ্মপুত্র, মধ্যপ্রদেশ-রাজস্থানের চম্বল প্রভৃতি নদীর বন্যা লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখের কারণ হয়। এই সকল নদীর বন্যা রোধ করা একটি বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ব্যতীত ভারতে কয়লার অসম-বন্টনের ফলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তাও বিশেষভাবে অনুভূত হয়। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতের নদীগুলির বিপুল জল-শক্তিকে উন্নয়নমূলক কার্যে ব্যবহারের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি নদী-পরিকল্পনার আদর্শে এই দেশেও নদী-পরিকল্পনা রূপায়ণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নদী-পরিকল্পনা অনুযায়ী নদীর গতিপথে বন্ধুর ভূ-প্রকৃতিতে আড়াআড়ি কংক্রিটের বাঁধ বাঁধিয়া জলধারাকে বিরাট জলাধারে সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজনমত নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করাইয়া বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন, জলসেচন প্রভৃতি নানাবিধ উপকার লাভ করা যায়। **নদীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া উহার ধ্বংসকরী ক্ষমতাকে মানুষের নানাবিধ কল্যাণসাধনে নিয়োজিত করিবার যে কার্যকরী পরিকল্পনা উহাকে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা বলে।** বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার সাহায্যে নিম্নলিখিত মুখ্য ও গৌণ উপকারসমূহ লাভ করা যায়।

মুখ্য উপকার-সমূহ: (১) **বন্যা-নিয়ন্ত্রণ**—অতিরিক্ত জলরাশিকে বাঁধের সাহায্যে আটকানো ও নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট পরিমাণে বন্টন করিবার ফলে কূলপ্লাবনী বন্যা রোধ হয়।

(২) **জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন**—বাঁধের সাহায্যে নদীর জল আটকাইয়া উহার প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগাইয়া জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

(৩) **যোগাযোগ স্থাপন**—প্রধান সেচখালগুলিকে নৌ-চলাচলযোগ্য করিয়া খনন করা হইলে কৃষিজ, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে জলপথে সুলভ ও সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং পণ্য ও যাত্রী চলাচলের সুবিধা হয়।

গৌণ উপকারসমূহ: (১) **মৎস্যচাষ**—জলাধার ও সেচখালগুলিতে মৎস্যচাষ সম্ভব হয়।

(২) **ভূমিক্ষয় রোধ**—বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের জলধারাকে নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করান হইলে ভূমিক্ষয় রোধ হয়।

(৩) **অরণ্য-সম্পদ বৃদ্ধি**—জলাধার বা সেচখালের তীর-সংলগ্ন অঞ্চলে স্বাভাবিক কারণেই অরণ্য-বলয় সৃষ্টি করা যায় এবং অরণ্য সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব হয়।

(৪) **ম্যালেরিয়া নিবারণ**—জলনিকাশ ব্যবস্থার অভাবে অস্বাস্থ্যকর গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহামারী আকারে দেখা দেয়। কিন্তু খালপথ সৃষ্টির ফলে জলনিকাশী ব্যবস্থা সুষ্ঠ হয়, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে ও মহামারী দূর হয়।

(৫) **স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রমোদকেন্দ্র**—নদী-পরিকল্পনার অন্তর্গত বাঁধকেন্দ্রগুলি প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী দ্রষ্টব্য স্থল হয়। অধিকন্তু জলাধারে নৌ-ভ্রমণ, মৎস্য শিকার, নিকটবর্তী অঞ্চলে পর্যটন প্রভৃতি নানা কারণে ঐ সকল স্থান মানুষের অবসর যাপনের প্রমোদকেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া ওঠে।

ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের প্রধান প্রধান নদী ব্যবস্থার ধারা, সমস্যা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি অনুধাবন করিয়া ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ নানাবিধ নদী-প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ঐ প্রকল্পগুলিকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। বৃহৎ ও মাঝারি পরিকল্পনাগুলি প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা রূপায়িত ও পরিচালিত এবং ক্ষুদ্র প্রকল্পগুলি রাজ্য সরকার দ্বারা রূপায়িত নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার আলোচনা করা হইল।

[প্রশ্ন : (১) বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা কি ? ইহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।]

সরকার পরিচালিত নদী পরিকল্পনাগুলি

(১) **দামোদর উপত্যকা-পরিকল্পনা (পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার)** (Damodar-Valley Project)—দামোদর নদ বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত পালামৌ জিলার **খামারপাত** পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া বিহারের হাজারিবাগ, মানভূম জিলার মধ্যে ১৯০ কি. মি. পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান জিলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্দ্ধমান হইতে ইহা দক্ষিণদিকে বাঁকিয়া হুগলী ও হাওড়া জিলা অতিক্রম করিয়া কলিকাতার দক্ষিণে ফলতার বিপরীত দিকে গঙ্গা নদীতে পড়িয়াছে। দামোদর মোট ৫৬০ কি. মি. দীর্ঘ।

দামোদর অববাহিকা বিহারের হাজারিবাগ, মানভূম, রাঁচি, পালামৌ, সাঁওতাল পরগণা এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান, হুগলী এবং হাওড়া জিলার বিস্তীর্ণ এলাকা লইয়া গঠিত। এই অববাহিকার উত্তরাংশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১২০-১৪০ সে মি.। বৃষ্টিপাত মৌসুমী বায়ুপ্রবাহে প্রধানত ঋতুগত। ইহার ফলে বর্ষাকালে প্রবল

বর্ষণে দামোদর নদে প্রায় প্রতি বৎসরই বন্যা দেখা দিত। বন্যার ফলে ইহার নিম্ন-গতিতে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জিলায় দামোদর তীরবর্তী অঞ্চলের ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়িত। দামোদর প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে বন্যার খেয়ালে পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রাম জনপদ ভাসাইয়া প্রভূত শস্য ও প্রাণহানি ঘটাইয়া

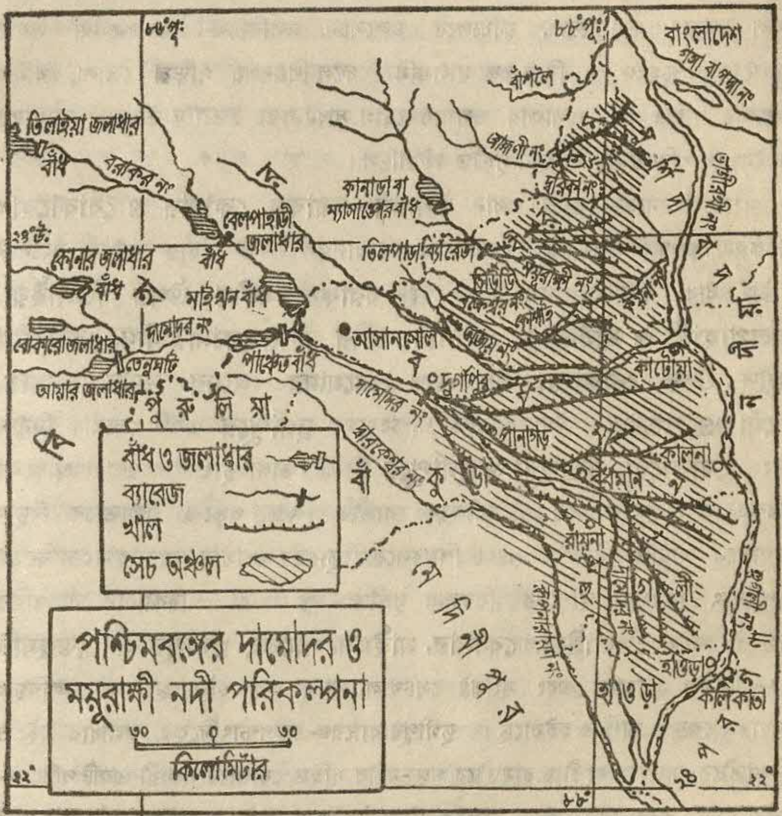

চিত্র ১০.১ : দামোদর ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা ও সেচ অঞ্চলসমূহ।

সম্পত্তির ক্ষতি করিয়া কালক্রমে 'চীনদেশের দুঃখ' হোয়াংহো নদের ন্যায় 'বাংলার দুঃখ' (Sorrows of Bengal) বলিয়া পরিচিত হইল। ১৯৪৩ সালে দামোদর নদ এক বিধ্বংসী বন্যায় বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। দামোদর নদের এই বিধ্বংসী তাণ্ডব রোধ করিবার উদ্দেশ্যে দেশ স্বাধীন হইবার পরে আমেরিকার **টেনেসি নদী-পরিকল্পনার** আদর্শে একটি বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা রচনা করা হয় এবং উহাকে রূপদানের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে আমেরিকার Tennesee Valley Authority-র অনুকরণে "দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন" নামক একটি সংস্থা গঠন করা হয়।

বিহারের অন্তর্গত দামোদর নদের উচ্চ অববাহিকা অঞ্চল তেমন উর্বর নহে, কিন্তু কয়লা, লোহ-আকরিক, তাম্র, অভ্র, বক্সাইট, চুনাপাথর প্রভৃতি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত অরণ্যে নানাবিধ শক্ত কাষ্ঠ, লাক্ষা, রেশমগুটি প্রভৃতি পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে দামোদরের নিম্ন অববাহিকা অঞ্চল কৃষি ও শিল্প প্রধান। এই সকল কারণে বন্যানিরোধ, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও উহার সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মালভূমি অঞ্চলে শিল্পবলয় গড়িয়া তোলা, খনিজ এলাকার সহিত শিল্প এলাকার জলপথে যোগ সাধন করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যেই দামোদর নদ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছিল।

দামোদর নদের তিনটি প্রধান **উপনদী—বরাকর, কোনার ও বোকারো।** পরিকল্পনা অনুযায়ী দামোদর ও বরাকরের সংযোগস্থল পর্যন্ত বিহার অঞ্চলে সর্বমোট আটটি বাঁধ নির্মাণের স্থান নির্দিষ্ট হয়—**বরাকর নদীর উপর তিলাইয়া, বেলপাহাড়ী ও মাইথন; কোনার নদীর উপর কোনার বাঁধ, বোকারো নদীর উপর বোকারো বাঁধ এবং দামোদর নদের উপর আয়ার, বার্মো ও পাঞ্চেৎ।** ইহা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের **দুর্গাপুরে** একটি সেচবাঁধ নির্মাণ এবং **বোকারো, চন্দ্রপুরা ও দুর্গাপুরে** তিনটি তাপবিদ্যুৎ কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য ঋতুতে জলাভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি মিটাইতে এবং শিল্পবলয়ে বিদ্যুতের যোগান অব্যাহত রাখিতেই তাপবিদ্যুৎ কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার বাঁধগুলির মধ্যে ইতিমধ্যে **তিলাইয়া, কোনার, মাইথন, পাঞ্চেৎ, দুর্গাপুর** এবং **তেনুঘাট** বাঁধ নির্মিত হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট সেচখাল খনন করা হইয়াছে এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে। দুর্গাপুর ব্যারেজ-এর পশ্চাৎদিকের জলাধার হইতে দক্ষিণতীরে সেচখাল ব্যতীত বামতীরে গঙ্গা-নদীর সহিত যোগাযোগকারী একটি পরিবহণ-খালও খনন করা হইয়াছে। সম্প্রতি বিহারের তেনুঘাটে দামোদরের উপর একটি অতিরিক্ত বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। তাপবিদ্যুৎ কারখানা তিনটিও নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু আয়ার, বার্মো ও বেলপাহাড়ী বাঁধের কার্য স্থগিত রাখা হইয়াছে।

উপকার ও উপকৃত এলাকা : (১) **জলসেচ**—দামোদর ও উহার উপনদী-সমূহের উপর বিভিন্ন বাঁধ নির্মিত হওয়ায় নিম্ন-দামোদর এলাকায় নিয়মিত বন্যার তাণ্ডব বর্তমানে অতীতের দুঃস্বপ্নে পরিণত হইয়াছে। তিলাইয়া, কোনার, মাইথন, দুর্গাপুর প্রভৃতি বাঁধসংলগ্ন জলাধার হইতে প্রায় ২,২৬২ কি. মি. দীর্ঘ সেচখাল খনন করা হইয়াছে। এইসকল খালের সাহায্যে বিহারে হাজারিবাগ, রাঁচি, পালামৌ, মানভূম জিলায় ও পশ্চিমবঙ্গে বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জিলায় প্রায় ৪·৭৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে খারিফ মরশুমে এবং আরও প্রায় ২২ হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে রবি মরশুমে

জলসেচ করা হয়। এই জলসেচের ফলে ধান, গম, ইক্ষু, পাট ও অন্যান্য প্রচুর কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের সুযোগ ঘটিয়াছে। (২) **বিদ্যুৎ উৎপাদন**—তিলাইয়া, মাইথন ও পাঞ্চেৎ কেন্দ্রগুলিতে প্রায় ১০২ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ এবং বোকারো চন্দ্রপুরা ও দুর্গাপুর কেন্দ্রে প্রায় ১০৭৭ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাণ্ডেলে আরও একটি তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে বিহারের ধানবাদ, ঝরিয়া, রাঁচি, জামসেদপুর ও পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল-দুর্গাপুর, হুগলী-হাওড়া-কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ইহার সাহায্যে বৈদ্যুতিক রেলও চালানো হয়। ফলে প্রচুর পরিমাণে কয়লা-সম্পদের অপচয় বন্ধ হইয়াছে। (৩) **পরিবহণ**—দুর্গাপুর বাঁধের বামতীর হইতে ১৩৬ কি. মি. দীর্ঘ একটি খালপথ খনন করিয়া হুগলী জিলার ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গার সহিত যোগ করা হইয়াছে। বামতীর হইতে ৮৯ কি মি. আরও একটি খাল খনন করা হইয়াছে। এই খালপথে বিহারের খনিজ দ্রব্য পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসম্ভার বিহারে সুলভে প্রেরণ করা যাইবে। কিন্তু ঐ খালপথ আজিও চালু হয় নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে দামোদর উপত্যকার বাঁধ নির্মাণে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই।

পরিকল্পনার ত্রুটি—দুর্গাপুর বাঁধ ও পাঞ্চেৎ বাঁধ নির্মাণের ফলে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সরাসরি নৌ যোগাযোগের সহজ সুযোগ নষ্ট হইয়াছে। জার্মানির রূঢ় অঞ্চলের সহিত দুর্গাপুরের তুলনা করা হয়। কিন্তু রূঢ় অঞ্চলে রাইন ও উহার সহিত যুক্ত দীর্ঘ খালপথ শিল্প বিস্তারে যে প্রকার সহজ যোগাযোগ ও পরিবহণের সুবিধা করিয়া থাকে দুর্গাপুরে তাহার একান্ত অভাব। নদীর মধ্যে এই বাঁধ ভবিষ্যত সম্ভাবনাও বিনষ্ট করিয়াছে বলা যায়। দামোদর উপত্যকায় জলবিদ্যুত্যের তুলনায় তাপ-বিদ্যুতের উপর আজিও গুরুত্ব অধিক। অধিকন্তু দামোদরের যে বিপুল জলধারা অতীতে গঙ্গা নদীর নাব্যতা রক্ষা করিয়া কলিকাতা বন্দরকে সচল রাখিয়াছিল বাঁধের ফলে দামোদরের জলস্রোত কমিয়া যাওয়ায় বর্তমানে গঙ্গার মোহনায় চড়া জমিয়া বন্দরের ধ্বংস প্রায় নিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। অধিকন্তু বাঁধসংলগ্ন জলাধারসমূহে পর্যাপ্ত জলধারণের ব্যবস্থা না হওয়ায় এক নাগাড়ে কয়েক দিন বৃষ্টিপাতের ফলেই নিম্ন দামোদর এলাকায় আজিও বন্যা প্রায় একটি বার্ষিক ঘটনা।

দামোদর-পরিকল্পনায় প্রাথমিকভাবে প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় বন্যারোধ, খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যতীত, মৎস্য চাষ, ভূমিক্ষয় রোধ, মৃত্তিকা সংরক্ষণ, অরণ্য সম্পদ সৃষ্টি, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি উপকার সাধিত হইয়াছে। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল, চিত্তরঞ্জনের রেলইঞ্জিন কারখানা, আসানসোলের অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প, সিন্ধ্রির সার কারখানা, রূপনারায়ণপুরের

'কেবল' কারখানা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে রেল চলাচল ইত্যাদি দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ফল। নিম্নে বিভিন্ন বাঁধ সম্পর্কিত একটি সারণী দেওয়া হইল।

বাঁধের নাম ও নির্মাণকাল	অঞ্চল ও নদীর নাম	সাধারণ বর্ণনা	উপকার
১। তিলাইয়া ১৯৫৩	বিহারের বরাকর নদীর উপর	৩৬৬ মি. দীর্ঘ ও ৩০ মি. উচ্চ। ৩,৯৪৭ লক্ষ ঘন মিটার জলধারণ ক্ষমতা।	বিহারে ৪০,০০০ হেক্টর জমিতে জলসেচ ও ৪,০০০ কি. ও. জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন।
২। মাইথন ১৯৫৭	বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে বরাকর নদীর উপর	২,৮৫৮ মি. দীর্ঘ ৪৮ মি. উচ্চ। জলধারণ-ক্ষমতা ১৩,৬১০ ল. ঘ. মি.।	বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে এক লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ ও ৬০,০০০ কি. ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন।
৩। কোনার ১৯৫৫	বিহারে কোনার নদীর উপর	৩৯২৯ মি. দীর্ঘ, ৪৬ মি. উচ্চ। জলধারণ ক্ষমতা ৩,৩৭০ ল. ঘ. মি.।	বিহারে ৪০,০০০ হেক্টর জমিতে জলসেচ।
৪। পাঞ্চেৎ ১৯৫৯	বিহার-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে দামোদর নদের উপর।	২,১৩০ মি. দীর্ঘ, ৪০ মি. উচ্চ। জলধারণ ক্ষমতা ১৪৯৭০ ল. ঘ. মি.।	বিহার-পশ্চিমবঙ্গে ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জল সেচনের সম্ভাবনা, ৪০,০০০ কি. ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন।
৫। দুর্গাপুর ১৯৫৫	পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদের উপর	৬৯২ মি. দীর্ঘ, ১২ মি. উচ্চ।	পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া জিলায় ৩.৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ, কলিকাতা-দুর্গাপুর নৌচলাচল।
৬। তেনুঘাট	বোকারোর নিকট দামোদর নদের উপর		বোকারো ইস্পাত কারখানায় জল সরবরাহ করা হয়।

[**প্রশ্ন:** দামোদর পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য কি? এই পরিকল্পনায় কোথায় কোথায় বাঁধ দেওয়া হইয়াছে ও হইবে?]

ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা (The Bhakra Nangal Project)

ভারতের বিভিন্ন বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার মধ্যে ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্পটি সর্ববৃহৎ ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান অঞ্চলে কয়লা ও খনিজ তৈলের অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন একটি গুরুতর সমস্যা। অধিকন্তু ঐ সকল অঞ্চলে প্রচুর উর্বর

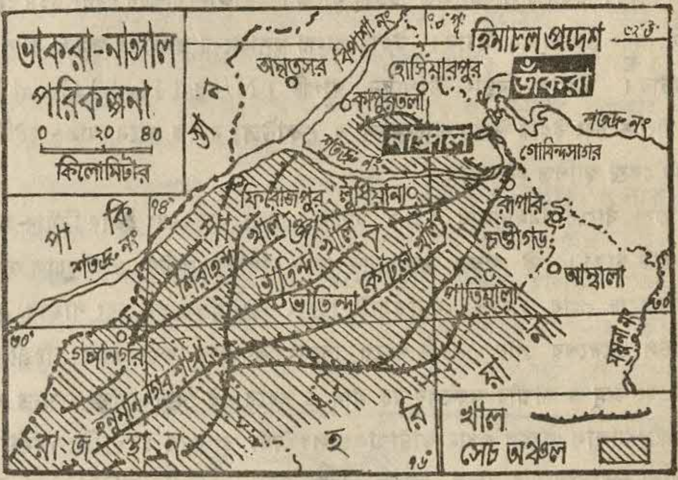

চিত্র ১০.২ : ভাকরা-নাঙ্গাল পারকল্পনার খাল ও সেচ অঞ্চল।

কৃষিজমি থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টির অভাবে চাষ-আবাদ খুবই অসুবিধাজনক। এই সকল অসুবিধা দূরীকরণের জন্য ১৯০৮ সালে প্রথম পাঞ্জাবের তদানীন্তন গভর্নর স্যার লুই ডেন (Sir Louis Dane) শতদ্রু নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন এই বিষয়ে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। ১৯৪০ সালে এই প্রস্তাব পুনরায় উত্থাপিত হইলে সিন্ধু সরকারের বাধাদানের ফলে প্রস্তাবটি যথারীতি নথীবন্দীই থাকিয়া যায়। দেশ স্বাধীন হইবার পর ১৯৪৮ সালে এই পরিকল্পনা কার্যকরীভাবে গ্রহণ করা হয় এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ১৯৫১ সালে প্রকল্পটির নির্মাণকার্য শুরু হয়।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের সীমান্তে রূপার হইতে ৮০ কিলোমিটার উত্তরে **ভাকরা** নামক স্থানে শতদ্রু নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ভাকরা বাঁধ হইতে ১৩ কি. মি. দক্ষিণে **নাঙ্গাল** নামক স্থানে শতদ্রু নদীর উপর আর একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া ইহার পশ্চাৎ দিক হইতে ৬৪ কি. মি. দীর্ঘ একটি খাল কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। এই খালটির নাম **নাঙ্গাল খাল**। ভাকরা বাঁধ ৫১৯ মি. দীর্ঘ, ৩০৫ মি. প্রশস্ত এবং ২২৬ মি. উচ্চ। ভাকরা বাঁধ তৈয়ার হওয়ায় পূর্বে আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের **কলোরাডো নদীর উপর নির্মিত হুভার বাঁধটিই** পৃথিবীর সর্বোচ্চ (২২০ মি.) বাঁধ ছিল ; বর্তমানে ভাকরা বাঁধই পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাঁধ। ভাকরা বাঁধের পশ্চাতে হিমাচল প্রদেশে ৭·৪ লক্ষ ঘন মিটার জলধারণ-ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বৃহৎ জলাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার নাম **গোবিন্দসাগর**। এই বাঁধ হইতে পতিত জলধারার সাহায্যেই নাঙ্গাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পরিচালিত হইয়া থাকে। নাঙ্গাল বাঁধটির দৈর্ঘ্য ৩১৪ মি., প্রস্থ ১২২ মি. এবং উচ্চতা ২৯ মিটার। ইহার সংলগ্ন জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা প্রায় ৩ লক্ষ ঘন মিটার। নাঙ্গাল বিদ্যুৎ উৎপাদন খালটি (Nangal Hydel Canal) রূপার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহার উপরে **গাঙ্গুয়াল** ও **কোটলা** নামক স্থানে আরও দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

ভাকরা বাঁধের নির্মাণকার্য ১৯৬২ সালে সমাপ্ত হয় এবং ইহার নির্মাণ-ব্যয় প্রায় ২৩৬ কোটি টাকা। এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে নাঙ্গাল, কোটলা ও গাঙ্গুয়াল জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে প্রায় ১,২০৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশের প্রায় ১২৮টি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। দিল্লী, উত্তর-প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলের বহু গ্রাম ও শহরে এই বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্পে প্রধান কাটাখালগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় ১,১০০ কিলোমিটার এবং ইহার শাখা-প্রশাখাসমেত মোট খালের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৪০০ কিলোমিটার। এই সকল খালের সাহায্যে বর্তমানে ৪১·৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ চলিতেছে। ভবিষ্যতে ইহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিদ্যুৎ-শক্তির মাধ্যমে পাঞ্জাব-হরিয়ানা রাজ্যে ভূগর্ভ হইতে সেচের জল তোলা হইতেছে এবং এই অঞ্চলের গ্রামে ও শহরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের অসংখ্য কারখানা চলিতেছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে তৈলবীজ, তুলা প্রভৃতির উৎপাদন আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা। পাঞ্জাব-হরিয়ানা অঞ্চলে কৃষিতে যে 'সবুজ বিপ্লব' ঘটিয়াছে ইহার মূলে রহিয়াছে ভাকরার জলসেচ। ভাকরা জলবিদ্যুতের সাহায্যে পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ চালিত ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছে। বাটালা, লুধিয়ানা, রূপার, জলন্ধর, আম্বালা, হোসিয়ারপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ইঞ্জিনিয়ারিং, বস্ত্রবয়ন শিল্প ইত্যাদির কেন্দ্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য। ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা ভারতের সর্বাধিক সফল বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের রাজ্যগুলির অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের বর্তমান সমৃদ্ধির মূলে ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার দান অপরিসীম। এই কারণে আধুনিক পাঞ্জাবকে ভাকরার দান (Gift of the Bhakra Project) বলা যায়।

[**প্রশ্ন** : (১) ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি ? (২) ভাকরা পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে কি কি উপকার হইয়াছে ?]

মহানদী পরিকল্পনা (The Mahanadi Project)

ওড়িশার বৃহত্তম নদী, মহানদী, মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া ঐ রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইব, হাঁসদেও, মন্দ, জঙ্ক, কাটজড়ি প্রভৃতি ইহার উপনদীসমূহ তীব্র খরস্রোতা ও মালভূমির উচ্চ অংশ হইতে প্রচুর জল বহন করিয়া আনে। ইহাতে মহানদী মোহনার ব-দ্বীপে নিয়মিতই বন্যার তাণ্ডবে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে। বন্যার এই তাণ্ডব রোধকল্পে এবং জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি নানাবিধ উপকার লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে মহানদী পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মহানদীর উপর **হীরাকুঁদ, টিকারপাড়া** ও **নারাজ** এই তিনটি স্থানে তিনটি বাঁধ নির্মাণ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। প্রথম পরিকল্পনা আমলে সম্বলপুরের ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমে হীরাকুঁদ নামক স্থানে মহানদীর উপর একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রসহ পৃথিবীর দীর্ঘতম সেচবাঁধ, **হীরাকুঁদ বাঁধ**, নির্মিত হইয়াছে। ১৯৫৭ সালে প্রায় ৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে এই বাঁধের প্রথম

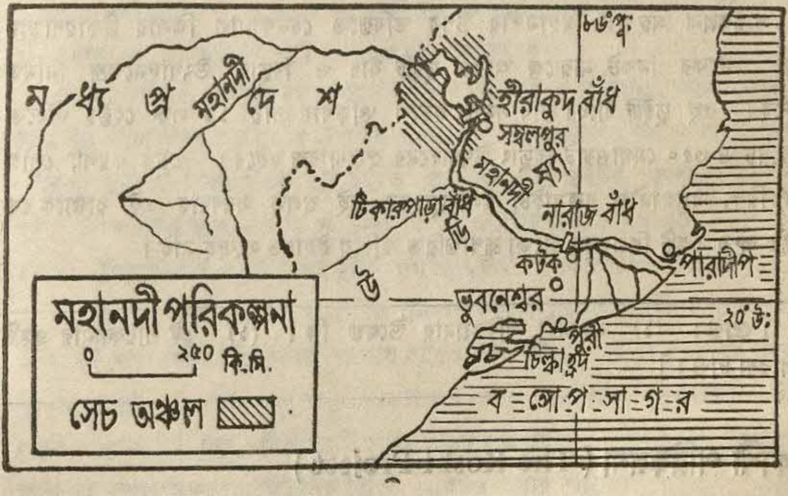

চিত্র ১০.৩ : ভারতের মহানদী পরিকল্পনার রূপায়ণ এবং নির্দেশক সেচ অঞ্চল।

পর্যায়ের কার্য শেষ হয়। হীরাকুঁদ বাঁধ ৪.৮ কি. মি দীর্ঘ ও ৬০ মি. উচ্চ। ইহার জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা প্রায় ৮১০ কোটি ঘন মিটার বা দামোদর উপত্যকার চারটি বাঁধের সম্মিলিত জলধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ। হীরাকুঁদ বাঁধের জলাধার হইতে বরাগড়, সামন ও সম্বলপুরমুখী তিনটি সেচখাল কাটা হইয়াছে। এই খাল ও ইহার শাখাপ্রশাখা দ্বারা সম্বলপুর, বোলাঙ্গীর, পুরী, কটক প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে প্রায় ৪.৬ লক্ষ

হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনাকে মহানদী ব-দ্বীপ জলসেচ পরিকল্পনার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। ইহাতে ভবিষ্যতে আরও ৬·৯৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইবে। হীরাকুঁদ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রাথমিক উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল ১২৩ মেগাওয়াট। সম্প্রতি ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ২৭২ মেগাওয়াট করা হইয়াছে। এই বাঁধের দক্ষিণে চিপলিমাতে ৭২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতাসম্পন্ন আরও একটি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

হীরাকুঁদ পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে মহানদী অববাহিকায় জলসেচের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং বর্তমানে এই রাজ্যে ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, পাট প্রভৃতির উৎপাদন আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বাঁধের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে রাউরকেল্লার লৌহ-ইস্পাত কারখানায়, রাজগাংপুরের সিমেন্ট কারখানায়, ব্রজরাজনগরের কাগজের কলে, ওড়িশা টেক্সটাইল ও কলিঙ্গ টিউব কারখানায়, জোডার ফেরো-ম্যাঙ্গানীজ কারখানায়, হীরাকুঁদের অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ইহা ব্যতীত সম্বলপুর, সুন্দরগড়, বরাগড়, আঙ্গুল, কটক, পুরী, ভুবনেশ্বর, খুরদা প্রভৃতি শহরেও এই বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী মহানদীর উপর ভবিষ্যতে ঢেনকানাল জিলার টিকারপাড়ায় এবং কটকের নিকট নারাজে আরও দুইটি বাঁধ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মিত হইবে। এই দুইটি বাঁধের কার্য সমাপ্ত হইলে ওড়িশায় প্রায় ১১ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ ও ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবন্দোবস্ত হইবে। প্রচুর কয়লা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানীজ, বক্সাইট, জলবিদ্যুতের এই সুলভ সরবরাহ এই রাজ্যকে যে অতি দ্রুত একটি শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যে রূপান্তরিত করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

[**প্রশ্ন** : (১) মহানদী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি ? (১) এই পরিকল্পনার একটি রূপরেখা দাও।]

কোশী পরিকল্পনা (The Koshi Project)

কোশী নদীকে **উত্তর বিহারের দুঃখের নদী** বলা হয়। কোশী হিমালয় পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া নেপালের পূর্ব দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া হনুমান নগরের নিকট ভারতের বিহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পরে ইহা ভারতের পূর্বাঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাহেবগঞ্জের অপর পারে গঙ্গা নদীতে পতিত হইয়াছে। কোশী নদী বরফগলা জলে পুষ্ট হইলেও বর্ষার সময় ইহার উপনদীসমূহ অরুণ কোশী ও সূর্য কোশী প্রচুর জল বহন করিয়া আনে এবং প্রবল বন্যার সৃষ্টি করে। অধিকন্তু এই নদীবাহিত বালি, পাথর ও নুড়ি

প্রচুর চাষের জমি ঢাকিয়া ফেলে এবং নদীর গতিপথে জমা হইয়া ইহার গতি পথের পরিবর্তন ঘটায়। ফলে নেপাল ও বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা অনুর্বর ডাঙ্গা জমি বা নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত হয়। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য ভারত ও নেপাল সরকারের যৌথ উদ্যোগে কোশী নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনা রচিত ও বাস্তবায়িত হয়। এই পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের সহিত জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থাও গৃহীত হয়।

সমগ্র পরিকল্পনাটি দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে—বিহার-নেপাল সীমান্তে **হনুমান নগরে** কোশী নদীর উপর একটি সেচ বাঁধ ও ২৪০ কি. মি. দীর্ঘ একটি বন্যা-নিয়ন্ত্রণকারী উচ্চ পাড় (dyke) নির্মাণ করা হইয়াছে। এই সেচ-বাঁধের দুই তীর হইতে দুইটি খাল খনন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নদীর বাম তীরে **পূর্ব কোশী** খাল কাটিয়া ইতিমধ্যেই বিহারের পূর্ণিয়া, সহর্ষ, দ্বারভাঙা ও মজঃফরপুর জিলার প্রায় ৫·৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হনুমান নগরের বাঁধ ব্যতীত এই পর্যায়ে নেপালের **ছাত্রা** গিরিখাতের নিকট ২১৯ মিটার উচ্চ আর একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। এই বাঁধের উভয় তীর হইতেও দুইটি খাল খনন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিম কোশী খালটি হনুমান নগর বাঁধের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে খনন করা হইবে এবং ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২৩·৬৫ কি. মি. হইবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে হনুমান নগর বাঁধের দক্ষিণ তীর হইতে **পশ্চিম কোশী খাল ও রাজপুর খাল** খনন করা হইবে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের পাড় নির্মাণের কার্য সম্প্রসারিত করা হইবে। ছাত্রা বাঁধের উভয় তীর হইতে প্রস্তাবিত খাল দুইটির খননকার্যও শেষ করা হইবে। অধিকন্তু হনুমান নগর ও ছাত্রা বাঁধের জলাধার হইতে যথাক্রমে ২০,০০০ ও ১০,০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুইটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

উপরি-উক্ত দুইটি পর্যায়ের প্রস্তাবিত নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইলে বিহার ও নেপালের প্রায় দুই লক্ষ হেক্টর জমি বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবে। উত্তর ভারতের সমভূমি পূর্ণিয়া, সহর্ষ, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি ও নেপালের তরাই এলাকা বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। ধান, গম, ইক্ষু, রবিশস্যের উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পাইবে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে এই সকল অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন শিল্পেরও প্রসার ঘটিবে।

[**প্রশ্ন** : কোশী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি ? পরিকল্পনাটি বর্ণনা কর।]

গঙ্গা বাঁধ বা ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা (The Ganga Barrage or Farakka Barrage Project)

বিহার হইতে গঙ্গানদী পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জিলায় প্রবেশ করিয়া দুইটি ধারায় বিভক্ত হইয়াছে। একটি ধারা পদ্মা নামে পূর্বদিকে বর্তমান বাংলাদেশে প্রবেশ

করিয়াছে এবং অপর একটি ধারা দক্ষিণ দিকে ভাগীরথী-হুগলী নামে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। একদিন গঙ্গানদীর মূল স্রোত ভাগীরথী-হুগলী হইয়া প্রবাহিত ছিল বলিয়া সুনাব্য হুগলী নদীর তীরে কলিকাতা বন্দর ও উহার সন্নিহিত হাওড়া-হুগলী-২৪-পরগণা জেলার শিল্পাঞ্চলের বিকাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু কোন ভৌগোলিক কারণে বিগত প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ গঙ্গানদীর এই স্রোতধারা ভাগীরথীর খাত পরিবর্তন করিয়া পদ্মার খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার ফলে ভাগীরথীর স্রোতবেগ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসে এবং ময়ূরাক্ষী, অজয়, রূপনারায়ণ প্রভৃতি গঙ্গার উপনদী-সমূহের বালি, কাদা, পলি ইত্যাদি ভাগীরথী-হুগলীর মোহনায় থিতাইয়া বিরাট চড়ার সৃষ্টি করে। ইহাতে সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ আর কলিকাতা বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না। বর্তমানে ৬।৭ মিটার খোলের জাহাজও পোর্ট পাইলটের সাহায্য ব্যতীত বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না। বন্দরের মুখ পলি হইতে পরিষ্কার রাখিবার জন্য সর্বদা পলিকাটা ড্রেজার (Dredger) সচল রাখিতে হয়। বন্দরের স্বাভাবিক পণ্য চলাচলের পরিমাণও সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছিয়াছে। অধিকন্তু গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনা জল নদীপথে অধিকদূর প্রবেশ করিবার ফলে জলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায় এবং নদী তীরবর্তী কলকারখানার যন্ত্রপাতি যেমন অতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতি ঘটে তেমনি জনস্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটে। মোটকথা, গঙ্গানদীর মুখে চড়া জমিয়া যাওয়ায় কলিকাতা বন্দর তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। পলি কাটিয়া বন্দর সচল রাখিতে প্রতি বৎসরই বন্দরের ব্যয় অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কলিকাতা বন্দরের অবনতির ফলে মেদিনীপুর জিলার **হলদিয়াতে** একটি সহায়ক বন্দর স্থাপন করা হয়। বর্ষাকালে ৩।৪ মাস ব্যতীত অন্য সময়ে গঙ্গার প্রধান ধারার সহিত ভাগীরথীর যোগ আদৌ থাকে না। ইহাতে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জিলার কৃষিকার্যেরও গুরুতর ক্ষতি হয়।

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ জিলার ধুলিয়ানের নিকট **তিলডাঙা** নামক স্থানে গঙ্গার উপর একটি আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনাই **গঙ্গা বাঁধ বা ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা** নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঁধের উপর দিয়া রেল ও সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা হইবে। এই সড়ক ও রেলপথে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যে সরাসরি পণ্য ও যাত্রী চলাচল করিতে পারিবে। ফরাক্কা বাঁধ হইতে প্রায় ৪০ কি. মি. ভাঁটিতে জঙ্গীপুরের নিকট ভাগীরথীর উপর আর একটি বাঁধ নির্মিত হইবে। এবং ফরাক্কা বাঁধের পিছন দিক হইতে ৪২·৬ কি. মি. দীর্ঘ একটি ফীডার খাল কাটিয়া জঙ্গীপুরের নিকট গঙ্গা ও ভাগীরথীকে যুক্ত করা হইবে। ইহার ফলে গঙ্গার মূল স্রোতধারা খালপথে ভাগীরথী হইয়া প্রবাহিত হইবে। ভাগীরথীতে জলধারা ও স্রোতবেগ বৃদ্ধি পাইলে ইহার গর্ভ ও মোহনায় যে পাল সঞ্চিত হইয়াছে

উহা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে এবং নতূন পলি সঞ্চয়ের সম্ভাবনাও হ্রাস পাইবে। কলিকাতা বন্দরে পূর্বের মত বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করিতে পারিবে ও কলিকাতা বন্দরের পুনরুজ্জীবন ঘটিবে। ইহা ব্যতীত আনুষঙ্গিক সুবিধা হিসাবে প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্যে জলপথে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সুযোগ ঘটিবে। দ্বিতীয়ত, ফীডার খাল হইতে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জিলার বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচের সুবিধা হইবে। তৃতীয়ত, কলিকাতা-হাওড়া অঞ্চলে পানীয় জলের অসুবিধা দূর হইবে।

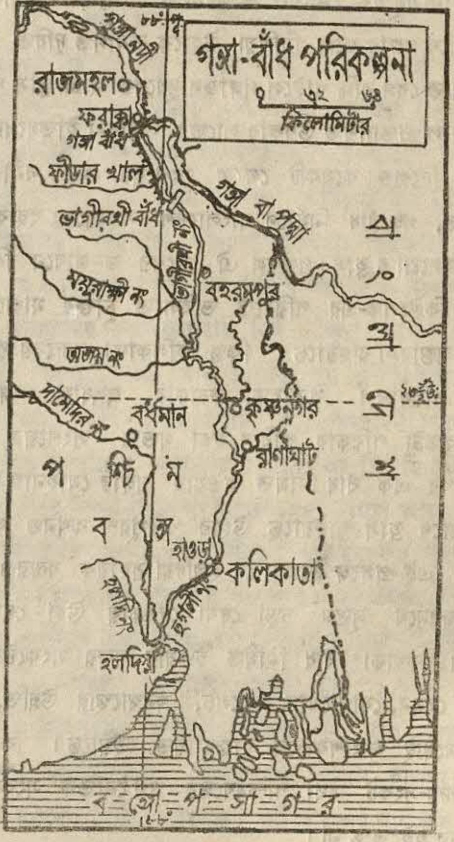

চিত্র ১০.৪ : ফরাক্কা বাঁধ ও ফীডার খাল।

চতুর্থত, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিবে ও কলকারখানার যন্ত্রপাতির অতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাইবে। পঞ্চমত, কলিকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের বার্ষিক পলিকাটার ব্যয় উল্লেখ-যোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাইবে। সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়ন ঘটিবে।

গঙ্গাবাঁধের নির্মাণকার্য সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। ফরাক্কা ও জঙ্গীপুরের বাঁধ নির্মিত হইয়াছে এবং ফীডার খালের মাধ্যমে ভাগীরথীতে ৪০,০০০ কিউসেক জল ছাড়া হইতেছে। বাঁধের উপর দিয়া রেল ও সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় দেশ-বিভাগের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যে যে সরাসরি যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল উহা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গঙ্গার জল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ইহার লবণাক্ততা বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু জলের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। গঙ্গাতীরবর্তী কারখানাসমূহের নোংরা আবর্জনা ও রাসায়নিক বিক্রিয়াজাত পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি প্রভূত পরিমাণে গঙ্গার জলে মিশিয়া উহাকে ক্রমাগত দূষিত করিয়া তুলিতেছে। গঙ্গার জলধারা ও স্রোত বেগ বৃদ্ধি পাইলে গঙ্গাজল দূষণের মাত্রা হ্রাস পাইবে।

বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রত্যাশিত উপকার লাভের সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে সংশয়ের মেঘ ঘনীভূত হইতে দেখা যাইতেছে। প্রথমত, গঙ্গাবাঁধ নির্মাণে বাংলাদেশ সরকারের বরাবরই আপত্তি ছিল। কারণ পদ্মা নদীতে জলস্রোত হ্রাস পাইলে ঐ দেশের জনজীবনে বিপর্যয় দেখা দিবে। বর্তমানে ৪০,০০০ কিউসেক-এর পরিবর্তে ভবিষ্যতে চুক্তির মাধ্যমে আরও কম জল ভাগীরথীতে ছাড়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু কলিকাতা বন্দরের পুনরুজ্জীবনে উহাই সর্বনিম্ন জলধারার পরিমাণ। দ্বিতীয়ত, ফরাকার জলধারা গঙ্গার গভীর পলিস্তর ধুইয়া গঙ্গামুখকে কতটা পরিষ্কার করিবে ইহা গভীর সংশয়ের বিষয়। দামোদর উপত্যকায় একের পর এক বাঁধ নির্মিত হওয়ায় গঙ্গার মোহনায় জলস্রোতের পরিমাণ ও তীব্রতা যে পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে উহার পরিপূরণ কখনও ফরাক্কার জলস্রোতে সম্ভব হইবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে হলদিয়া সহায়ক বন্দরও সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হইবার পূর্বেই বন্দরমুখে নূতন চড়া দেখা দেওয়ায় উহা ঘোর অস্তিত্ব-সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। ফরাক্কা বাঁধ নির্মিত হওয়ায় বন্দর সংকটের সমাধান ব্যতীত অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি যেমন, যোগাযোগ, জলসেচ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, জলের লবণাক্ততা হ্রাস ইত্যাদি ইতিমধ্যেই আংশিকরূপে বাস্তবায়িত হইয়াছে। কিন্তু এই বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রস্তাবিত বন্দর-সংকট তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের কোন সম্ভাবনাই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

[প্রশ্ন : (১) ফরাক্কা বাঁধের গুরুত্ব আলোচনা কর। (২) সমগ্র পরিকল্পনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।]

রাজ্য সরকার পরিচালিত পরিকল্পনা

১) ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা (The Mayurakshi Project)

ময়ূরাক্ষী বা মোর (Mor) নদী বিহারের সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘরের নিকট **ত্রিকূট পাহাড়** হইতে নির্গত হইয়া বিহারের সাঁওতাল পরগণা, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জিলার মধ্য দিয়া ২৪০ কি. মি. অতিক্রম করিয়া কাটোয়ার ২০ কি. মি. উত্তরে **দত্তবাটী** নামক স্থানে ভাগীরথীতে মিশিয়াছে। **ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর,** ইহার প্রধান উপনদী। পলি জমিয়া নদীর তলদেশ উন্নীত হওয়ায় বর্ষাকালে এই নদী-উপত্যকায় নিয়মিত বন্যার সৃষ্টি হয়। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে জলাভাবে এই সকল অঞ্চলে চাষ আবাদেরও বিশেষ অসুবিধা ঘটে। এই সকল অসুবিধা দূরীকরণার্থে ১৯৪৪ সালে বঙ্গ সরকার ময়ূরাক্ষী-নদী-পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পরে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ শুরু হয় এবং প্রথম পরিকল্পনা আমলেই ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিহারের সাঁওতাল-পরগণায় ডুমকার নিকট **ম্যাসাঞ্জোরে** ময়ূরাক্ষী নদীর উপর ৬৬১ মিটার দীর্ঘ, ৪৭ মিটার উচ্চ একটি বাঁধ ও ইহার সংলগ্ন ৬০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি জলাধার নির্মাণ করা হয়। ১৯৫৫ সালে কানাডা সরকারের আর্থিক সাহায্যে এই বাঁধ নির্মিত হয় বলিয়া ইহাকে '**কানাডা বাঁধ**'ও বলা হয়। এই স্থানে ৪,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ম্যাসোঞ্জার বাঁধের ৩২ কি. মি. নিম্নগতিতে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জিলায় সিউড়ির নিকট **তিলপাড়াতে** ১৯৫১ সালে আর একটি সেচবাঁধ নির্মিত হইয়াছে। এই বাঁধের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০৪ মিটার। এই সেচবাঁধ হইতে নিয়মিত প্রায় ২·৯ লক্ষ কিউসেক জল সেচের জন্য সরবরাহ করা যায়। এই বাঁধের পশ্চাৎ দিক হইতে দুই তীরে দুইটি প্রধান সেচখাল কাটা হইয়াছে। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রতিটি ১১২ কি. মি.। শাখা-প্রশাখাসহ এই সকল সেচখালের দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৭০০ কি. মি.। এই মূল পরিকল্পনা ব্যতীত ময়ূরাক্ষীর উপনদীগুলিতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ বাঁধ নির্মাণ দ্বারা জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। উত্তরাংশের প্রধান খালপথে দ্বারকা ও ব্রাহ্মণী নদীতে দুইটি ছোট ব্যারেজ নির্মিত হইয়াছে। দক্ষিণাংশের খালপথে কোপাই ও বক্রেশ্বর নদেও দুইটি ছোট ব্যারেজ নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বর্ষার জল নিয়ন্ত্রণের জন্য শাখা খালপথে 'রেগুলেটর' (Regulator) ও 'অ্যাকুইডাক্ট' (Acquiduct) প্রভৃতি নির্মাণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে বিহারের সাঁওতাল পরগণার ডুমকা জিলায় প্রায় ১০,০০০ হেক্টর জমিতে এবং পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জিলায় প্রায় ২·৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ হইতেছে। সেচপ্রাপ্ত জমিতে প্রভূত পরিমাণে অতিরিক্ত কৃষিদ্রব্য ধান, গম, ইক্ষু, পাট, ডাল ইত্যাদি উৎপাদিত

হইতেছে। জলবিদ্যুতের সাহায্যে সেচপাম্প পরিচালনা এবং শহর ও গ্রাম বৈদ্যুতীকরণ করা হইতেছে। এই সমগ্র পরিকল্পনা ১৯৫৭ সালে ২০'৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত হয়।

[**প্রশ্ন :** (১) ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায়—পশ্চিমবঙ্গের কি উপকার সাধিত হইয়াছে ?]

---

(২) চম্বল পরিকল্পনা (The Chambal Project)

রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের বৃষ্টি-বিরল অঞ্চলে চম্বল পরিকল্পনা ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক রূপান্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। চম্বল নদী মধ্যভারতের উচ্চ ভূভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া যমুনা নদীর সহিত মিশিয়াছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী চম্বল নদীর উপর তিনটি বাঁধ, জলাধার, সেচখাল ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণের সাহায্যে ইহার জলধারাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বন্যারোধ, জলসেচন, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ভূমিক্ষয় রোধের ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। সমগ্র পরিকল্পনাটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ইহার কার্য শুরু হয় এবং ইতিমধ্যে ইহার দুইটি পর্যায়ের কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। তৃতীয় পর্যায়ও প্রায় সমাপ্তির পথে।

এই প্রকল্পে প্রথমত রাজস্থানে চম্বল নদীর উপর চৌরাশিগড় দুর্গের ৮ কি. মি. ভাঁটিতে **গান্ধীসাগর বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র** নির্মাণ করা হইয়াছে। গান্ধী-সাগর বাঁধ ৫০৪ মি. দীর্ঘ ও ৬২ মি. উচ্চ। ইহার জলাধারের আয়তন প্রায় ৭০১ বর্গ কি. মি.। এই বাঁধের সংলগ্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে প্রায় ১১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজস্থানের **রাওয়াটভাট্টার** নিকট চম্বলনদীর উপর রাণাপ্রতাপ সাগর বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। **রাণাপ্রতাপ সাগর বাঁধের** দৈর্ঘ্য প্রায় ১০৮৬ মি. ও উচ্চতা প্রায় ৩৭ মিটার। এই বাঁধ-সংলগ্ন জলাধারের (২০১ বর্গ কি. মি. আয়তন) সাহায্যে প্রায় ১৭২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই পরিকল্পনার তৃতীয় পর্যায়ে কোটাশহরের সন্নিকটে ৫৪৩ মি. দীর্ঘ ও ৩৬ মি. উচ্চ **কোটা ব্যারেজ** নির্মাণ করা হইয়াছে এবং বর্তমানে এই ব্যারেজের সন্নিকটে জলসেচ ও জলবিদ্যুতের জন্য **জওহর সাগর** বাঁধ নির্মিত হইতেছে। জওহর সাগর বাঁধ হইতে ৯৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যাইবে। কোটা ব্যারেজের উভয় তীর হইতে দুইটি প্রধান সেচখাল ও বহু শাখা-সেচখাল কাটা হইয়াছে। চম্বল প্রকল্প দ্বারা মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের বিস্তীর্ণ এলাকায় গম, ইক্ষু, তুলা ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদান আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সকল খাল কাটা হইয়াছে উহার সাহায্যে বর্তমানে প্রায় ৪'৮৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা

হইতেছে। তৃতীয় পর্যায়ের কার্য শেষ হইলে আরও ১'২২ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের সুবন্দোবস্ত হইবে। গান্ধী সাগর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত বিদ্যুতের সাহায্যে মধ্যপ্রদেশে ও রাজস্থানের বিস্তীর্ণ এলাকা আলোকিত হইতেছে। ইন্দোর, গোয়ালিওর, সাওয়াই, কোটা, জয়পুর, মাধোপুর প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছে। রাণাপ্রতাপ সাগর ও জওহর সাগর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতেও প্রচুর বিদ্যুৎ রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হয়। জলবিদ্যুতের সরবরাহের ফলে এই অঞ্চলে অদূর ভবিষ্যতে শিল্প-বলয় গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

[**প্রশ্ন**: (১) চম্বল পরিকল্পনার প্রধান প্রধান জলাধারের নাম উল্লেখ কর। এই পরিকল্পনায় রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের কি কি উপকার সাধিত হইয়াছে ?]

(৩) তুঙ্গ-ভদ্রা পরিকল্পনা (The Tunga-Bhadra Project)

দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের প্রায়-শুষ্ক অঞ্চলে প্রধানত জলসেচের জন্য কৃষ্ণা নদীর উপনদী তুঙ্গভদ্রা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। জলসেচ ব্যতীত বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন ও প্রমোদ ভ্রমণের জন্য আকর্ষণ সৃষ্টি করাও এই বাঁধ নির্মাণের উদ্দেশ্য। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা উর্বর কিন্তু জলের অভাবে প্রায়ই ফসল নষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হইত। আবার বর্ষায় এই নদীতে প্রবল জলস্ফীতি ঘটিয়া কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের এই অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি হইত। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য প্রথম পরিকল্পনাকালে কর্ণাটক ও অন্ধ্র সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই পরিকল্পনার প্রাথমিক কার্য শুরু হয়।

তুঙ্গভদ্রা বাঁধটি কর্ণাটকের হসপেটের নিকট **মল্লারপুরম** নামক স্থানে তুঙ্গভদ্রা নদীর উপর নির্মিত হইয়াছে। এই বাঁধটি প্রায় ২,৪৪১ মি. দীর্ঘ ও প্রায় ৪৯ মি. উচ্চ। ইহার জলাধারের আয়তন ৩৮৫ বর্গ কি. মি. ও জলধারণ ক্ষমতা প্রায় ৪'৩৪ লক্ষ ঘন মিটার। জলসেচের জন্য এই বাঁধের উভয় তীরে দুইটি প্রধান খাল কাটা হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশের দিকে প্রসারিত ডান তীরের প্রধান খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৪৭ কি. মি. ও ইহার শাখা খালের দৈর্ঘ্য ৩,২০০ কি. মি.-এর উপর। বাম তীরের প্রধান খালটি ২০৩ কি.মি. দীর্ঘ। এই খালটি কর্ণাটকের রায়চুরের দিকে প্রসারিত। এই প্রকল্পে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন দ্বারা ৯৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে কর্ণাটকের বেল্লারী ও রায়চুর এবং অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর, কুর্নুল ও কুডাপ্পা জিলার বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচের সাহায্যে ধান, গম,

ইক্ষু, তুলা, তৈলবীজ প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। জলবিদ্যুৎ সহজলভ্য হওয়ায় এই অঞ্চলে শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে প্রায় ২৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

[**প্রশ্ন** : (১) তুঙ্গ-ভদ্রা বাঁধ ও জলাধার কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ? (২) এই পরিকল্পনার ফলে কোন্ কোন্ অঞ্চল জলসেচের সুবিধা পাইতেছে ?]

(৪) নাগার্জুন সাগর-প্রকল্প (The Nagarjun Sagar Project)

দক্ষিণ ভারতের বহুমুখী নদী-প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান নাগার্জুন সাগর-প্রকল্প। দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা নদী ও ভীমা, তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি ইহার উপনদীসমূহ পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বর্ষার জলধারায় ইহারা পুষ্ট বলিয়া নিম্ন কৃষ্ণা-উপত্যকায় বন্যা প্রায় একটি বার্ষিক স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। অধিকন্তু গ্রীষ্মকালে জলাভাবে এই উপত্যকা অঞ্চলে কৃষির: বিশেষ অসুবিধা ছিল। সুতরাং বন্যা-নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি বহুমুখী উপকার লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫-৫৬ সালে নাগার্জুন সাগর বাঁধ প্রকল্পের রূপায়ণ শুরু হয়।

এই প্রকল্প অনুযায়ী অন্ধ্রপ্রদেশে নলগোণ্ডার ২·৪ কি.মি. ভাঁটিতে কৃষ্ণা নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই বাঁধটি ১৪৫০ মি. দীর্ঘ ও ৯৯ মি. উচ্চ। ইহার জলাধারের জলধারণ-ক্ষমতা ১১৫৬ কোটি ঘনমিটার ও ইহার সংলগ্ন বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন-ক্ষমতা প্রায় ৭৫ মেগাওয়াট। নাগার্জুন সাগরের ডান ও বাম তীরে দুইটি প্রধান খাল কাটা হইয়াছে। ইহারা যথাক্রমে ২০৪ কি. মি. ও ১৭৯ কি. মি. দীর্ঘ। এই দুইটি খাল ও ইহার শাখা-প্রশাখার সাহায্যে বর্তমানে ৪·৩৩ লক্ষ হেক্টর কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ করা হইতেছে। ভবিষ্যতে সেচ এলাকার পরিমাণ ৮·৩ লক্ষ হেক্টর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে নিম্ন কৃষ্ণা অববাহিকায় বন্যার আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে এবং জলবিদ্যুৎ সুলভ হওয়ায় অন্ধ্রপ্রদেশে বিজয়ওয়াড়া অঞ্চলে শিল্প-বিকাশের সুবিধা হইয়াছে।

অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নদী-প্রকল্প

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কৃষি উন্নয়ন সূচীর সার্থক রূপায়ণের উদ্দেশ্যে জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতির জন্য ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ অসংখ্য নদী-প্রকল্পের কার্য সমাপ্ত হইয়াছে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নদী-প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হইল।

নদী-প্রকল্প ও রাজ্য	নদীর নাম ও বাঁধের বর্ণনা	উপকার ও উপকৃত এলাকা
১। গণ্ডক প্রকল্প, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, নেপাল।	তিনটি রাজ্যের সীমান্তে গণ্ডক নদীর উপর বাল্মিকী নগরে ৭৩৬ মি. দীর্ঘ ব্যারেজ ও সেচখাল এবং বিদ্যুৎ-কেন্দ্র।	বিহারের চম্পারণ, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, নেপালের পার্শা, ধাবা, রাউটহাট, উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর, দেওরিয়া জিলাসমূহের ৬.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ এবং ১৫ মেগওয়াট শক্তি উৎপাদন। মোট ব্যয় ৫৭০ কোটি টাকা।
২। রিহান্দ প্রকল্প, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার।	উত্তরপ্রদেশে পিপ্‌রির নিকট রিহান্দ নদীর উপর ৯২০ মি. দীর্ঘ ও ৯১ মি. উচ্চ বাঁধ, ৪৫০ বর্গ কি. মি. ব্যাপী ভারতের বৃহত্তম জলাধার।	তিনটি রাজ্যের ১৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ ও ৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন। জলবিদ্যুতের সাহায্যে গোণ্ডা, বাস্তি, বালিয়া, গাজীপুর, জৌনপুর, গোরক্ষপুর, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে নলকূপ হইতে সেচের জল তোলা হয়। ৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র।
৩। হরিকা ও পঙ্‌ ব্যারেজ প্রকল্প, পাঞ্জাব	পাঞ্জাবে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর সঙ্গমের নিকট হরিকা ব্যারেজ ও বিপাশা নদীর উপর পঙ্‌ বাঁধ।	পাঞ্জাব ও রাজস্থানের বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচ, রাজস্থান ক্যানেলে পঙ্‌ বাঁধ হইতে জল সরবরাহ করা হইবে।
৪। কাকড়াপাড়া ও উকাই প্রকল্প, গুজরাট।	তাপ্তী নদীর উপর ৬১২ মি. দীর্ঘ ও ১৪ মি. উচ্চ উইয়ার (Weir) বাঁধ ও বিদ্যুৎ-কেন্দ্র। উকাই গ্রামের নিকট তাপ্তী নদীর উপর ৪,৯২৮ মি. দীর্ঘ ও ৬৮.৬ মি উচ্চ বাঁধ।	প্রাথমিক পর্যায়ে গুজরাটের ২.২৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ। গুজরাটের ১.৫৩ লক্ষ হেক্টর অতিরিক্ত জমিতে জলসেচ। ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা।

নদী-প্রকল্প ও রাজ্য	নদীর নাম ও বাঁধের বর্ণনা	উপকার ও উপকৃত এলাকা
৫। কুণ্ডা প্রকল্প, তামিলনাড়ু	তামিলনাড়ু রাজ্যে, (কাবেরীর উপনদী ভবানী ও ইহার উপনদী কুণ্ডা)। কুণ্ডানদীর উপর এভালেন্স্ ও এভারেণ্ড দুইটি বাঁধের কার্য চলিতেছে, একটি জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রও নির্মিত হইবে।	তামিলনাড়ু রাজ্যে সেচের ব্যাপক সুবিধা। ২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা। কানাডা সরকারের আর্থিক সাহায্যে নির্মাণ-কার্য চলিতেছে।
৬। কয়না প্রকল্প, মহারাষ্ট্র	মহারাষ্ট্রে কৃষ্ণানদীর উপনদী কয়নার উপর নির্মিত ৬৬০ মি. দীর্ঘ ও ৬২ মি. উচ্চ বাঁধ। জলাধারের জলধারণ ক্ষমতা ১০,০৯৩ লক্ষ ঘন মিটার।	বোম্বাই, পুণে অঞ্চলে ১.১২ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ। পশ্চিমের অন্যান্য অঞ্চলেও কৃষি ও শিল্প বিকাশের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ। তিনটি পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা। তৃতীয় পর্যায় অন্তে ৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।

অনুশীলনী

১। বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝায়? ভারতের প্রধান তিনটি নদী-পরিকল্পনা ও ইহাদের উদ্দেশ্য আলোচনা কর।

[What do you mean by a multipurpose river valley project? Discuss the three major river projects of India with their objectives.]

২। বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝায়? ভাক্রা-নাঙ্গাল পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

[What is meant by multi-purpose river project? Discuss the main features of the Bhakra-Nangal Project.]

[W. B. H. S. C. Exam. 1980]

৩। ভারতের যে কোন একটি বৃহৎ বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার বিবরণ দাও এবং এইরূপ পরিকল্পনা হইতে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি বিবৃত কর।

[Give an account of one of the major Multi-purpose River Valley Projects in India and state the benefits that are being derived from such project.] [W. B. H. S. C. Exam. 1981.]

৪। নিম্নলিখিত নদী-উপত্যকা পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে প্রদত্ত রূপলেখা অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা কর।

[রূপরেখা—(ক) উদ্দেশ্য ; (খ) পরিকল্পনার বর্ণনা ও আনুমানিক ব্যয় ; (গ) আঞ্চলিক উপকার।]

ক। দামোদর পরিকল্পনা, খ। ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা, গ। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা। ঘ। গঙ্গা-বাঁধ পরিকল্পনা।

[Discuss in detail the following River Valley Projects as per outlines given below—

[Outlines : (a) Objectives. (b) Description of the project and estimated cost. (c) Regional benefits.]

(a) Damodar Valley Project. (b) Bhakra-Nangal Project. (c) Mayurakshi Project. (d) The Ganga Barrage Project.

৫। দামোদর বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার বিশিষ্ট দিকগুলি উল্লেখ কর।

[Discuss the salient features of the Damodar Multi-purpose River Valley Project.] [W. B. H. S. C. Exam. 1979]

৬। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মূল রূপরেখা বর্ণনা কর। এই পরিকল্পনা হইতে পশ্চিমবঙ্গ কি কি সুবিধা পায় ?

[Describe the salient features of the Damodar Valley Project. What are the benefits derived by West Bengal from the Project ?]
[W. B. H. S. C. Exam. 1982.]

৭। "পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিতে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা অপরিহার্য।"—মন্তব্য লিখ।

["Damodar Valley Project is indispensable in the development of West Bengal."—Comment.] [Tripura H. S. Exam. 1982.]

৮। "কলিকাতা বন্দর রক্ষার জন্য গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা অপরিহার্য।"—আলোচনা কর।

["Ganga Barrage Project is essential for saving the port of Calcutta."—Discuss.]

১১ ভারতের পরিবহণ ব্যবস্থা
(Transport System of India)

উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিচায়ক। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বা বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ে যাত্রী ও মানুষের প্রয়োজনীয় নানাবিধ পণ্যসামগ্রী স্থানান্তরকরণেই পরিবহণের গুরুত্ব। পরিবহণকে জাতীয় অর্থনীতির শিরা ও উপশিরা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের প্রসার, পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও জাতীয় কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করা ইত্যাদি পরিবহণ-ব্যবস্থার সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রাস্তা-ঘাট ও যানবাহনের উন্নতির ফলে ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থার নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নিম্নে ইহার শ্রেণীবিভাগ দেখান হইল।

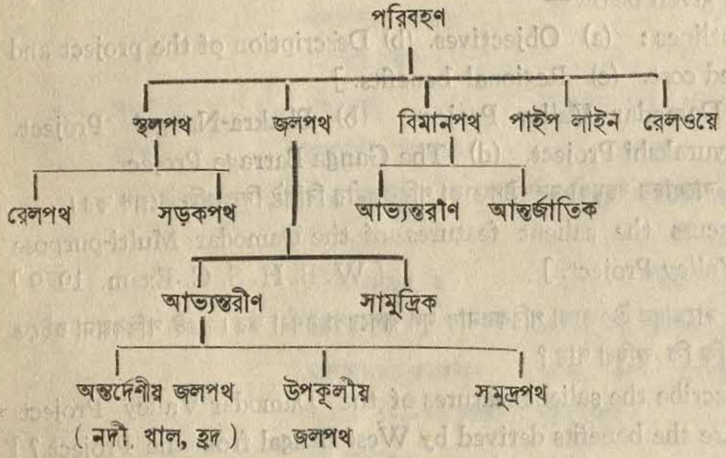

ভারতের সড়কপথ—ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের ৭০% লোক গ্রামে বাস করে। রেলপথগুলি বড় বড় শহর, শিল্পাঞ্চল ও বন্দরকে যুক্ত করিয়াছে। কৃষি-প্রধান গ্রামাঞ্চলের সহিত সড়কপথেই যোগাযোগ বেশী। কিন্তু ভারতে লোকসংখ্যা বা দেশের আয়তন অনুপাতে রাস্তার দৈর্ঘ্য আজিও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। বহু পার্বত্য অঞ্চলে বা উপকূলভাগে সাধারণ রাস্তার ব্যবস্থাও নাই। সমতলভূমিতে সারা বৎসর চলাচলযোগ্য রাস্তার যথেষ্ট অভাব। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে কাঁচা ও পাকা সড়ক পথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৪ লক্ষ কিলোমিটার। ইহার মধ্যে ১·৪৬ লক্ষ কি. মি পাকা এবং ২·৪২ লক্ষ কি মি কাঁচা সড়কপথ ছিল। ১৯৭৯-৮০ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ৫,৪০,৭২০ কিলোমিটার। ইহার মধ্যে পাকা সড়ক ও কাঁচা সড়কের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪,২০,১০৫ কি. মি. এবং ১২০,৬১৫ কি. মি.। দেশের

প্রতি বর্গ কিলোমিটার আয়তনে সড়কপথের দৈর্ঘ্য জাপানে ২ কি. মি., ফ্রান্সে ১.৫ কি. মি., আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৩.৭ কি. মি. এবং ভারতে মাত্র ০.৪১ কি. মি.। লোকসংখ্যা অনুপাতেও ভারতের সড়কপথ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। প্রতি এক লক্ষ লোকে সড়কপথের দৈর্ঘ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৪০০ কি. মি., ফ্রান্সে ১,৫০০ কি. মি., বৃটেনে ৬৪০ কি. মি. এবং ভারতে মাত্র ২৫১ কি. মি.।

ভারতের সড়কপথগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—(১) জাতীয় সড়কপথ (২) রাজ্য সড়কপথ, এবং (৩) অন্যান্য।

জাতীয় সড়কপথ (National Highways)—বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ও বড় বড় শহর, বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের মধ্যে যোগসাধনকারী রাজপথকে জাতীয় সড়ক পথ বলা

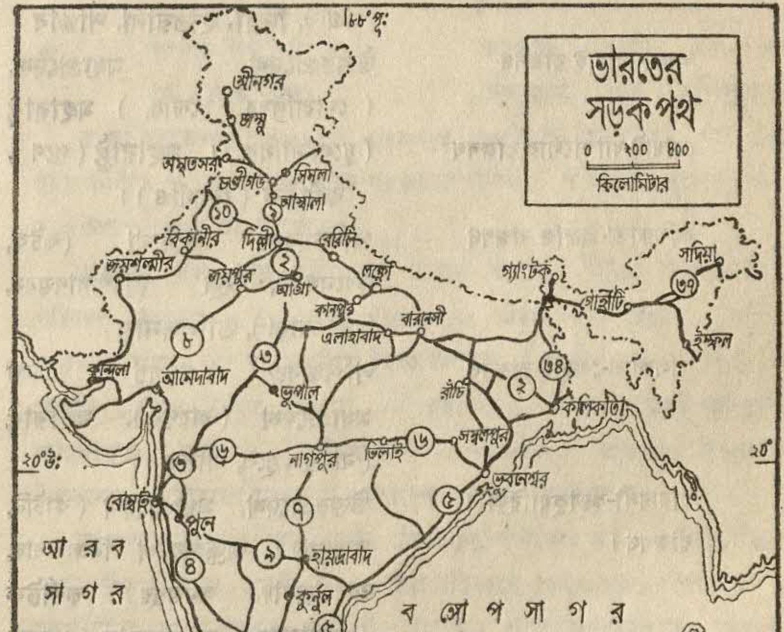

চিত্র ১১.১ : ভারতের জাতীয় সড়ক পথের নির্দেশক।

হয়। এইগুলির স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। ভারতে এই প্রকার রাস্তার সংখ্যা বর্তমানে ৫৫টি এবং ইহাদের মোট দৈর্ঘ্য ৩১,৩৫৮ কি. মি.।

ভারতের প্রধান প্রধান কয়েকটি জাতীয় সড়কের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

জাতীয় সড়ক নং	সংযুক্ত শহর	সংযুক্ত রাজ্য ও শহর
১	দিল্লী-অমৃতসর রাজপথ : দিল্লী হইতে পাঞ্জাবের অমৃতসর।	দিল্লী, হরিয়ানা, পাঞ্জাব (আম্বালা, জলন্ধর)।
২	গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড : পশ্চিম বঙ্গের কলিকাতা হইতে পাঞ্জাবের পাঠানকোট	পশ্চিমবঙ্গ (কলিকাতা, দুর্গাপুর), বিহার (ধানবাদ, গয়া), উত্তরপ্রদেশ (বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর, আগ্রা), দিল্লী, হরিয়ানা, পাঞ্জাব।
৩	আগ্রা-বোম্বাই রাজপথ	উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, (গোয়ালিয়র, ইন্দোর,) মহারাষ্ট্র (ধুলে, নাসিক)।
৪	বোম্বাই-ব্যাঙ্গালোর রাজপথ	মহারাষ্ট্র (পুণে), কর্ণাটক (বেলগাঁও)।
৫	কলিকাতা-মাদ্রাজ রাজপথ	পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা (কটক, ভুবনেশ্বর), অন্ধ্র (বিশাখাপত্তনম, বিজয়ওয়াড়া), তামিলনাড়ু।
৬	কলিকাতা-বোম্বাই রাজপথ	পশ্চিমবঙ্গ (খড়গপুর), ওড়িশা মধ্যপ্রদেশ (রায়পুর), মহারাষ্ট্র (নাগপুর, ধুলে, নাসিক)
৭	বারাণসী-কন্যাকুমারিকা রাজপথ।	উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ (কাটনি, জব্বলপুর), অন্ধ্রপ্রদেশ (নিজামাবাদ, হায়দারাবাদ, অনন্তপুর), কর্ণাটক (ব্যাঙ্গালোর), তামিলনাড়ু (সালেম, কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই)।
৮	দিল্লী-আমেদাবাদ বোম্বাই রাজপথ	দিল্লী, রাজস্থান, (জয়পুর, আজমীড়, উদয়পুর), গুজরাট (আমেদাবাদ)।
৯	বোম্বাই-বেজওয়াদা রাজপথ	মহারাষ্ট্র (পুনে, শোলাপুর), অন্ধ্র (হায়দারাবাদ)।
১৫	পাঞ্জাব-কাণ্ডলা রাজপথ : পাঞ্জাবের ফাজিলকা হইতে গুজরাটের কাণ্ডলাবন্দর।	পাঞ্জাব, রাজস্থান (গঙ্গানগর, বিকানির, জয়সালমির।)

জাতীয় সড়ক নং	সংযুক্ত শহর	সংযুক্ত রাজ্য ও শহর
১৭	বোম্বাই-কন্যাকুমারিকা রাজপথ	**মহারাষ্ট্র, গোয়া** (পানাজি), কর্ণাটক (ম্যাঙ্গালোর), **কেরালা** (কোচিন, ত্রিবান্দ্রাম), তামিলনাড়ু।
২২	আম্বালা-সিমলা-তিব্বত রাজপথ পাঞ্জাবের আম্বালা হইতে তিব্বত সীমান্ত।	**পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ**।
২৪	দিল্লী-লক্ষ্ণৌ রাজপথ।	**দিল্লী**, **উত্তরপ্রদেশ** (মোরাদাবাদ, বেরিলি)।
৩৭	আসাম ট্রাঙ্ক রোড ব্রহ্ম সীমান্ত পর্যন্ত।	**আসাম**, গৌহাটি ধুবরি, দিসপুর) **মেঘালয়**, (শিলং), **মণিপুর**।

রাজ্য সড়কপথ (State Highways) **:** এই পথ রাজ্যসীমার মধ্যে নির্মিত। ইহার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। পরিকল্পনা আমলে এই পথের দ্রুত উন্নয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে।

অন্যান্য পথ—দ্রুত পরিবহণের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কয়েকটি দ্রুত পরিবহণ রাজপথ বা Express Highways নির্মাণ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা-দমদম, কলিকাতা-দুর্গাপুর ইহার উদাহরণ। অনুরূপ রাস্তা বোম্বাই, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যেও নির্মিত হইয়াছে এবং হইতেছে। ভারতে কয়েকটি **আন্তর্জাতিক রাজপথও** বর্তমান। দিল্লী-লাহোর (পাকিস্তান) রাজপথ, ইম্ফল-মান্দালয় (ব্রহ্মদেশ), কলিকাতা-যশোহর (বাংলাদেশ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারতে সড়কপথে গরুর গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, সাইকেল, ভ্যান, মোটর গাড়ি, স্কুটার, অটো রিকশা, বাস প্রভৃতি পণ্য ও যাত্রী পরিবহণে ব্যবহৃত হয়। বিগত ৩৭ বৎসরে যানবাহনের সংখ্যা প্রায় ১০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতে জনসংখ্যার দ্রুত প্রসার, নূতন নূতন শহরাঞ্চলের প্রসার ও শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদির ফলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ও আন্তঃ-রাজ্য যোগযোগের জন্য বহু নূতন রাস্তা তৈয়ারি করা হইয়াছে। বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে জাতীয় ও রাজ্য পর্যায়ে সড়কপথের উন্নয়ন ও নতুন পথ নির্মাণের জন্য মোট ৬,৭৪৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে এবং প্রায় ১০,০০০ কি. মি. নতুন রাস্তা নির্মিত হইয়াছে।

রেলপথ (Railways)—ভারতে রেলগাড়ির প্রথম প্রচলন ঘটে ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল। বোম্বাই হইতে থানার মধ্যে (৩৩.৬ কি. মি. দূরত্ব) ১৪টি চাকাযুক্ত সেলুন কারের প্রথম গাড়িটি ৪০০ যাত্রী নিয়ে চলাচল শুরু করে। পরবর্তী বৎসর

১৮৫৪ সালে প্রথম রেলযোগাযোগ স্থাপিত হয় পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা ও কয়লাখনি অধ্যুষিত রাণীগঞ্জের মধ্যে। ইহার পর মাদ্রাজে রেলপথ স্থাপিত হয় ১৮৫৬ সালে। বেসরকারী বৃটিশ পুঁজি দ্বারাই ভারতে রেলপথের প্রবর্তন ঘটে। ১৮৫৮ সাল হইতেই মোটামুটিভাবে ভারতীয় রেলপথের উন্নতি শুরু হয় এবং দ্রুত রেলপথগুলি ভারতের

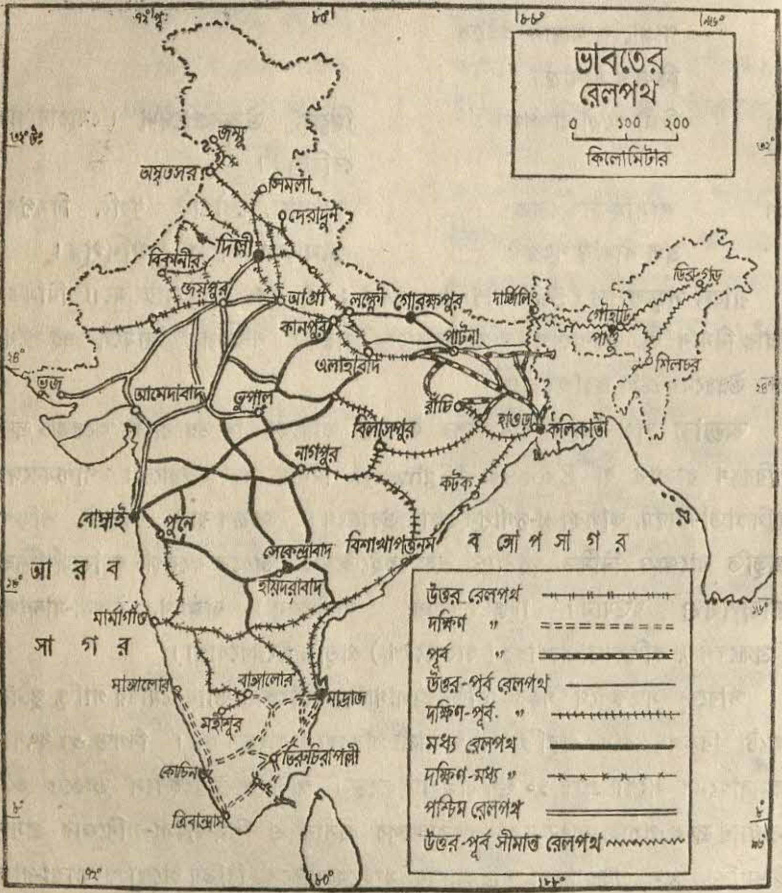

চিত্র ১১.২ : ভারতীয় রেলপথের পুনর্বিন্যাস।

প্রধান শহর ও বন্দরগুলির সহিত পশ্চাদ্ভূমির সাধারণ সংযোগ স্থাপন করে। ১৯০৫ সালে ভারতীয় রেলপথ নিয়ন্ত্রণের জন্য রেলওয়ে বোর্ড স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর রেলপরিচালনা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হয়। বর্তমানে রেল পরিচালনা ভারতের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। ভারতীয় রেলপথ এশিয়ার মধ্যে দীর্ঘতম এবং বিশ্বে দৈর্ঘ্যে চতুর্থ। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় সাম্প্রতিক কালে যাত্রী-পরিবহণের

সংখ্যা প্রায় ২০ গুণের বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পণ্য-পরিবহণের পরিমাণ ২২ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় রেলপথে পরিবাহিত পণ্যের মধ্যে কয়লা প্রথম, ধাতব খনিজ দ্বিতীয় এবং খাদ্যশস্য তৃতীয়। অন্যান্য রেল-পরিবাহিত পণ্যের মধ্যে সিমেন্ট, লৌহ ইস্পাত,, খনিজ তৈল, কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য, চিনি, তূলা, কার্পাস বস্ত্র, তৈলবীজ, রাসায়নিক সার, কাগজ, লবণ, আম ও অন্যান্য ফল ইত্যাদি প্রধান।

ভারতীয় রেলপথ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—**ব্রড গেজ, মিটার গেজ ও ন্যারো গেজ**। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৫৩,৫৯৬ কি.মি.। ১৯৮৩ সালের ৩১শে মার্চে ইহার দৈর্ঘ্য হয় ৬১,৩৮৫ কি. মি.। ইহা ব্যতীত ভারতে খুবই সামান্য পরিমাণ দৈর্ঘ্যের ন্যারো গেজ রেলপথ এখনও ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হইতেছে। পরিচালনার সুবিধার জন্য ১৯৫১-৫২ সালে ভারতীয় রেলপথের পুনর্বিন্যাস করা হয়। বর্তমানে ইহাকে নয়টি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে :—(১) পূর্ব রেলপথ, (২) পশ্চিম রেলপথ, (৩) উত্তর রেলপথ, (৪) দক্ষিণ রেলপথ, (৫) মধ্য রেলপথ, (৬) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ, (৭) উত্তর-পূর্ব রেলপথ (৮) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ, (৯) দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ।

(১) **পূর্ব রেলপথ** (Eastern Railways)—ইহার দৈর্ঘ্য ৪,২৩৫ কি. মি. এবং সদর দপ্তর **কলিকাতা**। এই রেলপথের প্রধান শাখাগুলি হাওড়া-বর্দ্ধমান-মোগলসরাই, হাওড়া--কিউল, শিয়ালদহ-বনগাঁ ও শিয়ালদহ-বজবজ-ক্যানিং প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের খনি এবং শিল্পাঞ্চলকে কলিকাতা বন্দরের সহিত এই রেলপথ যুক্ত করিয়াছে। রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা, হাজারিবাগ ও কোডার্মার অভ্র, সিন্ধ্রির সার, চিত্তরঞ্জন, আসানসোল, দুর্গাপুর, টিটাগর, নৈহাটি, হিন্দ্‌মোটর, রিষড়া অঞ্চলের লৌহ-ইস্পাত, কাগজ, পাটজাত দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, কার্পাস দ্রব্য ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পদ্রব্য এই রেলপথে পরিবাহিত হয়। কলিকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল। (২) **পশ্চিম রেলপথ** (Western Railways)—ইহার দৈর্ঘ্য ১০,১৫০ কি. মি. এবং সদর দপ্তর **বোম্বাই**। এই রেলপথের প্রায় ৪,৮৯০ কি. মি. এখনও মিটার গেজ ও ন্যারো গেজ। গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রের উত্তরাংশ ও মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল বোম্বাই ও কাণ্ডলা বন্দরের সহিত যুক্ত। বোম্বাই, আমেদাবাদের কার্পাস ও কার্পাস বস্ত্র, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের লবণ, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য ও নানাবিধ শিল্পদ্রব্য এই রেলপথ দ্বারা পরিবাহিত হয়। বোম্বাই ও কাণ্ডলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যাদি এই রেলপথ দ্বারা পরিবাহিত হয়। (৩) **উত্তর রেলপথ** (Northern Railways)—এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ১০,৬৮৭ কি. মি. এবং ইহার সদর দপ্তর **নয়াদিল্লীতে** অবস্থিত। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, পাঞ্জাব, দিল্লী এবং রাজস্থানের পূ[illegible] এই রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। এই রেলপথে পরিবাহিত পণ্যসামগ্রীর মধ্যে

পশম, চর্ম, চিনি, গম, তৈলবীজ, সিমেন্ট, কৃত্রিম রেশম এবং নানা প্রকার শিল্প দ্রব্য প্রধান। অমৃতসর, লুধিয়ানা, আগ্রা, দিল্লী, কানপুর, যোধপুর প্রভৃতি এই রেলপথের উপর অবস্থিত। (৪) **দক্ষিণ রেলপথ** (Southern Railways)—এই রেলপথ ৭,৪২৫ কি. মি. দীর্ঘ এবং ইহার সদর দপ্তর **মাদ্রাজে** অবস্থিত। তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের কৃষি ও শিল্পাঞ্চল এই রেলপথ দ্বারা মাদ্রাজ ও কোচিন বন্দরের সহিত যুক্ত। ব্যাঙ্গালোরের মেসিন টুলস্, বিমানপোত-শিল্প ও ভদ্রাবতীর লৌহ-ইস্পাত শিল্প, তামিলনাড়ুর কার্পাস ও চিনি শিল্প, আলওয়ের অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প এই রেলপথ দ্বারা পরিসেবিত। চা, কফি, মশলাদ্রব্য, চাল, তামাক, চীনাবাদাম, চামড়া, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ-ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, কার্পাস বস্ত্র ইত্যাদি এই রেলপথে চলাচল করে। (৫) **মধ্য রেলপথ** (Central Railways)—এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ৬,০১৬ কি. মি. এবং ইহার সদর দপ্তর **বোম্বাই** শহরে অবস্থিত। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রের অংশ বিশেষ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর কিয়দংশ এই রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। ঝাঁসি, ভূপাল, উজ্জয়িনী, নাগপুর, পুণে, জব্বলপুর, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি এই রেলপথের উপর অবস্থিত। গম, জোয়ার, বাজরা, কফি, ম্যাঙ্গানীজ, সিমেন্ট, চিনি, কার্পাস বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি এই রেলপথ দ্বারা পরিবাহিত হয়। (৬) **দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ** (South-Eastern Railways)—এই রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৬,৯২৬ কি. মি.। ইহার সদর দপ্তর **কলিকাতা (গার্ডেনরীচ)**। পশ্চিমে নাগপুর ও দক্ষিণে ওয়ালটেয়ার পর্যন্ত এই রেলপথ বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিয়দংশ এই রেলপথ দ্বারা যুক্ত। জামসেদপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লার লৌহ-ইস্পাত শিল্প, বিশাখাপত্তনম্ ও মধ্যপ্রদেশের খনিজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ ও শিল্পদ্রব্য ইহার দ্বারা পরিবাহিত হয়। বিশাখাপত্তনম্ ও পারাদীপ বন্দর মারফত আমদানি-রপ্তানি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল। (৭) **উত্তর-পূর্ব রেলপথ** (North-Eastern Railway)—ইহার দৈর্ঘ্য ৪,৯৭৭ কি. মি. এবং ইহার সদর দপ্তর উত্তর প্রদেশের **গোরক্ষপুরে** অবস্থিত। ইক্ষু, তামাক, চিনি, সিমেন্ট চাউল প্রভৃতি ইহার দ্বারা পরিবাহিত হয়। কাটিহার, ছাপরা মজঃফরপুর, বারাণসী প্রভৃতি এই রেলপথ দ্বারা যুক্ত। (৮) **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ** (North-Eastern Frontier Railways)—৩৬২৮ কি. মি. দীর্ঘ এই রেলপথের সদর দপ্তর গৌহাটির নিকট **মালিগাঁও**-এ অবস্থিত। উত্তর বিহার, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এই রেলপথ দ্বারা যুক্ত। আসামের চা, খনিজ তেল কাষ্ঠ প্রভৃতি ইহার দ্বারা পরিবাহিত হয়। (৯) **দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ** (South-Central Railways) দৈর্ঘ্যে ইহা ৬,১৭৫ কি. মি.। ইহার সদর দপ্তর অন্ধ্রপ্রদেশের **সেকেন্দ্রাবাদ**। অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণাংশ, উত্তর-পূর্ব কর্ণাটক, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, গোয়া রাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। ...ম উপকূলে গোয়ার অন্তর্ভুক্ত মার্মাগাঁও ও পূর্ব উপকূলের বিশাখাপত্তনম বন্দর

দুইটি এই রেলপথ দ্বারা যুক্ত। তুলা, তামাক, চীনাবাদাম, কাঠ, কার্পাসবস্ত্র প্রভৃতি এই রেলপথে চলাচল করে। হায়দ্রাবাদ, মান্মদ, বিজয়ওয়াড়া প্রভৃতি এই রেলপথের উপর অবস্থিত।

ভারতের মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, সিকিম, দাদরা ও নগর হাভেলি প্রভৃতি অঞ্চলে কোন রেলপথ নাই।

ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে পণ্য পরিবহণের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান, কিন্তু মাল-চলাচলের উপযোগী মালগাড়ীর অভাব, রেলপথে পণ্য চুরি, সময়মত মাল না পৌছান ইত্যাদি কারণে রেলপথের তুলনায় সড়কপথে আন্তরাজ্য পণ্য-চলাচলের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। পেট্রল ও পেট্রলজাত দ্রব্যাদির জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় সত্ত্বেও ভারতের অভ্যন্তরে রেল ও উপকূলীয় পরিবহণের প্রতি আদৌ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে না। অসাধু ব্যবসায়ী চক্রের প্রয়োজনেই যেমন এক দিকে সড়ক পথে পরিবহণ বৃদ্ধি পাইতেছে তেমনি অপর দিকে রেল পরিবহণের উন্নতির পরিবর্তে দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতীয় রেলপথকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ও কি ক ? (২) পূর্ব রেলপথে ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের গুরুত্ব আলোচনা কর।]

ভারতের জলপথ (Waterways of India)—ভারত নদীমাতৃক দেশ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে নদীপথে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য এবং সমুদ্রপথে উপকূলীয় রাজ্যগুলির সহিত ও এমনকি সাগরপারের দেশের সহিত বহির্বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে। ভারতের জলপথকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—আভ্যন্তরীণ জলপথ, উপকূলীয় জলপথ ও সমুদ্রপথ।

আভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland Waterways)—ভারতে নদীপথ ও উহার উপনদী বা শাখা নদীর সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও সুনাব্য নদীপথের অভাব বিশেষভাবে প্রকট। উত্তর ভারতের নদীগুলি গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও ইহাদের উপনদীগুলি বরফগলা জলে পুষ্ট কিন্তু সংস্কারের অভাবে ইহাদের নাব্যতা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী মহানদী, তাপ্তী, নর্মদা বর্ষার জলে পুষ্ট বলিয়া বর্ষাকালে খরস্রোতা এবং অন্য সময়ে প্রায় শুষ্ক। নাব্য জলপথ হিসাবে গোয়ার মাণ্ডবি (Mandovi) এবং জুয়ারি (Zuari) নদীদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নদীর মধ্যে সংযোগকারী কয়েকটি খাল কাটা হইয়াছে। পণ্য ও যাত্রী পরিবহণে এই খালগুলির গুরুত্ব খুবই বেশি। ইহাদের

পশম, চর্ম, চিনি, গম, তৈলবীজ, সিমেন্ট, কৃত্রিম রেশম এবং নানা প্রকার শিল্প দ্রব্য প্রধান। অমৃতসর, লুধিয়ানা, আগ্রা, দিল্লী, কানপুর, যোধপুর প্রভৃতি এই রেলপথের উপর অবস্থিত। (৪) **দক্ষিণ রেলপথ** (Southern Railways)—এই রেলপথ ৭,৪২৫ কি. মি. দীর্ঘ এবং ইহার সদর দপ্তর **মাদ্রাজে** অবস্থিত। তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের কৃষি ও শিল্পাঞ্চল এই রেলপথ দ্বারা মাদ্রাজ ও কোচিন বন্দরের সহিত যুক্ত। ব্যাঙ্গালোরের মেসিন টুলস্, বিমানপোত-শিল্প ও ভদ্রাবতীর লৌহ-ইস্পাত শিল্প, তামিলনাড়ুর কার্পাস ও চিনি শিল্প, আলওয়ের অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প এই রেলপথ দ্বারা পরিসেবিত। চা, কফি, মশলাদ্রব্য, চাল, তামাক, চীনাবাদাম, চামড়া, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ-ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, কার্পাস বস্ত্র ইত্যাদি এই রেলপথে চলাচল করে। (৫) **মধ্য রেলপথ** (Central Railways)—এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ৬,০১৬ কি. মি. এবং ইহার সদর দপ্তর **বোম্বাই** শহরে অবস্থিত। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রের অংশ বিশেষ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর কিয়দংশ এই রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। ঝাঁসি, ভূপাল, উজ্জয়িনী, নাগপুর, পুণে, জব্বলপুর, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি এই রেলপথের উপর অবস্থিত। গম, জোয়ার, বাজরা, কফি, ম্যাঙ্গানীজ, সিমেন্ট, চিনি, কার্পাস বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি এই রেলপথ দ্বারা পরিবাহিত হয়। (৬) **দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ** (South-Eastern Railways)—এই রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৬,৯২৬ কি. মি.। ইহার সদর দপ্তর **কলিকাতা (গার্ডেনরীচ)**। পশ্চিমে নাগপুর ও দক্ষিণে ওয়ালটেয়ার পর্যন্ত এই রেলপথ বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিয়দংশ এই রেলপথ দ্বারা যুক্ত। জামসেদপুর, ভিলাই, রাউরকেল্লার লৌহ-ইস্পাত শিল্প, বিশাখাপত্তনম্ ও মধ্যপ্রদেশের খনিজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ ও শিল্পদ্রব্য ইহার দ্বারা পরিবাহিত হয়। বিশাখাপত্তনম্ ও পারাদীপ বন্দর মারফত আমদানি-রপ্তানি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল। (৭) **উত্তর-পূর্ব রেলপথ** (North-Eastern Railway)—ইহার দৈর্ঘ্য ৪,৯৭৭ কি. মি. এবং ইহার সদর দপ্তর উত্তর প্রদেশের **গোরক্ষপুরে** অবস্থিত। ইক্ষু, তামাক, চিনি, সিমেন্ট চাউল প্রভৃতি ইহার দ্বারা পরিবাহিত হয়। কাটিহার, ছাপরা মজঃফরপুর, বারাণসী প্রভৃতি এই রেলপথ দ্বারা যুক্ত। (৮) **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ** (North-Eastern Frontier Railways)—৩৬২৮ কি. মি. দীর্ঘ এই রেলপথের সদর দপ্তর গৌহাটির নিকট **মালিগাঁওঁ**-এ অবস্থিত। উত্তর বিহার, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এই রেলপথ দ্বারা যুক্ত। আসামের চা, খনিজ তেল কাষ্ঠ প্রভৃতি ইহার দ্বারা পরিবাহিত হয়। (৯) **দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ** (South-Central Railways) দৈর্ঘ্যে ইহা ৬,১৭৫ কি. মি.। ইহার সদর দপ্তর অন্ধ্রপ্রদেশের **সেকেন্দ্রাবাদ**। অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণাংশ, উত্তর-পূর্ব কর্ণাটক, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, গোয়া রাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিম উপকূলে গোয়ার অন্তর্ভুক্ত মার্মাগাঁও ও পূর্ব উপকূলের বিশাখাপত্তনম বন্দর

দুইটি এই রেলপথ দ্বারা যুক্ত। তুলা, তামাক, চীনাবাদাম. কাষ্ঠ, কার্পাসবস্ত্র প্রভৃতি এই রেলপথে চলাচল করে। হায়দ্রাবাদ, মানমদ, বিজয়ওয়াড়া প্রভৃতি এই রেলপথের উপর অবস্থিত।

ভারতের মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরাম, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, সিকিম, দাদরা ও নগর হাভেলি প্রভৃতি অঞ্চলে কোন রেলপথ নাই।

ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে পণ্য পরিবহণের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান, কিন্তু মাল-চলাচলের উপযোগী মালগাড়ীর অভাব, রেলপথে পণ্য চুরি, সময়মত মাল না পৌছান ইত্যাদি কারণে রেলপথের তুলনায় সড়কপথে আন্তরাজ্য পণ্য-চলাচলের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। পেট্রল ও পেট্রলজাত দ্রব্যাদির জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় সত্ত্বেও ভারতের অভ্যন্তরে রেল ও উপকূলীয় পরিবহণের প্রতি আদৌ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে না। অসাধু ব্যবসায়ী চক্রের প্রয়োজনেই যেমন এক দিকে সড়ক পথে পরিবহণ বৃদ্ধি পাইতেছে তেমনি অপর দিকে রেল পরিবহণের উন্নতির পরিবর্তে দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতীয় রেলপথকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ও কি ক ? (২) পূর্ব রেলপথে ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের গুরুত্ব আলোচনা কর।]

ভারতের জলপথ (Waterways of India)—ভারত নদীমাতৃক দেশ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে নদীপথে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য এবং সমুদ্রপথে উপকূলীয় রাজ্যগুলির সহিত ও এমনকি সাগরপারের দেশের সহিত বহির্বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে। ভারতের জলপথকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—আভ্যন্তরীণ জলপথ, উপকূলীয় জলপথ ও সমুদ্রপথ।

আভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland Waterways)—ভারতে নদীপথ ও উহার উপনদী বা শাখা নদীর সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও স্থনাব্য নদীপথের অভাব বিশেষভাবে প্রকট। উত্তর ভারতের নদীগুলি গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও ইহাদের উপনদীগুলি বরফগলা জলে পুষ্ট কিন্তু সংস্কারের অভাবে ইহাদের নাব্যতা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী মহানদী, তাপ্তী, নর্মদা বর্ষার জলে পুষ্ট বলিয়া বর্ষাকালে খরস্রোতা এবং অন্য সময়ে প্রায় শুষ্ক। নাব্য জলপথ হিসাবে গোয়ার মাণ্ডবি (Mandovi) এবং জুয়ারি (Zuari) নদীদ্বয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নদীর মধ্যে সংযোগকারী কয়েকটি খাল কাটা হইয়াছে। পণ্য ও যাত্রী পরিবহণে এই খালগুলির গুরুত্ব খুবই বেশি। ইহাদের

মধ্যে মহানদী খাল, কৃষ্ণা-কাবেরী সংযোগকারী বাকিংহাম খাল, তুঙ্গভদ্রা ও পেন্নার নদী সংযোগকারী কুর্নুল-কুডাপ্পা খাল, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪,১৫০ কি. মি.। আভ্যন্তরীণ জলপথের উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনায় প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

উপকূলীয় জলপথ (Coastal Waterways)—ভারতের উপকূল ভাগের মোট দৈর্ঘ্য ৬,০৮৩ কি. মি.। এই উপকূল ভাগে অবস্থিত বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সমুদ্রপথে পণ্য চলাচল করে। ইহাকে উপকূলীয় বাণিজ্য বলা হয়। পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগরের উপকূলে অবস্থিত বন্দরগুলির মধ্যে পণ্য ও যাত্রী চলাচলে প্রধানত দেশীয় নৌকা ষ্টীমার ও জাহাজ ব্যবহৃত হইত। ১৯৫১ সালের পর হইতে এই উপকূলীয় বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। কিন্তু দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ও সুযোগের তুলনায় উহা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। রেলপথের উপর চাপ কমাইতে ও পরিবহণ ব্যয় নিম্নতম সীমায় রাখিতে উপকূলীয় বাণিজ্যের প্রসার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু রেলপথের মত এই ক্ষেত্রেও সরকারী ভূমিকা বাস্তবানুগ নহে এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী। বর্তমানে উপকূলীয় বাণিজ্যে প্রায় ৭৫% ভারতে তৈয়ারী জাহাজ ব্যবহার করা হয়।

সমুদ্রপথ (Ocean Transport)—স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতের সমুদ্র পথে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নতি ও নতুন বন্দর গঠন ইত্যাদির ফলে ভারতীয় জাহাজ বর্তমানে গভীর সমুদ্র পথে পরিবহণের কার্যে প্রবেশ করিয়াছে। জাহাজের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশাখাপত্তনমে ও কোচিনে বিরাট জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপন করা হইয়াছে। বোম্বাই-এর মাজগাঁও ও কলিকাতায় গার্ডেনরীচ ডকের সম্প্রসারণ করা হইয়াছে ও ছোট জাহাজনির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্বদিকে মালয়েশিয়া, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং পশ্চিমে আরব, পারস্য, আফ্রিকা, পশ্চিমে ইউরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে নিয়মিত সমুদ্রপথে ভারতের জাহাজ চলাচল করে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে মোট জাহাজের সংখ্যা ছিল ৯৪টি এবং ইহাদের মোট বহনক্ষমতা ছিল ৩.৭২ লক্ষ GRT। ১৯৮১-৮২ সালে ভারতের মোট জাহাজ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩০টি এবং ইহাদের বহনক্ষমতা হয় ৫৯.৪১ লক্ষ GRT। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে এ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ৯৬ লক্ষ টন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষেও ঐ সীমায় পৌছান সম্ভব হয় নাই। পূর্বে ভারতে দুইটি সংস্থা Eastern Shipping Corporation এবং Western Shipping Corporation সমুদ্রপথে পূর্বদেশীয় ও পশ্চিমদেশীয় বাণিজ্য পরিচালনা করিত। বর্তমানে এই দুইটি সংস্থাকে যুক্ত করিয়া The Shipping Corporation of India গঠন করা হইয়াছে। এখনও ভারতে বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজ কোম্পনী B. I. S.N. CO. এবং P & O. CO-এর প্রাধান্য পরিলক্ষিত

হয়। ভারতীয় জাহাজ নিম্নলিখিত সমুদ্রপথে নিয়মিত চলাচল করে।—(ক) ভারত-মিশর-যুক্তরাজ্য—অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় বন্দর, (খ) ভারত-জাপান দূরপ্রাচ্য, (গ) ভারত-রেঙ্গুণ-সিঙ্গাপুর, (ঘ) ভারত—পারস্য উপসাগর-কৃষ্ণসাগর—রাশিয়া, (ঙ) ভারত-শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া, (ছ) ভারত-পূর্ব আফ্রিকা, (ছ) ভারত-আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা।

বিমান পথ (Airways)—১৯১১ সালে ভারতে প্রথম বিমান চলাচল শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ভারতে বিমান পরিবহণের অগ্রগতি ঘটে। আভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহণে ১৯৪৭ সালে যাত্রী ও পণ্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে

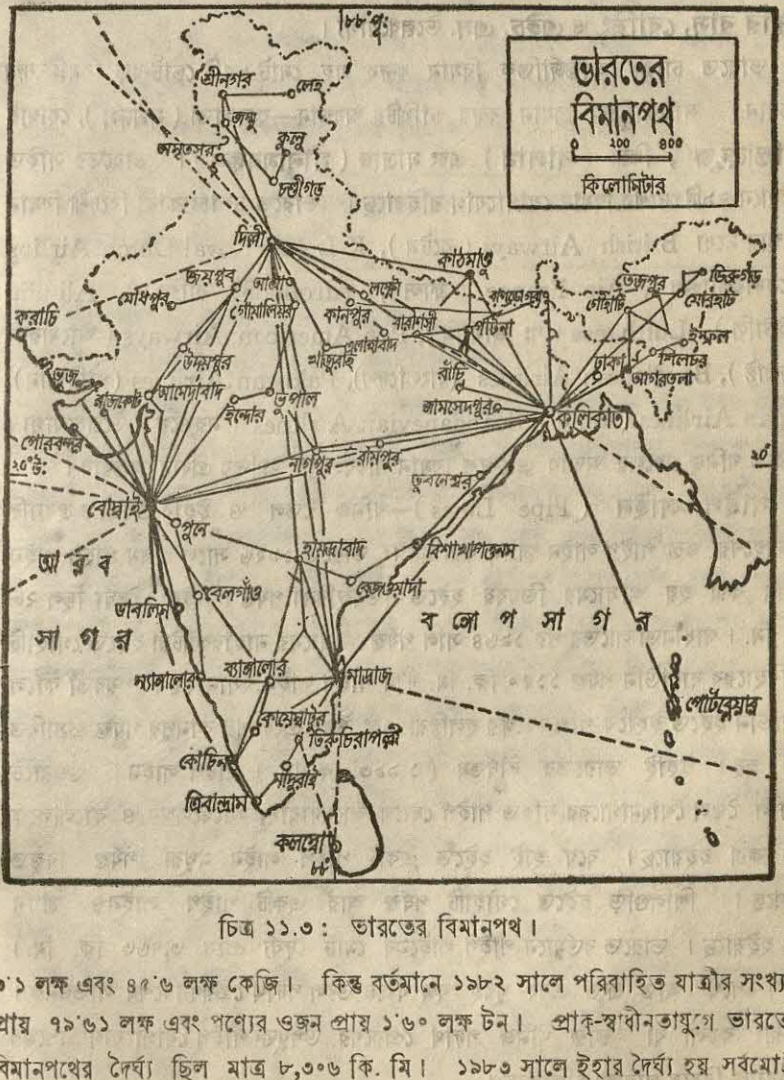

চিত্র ১১.৩ : ভারতের বিমানপথ।

৩·১ লক্ষ এবং ৪৫·৬ লক্ষ কেজি। কিন্তু বর্তমানে ১৯৮২ সালে পরিবাহিত যাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭৯·৬১ লক্ষ এবং পণ্যের ওজন প্রায় ১·৬০ লক্ষ টন। প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে ভারতে বিমানপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৮,৩০৬ কি. মি। ১৯৮৩ সালে ইহার দৈর্ঘ্য হয় সর্বমোট

৮·৪৬ কোটি কি. মি.। ভারতে বিমান পরিবহণের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া ১৯৫৩ সালে বেসামরিক বিমান পথ জাতীয়করণ করা হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের জন্য ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ করপোরেশন (I. A. C) এবং আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের জন্য এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টার ন্যাশনাল (A. I. I) গঠন করা হইয়াছে। সম্প্রতি দেশের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে যাত্রী ও পণ্য চলাচলের জন্য **বায়ুদূত** নামে একটি তৃতীয় সংস্থা গঠন করা হইয়াছে এবং দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে **এয়ার বাস** চলাচল নিয়মিতভাবে শুরু হইয়াছে। ভারতে চলাচলকারী বিমানের মধ্যে **ফকার ফ্রেণ্ডশিপ, এয়ার বাস, বোয়িং ও এইচ. এস.** উল্লেখযোগ্য।

ভারতে চারিটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সহ মোট ৮৫টি ছোট-বড় বিমানবন্দর বর্তমান। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর চারিটির অবস্থান—কলকাতা (দমদম), বোম্বাই (সান্তাক্রুজ), দিল্লী (পালাম) এবং মাদ্রাজ (মীনামবক্কম)। ভারতের সহিত বর্তমানে ২৯টি দেশের বিমান যোগাযোগ রহিয়াছে। ভারতে চলাচলকারী বিদেশী বিমান সংস্থার মধ্যে British Airways (বৃটেন), K L M—Royal Dutch Airlins (নেদারল্যাণ্ডস), Air France (ফ্রান্স), Airoflout (রাশিয়া), Alitalia (ইটালি), Lufthansa (পঃ জার্মানি), Pan American Airways (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র), Bangladesh Airlines (বাংলাদেশ), Pakistan Airlines (পাকিস্তান), Japan Airlines (জাপান), Scandanevian Airlines (নরওয়ে) উল্লেখযোগ্য। ভারতে খনিজ তেলের অভাব এ দেশে বিমান পরিবহণের উন্নতির প্রধান অন্তরায়।

পাইপ লাইন (Pipe Lines)—খনিজ তেল ও ইহার উপজাত দ্রব্যাদি পরিবহণের জন্য পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়। ভারতে ১৯২৬ সালে প্রথম পাইপ লাইন স্থাপন করা হয় আসামের ডিগবয় হইতে তিনসুকিয়া পর্যন্ত। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ২৮ কি. মি.। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত আসামের নাহারকাটিয়া হইতে গৌহাটি ও বিহারের বারাউনি পর্যন্ত ১১৫০ কি. মি. দীর্ঘ পাইপ লাইন বসান হয়। পরবর্তী কালে বারাউনি হইতে ইহাকে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া এবং উত্তর প্রদেশের কানপুর পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়। ইহাই ভারতের দীর্ঘতম (১,৯৯৩ কি. মি.) পাইপ লাইন। গুজরাটে কয়ালি তৈল শোধনাগারের সহিত পাইপ যোগে আমেদাবাদ, আঙ্কেলেশ্বর ও কালোলকে যুক্ত করা হইয়াছে। বম্বে হাই হইতে একটি পাইপ লাইন মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। শিলিগুড়ি হইতে গৌহাটি পর্যন্ত আর একটি পাইপ লাইনও স্থাপন করা হইয়াছে। ভারতে বর্তমানে পাইপ লাইনের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৭৬৩ কি. মি.। পাইপ পথে অতি দ্রুত এবং খুবই কম খরচে তরল পদার্থ প্রেরণ বিশেষ লাভজনক। সুতরাং কয়লা বা অন্যান্য খনিজ পদার্থ প্রেরণের উপযুক্ত পাইপ যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাব্যতা বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে।

রোপওয়ে (Ropeways)—বন্ধুর ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে যানবাহনের উপযুক্ত রাস্তার অভাবে রোপওয়ে স্থাপনই সর্বাধিক সুবিধাজনক। ভারতে মালপরিবহণের নিমিত্ত প্রায় ১০০টি রোপওয়ে আছে। ইহাদের মধ্যে চা বাগিচা ও কয়লা খনি অঞ্চলেই সর্বাধিক রোপওয়ে স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬৬ সালে বিশ্বের দীর্ঘতম (৩০ কি. মি.) ও দ্রুততম রোপওয়ে স্থাপিত হইয়াছে বিহারের ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চলে। ইহার সাহায্যে দামোদর খাত হইতে ঘণ্টায় ১,৩৫০ টন বালি খনি খাদ অঞ্চলে পরিবাহিত হয়। দার্জিলিং-এ ১৯৬৮ সালে একটি ৮ কি. মি. দীর্ঘ নতুন রোপওয়ে স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দার্জিলিং-বিজনবাড়ি-কালিম্পং রোপওয়ে, মেঘালয়ে চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে ছেররা ছাত, দক্ষিণ ভারতের কফি বাগিচার আন্নামালাই রোপওয়ে উল্লেখযোগ্য। রাজগীর ও মুসৌরিতে পর্যটকদের আনন্দদানের জন্য দুইটি সাধারণ রোপওয়ে আছে।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতে সমুদ্র পথের গুরুত্ব কি ? (১) ভারতের উল্লেখযোগ্য সমুদ্র-পথ ও পাইপ লাইনের বিষয় লিখ।]

ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর ও শহর
(Major Ports and Cities of India)

ভারতের উপকূল (৭,১০০ কি. মি.) অভগ্ন হওয়ায় বন্দর গঠনের পক্ষে ইহা তেমন উপযোগী নহে। ১৯৫১ সালে ভারতের পূর্ব উপকূলে তিনটি—কলিকাতা, বিশাখাপত্তনম ও মাদ্রাজ এবং পশ্চিম উপকূলে দুইটি—বোম্বাই ও কোচিন মুখ্য বন্দর ছিল। পরবর্তীকালে পশ্চিম উপকূলে কাণ্ডলা, মার্মাগাও ও নিউ ম্যাঙ্গালোর এবং পূর্ব উপকূলে তুতিকোরিণ ও পারাদীপ যুক্ত হইয়াছে। সাধারণত ৪,০০০ মেট্রিক টনের বেশি বহন ক্ষমতা-যুক্ত জাহাজ যে সকল বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে ঐ সকল বন্দরকে মুখ্য বন্দর বলা হয়। ভারতে বর্তমানে চালু বন্দরের মধ্যে ১০ টি মুখ্য বন্দর, ২১টি মাঝারি বন্দর এবং ১৪০টি ক্ষুদ্র বন্দরের উল্লেখ করা যায়। ইহার কারণ বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে বড় ও মাঝারি বন্দরের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ফলে উহাদের পণ্য পরিচালন ক্ষমতা প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৮১-৮২ সালে উপকূলীয় ও বহির্বাণিজ্যে ৮·৬৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন পণ্য চলাচল করে। ছোট বন্দরের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়ায় উহাদের অবনতি ঘটিয়াছে। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে বন্দরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে ভারতের মুখ্য বন্দরগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

পশ্চিম উপকূলের বন্দর : কাণ্ডলা (Kandla)—গুজরাট রাজ্যে কচ্ছ উপসাগরের তীরে স্বাভাবিক, গভীর ও নিরাপদ পোতাশ্রয় যুক্ত এই বন্দর অবস্থিত। করাচি বন্দর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহার বিকল্প বন্দর হিসাবে ১৯ ৭ সালে কাণ্ডলা বন্দর নির্মাণ করা হয়। গুজরাট, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লী, কাশ্মীর

ও মধ্য প্রদেশের কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি। পশ্চিম ও উত্তর রেলপথ দ্বারা ইহা পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত যুক্ত। সিমেন্ট, লবণ, তূলা ও রাসায়নিক দ্রব্য ইহার প্রধান রপ্তানি পণ্য। ঔষধ, প্রসাধন দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কয়লা, উৎকৃষ্ট তূলা এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করা হয়। পশ্চাদভূমিতে প্রচুর জিপসাম, বক্সাইট ও লিগনাইট পাওয়া যায় বলিয়া অদূর ভবিষ্যতে এখানে একটি শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

বোম্বাই (Bombay)—ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরব সাগরের তীরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বোম্বাই বন্দর অবস্থিত। ইহা মহারাষ্ট্রের রাজধানী, ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ও সর্বপ্রধান বন্দর। এই বন্দর সংলগ্ন পোতাশ্রয় স্বাভাবিক ও উৎকৃষ্ট। এখানে বড় বড় জাহাজের প্রবেশ ও অবস্থান স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ। সালসেট দ্বীপের মাধ্যমে রেল ও সড়কপথে ইহা মূল ভূখণ্ডের সহিত যুক্ত। উত্তর ও পশ্চিম রেলপথের ইহা সদর দপ্তর। কৃষিসমৃদ্ধ সমগ্র মহারাষ্ট্র গুজরাট, রাজস্থান এবং অংশত মধ্যপ্রদেশ কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ ইহার **পশ্চাদ্‌ভূমি**। ভারতের বিখ্যাত কার্পাস শিল্পকেন্দ্র, বোম্বাই-আমেদাবাদ, এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমিতে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত এই বন্দর সন্নিহিত অঞ্চলে ইঞ্জিনিয়ারিং, গুরু রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের বিশেষ সমাবেশ ঘটিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বন্দরগুলি ইহার নিকটতম হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহাকে **ভারতের প্রবেশদ্বার** (Gateway to India) বলা হয়।

চিত্র ১১.৪ : বোম্বাই বন্দর ও উহার সন্নিহিত অঞ্চল।

তূলা, লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, কার্পাস বস্ত্র, চর্ম, তামাক ও নানাবিধ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি এই বন্দর মারফত রপ্তানি হয়। আমদানি পণ্যের মধ্যে খনিজ তেল, খাদ্যশস্য, উৎকৃষ্ট তূলা, ইস্পাত দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও সার প্রভৃতি প্রধান।

মার্মাগাও (Murmagao)—পশ্চিম ভারতে কঙ্কণ উপকূলে আরবসাগরের তীরে গোয়া রাজ্যের জুয়ারী নদীর মোহনায় এই বন্দর অবস্থিত। এই বন্দরের পোতাশ্রয় গভীর ও প্রশস্ত হওয়ায় একই সময়ে বন্দরে প্রায় ৫০ খানা জাহাজ নোঙর

করিতে পারে। গোয়া, মাহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও অন্ধ্ররাজ্য ইহার **পশ্চাদ্‌ভূমির** অন্তর্ভুক্ত। রেল ও সড়কপথে ইহা পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত যুক্ত। লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, কফি তুলা, চিনি, চীনাবাদাম, তৈলবীজ প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে রাসায়নিক সার, খনিজ তেল, যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র উল্লেখযোগ্য।

কোচিন (Cochin)—ভারতের মালাবার উপকূলে আরবসাগরের তীরে কেরালা রাজ্যে অবস্থিত কোচিন একটি **স্বাভাবিক** ও **প্রথম** শ্রেণীর বন্দর। এখানে ভারতের **দ্বিতীয় বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণকেন্দ্র** স্থাপিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রকোপে বন্দরে জাহাজ চলাচলের সাময়িক কিছু অসুবিধা ঘটে। সমগ্র কেরালা ও তামিলনাড়ুর পশ্চিমাংশ এই বন্দরের **পশ্চাদভূমি**। এই বন্দরের মাধ্যমে নারিকেল তেল, শাঁস, দড়ি, চা, কফি, রাবার, মশলা প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং খনিজ তেল, কয়লা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হয়।

পূর্ব উপকূলের বন্দর : মাদ্রাজ (Madras)—ভারতের পূর্ব প্রান্তে করমণ্ডল উপকূলে বঙ্গোপসাগরের তীরে তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থিত মাদ্রাজ ঐ রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান বন্দর। ইহা ভারতের তৃতীয় প্রধান বন্দর। এখানে একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর আছে। ইহার পোতাশ্রয় কৃত্রিম। কৃষিজ সম্পদে সমৃদ্ধ তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণাংশ, কর্ণাটকের পূর্বাংশ ইহার **পশ্চাদ্‌ভূমির** অন্তর্গত। দক্ষিণ ভারতের কার্পাস বয়ন ও শর্করা শিল্প এই বন্দর সন্নিহিত অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বন্দর মারফত কার্পাস বস্ত্র, চা, কফি, তামাক, চর্ম প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং খনিজ তৈল, খাদ্যশস্য, কাগজ, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, মোটরগাড়ি, সাইকেল প্রভৃতি আমদানি করা হয়।

চিত্র ১১.৫ : মাদ্রাজ বন্দর ও সন্নিহিত অঞ্চল।

বিশাখাপত্তনম (Vishakhapattanam)—ভারতের পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত অন্ধ্ররাজ্যের অন্তর্গত এই বন্দর স্বাভাবিক ও গভীর পোতাশ্রয়-যুক্ত। এখানে ভারতের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। অন্ধ্র,

ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ এবং এমনকি বিহার ও উত্তরপ্রদেশও ইহার **পশ্চাদ্‌ভূমির** অন্তর্গত। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা ইহা পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত যুক্ত। আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, কার্পাস, তামাক, তৈলবীজ, কাষ্ঠ প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি পণ্য। আমদানি পণ্যের মধ্যে খনিজ তেল, শিল্পজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রধান।

পারাদ্বীপ (Paradip)—ভারতের পূর্ব প্রান্তে ওড়িশা রাজ্যে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর। ভারত হইতে জাপানে লৌহ আকরিক রপ্তানির জন্যই এই বন্দর বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ইহার নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ইহার উন্নতিকল্পে জাপান সরকারের আর্থিক সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা (Calcutta)—বঙ্গোপসাগরের উপকূলে গঙ্গার মোহনা হইতে প্রায় ১২৮ কি. মি. অভ্যন্তরে নদীর পূর্ব তীরে এই বন্দর অবস্থিত। ইহা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী, ভারতের বৃহত্তম শহর ও দ্বিতীয় প্রধান বন্দর। এই বন্দরসংলগ্ন পোতাশ্রয়টি কৃত্রিম। এক সময় সমগ্র উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারত ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি ছিল। বর্তমানে গঙ্গানদীর মোহনায় চড়া জমিয়া যাওয়ায় বড় জাহাজ আর বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না। ছোট জাহাজ জোয়ারের সময় পাইলটের সাহায্যে বন্দরে প্রবেশ করে। ইহাতে বন্দরের স্বাভাবিক কার্যকলাপ প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। ড্রেজারের সাহায্যে নিয়মিত পলি কাটিয়া কোন প্রকারে বন্দরকে সচল রাখার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার ফলে কলিকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। এই বন্দরের **পশ্চাদভূমি** পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি কৃষি, শিল্প ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং ইহাই ভারতের সর্বাপেক্ষা জনবহুল অঞ্চল। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে এবং উন্নত সড়ক পথে ইহা

চিত্র ১১.৬ : কলিকাতা বন্দর ও উহার সন্নিহিত অঞ্চল।

পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত যুক্ত। এই অঞ্চলে পাট ও কার্পাস বয়ন, লৌহ-ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, মোটরগাড়ি, কাগজ প্রস্তুত, রেলইঞ্জিন নির্মাণ, চিনি ও রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারির নানাবিধ শিল্পের সমাবেশ ঘটিয়াছে। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের চা, পাট, পাটজাত দ্রব্য, বিহারের কয়লা, লৌহ আকরিক, লাক্ষা, অভ্র, ওড়িশার লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ, উত্তরপ্রদেশের চিনি, চর্ম, তৈলবীজ প্রভৃতি এই বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি হয়। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্য, কাগজ, মোটরগাড়ি, খনিজ তেল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতিই প্রধান। কলিকাতা বন্দরের অবনতির ফলে ইহার চাপ হ্রাসের জন্য কলিকাতা হইতে দক্ষিণে গঙ্গা ও হলদি নদীর সঙ্গমে হলদিয়া বন্দর নির্মাণ করা হইয়াছে।

হলদিয়া (Haldia)—কলিকাতা বন্দরের অবনতি ঘটার ফলে ইহার বিকল্প বন্দর হিসাবে এই বন্দর নির্মিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ৯০ কি. মি. দক্ষিণে গঙ্গা ও হলদি নদীর মিলনস্থলে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জিলায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই বন্দর নির্মিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইহার **পশ্চাদ্‌ভূমি**। এখানে একটি তৈল শোধনাগার স্থাপনের জন্য ইহাকে নাহারকাটিয়া-বারৌণী প্রধান তৈলবাহী পাইপলাইনের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। এখানে একটি সার কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। একটি পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশা করা যায় এখানে একটি জাহাজ নির্মাণ-কেন্দ্রও স্থাপিত হইবে।

তুতিকোরিণ (Tuticorin)—ভারতের পূর্ব উপকূলে তামিলনাড়ু রাজ্যের দক্ষিণাংশে এই বন্দর অবস্থিত। ইহার পোতাশ্রয় অগভীর। শ্রীলংকার সহিত ভারতের বাণিজ্য প্রধানত এই বন্দরের মাধ্যমে হয়। ১৯৭৪ সালে ইহাকে মুখ্য বন্দর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। তামিলনাড়ু, কেরালা ও কর্ণাটকের দক্ষিণাংশ লইয়া ইহার **পশ্চাদভূমি গঠিত**। এই বন্দর মারফত তুলা, চা, লঙ্কা, এলাচ, কার্পাস-দ্রব্য, কার্পেট ইত্যাদি রপ্তানি করা হয়।

উপরি-উক্ত প্রধান বন্দর ব্যতীত নিম্নলিখিত অপ্রধান বা গৌণ বন্দরগুলি, বিশেষ উল্লেখযোগ্য—**গুজরাট রাজ্যে** ওখা, পোরবন্দর, ভেরাবল, সুরাট ; **কেরালা রাজ্যে** কোঝিকোড, আলেপ্পি, কুইলন ; **তামিলনাড়ু রাজ্যে** নেগাপত্তম, কারিকল এবং **অন্ধ্ররাজ্যে** মছলিপত্তম। এই সকল বন্দর উপকূলীয় বাণিজ্যেই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

[**প্রশ্ন** : নিম্নলিখিত বন্দরগুলি পশ্চাদ্‌ভূমি সহ আলোচনা কর—বোম্বাই, কলিকাতা, কোচিন, হলদিয়া, মার্মাগাও, কাণ্ডলা।]

বাণিজ্যকেন্দ্র (Trade Centres)—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে যেমন বন্দরগুলির বিকাশ ঘটিয়াছে তেমনি দেশের অভ্যন্তরে বহু শহরও শিল্প-বাণিজ্যের পীঠস্থান হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। নিম্নে ভারতের প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল :

অন্ধ্রপ্রদেশ (Andhra Pradesh): **হায়দরাবাদ** (Hydrabad)—অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী ও প্রধান শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে সিগারেট, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ঔষধ তৈয়ারি ও খাদ্য প্রস্তুতকারী শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। ইহার নিকটবর্তী সেকেন্দ্রাবাদে দক্ষিণ-মধ্য রেলপথের সদর কার্যালয় অবস্থিত। এখানে নানাধরনের কুটীর-শিল্প প্রসারলাভ করিয়াছে।

আসাম (Assam): **গুয়াহাটি** (Gouhati)—ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত গুয়াহাটি আসামের সর্ববৃহৎ শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। নদীপথে ইহা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতার সহিত যুক্ত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আসামের চা, কাষ্ঠ, এণ্ডি, মুগা, কমলালেবু প্রভৃতি এই শহর মারফত বিভিন্ন রাজ্যে চালান যায় এবং অন্যান্য রাজ্য হইতে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য এই শহরের মাধ্যমেই আমদানি করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথে ইহা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত যুক্ত। গুয়াহাটি অদূরে নূনমাটিতে ভারতের অন্যতম বৃহৎ খনিজ তেল শোধনাগার আছে এবং মালিগাঁও নামক স্থানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের সদর দপ্তর আছে।

দিস্‌পুর (Dispur)—গুয়াহাটি বা গৌহাটির নিকটে অবস্থিত এখানে আসামের নূতন রাজধানী গড়িয়া উঠিতেছে।

ডিগবয় (Digboi)—আসামের লখিমপুর জিলায় অবস্থিত। ভারতের খনিজ তেল উত্তোলনের ইতিহাসে ডিগবয় প্রথম আবিষ্কৃত তৈলকেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত। এখানে তেল শোধনাগারও আছে।

ডিব্রুগড় (Dibrugarh)—ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত নদীবন্দর। ইহা আসামের অন্যতম প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার মাধ্যমে চা, পাট, কাষ্ঠ, খনিজ তেল রপ্তানি করা হয়।

উত্তরপ্রদেশ (Uttar Pradesh): **লক্ষ্ণৌ** (Lucknow)—গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত লক্ষ্ণৌ উত্তরপ্রদেশের রাজধানী ও প্রধান শহর। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় এই শহরেই অবস্থিত। এই শহর সোনা, রূপা, হাতীর দাঁত ও কাষ্ঠের নানা প্রকার কারুশিল্প এবং কার্পাস-বস্ত্র, জরি, জর্জেট, আতর ও নকশাদার কাজের জন্য বিখ্যাত। অতি প্রাচীন শহর হিসাবে ইহার নানা ঐতিহাসিক নিদর্শন বহু ভ্রমণকারীকে আকৃষ্ট করে।

এলাহাবাদ (Allahabad)—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত

এলাহাবাদ হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র তীর্থস্থান। ইহাকে প্রয়াগও বলা হয়। এখানে উত্তরপ্রদেশের হাইকোর্ট ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। এখানে চিনি, ময়দা, কাঁচ, টর্চলাইট ও ব্যাটারী শিল্প আছে। ইহার নিকটে নৈনিতে একটি আধুনিক শিল্প নগরী গড়িয়া উঠিতেছে। নিকটবর্তী কৃষি অঞ্চলের জোয়ার, বাজরা, তামাক আখ প্রভৃতি এই শহর মারফত অন্যত্র প্রেরিত হয় বলিয়া এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

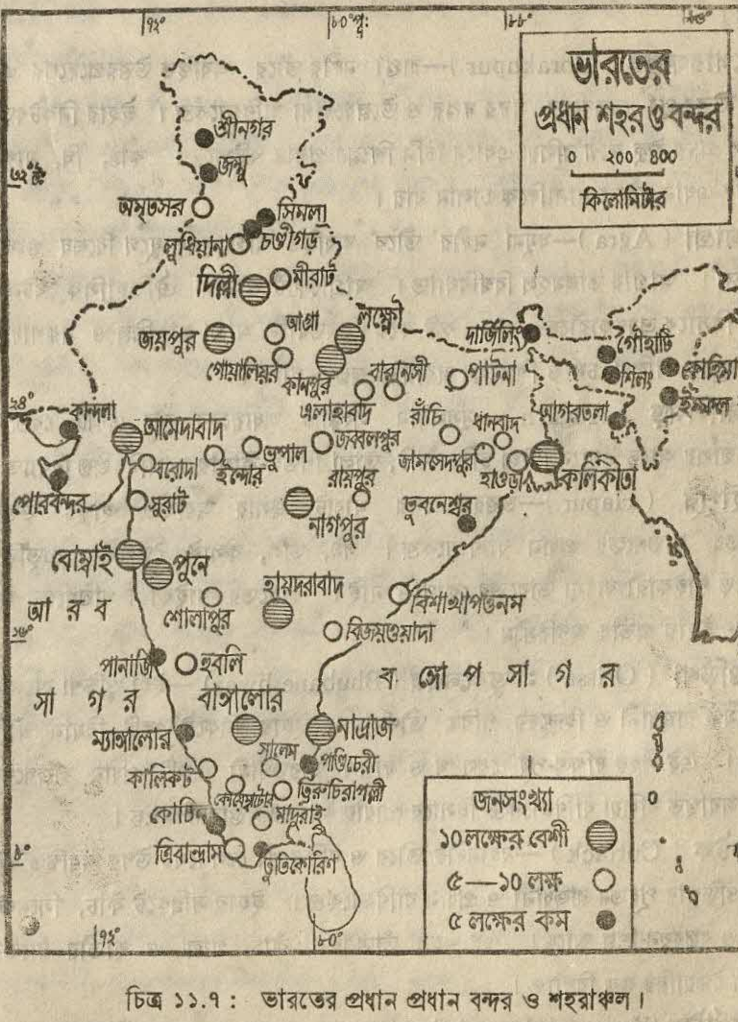

চিত্র ১১.৭ : ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর ও শহরাঞ্চল।

বারাণসী (Varanasi)—গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহার নিকটবর্তী সারনাথ বিখ্যাত

বৌদ্ধতীর্থ। এখানে চিনি, ময়দা ও সরিষার তেলনিষ্কাশনের শিল্প আছে। বারাণসীর তাঁতবস্ত্র বেনারসী বিখ্যাত। গালা, কাঁচ ও সোনা-রূপার অলঙ্কার, জর্দা এবং পিতল-কাঁসার দ্রব্যের জন্যও কাশী বা বারাণসীর বিখ্যাত। এখানে একটি ডিজেল ইঞ্জিনের কারখানা আছে।

কানপুর (Kanpur)—গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত কানপুর উত্তরপ্রদেশের সর্বপ্রধান শিল্পকেন্দ্র। এখানে চর্ম, পশম, কার্পাস, চিনি ও ভোজ্য তেলশিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব রেলপথের মিলনস্থল এই শহরে একটি সেনানিবাস আছে।

গোরক্ষপুর (Gorakhpur)—রাপ্তী নদীর তীরে অবস্থিত উত্তরপ্রদেশের এই শহর উত্তর-পূর্ব রেলপথের সদর দপ্তর ও উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রচুর ইক্ষু জন্মে বলিয়া এখানে চিনি শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। কাষ্ঠ, ঘি, মাখন ইত্যাদি এখান হইতে নানাদিকে চালান যায়।

আগ্রা (Agra)—যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত আগ্রা মুগল যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আগ্রার তাজমহল বিশ্ববিখ্যাত। আগ্রাফোর্ট ও নানা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হিসাবে ভ্রমণকারীদের আগ্রহ সৃষ্টি করে। বর্তমানে আগ্রা কারুশিল্প ও নকশাদার কাজ, জুতা, গালিচা, চর্ম ও পিতলের দ্রব্যাদির জন্য বিখ্যাত।

আলিগড় (Aligarh)—মুসলমান সংস্কৃতি অধ্যয়নের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে এখানে। ইহা ছুরি, কাঁচি, তালা, পিতল-কাঁসার দ্রব্যাদির জন্য বিখ্যাত।

হাপুর (Hapur)—উত্তরপ্রদেশের মীরাট জিলায় অবস্থিত হাপুর উত্তর ভারতের খাদ্যশস্যের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। গম, ডাল, কলাই, তৈলবীজ প্রভৃতির এত বড় পাইকারী ব্যবসা ভারতের কোথাও নাই। ভারতের পাইকারী খাদ্যশস্যের দর নিয়ন্ত্রণে ইহার প্রভাব অপরিসীম।

ওড়িশা (Orissa) : **ভুবনেশ্বর** (Bhubaneshwar) —ইহা ওড়িশা রাজ্যের নবনির্মিত রাজধানী ও হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। ইহার নিকটে একটি বিমান ঘাঁটি আছে। এই শহর দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ও দক্ষিণ ভারতগামী একটি প্রধান রাজপথের উপর অবস্থিত বলিয়া বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে প্রাধান্য লাভের সম্ভাবনা আছে।

কটক (Cuttack) —মহানদীর তীরে ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত এই শহর ওড়িশার পূর্বতন রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার সন্নিকটে কাঁচ, সিমেন্ট, টিউব ও বস্ত্রবয়ন-শিল্প আছে। এই শহর তাঁত-শিল্প, কাঁচ, গালা ও হাতীর দাঁতের জিনিস তৈয়ারির জন্য বিখ্যাত।

কর্ণাটক (Karnatak) : **ব্যাঙ্গালোর** (Bangalore)—সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯১৫ মিটার উচ্চে অবস্থিত এই শহর কর্ণাটকের রাজধানী ও প্রধান শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র।

বিমানপোত, টেলিফোন, ইলেকট্রনিক্স, রেশম, পশম, চর্ম, বৈদ্যুতিক বাতি, মেসিনটুল ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পের সমাবেশে সমৃদ্ধ। এখানের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন হওয়ায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশেষ সুবিধা হয়। এখানে প্রচুর ভ্রমণকারীর আগমন ঘটে বলিয়া হোটেল ব্যবসা বিশেষ লাভজনক।

মহীশূর (Mysore)—কর্ণাটকের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ইহা একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর। এই স্থানের রেশম, হাতীর দাঁত, হাড়, চন্দন কাষ্ঠ, প্রভৃতির সাহায্যে প্রস্তুত কারুশিল্প দ্রব্য বিখ্যাত। বৃন্দাবন গার্ডেনস-এর অপূর্ব সৌন্দর্য প্রচুর ভ্রমণকারীকে আকৃষ্ট করে। ফলে ইহা একাধারে পর্যটনকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

কেরালা (Kerala) : **ত্রিবান্দ্রম** (Trivandrum)—ইহা কেরালা রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই শহরে নারিকেল দড়ি, কাজুবাদাম, হাতীর দাঁত ও হাড়ের জিনিস তৈয়ারির কুটীর শিল্প খুবই উন্নত। ইহা ব্যতীত এখানে কার্পাস বয়ন-শিল্প ও সিমেণ্ট শিল্প আছে।

গুজরাট (Gujrat) : **আমেদাবাদ** (Ahmedabad)—গুজরাটে সবরমতী নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর এই রাজ্যের প্রধান শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র এবং পূর্বতন রাজধানী। ইহা ভারতের বৃহত্তম কার্পাস শিল্পকেন্দ্র। কার্পাস ব্যতীত এখানে কাগজ, চর্ম, রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি তৈয়ারির শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

গান্ধীনগর (Gandhinagar)—আমেদাবাদের নিকটে অবস্থিত ইহা গুজরাট রাজ্যের নূতন রাজধানী।

জম্মু ও কাশ্মীর (Jammu & Kashmir) : **শ্রীনগর** (Srinagar)—হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত পীরপাঞ্জাল পাহাড় ঘেরা কাশ্মীর উপত্যকায় ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত শ্রীনগর জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী। তুষারমৌলি হিমালয়ের প্রেক্ষাপটে এখানকার হ্রদ, বরফাবৃত উপত্যকা, সরল বৃক্ষরাজি ও ফুলের সমারোহ অতুলনীয় নিসর্গশোভা সৃষ্টি করিয়াছে। এইজন্য ইহাকে ভূ-স্বর্গ বলা হয়। বিশ্বের সৌন্দর্য-পিপাসু ভ্রমণকারীদের ইহা যুগ যুগ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে। এখানে পশম, রেশম ও কাষ্ঠ খোদাই-এর কুটীর শিল্প বিশেষ উন্নত। পশমের কাশ্মীরী শাল বিখ্যাত। এখানে হোটেল ব্যবসাও খুবই সমৃদ্ধ।

তামিলনাড়ু (Tamilnadu) : **মাদুরাই** (Madurai)—ইহা তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থিত ধর্মীয় শহর ও শিল্পকেন্দ্র। এই স্থানের মীনাক্ষী দেবীর মন্দির বিখ্যাত। কার্পাস ও রেশম শিল্পের ইহা অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

কোয়েম্বাটুর (Coimbatore)—ইহা তামিলনাড়ুর অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ বস্ত্রশিল্প কেন্দ্র। ইহা চীনাবাদাম, তুলা, সুপারি প্রভৃতির ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত।

ইহার নিকটে পেরাম্বুরে রেলগাড়ীর কামরা নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। পাইকারা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ সহজলভ্য হওয়ায় এখানে শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে।

ত্রিপুরা (Tripura) : **আগরতলা** (Agartala)—ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ইহা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র। স্থানীয় চা, পাট, আনারস, কমলালেবু প্রভৃতি এই কেন্দ্র হইতে রপ্তানি হয়। আসাম ব্যতীত ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সহিত সরাসরি যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম বিমান। এখানে একটি কাগজের কল স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। পরীক্ষামূলকভাবে এখানে রাবার চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দিল্লী (Delhi) : **দিল্লী** (Delhi)—যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত দিল্লী কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল। ইহা ভারতের রাজধানী, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও উত্তর ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। রেল ও সড়কপথে ইহা ভারতের সকল অঞ্চলের সহিত যুক্ত। উত্তর রেলপথের ইহা সদর দপ্তর। রাজধানীর সন্নিহিত অঞ্চলে বস্ত্র-বয়ন, হোসিয়ারি, চর্ম, রাবার, বনস্পতি, মদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি শিল্পের বিশেষ সমাবেশ ঘটিয়াছে। সোনা, রূপা, তামা, পিতল, হাতীর দাঁত প্রভৃতি কারুশিল্প এখানে বিশেষ উন্নত। পুরাতন দিল্লী অঞ্চল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং নয়াদিল্লী অঞ্চল পরিকল্পিত শহর ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু।

চিত্র ১১.৮ : দিল্লী ও উহার সন্নিহিত অঞ্চল।

পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal) : **আসানসোল** (Asansol)—ইহা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জিলায় বিহার সীমান্তে অবস্থিত কয়লাখনি ও নানা শিল্পসমৃদ্ধ শহর। পূর্ব রেলপথ ও গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ইহাকে শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছে। ইহার উপকণ্ঠে বার্ণপুর—কুলটির লৌহ-ইস্পাত শিল্প, অম্বুপনগরের অ্যালুমিনিয়াম শিল্প, স্থানীয় সাইকেল, মদ্য, ইঞ্জিনীয়ারিং, মৃৎ শিল্প ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব রেলপথের ইহা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং সীমান্ত শহর বলিয়া আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র।

চিত্তরঞ্জন (Chittaranjan)—পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান জিলায় বিহার সীমান্তে অবস্থিত এই নগরী রেলইঞ্জিন নির্মাণ শিল্পের জন্য বিখ্যাত। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লা জামশেদপুর-বার্ণপুর লৌহ-ইস্পাত, দামোদরের জলবিদ্যুৎ ইত্যাদির অপূর্ব যোগাযোগ এককালের অখ্যাত অজ্ঞাত ও অবহেলিত এই প্রান্তরকে আধুনিক শিল্পনগরীর মর্যাদা দিয়াছে। ইহার নিকটবর্তী রূপনারায়ণপুরে টেলিফোনের তার তৈয়ারির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

দুর্গাপুর (Durgapur)—পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান জিলায় রাণীগঞ্জ-আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চলের সন্নিকটে দুর্গাপুর অবস্থিত। ইহা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এখানে লৌহ-ইস্পাত শিল্প, কোকচুল্লী, অ্যালয়-ইস্পাত ও অন্যান্য নানাবিধ ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য সার, গ্যাস প্রভৃতি উৎপাদনের শিল্প-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কয়লা খনি সন্নিহিত এই অঞ্চলে লৌহ-ইস্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং, রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্পের অপূর্ব সমাবেশ ঘটায় ইহাকে পশ্চিম জার্মানীর রূঢ় অঞ্চলের সহিত তুলনা করা হয় (Durgapure is the Ruhr of India)। পূর্ব রেলপথ, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে যোগে ইহা কলিকাতা বন্দরের সহিত যুক্ত।

শিলিগুড়ি (Siliguri)—ইহা পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জিলায় অবস্থিত, উত্তরবঙ্গের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সহিত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্যান্য রাজ্যের যোগাযোগ এই শহরের মাধ্যমেই প্রধানত হইয়া থাকে। দার্জিলিং-এর চা, কমলালেবু, কাষ্ঠ ও অন্যান্য সামগ্রী এই কেন্দ্র মারফত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত হয়। ফারাক্কা বাঁধ নির্মিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে ইহার গুরুত্ব প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার নিকটবর্তী নিউজলপাইগুড়ি একটি বিরাট রেলজংশন।

হাওড়া (Howrah)—পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত হওড়া পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। পাট, কার্পাস, লৌহ ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্পের জন্য এই শহর বিখ্যাত। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য প্রস্তুতের অসংখ্য ছোট-বড় কারখানা এই শহরের সর্বত্রই দেখা যায়। এই কারণে ইহাকে বাংলার শেফিল্ড (Sheffieid of Bengal) বলা হয়। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ইহা প্রধান কেন্দ্র। কাষ্ঠ, মৎস্য, ডাল, তাঁত বস্ত্র প্রভৃতির পাইকারী ব্যবসা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম হাট 'হাওড়া হাট' বা 'মঙ্গলা হাট' এই শহরে অবস্থিত। এখানে তাঁত বস্ত্র, তৈয়ারি পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির পাইকারী ক্রয়-বিক্রয় হয়।

পাঞ্জাব (The Punjub): **অমৃতসর** (Amritsar)—পূর্ব-পাঞ্জাবে অবস্থিত অমৃতসর শিখদের তীর্থস্থান ও স্বর্ণমন্দিরের জন্য যেমন খ্যাত তেমনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবেও উল্লেখযোগ্য। এখানে কার্পাস, রেশম,

পশম, চর্ম, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি শিল্প বিশেষ উন্নত। উত্তর রেলপথের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত এই শহর জম্মু ও কাশ্মীরের সামগ্রিক বাণিজ্যই এই শহরের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া থাকে।

লুধিয়ানা (Ludhiana)—পাঞ্জাবে উত্তর রেলপথের উপর অবস্থিত লুধিয়ানা পশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। পশম ব্যতীত এখানে কার্পাস শিল্পও আছে। কার্পাস বস্ত্র, পশম, পশমী বস্ত্র ও কাশ্মীরী শালের ইহা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্র।

বিহার (Bihar): **পাটনা** (Patna)—গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত পাটনা বিহারের রাজধানী ও উল্লেখযোগ্য ব্যবসায় কেন্দ্র। পাটনার চাউল ও লঙ্কা বিখ্যাত। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহা একটি রেল-জংশন এবং চিনি শিল্প কেন্দ্র।

রাঁচি (Ranchi)—বিহারে অবস্থিত রাঁচি এই রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ও স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস। এখানে লাক্ষা ও রেশম সম্বন্ধীয় গবেষণাগার আছে। ইহা কাষ্ঠ ও লাক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্র। এখানে হাটিয়াতে সরকারী উদ্যোগে একটি ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প স্থাপিত হইয়াছে। রাঁচির নিকটবর্তী হুড্রু ও গৌতমধারা জলপ্রপাত, নেতার হাট প্রভৃতি মনোরম দ্রষ্টব্য বিষয় বহু পর্যটনকারীকে আকর্ষণ করে। হাজারিবাগের অভ্রখনিও ন্যাশনাল ফরেষ্ট ইহার নিকট অবস্থিত।

ডালমিয়া নগর (Dalmianagar)—শোণ নদীর তীরে অবস্থিত ইহা বিহারের বিশেষ উন্নতিশীল শিল্পকেন্দ্র। এখানে কাগজ, সিমেন্ট, চিনি প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য।

সিন্ধ্রি (Sindhri)—বিহারে দামোদর উপকূলে অবস্থিত এই শহর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র। এখানে ভারতের তথা এশিয়ার বৃহত্তম সার তৈয়ারির কারখানা আছে। ইহার নিকটে একটি সিমেণ্ট তৈয়ারির কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ—(Madhya Pradesh) : **জব্বলপুর** (Jabbalpur)—মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত জব্বলপুর একটি শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে সিমেন্ট, কার্পাস, কাচ, পিতল-কাঁসা ও গোলাবারুদের কারখানা আছে। জব্বলপুরের নিকট মার্বেল পাহাড় আছে এবং ঐ পাহাড় হইতে নর্মদা নদী নিম্নে অবতরণের সময় একটি সুন্দর জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। এই মনোরম দৃশ্য প্রচুর ভ্রমণকারীকে আকর্ষণ করে।

ভূপাল (Bhopal)—ইহা মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ও ব্যবসায় কেন্দ্র। সম্প্রতি ইহার সন্নিকটে পিল্লানি নামক স্থানে ভারতের বৃহত্তম ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এখানেও আধুনিক শিল্প স্থাপনের প্রয়াস চলিতেছে। এখানে আমেরিকার ইউনিয়ন কারবাইড কোম্পানি পরিচালিত কারখানায় ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মিক' গ্যাস নিঃসৃত হইয়া প্রায় ৩,৫০০ লোক মারা যায় এবং হাজার

হাজার লোক অক্ষম ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দুর্ঘটনা (Bhopal Gasl Eak Tragedy) দেশে বিপজ্জনক গ্যাস ও দ্রব্যাদির কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা সম্পর্কে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতির অবতারণা করিয়াছে।

নেপানগর (Nepanagar)—মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত নেপানগর ভারতের সর্বপ্রধান নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন কেন্দ্র। ঘাস, বাঁশ ও নরম কাষ্ঠের মণ্ড হইতে এই কাগজ তৈয়ারি করা হয়।

মহারাষ্ট্র (Maharastra) : **নাগপুর** (Nagpur)—ভারতের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মহারাষ্ট্রের এই শহর উল্লেখযোগ্য শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। ইহা ভারতের প্রধান শহর, দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতির সহিত রেল, বিমান ও সড়কপথে যুক্ত। এখানে কাঁচ, কার্পাস, কাগজ, মৃৎশিল্প প্রভৃতি প্রসার লাভ করিয়াছে। এই অঞ্চলের কাষ্ঠ, কাগজ, কমলালেবু, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি এই শহর মারফত অন্যান্য রাজ্যে চালান যায়।

পুণে (Poona)—মহারাষ্ট্রের এই শহর পশ্চিমঘাট পর্বতের প্রায় ৫৭০ মিটার উচ্চে অবস্থিত। ইহা মারাঠা সংস্কৃতির অতি প্রাচীন পীঠস্থান এবং আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণকেন্দ্র। এখানে বস্ত্র বয়ন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ঔষধ ও কাগজ তৈয়ারি ইত্যাদি নানা ধরনের শিল্প আছে। এখানে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সেনানিবাস আছে।

মণিপুর (Manipur) : **ইম্ফল** (Imphal)—ইহা মণিপুরের রাজধানী। কুটীর শিল্পের জন্য ইহা বিখ্যাত। নানাপ্রকার নকশাদার সূতীবস্ত্র, রেশমীবস্ত্র ও হাতির দাঁতের জিনিস এই শহরে তৈয়ারি হয়।

রাজস্থান (Rajastan) : **জয়পুর** (Jaipur)—ইহা রাজস্থানের রাজধানী ও প্রধান শিল্প বাণিজ্যকেন্দ্র। এই স্থানের চীনামাটি, পিতল ও মার্বেল পাথরের কারুকার্য-খচিত দ্রব্যাদি বিখ্যাত। ইহার নিকটেই অভ্রের খনি আছে। এখানে একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে।

যোধপুর (Jobhpur)—রাজস্থানে অবস্থিত যোধপুর শহর লবণ ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে রেলের মেরামতী কারখানা, কার্পাস ও পশম শিল্প আছে। ইহার নিকটে জিপসামের খনি আছে।

[**প্রশ্ন** : নিম্নলিখিত বাণিজ্যকেন্দ্রের অবস্থান ও গুরুত্ব বর্ণনা কর :—অমৃতসর, দিল্লী, শ্রীনগর, আমেদাবাদ, চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর, কোয়েম্বাটুর. জয়পুর, ব্যাঙ্গালোর, এলাহাবাদ, বারানসী, ডিগবয়।]

অনুশীলনী

১। ভারতীয় অর্থনীতিতে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা কর। ভারতে কয়টি রেল অঞ্চল আছে ? রেল অঞ্চলগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Discuss the importance of Tranport and Communication in Indian economy. How many railway zones are in India ? Describe in brief the railway zones.]

২। ভারতে রেলপথ অঞ্চলগুলি কি কি ? এই অঞ্চলগুলির মধ্যে যে কোন একটির বিবরণ দাও ও তৎ প্রসঙ্গে ঐ অঞ্চলের অর্থ নৈতিক উন্নতির উপর এই রেলপথের প্রভাব বর্ণনা কর।

[What are the railway zones in India ? Describe any one of those zones with special reference to the part played by railway, in the economic development of the region.]

[Specimen Question of H. S. C. 1980.]

৩। ভারতের বিভিন্ন রেলপথ অঞ্চলের বিবরণ দাও।

[Describe the various railway zones of India.]

[Specimen Question of H. S. C. 1980]

৪। ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথের গুরুত্ব উল্লেখ কর। সাম্প্রতিককালে ভারতে উপকূলীয় বাণিজ্যের প্রসার ঘটিবার কারণ উল্লেখ কর।

[Point out the importance of internal water ways of India. Mention the causes of expansion of costal trade in India in recent times.]

৫। ভারতে বন্দর ও পোতাশ্রয় গঠনের উপযোগী অবস্থা কোথায় কোথায় দেখা যায় ? ভারতের প্রধান তিনটি বন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। পশ্চাদ্‌ভূমি বলিতে কি বুঝায় ?

[Where do the conditions favourable for the development of Ports and Harbours exist in India ? Give an account of the major ports of India. What is meant by Hinterland ?]

৬। ভারতের নিম্নলিখিত বন্দরগুলির অবস্থান, উন্নতি ও পশ্চাদ্‌ভূমি আলোচনা কর এবং এই সকল বন্দরের মারফত সংগঠিত বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—

(ক) কলিকাতা, (খ বোম্বাই, (গ) কাণ্ডলা, (ঘ) বিশাখাপত্তনম, (ঙ) মাদ্রাজ, (চ) কোচিন, (ছ) হলদিয়া, (জ) মার্মাগাঁও।

[Discuss the location, development and hinterlands of the following ports of India and also give a brief account of the export and imports passing through those ports :—

(a) Calcutta, (b) Bombay, (c) Kandla, (d) Vishakhapattanam (e) Madras, (f) Cochin, (g) Haldia, (h) Murmagaon.

৭। ভারতে প্রধান ও অপ্রধান বন্দর বলিতে কি বুঝ ? উপযুক্ত উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

[What do you mean by major and minor ports of India ? Illustrate your answer with suitable examples.]

[Specimen Questions of H. S. C.]

৮। ভারতের প্রধান বন্দর কি কি ? যে কোন একটি প্রধান বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি ও বাণিজ্যের ধরন বর্ণনা কর।

[What are the major ports of India ? Describe the hinterland and pattern of trade of any one of the major ports of India.]

[Specimen Question of H. S. C. 1980.]

৯। কলিকাতা বন্দরের অবস্থান ও উন্নতিতে যে সকল ভৌগোলিক অবস্থার অবদান রহিয়াছে তাহা বর্ণনা কর। এই বন্দরের নৌ-পরিবহণের অসুবিধাসমূহ কি কি এবং কিভাবে উহার সমাধান করা যায় ?

[Analyse the geographical conditions that have contributed to the location and development of the port of Calcutta. What are the navigational difficulties facing the port and how can they be remedied ?]

১০। ভারতের প্রধান বন্দরগুলির পশ্চাদ্‌ভূমি ও বাণিজ্যের ধরন বর্ণনা কর।

[Describe the hinterland and the pattern of trade of the major ports of India.] [Specimen Question of H. S. C.]

১১। (ক) কাথিয়াওড়ার ও কচ্ছ উপকূলের যে কোন দুইটি বন্দরের নাম লিখ। (খ) পশ্চাদ্‌ভূমির গুরুত্ব আলোচনা কর। (গ) কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দরের গঠন প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা কর।

[Give the name of any two ports of Kathiawar-Kutch coast. (b) Explain the importance of hinterland. (c) Make a comparative assessment of the development of Calcutta, Madras and Bombay Ports.] [Tripura H. S. Exam. 1979)

(ক) করমণ্ডল উপকূলের দুইটি বন্দরের নাম লিখ। (খ) কলিকাতা বন্দরের প্রধান সমস্যাগুলি উল্লেখ কর। (গ) ভারতের আন্তর্দেশিক স্থলপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(a) Give the names of any two ports of Corromondal Coast. (b) Describe the principal problems of Calcutta Port (c) Give a brief account of inland waterways of India.]
[Tripura H. S. Exam. 1979]

১৩। ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখ কর ও নিম্নলিখিত শহরসমূহের গুরুত্ব বর্ণনা কর—
দুর্গাপুর, ব্যাঙ্গালোর, ডিগবয়, কানপুর, শ্রীনগর, অমৃতসর, নাগপুর, জামশেদপুর, ভিলাই, মাদুরাই, বারাণসী, ভুপাল, গৌহাটি, রাউরকেল্লা, চিত্তরঞ্জন, আমেদাবাদ, রাঁচি, এলাহাবাদ, দিল্লী, পুনে, বারাউনি, বিকানীর, চণ্ডীগড়, ত্রিবান্দ্রাম।

[Point out the geographical location and also describe the importance of the following cities :—

Durgapur, Bangalore, Digboi, Kanpur, Srinagar, Amritsar. Nagpur, Jamshedpur, Bhilai. Madurai, Benaras, Bhopal, Gauhati, Rourkella, Chittaranjan, Ahmedabad, Ranchi, Allahabad, Delhi, Puri, Barauni, Bikanir, Chandigarh, Trivandrum.]

১৪। ভারতের তিনটি প্রধান বন্দরের নাম উল্লেখ করিয়া ইহাদের (ক) অবস্থান, (খ) রপ্তানি ও (গ) আমদানি বিষয়ে আলোচনা কর।

[Mention the names of three important ports of India and describe their (a) location (b) exports and (c) imports.]
[W. B. H. S. C. Exam. 1983]

১২ | ভারতে শ্রম শিল্প
(Manufacturing Industries in India)

আধুনিক যুগকে শিল্পযুগ বলা হয়। এই যুগে শ্রমশিল্পের উন্নতি ব্যতিরেকে কোন দেশেরই উন্নতি সম্ভব নহে। ভারতে শ্রমশিল্পের ভিত্তি বিভিন্ন কাঁচামাল ও শক্তি-সম্পদের প্রাচুর্য অনেক দেশেরই ঈর্ষার সঞ্চার করে। কিন্তু এই দেশ দীর্ঘকাল বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের নাগপাশে আবদ্ধ থাকায় শ্রমশিল্পের প্রয়োজনীয় প্রসার ঘটে নাই। বৃটিশ প্রভুদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে একদিকে যেমন দেশের কুটীরশিল্পগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হইল অপরদিকে তেমনি এই দেশের বাজারে বৃটিশ শিল্পপণ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিল। ১৮৫৪ সালে ভারতে রেলপথ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর হইতে বৃটিশ মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজনে এই দেশে স্থানীয় কাঁচামালের সাহায্যে কিছু কিছু ভোগ্য পণ্যশিল্পের বিকাশ ঘটে। পরবর্তী কালে ইউরোপে যুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি শিল্পবিকাশের এই ধারায় কিছুটা গতি সঞ্চার করিয়াছিল। তথাপি ভারতে শিল্পযুগের সূচনা হয় প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা লাভের পরে। কারণ পূর্বে এই দেশে **মূল শিল্প** (Basic Industry) সৃষ্টির কোন পরিকল্পনাই ছিল না। কিন্তু স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টা শুরু হয়। বিগত ৩৮ বৎসরে এই বিষয়ে দেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিও ঘটিয়াছে। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে শিল্প বিকাশের ধারাকে চারিটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যথা—(ক) **১৮৫৪-১৯১৪** : এই সময় ভারতে রেলপথ খোলা হয়, রাণীগঞ্জ-আসানসোল-ঝরিয়া কয়লাখনি চালু হয় এবং বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে কার্পাস-বয়নশিল্প ও কলিকাতা-হাওড়া অঞ্চলে পাটশিল্পের বিকাশ ঘটে। (খ) **১৯১৪-১৯২১** : প্রথম মহাযুদ্ধ ও ইহার উত্তর কালে বৃটিশ মূলধন বিনিয়োগের জন্য ইউরোপ হইতে যন্ত্রপাতি ও শিল্পপণ্য আমদানি করা অসুবিধাজনক হওয়ায় এই দেশে ভোগ্যপণ্য শিল্প ও যন্ত্রশিল্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। (গ) **১৯২১-১৯৩৯**—অসহযোগ আন্দোলন, বিলাতী দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকা ও বৃটিশ মূলধনের ক্রমপ্রসারের প্রয়োজনে সরকারী সংরক্ষণ-নীতি প্রযুক্ত হয়। এই সময় এই দেশে লৌহ-ইস্পাত, চিনি, কার্পাসবস্ত্র, কাগজ, সিমেন্ট প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি ঘটে। (ঘ) **১৯৩৯-১৯৪৭** : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপ হইতে আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং দেশীয় শিল্পের উন্নতির সুযোগ ঘটে। ফলে সরকারী নীতির আনুকূল্যে বেসরকারী উদ্যোগে নানাবিধ শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগেই প্রকৃতপক্ষে ভারতে শিল্পযুগের সূচনা হয়। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে একদিকে যেমন মূল শিল্প (Basic Industries) এবং ভারী শিল্প

(Heavy Industries) গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা রূপায়িত হয় অপরদিকে তেমনি ভোগ্যপণ্যশিল্পের প্রসারেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হয়। নিম্নের সারণীতে বিভিন্ন পরিকল্পনায় ভারতে শিল্পোন্নয়নে অগ্রগতির রূপরেখা নির্দেশিত হইল :

পরিকল্পনা ও ব্যয়বরাদ্দ	শিল্পোন্নয়ন
প্রথম পরিকল্পনা ১৯৫১-৫২ হইতে ১৯৫৫-৫৬	এই পরিকল্পনা মূলত কৃষি-উন্নয়নমূলক, তথাপি কয়লা, খনিজ তেল, লৌহ-ইস্পাত ও জাহাজ-নির্মাণ প্রভৃতি শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
দ্বিতীয় পরিকল্পনা ১৯৫৬-৫৭ হইতে ১৯৬০-৬১	প্রকৃত পক্ষে এই পরিকল্পনাকালেই ভারতে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়। মূল ও ভারী শিল্পের উন্নয়ন, সরকারী উদ্যোগে নতুন তিনটি ইস্পাত কারখানা নির্মাণ, সার ও গুরু রাসায়নিক শিল্প স্থাপন, কয়লা, খনিজ তেলশিল্পের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য।
তৃতীয় পরিকল্পনা ১৯৬১-৬২ হইতে ১৯৬৫-৬৭	ভারী শিল্পের উন্নতি সাধন, ইস্পাত ও গুরু রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। তেল শোধনাগার স্থাপন, লঘু যন্ত্রপাতি নির্মাণ ইত্যাদি। ইহাকে ভারতীয় শিল্পের স্বর্ণ যুগ বলা যায়।
চতুর্থ পরিকল্পনা ১৯৬৯-৭০ হইতে ১৯৭৩-৭৪	পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ব্যতীত সার ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি লৌহেতর ধাতু, লৌহ-ইস্পাত, কাগজ, সিমেণ্ট প্রভৃতির নতুন কারখানা স্থাপন ও উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে।
পঞ্চম পরিকল্পনা ১৯৭৪-৭৫ হইতে ১৯৭৮-৭৯	পেট্রোকেমিক্যাল, জাহাজ-নির্মাণ, সার, কাগজ ইত্যাদি শিল্পের উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।
ষষ্ঠ পরিকল্পনা ১৯৭৯-৮০ হইতে ১৯৮৪-৮৫	বিদ্যুৎ ও শক্তি সম্পদ উৎপাদন ও সুষ্ঠু বণ্টন, খনিজ সম্পদ আহরণ ও শিল্পোন্নতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইহা ব্যতীত পরিবহণ, সেচ ও বন্যা-নিয়ন্ত্রণের প্রতিও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ভারতের শিল্পাঞ্চল (Industrial Regions of India)—স্বাধীনতা লাভের পূর্বে মোটামুটিভাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে কলিকাতা-হাওড়া এবং পশ্চিমাঞ্চলে বোম্বাই-আমেদাবাদ এই দুইটিই উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চল ছিল। ভারতের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ইহার ফলে ভারতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্পাঞ্চলের উদ্ভব ঘটে। বর্তমানে ভারতের শিল্পাঞ্চলগুলি নিম্নরূপ : (১) **বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চল**—হুগলী নদীর উভয় তীরে বাঁশবেড়িয়া হইতে বিড়লাপুর পর্যন্ত এই শিল্পাঞ্চল বিস্তৃত। উল্লেখযোগ্য শিল্প—পাট, কার্পাস, মোটরগাড়ি, রবার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিরামিক, খাদ্য প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্প। **দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল**—দুর্গাপুর, আসানসোল ও চিত্তরঞ্জন ইহার অন্তর্ভুক্ত। লৌহ-ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি, অ্যালয় ইস্পাত, রেল-ইঞ্জিন, টেলিফোনের তার, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি শিল্প উল্লেখযোগ্য। (৩) **ছোটনাগপুর শিল্পাঞ্চল**—জামশেদপুর, ধানবাদ, বোকারো, রাঁচী ইত্যাদি ইহার অন্তর্ভুক্ত। লৌহ-ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি, রেল-ইঞ্জিন, মোটর ট্রাক, অ্যালুমিনিয়াম, রেল-ওয়াগন ইত্যাদি শিল্প গুরুত্বপূর্ণ। (৪) **বোম্বাই-পুণে শিল্পাঞ্চল**—কার্পাস বয়ন, রাসায়নিক, পেট্রো-কেমিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাইকেল, মোটর গাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি প্রধান শিল্প। (৫) **আমেদাবাদ ভাদোদরা (বরোদা) শিল্পাঞ্চল**—কার্পাস বয়ন, পেট্রোকেমিক্যাল, রাসায়নিক, সিরামিক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। (৬) **নীলগিরি শিল্পাঞ্চল**—মাদুরাই, কোয়েম্বাটুর, ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। কার্পাস, বয়ন, লৌহ-ইস্পাত, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং ; রেশম, মেশিন টুলস্‌, মোটর গাড়ি নির্মাণ, শর্করা, চা, কফি প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য।

উপরি-উক্ত প্রধান শিল্পাঞ্চল ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আরও নূতন নূতন শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে **দিল্লী-কানপুর, অমৃতসর-লুধিয়ানা, নাগপুর-ওয়ার্ধা, ইন্দোর-ভূপাল, গোদাবরী-কৃষ্ণা ব-দ্বীপ, দার্জিলিং-তরাই, মালাবার-ত্রিচুর-কুইলন** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন শ্রমশিল্প (Manufacturing Industries)—ভারতে সংগঠিত শ্রমশিল্পকে কাঁচামালের ভিত্তিতে চারিটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) **খনিজ সম্পদভিত্তিক শিল্প**, যেমন— লৌহ-ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যালুমিনিয়াম, সিমেন্ট, রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি। (২) **কৃষিজ পণ্যভিত্তিক শিল্প**, যেমন—কার্পাস বয়ন, পাট, শর্করা, খাদ্য প্রস্তুত ইত্যাদি শিল্প। (৩) **বনজ সম্পদভিত্তিক শিল্প**—কাগজ, রেয়ন ইত্যাদি শিল্প। (৩) **প্রাণিজ সম্পদভিত্তিক শিল্প**, যেমন—পশম শিল্প, মাংস, মৎস্য শিল্প ইত্যাদি। নিম্নে ভারতের কয়েকটি প্রধান শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতের আধুনিক শ্রমশিল্পের বিকাশের যুগকে কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায় ও কি কি ? (২) ভারতে কয়টি শিল্পাঞ্চল আছে ও কি কি ? (৩) বিভিন্ন পরিকল্পনায় ভারতে শিল্প বিকাশের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহার আলোচনা কর।]

লৌহ-ইস্পাত শিল্প
(Iron and Steel Industry)

ভারতীয় অর্থনীতিতে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের গুরুত্ব ও অবদান অপরিসীম। দেশের শিল্পোন্নতি লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রসার ও উন্নতির সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। নিত্য-ব্যবহার্য সামগ্রী হইতে শুরু করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ও নানাবিধ সহযোগী শিল্পের কাঁচামাল লৌহ ও ইস্পাত। ভারতে এই শিল্পে বর্তমানে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা এবং নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১,২০,০০০।

বিকাশ—আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিকাশ ঘটে ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের পরে। কিন্তু ভারতে দিল্লীর কুতুবমিনারের নিকটবর্তী ১৬০০ বৎসরের পুরাতন মরিচাবিহীন লৌহস্তম্ভ লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের বাস্তব নিদর্শন। কালক্রমে অবক্ষয়ের আবর্তে পড়িয়া ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইহার পুনঃসংগঠন ঘটে।

ভারতে আধুনিক লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গঠনের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন সম্ভবত মট্টি ও ফার্কার (Motte and Farquhar) ১৭৭৯ সালে। পশ্চিমবঙ্গে বীরভূমের লৌহ আকরিক ছিল তাহাদের ভরসা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ইহার পরে ১৮৩০ সালে মাদ্রাজ রাজ্যের (বর্তমান তামিলনাডু) দক্ষিণ আর্কটে পোর্টোনোভোতে জোশিয়া মার্শাল হীথ (Joshia Marshall Heath) একটি লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপন করেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থ সাহায্যে। শক্তি-সম্পদ ও যন্ত্রপাতির অভাবে এবং সর্বোপরি হীথের মৃত্যুর সহিত ১৮৮৪ সালে এই কারখানাও বন্ধ হইয়া যায়। এই সময়ে ১৮৮৪ সালেই ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লার সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের কুলটিতে স্থাপিত হয় 'বরাকর আয়রণ-ফাউণ্ড্রি' নামে একটি লৌহ-ইস্পাত কারখানা। কালক্রমে এই কারখানা বার্ণপুরের আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোং (IISCO)-এর অঙ্গীভূত হয়। এই কারখানা স্থাপনের ফলেই যদিও ভারতে ইস্পাত শিল্পের সূচনা হইয়াছিল, তথাপি এই শিল্পের প্রকৃত উন্নতি শুরু হয় ১৯০৭ সালে যখন বিহারের সাকচিতে বোম্বাই-এর পার্শী ব্যবসায়ী জামশেদজী টাটা বর্তমান টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোং (TISCO) স্থাপন করেন। ক্রমে পশ্চিমবঙ্গের বার্ণপুরে ও মহীশূরের (বর্তমানে কর্ণাটক) ভদ্রাবতীতেও ইস্পাত শিল্প স্থাপিত হয় এবং ভারত আধুনিক ইস্পাত-যুগে প্রবেশ করে।

কাঁচামাল ও সংগঠনের অনুকূল উপাদান (Raw materials and Favourable Factors)—কয়লা, লৌহ-আকরিক, চুনাপাথর,ডলোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, ক্রোমিয়াম, জল, শ্রমিক প্রভৃতির সুলভ ও সহজ যোগান এবং বাজার ও যোগাযোগ-

ব্যবস্থার প্রসারের উপর লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের গঠন ও উন্নতি নির্ভর করে। ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে এই সকল উপাদানের প্রাচুর্য উল্লেখ্য।

আঞ্চলিক বণ্টন একদেশীভবন (Regional Distribution and Localisation)—১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের **বার্ণপুর**, বিহারের **জামসেদপুর** এবং কর্ণাটকের **ভদ্রাবতীতে** বেসরকারী উদ্যোগে সংগঠিত তিনটি লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র ছিল। স্বাধীন ভারতে শিল্পায়নের প্রয়োজনে লৌহ-ইস্পাত ও অন্যান্য

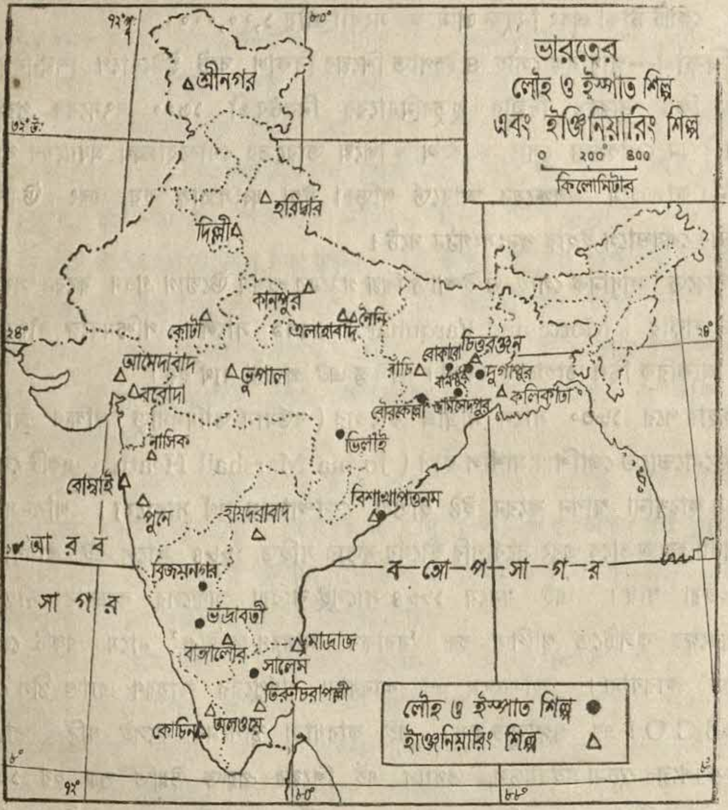

চিত্র ১২.১ : লৌহ-ইস্পাত শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প নির্দেশক অঞ্চলসমূহ।

কয়েকটি মূল ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। বিগত পরিকল্পনাকালে সরকারী উদ্যোগে ওড়িশার **রাউরকেল্লা**, মধ্যপ্রদেশের **ভিলাই**, পশ্চিমবঙ্গের **দুর্গাপুর** ও বিহারের **বোকারোতে** মোট চারিটি নতুন কারখানা স্থাপিত হয়। ইস্পাত শিল্প মুখ্যতঃ কয়লা ও লৌহ আকরিকনির্ভর হওয়ায় ভারতে ছোটনাগপুর মালভূমি ও ইহার সন্নিহিত অঞ্চলেই ইহার একদেশীভবন লক্ষ্য করা যায়। ভারতের লৌহ-ইস্পাত

উৎপাদনকেন্দ্রগুলি (সাতটির মধ্যে ছয়টি) এই অঞ্চলের কয়লা, লৌহ আকরিক, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনি অঞ্চলের সহজ সান্নিধ্যে অবস্থিত। স্থানীয় শ্রমিক, নদীর জল, বিদ্যুতের সরবরাহ, রেল ও সড়কপথে দেশের অভ্যন্তরভাগ ও নিকটবর্তী বন্দরের সহিত সহজ ও সুলভ যোগাযোগ এই একদেশীভবনের বিশেষ অনুকূল হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত ভদ্রাবতীর ইস্পাত কারখানাটিও গড়িয়া উঠিয়াছে স্থানীয় বাবাবুদানের লৌহ আকরিক, ভাণ্ডিগুড্ডার চুনাপাথর এবং শিমোগা ও চিত্রদুর্গের ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া। দক্ষিণ ভারতের কয়লার অভাব জলবিদ্যুৎ ও তামিলনাড়ুর লিগনাইটের সাহায্যে দূর করিবার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে। ফলে ঐ অঞ্চলে আরও দুইটি নতুন কারখানা নির্মিত হইতেছে।

ভারতের ইস্পাত শিল্প ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ মেট্রিক টনেরও কম। এই সময় বৃটেন হইতে প্রচুর পরিমাণে ইস্পাত ও ইস্পাতজাত দ্রব্যাদি আমদানি করা হইত। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য প্রথম সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু হয়। প্রথমত বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত তিনটি কেন্দ্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং নতুন তিনটি ইস্পাতকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রচিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে **রাউরকেল্লা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে** তিনটি নতুন কারখানা স্থাপন করা হয় এবং ইহার পরিচালনভার **হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড** নামক একটি কেন্দ্রীয় সরকারী উদ্যোগের উপর ন্যস্ত হয়। এই সময় হইতেই ভারতে ইস্পাত উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। তৃতীয় পরিকল্পনায় **বোকারোতে** একটি নতুন কারখানা স্থাপন, পুরাতন সকল কারখানার সম্প্রসারণ ও উৎপাদনক্ষমতাবৃদ্ধি, লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় কয়লা, চুনাপাথর, আকরিক লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদির উৎপাদনবৃদ্ধি ও নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তামিলনাড়ুর নিভেলি অঞ্চলের লিগনাইটকে ইস্পাত শিল্পে ব্যবহারোপযোগী করিবার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত ইস্পাতকেন্দ্রগুলির মধ্যে অধিকতর সমন্বয় বিধানের জন্য স্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া লিঃ (Steel Authority of India Ltd.—SAIL) নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয় এবং হিন্দুস্থান স্টীল লিঃ কে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পরিকল্পনাকালে অন্ধ্রপ্রদেশের **বিশাখাপত্তনম**, তামিলনাড়ুর **সালেম** এবং কর্ণাটকের **বিজয়নগর-হসপেটে** আরও তিনটি ইস্পাতকেন্দ্র স্থাপনের কার্যকরী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বিভিন্ন পরিকল্পনায় ভারতে অ্যালয় স্টীল, টুল ইস্পাত ও অন্যান্য বিশেষ ধরনের ইস্পাত উৎপাদনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গৃহীত হয়। সরকারী উদ্যোগে দুর্গাপুর ও **ভদ্রাবতীতে অ্যালয় স্টীল** ইউনিট স্থাপিত হয় ও **বিহারের পাত্রাতুতে** একটি

নতুন অ্যালয় কারখানা স্থাপিত হয়। কলিকাতার নিকট কাশীপুর ও উত্তরপ্রদেশের কানপুরের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে অ্যালয় স্টীল উৎপাদন করা হয়। বেসরকারী উদ্যোগে বোম্বাইয়ের নিকট খোপলিতে মাহিন্দ্র ইউজিন স্টীল কোং, কলিকাতায় গেষ্টকীন উইলিয়ামসও অ্যালয় স্টীল উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়া চলিয়াছে। ইহা ব্যতীত দেশের ক্রমবর্ধমান ইস্পাতের চাহিদা মিটাইতে নানাস্থানে কয়েকটি মিনি স্টীল প্ল্যাণ্ট স্থাপনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়াতে একটি মিনি স্টীল কারখানা শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। নিম্নে ভারতের ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা ও অগ্রগতি দেখান হইল :

ভারতে ইস্পাত উৎপাদন (ল. মে. ট.)

	লৌহপিণ্ড	ইস্পাত		লৌহপিণ্ড	ইস্পাত
১৯৫০-৫১	১৬.৯	১৪.৭	১৯৮০-৮১	৯৫.৫	১০৩.৩
১৯৬০-৬১	৪৩.১	৩৪.২	১৯৮২-৮৩	৯৫.৮	১১০.৩
১৯৭০-৭১	৬৯.৯	৬১.৪	১৯৮৩-৮৪	৯১.৯	১০৪.৮

ভারতের মুখ্য ইস্পাত কেন্দ্রগুলির ইস্পাতপিণ্ড উৎপাদন-ক্ষমতা ও উৎপাদন

	উৎপাদন ক্ষমতা (ল. মে. ট.)	উৎপাদন ১৯৭৪-৭৫ (ল. মে. ট.)	১৯৮২-৮৩
টিসকো	৩৫	১৭.২	১৯.৪৬
ইসকো	১০	৫.৩	৬.২৪
ভিলাই	২৫	২০.০	২১.৩০
দুর্গাপুর	১৬	৮.২	৯.৫২
রাউরকেল্লা	১৮	১০.৭	১১.৪৪
বোকারো	২৫	১.২	১৮.২৯
	১০৬	৬২.৬	৮৬.২৫

বিভিন্ন লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্র—(১) **টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোং** (TISCO) বিহারের সাকচিতে জামশেদজী টাটার উদ্যোগে ১৯০৭ সালে এই কারখানাটি স্থাপিত হয়। বেসরকারী উদ্যোগে সংগঠিত লৌহ ইস্পাত-কারখানার মধ্যে ইহা বৃহত্তম। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের উপর অবস্থিত জামসেদপুর বা টাটানগর ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের লৌহ-বলয়ের কেন্দ্রবিন্দু। বিহারের নোয়ামুণ্ডি, ওড়িশার

গুরুমহিষানি খনির লৌহ আকরিক, ঝরিয়ার কয়লা, ওড়িশার গাংপুর অঞ্চলের চুনাপাথর ও ডলোমাইট এবং বীরমিত্রপুর ও গাংপুরের ম্যাঙ্গানিজ এই কেন্দ্রের ১০০-১৫০ কি. মি. দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা যুক্ত। ইহা ব্যতীত নিকটবর্তী খরকই ও সঞ্জয় নদীর জল, বিহার ও ওড়িশার স্থানীয় শ্রমিক এবং মাত্র ২৫০ কি. মি. দূরে অবস্থিত কলিকাতা বন্দর এই কেন্দ্রের গঠন ও উন্নতিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ভারতে ইস্পাত ও ইস্পাতজাত দ্রব্য উৎপাদনে ইহার গুরুত্ব সর্বাধিক। কলিকাতার হাওড়া ব্রীজ নির্মাণে ব্যবহৃত টিসকোর বিশেষ ধরনের ইস্পাত টিস্‌ক্রোম ইহার কারিগরী দক্ষতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ভারী যন্ত্রপাতি, রেল, জাহাজ ইত্যাদি নির্মাণে ইহার ইস্পাতের চাহিদা সর্বাধিক। বর্তমানে ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া বার্ষিক ৩৫ লক্ষ মে. টন করা হইয়াছে। ১৯৮২-৮৩ সালে ইহার মোট উৎপাদন ছিল ১৯·৪৬ ল. মে. টন।

(২) **ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোং** (IISCo)—পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান জিলায় বার্ণপুর ও কুলটিতে এইটি সংগঠিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ১৯১৮ সালে রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ায় কয়লাখনি, বিহারের সিংভূম ও ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের লৌহ আকরিক, বিহার ও ওড়িশার চুনাপাথর ও ম্যাঙ্গানিজ এবং কলিকাতা বন্দরের নৈকট্য এই ইস্পাতকেন্দ্র সংগঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব-রেলপথ যোগে ইহা কলিকাতা বন্দরের সহিত যুক্ত। দামোদরের জল, বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক সুলভ ও সহজলভ্য। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এই কারখানাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭২ সালে অধিগ্রহণ করিয়াছিল। বর্তমানে এই কেন্দ্রের ইস্পাত উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ১০ ল. মে করা হইয়াছে। ১৯৮২-৮৩ সালে ইহার মোট উৎপাদন ছিল ৬·২৪ লক্ষ মে. টন ইস্পাত।

(৩) **বিশ্বেশ্বরায়া আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল লিঃ**—ইহা পূর্বে মহীশূর আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল লিঃ নামে পরিচিত ছিল। ১৯২৩ সালে কর্ণাটকের ভদ্রাবতীতে এই লৌহ-ইস্পাতকেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। ইহার সংগঠনে অনুকূল উপাদানের মধ্যে বাবাবুদান পর্বতের কেমাংগুণ্ডির লৌহ আকরিক, কাডুর শিমোগা বনভূমির কাষ্ঠ হইতে কাঠ কয়লা, শিমোগা চিত্রদুর্গ অঞ্চলের ম্যাঙ্গানিজ, ভাণ্ডিগুড্ডার চুনাপাথর এবং স্থানীয় ভদ্রা নদীর জল উল্লেখযোগ্য। এই কেন্দ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে কয়লার অভাবহেতু সাধারণ লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনে খরচ বেশি পড়ে। এই কারণে বর্তমানে এখানে সাধারণ ইস্পাত উৎপাদনের পরিবর্তে সরাবতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হইতে বিদ্যুৎ গ্রহণ করিয়া বৈদ্যুতিক চুল্লীর সাহায্যে অ্যালয় স্টীল উৎপাদন করা হইতেছে। ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা খুবই কম, মাত্র ৭৭,০০০ মে. টন।

(৪) **হিন্দুস্থান স্টীল লিঃ**—(ক) **রাউরকেল্লা**—সরকারী উদ্যোগে এবং

জার্মানির ক্রুপসডেমাগ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ওড়িশার লৌহ-বলয়ের অন্তর্গত রাউরকেল্লার এই কারখানাটি স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ সালে এই কারখানাটি স্থাপিত হয়।

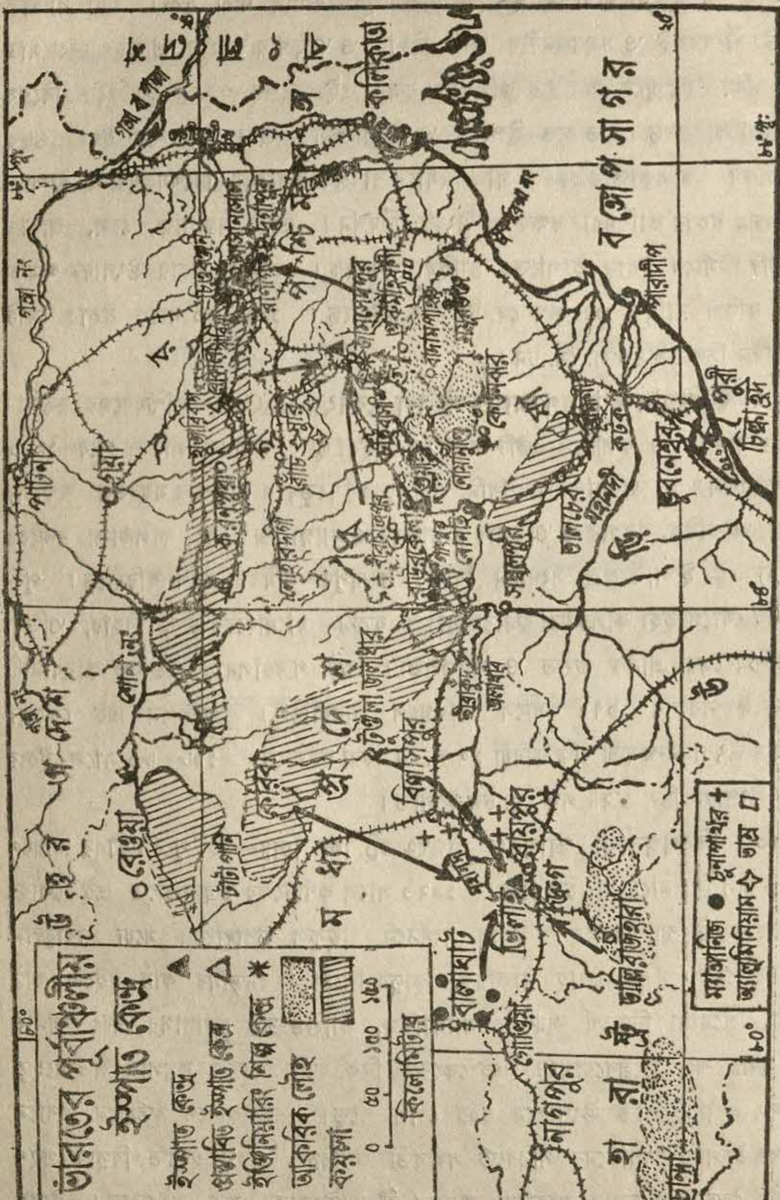

চিত্র ১২.২ : ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ইস্পাত কেন্দ্র ও কাঁচামালের অবস্থান।

নিকটবর্তী বোনাই, কিরিবুরু অঞ্চলের লোহ আকরিক, তালচের ঝরিয়া-রাণীগঞ্জ অঞ্চলের

কয়লা ও স্থানীয় বীরমিত্রপুর ও গাংপুরের ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর, ডলোমাইট এবং ব্রাহ্মণী নদীর জল এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সহজ পরিবহণ-ব্যবস্থা এই কেন্দ্র গঠনের অনুকূল পরিবেশ রচনা করিয়াছে। ঝরিয়া-রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লার সহিত ওড়িশার ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর ইত্যাদি দোলক প্রথায় পরিবাহিত হয় বলিয়া পরিবহণ-ব্যয় খুবই কম পড়ে। বর্তমানে এই কেন্দ্রের উৎপাদন-ক্ষমতা বার্ষিক ১৮ ল. মে. টন। ১৯৮২-৮৩ সালে ইহার উৎপাদন ছিল ১১·৪৪ ল. মে. টন।

(খ) **ভিলাই**—মধ্যপ্রদেশের দ্রুগ জিলায় ভিলাইতে সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায় সরকারী উদ্যোগে এই কারখানা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে স্থাপিত হয়। ১৯৫৯ সালে ইহার উৎপাদন শুরু হয়। এই কেন্দ্রের ৩০-৪০ কি. মি.-এর মধ্যে অবস্থিত দ্রুগ জিলায় ঢালি রাজহারা অঞ্চলের উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক, কোরবা খনির কয়লা, বালাঘাট চিন্দোয়ারা ও জব্বলপুরের ম্যাঙ্গানিজ এবং স্থানীয় চুনাপাথর ও মাত্র ৩২ কি. মি. দূরে অবস্থিত টুণ্ডলা জলাধার হইতে সংগৃহীত জলের সাহায্যে এই ইস্পাত প্রকল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা ইহা কলিকাতা ও পশ্চিম রেলপথ দ্বারা ইহা বোম্বাই বন্দরের সহিত যুক্ত। বর্তমানে ইহাই ভারতের সর্ববৃহৎ ইস্পাতকেন্দ্র। বোম্বাই-এর ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে, বিশাখাপত্তনমের জাহাজ নির্মাণে ও কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে বর্তমানে প্রভূত পরিমাণে ভিলাই ইস্পাত ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯৮২-৮৩ সালে এই কারখানার মোট উৎপাদন ছিল ২১·৩০ ল. মে. টন। শীঘ্রই ইহার উৎপাদন ক্ষমতা ২৫ ল. মে. টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪০·০০ ল. মে. টন করা হইবে।

(গ) **দুর্গাপুর**—'ইস্কন' নামে একটি বৃটিশ সংস্থার সহযোগিতায় সরকারী উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছে দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্প। দুর্গাপুরের ১১০ কি. মি.-এর মধ্যে অবস্থিত ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লা, ৩০ কি. মি. এর মধ্যে অবস্থিত সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জের আকরিক লৌহ, বীরমিত্রপুর ও গাংপুরের চুনাপাথর ও ম্যাঙ্গানিজ এবং দুর্গাপুর ব্যারেজের জল এই প্রকল্পের গঠন ও উন্নতিতে অপরিহার্য সাংগঠনিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ব রেলপথে ইহা মাত্র ৮০ কি. মি. দূরে অবস্থিত কলিকাতা বন্দরের সহিত যুক্ত। এই কেন্দ্রে ইস্পাত উৎপাদন শুরু হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষভাগে। বর্তমানে ইহার ইস্পাত উৎপাদন-ক্ষমতা ১৬ ল. মে. টন। ১৯৮২-৮৩ সালে ইহার উৎপাদন ছিল ৯·৫২ ল. মে. ট ইস্পাত পিণ্ড। কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের নানাবিধ ইস্পাতের চাহিদা পূরণে ও বিদেশে রপ্তানিতে দুর্গাপুর কেন্দ্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এখানে একটি কোকচুল্লী ও একটি অ্যালয় স্টীল কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। দুর্গাপুর একটি শিল্পনগরী মাত্র নহে। রাণীগঞ্জ কয়লাখনি ও দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর কলকাতা,

চিত্তরঞ্জন, রূপনারায়ণপুর, অন্থপনগর এবং বিহারের সিন্ধ্রি প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র অবস্থিত। ভবিষ্যতে এই সকল অঞ্চলের আরও প্রসার ঘটিবে। এই কারণে জার্মানির রূঢ় শিল্পাঞ্চলের সহিত দুর্গাপুরের তুলনা করা হয় এবং ইহাকে ভারতের রূঢ় (The Ruhr of India) বলা হয়।

(ঘ) **বোকারো**—বিহারের ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলের অদূরে সরকারী উদ্যোগে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই কারখানাটি স্থাপিত হয়। এই প্রকল্পে প্রথমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার প্রতিশ্রুত ছিল। কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষিত না হওয়ায় রাশিয়ার সহযোগিতায় ইহা গড়িয়া উঠে। ঝরিয়া ও স্থানীয় অঞ্চলের কয়লা, চুনাপাথর, সিংভুম ও ময়ূরভঞ্জের আকরিক লৌহ, বীরমিত্রপুর ও গাংপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ম্যাঙ্গানিজ ও চুনাপাথর, দামোদর প্রকল্পের তেনুঘাট বাঁধের জল ইত্যাদি এই ইস্পাত-কেন্দ্র গঠনে বিশেষ সহায়ক। বোকারো কারখানার নির্মাণ কার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। বর্তমানে ইহার ইস্পাত উৎপাদন-ক্ষমতা ২১'৫ মে. টন। ভবিষ্যতে ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা ৪০ ল. মে. টনে বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৮২-৮৩ সালে ইহার উৎপাদন ১৮'২৯ ল. মে. টন।

নির্মীয়মাণ নতুন কেন্দ্র—(১) **বিশাখাপত্তনম্**—ভারতের পূর্ব-উপকূলে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের নিকটবর্তী বালাচেরুভুতে ৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনের কার্য শুরু হয় ১৯৭১ সালের ২০শে জানুয়ারী। সিঙ্গারেনি অঞ্চলের কয়লা, এবং বাইলাডিলা, কুর্নূল, কুডাপ্পা নেলোর প্রভৃতি অঞ্চলের লৌহ আকরিক এখানে প্রধানত ব্যবহৃত হইবে। প্রথম পর্বে ইহার উৎপাদন ক্ষমতা ১২ ল. মে. ট. ইস্পাত পিণ্ড ধার্য হইয়াছে। কিন্তু পরে ইহার উৎপাদন ক্ষমতা ৩৭ ল. মে ট. পর্যন্ত করা হইবে। এই কারখানা স্থাপনে সোভিয়েত রাশিয়ার কারিগরী সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

(২) **বিজয়নগর-হস্‌পেট**—কর্ণাটক রাজ্যের হস্‌পেট অঞ্চলে ২০ ল. মে. ট. উৎপাদন-ক্ষমতাবিশিষ্ট অপর একটি লৌহ-ইস্পাত কারখানার নির্মাণকার্যও শুরু হয় ১৯৭১ সালে (১১ই অক্টোবর)। ইহার আনুমানিক ব্যয় ধার্য হইয়াছে ৭৫০ কোটি টাকা। হস্‌পেট অঞ্চলের উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক ও কর্ণাটক অঞ্চলের চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি এই কারখানায় ব্যবহৃত হইবে।

(৩) **সালেম**—তামিলনাড়ুর সালেম নামক স্থানে স্থানীয় লৌহ আকরিক, নিভেলির লিগনাইট ও সালেম-তিরুচিরাপল্লী চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট প্রভৃতির সাহায্যে ৩৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২,০০০ টন উৎপাদনক্ষমতা বিশিষ্ট একটি সঙ্কর ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কার্য শুরু হইয়াছে।

আশা করা যায় ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্র ও গোয়া অঞ্চলে নূতন ইস্পাত-শিল্পস্থাপনের উদ্যোগ

গৃহীত হইবে। ইহা ছাড়া পূর্বাঞ্চলে কয়লা ও লৌহ আকরিক ক্ষেত্রের সন্নিকটে নূতন ইস্পাত কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ইস্পাতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এই সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করিবে সন্দেহ নাই।

বাণিজ্য—ভারতের লৌহ-ইস্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভাবনাময়। এই দেশে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রাচুর্য, দ্রুত শিল্পায়নের চাহিদা এবং সরকারী আনুকূল্য এই শিল্পের উন্নতিতে আবশ্যিক প্রেরণা যোগাইবে। ভারতে মাথা পিছু ইস্পাত ব্যবহারের পরিমাণ ১৫ কে. জি, কিন্তু বৃটেনে ইহার পরিমাণ ২৯০ কে. জি., আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৫৬০ কে. জি, এবং রাশিয়ায় ৩১০ কে. জি.। ভারতে উন্নতমানের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈয়ারির জন্য কিছু বিশেষ ধরনের ইস্পাত আমদানি করা হয়। সাধারণত

চিত্র ১২.৩ঃ দক্ষিণ ভারতের লৌহ ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র।

বৃটেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চেকোস্লোভাকিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে এই ইস্পাত আমদানি করা হয়। ভারতে বার্ষিক ইস্পাতের চাহিদা বর্তমানে ক্রমবর্দ্ধমান। ফলে প্রতি বৎসরই কিছু পরিমাণ ইস্পাত আমদানি করিতে হয়। ১৯৮২-৮৩ সালে ভারতে ১,১৪৬ কোটি টাকার ইস্পাত আমদানি করা হয় এবং ৫৫·৭৫ কোটি টাকার লৌহ-ইস্পাত রপ্তানি করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ইস্পাত উৎপাদনের সহজ সুযোগের অভাব হেতু ভবিষ্যতে এই সকল দেশে ভারতীয় ইস্পাত ও ইস্পাতজাত দ্রব্য রপ্তানির বাজার প্রসারিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতের ইস্পাত শিল্পের উন্নয়নে প্রধান কয়েকটি সমস্যা লক্ষ্য করা যায়—(১) উন্নত

মানের কোক কয়লার অভাব, (২) দক্ষ শ্রমিক, ও পরিচালন-কর্মীর অভাব, (৩) উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব, (৪) পরিবহণের অসুবিধা, (৫) মেরামতি সাজসরঞ্জামের অভাব, (৬) উৎপাদন-মূল্যের আধিক্য, (৭) সর্বোপরি মূলধনের অভাব। এই সকল সমস্যা নিঃসন্দেহে সমাধানযোগ্য। আশা করা যায় দেশে ইস্পাতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে ইস্পাত শিল্পের প্রসারের সহিত ক্রমে এই সকল অসুবিধা দূরীভূত হইবে ও ভারত অতি দ্রুত বিভিন্ন প্রকার ইস্পাতের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে।

[**প্রশ্ন** : (১) লৌহ-ইস্পাত শিল্পের অনুকূল সাংগঠনিক পরিবেশ কি? (২) ভারতে কোন্ কোন্ অঞ্চলে ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে এবং কেন? (৩) জামশেদপুর, দুর্গাপুর ও ভিলাই ইস্পাতকেন্দ্রের গঠন সম্পর্কে আলোচনা কর। (৪) ভারতে সম্ভাব্য ৩টি ইস্পাতকেন্দ্র গঠনের স্থান নির্দেশ কর।]

কার্পাস বয়ন-শিল্প
(Cotton-Textile Industry)

কার্পাস বয়ন-শিল্প ভারতের প্রাচীনতম শিল্প। অতি প্রাচীনকাল হইতেই স্থানীয় কার্পাসের সাহায্যে কুটীর-শিল্পের মাধ্যমে ভারতে হস্তচালিত তাঁতে কার্পাস সূতা তৈয়ারি ও বস্ত্রবয়ন চলিয়া আসিতেছে। এক সময় ভারতের ঢাকাই মসলিন ও কালিকটের ক্যালিকো কাপড় বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। বৃটিশ যুগে ঔপনিবেশিক শোষণের কবলে পড়িয়া ভারতের এই ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতের তাঁত-শিল্প নানাদিক হইতে উন্নত এবং আধুনিক বৃহদাকার বয়ন-শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় ইহা আজিও টিকিয়া আছে এবং বিশ্বের দরবারে উন্নত মানের বিবিধ সৌখিন দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া আপন অস্তিত্ব সগৌরবে ঘোষণা করিতেছে।

ভারতের আধুনিক বৃহদাকার বস্ত্রশিল্পের সূচনা হয় ১৮১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার অন্তর্গত ঘুষুড়িতে, কিন্তু স্থানীয় তুলার অভাবে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরবর্তী কালে ১৮৫১ সালে স্থানীয় তুলা ও জলবিদ্যুতের সাহায্যে বোম্বাই অঞ্চলে এই শিল্পের সফল সূচনা ঘটে। ১৯০৫ সালে বিদেশী বর্জন আন্দোলন, ১৯১৪-১৮ সাল ব্যাপী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ১৯২৭ সালে এই শিল্পে সংরক্ষণ শুল্কধার্য, জাতীয়তা বোধের উন্মেষ, ১৯৩৯-৪৫ ব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ প্রভৃতি ঘটনা এই শিল্পের প্রসারের পক্ষে অনুকূল হওয়ায় ক্রমশঃ ইহা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। বর্তমানে কার্পাস-বয়নশিল্প জননিয়োগের দিক হইতে ভারতের বৃহত্তম শিল্প। জাতীয় আয় উৎপাদনে ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও ইহার ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনে ইহার স্থান

বিশ্বে চতুর্থ, বিশ্বে রপ্তানিতে দ্বিতীয় এবং জননিয়োগে প্রথম। ভারতে প্রায় ১০ লক্ষ লোক এই শিল্পে নিযুক্ত আছে।

ভারতের কার্পাস বয়ন-শিল্পের চারিটি প্রধান বিভাগ দেখা যায়—(ক) **সূতা উৎপাদন সংস্থা** (Spinning Mill), (খ) **বস্ত্রবয়ন সংস্থা** (Weaving Mill), (গ) **সূতা ও বস্ত্র উৎপাদন সংস্থা** (Composite Mill), (ঘ) **হস্তচালিত তাঁতশিল্প বা শক্তিচালিত তাঁত সংস্থা** (Hand or Power-driven Looms)।

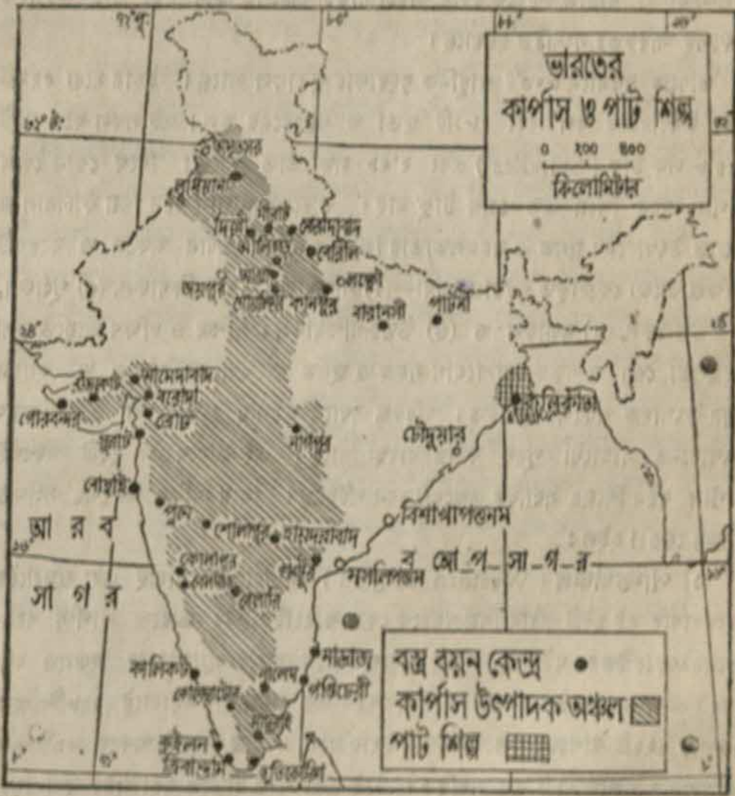

চিত্র ১২.৪ : ভারতের বস্ত্র-বয়ন শিল্পের আঞ্চলিকতা।

ভারতে তাঁতশিল্প বৃহদাকার বয়ন-শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক। বস্ত্র উৎপাদনে ও জননিয়োগে ইহার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আঞ্চলিক বন্টন ও একদেশীভবন (Regional Distribution and Localisation)—কার্পাস বয়ন শিল্প সংগঠনে কাঁচামাল, শক্তি-সম্পদ, শ্রমিক, বাজার,

মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের সহজ সুলভ যোগান অপরিহার্য। উন্নত পরিবহণব্যবস্থা ও বন্দরের নৈকট্য ইহার দ্রুত উন্নতির সহায়ক। কার্পাস বয়নশিল্পের প্রধান কাঁচামাল তূলা প্রধানত পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের জলবায়ুগত স্বাভাবিক কৃষিজ ফসল। তুলা বিশুদ্ধ কাঁচামাল বলিয়া এই শিল্প বিচরণশীল ও বাজারমুখী। অর্থাৎ যে সকল কাঁচামালের শিল্পে ব্যবহারের পূর্বে ও পরে ওজনে উল্লেখযোগ্য কোন ঘাটতি হয় না তাহাকে **বিশুদ্ধ কাঁচামাল** বলা হয়। ফলে এই শিল্পের শৈশবাবস্থায় ইহার সংগঠন প্রধানত বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিলেও ক্রমে ইহা তুলা উৎপাদক অঞ্চলেই অধিকতর সংগঠিত হইয়াছে।

ভাবতে বর্তমানে ৮০৩টি আধুনিক বৃহদাকার সূতাকল আছে। ইহার মধ্যে ৫২২টি সূতা উৎপাদনের কল এবং ২৮১টি সূতা ও বস্ত্রবয়নের কল। এই সকল কলে মোট ২২৪·৮ লক্ষ টাকু (Spindles) এবং ২·০৯ লক্ষ তাঁত আছে। বিশ্বে কোন দেশে কার্পাস বয়ন শিল্পে এত বেশি টাকু নাই। ভারতের কার্পাস বয়ন শিল্প কাঁচামাল ও অন্যান্য উৎপাদনের সুলভ ও সহজলভ্যতার ভিত্তিতে চারিটি প্রধান অঞ্চলে ও কয়েকটি বিক্ষিপ্ত রাজ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, যথা—(১) পশ্চিমাঞ্চল, (২) দক্ষিণাঞ্চল, (৩) পূর্বাঞ্চল, (৪) উত্তরাঞ্চল, (৫) মধ্যাঞ্চল ও (৬) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে তূলা সহজলভ্য, রেল ও সড়ক যোগাযোগ সহজ ও সুলভ এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কোচিন বন্দর উৎপাদক অঞ্চলের সন্নিহিত। অধিকন্তু এখানে কয়লার অভাব ব্যাপক জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সাহায্যে পূরণ করার ব্যবস্থা আছে। এই কারণে এই দুইটি অঞ্চলেই কার্পাস বয়ন শিল্পের সর্বাধিক একদেশীভবন ঘটিয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল :

(১) **পশ্চিমাঞ্চল** (Western Region)—মহারাষ্ট্রের বোম্বাই এবং গুজরাটের আমেদাবাদ এই দুইটি প্রধান শিল্প-শহরকে কেন্দ্র করিয়াই পশ্চিম ভারতে কার্পাস বয়ন-শিল্পের একদেশীভবন ঘটিয়াছে। এই কারণে ইহাকে বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলও বলা হয়। এখানে মোট ৩২০টি কার্পাস বয়ন-কল আছে। মহারাষ্ট্রে ১৯৮টি এবং গুজরাটে ১২২টি কাপড়ের কল আছে। ইহার মধ্যে একমাত্র বোম্বাই অঞ্চলে .৫৯টি এবং আমেদাবাদ অঞ্চলে ৬৯টি কল অবস্থিত। এই দুইটি শহর ব্যতীত মহারাষ্ট্রের শোলাপুর, নাগপুর, পুণে, জলগাঁও, হুবলী এবং গুজরাটের সুরাট, ব্রোচ, বরোদা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র! এই অঞ্চলে কার্পাস বয়নশিল্পের সমৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে (ক) **কাঁচামালের যোগান**—এই অঞ্চলের কৃষ্ণ মৃত্তিকায় ভারতের সর্বাধিক মধ্যম আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হয়। (খ) **সুলভ শক্তি**—এখানে কয়লার অভাব। কিন্তু বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদিত জলবিদ্যুৎ সুলভ। (গ) **মূলধন**—মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলের পার্শী ও ভাটিয়া বণিক গোষ্ঠীর মূলধন এবং স্থানীয় ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ঋণ সহজলভ্য। (ঘ) **শ্রমিক**

—মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের শ্রমিক সুলভ। (ঙ) **যোগাযোগ ব্যবস্থা**—রেল ও সড়ক-পথে তূলা ও বস্ত্রের পরিবহণ সহজ ও সুলভ। (চ) **বন্দরের নৈকট্য**—বোম্বাই বন্দরের নৈকট্য বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট তূলা ও যন্ত্রপাতি আমদানি এবং বস্ত্র রপ্তানির সহায়ক। (ছ) **জলবায়ু**—এই অঞ্চলের স্বাভাবিক আর্দ্র জলবায়ু সূক্ষ্ম সূতা উৎপাদনের সহায়ক।

সুটিং, শার্টিং, মিহি কাপড়, প্রিন্টস্ ইত্যাদি উৎপাদনে ইহার বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এই অঞ্চলে কার্পাসের সহিত পশম, টেরিন ও অন্যান্য কৃত্রিম তন্তু মিশাইয়া টেরিকট ইত্যাদি নানাবিধ বস্ত্র উৎপাদন করা হইতেছে।

(২) **দক্ষিণাঞ্চল** (Southern Region)—এই অঞ্চলে মোট ২৩৯টি সূতা কলের মধ্যে তামিলনাডুতে ১৯১টি, কর্ণাটকে ২৬টি এবং কেরালায় ২২টি অবস্থিত। সংগঠিত সূতাকলের সংখ্যায় এই অঞ্চল প্রধান হইলেও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্যে বোম্বাই-আমেদাবাদ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলের তূলা, স্থানীয় জলবিদ্যুৎ, দক্ষ শ্রমিক, রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, পূর্বপ্রান্তে মাদ্রাজ ও পশ্চিমপ্রান্তে কোচিন ও কোঝিকোড বন্দরের নৈকট্য ও সারা বৎসর আর্দ্র জলবায়ু এই অঞ্চলের কার্পাস বয়নশিল্পের সংগঠন ও উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কার্পাস বয়নশিল্পে হস্ত ও শক্তি চালিত তাঁতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলে সূতাকল ও তাঁত সংস্থার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় বর্তমান। তামিলনাডুর কোয়েম্বাটুর এই অঞ্চলের বৃহত্তম কার্পাস শিল্পকেন্দ্র। অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে তামিল াডুর মাদুরাই, তিরুচিরাপল্লী, কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর, কেরালার আলেপ্পি, কুইলন, কোঝিকোড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলে প্রায় ৭ লক্ষ লোক তাঁতশিল্পে এবং ১ লক্ষ লোক সূতা কলে নিযুক্ত আছে। নকশাদার মিহি কাপড়, ড্রিল, শার্টিং, কোটের কাপড়, মোটা শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, তোয়ালে, চাদর ইত্যাদি এই অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

(৩) **পূর্বাঞ্চল** (Eastern Region)—এই অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চল প্রধান। স্থানীয় তুলার অভাবে এই অঞ্চলের প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থ হইলেও কয়লা, শ্রমিক, মূলধন, পরিবহণ ইত্যাদির সহজ সুযোগ ও কলিকাতা বন্দরের নৈকট্য এই অঞ্চলে কার্পাস বয়ন-শিল্প সংগঠনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। এই অঞ্চলের তাঁতশিল্প বিশেষ উন্নত এবং তাঁতজাত নকশাদার ও সৌখিন দ্রব্য বিদেশের বাজারে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এই অঞ্চলে বর্তমানে ৩৬টি সূতাকল আছে। সস্তা মোটা শাড়ি, ধুতি, নকশাদার তাঁতের শাড়ি ধুতি ইত্যাদি এই অঞ্চলের প্রধান উৎপাদন। শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, হাওড়া, বেলঘরিয়া, সোদপুর উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। তাঁত কেন্দ্রের মধ্যে শান্তিপুর, ফরাসডাঙা, ধনিয়াখালি বিখ্যাত। পূর্বাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে বিহারে ৫টি, ওড়িশায় ৪টি ও আসামে ২টি কাপড়ের কল বর্তমান। পশ্চিমবঙ্গের কাঁচামালের অভাব, মূলধনের

অভাব, বিদ্যুৎ ঘাটতি, শ্রমিক অসন্তোষ প্রভৃতি কারণে বেশ কয়েকটি কাপড়ের কল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কয়েকটি সংকটাপন্ন অবস্থায় ধুঁকিতেছে।

(৪) **উত্তরাঞ্চল** (Northern Region) উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার সাহায্যে দিল্লী (৪টি) উত্তরপ্রদেশের কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এই শিল্প (৩১টি) গড়িয়া উঠিয়াছে। কানপুর দড়ি-দড়া, তাঁবু এবং দিল্লী মিহি প্রিণ্টস্, তোয়ালে, শার্টিং স্যুটিং ইত্যাদি তৈয়ারিতে বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে।

(৫) **মধ্যাঞ্চল** (Central Region): এই অঞ্চলের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, ভূপাল, গোয়ালিয়র, অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দরাবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোয়ালিয়রের শার্টি স্যুটিং বিখ্যাত। এই অঞ্চলে ১৯টি কাপড়ের কল বর্তমান।

চিত্র ১২.৫ : ভারতের কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনের বারগ্রাফ।

(৬) **উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল** (North-Western Region)— রাজস্থান (১৮টি), পাঞ্জাব (৮টি) ও হরিয়ানা (৮টি) এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে ৩৪ টি কাপড়ের কল চালু আছে। রাজস্থান ও পাঞ্জাবের সুলভ তুলা ও জলবিদ্যুৎ এই শিল্প গঠনে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। রাজস্থানের জয়পুর প্রিণ্টস বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উৎপাদন—ভারতে উৎপন্ন সূতীবস্ত্রের প্রায় ৫০% বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। ইহার পরেই তামিলনাড়ুর স্থান। ভারতে জনাধিক্য থাকায় কাপড়ের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে ভারতে জনপ্রতি মাত্র ১৪.৬৩ মিটার কাপড় ব্যবহৃত হয়। সভ্যদেশ হিসাবে ইহা যথেষ্ট নহে। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ভারতের বর্তমান উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। নিম্নের সারণীতে কার্পাস সূতা ও বস্ত্র উৎপাদনের গতি প্রদর্শিত হইল—

কার্পাস সুতা ও বস্ত্রের উৎপাদন

	সূতা (মি. কেজি)	বস্ত্র (মি. মিটার)
১৯৫০-৫১	৫৩৪	৪,২১৫
১৯৬০-৬১	৮০১	৬,৭৩৮
১৯৭০-৭১	৯২৯	৭,৬০২
১৯৮০-৮১	১,০৬৭	৮,৩৬৮
১৯৮৩-৮৪	১,১১৮	৮,৭৬৫

সমস্যা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : ভারতের কার্পাস বয়ন শিল্পের বিকাশে বিদেশের বাজারের চাহিদা এক সময় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে বৈদেশিক বাজার সংকুচিত হইলেও আভ্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হয়। কিন্তু তথাপি ইহার অগ্রগতি আশানুরূপ নহে। কারণ—(ক) ভারতে উৎপন্ন তূলা মধ্যম ও ছোট আঁশযুক্ত; (খ) যন্ত্রপাতি পুরাতন ও স্বয়ংচালিত নহে; (গ) শ্রমিক-মালিক বিরোধ। (ঘ) বিদ্যুতের অভাবে শক্তিচালিত তাঁতের প্রসারে অসুবিধা, (ঙ) কৃত্রিম তন্তু টেরিলিন, রেয়ন, নাইলন প্রভৃতির ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা। এই সকল সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতে তাঁতশিল্প ও সূতা কলের উন্নতির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ইহাতে তাঁত ও মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদনের মান উন্নীত হইয়াছে এবং রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশে জলসেচের সাহায্যে পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তূলার উৎপাদন বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে সাগর দ্বীপীয় উৎকৃষ্ট তূলা আমদানির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমাঞ্চলের কাপড়ের কলের আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের প্রয়োজনীয় রঙীন শাড়ীর উৎপাদন তাঁত শিল্পের উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

বাণিজ্য—ভারত বস্ত্র রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয়। ভারতীয় কার্পাস বস্ত্রের প্রধান গ্রাহক বৃটিশ যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, আফগানিস্থান, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি। রপ্তানি বাণিজ্যে ভারতের প্রধান প্রতিযোগী জাপান, চীন, পাকিস্তান। ভারতের উৎপাদন খরচ কমাইতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতির জন্য দুর্বল সংস্থাগুলিকে জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন আর্থিক সাহায্য দিয়া থাকে। রপ্তানিবৃদ্ধির জন্য Textile Export Promotion Council or TEXPROCIL নামে একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। ইহার অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক।

[প্রশ্ন : (১) ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্প গঠনের উপযোগী উপাদানের সহজ লভ্যতা আলোচনা কর। (২) কোন্ কোন্ অঞ্চলে কার্পাস শিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে এবং কেন? (৩) Texprocil কি? (৪) এই শিল্পের ভবিষ্যৎ কি?]

পশম বয়ন শিল্প (Woollen Industry)

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ভারত। জলবায়ুর কারণেই এই দেশে পশম বয়ন শিল্প অন্যান্য বয়ন শিল্পের তুলনায় অনগ্রসর। স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে শীতপ্রধান কাশ্মীর ও পাঞ্জাব অঞ্চলে ইহার সূচনা হয়। সম্ভবত মোগল সম্রাটদের আনুকূল্যে দিল্লী, আগ্রা

প্রভৃতি অঞ্চলে পশম বস্ত্র ও কার্পেট বয়নের প্রচলন ঘটে কুটীর শিল্প হিসাবে। ভারতে আধুনিক পশম বয়ন শিল্পের প্রসার ও উন্নতি ঘটে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে। বর্তমানে এই সকল সংগঠিত পশম বয়ন কেন্দ্রে কম্বল, টুইড, ওরষ্টেড্ প্রভৃতি গরম কাপড় ইত্যাদি তৈয়ারি হয়।

উৎপাদক অঞ্চল (Producing Regions)—পশম শিল্প বিচরণশীল শিল্প। ইহার কাঁচামাল মেষের লোম। মেষ প্রতিপালন জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। ভারতে পশমের যোগান প্রধানত কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও রাজস্থান অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের শুষ্ক মালভূমি এবং কচ্ছ-কাথিয়াবাড় অঞ্চলেও কিছু পরিমাণ পশম আহরণ করা হয়। ভারতের পশম বয়ন শিল্প প্রধানত তিনটি অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়—(১) উত্তর-পশ্চিম ভারতে জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চল (২) মহারাষ্ট্রের বোম্বাই শিল্পাঞ্চল (৩) মধ্য-গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চল। ইহা ব্যতীত নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চল, গুজরাটের ভাদোদরা (বরোদা), জামনগর, রাজস্থানের জয়পুর, বিকানীর এবং কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানেও বিক্ষিপ্তভাবে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম ভারত—শীতপ্রধান অঞ্চলে মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশুর দীর্ঘ লোম হইতে নানাপ্রকার শাল, আলোয়ান, কম্বল, গালিচা প্রভৃতি তৈয়ারি করা হয়। **কাশ্মীরের** নকশা-খচিত শাল বিশ্বে সর্বত্র সমাদৃত। এখানে পশম বয়ন কুটীর শিল্পের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। শ্রীনগর প্রধান শিল্পকেন্দ্র। **পাঞ্জাব ও হরিয়ানা** অঞ্চলে যোগীন্দ্রনগর ও নাঙ্গাল কেন্দ্রের জলবিদ্যুতের সাহায্যে সংগঠিত পশম বয়ন কেন্দ্র পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানে কম্বল, সোয়েটার, মাফলার ও আলোয়ান বোনার পশমের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। ধারিয়াল, লুধিয়ানা, অমৃতসর, জলন্ধর প্রভৃতি বিশিষ্ট কেন্দ্র। **হিমাচল প্রদেশে** সিমলা উল্লেখযোগ্য পশমবস্ত্রবয়ন কেন্দ্র।

মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকা—উত্তরপ্রদেশে কানপুর, রামপুর, মির্জাপুর, বকসার, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে পশম বয়ন শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। এই সকল কেন্দ্রে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, মালব মালভূমি ও চম্বল উপত্যকায় প্রতিপালিত মেষের পশম ব্যবহৃত হয়।

পশ্চিম ভারত—মহারাষ্ট্রে বোম্বাই শিল্পাঞ্চলে এই শিল্প বোম্বাই ও থানা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। বাজারের সুবিধার জন্য এই কেন্দ্র বিকাশ লাভ করিয়াছে। এখানে ভারতের বৃহত্তম পশম বয়ন কেন্দ্র অবস্থিত। রাজস্থান, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্য হইতে এখানে কাঁচা পশম আমদানি করা হয়। কম্বল, গরম পোশাকের কাপড়, সোয়েটার, জ্যাকেট প্রভৃতি উৎপাদনে এই কেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। **গুজরাট রাজ্যে** জামকার ও ভাদোদরা দুইটি উল্লেখযোগ্য পশম বস্ত্র বয়নকেন্দ্র।

উৎপাদন ও বাণিজ্য (Production and Trade) : ভারতে উৎপন্ন পশম নিম্নমানের এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদাও বেশি নহে। ইহার জন্য স্থানীয় জলবায়ু

মুখ্যত দায়ী। অবশ্য স্বল্প চাহিদার জন্য জনসাধারণের দারিদ্র্যও দায়ী। ভারতে ১৯৫০-৫১ সালে মোট ৮৭ লক্ষ কিলোগ্রাম পশম সূতা এবং ৬১ লক্ষ মিটার পশমের কাপড় তৈয়ারি হইয়াছিল। ১৯৭৫-৭৬ সালে আনুমানিক ২০৩ লক্ষ কিলোগ্রাম পশম সূতা এবং ১২৮ লক্ষ মিটার গরম কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৮০-৮১ সালে ভারতে ৪১৭ লক্ষ কিলোগ্রাম পশম সূতা ও ১৬৭ লক্ষ মিটার পশমের কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতের কার্পেট ও পশম সূতা বিদেশের বাজারে সমাদৃত পণ্য। ১৯৮১-৮২ সালে ভারত প্রায় ১৭৩ কোটি টাকা মূল্যের কার্পেট ও কাঁচা পশম রপ্তানি করিয়াছিল। ইউরোপ ও আমেরিকা ভারতীয় কার্পেটের প্রধান ক্রেতা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় কাঁচা পশমের বাজার বিস্তৃত। সূক্ষ্ম কারুকার্যময় পশম বস্ত্র যেমন শাল, আলোয়ান, স্কার্ফ, স্টোল ইত্যাদির চাহিদা বিদেশের বাজারে ক্রমবর্ধমান।

[**প্রশ্ন** : ভারতে পশম বয়ন শিল্পের গঠন ও বিকাশ আলোচনা কর।]

পাট শিল্প (Jute Industry)

পাটশিল্প ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প। জন নিয়োগে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ও অর্থপ্রসূ শিল্প হিসাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে পাটশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীনকালে কুটীর শিল্পের মাধ্যমে পাট তন্তু ও পাটজাত দড়ি, থলি, চট ইত্যাদি প্রস্তুত করা হইত এবং এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই সকল দ্রব্য বিশেষ সমাদর লাভ করিত। ভারতে আধুনিক পাট শিল্পের জন্ম হয় ১৮৫৪ সালে। এই সময় স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডির অনুকরণে কলিকাতার নিকটবর্তী রিষড়াতে জর্জ অকল্যাণ্ড (George Auckland) ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ী বিশ্বম্ভর সেন (Bysumber Sen)-এর উদ্যোগে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। ইহার পরে বরানগরে ভারতের দ্বিতীয় পাটকল স্থাপিত হয়। এই ব্যবসা প্রভূত লাভজনক হওয়ায় ক্রমে হুগলী নদীর উভয় তীরে নূতন নূতন পাটকল গড়িয়া উঠে এবং কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগণার গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে বিশ্বের বৃহত্তম পাটশিল্প বলয় গড়িয়া উঠে।

আঞ্চলিক বণ্টন ও একদেশীভবন (Regional Distribution and Localisation) : পাটশিল্পের প্রধান কাঁচামাল কাঁচাপাট বা সোনালী আঁশ। পাট উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র ছিল পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ)। পূর্ববঙ্গে কয়লা ও শিল্পগঠনের অন্যান্য উপাদানের অভাবহেতু মেঘনা-পদ্মা-গঙ্গা পথে পূর্ববঙ্গের পাট কলিকাতার গঙ্গাতীরবর্তী শিল্পাঞ্চলেই প্রেরিত হইত। ফলে বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে পাটশিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে সর্বাধিক পাট উৎপাদক

অঞ্চল ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে ভারতের পাটশিল্প বিরাট সংকটের সম্মুখীন হয়। কিন্তু দ্রুত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাট ও ইহার ঘনিষ্ঠ পরিপূরক তন্তু মেস্তার চাষ প্রসার লাভ করে। প্রাথমিক আঘাতে ১৯৪৯ সালে ভারতের বহু পাটকল বন্ধ হইলেও ক্রমে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশে পাট চাষের প্রসার ঘটায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভারতে ৭২টি পাটকল ছিল। সম্প্রতি তিনটি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বর্তমানে ৬৯টি পাট কল চালু আছে। ইহার মধ্যে ১৯৮০ সালে ৬টি পাটকল জাতীয়করণ করা হইয়াছে। বর্তমানে ৪৪,৯০০ তাঁত চালু আছে। ভারতের পাটকলগুলি প্রধানত বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে (৫২টি), আসামে (৫টি), অন্ধ্রপ্রদেশে (৪টি), উত্তরপ্রদেশে (৩টি), বিহারে (৩টি), মধ্য-প্রদেশে (১টি) এবং ত্রিপুরায় (১টি) অবস্থিত। ভারতের পাটশিল্পে মোট ২.৭১ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে।

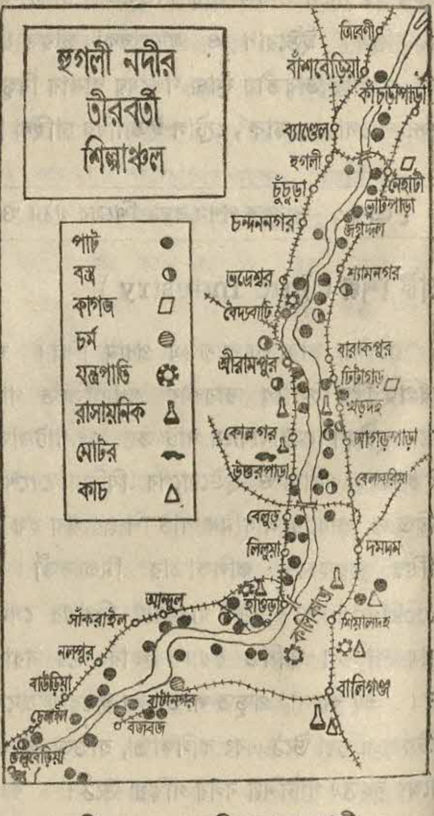

চিত্র ১২.৬ : পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নদীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল

গঙ্গা তীরবর্তী বৃহত্তম কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে পাট শিল্পের একদেশীভবনের অনুকূল কারণসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—(১) পাট বিশুদ্ধ কাঁচামাল হওয়ায় এই শিল্প বিচরণশীল ও বাজারমুখী। সুতরাং জলপথে পূর্ববঙ্গের কাঁচা পাট আমদানি সুলভ ছিল। এমনকি বর্তমান কালেও আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে জলপথে পাট আমদানি সহজ ও সুলভ। (২) রাণীগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের কয়লা সহজ-লভ্য। (৩) এই অঞ্চলে রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিশেষ উন্নত। (৪) কলিকাতা বন্দর মারফত যন্ত্রপাতি আমদানি এবং পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি বিশেষ সুবিধাজনক। (৫) সুলভ বৃটিশ মূলধন ও কলিকাতার ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের সুবিধা। (৬) বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের ব্যাপক বাজার। (৭)

বিহার ও ওড়িশা রাজ্যের সুলভ শ্রমিক। (৮) কলিকাতা তৎকালীন ভারতের রাজধানী ও বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে শিল্পগঠনে সহায়ক ছিল।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে কাঁচামাল উৎপাদক অঞ্চলের প্রতিকূল পরিবর্তন ব্যতীত অন্যান্য উপাদানের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বরং আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার অনেকাংশে অনুকূল হইয়াছে। এই অঞ্চলে কলিকাতার উত্তরে বাঁশবেড়িয়া হইতে কলিকাতার দক্ষিণে বিড়লাপুর পর্যন্ত এই প্রধান অঞ্চলটি বিস্তৃত। নৈহাটি, কাঁকিনারা, শ্যামনগর, টিটাগড়, আগরপাড়া, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, হাওড়া, বাউড়িয়া, বালি, বজবজ, বিড়লাপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পাটকল কেন্দ্র।

ভারতের অন্যান্য পাটকল কেন্দ্রের মধ্যে **বিহারের** কাটিহার ও মুক্তারপুর, **উত্তর-প্রদেশের** কানপুর ও গোরক্ষপুর এবং **অন্ধ্রপ্রদেশের** চিতাভালসা বিশাখাপত্তনম জিলার বিমলিপত্তনম তালুকের অন্তর্গত এবং নেলিমারলা অঞ্চলে অবস্থিত। অন্ধ্রপ্রদেশে মেস্তার উৎপাদন বেশি বলিয়া এখানে পাটের সহিত মেস্তা অধিক ব্যবহার করা হয়। **ত্রিপুরায়** একটি ও **মধ্যপ্রদেশের** রায়গড়ে একটি পাটকল বর্তমান।

উৎপাদন: ভারতে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনে বৈচিত্র্য দেখা যায়। সাধারণ সুতলি, দড়ি হইতে থলি, চট, ক্যানভাস যেমন তৈয়ারি হয় তেমনি তাঁবু, ত্রিপল, কার্পেট, ফ্লানেল, লিনোলিয়াম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। নিম্নের সারণীতে উৎপাদনের গতি প্রদর্শিত হইল :

ভারতে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন (ল. মে. ট)

বৎসর	উৎপাদন	বৎসর	উৎপাদন
১৯৬০-৬১	১০·৯৭	১৯৮০-৮১	১৩·৯২
১৯৭০-৭১	১০·৬০	১৯৮২-৮৩	১৩·৩৮
১৯৭৫-৭৬	১৩·০২	১৯৮৩-৮৪	১০·৮৯

Source : Economic Survey, India, 1984-85

পাটশিল্পের সমস্যা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদেশে পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির অসুবিধা হইতেই ভারতীয় পাটশিল্পের সমস্যার উদ্ভব। দেশবিভাগের পরে এই সমস্যার প্রসার ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, যথা—(১) দেশবিভাগের ফলে প্রায় ৭০% কাঁচাপাট উৎপাদক অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। (২) যন্ত্রপাতি পুরাতন ও অকেজো। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে, চীনদেশে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে প্রতিযোগিতায় অসুবিধা। (৩) আভ্যন্তরীণ পাটের মূল্য বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি। (৪) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিকল্প তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধি—জাভার

'রোজেলা', মাঞ্চুরিয়ার 'কেনাফ', ফিলিপাইনের 'ম্যানিলা হেম্প', ইন্দোচীনের 'পলম্প', রাশিয়ার 'তিসির বল্কল', আমেরিকা ইউরোপে কাপড়, প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার। (৫) পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, মিশর, ব্রেজিল, ব্রহ্মদেশ, ইরাণ, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে নূতন পাটকল স্থাপন। এই সকল কারণে ভারতের পাটশিল্প গভীর সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশে পাট ও মেস্তার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়। ফলে পাট ও মেস্তার উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। চতুর্থ পরিকল্পনায় পাটশিল্পের আধুনিকীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির সহিত আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক প্রচারকার্য চালান হয় এবং পাটের নূতন নূতন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ব্যাপক গবেষণার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৮৩-৮৪ সালের মধ্যে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের ধার্য লক্ষ্যমাত্রা ১৫ ল. মে. টনে পৌছান সম্ভব হয় নাই।

বাণিজ্য (Trade): পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানিতে ভারত বিশ্বে প্রথম। এই দেশে উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্যের বেশির ভাগই রপ্তানি করা হয়। ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (৩০%), ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য (১৬%), আর্জেন্টিনা (১০%), মিশর, রাশিয়া কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, কিউবা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ। ভারতে উৎপাদন ব্যয় ও রপ্তানি শুল্ক বেশি হওয়ায় বিদেশের বাজার সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। বাংলাদেশ ভারতের প্রধান প্রতিযোগী। ভবিষ্যতে চীন ও ব্রেজিলের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সম্ভাবনা রহিয়াছে। ১৯৮১-৮২ সালে ভারত ২৫০·১ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। ১৯৭৫ সালে ভারতের পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির মূল্য ছিল ২৫৬ কোটি টাকা। ১৯৮৩-৮৪ সালে ভারত বাংলাদেশ হইতে ২ লক্ষ বেল (বেল= ১৮০ কে.জি.) পাট আমদানি করিয়াছিল।

[**প্রশ্ন**: (১) হুগলী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে পাট শিল্পের একদেশীভবন ঘটার কারণ কি? (২) পাট শিল্পের প্রধান সমস্যা কি? এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি? (৩) পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি?]

কাগজ শিল্প (Paper Industry)

প্রাচীন কালে ভারতে ছিন্নবস্ত্র, তুলা ইত্যাদির সাহায্যে একপ্রকার কাগজ তৈয়ারি হইত। ইহা তুলট কাগজ নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্র এই তুলট কাগজেই লিখিত হইত। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতে কাগজ তৈয়ারির প্রথম উদ্যোক্তা উইলিয়াম কেরী নামক একজন ইংরেজ। তিনি ১৮১৬ সালে তামিলনাড়ুর তাঞ্জোরের অন্তর্গত ট্রাঙ্কুবার নামক স্থানে প্রথম কল স্থাপন করেন। অল্পকাল পরে

ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর ১৮৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া জেলার বালীতে প্রথম আধুনিক কাগজের কল স্থাপিত হয় এবং ক্রমে ইহা উন্নতি লাভ করে। সাক্ষরতা বৃদ্ধির সাহত দেশে কাগজের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। কাগজ উৎপাদনে ভারতের অগ্রগতি বর্তমানে আশাব্যঞ্জক।

কাঁচামাল ও সংগঠনের অনুকূল উপাদান (Favourable Conditions) : কাগজ উৎপাদনে প্রধানতম প্রয়োজন কাঁচামাল, রাসায়নিক দ্রব্য এবং পরিষ্কার জল। অন্যান্য উৎপাদনের মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তি, পরিবহণ, শ্রমিক, বাজার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রধান কাঁচামাল সরলবর্গীয় বৃক্ষের নরম কাঠ, বাঁশ, সাবাই ঘাস। ইহা ব্যতীত শণ,

চিত্র ১২.৭ ভারতের কাগজ শিল্পের নির্দেশক অঞ্চল সমূহ

পাট, তুলা, পুরাতন কাগজ, ইক্ষুর ছোবড়া, ছিন্নবস্ত্র ইত্যাদি নিকৃষ্ট ধরনের কাগজ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। **পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা, ত্রিপুরা** ও **মহারাষ্ট্রের** পশ্চিমঘাট

পর্বতের ঢালে প্রচুর বাঁশ জন্মে। **উত্তরপ্রদেশ, বিহার** ও **মধ্যপ্রদেশে** প্রচুর সাবাই ঘাস জন্মে। পশ্চিম হিমালয়ে **কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশের উত্তরাখণ্ডে এবং পূর্ব হিমালয়ের দার্জিলিং, অরুণাচল** প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর নরম কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। **দক্ষিণ ভারতের** নীলগিরি অঞ্চলে নরম কাষ্ঠের বনভূমি আছে। ভারতে বাঁশ ও সাবাই ঘাসই এখনও সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কাগজ শিল্পে প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে কষ্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, ক্লোরিন, ব্লিচিং পাউডার, সোডিয়াম সালফেট, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট প্রধান। সুলভ শক্তি সম্পদের যোগান ও উন্নত পরিবহণের ব্যবস্থা ইহার কেন্দ্রীভবনে সহায়তা করে।

আঞ্চলিক বণ্টন (Regional Distribution): কাগজ শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্র ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করে। বর্তমানে ভারতে ১৭৭টি কাগজের কল আছে। ইহাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৯·১৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ইহার মধ্যে মহারাষ্ট্রে ১৭টি, পশ্চিমবঙ্গে ১১টি, গুজরাটে ৯টি, কর্ণাটকে ৭টি, মধ্যপ্রদেশে ৪টি ও হরিয়ানায় ৪টি কল আছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, কেরালা, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে কাগজের কল আছে। ইহা ব্যতীত নাগাল্যাণ্ড, আসাম (কাছাড় ও নওগাঁও), অরুণাচল, মধ্যপ্রদেশ ও কেরালায় ৬টি নূতন কাগজ মণ্ড ও কাগজ তৈয়ারির কল স্থাপনের কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। কর্ণাটক ও কেরালার প্রকল্প দুইটিতে যথাক্রমে ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে উৎপাদন শুরু হইয়াছে। ভারতের কাগজ কলে নানাবিধ ব্যবহারের উপযোগী কাগজ তৈয়ারি হইতেছে, যথা—লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ (Writing and Printing Paper), দলিলের কাগজ (Bond Paper), শক্ত মলাটের কাগজ (Kraft Paper), সংবাদ-পত্রের কাগজ (Newsprint), সিগারেটের কাগজ (Cigarette Paper), টিস্যু কাগজ (Tissue Paper) ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গে কাগজের কলগুলি প্রধানত **টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, হালিশহর, ত্রিবেণী, রাণীগঞ্জ** প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে আসাম ও ওড়িশার বাঁশ এবং মধ্যপ্রদেশের সাবাই ঘাস ব্যবহৃত হয়। ছিন্নবস্ত্র, ময়লা কাগজ, তুলা, পাটও এখানে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লা, কলিকাতা বন্দরের নৈকট্য, স্থানীয় বাজার এবং উন্নত রেল ও সড়ক পরিবহণ এই অঞ্চলের কাগজ শিল্পের প্রসারে বিশেষ সহায়ক। ত্রিবেণীতে একটি টিস্যু কাগজের কল আছে। **মহারাষ্ট্রের** অধিকাংশ কাগজ কল **বোম্বাই, পুনে, খপোলি, অমরাবতী** ও **নাগপুরে** অবস্থিত। আমদানিকৃত কাষ্ঠমণ্ড ছাড়া এখানে পুরাতন কাগজ ব্যবহার করা হয়। **উত্তরপ্রদেশে লক্ষ্ণৌ** ও **সাহারানপুর** এবং **বিহারের ডালমিয়ানগরে** কাগজের কলে সাবাই ঘাস অধিক ব্যবহৃত হয়। **পাঞ্জাবের জগধ্রী, ফরিদাবাদ, হরিয়ানার**

যমুনানগরে নেপালের একপ্রকার ঘাস ব্যবহার করা হয়। **গুজরাটের আমেদাবাদে, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজমহেন্দ্রী এবং সিরপুর, তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ, কেরালার আলওয়ে, পুনালুর, কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর, দাণ্ডেলি ও ভদ্রাবতী, ওড়িশার ব্রজরাজনগর, মধ্যপ্রদেশের বল্লারপুর** প্রভৃতি স্থানে কাগজের কল আছে। **ভূপালের নিকটে হোসঙ্গাবাদে** একটি নোটের কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে।

নিউজ-প্রিন্ট : ভারতে ১৯৪৭ সালে মধ্যপ্রদেশের নেপানগরে একটি নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনের কল স্থাপিত হয়। ১৯৪৮ সালে ইহা সরকারী মালিকানায় আনা হয়। ভারতে নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনের ইহাই একমাত্র কল ছিল এতদিন। ইহার উৎপাদন ক্ষমতা বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে বার্ষিক ৩০,০০০ মেট্রিক টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৭৫,০০০ মেট্রিক টন করা হইয়াছে। স্থানীয় স্প্রুস গাছের নরম কাষ্ঠ এখানে ব্যবহৃত হয়। ১৯৮২ সালে কর্ণাটক ও কেরালায় নূতন দুইটি নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন কেন্দ্র চালু করা হইয়াছে। অরুণাচলে একটি নিউজপ্রিন্ট কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে সিকিমেও কাষ্ঠমণ্ড ও কাগজ উৎপাদনের একটি কল স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

উৎপাদন ও সমস্যা : ভারতে ১৯৫০ সালে মোট কাগজের উৎপাদন ছিল ১·১৬ লক্ষ মে. ট.। এই সময় নিউজপ্রিন্ট ছিল না। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নূতন কল স্থাপিত হইবার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নের সারণীতে উৎপাদনের অগ্রগতি নির্দেশিত হইল :

ভারতে কাগজ উৎপাদন লক্ষ মেট্রিক টন

বৎসর	কাগজ ও বোর্ড	নিউজপ্রিন্ট	বৎসর	কাগজ ও বোর্ড	নিউজপ্রিন্ট
১৯৫১	১·১৬	—	১৯৮১	১২·৪৩	০·৫৮
১৯৬১	৩·৬৫	০·২৬	১৯৮২	১২·০৫	০·৯৬
১৯৭১	৭·৭৮	০·৪০	১৯৮৩	১১·৮২	১·৬০

ভারতে কাগজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সত্ত্বেও উৎপাদন আশানুরূপ নহে। কারণ, এই শিল্পের কয়েকটি গুরুতর সমস্যা বর্তমান। (১) বাঁশ ও নরম কাষ্ঠ অঞ্চল হইতে শিল্পক্ষেত্রের দূরত্ব। (২) বাঁশের অভাব এবং হিমালয় অঞ্চল হইতে নরম কাষ্ঠ আনয়নের অসুবিধা। (৩) পরিবহণের অসুবিধা ও ব্যয় বৃদ্ধি। (৪) কয়লার অসম বণ্টন। (৫) রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব। (৬) এই শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব। এই সকল অসুবিধা দূরীকরণের জন্য প্রচেষ্টা চলিতেছে। কাগজ শিল্পের জন্য বনভূমি সংরক্ষিত করা, বাঁশের যোগান বৃদ্ধি করা এবং রাসায়নিক দ্রব্যের

উৎপাদন বৃদ্ধি করা বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। আশা করা যায় আসাম, কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে নূতন কল স্থাপিত হইলে অবস্থার উন্নতি ঘটিবে।

বাণিজ্য : ভারতে বর্তমানে কাগজের চাহিদার পরিমাণ বার্ষিক ১৫ লক্ষ মে. টন। সুতরাং কাগজের চাহিদা পূরণের জন্য নিউজপ্রিন্ট ও কাষ্ঠমণ্ড প্রতি বৎসরই আমদানি করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ১০'১৪ কোটি টাকার কাগজ, কাগজের বোর্ড ইত্যাদি আমদানি করা হইয়াছিল। ১৯৮২-৮৩ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৭'৫ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত ২৭'২ কোটি টাকার কাগজমণ্ড ও কাগজ তৈয়ারির প্রয়োজনীয় বর্জ কাগজ আমদানি করা হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালে কাগজ মণ্ড ও বর্জ কাগজের আমদানি ধার্য করা হইয়াছে ৮২'৩ কোটি টাকা এবং কাগজ, কাগজের বোর্ড ইত্যাদির আমদানির পরিমাণ ধার্য হইয়াছে ১৭২'৬ কোটি টাকা। ভারতে জনপ্রতি কাগজের চাহিদা ১ কিলোগ্রাম। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইহার পরিমাণ ১৮০ কিলো এবং পশ্চিম ইউরোপে ৯০ কিলো গ্রাম। ভারত কানাডা রাশিয়া, নরওয়ে, সুইডেন, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে কাগজ ও কাগজ মণ্ড আমদানি করে। ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহে সামান্য পরিমাণ কাগজ রপ্তানিও করিয়া থাকে। কারণ ব্রহ্মদেশ, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে কাগজ শিল্পের বিকাশ ঘটে নাই।

[**প্রশ্ন :** (১) ভারতে কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল কি কি ? (২) ভারতে কাগজ শিল্প কোন্ কোন্ অঞ্চলে অধিক সংগঠিত দেখা যায় ও কেন ? (৩) ভারতে নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনের সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা কর।]

চিনি শিল্প (Sugar Industry)

চিনি শিল্প ভারতের অন্যতম প্রাচীন শিল্প। প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে রচিত "প্রতিমোক্ষ" নামক বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থে চিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। চীন, মিশর হইতেও চিনি আমদানি করা হইত। চীন হইতে 'চিনি', মিশর হইতে 'মিশরি' কথার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ভারতে আধুনিক চিনি কল স্থাপিত হয়, ১৮০৩ সালে বিহারে। কিন্তু জাভা চিনির প্রতিযোগিতায় ইহার অগ্রগতি আশানুরূপ না হওয়ায় ১৯৩২ সালে চিনি শিল্পে সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য করা হয়। ১৯৩০ সালে ভারতে মাত্র ২৯টি চিনির কল ছিল। কিন্তু সংরক্ষণ শুল্ক ধার্যের ফলে ১৯৩৭ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৮। বর্তমানে ভারতে ৩২০টি চিনির কল আছে।

সংগঠনের অনুকূল অবস্থা ও উৎপাদন পদ্ধতি (Organisational Facilities and Methods of Production) : চিনি শিল্পের প্রধান কাঁচামাল ইক্ষু ও

বীট। ভারত ইক্ষু উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম। এই দেশে ইক্ষু ক্ষেত্রগুলি চিনির কল হইতে দূরে অবস্থিত। সুতরাং ইক্ষুক্ষেত্র হইতেচিনি কলে ইক্ষু পরিবহণে দ্রুত ও উন্নত যোগাযোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ব্যতীত শক্তি, শ্রমিক, বাজার, মূলধন ইত্যাদির সহজ ও সুলভ যোগান অপরিহার্য। ভারতে তিনটি পদ্ধতিতে চিনি উৎপাদিত হয়। (ক) ভ্যাকুয়াম প্যান প্রথা—আধুনিক বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে ইক্ষুর রস হইতে সরাসরি সাদা চিনি তৈয়ারি হয়। বর্তমানে এই জাতীয় কলের সংখ্যাই সর্বাধিক। (খ) দেশীয় প্রথা—ইক্ষুর রস জ্বাল দিয়া গুড় তৈয়ারি করা হয় এবং ঐ গুড় হইতে চিনি তৈয়ারি করা হয়। (গ) খান্দেশারি প্রথা—এই প্রথায় ইক্ষু গুড়ের ঝোলা অংশ বাদ দিয়া দানা অংশ চিনিতে

চিত্র ১২.৮ : ভারতের চিনি শিল্পের নির্দেশক অঞ্চলসমূহ।

পরিণত করা হয়। একপ্রকার জলজ ঘাসের সাহায্যে ইহা পরিষ্কার করা হয় বলিয়া ইহার রং কিছুটা লাল।

উপজাত দ্রব্য (By-Product): চিনি শিল্পের তিনটি উপজাত দ্রব্য (ক) ছিবড়া (Bagassee), (খ) ঝোলাগুড় (Molasses), ও (গ) তলানি (Pressmud)। ছিবড়া হইতে শক্ত মোটা কাগজ ও কাগজ তৈয়ারির মণ্ড, ঝোলাগুড় হইতে সুরাসার, রাসায়নিক দ্রব্য ও মদ্য এবং তলানি হইতে কার্বন পেপার, জুতার কালি, মোম, প্ল্যাস্টিক প্রভৃতি তৈয়ারি হয়।

উৎপাদক অঞ্চল ও একদেশীভবন (Producing Regions and Localisation): ইক্ষু অবিশুদ্ধ (weight losing) কাঁচামাল হওয়ায় চিনি শিল্প ইক্ষু অঞ্চলেই সংগঠিত হয়। **উত্তরপ্রদেশ-বিহার, মহারাষ্ট্র-গুজরাট** এবং **অন্ধ্র-তামিলনাডু-কর্ণাটক** এই তিনটি অঞ্চলেই প্রধানত ভারতের শর্করা শিল্পের একদেশীভবন ঘটিয়াছে। এই প্রধান তিনটি অঞ্চল ব্যতীত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যেও শর্করা শিল্পের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, গোয়া, পণ্ডিচেরী ও নাগাল্যাণ্ডে একটি করিয়া চিনি কল আছে। (১) **উত্তরপ্রদেশ—বিহার অঞ্চল**—উত্তরপ্রদেশে ৯১টি ও বিহারে ৩০টি চিনি কল আছে। এই অঞ্চলে চিনি শিল্পের একদেশীভবনের অন্যতম প্রধান কারণ—(১) বিহার ও উত্তরপ্রদেশের উত্তরাংশে জলবায়ু ও মৃত্তিকা ইক্ষু চাষের উপযোগী। জলসেচের সুবন্দোবস্ত থাকায় ব্যাপক ইক্ষুর চাষ হয়। (২) ইক্ষুর রসে চিনির পরিমাণও বেশী হয়। (৩) সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য। (৪) কয়লার অভাব জলবিদ্যুতের সাহায্যে পূরণ করা হয়। (৫) ভারী শিল্প সংগঠনের অসুবিধা। (৬) রেল ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি। **উত্তরপ্রদেশের** সাহারাণপুর, মীরাট, কানপুর, মজঃফরনগর, গোরক্ষপুর এবং **বিহারের** চম্পারণ, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে বেশির ভাগ কল অবস্থিত। বর্তমানে ভারতের প্রায় ৫০% চিনি এই অঞ্চলে তৈয়ারি হয়। (২) **মহারাষ্ট্র-গুজরাট অঞ্চল**—এই অঞ্চলে প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হয়। উত্তরাঞ্চলের তুলনায় এখানে হেক্টর প্রতি ইক্ষুর উৎপাদন বেশি এবং ইক্ষুরসে চিনির পরিমাণও বেশি। স্থানীয় জলবিদ্যুতের যোগান, শ্রমিকের প্রাচুর্য, রেল-সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, বোম্বাই বন্দরের নৈকট্য প্রভৃতি এই অঞ্চলের চিনি শিল্পের উন্নতির সহায়ক। **মহারাষ্ট্রের** আহম্মদনগর প্রধান কেন্দ্র ; অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে শোলাপুর, সাংলি, সকরওয়াদি উল্লেখযোগ্য। **গুজরাটের** আমেদাবাদ উল্লেখযোগ্য। (৩) **অন্ধ্র-তামিলনাডু-কর্ণাটক অঞ্চল—কোয়েম্বাটুর ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্রের** উন্নত বীজ, উপকূলের সামুদ্রিক জলবায়ু, উর্বর মৃত্তিকা, ব্যাপক জলসেচ ইত্যাদির আনুকূল্যে এই অঞ্চলের ইক্ষুর উৎপাদন ক্রমবর্ধমান। স্থানীয় জলবিদ্যুৎ, প্রচুর শ্রমিক, বিশাখাপত্তনম্ ও মাদ্রাজ বন্দরের নৈকট্য, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাজার ইত্যাদি এই অঞ্চলের শর্করা শিল্পের প্রসারে

বিশেষ সহায়ক। **অন্ধ্রপ্রদেশের** সঙ্করনগর, কৃষ্ণা, বিশাখাপত্তনম্, **তামিলনাডুর** কোয়েম্বাটুর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য চিনি শিল্প কেন্দ্র। এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়।

পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বীরভূমে একটি চিনিকল আছে। পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জিলার জলবায়ু ও মৃত্তিকা ইক্ষু চাষের সহায়ক। পর্যাপ্ত কাঁচামাল, কলিকাতা বন্দরের নৈকট্য, স্থানীয় ব্যাপক বাজার এবং ইক্ষু শিল্প সংগঠনের উপযুক্ত পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলে ইক্ষু শিল্পের অনগ্রসরতা বিস্ময়কর।

উৎপাদন ও সমস্যা (Production and Problem) : ভারতে চিনির উৎপাদন ১৯৫০-৫১ সালে ছিল ১১.৩৪ লক্ষ মে. ট.। ১৯৬০-৬১ সালে ৩০.২১ লক্ষ মে. ট. এবং ১৯৭০-৭১ ও ১৯৮০-৮১ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৭.৪০ লক্ষ মে. ট. ও ৫১.৪৮ লক্ষ মে. ট.। ১৯৮৩-৮৪ সালে ভারতে ৫৮.৮৯ ল. মে. ট. চিনি উৎপাদিত হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে চিনির ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে কম। পৃথিবীতে গড় মাথাপিছু চিনি ব্যবহারের পরিমাণ প্রায় ৭ কিলো। ইহার কারণ ভারতে গুড় ব্যবহারের পরিমাণ বেশি। ভারতে চিনি শিল্পের উন্নতির ব্যাপক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ইহার সমস্যাও যথেষ্ট রহিয়াছে। (১) ইক্ষুর হেক্টর প্রতি উৎপাদন কম। (২) ইক্ষুর রসে চিনির পরিমাণ কম। (৩) ইক্ষুর মরশুম মাত্র ৫ মাস। ফলে চিনি কলগুলি কাঁচা মালের অভাবের প্রায় ৫/৬ মাস বন্ধ থাকে। (৪) রস নিষ্কাশন ও পরিশোধন ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় অপচয় বৃদ্ধি পায়। (৫) উপজাত দ্রব্যের সঠিক ব্যবহার না হওয়ায় চিনির মূল্য বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় চিনি শিল্পে প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে এবং প্রায় ৩ কোটি ইক্ষু চাষী ইহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বর্তমানে ভারতে মোট ৩২০টি (১৯৮১-৮২) চিনিকলের মধ্যে প্রায় ১৫৪টি চিনি কল সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত। দক্ষিণ ভারতেই সমবায় পরিচালিত চিনি কলের সংখ্যা বেশি।

বাণিজ্য (Trade) : চিনি শিল্প ভারতের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৭ সালে ভারত প্রথম চিনি রপ্তানি শুরু করে। ভারতীয় চিনির প্রধান আমদানিকারক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি। ১৯৭৫-৭৬ সালে ভারত চিনি রপ্তানি করিয়া প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কিন্তু ১৯৮০-৮১ সালে ভারতের চিনি রপ্তানির পরিমাণ খুবই হ্রাস পায় এবং মাত্র ৭১,৫০০ টন চিনি রপ্তানি করিয়া ৩৫.৯৬ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আজিত হয়। ১৯৮২-৮৩ সালে ২,১২,৭০০ টন চিনি রপ্তানি করা হয়। ইহার মূল্য ছিল ৬২.৩৭ কোটি টাকা।

১৯৮৩-৮৪ সালে রপ্তানির পরিমাণ ২·৪০ লক্ষ টন এবং মূল্য ১৩৯·৮৬ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রশ্ন: (১) চিনি শিল্পের একদেশীভবনে কোন্ কোন্ উপাদান অপরিহার্য? (২) ভারতের চিনি শিল্প উত্তরপ্রদেশে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ কি? (৩) ভারতে চিনি শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

রাসায়নিক শিল্প (Chemical Industry)

বর্তমান শিল্প সভ্যতার অগ্রগতি অনেকাংশেই রাসায়নিক শিল্পের বিকাশ ও উন্নতির উপর নির্ভরশীল। ভারতে অতি প্রাচীন কালেও লবণজাতীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সোরা, ফিটকিরি, অ্যাসিড প্রভৃতি তৈয়ারি হইত। বিশ্বে আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের বিকাশ ঘটে মূলতঃ শিল্প-বিপ্লবের পরে। ভারতে আধুনিক রাসায়নিক শিল্পের বিকাশ ঘটে ১৮৩০ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জিলার **কোন্নগরে** বৃটিশ পুঁজি ও ব্যবস্থাপনায় প্রথম সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানা স্থাপিত হয়। ইহার পরে ক্রমে আরও নূতন নূতন কারখানা স্থাপন শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে বোম্বাই-আমেদাবাদ, দক্ষিণে তামিলনাড়ু-কর্ণাটক ও পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ-বিহার ক্ষেত্রে নানাবিধ রাসানিক দ্রব্যাদির কারখানা কার্যকরভাবে চালু হয়। স্বাধীনতা লাভের পর দেশে অতিরিক্ত চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটে ও ইহার উৎপাদন সামগ্রীর বিভাজনও ঘটে।

শ্রেণীবিভাগ (Classification): ভারতে উৎপাদিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি কার্যকারিতা ও উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানত দুইটি বিভাগে ও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নানা উপবিভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে এই শ্রেণীবিভাজন ছকের সাহায্যে দেখান হইল :

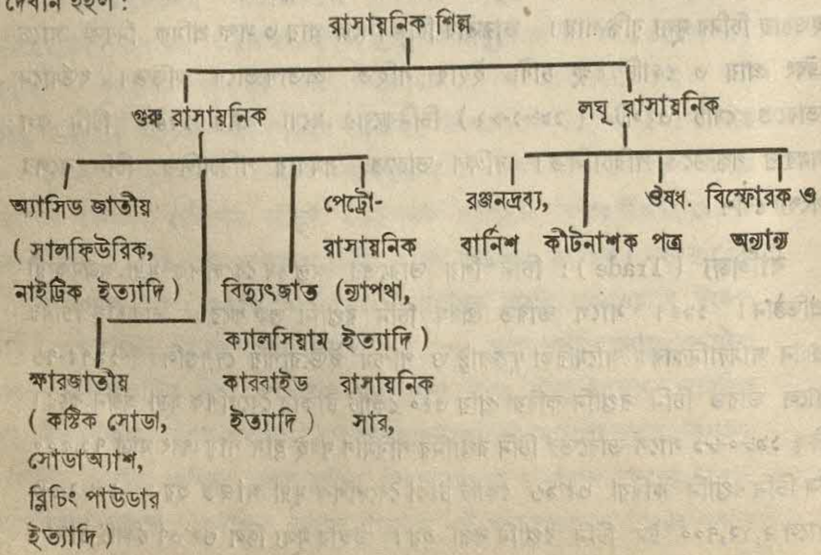

আঞ্চলিক বণ্টন (Regional Distribution): **অ্যাসিড** (Acid)—গুরু রাসায়নিকের মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য অ্যাসিডের মধ্যে নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নানাপ্রকার অ্যাসিড রং, বিস্ফোরক দ্রব্য, খনিজ তেল পরিশোধন, চামড়া ট্যানিং প্রভৃতি কার্যে ইহার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। রাসায়নিক সার উৎপাদনের ইহা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সালফিউরিক অ্যাসিড ও অন্যান্য অ্যাসিড তৈয়ারের প্রধান কাঁচামাল গন্ধক। জিপসাম পাইরাইটস, কয়লা ও নানা প্রকার ধাতু হইতে গন্ধক নিষ্কাশিত হয়। ভারতে এই সকল কাঁচামাল প্রচুর পাওয়া যায়। এই দেশে গন্ধকের উৎপাদন কম বলিয়া বিদেশ হইতে গন্ধক আমদানি করা হয়। বর্তমানে ভারতে প্রায় ৬৬টি সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানা আছে। ইহার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ (১৩টি) ও মহারাষ্ট্রেই (১২টি) সর্বাধিক কারখানা অবস্থিত। কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লীতেও ইহার কারখানা আছে।

ক্ষার রাসায়নিক (Alkalies)—কষ্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি ক্ষার রাসায়নিকের অন্তর্ভুক্ত। কষ্টিক্ সোডা. সোডা অ্যাশ প্রভৃতির মৌলিক উপাদান কয়লা, চুনাপাথর, লবণ, অ্যামোনিয়া সালফেট ইত্যাদি। সুতরাং কাঁচামাল উৎপাদনকারী অঞ্চলেই ইহার কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য করা যায়। সাবান, কাগজ, কাঁচ তৈয়ারি, বয়নশিল্প ও খনিজ তেল পরিশোধন প্রভৃতি কার্যে ইহার ব্যাপক ব্যবহার হয়। পশ্চিমবঙ্গের রিষড়া, বিহারের ডেহরি-অন-শোন, তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ, গুজরাটের আমেদাবাদ ও মিঠাপুর, দিল্লী, পাঞ্জাব, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশায় কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতির কারখানা অবস্থিত। ভারতে উৎপাদিত এই সকল রাসায়নিক দ্রব্য পর্যাপ্ত না হওয়ায় যুক্তরাজ্য, জাপান, হাঙ্গেরী; পশ্চিম জার্মানী ও রাশিয়া হইতে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি করা হয়।

রাসায়নিক সার (Chemical Fertilizer): ভারতের কৃষিক্ষেত্রে পূর্বে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গোবর, খইল, লবণ, হাড়ের গুঁড়া, মনুষ্য-পুরীষ ও নানা পচানো আবর্জনা ব্যবহার করা হইত। ক্রমে খাদ্য ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পের কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার প্রয়োগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ হইতে প্রধানত রাসায়নিক সার উৎপন্ন হয়। নাইট্রোজেন হইতে অ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, ফসফরাস হইতে সুপার ফসফেট, অ্যামোনিয়াম ফসফেট, নাইট্রোফসফেট এবং পটাশ হইতে পটাসিয়াম সার তৈয়ারি হয়। কৃষিক্ষেত্রে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস-ঘটিত সারের প্রয়োজন সর্বাধিক।

ভারতে তামিলনাড়ুর **রাণীপেট** নামক স্থানে ১৯০৬ সালে প্রথম সুপার ফসফেট উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ সালে কর্ণাটকের **বেলুগোলা** ও ১৯৪৭

সালে কেরালার **আলওয়েত** কৃষিসার কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু সার শিল্পের প্রকৃত উন্নতি ও প্রসার ঘটে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরু হইতে। ১৯৫১ সালে বিহারের **সিন্ধ্রিতে** এশিয়ার বৃহত্তম অ্যামোনিয়া সালফেট উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হয়। ঐ সময় ভারতে মোট সার কারখানার সংখ্যা ছিল ৯টি। বর্তমানে এই সংখ্যা ৭১টি। ইহার মধ্যে ২৫টি কেন্দ্র সরকারী এবং ৪৬টি কেন্দ্র বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত। সরকারী সার উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে বিহারের সিন্ধি, পাঞ্জাবের নাঙ্গাল, মহারাষ্ট্রের ট্রম্বে, ওড়িশার রাউরকেল্লা, কেরালার আলওয়ে, তামিলনাড়ুর নিভেলী, আসামের নামরূপ ও পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, হলদিয়া উল্লেখযোগ্য। বেসরকারী সংস্থাগুলি প্রধানত গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ু রাজ্যে সংগঠিত।

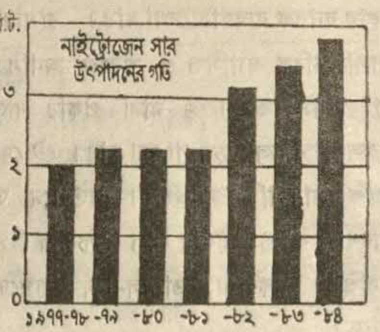

চিত্র ১২.৯ : নাইট্রোজেন সার উৎপন্নের বারগ্রাফ

ভারতে ১৯৬১ সালে সার উৎপাদনে নিয়োজিত দুইটি সরকারী সংস্থা ছিল—**ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া** এবং **ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার লিমিটেড**। ১৯৭৮ সালের মধ্যে ঐ দুইটি সংস্থাকে চারিটি সংস্থায় পুনর্গঠিত করা হয়। নূতন সংস্থা দুইটি হইল—**হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন** এবং **রাজ্য কেমিক্যালস অ্যাণ্ড ফার্টিলাইজার**। সার উৎপাদনে ন্যাপথার চাহিদা সর্বাধিক। ভারতে ন্যাপথার অভাব হেতু সম্প্রতি সরকার কয়লানির্ভর সার উৎপাদনের জন্য কয়লা খনি অঞ্চলে যেমন ওড়িশার তালচের, মধ্যপ্রদেশের কোরবা, অন্ধ্রপ্রদেশের রামাগুন্ডাম-এ সার কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতে সারের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও দেশের চাহিদা পূরণে বিদেশ হইতে প্রচুর সার আমদানি করা হয়। ইহার মধ্যে পটাশঘটিত সারের পরিমাণই বেশি। নিম্নের সারণীতে রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন দেখান হইল :

ভারতে রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন (**হা. মে. ট.**)

	১৯৫০-৫১	১৯ ০-৭১	১৯৮০-৮১	১৯৮৩-৮৪
সালফিউরিক অ্যাসিড	১০১	১,১৯৭	২,০৫৩	২,০৭৬
সোডা অ্যাশ	৪৫	৪৪৯	৫৬৩	৭৮১
কষ্টিক সোডা	১২	৩৭১	৫৭৮	৬৩০
নাইট্রোজেন সার	৯	৮৩০	২,১৬৪	৩,৪৮৫
ফসফেট সার	৯	২২৯	.৮৪২	১,০৪৮

Source : Economic Survey (India), 1984-85.

লঘু রাসায়নিক শিল্প (Light Chemicals) : ঔষধপত্র, রঞ্জন দ্রব্য, বার্নিশ আলোকচিত্রের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য, কীটনাশক, বেনজিন, ক্যাফিন, ভিটামিন, ডি.ডি.টি., অ্যালকোহল, গ্লিসারিন, ন্যাপথলিন, ফেনল, অ্যাসিটোন, ক্রিয়োজেট, সেন্ট ইত্যাদি লঘু রাসায়নিক শিল্পের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ভারতে বেসরকারী মালিকানায় এই শিল্পের বিকাশ ঘটে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। প্রায় ৯৫ ভাগ লঘু রাসায়নিক শিল্প বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত। ভারত সরকার কর্তৃক পুণার নিকট **পিমপিড়িতে** ও উত্তরপ্রদেশের **হৃষিকেষে** দুইটি অ্যান্টিবায়োটিক ড্রাগপ্ল্যান্ট এবং অন্ধ্রপ্রদেশের **হায়দরাবাদে** একটি সিন্থ্যাটিক ড্রাগপ্ল্যান্ট স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল প্ল্যান্টে পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। দিল্লী ও কেরালায় (আলওয়ে) কীটনাশক ডি. ডি. টি. প্রভৃতি ঔষধ তৈয়ারির কারখানা আছে। বিহারের **গোমিয়া** ও উত্তরপ্রদেশের কানপুরের নিকট **পান্‌কিতে** দুইটি বিস্ফোরক দ্রব্যের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। লঘু রাসায়নিক শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অগ্রণী। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারেও এই শিল্পের প্রসার উল্লেখযোগ্য। **ইণ্ডিয়ান ড্রাগ অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড** এবং **হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিকস** নামে দুইটি সরকারী সংস্থার পরিচালনায় দেশে নানাবিধ ঔষধপত্র প্রস্তুত হইতেছে। ঔষধপত্র ইত্যাদি লঘুরাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনে ভারত অনেকটা স্বনির্ভর। ফলে ভারত দূরপ্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যে সামান্য পরিমাণে ঔষধপত্র রপ্তানি করিয়া থাকে।

পেট্রো-রাসায়নিক (Petro-chemicals) : খনিজ তৈল হইতে উপজাত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের সাহায্যে সার, কৃত্রিম রবার রং, কৃত্রিম তন্তু, প্ল্যাষ্টিক, পলিথিন, পরিশোধক দ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়। ভারতে ১৯৬৬ সালে প্রথম পেট্রো-রাসায়নিক শিল্প স্থাপিত হয় মহারাষ্ট্রের ট্রম্বেতে ইউনিয়ন কার্বাইড লিঃ-এর উদ্যোগে। ইহার প্রাথমিক উৎপাদন ছিল 'মেন্থল'। ইহার পর ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে বেসরকারী মালিকানায় আরও দুইটি কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৬৯ সালে সরকারী মালিকানায় গুজরাটের **জহর নগরে** প্রথম পেট্রো-রাসায়নিক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৭৪ সালে আসামের **বঙ্গাইগাঁওতে** একটি কারখানা নির্মিত হয়। ভারত সরকারের এই সংস্থার নাম ইণ্ডিয়ান পেট্রো-কেমিক্যালস কর্পোরেশন। গুজরাটে ষ্টেট ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ নামে একটি সংস্থা ভাদোদরাতে স্থানীয় কাঁচামালের সাহায্যে নাইলন ও পলিয়েস্টার তৈয়ারি করিতেছে। পেট্রো-রাসায়নিক কারখানার প্রধান কাঁচামাল খনিজ তেলের উপজাত দ্রব্যাদি। সুতরাং এই শিল্প খনিজ তেল শোধনাগারের নিকট স্থাপিত হওয়াই প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়াতেও একটি কারখানা স্থাপনের কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে পেট্রো-রাসায়নিক দ্রব্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। দেশে

খনিজ তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত এই শিল্পেরও প্রসার ঘটিবে আশা করা যায়।

[**প্রশ্ন** : (১) ভারতে রাসায়নিক শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা কর। (২) রাসায়নিক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি ?]

পূর্ত শিল্প (Engineering Industry)

লৌহ ইস্পাত কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া ছোট নাট, বল্টু, যন্ত্রপাতি, রেডিও, বৃহদাকার রেল ইঞ্জিন, বিমানপোত, জাহাজ প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ যে শিল্পের মাধ্যমে তৈয়ারি করা হয় উহাকে পূর্ত শিল্প বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বলা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) **ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প** (Heavy Engineering) এবং **হালকা বা সূক্ষ্ম ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প** (Light Engineering)। বৃটিশ যুগে ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশ আদৌ ঘটে নাই। প্রয়োজনীয় ভারী বা সূক্ষ্ম যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ সকলই বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। স্বাধীনতা-উত্তর যুগেই ভারতে এই শিল্পের দ্রুত প্রসার ও উন্নতি ঘটে।

ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রীর মধ্যে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, বস্ত্র, সিমেন্ট, চিনি, জাহাজ, মোটর, বিমানপোত, ক্রেণ, বিদ্যুৎ উৎপাদক মোটর প্রভৃতি শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ প্রধান। ভারতে সংগঠিত ভারী শিল্পের মধ্যে রাঁচীতে 'দি হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন', এলাহাবাদের নিকট নৈনিতে 'দি 'ভারত পাম্পস অ্যাণ্ড কম্প্রেসরস লিঃ', পশ্চিমবঙ্গে 'রিচার্ডস অ্যাণ্ড ক্রুডাস লিঃ', 'ব্রেইথওয়েটস' জেসপ অ্যাণ্ড কোং, 'দি ত্রিবেণী স্ট্রাকচারাল লিঃ', কর্ণাটকের 'দি তুঙ্গভদ্রা 'ষ্টিল প্রডাক্টস', বিশাখাপত্তনমের 'দি ভারত প্লেট ভেসেলস' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। **সূক্ষ্ম ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের** উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে সাইকেল, বলবিয়ারিং স্ক্রু, নাট, বল্টু ইত্যাদি তৈয়ারির কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বৃটিশ ভারতে সংগঠিত ছিল। কিন্তু পরিকল্পনাকালে ইহার দ্রুত প্রসার ঘটে। ঘড়ি, টাইপরাইটার, রেডিও, টেলিভিশন, ক্যালকুলেটিং মেশিন, বন্দুক, রাইফেল, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈয়ারিতে বর্তমানে বিশেষ উন্নতি ঘটে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ভারতে মোট ২৭২·৪ কোটি টাকার মেসিন টুলস উৎপাদিত হয়।

ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রধান কেন্দ্রের মধ্যে **পশ্চিমবঙ্গে** হাওড়া, দুর্গাপুর, ইছাপুর, দমদম, **মহারাষ্ট্রে** বোম্বাই, পুনে, নাগপুর, শোলাপুর, **কর্ণাটকে** ব্যাঙ্গালোর, **বিহারে** জামশেদপুর, রাঁচী **উত্তরপ্রদেশে** কানপুর, বারাণসী, নৈনি, আলিগড়, **পাঞ্জাবে** অমৃতসর, **অন্ধ্রপ্রদেশে** হায়দরাবাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রেল ইঞ্জিন নির্মাণ শিল্প (Locomotive Industry) : ভারতে ১৯৪৩ সালে জামশেদপুরে টাটা গ্রুপের 'টেলকো' সংস্থার উদ্যোগে প্রথম রেল ইঞ্জিন তৈয়ারির কারখানা স্থাপিত হয়। ভারতে প্রায় ৭০০০ রেল ইঞ্জিনের প্রয়োজন। এই বিপুল চাহিদা পূরণের জন্য ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে **পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জনে** একটি বৃহদাকার রেল ইঞ্জিন কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ সালে এই দেশে রেলপথে বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্প চালু হওয়ায় ক্রমে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন ও ডিজেল ইঞ্জিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে চিত্তরঞ্জনে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনই নির্মিত হয়। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই কারখানায় মোট ২৩৫১টি ষ্টিম ইঞ্জিন তৈয়ারি হয়। ইহার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৩০০ খানা। জামশেদপুর টেলকো কারখানার উৎপাদন বৎসরে ২০০ খানা। এই দুইটি কারখানা ব্যতীত ১৯৬৪ সালে বারাণসীতে একটি ডিজেল ইঞ্জিন কারখানা স্থাপিত হয়। ১৯৭২ সাল হইতে চিত্তরঞ্জন কারখানায় নানা-ধরনের বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনই তৈয়ারি হইতেছে। ১৯৮২ সালের মার্চ পর্যন্ত এই কারখানায় মোট, ১৬০৮ খানা বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন তৈয়ারি হইয়াছে।

ভারত রেলইঞ্জিন নির্মাণ শিল্পে বর্তমানে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই শিল্পের উপযোগী কাঁচা মাল, উৎকৃষ্ট ইস্পাত, কয়লা, দক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি সুলভ ও পর্যাপ্ত হওয়ায় এবং সর্বোপরি সরকারী আনুকূল্য থাকায় দ্রুত এই শিল্পের প্রসার ঘটিতেছে। ভারত বিদেশেও কিছু কিছু রেল ইঞ্জিন রপ্তানি করিতেছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে ইহার আরও প্রসার ঘটিবে।

মোটরগাড়ি নির্মাণ শিল্প (Automobile Industry) : ১৯৪১ সালে মহারাষ্ট্রের **বোম্বাই**-এ ভারতের প্রথম মোটর কারখানা Primier Automobliles স্থাপিত হয়। ইতালির Fiat ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Crysler Group-এর সহযোগিতায় এই কারখানা স্থাপিত হয়। প্রথমে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতিই ব্যবহৃত হইত। মোটর শিল্পে যাত্রীবাহী মোটর, বাস, জীপ, ইত্যাদি, পণ্যবাহী ট্রাক, তিন চাকার ট্রাক, টেম্পো, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত ট্রাক্টর, স্কুটার, মোটর সাইকেল প্রভৃতি নির্মিত হয়। ভারতে বর্তমানে এই সকল সড়ক পরিবহণে নিয়োজিত যান ইত্যাদি নির্মাণের ১৭টি প্রধান কারখানা ও ইহার সহায়ক উপকরণের প্রায় ১৬০টি কারখানা বর্তমান। তিনটি অঞ্চলেই কারখানার অধিকাংশ অবস্থিত। (১) **মহারাষ্ট্র**—এখানে ৬টি প্রধান কারখানা ও প্রায় ৬০টি সহায়ক উপকরণ নির্মাণের কারখানা বর্তমান। যাত্রীবাহী মোটর ট্রাক, ইত্যাদি নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই-এর 'প্রিমিয়ার অটোমোবাইলস'। পুণা, নাগপুর অন্যান্য কেন্দ্র। (২) **পশ্চিমবঙ্গ**—হুগলী জিলার কোন্নগরে (বর্তমানে হিন্দমোটরস্) ১৯৪৪ সালে বৃটেনের Morris Motors এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Studebaker Export Corporation-এর সহযোগিতায় বিড়লা গ্রুপের উদ্যোগে আধুনিক যাত্রীবাহী মোটর ও মালবাহী ট্রাক নির্মাণের কারখানা 'হিন্দুস্থান মোটরস' স্থাপিত হয়। এই

কারখানার দ্রুত প্রসার ও উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; (৩) **তামিলনাড়ু**—মাদ্রাজ অঞ্চলে Austin Motor Company Ltd.-এর সহায়তায় অশোক লেল্যাণ্ড মোটর

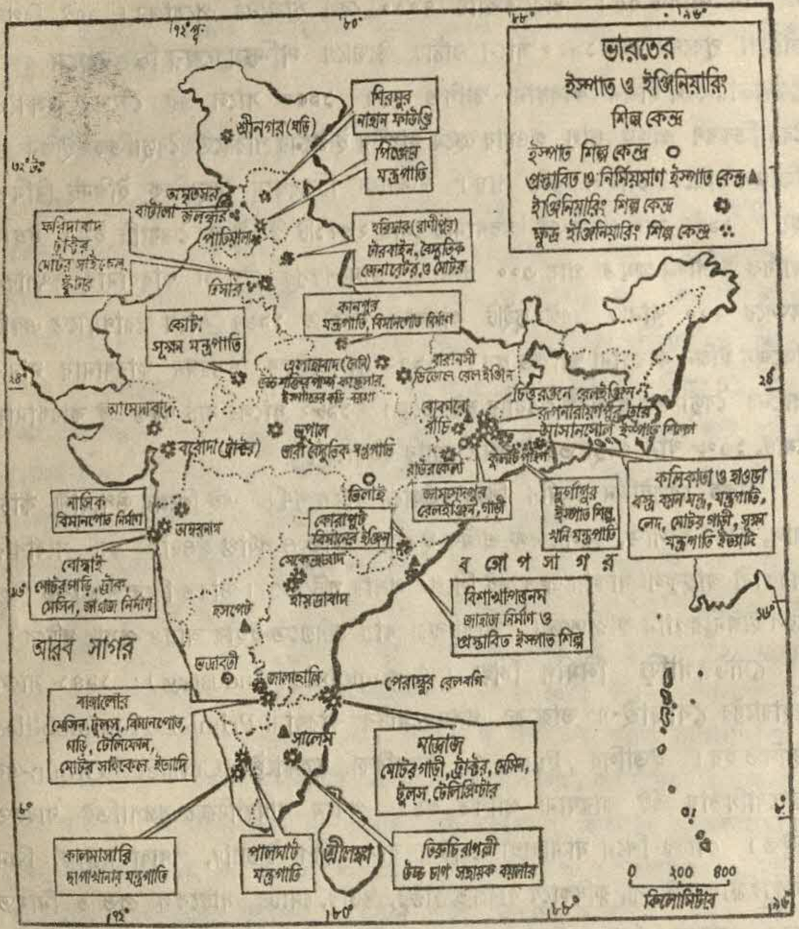

চিত্র ১২.১০ : ভারতের ইস্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কেন্দ্র-নির্দেশক অঞ্চলসমূহ।

কারখানা স্থাপিত হয়। এখানে 'স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ড' নামে অপর একটি মোটর নির্মাণ কারখানাও আছে। ইহা ব্যতীত জামশেদপুরে জার্মানীর মার্সিডিস বেঞ্জ-এর সহযোগিতায় একটি উল্লেখযোগ্য মোটর ট্রাক নির্মাণ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজ অঞ্চলে জীপ ও স্কুটার নির্মাণেরও কয়েকটি কারখানা আছে। উত্তরপ্রদেশের সানিলাতে রাশিয়ার সাহায্যে 'ইনসোভ অটো' নামে একটি জীপ ও ট্রাক তৈয়ারির কারখানা নির্মিত হইতেছে। দিল্লীর সন্নিকটে জাপানের সহযোগিতায় 'মারুতি উদ্যোগ' নামে একটি সংস্থা স্বল্প মূল্যের ছোট মোটর গাড়ি নির্মাণ করিতেছে।

ভারতে মোটর শিল্পের উপযোগী লৌহ-ইস্পাত, আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম, দক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি প্রাচুর্য রহিয়াছে। অধিকন্তু ক্রমসম্প্রসারণশীল বাজার ইহার উন্নতির বিশেষ সহায়ক। ভারতে প্রায় ১,৯০০ জন লোকের জন্য একটি মোটরগাড়ি আছে। কিন্তু বৃটেনে প্রতি ১৮ জনে এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৮ জনে একটি মোটরগাড়ি আছে। ভারতে সুলভে ৫,০০০/৬,০০০ টাকায় মোটর নির্মাণের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। উহার বাস্তবায়নের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। ভারতে পেট্রোলিয়ামের অভাব, জনগণের দারিদ্র্য ও মূল্যবৃদ্ধি এই শিল্পের প্রসারে দুস্তর বাধা। ভারতে ১৯৮৩-৮৪ সালে ১'৫৮ লক্ষ মোটর, গাড়ি, জীপ, লরী, ট্রাক ইত্যাদি এবং ৪'৪০ লক্ষ মোটর সাইকেল ও স্কুটার নির্মিত হয়।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প (Ship-building Industry) : ভারতে অতীতে পাল তোলা জাহাজ নির্মাণের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল এবং ভারতের উপকূলীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ইহার বহুল ব্যবহারও ছিল। কিন্তু বাষ্পীয় ইঞ্জিন পরিচালিত আধুনিক জাহাজ শিল্পের প্রথম প্রবর্তন করেন বোম্বাই-এর বিখ্যাত শিল্পপতি দয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ। ১৯৪১ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন নামে তিনি একটি জাহাজ নির্মাণ সংস্থা স্থাপন করেন। ১৯৪৮ সালে এই সংস্থায় স্বাধীন ভারতের প্রথম জাহাজ "জলউষা" (৮,০০০ টন) নির্মিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারে দেশীয় জাহাজের প্রয়োজনীয়নতা উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার ১৯৫২ সালে এই শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিঃ (Hindusthan Shipyard Ltd) নামে একটি জাহাজ নির্মাণ সংস্থার প্রবর্তন করেন। এই সংস্থা বিশাখাপত্তনম কারখানার ⅔ অংশের মালিকানা লাভ করে। ভারতে জাহাজ নির্মাণ শিল্পের প্রয়োজনীয় ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, শ্রমিক, কাষ্ঠ, দক্ষ নাবিক ইত্যাদির প্রাচুর্য রহিয়াছে। বন্দর ও পোতাশ্রয়-এর অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি বন্দর মোটামুটি আদর্শ। ভারতে বর্তমানে চারিটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। (১) **বিশাখাত্তনমে** হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড (২) **কলিকাতায়** গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ, (৩) **বোম্বাই-এর** মাজগাঁও ডক এবং (৪) **কেরালার** কোচিন জাহাজ নির্মাণকেন্দ্র। চতুর্থ কেন্দ্রটির নির্মাণকার্য চলিতেছে।

(১) **হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড** : বিশাখাপত্তনমের এই কেন্দ্রে ভিলাই ও জামশেদপুরের ইস্পাত, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের কাষ্ঠ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের কয়লা ব্যবহার করা হয়। উপকূলের ভগ্ন অবস্থা ও গভীরতা স্বাভাবিক ও সুরক্ষিত পোতাশ্রয় নির্মাণের বিশেষ উপযোগী। রেল যোগাযোগও বিশেষ উন্নত হওয়ায় পণ্য চলাচলের সহজ সুযোগ বর্তমান। এই কেন্দ্রে প্রথমে ১৫,০০০ টনের মালবাহী ৪ খানা জাহাজ নির্মাণের সুবিধা যুক্ত 'ড্রাই ডক' ছিল। বর্তমানে একত্রে ৬।৭ খানা জাহাজ নির্মাণের জন্য ইহার সম্প্রসারণ কার্য চলিতেছে। এই কেন্দ্রে মোট ৮০ খানি জাহাজ নির্মিত হইয়াছে। ইহার বার্ষিক

উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ২১,৫০০ DWT সম্পন্ন ৩ খানা জাহাজ। (২) **গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপ**—কলিকাতায় এই কেন্দ্রে পলিকাটা ড্রেজার, ফ্রিগেট, পণ্যবাহী টাগবোট ও উপকূলে চলাচলকারী ছোট জাহাজ নির্মাণ করা হয়। সমুদ্রগামী বড় জাহাজ নির্মাণের জন্য ইহার আধুনিকীকরণ করা হইতেছে। (৩) **মাজগাঁও ডক**—ইহার উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,০০০-২৬,০০০ DWT। এই কেন্দ্রে যাত্রীবাহী জাহাজ, নৌবাহিনীর উপযুক্ত জলযান ও পণ্যবাহী জাহাজ নির্মিত হয়। (৪) **কোচিন জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র**—এখানে ৮৫,০০০ টনের জাহাজ নির্মাণ এবং এক লক্ষ টন বহন ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজের মেরামতের জন্য ডক নির্মিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহাই ভারতের সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র। ভদ্রাবতী ইস্পাত কারখানার ইস্পাত, কর্ণাটকের বনভূমির কাষ্ঠ, স্থানীয় দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক ও দক্ষ নাবিক, উপকূলের গভীরতা ও পোতাশ্রয় নির্মাণের সুবিধা ইত্যাদি এই বন্দর গঠনের অনুকূল উপাদান। এই কেন্দ্রে ১৯৮১ সালে ৭৫,০০০ DWT-এর একটি জাহাজ নির্মিত হয় এবং উহা শিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার হস্তে সমর্পণ করা হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বিভিন্ন অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে উপকূলীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়াছে। দেশরক্ষার প্রয়োজনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল কারণে দেশীয় জাহাজ শিল্পের উন্নতি বিধান অপরিহার্য। ভারতে ইস্পাত শিল্পের প্রসারে যেমন কাঁচামাল ইত্যাদির প্রাচুর্য দেখা দিয়াছে তেমনি প্রযুক্তি বিষ্ণারও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতে জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রভূত উন্নতি করিতে সক্ষম হইবে ও ইহাতে বৈদেশিক মুদ্রার বিশেষ সাশ্রয় হইবে।

বিমান পোত নির্মাণ শিল্প (Air Craft Industry) **:** আধুনিক যুগে বিমান পরিবহণের প্রসার লক্ষণীয়। যুদ্ধে বিমান অপরিহার্য। যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে বিমানের ব্যবহারও ক্রমবর্ধমান। ভারতে বিমান নির্মাণের প্রচেষ্টা বেসরকারী উদ্যোগে শুরু হয় ১৯৪০ সালে। এই সময় কর্ণাটক রাজ্যের ব্যাঙ্গালোরে **হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফট** নামে একটি কারাখানা স্থাপিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ইহা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় ও ইহার বর্তমান নাম **হিন্দুস্থান এয়ারনটিকস্ লিঃ**। ভারতে ইহাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিমানপোত কেন্দ্র। এখানে জেট, জঙ্গীবিমান, ন্যাট, জেট ইঞ্জিন প্রভৃতি নির্মিত হয়। কানপুরে ইহার একটি বিভাগ আছে এবং এই বিভাগে Avro Jet নির্মিত হয়। বিমানপোত শিল্পের প্রধান কাঁচামাল উৎকৃষ্ট ইস্পাত, অ্যালয় ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম। ভারতে বর্তমানে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তৈয়ারি হওয়ায় কাঁচামালের যোগান সুলভ ও সহজ হইয়াছে। কিন্তু কারিগরী দক্ষতা ও প্রযুক্তিবিদ্যার অধিক উন্নতি প্রয়োজন। দেশে বিমানপোতের অধিকতর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য

রাশিয়ার সহযোগিতায় মহারাষ্ট্রের নাসিক, ওড়িশার কোরাপুট ও অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দরাবাদে তিনটি কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে MIG বিমানের ইঞ্জিন, কাঠামো ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মিত হইবে। ইহাতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হইবে। ভারতে বিমানপোত নির্মান শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়।

[প্রশ্ন : (১) পূর্ত শিল্প কি? ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রধান শিল্পগুলি কি কি? ভারতের (ক) জাহাজ নির্মাণ শিল্প (খ) রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ ও (গ) মোটর শিল্পের গঠন ও অগ্রগতি বর্ণনা কর।]

অনুশীলনী ১২

১। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের শিল্পোন্নয়নের একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ দাও।

[Give a brief account of the process of industrial development in India during post-independence period.]

২। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতে শিল্পবিকাশের যে নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে উদাহরণসহ তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[Discuss in brief the principles that have been pursued in India through Five Year Plans for a break-through in the process of industrialisation in India.]

৩। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল কি কি? জামশেদপুর ও দুর্গাপুরে লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারির কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবার কারণ বর্ণনা কর।

[What are the raw materials of Iron and Steel Industry? State the reasons for the location of Iron and Steel manufacturing centres at J amshedpur and Durgapur.]

[W. B. H. S. C. Exam. 1978]

৪। ভারতের প্রধান প্রধান ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রের নাম লিখ এবং উহাদের অবস্থানের কারণ বিশ্লেষণ কর।

[Name the principal Iron and Steel producing centres of India and account for their locations.]

৫। ভারতের যে কোন চারিটি প্রধান লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রের নাম লিখ। দুর্গাপুর ও জামশেদপুরে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের অবস্থানের নির্দেশ কর।

[Name any four important centres of Iron and Steel Industries

of India. Account for the location of Iron and Steel Industries at Durgapur and Jamshedpur.]

[W. B. H. S. C. Exam. 1981.]

৬। ভারতে লৌহ ইস্পাত শিল্পের অবস্থানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর এবং এই প্রসঙ্গে ভারতের নূতন ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্রগুলির স্থান নির্বাচন সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

[Discuss the features of the location of Iron and Steel Industry in India. In this context give your views about the selection of new sites for the manufacture of Iron and Steel in India.]

৭। ভারতের কার্পাস বয়ন শিল্প সম্পর্কে নিম্নলিখিত রূপরেখা অনুযায়ী একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(ক) কাঁচামালের উৎস, (খ) মূলধন, (গ) শক্তি সরবরাহ, (ঘ) পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং (ঙ) বাজার।

[Give a brief account of the Cotton Textile Industry of India under the following outline :

(a) Sources of Raw Matereals, (b) Capital, (c) Supply of Power, (d) Transport and Communication and (e) Market.

৮। ভারতে কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতির প্রধান কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর এবং ইহার অবস্থানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ভারতের এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা সম্পর্কে তোমার মতামত জানাও।

[Explain the principal causes of development of Cotton Textile Industry in India. Give your views about the present position and prospects of this industry in India.]

৯। ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে কার্পাস বয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ নির্দেশ কর। এই শিল্পের বর্তমান সমস্যা কি ?

[Account for concentration of the Cotton Textile Industry in the western and southern regions of India. What are the present problems of this industry ?] [W. B. H. S. C. Exam. 1982.]

১০। ভারতের যে-কোন একটি মুখ্য কার্পাস-বয়ন শিল্পকেন্দ্রের অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা কর। এই শিল্পের বর্তমান সমস্যা কি কি ?

[Account for the location of any one of the major Cotton Textile manufacturing centres of India. What are present problems of this industry ?] [W. B. H. S. C. Exam. 1984]

১১। ভারতে পশম শিল্পের বিকাশের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা কর। এই শিল্পের মুখ্য কেন্দ্রগুলির অবস্থা নির্দেশ কর।

[Mention the favourable geographical factors for the growth of

Woolen Iudustry in India. Mention the location of the principal centres of this industry.] [W. B. H. S. C. Exam. 1984]

১২। ভারতের পাট শিল্পকেন্দ্রগুলির অবস্থান নির্দেশ কর। পাটশিল্পে ভারতের অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Give the geographical distribution of Jute manufacturing centres in India. Mention briefly the progress and recent phase of the industry in India.] [W. B. H. S. C. Exam. 1979]

১৩। নিম্নলিখিত রূপরেখা অনুযায়ী ভারতের পাটশিল্পের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (ক) কাঁচামালের উৎস, (খ) বাজার, (গ) মূলধন, (ঘ) বর্তমান অবস্থান এবং (ঙ) সমস্যা ও সম্ভাবনা।

[Give an account of the Jute Industry of India under the following outlines.

(a) Sources of Raw Materials, (b) Market, (c) Capital, (d) Present location, (e) Problems and Prospects.]

১৪। ভারতের হুগলী পর্যন্ত পাট শিল্পের একদেশীভবনের কারণ আলোচনা কর। ভারতে পাট শিল্পের বর্তমান সঙ্কটের কারণ নির্দেশ কর। ইহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমার মতামত কি ?

[Account for the location of the Jute Industry in the Hooghly basin of India. Point out the causes of the present crisis of Indian Jute Industry. Give your views about its prospect.]

১৫। কাগজ শিল্পের জন্য কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন হয় ? ভারতে কাগজ উৎপাদনের মুখ্য কেন্দ্রগুলির ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐ শিল্পের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা কর।

[What are the raw-materials required for Paper Industry ? Give the geographical location of the main centres of paper production and the present position of the industry in India.]

[W. B. H. S. C. Exam. 1980]

১৬। ভারতে কাগজ শিল্পের অবস্থানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও সম্ভাবনা আলোচনা কর।

[Discuss the locational aspect of the Paper Industry of India. Also discuss the present condition and the prospect of this Industry.]

১৭। ভারতের কাগজ শিল্পের জন্য কি কি কাঁচামাল প্রয়োজন হয় ? কোথায় এবং কি পরিমাণে এইগুলি ভারতে পাওয়া যায় ?

[What are the raw materials needed for the Paper Industry of India. Where and to what extent are they found in India ?]

[W. B. H. S. Exam.1982]

১৮। ভারতের অর্থনীতিতে চিনি শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা কর। এই শিল্পের অবস্থানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

[Discuss the importance of Sugar Industry in Indian economy. Also discuss the locational aspect of this Industry.]

১৯। গাঙ্গেয় উপত্যকায় চিনি শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ ব্যাখ্যা কর। এই শিল্পের বর্তমান সমস্যা কি কি ?

[Account for the concentration of Sugar Industry in the Ganga plain. What are the present problems of this Industry ?]

[W. B. H. S. C. Exam. 1983]

২০। ভারতে চিনি শিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্র কোথায় দেখা যায় ? ঐ সকল অঞ্চলে ইহার সংগঠনের কারণ নির্দেশ কর। এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর।

[Where would you find the important centres of the Sugar Industry in India ? Indicate the reasons of their development in these areas. Examine the present position of this Industry.]

২১। ভারতের রাসায়নিক শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা কর। এই শিল্পের শ্রেণীবিভাগ কর। এই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও উহাদের উৎস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Discuss the importance of the Chemical Industry in India. Classify it and name the principal raw materials of this industry, indicating the areas of their supply.]

২২। ভারতে গুরু রাসায়নিক শিল্পের অবস্থান নির্দেশ কর। এই শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা কর।

[Give an account of the location of the Heavy Chemicals Industry of India. Discuss its problems and prospects.]

২৩। সার শিল্পের বিকাশের জন্য কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন ? পূর্ব ভারতের যে কোন একটি প্রধান সার শিল্পকেন্দ্রের উন্নতির অনুকূল ভৌগোলিক উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা কর।

[What are raw materials required for the development of Fartilizer Industry ? Discuss the factors favourable for the development of any major centre of Fertilizer Industry in Estern India.] [W. B. H. S. C. Exam. 1979.]

২৪। ভারতের নিম্নলিখিত শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা কর এবং ভারতে ঐ শিল্প গড়িয়া উঠিবার অনুকূল পরিবেশ বর্ণনা কর।

(ক) জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প।

[Discuss the importance of the following industries in India and describe the favourable conditions for the development of these industries in India.

(a) Ship-Building Industry and (b) Engineering Industry.]

২৫। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির কারণ ব্যাখ্যা কর —

(ক) নিজ দেশের চাহিদা অপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও ভারত চিনি রপ্তানি করে।

(খ) কলিকাতা ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভারতের অধিকাংশ পাটকল অবস্থিত।

(গ) মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলে বয়নশিল্প কেন্দ্রীভূত।

(ঘ) কলিকাতা ও উত্তর সংলগ্ন এলাকায় বহু পাটকল আছে। কিন্তু বোম্বাইতে একটিও নাই।

(ঙ) আমেদাবাদ শিল্পাঞ্চলে বয়ন শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

(চ) ভারতের লৌহ-ইস্পাতের কারখানাগুলি কয়লা খনির নিকট অবস্থিত।

[Explain the following statements :—

(a) India exports Sugar, though she could not meet her own demands. [W. B. H. S. C. Exam. 1981]

(b) Indian Jute Mills are mostly located in and around Calcutta. [W. B. H. S C. Exam. 1978]

(c) Cotton Textile Indurtries are concentrated in Maharastra and Gujrat. [W. B. H. S. C. Exam. 1978]

(d) Calcutta and its neighbourhood areas have many Jute Mills whereas Bombay has none. [W. B. H. S. C. Exam. 1979]

(e) Textile Industries concentrated in the industriial zone of Ahmedabod. [W. B. H. S. C. Exam. 1979]

(f) Iron and Steel factories of India are located near the coal fields. [W. B. H. S. C. Exam. 1980]

১৩ ভারতের বহির্বাণিজ্য
(Foreign Trade of India)

চীন, আফগানিস্তান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলির সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘকালের। ভারতীয় 'মসলিন', 'কেলিকো', মশলাদ্রব্য ইত্যাদি একসময় আরব বণিকদের মারফত ইউরোপের বাজারেও প্রবেশলাভ করিয়াছিল। বৃটিশ যুগে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে ভারতের অতীত শিল্প-বাণিজ্যের কাঠামো ভাঙিয়া পড়ে এবং ভারতের বহুমুখী বাণিজ্যধারা মুখ্যত যুক্তরাজ্যমুখী হইয়া পড়ে। এই সময় ভারত হইতে প্রধানত শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে রপ্তানী করা হইত এবং তথা হইতে শিল্পজাত ভোগ্যপণ্য আমদানি করা হইত। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে তুলা, পাট, চা, তৈলবীজ, চামড়া, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজ, লৌহ আকরিক ইত্যাদি এবং আমদানি দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্র, ঘড়ি, সাইকেল, সিমেন্ট, কাঁচের দ্রব্য, কাগজ, পেনসিল, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি ছিল প্রধান। এই প্রকার বাণিজ্যের ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়ে। অবশ্য বৃটিশ যুগের শেষদিকে জাপান, জার্মানী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের কিছু বাণিজ্যিক লেনদেন শুরু হইয়াছিল। ভারতের দারিদ্র্য হেতু যুক্তরাজ্য নিয়ন্ত্রিত এই বাণিজ্যে ভারতের আমদানির তুলনায় রপ্তানিই বেশী হইত এবং উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের অর্থ বৃটেনে সঞ্চিত হইত। ইহাই ভারতের Sterling Balance। একসময় এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৬০০ কোটি পাউণ্ড স্টার্লিং। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন, গতি, পরিমাণ ও প্রকৃতির বিপুল পরিবর্তন ঘটে।

গঠন—আমদানি : স্বাধীনতা-উত্তর যুগে দেশে জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি ও নানা কারণে ফসল নষ্ট হওয়ায় খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহা ব্যতীত কৃষি ও শিল্পের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় সার শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পেট্রল প্রভৃতির আমদানি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। শিল্প ফসল, তুলা ও পাট উৎপাদক উল্লেখযোগ্য কিছু অঞ্চল পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়ায় ভারত ঐ দুইটি সামগ্রীও আমদানি করিতে বাধ্য হয়। ফলে আমদানি দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্য, তুলা, পাট, পশম, রাবার, খনিজ তেল, সার, ধাতবদ্রব্য, মূলধন জাতীয় যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক মোটর ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি প্রাধান্য পায়।

রপ্তানি : পূর্বে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে বিভিন্ন কাঁচামালই ছিল পরিমাণে ও মূল্যে সর্বাধিক। কিন্তু দেশে শিল্পের কিছু কিছু বিকাশ ঘটায় রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে শিল্প পণ্যের

সংযোজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চা, কফি, কাজুবাদাম, মশলা, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, আকরিক লৌহ, চামড়া, পাট, পাটজাত দ্রব্য, চিনি, ইস্পাত, সাইকেল, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। শিল্পজাত দ্রব্য যেমন পাখা, সাইকেল, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির রপ্তানি বর্তমানে ক্রমবর্ধমান।

গতি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্ধেকের বেশি যুক্তরাজ্যের সহিত সংগঠিত হইত। ইউরোপের ফ্রান্স, জার্মানী ও অন্যান্য দেশের সহিতও সামান্য পরিমাণে বাণিজ্য ছিল। কিন্তু এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পরে বাণিজ্যের এই গতি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাশিয়া ও শ্রেষ্ঠ ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকার অভ্যুদয় বিশ্বের শক্তিগোষ্ঠীকে দুইটি শিবিরে বিভক্ত করে। বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রাচীন শক্তিশালী দেশগুলি হীনবল হইয়া পড়ায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে। রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বিভিন্ন দেশের নূতন বাণিজ্যিক-সম্পর্ক স্থাপিত হইতে থাকে। ভারতের বাণিজ্যের গতিও ক্রমে ইউরোপ হইতে আমেরিকার দিকে পরিবর্তিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের যেমন বিশেষ আকর্ষণীয় বাজার গড়িয়া উঠে তেমনি খাদ্যশস্য ও নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও শিল্পপণ্য আমদানির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উপর ভারতের নির্ভরশীলতাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ষাটের দশক হইতে ভারতের বাণিজ্যের গতি নূতন মোড় নেয় এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া ও ঐ শিবিরভুক্ত অন্যান্য দেশের সহিত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহা ব্যতীত সদ্য স্বাধীন আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সহিতও ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপে বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, হাঙ্গেরী, ওশিয়ানিয়ায় অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকায় মিশর, সুদান, কেনিয়া, মধ্যপ্রাচ্যে ইরাক, ইরাণ উপসাগরীয় রাজ্যগুলি ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রায় সকল দেশের সহিতই ভারতের বাণিজ্য বহুমুখী ধারায় চলিতেছে।

প্রকৃতি: অতীতের সহিত তুলনায় বর্তমান ভারতের বাণিজ্যের প্রকৃতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরু হইতেই দেশে শিল্পায়ণের যে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। একসময় ভারত হইতে শিল্পের কাঁচামাল রপ্তানি ও ভোগপণ্য আমদানিই ছিল ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে ইহার পরিবর্তে শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মূলধনজাতীয় সম্পদ, কাঁচামাল ইত্যাদির আমদানি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে তেমনি রপ্তানি পণ্যের মধ্যে শিল্পের কাঁচামালের সহিত বিভিন্ন শিল্প পণ্যের সংযোজন ও ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভোগপণ্য আমদানির তুলনায় বর্তমানে যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক ও পরিবহণ সাজসরঞ্জাম, রাসায়নিক সার, খনিজ তেল ও উহার উপজাত দ্রব্য এবং পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল

আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে রপ্তানি পণ্যের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য যেমন যন্ত্রপাতি, সেলাই-এর কল, সাইকেল, পাখা, কলকব্জা, রাসায়নিক দ্রব্য ও নানাবিধ ভোগ্যপণ্যের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান।

পরিমাণ ও উদ্বৃত্ত—বৃটিশ যুগের তুলনায় ভারতের বহির্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৩২১ কোটি টাকা। পরিকল্পনা যুগের শুরুতে অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ১,২৫১ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৫০ কোটি ও ৬০১ কোটি টাকা। ১৯৮২-৮৩ সালে মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ২৩,১৬৪ কোটি টাকা, আমদানি ১৪,২৫৬ কোটি টাকা ও রপ্তানি ৮,৯০৮ কোটি টাকা। সাম্প্রতিককালে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিলেও মোট বাণিজ্যের পরিমাণ যে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

দেশের মোট রপ্তানি ও আমদানির পার্থক্যকে উদ্বৃত্ত বুঝায়। রপ্তানির তুলনায় আমদানি কম হইলে **অনুকূল উদ্বৃত্ত** ঘটে এবং বেশি হইলে **প্রতিকূল উদ্বৃত্ত** ঘটে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অনুকূল উদ্বৃত্ত। কিন্তু ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয় এবং এই ঘাটতি আজিও অব্যাহত। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের প্রতিকূল উদ্বত্তের পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি টাকা। ১৯৬০-৬১ সালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯৮ কোটি টাকা, ১৯৭০-৭১ সালে ৯৯ কোটি টাকা। বিগত প্রায় তিন দশকে ইহাই ভারতের ন্যূনতম ঘাটতি। ১৯৮১-৮২ সালে ভারতের সর্বাধিক প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়। ইহার পরিমাণ ছিল ৫,৮৬৮ কোটি টাকা। ভারতের বহির্বাণিজ্যের এই প্রকার ঘাটতির মূলে রহিয়াছে পরিকল্পনার প্রয়োজনে মূলধনজাতীয় যন্ত্রপাতি, খাদ্যশস্য, সার ও খনিজ তেলের ক্রমবর্ধমান আমদানি। দেশে শিল্পায়নের প্রসারের ফলে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতের এই ঘাটতি বা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত অনুকূল উদ্বৃত্তে পরিণত হইবে। নিম্নের সারণীতে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি দেখান হইল :

ভারতের বহির্বাণিজ্য (কোটি টাকায়)

বৎসর	আমদানির মূল্য	রপ্তানির মূল্য	মোট মূল্য	ঘাটতি (−) উদ্বৃত্ত (+)
১৯৫০-৫১	৬৫০·২১	৬০০·৬৪	১,২৫০·৮৫	−৪৯·৫৭
১৯৬০-৬১	১,১৩৯·৬৯	৬৬০·২২	১৭৯৯·৯১	−১৭৯·৪৭
১৯৭০-৭১	১৬৩৪·২০	১৫৩৫·১৬	৩,১৬৯·৩৬	−৯৯·০৪
১৯৮০-৮১	১২,৫৬০·২৯	৬,৭১০·৭১	১৯,২৭১·০০	−৫,৮৪৯·৫৮
১৯৮১-৮২	১৩,৬৭১·২৬	৭,৮০২·৯৭	২১,৪৭৪·২৩	−৫,৮৬৮·২৯
১৯৮৩-৮৪	১৫,৭৬৩·৩০	৯,৮৬৫·০০	২৫,৬২৮·৩০	−৫,৭৯৭·৭০

Source ; Economic Survey (India), 1984-85 and India, 1983.

[প্রশ্ন : (১) ভারতের বহির্বাণিজ্যে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে কি কি মৌল পরিবর্তন ঘটিয়াছে ? (২) বহির্বাণিজ্যের গঠন ও গতি পরিবর্তনের কারণ কি ?]

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন, গতি ও পরিমাণ

আমদানি—১৯৮২-৮৩ (কোটি টাকায়)

আমদানি দ্রব্য	পরিমাণ	প্রধান রপ্তানিকারী দেশ
(১) খাদ্যশস্য—গম, চাল, ফল, দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি	৩০৬˙৫	যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যাণ্ড।
(২) শিল্পের কাঁচামাল—পাট, তুলা, পশম, রাবার, কৃত্রিম রাবার	২৫৪˙০	পাট—বাংলাদেশ ; পশম—অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা ; তুলা—মিশর, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া; রবার—মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা ; কৃত্রিম রবার—যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম জার্মানি।
(৩) খনিজ তেল ও খনিজ তেলজাত দ্রব্য	৫,৬০৫˙০	রাশিয়া, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব।
(৪) ধাতব দ্রব্য—ইস্পাত, তাম্র, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম	১,৪২৫˙১	পশ্চিম জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া।
(৫) ভারী যন্ত্রপাতি, পরিবহণ সরঞ্জাম—জাহাজ, বিমান, কৃষি ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	২,৩৬৮˙৩	যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া।
(৬) রাসায়নিক দ্রব্য : সার, ঔষধ, রং ইত্যাদি	১,৫১২˙০	যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি।
(৭) কাগজ, নিউজপ্রিণ্ট ও কাগজমণ্ড	২৭˙২	নরওয়ে, সুইডেন, কানাডা, ফিনল্যাণ্ড, জাপান।
(৮) অন্যান্য দ্রব্যাদি—বই, ঘড়ি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, মূল্যবান পাথর, মুক্তা, ইত্যাদি	৫৮৩˙০	যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, পাকিস্তান ইত্যাদি।

রপ্তানি—১৯৮২-৮৩ (কোটি টাকায়)

রপ্তানি দ্রব্য	পরিমাণ	প্রধান আমদানিকারী দেশ
(১) চিনি	৬২˙৩৫	যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা।
(২) পাটজাত দ্রব্য—চট ও থলি	৩৪৫˙৮৮	যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, কিউবা, মধ্যপ্রাচ্য

রপ্তানি দ্রব্য	পরিমাণ (কোটি টাকা)	প্রধান আমদানিকারী দেশ
(৩) চা	৩৬৭·৫৩	যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পঃ জার্মানি, মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া।
(৪) (ক) কার্পাস বস্ত্র	২৬৫·৫২	যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, কানাডা, পঃ জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, পূর্ব আফ্রিকা, দঃ পূঃ এশিয়া।
(খ) পোষাক	৫২৭·৫০	
(৫) যন্ত্রপাতি ও পরিবহণ দ্রব্য, কলকব্জা, মোটরগাড়ি, সাইকেল, সেলাই-এর কল, রেলইঞ্জিন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি	১৮৬·১৬	রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব আফ্রিকা, প্রভৃতি।
(৬) তামাক, তৈলবীজ, খইল ইত্যাদি।	৩৮৯·১২	যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া হাঙ্গেরী ইত্যাদি।
(৭) (ক) মৎস্য এবং মৎস্যজাত দ্রব্যাদি	৩৪৯·৪৫	যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানি, জাপান, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা।
(খ) ফল, শব্জি ও ডাল	১৫৮·৮০	
(৮) আকরিক লৌহ	৩৭৩·৭৯	জাপান, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, নেদারল্যাণ্ডস্।
(৯) চর্ম ও চর্মজাত দ্রব্য	২৫·৯২	যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইতালি।
(১০) কাজুবাদাম	১৩৩·৯৭	রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, পঃ জার্মানি।
(১১) লৌহ ও ইস্পাত	৫৫·৭৫	যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, হংকং, পশ্চিম জার্মানি, জাপান ইত্যাদি।
(১২) অন্যান্য দ্রব্যাদি—ফল, তরকারি, মশলা, পশম, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, রং, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র প্রভৃতি।	৫৩০·০০	মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশ।

বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন (Reconstruction of Foreign Trade) **:** বিপুলায়তন ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও নগণ্য। পৃথিবীর মোট বহির্বাণিজ্যের শতকরা মাত্র ২·৫ অংশ ভারতের। ভারতের এই স্বল্প পরিমাণ বহির্বাণিজ্যের কারণ ভারত এখনও মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। শিল্পায়ণের যে প্রচেষ্টা বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে শুরু হইয়াছে ইহা ফলপ্রসূ হইতে সময়ের প্রয়োজন। কাজেই আশা করা যায় আগামী দিনে ভারতের বহি-র্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবেই বৃদ্ধি পাইবে।

পরিকল্পনার শুরু হইতেই ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে ও অনুকূল উদ্বৃত্তের প্রয়োজনে ভারতের বহির্বাণিজ্যের পুনর্গঠন আবশ্যক। ভারত পাটজাত দ্রব্যাদি, চা, কার্পাস-বস্ত্র, আকরিক লৌহ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, চূণ প্রভৃতি রপ্তানিতে বিশ্বে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এবং ভারতের আমদানির মধ্যে খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, রাসায়নিক সার, খনিজ তেল ইত্যাদিই প্রধান। বিভিন্ন পরিকল্পনা কালে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বিভিন্ন প্রকার সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। (১) চা, কার্পাস বস্ত্র, রেশম, রেয়ন, তামাক, মশলা, কাজু বাদাম, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ, রাসায়নিক দ্রব্য, চর্ম, প্লাষ্টিক, খেলাধুলার সরঞ্জাম ইত্যাদির প্রত্যেকটির জন্য একটি করিয়া 'রপ্তানি উন্নয়ন সংস্থা' (Export Promotion Council) গঠিত হইয়াছে। (২) রপ্তানি ঝুঁকি হ্রাস ও রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানে সাহায্য করিবার জন্য Export Credit and Guarantee Corporation নামক একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। (৩) বিদেশে ভারতীয় পণ্যসামগ্রীর বাজার সৃষ্টির জন্য ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (৪) রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য শুল্ক হার কমান বা কোন কোন ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং রপ্তানির প্রয়োজনে আমদানিকৃত পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। (৫) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা (State Trading Corporation)-এর মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক দেশের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালান হইতেছে। (৬) রপ্তানি বৃদ্ধির সহায়ক Board of Trade নামেও একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। (৭) বিশ্বের বিভিন্ন মিত্র রাষ্ট্রের সহিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান হইতেছে।

উপরি-উক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ইতিমধ্যেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। (১) প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০টি। বর্তমানে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৩০০ হইয়াছে। (২) প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানত যুক্তরাজ্যের সহিত সংঘটিত হইত। স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম যুগে ইহা যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মধ্যেই

বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকন্তু পশ্চিম ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও জাপানের সহিতও ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের সহিতও ভারতের বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছে। (৩) ভারতের বহির্বাণিজ্য বর্তমানে সমুদ্রপথে, স্থলপথে ও আকাশপথেও পরিচালিত হইতেছে। বাংলাদেশ, নেপাল, আফগানিস্তান, ইরাণ প্রভৃতি দেশের সহিত স্থলপথেই বেশি বাণিজ্য সংঘটিত হয়। (৪) ভারতের পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য (Entrepot Trade) একসময় খুবই নগণ্য ছিল। সম্প্রতি ইহার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। (৫) ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানত বেসরকারী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাম্প্রতি কালে সরকার নানাভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করায় এই ক্ষেত্রে সরকারী অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে এবং আশা করা যায় সরকারী অংশগ্রহণ খুবই ফলপ্রসূ হইবে। (৫) পূর্বের তুলনায় ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধির সাহায্যে এই ঘাটতি পূরণের প্রয়াস চালান হইতেছে। এই প্রয়াসের ফলে আশা করা যায় অচিরেই বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

[প্রশ্ন : (১) ভারতের বহির্বাণিজ্যের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল ? (২) বহির্বাণিজ্যের পুনর্গঠনে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় ? (৩) যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সহিত আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের একটি তালিকা তৈয়ারি কর।]

অনুশীলনী ১৩

১। ভারতের বহির্বাণিজ্যের বিবরণ দাও। উহার পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

[Give an account of the foreign trade of India. Give your views about its reconstruction and the probable changes.]

২। ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা কর। এই বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তুমি কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন মনে কর ?

[Give a critical account of the recent trend of India's foreign trade. Do you suggest any measure for its improvement ?]

[W. B. H. S. C. Exam. 1982]

৩। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ, গঠন ও গতির বিবরণ দাও এবং ইহার সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

[Give an account of the volume, composition and direction of the foreign trade of India and analyse its recent trend.]

৪। ভারতের বহির্বাণিজের মূল কাঠামো বিশ্লেষণ কর। ইহার সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি আলোচনা কর।

[Analyse the basic structure of India's foreign trade. Examine its recent trend.] [W. B. H. S. C. Exam. 1984]

৫। ভারতের প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্য নির্দেশ করিয়া ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Discuss the future of India's foriegn trade indicating the main items of imports and exports].

৬। নিম্নলিখিত রূপরেখা অনুসারে ভারতের বৈদেশিক বাণিজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

(ক) বাণিজ্যের পরিমাণ ও উদ্বৃত্ত, (খ) আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যসমূহ ও (গ) যে সকল দেশের সহিত বৈদেশিক বানিজ্য পরিচালিত হয়।

[Discuss the main features of India's foreign trade as per outlines given : (a) Volume of trade and Balance of trade, (b) Items of imports and exports (c) Countries with which foriegn trade is conducted.]

১৪ | ভারতে জনবিন্যাস
(Distribution of Population in India)

ভারত একটি অতিজনবহুল দেশ। এই দেশের জনসংখ্যা অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের মোট আয়তন ৩২,৮০,৪৮৩ বর্গ কিলোমিটার। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে ভারতে ২২১ জন লোক বাস করে কিন্তু ভারতে এমন বহুস্থান আছে যেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ২ জন লোক বাস করে। আবার কোথাও প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩০ হাজারেরও বেশি লোক বাস করে। জনবিন্যাসের ক্ষেত্রে এই প্রকার বৈষম্য ভারতের অনেক অঞ্চলে দেখা যায়। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৮১ সাল হইতে ভারতে প্রতি দশ বৎসর অন্তর জনগণনা হইতেছে। ইহাকে আদমসুমারি (census) বলা হয়। নিম্নে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি সারণী দেওয়া হইল :

বৎসর	মোট জনসংখ্যা	বৃদ্ধির হার (%)	ঘনত্ব ব.কি.মি.
১৯০১	২৩.৮৩ কোটি	—	—
১৯৪১	৩১.৮৩ কোটি	১.৪২	১০৩
১৯৫১	৩৬.১০ কোটি	১.৩৩	১১৭
১৯৬১	৪৩.৯২ কোটি	২.১৬	১৪০
১৯৭১	৫৪.৮১ কোটি	২.৪৮	১৭৭
১৯৮১	৬৮.৩৮ কোটি	২.৪৭	২২১

সামগ্রিকভাবে ভারতে জনসংখ্যা ও ইহার ঘনত্ব ক্রমবর্ধমান। ভারতে প্রায় ৭৫% লোক এখনও গ্রামে বাস করে এবং অবশিষ্ট মাত্র ২৫% শহরে বাস করে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়াই ইহার অর্থনীতি আজিও গ্রাম-কেন্দ্রিক। কিন্তু ভারতে সকল রাজ্যের জনবিন্যাসের মধ্যে সমতা দেখা যায় না। ভারতে সর্বাধিক লোক বাস করে উত্তরপ্রদেশে। ইহার পরেই বিহার ও মহারাষ্ট্রের স্থান। ভারতে ন্যূনতম জনসংখ্যা দেখা যায় নাগাল্যাণ্ডে। নিম্নের সারণীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জনসংখ্যা বণ্টনের হিসাব দেওয়া হইল। কোন অঞ্চলে জনঘনত্ব বলিতে ঐ অঞ্চলের আয়তনের সহিত বসবাসকারী লোকের অনুপাতকে বুঝায়। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বসবাসকারী জনসংখ্যাকেই জনঘনত্ব বলা হয়।

পূর্ণাঙ্গ রাজ্য (রাজধানী)	আয়তন ব. কি. মি.	জনসংখ্যা কোটি	জনঘনত্ব প্রতি ব. কি. মি.
১. অন্ধ্রপ্রদেশ (হায়দরাবাদ)	২,৭৬,৮১৪	৫·৩৪	১৯৪
২. আসাম (দিসপুর)	৭৮,৫২৩	১·৯৯	২৫৪
৩. বিহার (পাটনা)	১,৭৩,৮৭৬	৬·৯৮	৪০২
৪. গুজরাট (গান্ধীনগর)	১,৯৫,৯৮৪	২·৪০	১৭৩
৫. হরিয়ানা (চণ্ডীগড়)	৪৪,২২২	১·২৯	২৯১
৬. হিমাচলপ্রদেশ (সিমলা)	৫৫,৬৭৩	০·৪২	৭৬
৭. জম্মু ও কাশ্মীর (শ্রীনগর)	২,২২,২৩৬	০·৭০	২৭
৮. কর্ণাটক (ব্যাঙ্গালোর)	১,৯১,৭৭৩	৩·৭০	১৯৩
৯. কেরালা (ত্রিবান্দ্রম)	৩৮,৮৬৪	২·৫৪	৬৫৪
১০. মধ্যপ্রদেশ (ভূপাল)	৪,৪২,৮৪১	৫·২১	১১৮
১১. মহারাষ্ট্র (বোম্বাই)	৩,০৭,৭৬২	৬·২৭	২০৪
১২. মণিপুর (ইম্ফল)	২২,৩৫৬	০·১৪	৬৪
১৩. মেঘালয় (শিলং)	২২,৪৮৯	০·১৩	৫৯
১৪. নাগাল্যাণ্ড (কোহিমা)	১৬,৫২৭	০·০৭	৪৬
১৫. ওড়িশা (ভুবনেশ্বর)	১,৫৫,৭৮২	২·৬৩	১৬৯
১৬. পাঞ্জাব (চণ্ডীগড়)	৫০,৩৬১	১·৬৭	৩৩১
১৭. রাজস্থান (জয়পুর)	৩,৪২,২১৪	৩·৪১	১০০
১৮. সিকিম (গ্যাংটক)	৭,২২৯	০·০৩	৪৪
১৯. তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ)	১,৩০,০৬৯	৪·৮৩	৩৭১
২০. ত্রিপুরা (আগরতলা)	১০,৪৭৭	০·২১	১৯৬
২১. উত্তরপ্রদেশ (লক্ষ্ণৌ)	২,৯৪,৪১৩	১১·০৯	৩৭৭
২২. পশ্চিমবঙ্গ (কলিকাতা)	৮৭,৮৫৩	৫·৪৫	৬১৪

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	আয়তন ব. কি. মি.	জনসংখ্যা কোটি	জনঘনত্ব ব. কি. মি.
১. আন্দামাননিকোবর (পোর্ট ব্লেয়ার)	৮,২৯৩	০·০২	২৩
২. অরুণাচল (ইটানগর)	৮৩,৫৭৮	০·০৬	০৭
৩. চণ্ডীগড় (চণ্ডীগড়)	১১৪	০·০৪	৩,৯৪৮
৪. দাদরা, নগরহাভেলী (সিলভাসা)	৪৯১	০·০১	২১১
৫. দিল্লী (দিল্লী)	১,৪৮৫	০·৬২	৪,১৭৮
৬. গোয়া, দমন, দিউ (পানাজি)	৩,৮১৩	০·১৪	২১৪
৭. লাক্ষা দ্বীপ (কাভারত্তি)	৩২	৪০ হাজার	১,২৫৭
৮. মিজোরাম (আইজল)	২১,০৮৭	০·০৫	২৩
৯. পণ্ডিচেরী (পণ্ডিচেরী)	৪৮০	০·০৬	১,২২৮
সর্ব ভারত	৩২,৮০,৪৮৩	৬৮·৩৮	২২১

ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে জনসংখ্যা বণ্টনের পার্থক্য অনুসারে ভারতকে প্রধান ৬টি অঞ্চলে ভাগ করা যায় ; যথা—(১) **জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০০ জনের অধিক**—কেন্দ্রশাসিত কয়েকটি শহর ব্যতীত এত অধিক জনসংখ্যা ভারতের নিম্ন-গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে ও কেরালায় দেখা যায়। কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি এই সকল অঞ্চলে অধিক জনঘনত্বের জন্য দায়ী। (২) **জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩০০ হইতে ৫০০ জন**—বিহার, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এই অঞ্চলের অন্তর্গত। কৃষি, বাগিচা কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটায় এই অঞ্চলে জন ঘনত্ব

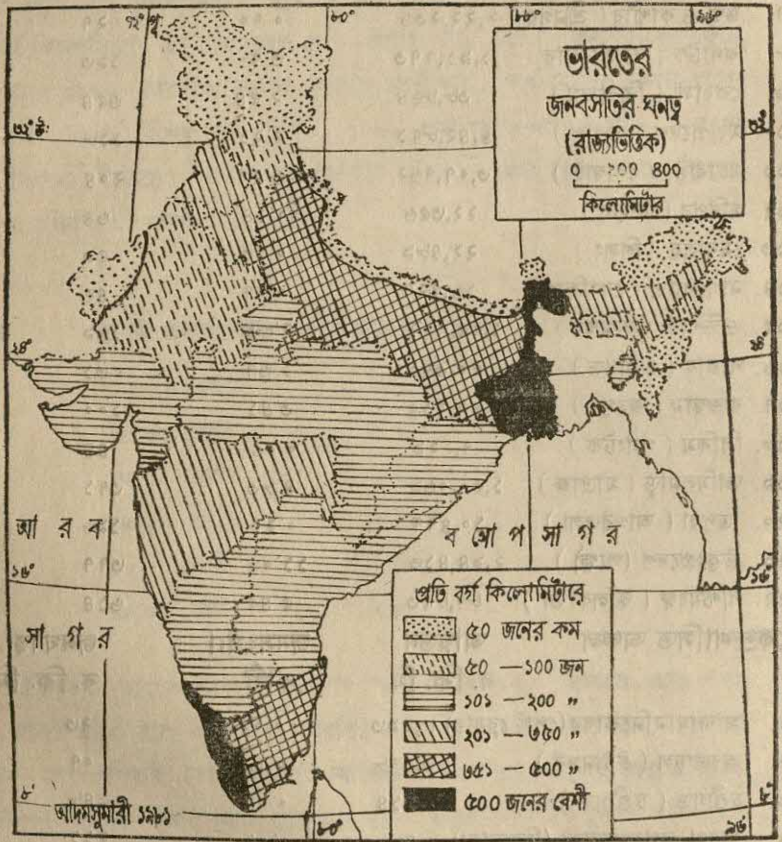

চিত্র১৪.১ : ভারতের জনবসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)।

ক্রমবর্ধমান। (৩) **জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২০০ হইতে ২৯৯ জন**—সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির উত্তর-পশ্চিমাংশে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যে কৃষিকে ভিত্তি করিয়া এই প্রকার জনঘনত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। (৪) **জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০০ হইতে ১৯৯ জন**—আসাম, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক,

ওড়িশা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলে কিছু কিছু অধিক বসতিযুক্ত উন্নত শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র থাকিলেও বিস্তৃত অনুন্নত অঞ্চল থাকায় জনঘনত্ব গড়ে কমই দেখা যায়। (৫) **জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০ হইতে ৯৯ জন**—মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হিমাচলপ্রদেশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল, মরুপ্রায় জলবায়ু, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি নানা কারণে জনঘনত্ব খুবই স্বল্প। (৫) **জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০ জনের কম**—মেঘালয়, অরুণাচল, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর কারণেই স্বল্পতম লোকবসতি দেখা যায়। কাশ্মীর ও রাজস্থানের মরুস্থলীও এই অঞ্চলের অন্তর্গত।

লোকবসতির তারতম্যের কারণ (Factors responsible for the uneven distribution of population) **:** ভারতে জনসংখ্যার বণ্টন সর্বত্র সমান নহে। কেরালায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬৫৪ জন লোক বাস করে। অরুণাচল প্রদেশে বাস করে মাত্র ৭ জন লোক এবং রাজস্থানে বাস করে ১০০ জন। জনঘনত্বের এই তারতম্যের জন্য দায়ী কারণসমূহের মধ্যে ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, প্রাকৃতিক সম্পদ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি অন্যতম। নিম্নে ইহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

(১) **ভূ-প্রকৃতি** (Topography) **:** বিভিন্ন প্রকার ভূ-প্রকৃতির মধ্যে সমতলভূমিই মানুষের বসবাস ও অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের পক্ষে আদর্শ। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার এই সকল অঞ্চলেই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ, যানবাহন পরিচালনা, শিল্প স্থাপন এই সকল স্থানে অতি সহজ। ফলে সভ্যতার আদি যুগ হইতে এই সকল স্থানেই জনবসতির ঘনত্ব বেশী পরিলক্ষিত হয়। ভারতের মধ্যবর্তী সমভূমি অঞ্চল, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল অঞ্চল এই কারণেই অতি নিবিড় বসতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত জম্মু ও কাশ্মীর, অরুণাচল, সিকিম প্রভৃতি স্থানের ভূ-প্রকৃতি আদৌ মনুষ্য-বাসের ও মানুষের অর্থ নৈতিক ক্রিয়া কলাপের প্রসারের পক্ষে উপযোগী নহে। ফলে এই সকল অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০ জনেরও কম।

(২) **জলবায়ু** (Climate) **:** মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে জলবায়ুর প্রভাব সর্বাধিক। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও ইহার জলবায়ু সর্বত্র একপ্রকার নহে। কৃষি কার্যের উপযোগী জলবায়ু অঞ্চলেই কৃষিকার্যকে ভিত্তি করিয়া ভারতের সর্বাধিক জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। পরবর্তীকালে এই সকল অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ঘটায় জনবসতি অধিকতর নিবিড় হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু প্রভৃতি স্থানে জলবায়ুর

আনুকূল্যেই অধিক জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজস্থানের মরু অঞ্চল বা অরুণাচলের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু অঞ্চলে এই কারণেই বিরল বসতির সৃষ্টি হইয়াছে।

(৩) **মৃত্তিকা** (Soil) : মানুষের জীবিকার প্রাথমিক অবলম্বন কৃষি। ইহা ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও মৃত্তিকার আনুকূল্যের উপর নির্ভরশীল। এই কারণে উর্বর মৃত্তিকা অঞ্চলে কৃষিকার্যকে আশ্রয় করিয়া জনবসতি নিবিড় হইয়া থাকে। নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকায় পলিসমৃদ্ধ অঞ্চলে, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে নদী ব-দ্বীপে, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে মৃত্তিকার স্বাভাবিক উর্বরতা জনবসতির ঘনত্বের অন্যতম প্রধান কারণ।

(৪) **নদ-নদী** (Drainage) : নদী-অববাহিকা পলিসমৃদ্ধ সমভূমি। ইহা কৃষিকার্য, গৃহ নির্মাণ, পরিবহণ প্রভৃতির বিশেষ উপযোগী। নদীপথে পরিবহণ বিশেষ সুবিধাজনক। নদীর জল যেমন স্নান-পানে ব্যবহৃত হয় তেমনি কৃষিক্ষেত্রে সেচকার্যে—জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ও শিল্পে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। নদীকে কেন্দ্র করিয়া একদিন মনুষ্য বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। আজিও ঐ ধারা অব্যাহত। ভারতের নদী ব-দ্বীপ যেমন গঙ্গার অববাহিকা ও গোদাবরী—কৃষ্ণা—কাবেরী—মহা-নদী, ব-দ্বীপ এলাকাগুলি এই কারণেই নিবিড় বসতিপূর্ণ। নর্মদা, তাপ্তি, যমুনা, দামোদর, তুঙ্গাভদ্রা প্রভৃতি নদী-অববাহিকায় কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছে। এই সকল কারণে নদনদীর অববাহিকা অঞ্চলে জনবসতির অধিক ঘনত্ব পরিলক্ষিত হয়।

(৫) **প্রাকৃতিক সম্পদ** (Natural Resources) : প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসারে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে। দুর্গম অরণ্য, পর্বত, মরু ও মেরু অবহেলায় মানুষ জয় করে সম্পদ আহরণের প্রয়োজনে। কৃষিজ, বনজ, প্রাণীজ, খনিজ প্রভৃতি নানাবিধ সম্পদ মানুষ নানাভাবে ব্যবহার করে। শিল্পের সাহায্যে প্রাথমিক সম্পদকে রূপান্তরিত করিয়া মানুষ নানাবিধ পণ্য উৎপাদন করে। ফলে এই সকল সম্পদ আহরণ স্থলে ও উৎপাদন স্থলে নিবিড় জনবসতি গড়িয়া উঠে। খনিজ তেল উৎপাদনের প্রয়োজনে আসামের দুর্গম অঞ্চলে জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটিয়া থাকায় অধিক সংখ্যক মানুষ জীবিকারজন্য ঐ সকল রাজ্যে বসবাস করিতেছে। ফলে ঐ সকল স্থানে নিবিড় বসতি অঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৬) **সাংস্কৃতিক পরিবেশ** (Cultural Environment) : কোনস্থানের সাংস্কৃতিক পরিবেশের আনুকূল্যেও জনবসতির ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধর্ম ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে বারাণসী, এলাহাবাদ, অমৃতসর প্রভৃতি কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল অঞ্চলে জনবসতি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী কালে

অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিবেশের আনুকূল্যে এই সকল স্থানে শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র গড়িয়া উঠে এবং এই সকল অঞ্চলের জনবসতি অতি নিবিড় হয়।

রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণেও ভারতে বহুপ্রাচীন শহর ও শিল্প বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল স্থানেও জনবসতি মোটামুটি ঘন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতের উত্তর, পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলের নাতিনিবিড় ও বিরল বসতিযুক্ত অঞ্চলে জলসেচের সাহায্যে কৃষির সুব্যবস্থা করায় ও কোন কোন অঞ্চলে শিল্প স্থাপন করায় জনবসতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিতেছে।

[প্রশ্ন : (১) ভারতের জনবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য কি কি ? (২) জনঘনত্ব কি ? (৩) ভারতে কোন্ অঞ্চলে সর্বাধিক জনঘনত্ব দেখা যায় এবং কেন ? (৪) জনঘনত্বের তারতম্যের কারণ কি ? (৫) জনঘনত্ব অনুযায়ী ভারতকে ক'টি অঞ্চলে ভাগ করা যায় ও কি কি ?

ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনবণ্টন (Distribution of population in India in the light of geographical resources) : কোন অঞ্চলের জনবসতির ঘনত্ব অনেকাংশেই নির্ভর করে ঐ অঞ্চলের ভৌগোলিক সম্পদের প্রাচুর্য ও উহার ব্যবহারের সুবিধার উপর। ভৌগোলিক সম্পদ বলিতে প্রধানত ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, কৃষিজ, বনজ, প্রাণীজ, খনিজ সম্পদ প্রভৃতিকে বুঝায়। এই সকল সম্পদের প্রাচুর্য বা অভাবের ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতে তিনটি জনবসতি অঞ্চল পরিলক্ষিত হয়— (১) নিবিড় বসতি অঞ্চল, (২) নাতিনিবিড় বসতি অঞ্চল এবং (৩) বিরল বসতি অঞ্চল।

(১) **নিবিড় বসতি অঞ্চল** (High Density zone) : প্রতি বর্গ কিলোমিটার স্থানে ২০০ জনের অধিক লোক বসবাসকারী অঞ্চলকে নিবিড় বসতি অঞ্চল বলা হয়। ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা, মালাবার, কঙ্কন ও ওড়িশার উপকূলভূমি এবং তামিলনাড়ুর উত্তরাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের সমতলভূমি, পলিসমৃদ্ধ উর্বর মৃত্তিকা, বৃষ্টিপাত ও উত্তাপ, উন্নত সেচব্যবস্থা ব্যাপক কৃষির সহায়ক। ধান, পাট, গম, চা, ইক্ষু, প্রভৃতি কৃষি সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টনে এই অঞ্চলের সর্বাধিক সুবিধা রহিয়াছে। অধিকন্তু এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে ও ইহার সন্নিহিত অঞ্চলের খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় শিল্প স্থাপনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর কলিকাতা, দুর্গাপুর-আসানসোল, বিহারের রাঁচি-জামশেদপুর, মহারাষ্ট্রের বোম্বাই-পুনা, তামিলনাড়ুর মাদ্রাজ-কোয়েম্বাটুর প্রভৃতি অতি নিবিড় জনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বন্দরের নৈকট্য এই অঞ্চলের জনবসতি বৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(২) **নাতিনিবিড় বসতি অঞ্চল** (Moderate Density zone) : প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০০ হইতে ২০০ জন লোকবসতিযুক্ত অঞ্চলকে নাতি নিবিড় বসতি অঞ্চল বলা যায়। গুজরাটের পূর্বাংশ, ত্রিপুরা, ওড়িশা, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণাংশ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর কিয়দংশ এবং আসামের অংশবিশেষ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানে মৃত্তিকা উর্বর। কিন্তু স্থানে স্থানে বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম-বেশি হওয়ায় কৃষিকার্যের কিছুটা অসুবিধা ঘটে। এখানে গম, তুলা, ইক্ষু, চা, ভুট্টা, তৈলবীজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলে খনিজ সম্পদের অপ্রাচুর্য-হেতু শিল্পাঞ্চলের প্রসারও তেমন ঘটে নাই। মালভূমি অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, যানবাহন পরিচালনা বিশেষ অসুবিধাজনক। আসামের চা-বাগিচা ও তেলসমৃদ্ধ অঞ্চলে জনবসতি অপেক্ষাকৃত ঘন। আসাম ও কর্ণাটক অঞ্চলে বনভূমি রহিয়াছে। কিন্তু আসামের দুর্গম বনভূমি হইতে সম্পদ আহরণ কষ্টকর। এই সকল কারণে এই অঞ্চলের জনবসতি নাতিনিবিড়।

(৩) **বিরল বসতি অঞ্চল** (Low Density zone) : প্রতি বর্গ কিলোমিটার স্থানে ১০০ জনের কম বসতিযুক্ত অঞ্চলকে বিরল বসতি অঞ্চল বলা যায়। রাজস্থানের মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চল, অরুণাচল, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, সিকিম, মণিপুর, মিজোরাম, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, আসাম ও মধ্যপ্রদেশের বনভূমি প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, মরু অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা, হিমালয় অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের আধিক্য ইত্যাদি সকল কৃষির প্রতিকূল। খনিজ সম্পদের অভাব, রাস্তাঘাট তৈয়ারি ও যানবাহন চলাচলের অসুবিধা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি কারণেই এই সকল স্থানে জনবসতি কোথাও প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০০ জনের বেশি দেখা যায় না।

প্রশ্ন : ভৌগোলিক সম্পদের ভিত্তিতে ভারতের জনবণ্টন দেখাও।

অনুশীলনী ১৪

১। ভারতে জনবসতি বণ্টনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। ভারতের পরিবেশ এই জনবসতি বণ্টনের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ?

[Examine the pattern of population distribution in India. How far has this distribution been affected by economic factors ?]
[W. B. H. S. C. Exam. 1983]

২। জনবসতির ঘনত্বের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতকে ভাগ কর। ভারতের অসম জনবসতি বণ্টনের কারণ নির্দেশ কর।

[Divide India on the basis of the density of population. Account for the unven distribution of population in India.]
[W. B. H. S. C. Exam. 1981]

৩। ভারতের জনবন্টনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ভারতে জনবসতির অসম বন্টনের কারণ নির্দেশ কর।

[Discuss the features of the population distribution in India. Account for the uneven distribution of population in India.]

৪। ভৌগোলিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনবসতির পর্যালোচনা কর।

[Criticaily examine the pattern of population distribution in India in the light of geographical resources.]

৫। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে জনবসতি ঘন? এই সকল অঞ্চলে জনবসতি ঘনত্বের কারণ নির্দেশ কর।

[Which parts of India are thickly populated ? State the causes for such population concentration.]

৬। ভারতের লোকবসতির অসম বন্টনের কারণ নির্দেশ কর। এই দেশ কি অতি জনাকীর্ণ?

[Account for the uneven distribution of population in India. Is India over-populated ?] [W. B. H. S. C. Exam. 1982]

৭। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির ব্যাখ্যামূলক টীকা লিখ—

(ক) কোন দেশের কেন্দ্রীয় অবস্থান ঐ দেশের বহির্বাণিজ্যের সহায়ক।

(খ) স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

(গ) পরিকল্পনা কালে ভারতের ঘাটতি বাণিজ্যের উদ্ভব হইয়াছে।

(ঘ) রাজস্থানে ও পূর্বহিমালয় অঞ্চলে লোকবসতি খুবই বিরল।

(ঙ) গাঙ্গেয় উপত্যকায় লোকবসতি খুবই নিবিড়।

(চ) কেরালা রাজ্যে জনবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন।

[Write explanatary notes on the following statements—

(a) The central situation of a country is favourable to its foriegn trade.

(b) There is a basic change in the trend of India's foreign trade during the post-independence period.

(c) There has arisen adverse balance of trade in India during plan period.

(d) Population is scanty in Rajasthan and Eastern Himalayan region.

(e) Average density of populution is too high in the Gangetic Valley.

(f) Population density is the highest in Kerala.]

১৫ | পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal)

অবস্থান ও আয়তন (Location and Area) : ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট অবিভক্ত বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ লইয়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হইয়াছে। ইহা ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান ২১°২৫´ উত্তর অক্ষাংশ হইতে ২৭°১৩´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৫°৪৯´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হইতে ৮৯°৫৩´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ। কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩½° উত্তর অক্ষাংশ) এই রাজ্যের **কৃষ্ণনগর** ও **পুরুলিয়ার** উপর দিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ইহার মোট আয়তন ৮৮,৭৫২ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮০ হাজার (১৯৮১ সালের আদমসুমারি-অনুযায়ী)। প্রতি বর্গ কিলোমিটার স্থানে এই রাজ্যে ৬১৪ জন লোক বাস করে। জনবসতির ঘনত্বে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ভারতে কেরালার পরে, দ্বিতীয়।

ভূ প্রকৃতি ও জলবায়ু (Topography and Climate) : পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যের ৮০% অঞ্চল পলিগঠিত সমভূমি হইলেও ইহার উত্তরে হিমালয়ের উচ্চভূমি, পশ্চিমে ছোটনাগপুর মাল-ভূমির সীমিত বিস্তার ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন সমভূমি এই রাজ্যের ভূ-প্রকৃতি গঠনে বিশেষ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ও ইহার পাদদেশের মৃত্তিকা শিলাময় ও অনুর্বর। পশ্চিমাঞ্চলে মালভূমির মৃত্তিকা লাল কঙ্করময়। সেচ ব্যবহারে ইহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণের সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চলের মৃত্তিকা অনেকাংশে বালুকাময়, লবণাক্ত ও অনুর্বর। ইহা ব্যতীত সমগ্র সমভূমি অঞ্চল গঙ্গা ও ইহার বিভিন্ন উপনদীবাহিত পলিগঠিত ও উর্বর। এই রাজ্যের জলবায়ু মৌসুমী-অধ্যুষিত উষ্ণ ও আর্দ্র। সমগ্র রাজ্যটি মৌসুমী জলবায়ু-অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে বৃষ্টিপাত ঋতুগত। ইহার উত্তরাংশে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত (প্রায় ২৫০ সে. মি.) হয়, পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম (প্রায় ১০০ সে.মি.)। অন্যান্য অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ১৫০ সেমি.-২০০ সেমি.।

নদ-নদী (Drainage) : পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রধান নদী **গঙ্গা**। মুর্শিদাবাদ জিলায় ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া প্রধান ধারাটি **পদ্মা** নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। অপর ধারাটি **ভাগীরথী** নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। **হুগলীর নিকট হইতে মোহনা পর্যন্ত ইহা হুগলী নামে পরিচিত**। সাধারণের নিকট ইহা গঙ্গা নামেই পরিচিত। গঙ্গা ও ইহার উপনদী **ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, জলঙ্গী, দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাবতী** প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির

অন্যতম প্রধান অবলম্বন। কিন্তু বিগত প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ এই সকল নদীতে পলি জমিয়া পরিবহণের বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। গঙ্গার মুখে পলিস্তর জমিয়া কলিকাতা বন্দরের প্রায় ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে। ইহা ব্যতীত নদীখাল অগভীর হওয়ায় বর্ষাকালে প্রায়ই প্লাবনের সৃষ্টি হয় ও ধনসম্পত্তির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি (Agriculture)

কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা (Agriculture and Irrigation): পশ্চিমবঙ্গের আয়তনের প্রায় ৬২% অংশে কৃষিকার্য করা হয় এবং এই রাজ্যের প্রায় ৫৭% লোক কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল। এই রাজ্যে খারিক মরশুমেই সর্বাধিক কৃষিকার্য হয়। কারণ এই সময় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটে। রবি মরশুম বৃষ্টিহীন শুষ্ক বলিয়া এই সময় কৃষিকার্যের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। অধিকন্তু খারিফ মরশুমেও পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া প্রভৃতি জিলাগুলিতে সমভাবে বৃষ্টিপাত ঘটে না। জলের অভাবে কৃষিকার্য পরিচালনা খুবই অসুবিধাজনক হয়। এই কারণে বৎসরের সকল সময় কৃষিক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জলের সরবরাহ নিশ্চিত করিবার জন্য জলসেচের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু জলসেচের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা কখনও পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে জলসেচের ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

সেচ-ব্যবস্থা: সমগ্র ভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সেচ ব্যবস্থা এখনও তেমন ব্যাপক নহে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২৬% জমি সেচযুক্ত। ভারতে মোট সেচযুক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ৩১%। এই রাজ্যে একসময় পুকুর, কুয়া ও নলকূপ হইতেই প্রধানত জলসেচ করা হইত। বৃটিশ যুগের শেষ দিকে বিভিন্ন জিলায় কয়েকটি খাল কাটা হইয়াছিল। এই সকল খালের মধ্যে বর্দ্ধমান জিলার দামোদর, ইডেন ও বেহালা খাল, বীরভূম জিলার বক্রেশ্বর, কাশিয়ানালা, বাঁকুড়া জিলায় শুভঙ্করী, শালবাঁধ, আমজোর, রুক্মিনী খাল, মেদিনীপুর জিলায় মেদিনীপুর খাল, হুগলী জিলার ডানকুনি খাল, তেরাজুলিখাল, পুরুলিয়া জিলায় সাহারজোর খাল উল্লেখযোগ্য।

নদী পরিকল্পনা ও জলসেচ ব্যবস্থা—বৃষ্টিপাতের অসমবণ্টন ও অনিশ্চয়তা দূর করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে কয়েকটি নদী প্রকল্প রূপায়িত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী নদী পরিকল্পনা। (১) দামোদর নদের উপর দুর্গাপুরে সেচ বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জিলার বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের সুবিধা হইয়াছে। (২) ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার সাহায্যে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জিলার বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচ সম্ভব

হইয়াছে। (৩) কংসাবতী পরিকল্পনার কার্যধারা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, অংশত শেষ হইয়াছে। এই প্রকল্প রূপায়িত হইলে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও হুগলী জিলায় ব্যাপক জলসেচের সুবিধা হইবে।

চিত্র ১৫.১ : ময়ূরাক্ষী, দামোদর ও কংসাবতী পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গে উপরি-উক্ত বৃহৎ তিনটি নদী পরিকল্পনা ব্যতীত আরও কয়েকটি মাঝারি ও ছোট আকারের সেচ প্রকল্প রূপায়িত হইয়াছে। ইহার ফলে বর্তমানে এই রাজ্যের প্রায় ২৩·১৬ লক্ষ হেক্টর জমি (৩২% প্রায়) সেচের আওতায় আনা সম্ভব হইয়াছে! আশা করা যায় শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের সেচযুক্ত জমির পরিমাণ প্রায় ৩০ লক্ষ হেক্টর বা মোট আবাদযোগ্য জমির প্রায় ৪০% হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান কৃষিজ সম্পদ—পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন কৃষিজ দ্রব্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) খাদ্য শস্য—ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, ডাল ইত্যাদি ;

(২) অর্থকরী ফসল—পাট, ইক্ষু, তামাক, পান, লঙ্কা, শন, মেস্‌তা ইত্যাদি ;

(৩) বাগিচা ফসল—চা, সিঙ্কোনা, তুঁতগাছ, ফল।

ধান—পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কৃষি সম্পদ ধান। কৃষি জমির শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জমিতে ধান উৎপন্ন হয়। ধান উৎপাদনে ভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম। ধান এই রাজ্যের সব জিলাতেই কম-বেশি হইয়া থাকে। মোট উৎপাদনে বর্দ্ধমান জিলা প্রথম এবং হেক্টর প্রতি উৎপাদনে হুগলী অগ্রণী। অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে হাওড়া, মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, কোচবিহার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গম—পশ্চিমবঙ্গে এক সময় গম চাষ নগণ্য ছিল। কিন্তু দেশে খাদ্য ঘাটতির ফলে এই রাজ্যে গম চাষের প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং বিগত দশ বৎসরে এই রাজ্যে গম চাষের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। হেক্টর প্রতি গম উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। মুর্শিদাবাদ জিলায় সর্বাধিক গম উৎপন্ন হয়। বর্তমানে প্রায় সকল জিলাতেই গম চাষের প্রচুর প্রসার ঘটিয়াছে। নদীয়া, বীরভূম, ২৪-পরগণা, মালদহ, দার্জিলিং ও অন্যান্য জিলায় প্রচুর গম উৎপন্ন হয়।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য শস্যের উৎপাদন (ল. মে. ট.)

বৎসর	ধান	গম	দানাশস্য	ডাল	মোট খাদ্য শস্য
১৯৭৫-৭৬	৬৮·৬৬	১১·৮৭	১·২৮	৪·১০	৮৫·৯২
১৯৮০-৮১	৫৮·৮৬	৭·৬৮	১·০৩	৩·০৪	৭০·৬২
১৯৮২-৮৩	৪৯·৪৯	৬·০৫	১·০০	১·৯৭	৫৮·৫২
১৯৮৩-৮৪	৭৯·৪০	৮·৫৪	১·১৭	২·৪৫	৯১·৫৭

Source : Economic Survey (India), 1984-85

পাট—পশ্চিমবঙ্গের ধানের পরেই পাটের স্থান। ইহা একটি অর্থপ্রসূ প্রধান ফসল। স্বাধীনতার পূর্বে পাট কলগুলি পশ্চিমবঙ্গে থাকিলেও চাহিদানুযায়ী কাঁচামাল পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) হইতে আসিত। বর্তমানে অবশ্য ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন প্রদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) তুলনায় এখানে উৎপন্ন কম ও পাট তেমন উৎকৃষ্ট নহে। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর,, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে পাটের চাষ হয়।

চা—চা আরও একটি পশ্চিমবাংলার অর্থপ্রসূ ফসল। ভারতের মধ্যে চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে চা উৎপন্ন হয়।

ইক্ষু—মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও বীরভূমে ইক্ষু উৎপন্ন হয়; চিনির কলের অভাবে ইক্ষুর চাহিদা কম। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য নহে।

অন্যান্য ফসল: ২৪-পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও কোচবিহারে প্রচুর, **তামাক** জন্মে; বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় **ভুট্টা** উৎপন্ন হয়। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির পাহাড়ের কোলে **কমলালেবু**, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরে **আলু**, মালদহ ও দিনাজপুরে **আম**, দার্জিলিং-এ **সিঙ্কোনা** পুলবাজার ও কালিম্পং-এ **বড় এলাচ** ও অন্যান্য **মশলাপাতি**, সমুদ্র তীরবর্তী ২৪-পরগণা ও মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী জিলাতে **নারিকেল** উৎপন্ন হয়। হুগলী জিলায় প্রচুর **কলা** উৎপাদন হয়। **তুঁত** গাছের চাষ হয় মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। আর উহাদের পাতার সাহায্যে পালন করা হয় অসংখ্য গুটিপোকা যাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন হয় প্রচুর রেশমী কাপড়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন জিলায় **তিল**, **তিসি** প্রভৃতি **তৈলবীজ**, **তুলা** ও **ডাল** স্বল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদ (Mineral Resources)

পশ্চিমবঙ্গ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। কেবলমাত্র কয়লাই এই রাজ্যের প্রধান খনিজ সম্পদ। লৌহ, তাম্র, চুনাপাথর, চীনামাটি প্রভৃতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

কয়লা—বৰ্দ্ধমান জিলার রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে প্রায় ৮০০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের কয়লার খনি অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের মোট কয়লার খনির সংখ্যা ২০০টি। ভারতের সমগ্র কয়লার ২৮% এইরাজ্যে উত্তোলিত হয়। দার্জিলিং অঞ্চলে টার্শিয়ারী কয়লার একটি খনি আছে। বাঁকুড়া জিলায় উল্লেখযোগ্য কয়লা খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

লৌহ আকরিক: বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জিলায় লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। ইহার পরিমাণ খুবই সামান্য। দার্জিলিং জিলায় সামান্য লৌহ আকরিক থাকিলেও যানবাহনের অসুবিধার কারণে তাহা ব্যবহার করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের লৌহ আকরিক অত্যন্ত নিম্নমানের।

চুনাপাথর: বক্সা ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রচুর চুনাপাথর পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত স্থানে

নানান অসুবিধার কারণে চুন প্রস্তুতের কোন কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। ইহা ছাড়াও বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমান জিলায় সামান্য চুনাপাথরের অস্তিত্ব রহিয়াছে।

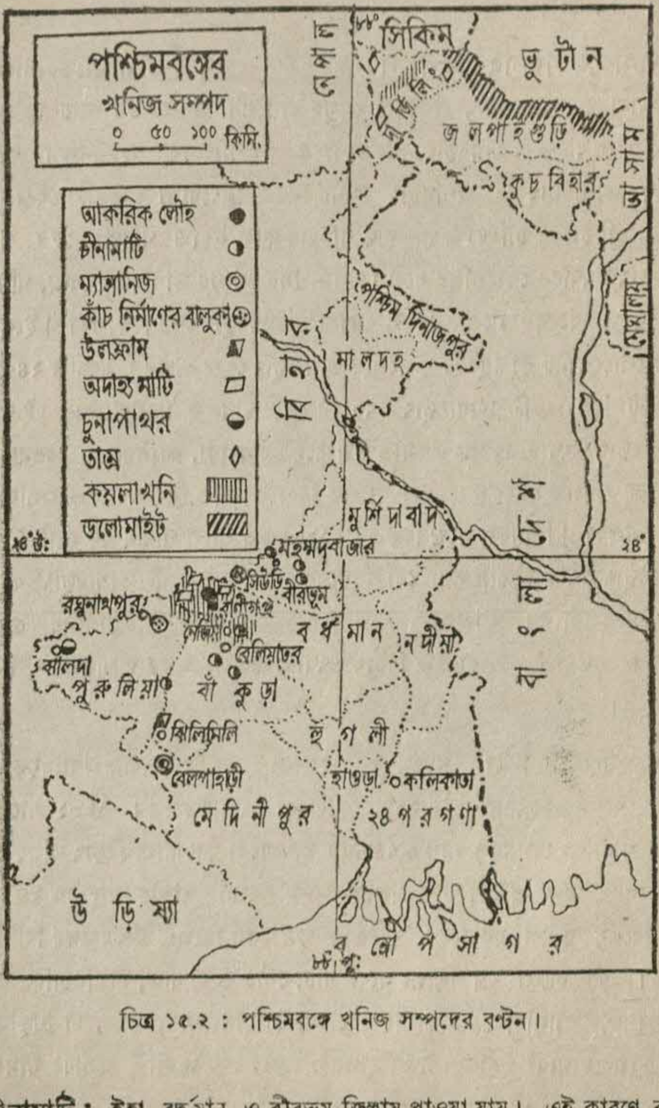

চিত্র ১৫.২ : পশ্চিমবঙ্গে খনিজ সম্পদের বণ্টন।

চীনামাটি : ইহা বর্দ্ধমান ও বীরভূম জিলায় পাওয়া যায়। এই কারণে রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর, কুলটিতে ইট, টালি ও পাইপের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দার্জিলিং জিলায়ও চীনামাটি পাওয়া যায়।

ইহা ব্যতীত জলপাইগুড়ি জিলার বক্সাডুয়ার্সের জয়ন্তী অঞ্চলে ডলোমাইট পাওয়া যায়। এই রাজ্যে ফায়ার ক্লে, অভ্র, উলফ্রাম, আকরিক তাম্র, ট্যালক ইত্যাদি খুবই সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। সম্প্রতি এই রাজ্যের বাঁকুড়া জিলায় তেজস্ক্রিয় খনিজের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন : এই রাজ্যে এক সময় তাপবিদ্যুতের সাহায্যেই শিল্প-কারখানা চালিত হইত, রাস্তাঘাট ও গৃহ আলোকিত হইত। কয়লার অপচয় রোধকল্পেই প্রধানত জলবিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবার ফলে ইহাও পর্যাপ্ত নহে। পশ্চিম-বঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মধ্যে ডি. ভি. সির দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ব্যাণ্ডেল ও সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কাশীপুর ও মুলাজোর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রধান। সম্প্রতি ২৪-পরগনা জিলার টিটাগড়ে একটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই রাজ্যের মধ্যে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একমাত্র উত্তরবঙ্গের জলঢাকা, কার্শিয়াং ও বিজনবাড়ীতে তিনটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বিহারে ডি.ভি.সি-উৎপাদিত জলবিদ্যুতের সরবরাহ কলিকাতা শিল্পাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯৮২-৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট 6·5 লক্ষ কি. ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। মেদিনীপুরের কোলাঘাটে একটি তাপবিদ্যুৎ কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। ফারাক্কায় একটি সুপার থার্মাল স্টেশন স্থাপনের প্রচেষ্টাও চলিতেছে। বর্তমানে এই রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট ক্ষমতার পরিমাণ ২ মিলিয়ন কিলোওয়াট।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প : পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য। ভারতের শিল্পজাত দ্রব্যের প্রায় ২০% এই রাজ্যে উৎপাদিত হয়। ১৯৮১ সালে এই রাজ্যে কারখানার সংখ্যা ছিল প্রায় ৬,৫৪৮টি। এই রাজ্যে কাঁচামাল, বিদ্যুৎ শক্তি, বাজার, উন্নত পরিবহণ, দক্ষ শ্রমিক, বন্দর প্রভৃতির সহজ সরবরাহ থাকায় আধুনিক যন্ত্র শিল্পের প্রসারে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পেও পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। এই রাজ্যে যন্ত্র শিল্পের মধ্যে পাট, লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং, কার্পাস বয়ন, কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম, রাসায়নিক, চর্ম, কাঁচ সিরামিক, মুদ্রণ, চা প্রভৃতি শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত ডালকল, তেলকল, বেকারি, প্রসাধন সামগ্রী ও প্লাস্টিক দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতির অসংখ্য কারখানা বর্তমান।

নিম্নের সারণীতে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত বিভিন্ন রাজ্যের কর্মীদের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেখান হইল (**শতকরা হিসাবে**):

		পশ্চিমবঙ্গ	বিহার	ওড়িশা	উঃপ্রদেশ	অন্যরাজ্য
পাটশিল্প	১৯৭৭	২৭'৯৩	৩৯'৪১	৬'৭২	২০'১১	৫'৮৩
	১৯৮১	২৫'৭৯	৩৮'৭৯	৫'৮৮	২৩'৪৩	৬'৫৩
ইঞ্জিনিয়ারিং	১৯৭৭	৫৯'২১	২১'১০	৩'০৩	১২'০৪	৪'৬২
	১৯৮১	৬০'১২	১৭'৮৮	৩'৪২	১৫'২৫	৩'৩১
ছাপাখানা	১৯৭৭	৭২'২৩	১৫'৭৯	২'৩৭	৫'৩৭	৩'৮৪
	১৯৮১	৭৫'১৮	১৪'৭২	২'৫৭	৪'৭১	২'৮২
কাঁচ শিল্প	১৯৭৭	৬০'৪৭	২০'৪৭	৩'৪৬	১১'৭৯	৩'৫৯
	১৯৮১	৩৯'২৫	২৪'১২	২'৬২	৩১'৫২	৩'৪৮
লৌহ ইস্পাত	১৯৭৭	৪৪'৫৬	২৭'৭৪	১'২৯	১৭'৯০	৮'৫১
	১৯৮১	৫৪'১৮	২৮'৮৮	১'২৬	১২'৬৬	৩'০২
রাসায়নিক শিল্প	১৭৭৭	৬০'৮৯	১৫'৪৬	৮'৩২	১১'৫১	৩'৮২
	১৯৮১	৫৮'৭৯	১৬'৯৩	৮'৫২	১২'১১	৩'৬৫
সকল শিল্প মোট	১৯৭৭	৪২'৮৯	২৯'৩২	৫'৫৩	১৬'৯২	৫'৩৪
	১৯৮১	৪২'৫৩	২৮'৫৯	৫'২১	১৮'৩৫	৫'৩২

Source: Economic Review (West Bengal) 1982-83

বৃহদায়তন শিল্প : পাট শিল্প—পাটশিল্পে পশ্চিমবঙ্গ বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৮৫৫ সালে হুগলী জিলার রিষড়াতে প্রথম পাট কল স্থাপিত হয় এবং ক্রমে ইহা বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের বৃহত্তম শিল্পে পরিণত হয়। এই রাজ্যে ৬৬টি পাটকল আছে। জগদ্দল, নৈহাটি, কাঁকিনাড়া, ভাটপাড়া, টিটাগড়, হাওড়া, বাউড়িয়া, শ্রীরামপুর, রিষড়া, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পাটকল কেন্দ্র। চট, থলি, দড়ি ইত্যাদি প্রধান উৎপাদন। ১৯৮১ সালে মোট ১.১৬ মি. মে. টন. পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

লৌহ-ইস্পাত শিল্প : লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের জন্য এই রাজ্যে তিনটি কারখানা বর্তমান। ১৮৭৪ সালে কুলটিতে প্রথম লৌহ গলাইবার কারখানা স্থাপিত হয়। পরে আসানসোলের নিকট বার্নপুর (IISCO) কারখানা স্থাপনের পর কুলটি ও বার্নপুরকে এক করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দুর্গাপুরে একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হয়। দুর্গাপুরে একটি অ্যালয় ইস্পাত কেন্দ্রও গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ১৯৮১ সালে এই রাজ্যে মোট ১৭'৮২ লক্ষ মে. টন লৌহপিণ্ড এবং ১০'২১ লক্ষ মে. টন ইস্পাত তৈয়ারি হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প : পশ্চিমবঙ্গে কয়লা, লৌহ-ইস্পাত, দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতি সহজলভ্য হওয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছে। ভারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মধ্যে এই রাজ্যে চিত্তরঞ্জনের রেল ইঞ্জিন শিল্প, হিন্দ মোটর্সের মোটর শিল্প, গার্ডেন রীচ অঞ্চলের লক, ষ্টীমার নির্মাণ শিল্প, আসানসোলের সাইকেল, বেলঘরিয়ায় বয়ন শিল্পের যন্ত্রপাতি (ট্যাক্সম্যাকো), দমদম, হাওড়া, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে নির্মাণ শিল্পের উপযোগী ভারী ইস্পাত সামগ্রী প্রস্তুতের কারখানা ও অসংখ্য যন্ত্রপাতি ও পাখা, সেলাই-এর কল, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি নির্মাণের কারখানা উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য উৎপাদনের কারখানাও পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বন্দুক, রাইফেল তৈয়ারির কারখানা এই রাজ্যে দমদম, কাশীপুর ও ইছাপুরে অবস্থিত।

কার্পাস বয়ন শিল্প : ভারতের কার্পাস বয়ন শিল্পের প্রথম কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল হাওড়া জিলার ঘুষুড়িতে। কিন্তু কাঁচা তুলার অভাবে এই কেন্দ্রটি বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় এই অঞ্চলে কার্পাস শিল্প স্থাপন করা হয়। বর্তমানে এই রাজ্যে ৩৬টি কার্পাস বয়ন কেন্দ্র আছে। শ্রীরামপুর, কোন্নগর, রিষড়া, হাওড়া, মেটিয়াবুরুজ, শ্যামনগর, বেলঘরিয়া, সোদপুর, পানিহাটি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কার্পাস বয়ন কেন্দ্র। ১৯৮১ সালে এই রাজ্যে ৫৩.১২ মি. কে.জি সূতা ও ১৪১.৬ মি. মিটার কাপড় তৈয়ার হয়।

অ্যালুমিনিয়াম শিল্প : আসানসোলের নিকট অম্বুপনগরে এই রাজ্যের প্রধান অ্যালুমিনিয়াম কারখানা অবস্থিত। বেলুড়, দমদম ও জলপাইগুড়িতে অ্যালুমিনিয়ামের দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানা আছে।

রবার শিল্প : রবার শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ উন্নত। হুগলী জিলার সাহাগঞ্জে ডানলপ, নদীয়ার কল্যাণীতে ইনচেক এবং ২৪-পরগণার পাণিহাটিতে বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ কারখানা আছে। মোটর ট্রাক, সাইকেল প্রভৃতির টায়ার, টিউব ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। কলিকাতার নিকটে রবার দ্রব্য উৎপাদনের অনেক ছোট কারখানা আছে।

কাগজ শিল্প : ১৮৬৭ সালে প্রথম কাগজ কল প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ৬টি কাগজের কল রহিয়াছে। টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, রাণীগঞ্জ, হালিশহর, নৈহাটি ও ত্রিবেণীতে এই কলগুলি অবস্থিত। ত্রিবেণীতে টিস্যু কাগজ তৈয়ারি হয়। ১৯৮১ সালে এই রাজ্যে কাগজ ও কাগজের বোর্ড মোট ১১৮.৬ মি. কেজি উৎপন্ন হয়।

দিয়াশলাই শিল্প : ১৯২৩ সালের পর এই শিল্পটি প্রসার লাভ করিতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৯টি দিয়াশলাই কারখানা আছে। ইহার উৎপাদন প্রায় ৪.১ লক্ষ গ্রোস বাক্স।

সিরামিক ও কাঁচ শিল্প : ১৯১৯ সালের প্রথম কাঁচ শিল্পের উন্মেষ হইলেও উহা স্থায়ী হয় নাই। ১৯২৭ সালে পুনরায় এই শিল্প গড়িয়া উঠে। বর্তমানে মোট ৩৩টি

কাঁচশিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। কলিকাতা ও আসানসোল অঞ্চলে কাঁচ তৈয়ারির প্রধান কারখানা অবস্থিত। সিরামিক কারখানা কলিকাতার বেলেঘাটা, দমদম, বেলঘরিয়া অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত।

মৃৎ শিল্প : এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল চীনামাটি। কাঁচ ও মৃৎ শিল্পের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন স্থানে গবেষণাগার স্থাপন করিয়াছে।

ঔষধ ও রাসায়নিক শিল্প : সমগ্র ভারতে রাসায়নিক শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম। সালফিউরিক অ্যাসিড, কষ্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরিন, রং, বেন্‌জিন ও কয়লার নানা উপজাত দ্রব্য এই শিল্পের প্রধান উৎপাদন। কলিকাতায় কয়েকটি বড় ঔষধ প্রস্তুত কারখানা অবস্থিত।

চর্ম শিল্প : কলিকাতার উপকণ্ঠে বাটানগরে সর্ববৃহৎ জুতার কারখানাটি অবস্থিত। ছোট-বড় অনেক কারখানা কলিকাতায় রহিয়াছে। এই রাজ্য চর্মশিল্পে বেশ উন্নত। কলিকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে বৃহৎ ট্যানারি আছে।

চা শিল্প : পশ্চিমবঙ্গ চা উৎপাদনে ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও, চা শিল্পে ইহার স্থান প্রথম। এই রাজ্যের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে চা উৎপন্ন হয়। ডুয়ার্স অঞ্চলে চা শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জিলায় মোট প্রায় ৩০০টি চা বাগান আছে। উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতি এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল। প্রায় ৫০ কোটি টাকা মূল্যের চা পশ্চিমবঙ্গ হইতে রপ্তানি হয়। ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গে চায়ের উৎপাদন ছিল ১,১৮০ লক্ষ কিলোগ্রাম। চা শিল্পের উন্নতির জন্য বর্তমানে নানাবিধ সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। কলিকাতা ও শিলিগুড়িতে দুইটি চায়ের নিলামকেন্দ্র আছে। উপরি-উক্ত শিল্পগুলি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর সংখ্যক ধানের কল, ময়দা কল, অসংখ্য আটা কল, তেলের কল আছে। পলাশী, বেলডাঙ্গা, আমেদপুরে তিনটি ছোট চিনির কল আছে। গুড়ের চাহিদা প্রচুর থাকা সত্ত্বেও বড় কল গঠন করা সম্ভব হয় নাই। ইহা কুটির শিল্পের অন্তর্গত।

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প : পশ্চিমবঙ্গের কুটির শিল্পের মধ্যে শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, ধনেখালির **তাঁতের কাপড়,** বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহের **রেশমী কাপড় ;** দার্জিলিং-এর **পশম শিল্প,** কৃষ্ণনগরের **মাটির পুতুল,** মুর্শিদাবাদে—খাগড়ার **কাঁসাপিতলের বাসন ;** হরিণঘাটার **দুগ্ধ শিল্প,** পুরুলিয়ার **লাক্ষা** এবং সমুদ্র উপকূলের **লবণ শিল্প** বিখ্যাত।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল : পশ্চিমবঙ্গে শিল্প গঠনের অনুকূল পরিবেশ সর্বত্র একপ্রকার নহে। এই কারণে চারিটি অঞ্চলেই প্রধান ও উল্লেখযোগ্য শিল্পসমূহের কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে, যেমন—(১) **বৃহত্তর কলিকাতা বা হুগলী-তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল,** (২) **হলদিয়া শিল্প সমাবেশ,** (৩) **আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল,** **এবং**

(৪) **জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং শিল্পাঞ্চল**। ইহা ব্যতীত কল্যাণী ও পুরুলিয়ায় দুইটি নূতন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক নানা শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চলেই প্রায় ৮ লক্ষ, আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে ১ লক্ষ এবং অন্যান্য কেন্দ্রে প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে।

হুগলী তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল
(The Hooghly Industrial Region)

পশ্চিমবঙ্গে হুগলী নদীর পূর্ব তীরে কলিকাতা ও পশ্চিমতীরে হাওড়া শহরকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর-দক্ষিণে হুগলী নদীর ধারা অনুসারী নানাবিধ শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যকেন্দ্রের যে রৈখিক বিস্তার ঘটিয়াছে তাহাকে হুগলী তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল বলে। এই শিল্পাঞ্চল বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চল নামে সমধিক খ্যাত। জন-নিয়োগ, মূলধন বিনিয়োগ, উৎপন্ন সামগ্রীর আর্থিক মূল্য ইত্যাদি বিচারে এই শিল্পাঞ্চলের গুরুত্ব সমগ্র দেশের অর্থনীতিতে অপরিসীম।

শিল্পাঞ্চলের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি : সপ্তদশ শতাব্দীতে বাণিজ্য সূত্রে ব্রিটেন হইতে ভারতে আগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী জব চার্নক ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট **কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর**—এই তিনখানি গ্রাম লইয়া কলকাতার পত্তন করেন। বঙ্গোপসাগরে পতিত গঙ্গা-হুগলী নদীর মোহনা হইতে মাত্র ১২০ কি. মি. অভ্যন্তরে হুগলী নদীর তীরে কলিকাতার অবস্থান ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য যোগাযোগ ও তৎকালীন বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌল্লার রোষ হইতে আত্মরক্ষা বিষয়ে বিশেষ সুবিধাজনক। ইহার পর ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে কবিগুরুর ভাষায়—"... বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে।" কলকাতা রূপান্তরিত হইল গোটা ভারতবর্ষের রাজধানীতে। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজগণ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিল এবং ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলিকাতাই ছিল ভারতের রাজধানী।

বর্তমানে উত্তরে হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে হুগলী জিলার ত্রিবেণী এবং পূর্ব তীরে নদীয়া জিলার কল্যাণী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে হাওড়া জিলার উলুবেড়িয়া এবং পূর্ব তীরে ২৪-পরগনা জিলার বিড়লাপুর পর্যন্ত প্রায় ৮০ কি.মি. দীর্ঘ এবং নদীর উভয় তীরে ৫-৬ কি.মি. প্রশস্ত বিরাট একটি এলাকা এই শিল্পাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। হুগলী নদীতে পলি জমিয়া কলিকাতা বন্দরের ধ্বংস প্রায় অনিবার্য হওয়ায় ইহার দক্ষিণে মেদিনীপুর জিলার হুগলী-হল্‌দী মোহনায় গড়িয়া তোলা হইয়াছে **হলদিয়া বন্দর**। নূতন বন্দরকে অনুসরণ করিয়া এই শিল্পাঞ্চলও ক্রমশঃ দক্ষিণে বিস্তৃত হইতেছে।

শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিবার অনুকূল পরিবেশ : এই শিল্পাঞ্চলের উদ্ভব ও বিকাশে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল কলিকাতা হইতে মাত্র ২০০ কি. মি. দূরে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার আবিষ্কার এবং ১৮৫৪ সালে রাণীগঞ্জের সহিত হাওড়ার রেলযোগাযোগ

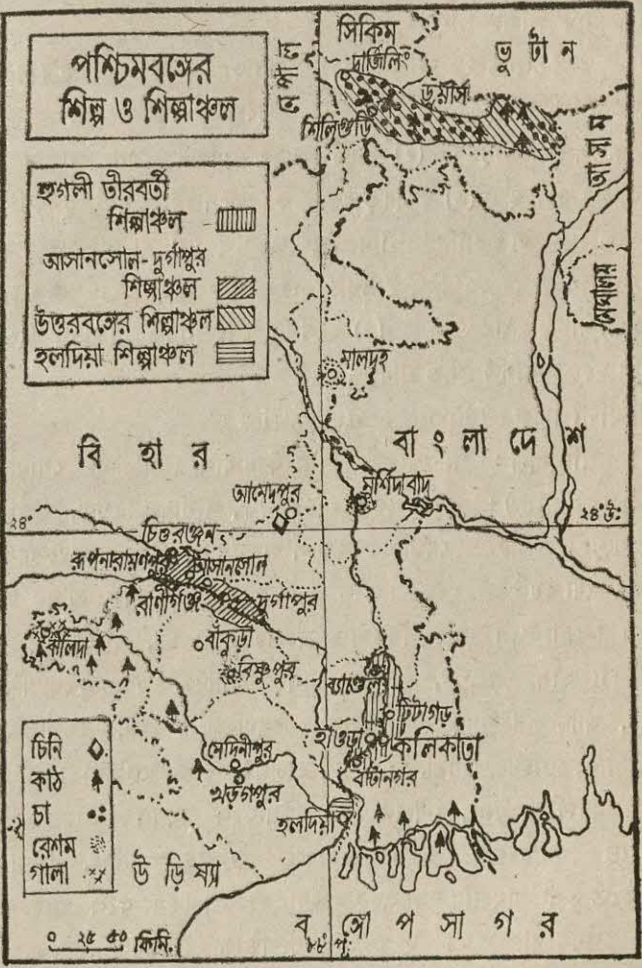

চিত্র ১৫.৩ : পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও শিল্পাঞ্চল।

স্থাপন। ইহা ছাড়া অন্যান্য যে সকল কার্যকরণ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে হুগলী শিল্পাঞ্চল সেগুলিকে নিম্নলিখিত দুইটি প্রধানভাগে ভাগ করা যায়— (ক) ভূ-প্রাকৃতিক ও (খ) অর্থনৈতিক কারণ।

(ক) **ভূ-প্রাকৃতিক কারণ**—(১) হুগলী নদীর উভয় তীরে পলি জমিয়া উচ্চ

লেভির সৃষ্টি হইয়াছে। তীরবর্তী অঞ্চল হইতে অভ্যন্তর ভাগে ক্রমশঃ ভূমিভাগ ঢালু হইয়া গিয়াছে। ফলে উচ্চ তীরবর্তী অঞ্চলেই কালক্রমে জনপদ ও শিল্প-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। (২) গঙ্গার প্রধান ধারা হুগলী নদীর খাতেই তখন প্রবাহিত হইত বলিয়া নদীখাত গভীর ছিল। (৩) মোহনা হইতে প্রায় ১২০ কি. মি. অভ্যন্তরে হওয়ায় জাহাজ নিরাপদ আশ্রয় পাইত।

(খ) **অর্থনৈতিক কারণ**—(১) কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, পূর্ববঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চল কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। (২) পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত রেল, সড়ক ও জলপথে যোগাযোগের সুব্যবস্থা। (৩) পশ্চাদ্‌ভূমির বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পাট, তুলা, চিনি, চামড়া, কয়লা, লোহা, অভ্র ইত্যাদি রপ্তানির উদ্দেশ্যে কলিকাতা বন্দরে জড় হইত। ক্রমে এই সকল সম্পদই বিভিন্ন শিল্প সৃষ্টির সহায়ক হয়। (৪) রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লা শিল্প শক্তির প্রধান উৎস। (৫) দেশ-বিদেশের ব্যাপক বাজার। (৬) পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি হইতে আগত সুলভ শ্রমিক।

উল্লেখযোগ্য শিল্প (Important Industries)

(১) **পাটশিল্প** : পাটশিল্পের প্রধান কাঁচামাল পাট বা সোনালী আঁশ (Golden Fibre)। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জিলা, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, ওড়িশা, হইতে সংগৃহীত পাট ও মেস্তা এই অঞ্চলে ব্যবহার করা হয়। ভারতের মোট ৬৬টি পাটকলের মধ্যে ৫৪টি এই শিল্প অঞ্চলে অবস্থিত। প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক এই অঞ্চলের পাটশিল্পে নিয়োজিত। পাট শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে চট, থলি, বস্তা, দড়ি, তাঁবু, ত্রিপল, ক্যানভাস, কার্পেট, জুট ফ্ল্যানেল ইত্যাদি প্রধান। নৈহাটি, ভাটপড়া, শ্যামনগর, জগদ্দল, টিটাগড়, আগড়পাড়া, বেলঘরিয়া, বজবজ, বিড়লাপুর, বাউড়িয়া, হাওড়া, বালি, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পাটকল কেন্দ্র।

(২) **কার্পাস বয়ন শিল্প** : এই শিল্পাঞ্চলে বর্তমানে প্রায় ৩৬টি কাপড়ের কল আছে। পশ্চিমবঙ্গে তুলার অভাবহেতু গুজরাট, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল হইতে তুলা আমদানি করা হয়। এখানকার কাপড়ের কলে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়। হাওড়া, উলুবেড়িয়া, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, মেটিয়াবুরুজ, বেলঘরিয়া, সোদপুর, শ্যামনগর, কল্যাণী প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কল বর্তমান। এইখানে প্রধানত মোটা ও মিহি ধুতি, শাড়ি, মার্কিন কাপড় ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। এই শিল্পাঞ্চলে কার্পাস শিল্পের সহযোগী শিল্প হিসাবে তাঁত ও হোসিয়ারী শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটিয়াছে। হাওড়া ও কলিকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকায় হোসিয়ারী শিল্প বিশেষভাবে কেন্দ্রীভূত। ধনিয়াখালি, ফরাসডাঙ্গা, কল্যাণী প্রভৃতি তাঁত শিল্প কেন্দ্র।

(৩) **ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প** : ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে হুগলী শিল্পাঞ্চল ভারতের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। এই অঞ্চলে সাধারণ সূঁচ হইতে মোটর গাড়ি, ক্রেন, বয়লার, ওয়াগন এবং নানাবিধ সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রপাতি তৈয়ারি হয়। **কার্পাস ও পাট শিল্পের**

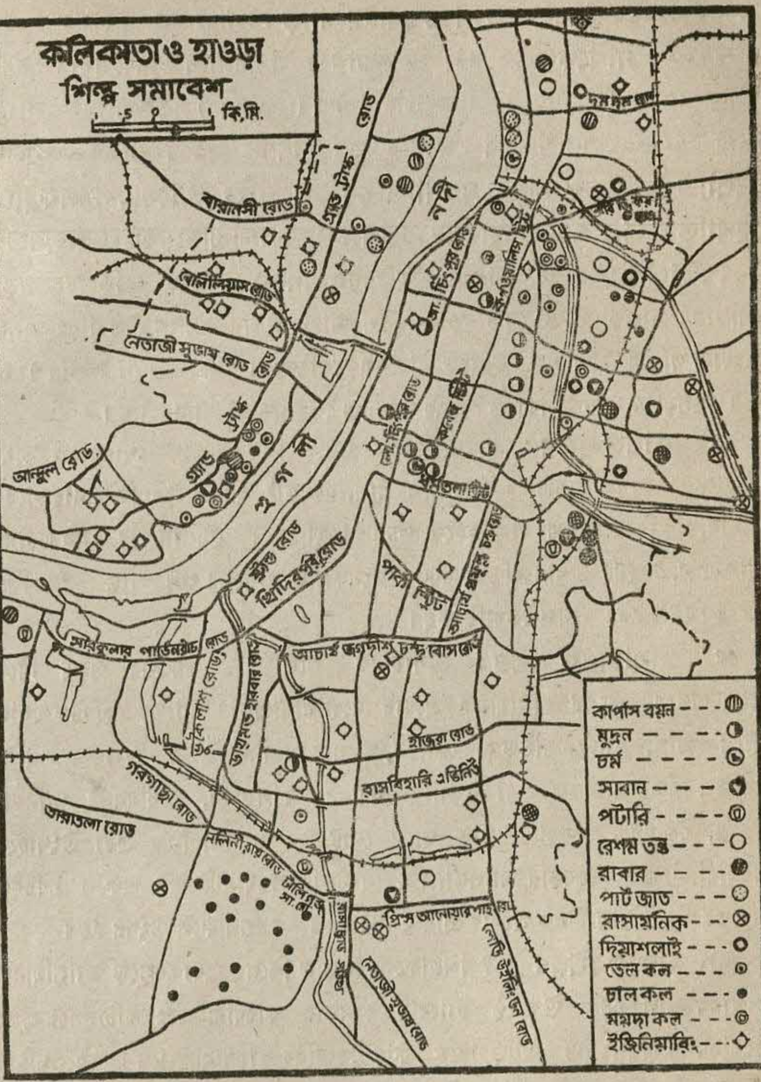

চিত্র ১৫.৪ কলিকাতা ও হাওড়া শিল্প সমাবেশ।

যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা বেলঘরিয়া (Texmaco), দমদম ও শ্রীরামপুরে স্থাপিত হইয়াছে। ভারী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ নির্মাণের কারখানার জন্য দমদম (Jessop), খিদিরপুর (M. M. C), হাওড়া (Martin Burn, Guestkeen Williams)

বিখ্যাত। খড়দহ, আগরপাড়া (Texmaco) ও দমদমে (Jessop) **বয়লার ও রেলওয়াগান** নির্মিত হয়। **মোটর লঞ্চ, ট্রলার, ফ্রিগেট** ইত্যাদি নির্মাণের জন্য গার্ডেনরীচ ও মেটিয়াবুরুজ, **জীপ ও মোটর গাড়ি** তৈয়ারির জন্য কলিকাতা ও হিন্দ-মোটরস এবং **সাইকেল** তৈয়ারির জন্য কল্যাণী ও আসানসোল উল্লেখযোগ্য। হুগলী জিলার সাহাগঞ্জ (Dunlop) এবং নদীয়ার কল্যাণী (Incheck) সড়ক পরিবহণে ব্যবহৃত টায়ার টিউব ও অন্যান্য রাবারজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। **হালকা যন্ত্রপাতি বৈদ্যুতিক তার** ও **যন্ত্রপাতি, রেডিও, টিভি, ক্যাসেট, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি প্রস্তুতের ছোট বড় নানা ধরনের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে কলিকাতা, হাওড়া, সালকিয়া, দমদম, শ্যামনগর, খিদিরপুর, লিলুয়া, বেলুড়, আড়িয়াদহ প্রভৃতি এলাকায়। হাওড়া অঞ্চলে ছোট বড় ও জটিল নানা প্রকার যন্ত্রাংশ তৈয়ারির অসংখ্য কারখানা গড়িয়া উঠিবার জন্য ইহাকে ভারতের শেফিল্ড (Sheffild of India) বলা হয়। লিলুয়া ও কাঁচড়াপাড়াতে রেলের যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা আছে।

(৪) **কাগজ শিল্প :** ভারতে কাগজ প্রস্তুতে এই শিল্পাঞ্চলের গৌরবদীপ্ত ভূমিকা রহিয়াছে। কাগজ তৈয়ারির কাঁচামাল বাঁশ, নরমকাঠ, র্যাগস ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে ও আসাম, বিহার ও ওড়িশা রাজ্য হইতে প্রচুর পাওয়া যায়। হুগলী নদীর তীরে টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, নৈহাটি ও বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে অনেকগুলি কাগজের কল আছে। ত্রিবেণীতে টিস্যু ও সিগারেটের কাগজ তৈয়ারি হয়।

(৫) **রাসায়নিক শিল্প :** রাসায়নিক শিল্পে এই অঞ্চলের গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উৎপন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে নানাপ্রকার অ্যাসিড, কস্টিক সোডা, সোডা অ্যাশ, ব্লীচিং পাউডার, ক্লোরিন, কয়লার নানাবিধ উপজাত দ্রব্য—ন্যাপথলিন, বেনজিন, ফিনাইল, রঞ্জক দ্রব্য ইত্যাদি প্রধান। কলিকাতা, বিধাননগর, পানিহাটি, হাওড়া, কোন্নগর, রিষড়া প্রভৃতি স্থানে ছোট-বড় বহু রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা আছে। রিষড়ার অ্যালকালি কেমিক্যাল কারখানাটি এই অঞ্চলে সর্ববৃহৎ। ভারতের উৎপন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের প্রায় ২০ শতাংশ এই শিল্পাঞ্চলে উৎপন্ন হয়।

(৬) **অন্যান্য শিল্প :** এই শিল্পাঞ্চলের অন্যান্য শিল্পের মধ্যে বেলুড়ে অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, কলিকাতার উপকণ্ঠে ট্যাংরায় চামড়ার কারখানা এবং বাটানগরে জুতার কারখানা, যাদবপুর ও আড়িয়াদহে কাঁচ তৈয়ারির কারখানা আছে। বেলেঘাটা ও বেলঘরিয়ায় পটারি শিল্প, দক্ষিণেশ্বরে দিয়াশলাই তৈয়ারির কারখানা ও কামারহাটিতে সিগারেট তৈয়ারির কারখানা উল্লেখযোগ্য। এই শিল্পাঞ্চলে বড় শিল্পের সহযোগী ও পরিপূরক অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

শিল্পাঞ্চলের সমস্যা : হুগলী শিল্পাঞ্চলের সমস্যার সূত্রপাত হয় দেশ বিভাগ হইতেই। কারণ পূর্ববঙ্গের কাঁচা পাটের আমদানি বন্ধ হওয়ায় এই অঞ্চলের বহু পাট কল

বন্ধ হইয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এই সমস্যার অনেকটা সমাধান হইয়াছে। হুগলী নদীর গভীরতা কমিয়া যাওয়ায় কলিকাতা বন্দর প্রায় ধ্বংসের পথে। বন্দর রক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে গঙ্গার উপর ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করিয়া হুগলীর জলধারা বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং কলিকাতার সহায়ক বন্দর হিসাবে হলদিয়া বন্দর গঠন করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই শিল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সংকট মারাত্মক আকারে দেখা দেওয়ায় দুর্গাপুর, ব্যাণ্ডেল, সাঁওতালডি ও টিটাগড়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

হলদিয়া শিল্প সমাবেশ
(Haldia Industrial Complex)

কলিকাতা বন্দরের আসন্ন অবলুপ্তির আশঙ্কা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে হলদিয়া বন্দর এবং বন্দর সংলগ্ন শিল্প প্রকল্প। কলিকাতা হইতে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দক্ষিণে হুগলী নদীর নিম্ন গতিতে মেদিনীপুর জিলার তমলুক মহকুমার দক্ষিণাংশে হুগলী ও হলদি নদীর দক্ষিণ তীরে নির্মিত হইয়াছে হলদিয়া বন্দর। এই বন্দরের পূর্ব-দক্ষিণে হুগলী নদী, পশ্চিমে হলদি নদী এবং ইহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ হুগলী নদীর পূর্ব তীরে ২৪-পরগণা জিলার ফলতা অবস্থিত। হলদিয়া বন্দর ও শিল্প প্রকল্প প্রায় ৩২৬ বর্গ কি. মি. স্থান লইয়া গঠিত এবং ইহার প্রস্তাবিত ব্যয় ৭০০ কোটি টাকা। এই বন্দরের প্রাথমিক পর্যায়ের নির্মাণ কার্য শেষ হইয়াছে এবং বন্দরে আগত জাহাজ হইতে পণ্য খালাস করা শুরু হইয়াছে। যে সকল পণ্যবাহী বড় বড় জাহাজ অগভীর ও চড়াবহুল হুগলী নদীপথে এমনকি বড় জোয়ারের সময়েও প্রবেশ করিতে পারে না সেগুলি এই বন্দরে সারা বৎসর অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারিবে। কলিকাতা বন্দর পরিচালিত উত্তর-পূর্ব ভারতের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের অনেকটাই কালক্রমে এই বন্দরের মাধ্যমে পরিচালিত হইতে পারিবে। এই বন্দরের মাধ্যমে প্রধানত আমদানিকৃত খাদ্যশস্য, অপরিশোধিত খনিজ তেল, নানাবিধ যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ ইত্যাদি খালাস করা হইবে এবং পূর্ব ভারতের আকরিক লোহা, কয়লা, চা, চিনি, চর্ম দ্রব্য, কার্পাস ও পাটজাত দ্রব্য এবং বিভিন্ন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ ইত্যাদি জাহাজ বোঝাই করিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হইবে।

প্রাকৃতিক আনুকূল্য : (১) হুগলী-হলদি নদীর সঙ্গমস্থল হইতে বঙ্গোপসাগরের দূরত্ব মাত্র ৬০ কিলোমিটার। জলের গভীরতা এই স্থলে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বিশেষজ্ঞগণের মতে এই বন্দরে প্রায় ৮০,০০০ টনের জাহাজ প্রায় সারা বৎসরই যাতায়াত করিতে পারিবে। (২) সাগর মোহনা হইতে কলিকাতা পর্যন্ত হুগলী নদীর খাত যেমন অগভীর তেমনি কমবেশি ১৬টি বালুচড়া সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু হলদি নদীর মোহনা পর্যন্ত মাত্র ৫টি বালুচড়া রহিয়াছে। (৩ সাগর মোহনা হইতে অভ্যন্তরে

অবস্থিত হওয়ায় ঝড়-ঝঞ্ঝা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে বন্দর ও পোতাশ্রয় খুবই নিরাপদ। বন্দরের দুইপার্শ্বে নদী থাকায় জেটি ও পোতাশ্রয় নির্মাণ বিশেষ সহায়ক হইবে।

অর্থনৈতিক আনুকূল্য: (১) এই বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি—পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল ইত্যাদি নানাবিধ কৃষিজ, খনিজ শিল্পজাত পণ্যে সমৃদ্ধ। (২) রেল ও সড়ক পথে হলদিয়া পশ্চাদ্‌ভূমির সহিত প্রত্যক্ষ-ভাবে যুক্ত। দক্ষিণ-পূর্বে রেলপথের হাওড়া-খড়্গপুর প্রধান রেলপথের সহিত হলদিয়া পাঁশকুড়া জংশনের মাধ্যমে যুক্ত। কলিকাতা-বোম্বাই ৬নং জাতীয় সড়কের সহিতও হলদিয়া ৪১নং জাতীয় সড়ক দ্বারা যুক্ত। (৩) রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলের কয়লার সাহায্যে শিল্পাঞ্চলের জ্বালানীর সমস্যা সুলভে সমাধান করা যাইবে। (৪) বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ শক্তি ডি. ভি. সি. ও দুর্গাপুর-ব্যাণ্ডেল বৈদ্যুতিক **গ্রীড** হইতে পাওয়া যাইবে। (৫) বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় **লৌহ ইস্পাত** জামশেদপুর, রাউরকেল্লা, বোকারো ও দুর্গাপুর হইতে সুলভে পাওয়া যাইবে। (৬) বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের শ্রমশক্তির উৎস হইবে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশের সুলভ ও উদ্যমী শ্রমিক শ্রেণী। (৭) বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে হলদিয়া বন্দর ও শিল্পাঞ্চলের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে।

বন্দর প্রকল্প ও তাহার নির্মাণ কার্য: হলদিয়া বন্দর প্রকল্প অনুযায়ী এই স্থলে একটি তেল জেটি, একটি ফিঙ্গারজেটি, কয়লার জন্য একটি বার্থ, আকরিক লোহার জন্য একটি বার্থ, রাসায়নিক সারের জন্য একটি বার্থ ও অন্যান্য পণ্যের জন্য ২টি বার্থ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে তেলজেটি ও রাসায়নিক সারের বার্থ চালু করা হইয়াছে। এইখানে একটি মার্শালিং ইয়ার্ডও নির্মাণ করা হইতেছে। জাহাজ মেরামতের জন্য একটি ডক নির্মিত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে জাহাজ নির্মাণ প্রকল্প চালু হইলে ইহার আরও সম্প্রসারণ ঘটিবে। এই বন্দরে ওয়াগন হইতে সরাসরি জাহাজে পণ্য বোঝাই এবং জাহাজ হইতে সরাসরি ওয়াগনে পণ্য খালাস ব্যবস্থা চালু করা হইবে। হলদিয়া বন্দর ভারতের পূর্ব উপকূলীয় বন্দরসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়বহুল বন্দর হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। এই বন্দরের মাধ্যমে একমাত্র লৌহ আকরিক রপ্তানির সাহায্যেই ভারতের বার্ষিক আয় প্রায় ১২ কোটি টাকা হইবে। ইতিমধ্যে তেল জেটি সংলগ্ন ৩৫,০০০ কিলোলিটার তেল ধারণক্ষম দুইটি ট্যাংকার নির্মিত হইয়াছে। আধুনিক উন্নত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বন্দর হিসাবে হলদিয়া বন্দরকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে বিভিন্ন প্রকার আর্থিক ও কারিগরী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

হলদিয়া শিল্পাঞ্চল: হলদিয়া বন্দর সংলগ্ন এলাকায় বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল গঠনের

জন্য প্রয়োজনীয় জমি সংরক্ষিত হইয়াছে। মূল প্রকল্প অনুযায়ী এই অঞ্চলে তেল-শোধনাগার পেট্রো-রাসায়নিক শিল্প, রাসায়নিক সার শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, মেশিনটুল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়িয়া তুলিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে।

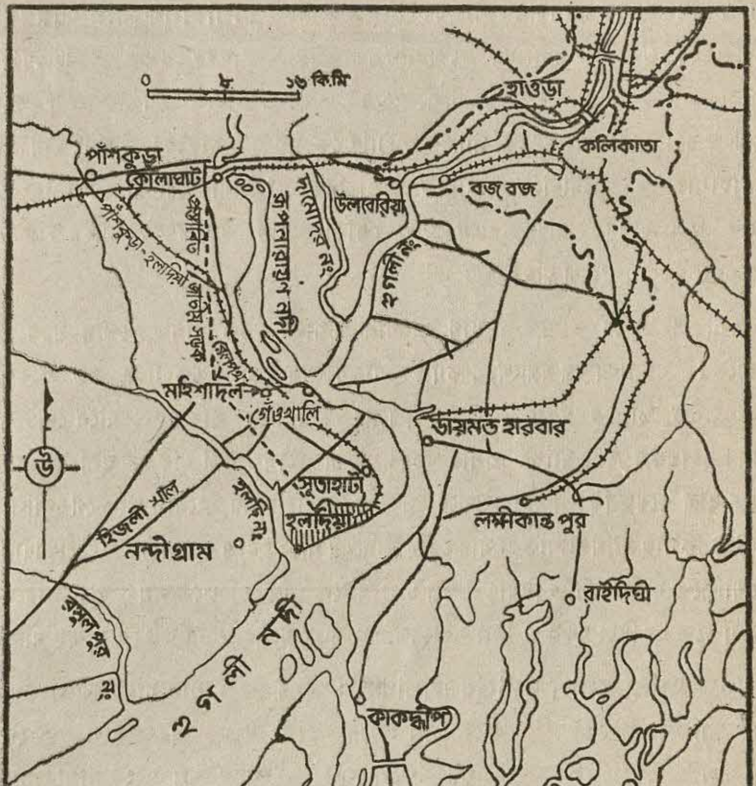

চিত্র ১৫.৫ : হলদিয়া বন্দর প্রকল্প।

ভারত সরকারের অধীন ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন-এর উদ্যোগে হলদিয়াতে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টন খনিজ তেল শোধনের উপযোগী একটি খনিজ তেল শোধনাগার স্থাপিত

হইয়াছে। আসামের নাহারকাটিয়া হইতে বিহারে বারাউনি পর্যন্ত বিস্তৃত তৈলবাহী পাইপলাইনের একটি শাখা এই শোধনাগারের সহিত যুক্ত। ইহা ব্যতীত বিদেশ হইতেও তেল আমদানি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে ও উপসাগরীয় এলাকায় খনিজ তেল পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। তেল শোধনাগার হইতে প্রাপ্ত উপজাত দ্রব্য ন্যাপথা হইতে রাসায়নিক সার তৈয়ারির জন্য একটি **রাসায়নিক সার কারখানা** স্থাপিত হইয়াছে। ইহার বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৩,২০,০০০ টন। একটি পেট্রো-রাসায়নিক কারখানা স্থাপনের কাজ চলিতেছে। এই কারখানার উপজাত দ্রব্য হইতে সিন্থেটিক রবার, রাসায়নিক তন্তু, প্ল্যাস্টিক ইত্যাদি তৈয়ারি করা যাইবে। সুতরাং হলদিয়ার পেট্রোরাসায়নিক কারখানাকে নানাবিক রাসায়নিক কারখানার বুনিয়াদি শিল্প হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। অধিকন্তু এই স্থলে সোডা অ্যাশ ও কষ্টিক তৈয়ারির কারখানা স্থাপনেরও সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে।

হলদিয়া বন্দরে জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনের জন্যও ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। নানাবিধ যন্ত্র যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি তৈয়ারির জন্য কয়েকটি শিল্প এস্টেট স্থাপিত হইয়াছে। মূল শিল্পের অগ্রগতির সহিত এইখানে ছোট-বড় বহুবিধ সহায়ক শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায়। হলদিয়া বন্দর হইতে মাত্র কয়েক কিলোমিটার উত্তরে হুগলী ও রূপনারায়ণের সংযোগ স্থলে গেঁওখালিতে একটি উপকূলীয় বাণিজ্যপোত নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও সরকারের বিবেচনাধীন। গেঁওখালিতে বাণিজ্যপোত নির্মাণ প্রকল্প চালু হইলে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র পূর্ব ভারতের অর্থনীতিতে হলদিয়া বন্দর ও শিল্প সমাবেশ এক নূতন যুগের সূচনা করিবে সন্দেহ নাই।

(৩) **আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল :** রাণীগঞ্জ আসানসোল অঞ্চলে কয়লা খনির আবিষ্কার হইতেই এই অঞ্চলে শিল্প সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বলিতে প্রথমে কুলটি ও হীরাপুর অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং আসানসোলে কিছু হাল্কা শিল্প স্থাপিত হয়। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ইহার তেমন বিকাশ ঘটে নাই। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর যুগে এই অঞ্চলের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। স্থানীয় কয়লা, বিহার-ওড়িশা অঞ্চলের লৌহ আকরিক ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ, কলিকাতা বন্দরের সান্নিধ্য, রেল ও সড়ক যোগাযোগ ইত্যাদির সমন্বয়ে এই অঞ্চলের শিল্প-পরিকাঠামো গড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে, দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ব্যাপক শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়। দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, বার্ণপুর, কুলটি, বরাকর, চিত্তরঞ্জন এই অঞ্চলের অন্তর্গত। এখানে লৌহ-ইস্পাত, অ্যালয় ইস্পাত, দুরবীণ ও চশমার কাচ, আলকাতরা, আলকাতরা জাত রাসায়নিক সার, কয়লা শোধন, রিফ্রাক্টরী ফায়ার ব্রিকস, কাগজ, যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টরের যন্ত্রাংশ, অ্যালুমিনিয়াম, সাইকেল প্রভৃতি তৈয়ারির কারখানা

অবস্থিত। সমগ্র অঞ্চলটিকে একটি ব্যাপক শিল্পাঞ্চল রূপে গড়িয়া তোলার উপযোগী পরিকাঠামো বর্তমান। এই অঞ্চলের অবস্থা অনেকটা পশ্চিম জার্মানির রূঢ় অঞ্চলের অনুরূপ

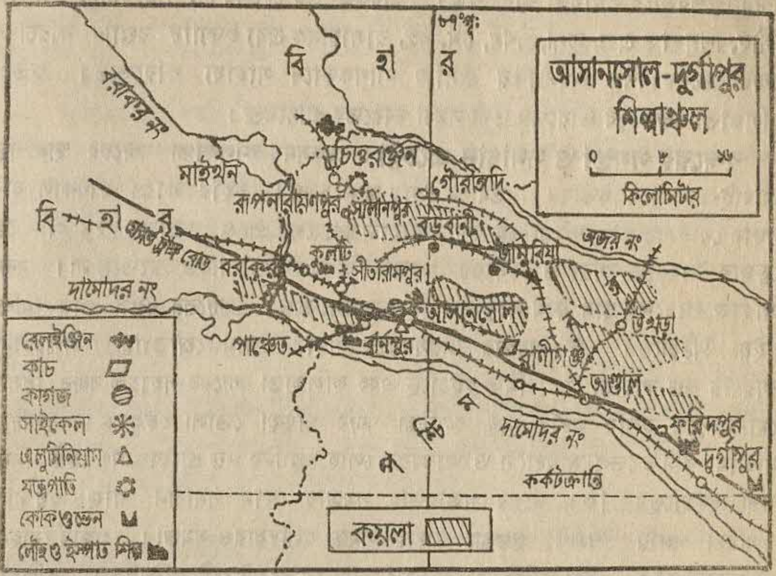

চিত্র ১৫·৬ : আসানসোল ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল।

বলিয়া এই অঞ্চলকে **ভারতের** রূঢ় বলা হয়। ইহার প্রসার ও উন্নতি রাজ্যের শিল্প অর্থনীতির পক্ষে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ।

(৪) **জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং শিল্পাঞ্চল** : এই অঞ্চলে প্রধানত চা ও কাঠকে কেন্দ্র করিয়া হালকা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি কয়েকটি হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পও স্থাপিত হইয়াছে। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রায় ২৬০টি চায়ের কারখানা আছে। কাঠ চেরাই, প্যাকিং বাক্স, সাবান ইত্যাদি তৈয়ারির কারখানাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপরি উক্ত চারিটি শিল্পাঞ্চল ব্যতীত **কল্যাণীতে** বস্ত্র-বয়ন শিল্প স্থাপন করা হইয়াছে। এখানে শিল্প এস্টেট স্থাপনের সাহায্যে নূতন শিল্পাঞ্চল গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস চলিতেছে। পুরুলিয়ায় মিনি ইস্পাত শিল্প ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক শিল্প স্থাপনের কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা বন্দর : বৃটিশ যুগ হইতে কলিকাতা বন্দর শুধু পূর্ব ভারতের নহে সমগ্র ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যে, দেশে শিল্প বিস্তারে ও যোগাযোগ রক্ষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। একসময় উত্তর ভারত ইহার পশ্চাদ্‌ভূমি ছিল। সম্প্রতি অন্যান্য বন্দর স্থাপনের ফলে ও কলিকাতা বন্দরে জলের গভীরতার সমস্যা দেখা দেওয়ায় ইহার বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়াছে ও পশ্চাদ্‌ভূমির বিস্তৃতি সংকুচিত হইয়া উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যেই সীমিত হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব রেলপথ, উত্তর-পূর্ব রেলপথ, অসংখ্য জাতীয় সড়ক, জলপথ, বিমানপথ এই বন্দরের সহিত সমগ্র বিশ্বের যোগ স্থাপন করিয়াছে। এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানি দ্রব্যের মধ্যে খনিজ তেল,

যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি প্রধান এবং এই সকল দ্রব্য আমদানির সাহায্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প, পরিবহণ ইত্যাদির প্রসারে কলিকাতা বন্দর বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছে। অধিকন্তু এই দেশের চা, পাট, চিনি, আকরিক লৌহ, শিল্পজাত দ্রব্য, তুলা, পশম, চর্ম, বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি রপ্তানি করিয়া এই বন্দর দেশের শিল্প অর্থনীতির প্রসারে ব্যাপকভাবে সাহায্য করিতেছে। সুতরাং কলিকাতা বন্দর পূর্ব ভারতের তথা সমগ্র ভারতের প্রাণকেন্দ্র।

বন্দরের সমস্যা ও সমাধান প্রচেষ্টা : একসময় কলিকাতা বন্দরের স্থান ছিল বোম্বাই-এর পরে দ্বিতীয়। বর্তমানে ইহার স্থান চতুর্থ। ইহার কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ গঙ্গার মোহনায় পলি জমিয়া এই বন্দরে জাহাজ প্রবেশের প্রচণ্ড অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। ড্রেজার ব্যবহার করিয়াও বন্দরের অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে না। বন্দরে জাহাজ প্রবেশের স্থান ক্রমে সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। বন্দরের ধ্বংস প্রায় নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থার নিরসনকল্পে গঙ্গার প্রধান স্রোতধারা ভাগীরথীমুখী করিবার জন্য ফারাক্কা বাঁধ নির্মিত হইয়াছে এবং কলিকাতা বন্দরের সহায়ক বন্দর হিসাবে মেদিনীপুরে হলদি নদীর মুখে হলদিয়া বন্দর গড়িয়া তোলা হইয়াছে। হলদিয়ার মাধ্যমে খনিজ তেল আমদানি ও আকরিক লৌহ রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় জেটি নির্মাণ করা হইয়াছে। কিন্তু জলের গভীরতার সমস্যার কোন সমাধান আজিও হয় নাই। হলদিয়া গঙ্গার উপনদী, সুতরাং গঙ্গার সমস্যা হলদিয়ারও সমস্যা। গঙ্গার মোহনার চড়া ক্রমবর্ধমান। ইহা কলিকাতা তথা পূর্ব ভারতের সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। কলিকাতা বন্দরের এই সংকট দূর করিবার প্রয়াসে আজিও তেমন কার্যকর কিছু হয় নাই। গঙ্গা এবং উহার সাগরমুখের চড়া অপসারণ অসম্ভব। সুতরাং বিকল্প হিসাবে বলা যায় সাগর মোহনা হইতে কলিকাতা পর্যন্ত একটি গভীর খাল খনন করিয়া (সুয়েজ খালের অনুরূপ) জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অথবা নামখানার দক্ষিণে সাগর দ্বীপ বা অনুরূপ কোন দ্বীপকে আধুনিক বন্দরের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অধিকতর বাস্তব। ইহাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অভাব হইবে না। নূতন কলিকাতা নামের ঐ বন্দরকে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল রূপে গড়িয়া তোলা হইলে আর্থিক সমস্যার সমাধান হইবে আশা করা যায়।

[**প্রশ্ন :** (১) পশ্চিমবঙ্গে জলসেচের প্রয়োজনীয়তা কি ? (২) জলসেচের জন্য প্রধান কি কি প্রকল্প রূপায়িত হইয়াছে ? (৩) পশ্চিমবঙ্গে শিল্পাঞ্চল কয়টি ও কি কি ? (৪) বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে সংগঠিত প্রধান প্রধান শিল্প কি ? (৫) পশ্চিমবঙ্গে নূতন শিল্পাঞ্চল কোথায় গড়িয়া তোলা হইতেছে ? (৬) কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব কি ? (৭) এই বন্দরের সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে আলোচনা কর।]

অনুশীলনী ১৫

১। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকার্যের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান ফসল উৎপাদক অঞ্চলসমূহের আলোচনা কর।

[Examine the present position of agriculture in West Benga Mention the areas where the principal crops are grown in Wes t Bengal.]

২। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান কৃষিজাত ও খনিজ সম্পদের বিবরণ দাও। একটি মানচিত্রের উপর ঐ সকল সম্পদের উৎপাদন স্থান নির্দেশ কর।

[Give an account of the principal agricultural and mineral resources of West Bengal. Locate the resources on a sketch map of West Bengal.] [W. B. H. S. Exam., 1978]

৩। পশ্চিমবঙ্গকে কয়টি শিল্পাঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে ? এই শিল্পবিকাশ পশ্চিমবঙ্গের জনবসতির ঘনত্বকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে ? এই রাজ্যের দুইটি শিল্পের নাম কর এবং উহাদের উন্নতির কারণ লিখ।

[How many industrial regions are there in the State of West Bengal ? How has this development of industry influenced the density of population in West Bengal ? Give the names of two industries of this State and account for their development.]
[W. B. H. S. C. Exam., 1980]

৪। পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের অবদান বিশ্লেষণ কর।

[Analyse the role played by the Calcutta Industrial Region in the economic development of West Bengal.]
[W. B. H. S. C. Exam., 1979]

৫। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থান নির্দেশ করিয়া ইহাদের উন্নতির কারণ ব্যাখ্যা কর।

[Point out the location of major Industrial Regions of West Bengal and explain the reasons for their development.]
[W. B. H. S. C. Exam., 1984]

৬। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থান নির্দেশ করিয়া উহাদের যে কোন একটির শিল্পায়নের কারণ নির্দেশ কর।

[Indicate the location of industrial regions of West Bengal and account for the growth of industries in any one of the regions.]
[W. B. H. S. C. Exam., 1982]

৭। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব আলোচনা কর। এই বন্দরের বর্তমান সমস্যা কি কি ?

[Discuss the importance of Calcutta Port in overall development of West Bengal. That are the present problems of this port ?] [W. B. H. S. C. Exam., 1982]

৮। পশ্চিমবঙ্গের লৌহ ও ইস্পাত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Give an account of the Iron and Steel and Engineering Industries of West Bengal.]

৯। কলিকাতা বন্দরের উন্নতিতে গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনার ভূমিকা পর্যালোচনা কর।

[Critically examine the role of the Ganga Barrage in the development of Calcutta Port.]

১০। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে হলদিয়া প্রকল্পের গুরুত্ব আলোচনা কর।

[Discuss the importance of Haldia Project in the economy of West Bengal.]

১৬ ত্রিপুরা (Tripura)

অবস্থান ও আয়তন (Location and Area): বৃটিশ ভারতবর্ষে ত্রিপুরা একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। স্বাধীন ভারতে ত্রিপুরা প্রথমে একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে যুক্ত হয়। ১৯৭২ সালের ২১ শে জানুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্যপাল-শাসিত পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এই রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিজোরাম-এর সহিত যুক্ত। অন্যান্য সকল দিকে রাজ্যটি বাংলাদেশের সীমান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত। বলা যায় স্থলভাগে অনুপ্রবিষ্ট সমুদ্র খাঁড়ির ন্যায় রাজ্যটি যেন বাংলাদেশের—ভূ-আঞ্চলিক সীমানার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সহিত একমাত্র মিজোরাম-এর ভিতর দিয়া ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার যোগাযোগ নাই। ত্রিপুরার এই বিচ্ছিন্ন অবস্থান এই রাজ্যের উন্নতির একটি প্রধান অন্তরায়। পক্ষান্তরে ইহা সামরিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ।

ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন ১০,৪৭৭ বর্গ কিলোমিটার। মোট লোকসংখ্যা ২০.৪৭ লক্ষ (১৯৮১) এবং জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৯৫ জন। দেশবিভাগ ও ইহার পরবর্তী কালে পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশ) বার বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে ক্রমাগত হিন্দু নরনারীর এই অঞ্চলে আগমন ঘটে। এই কারণে ত্রিপুরার জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজ্যের প্রাচীন অধিবাসীরা ত্রিপুরী নামে পরিচিত। ত্রিপুরী ও বাঙ্গালী ছাড়া এই রাজ্যের শতকরা প্রায় ২৯ ভাগই উপজাতীয় আদিবাসী। উপজাতিদের মধ্যে চাকমা, রিয়াং, জামাতিয়া, নোয়াতিয়া, মগ, কুকী, গারো, লুসাই, হাজম উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষাই ত্রিপুরার সরকারী ভাষা। প্রশাসনিক দিক হইতে রাজ্যটি তিনটি জিলায় বিভক্ত, যথা—(১) উত্তর ত্রিপুরা (২) দক্ষিণ ত্রিপুরা ও (৩) পশ্চিম ত্রিপুরা।

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (Physical Features):

ভূ-প্রকৃতি ও নদ-নদী (Relief and Drainage): ত্রিপুরার ভূ-প্রকৃতি মোটামুটিভাবে পার্বত্য ও বন্ধুর। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত কয়েকটি নাতি উচ্চ পাহাড়, ছোট ছোট টিলা ও উহাদের অন্তর্বর্তী নদী উপত্যকা এই রাজ্যের ভূ-প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাজ্যের প্রায় ষাট শতাংশ ভূ-ভাগ পর্বতময়। উত্তর, পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে কিছুটা সমতলভূমি দৃষ্ট হয়। ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী ত্রিপুরাকে দুইটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যথা—(১) পার্বত্য অঞ্চল এবং (২) নদী উপত্যকা ও সমভূমি অঞ্চল।

(১) **পার্বত্য অঞ্চল**—ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য ভূমির

অন্তর্গত। এই রাজ্যের পর্বতসমূহের সম্মিলিত নাম ত্রিপুরা পাহাড়। পর্বতগুলি দেশের পূর্ব হইতে পশ্চিমে শ্রেণীবদ্ধভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহাদের মধ্যে **জাম্পুইটাং, শাখানটাং, নংতরাই, আঠারমুড়া ও বড়মুড়া** এই পাঁচটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাহাড়গুলি দেশের পূর্ব প্রান্ত হইতে ১০/২০ কিলোমিটার দূরে দূরে অবস্থিত। **জাম্পুইটাং** সর্বোচ্চ (৯৬১ মি.) এবং **শাখাননাং** দ্বিতীয় (৭৭৪ মি.) উচ্চতম পর্বত।

(২) **নদী উপত্যকা ও সমভূমি অঞ্চল**—দুইটি পর্বতের মধ্যবর্তী নদী

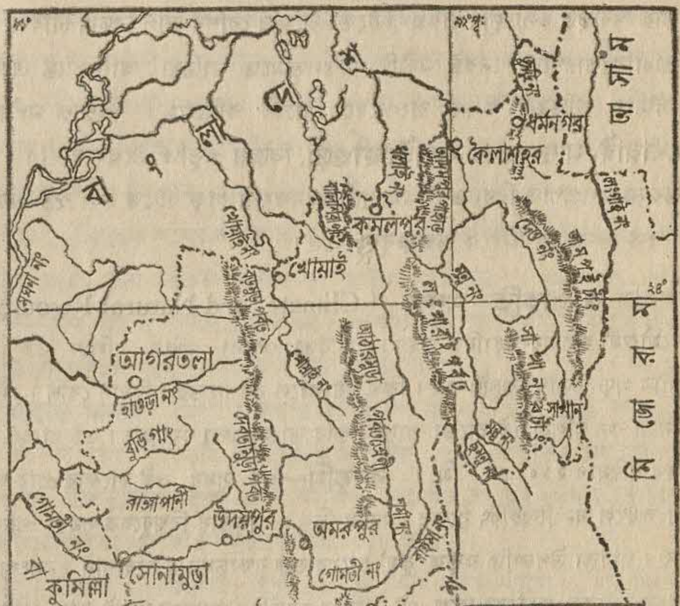

চিত্র ১৬.১ : ত্রিপুরার ভূ-প্রকৃতি।

উপত্যকাগুলিই প্রকৃত পক্ষে এই রাজ্যের সমতল অঞ্চল। নদী উপত্যকা ব্যতীত এই রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে কিছুটা বিস্তীর্ণ সমভূমি রহিয়াছে। বিভিন্ন নদী উপত্যকার মধ্যে জুড়ি নদী গঠিত ধর্মনগর উপত্যকা, খোয়াই গঠিত খোয়াই উপত্যকা, ধলাই বিধৌত কমলপুর, দেও ও মানু নদী গঠিত কৈলাশহর উপত্যকা উল্লেখযোগ্য।

আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ত্রিপুরা রাজ্যে ছোট-বড় অনেকগুলি নদী রহিয়াছে। নদী-গুলির বেশির ভাগই দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে প্রবাহিত। গোমতী ইহার ব্যতিক্রম। **গোমতী** ত্রিপুরার দীর্ঘতম নদী। **রাইমা** ও **সাইমা** নামে দুইটি নদী যথাক্রমে আঠারমুড়া ও নংতরাই পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সমতল ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত ধারার নামই গোমতী। গোমতী পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর মধ্যে গিরিখাত সৃষ্টি করিয়াছে। এই নদীপথে সোনামুড়ায় অবস্থিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হইতে রাজ্যের বেশির ভাগ বিদ্যুৎ চাহিদা মিটান হয়। রাধাকিশোরপুরের নিকট নদীটি সমতলভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে এবং পরে পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। অন্যান্য নদীর মধ্যে **জুরি, খোয়াই, মানু, দেও, ধলাই, হাওড়া,** বিজয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা রাজ্যে **ডম্বরু** জলপ্রপাত বিখ্যাত। অমরপুরে রঘুনন্দন পাহাড় হইতে ইহা সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার পতিত জলধারার খাদকে **ডম্বরুকুণ্ড** বলে।

জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সম্পদ (Climate and Natural Resources): ত্রিপুরা মৌসুমী জলবায়ু-অধ্যুষিত রাজ্য। পার্বত্য এলাকা প্রধান বলিয়া এই রাজ্যে গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ কিছুটা কম। কিন্তু বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি। নদীর জল ধারণ ক্ষমতা কম বলিয়া এই রাজ্যে প্রায়ই বন্যার তাণ্ডব লক্ষ্য করা যায়। এই রাজ্যে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২১০ সে. মি.। **বনভূমি**—এক সময় এই রাজ্যের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ অঞ্চলে ঘন চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচুর বৃক্ষ ছেদন হয়। পার্বত্য উপজাতি কর্তৃক 'ঝুম' চাষের জন্য বৃক্ষছেদন ও সর্বোপরি জনসংখ্যা বৃদ্ধি-জাত শহর-নগরের প্রসারের ফলে এই রাজ্যের বনভূমির আয়তন যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে ইহার মোট আয়তন রাজ্যের আয়তনের শতকরা ৫০-৫৫ ভাগ মাত্র। এখানে শাল, সেগুন, চামল, গামারি, পোমা, কোড়াই প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে। এখানে প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মে। এই রাজ্যে বাঁশ ও গামার জাতীয় বৃক্ষের বনাঞ্চল ক্রমবর্ধমান। আশা করা যায় এই রাজ্যে কাগজ কল স্থাপনের উপযোগী কাঁচামালের কোন অভাব ঘটিবে না। ত্রিপুরার জলবায়ু রবার চাষের অনুকূল হওয়ায় এখানে ১৯৬৫ সালে পরীক্ষামূলক-ভাবে ৪৯ হেক্টর জমিতে রবার চাষের সূত্রপাত হয়। ১৯৮২ সালে ত্রিপুরার ৩,৩৩৭ হেক্টর জমিতে রবার চাষের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮৫ সালের শেষে রবার বাগিচার আয়তন ৫০০০ হেক্টর করা হইবে।

কৃষিকার্য (Agriculture): ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত ত্রিপুরা একটি কৃষি-প্রধান অঞ্চল। রাজ্যের মোট ১০,৪৭,০০০ হেক্টর ভূভাগের মধ্যে নীট বপিত জমির পরিমাণ প্রায় ২,৪২,০০০ হেক্টর অথবা ২৪%। এই রাজ্যের কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর

নির্ভরশীল বলিয়া জলসেচের ব্যাপক ব্যবস্থা প্রয়োজন। বর্তমানে এই রাজ্যে মোট চাষের জমির শতকরা ৮ ভাগ মাত্র এলাকায় জলসেচের ব্যবস্থা আছে।

ত্রিপুরার বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের মধ্যে ধান, গম, পাট, আলু, ইক্ষু, তূলা, তৈলবীজ, চা ও নানাবিধ ফল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ধান ও পাট : এই দুইটি ফসল ত্রিপুরার প্রধান ফসল। এখানে আউশ, আমন ও বোরো তিন প্রকারের ধান জন্মে। দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরের নদী উপত্যকার নিম্নাঞ্চলেই বেশির ভাগ আমন ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় উচ্চভূমিতে আউশের চাষ হইয়া থাকে। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধানের পরেই ত্রিপুরায় পাটের স্থান। নদী উপত্যকা অঞ্চলের নিম্নভূমিতে পাটের চাষ হইয়া থাকে। উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের নদী-উপত্যকা পাট উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। ১৯৮৩-৮৪ সালে ত্রিপুরায় ৩.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন ধান এবং ৯,১০০ মেট্রিক টন পাট উৎপন্ন হয়।

গম : ত্রিপুরায় গমের চাষ মাত্র ১৯৬৮-৬৯ সালে রবিশস্য হিসাবে শুরু করা হয়। সম্প্রতি গমের চাষ কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে গমের উৎপাদন ছিল মাত্র ৬ হাজার মেট্রিক টন। এখানে রবিশস্য হিসাবে ডালের চাষ হয় এবং বর্তমানে ডালচাষের জমি ও উৎপাদন উভয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অন্যান্য ফসল : ত্রিপুরায় অন্যান্য কৃষিজ ফসলের মধ্যে ইক্ষু, তূলা, আলু, তৈলবীজ প্রভৃতির চাষ হয়। সমভূমি অঞ্চলেই আলু, ইক্ষু, তূলা প্রভৃতির চাষ ব্যাপক হইলেও পূর্বাঞ্চলের উচ্চভূমিতে তূলা চাষ আজিও অনেকাংশে ঝুম প্রথায় হইয়া থাকে। পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় ইক্ষুচাষের চেষ্টা চলিতেছে।

চা (Tea) : ত্রিপুরায় প্রচুর চায়ের চাষ হইয়া থাকে। পূর্ব দিকের পার্বত্য অঞ্চলে বেশির ভাগ চা বাগিচা অবস্থিত। পার্বত্য এলাকায় ধাপ কাটিয়া (Terracing system) চায়ের চাষ করা হয়। ১৯৮২ সালে এই রাজ্যে প্রায় ৬,০০০ হেক্টর জমিতে ৪ মিলিয়ন কেজি চায়ের উৎপাদন হইয়াছিল।

এই রাজ্যে নানা ধরনের টক জাতীয় ফল, কলা ও শাকসব্জি উৎপন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে আনারস প্রধান। কারণ ইহার ফলন এই রাজ্যে যেমন বেশি তেমন স্বাদ। ফলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এখন হইতে প্রচুর আনারস প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহাতে রাজ্যের যথেষ্ট অর্থোপার্জন হয়।

ত্রিপুরার রাজধানী-শহর আগরতলায় দুগ্ধ সরবরাহের জন্য ইন্দ্রনগরে ১০,০০০ লিটার দুধ উৎপাদন ক্ষমতাযুক্ত একটি বৃহৎ দোহশালা স্থাপন করা হইয়াছে। এই রাজ্যে গরু, মহিষ, শূকর, হাঁস, মুরগী প্রতিপালনের ও গো-প্রজননের ব্যবস্থা আছে। রাজ্যে মৎস্যের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু উৎপাদন চাহিদার তুলনায় শতকরা ৩০-৪০ ভাগ মাত্র। এই কারণে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় মৎস্য প্রজননের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

কৃষির উন্নয়ন (Development of Agriculture) : ত্রিপুরার বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি,

কৃষিজমির অভাব, জলসেচ ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ইত্যাদি কারণে ত্রিপুরার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হইয়াছে। এই কারণে প্রাচীন কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া উৎপাদনবৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কৃষির উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হইয়াছে।

(১) **কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি**: জনসংখ্যার উর্ধ্বগতির সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কৃষিজমির প্রসার অপরিহার্য। এই রাজ্যে জলজমি পুনরুদ্ধার, ভূমিক্ষয় রোধ ও অপ্রয়োজনীয় বনাঞ্চল পরিষ্কার করিয়া ধানজমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

(২) **জলসেচের প্রসার ও বহু-ফসলী জমি**: ত্রিপুরায় কৃষিজমির আয়তন কম। নানাভাবে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে। জলসেচ ব্যবস্থার প্রসারের সাহায্যে একই জমিতে বৎসরে একাধিক ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নদীতে মাটির বাঁধ দিয়া জলস্রোত কৃষিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া এবং ডিজেল পাম্প সেটের সাহায্যে নদী হইতে জলসেচের ব্যবস্থা করা ব্যতীত গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভ হইতেও সেচের জল সরবরাহ করা হইতেছে। জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গোমতী, খোয়াই, মনু, হাওড়া প্রভৃতিতে সমীক্ষা করা হইতেছে।

(৩) **রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার** (Use of Chemical Fertilizer, Pesticides and Agricultural Equipments): বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই রাজ্যে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ-পত্রাদির ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৯৬৫ সালে ত্রিপুরার কৃষিক্ষেত্রে মোট ৯৮ টন রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার পরিমাণ প্রায় ৬০০ টন। কৃষিক্ষেত্রে পোকামাকড়ের উৎপাত বন্ধ করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে কীট-নাশকও ব্যবহার করা হইতেছে। চাষের কার্যে ট্রাকটরের ব্যবহার জনপ্রিয় ও উৎপাদনশীল হইতেছে।

(৪) **উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার** (Use of Hybrid Seeds): কৃষি-জমিতে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে মাত্র ১৯২ টন উচ্চ-ফলনশীল বীজ ব্যবহৃত হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার পরিমাণ ৩৫০ টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে প্রায় ১·৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার করা হয়।

(৫) **নূতন শস্যের প্রবর্তন** (Introduction of New Crops): ত্রিপুরার প্রধান কৃষিজ দ্রব্য ছিল ধান ও পাট। কিন্তু বর্তমানে এখানে গম ও নানাবিধ ডালচাষের প্রবর্তন করা হইয়াছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই নূতন শস্য প্রবর্তন প্রথা দেশের সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদনের অনুকূল হইবে। বনাঞ্চলে রবার বাগিচা সৃষ্টিও একটি নূতন পরীক্ষা। ইহার ভবিষ্যৎও সম্ভাবনাময়।

(৬) **মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ** (Control of Soil Erosion) : বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি ও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য এই রাজ্যে ভূমি-ক্ষয় ব্যাপক এবং ইহা কৃষির একটি সংকটজনক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য জলনিকাশের স্বাভাবিক ব্যবস্থা, কন্টুর বাঁধ নির্মাণ ও ঝুমিয়াদের ও ভূমিহীনদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া ঝুমচাষ রোধ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইয়াছে।

উপরি-উক্ত কার্যকর ব্যবস্থা সকল গ্রহণ ও উহার প্রয়োগের ফলে আশা করা যায় কৃষিতে ত্রিপুরার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হইবে।

খনিজ ও শক্তি সম্পদ (Minerals and Power Resources): ত্রিপুরা রাজ্যে খনিজ সম্পদের একান্ত অভাব। শিল্প সংগঠনের উপযোগী এখানে কোন প্রকার খনিজ দ্রব্যের সন্ধান আজিও পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি বড়মুড়া এলাকায় খনন কার্যের ফলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান মিলিয়াছে। ভবিষ্যতে এখানে কয়লা ও খনিজ তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আশা করা যায়। এই রাজ্যে বিদ্যুতের প্রয়োজন মিটাইতে আসাম হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এখানে গোমতী নদীর উপর একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। রাজ্যের উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ প্রায় ১০ মেগাওয়াট এবং ইহার বর্তমান চাহিদা প্রায় ২০ মেগাওয়াট।

শ্রমশিল্প ও কুটির শিল্প (Industries and Small-scale Industries): খনিজ সম্পদ ও শক্তি সম্পদের অভাবে ত্রিপুরায় আজিও উল্লেখযোগ্য কোন ভারী শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অবস্থানও ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। সুতরাং কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক ত্রিপুরায় ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সম্প্রতি উত্তর ত্রিপুরা জিলার ফটিকরায় নামক স্থানে দৈনিক ২৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি কাগজ কল এবং ২০০টি তাঁত সহ একটি পাটকল স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার ফলে কাগজ কলে প্রায় ১০/১২ হাজার কর্মী এবং পাটকলে প্রায় ২,৫০০ কর্মী নিযুক্ত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের মধ্যে হস্তচালিত তাঁত, খাদি, রেশম, হস্তশিল্প, খান্দেসারী চিনির কারখানা, ফল সংরক্ষণ, ভেষজ দ্রব্যাদি প্রস্তুত শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আদিবাসীদিগকে শিল্পে আগ্রহী করিতে রাজ্য সরকার কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট গঠন করিয়াছেন এবং রাজ্যের প্রতি জিলায় একটি করিয়া শিল্প তালুক গঠন করিয়াছেন। উদয়পুর, কুমারঘাট, অরুন্ধতিনগর ও ধর্মনগরে শিল্প তালুক গড়িয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন শিল্প তালুকে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বিভিন্নতা লক্ষণীয়। কাঠের নক্শাদার কার্য, চামড়ার জুতা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত, হস্ত নির্মিত কাগজ, ধাতু নির্মিত দ্রব্য প্রস্তুত, মোটরগাড়ি মেরামত উল্লেখযোগ্য। বেসরকারী উদ্যোগে অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র তৈয়ারি, ষ্টীলের আসবাবপত্র তৈয়ারি, সাবান প্রস্তুত, লৌহ ও লৌহ বর্জিত ধাতুর ফাউণ্ড্রি ওয়ার্কস, ছাপাখানা, বই বাঁধাই ইত্যাদি সংগঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া বেত,

বাঁশ ও কাষ্ঠ নির্মিত নানাবিধ সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুতে ত্রিপুরা বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে। সরকারী উদ্যোগে শিল্প দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে, দিল্লী ও কলিকাতায় বিক্রয় এম্পোরিয়াম খোলা হইয়াছে। বিদেশে এই সকল দ্রব্যসামগ্রী জনপ্রিয় করিবার জন্য ত্রিপুরা হস্তশিল্প কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে।

প্রধান শহর (Principal Cities) : **আগরতলা** ত্রিপুরার রাজধানী, প্রধান শহর ও ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র। পাট, ইক্ষু, চা, আনারস ইত্যাদি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। অন্যান্য শহরের মধ্যে **কৈলাশহর**, বেলোনিয়া, ধর্মনগর, রাধাকিশোরপুর, উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনী ১৬

১। ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্প কি কি? ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ নির্দেশ কর।

[What are the natural resources of Tripura? Indicate the causes of the economic backwardness of Tripura.]

২। ত্রিপুরার ভৌগোলিক পরিবেশের বিবরণ দাও এবং ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নতিতে ইহার প্রভাব আলোচনা কর।

[Describe the geographical environment of Tripura and discuss its influence on the economic development of this state.]

[Tripura H. S. Exam., 1980]

৩। ত্রিপুরার ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের বিবরণ দাও। ত্রিপুরায় অন্যান্য শিল্প গঠনের সম্ভাবনা বিষয়ে তোমার মতামত লিখ।

[Give an account of the Small Scale Cottage Industry of Tripura. Give your views about the development of other industries in Tripura.]

৪। টীকা লিখ :—(ক) ত্রিপুরার ঝুম চাষ, (খ) ত্রিপুরার রবার চাষ, (গ) ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা।

[Write notes on : (a) Jhum Cultivation of Tripura, (b) Rubber plantation of Tripura, (c) Communication system of Tripura.]

SPECIMEN QUESTIONS : 1978
OF
West Bengal Council of Higher Secondary Education
ECONOMIC GEOGRAPHY

[পশ্চিমবঙ্গ উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ-এর আদর্শ প্রশ্নাবলী—১৯৭৮]

Paper I

[অর্থ নৈতিক ভূগোল—প্রথম পত্র]

১। "কোন একটি অঞ্চলে মানুষের জীবনযাপন প্রণালী কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। উহা পরিবেশের প্রভাবের ফল।"—আলোচনা কর।

["The mode of life in any region is not an accident but is the result of the environment." Discuss.]

২। স্বাভাবিক তৃণভূমির শ্রেণীবিভাগ কর এবং এই সকল তৃণভূমি অঞ্চল গড়িয়া উঠিবার কারণ নির্দেশ কর। এই সকল তৃণভূমি অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Classify and account for the chief areas of natural grasslands of the world. Describe the nature of economic development of these regions.]

৩। সম্পদের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং শ্রেণীবিভাগ কর। সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

[Define and classify resources. Explain the functional theory of resources.]

৪। সম্পদের সংরক্ষণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। সম্পদের সংরক্ষণ তত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Explain the concept of conservation of resources. Indicate the different aspects of the conservation of resources.]

৫। মানুষ-জমির অনুপাত বলিতে কি বুঝ? জনঘনত্বের সহিত ইহার তুলনা কর।

[What do you mean by man-land ratio? How does the concept compare with population density?]

৬। পৃথিবীর জনবসতি বন্টনের প্রকৃতি বর্ণনা কর।

[Describe the nature of population distribution in the world.]

৭। বিশ্বে জনবসতি বন্টনের তারতম্যের কারণ বিশ্লেষণ কর।

[Explain the causes of uneven distribution of population in the world.]

৮। বিশ্বের প্রধান প্রধান মৎস্যচারণ ক্ষেত্রগুলির বর্ণনা দাও।

[Describe the important commercial fishing grounds of the world.]

৯। বিশ্বের বনভূমির শ্রেণীবিভাগ কর এবং উহাদের ব্যবহারের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Classify the forests of the world and indicate the nature of their utilisation.]

১০। পৃথিবীর মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ কর এবং বিভিন্ন মৃত্তিকার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Classify soils of the world and indicate the nature of their utilisation.]

১১। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা পর্যালোচনা কর। বিশ্বে জলবিদ্যুৎ সম্পদের বন্টন বিশ্লেষণ কর।

[Explain the conditions favouring the development of hydro-electric power. Examine the world distribution of water power resources.]

১২। উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা, উৎপাদক অঞ্চল ও পৃথিবীতে বন্টন আলোচনা কর—গম, ধান, তুলা, পাট, চা ও কফি।

[Explain the conditions of growth, areas of production and world distribution of wheat, rice, cotton, jute, tea and coffee.]

১৩। পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশুচারণ ক্ষেত্রের বর্ণনা দাও এবং ইহাদের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Describe the principal commercial grazing grounds of the world and indicate their future potentialities.]

১৪। বন্দরের শ্রেণীবিভাগ কর এবং সমুদ্র বন্দর গঠনের অনুকূল অবস্থা বর্ণনা কর।

[Classify ports and discuss the factors favouring the growth of sea ports.]

১৫। বিশ্বের প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলির বর্ণনা কর।

[Describe the principal industrial regions of the world.]

১৬। একটি দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বিচার করিয়া ঐ দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি সম্পর্কে কতটা ধারণা করা যায় তাহার পর্যালোচনা কর।

[Explain how far the volume of international trade can be considered as an index of economic development of a country.]

Paper II

[দ্বিতীয় পত্র]

১। ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে (ক) ভূ-প্রকৃতি ও (খ) জলবায়ুর প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

[Examine the influence of (a) topography & (b) climate on the economic life of India.]

২। ভারতের মৃত্তিকা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Write a short essay on the soils of India.]

৩। ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে মৃত্তিকা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা কার্যকর করা হইয়াছে তাহার পর্যালোচনা কর।

[Examine briefly the soil conservation programme introduced in India during the Five-Year Plan periods.]

৪। ভারতে সেচের গুরুত্ব আলোচনা কর। ভারতে কি কি ধরনের সেচ-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে? ভারতে সেচের উন্নতির জন্য যে বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকর করা হইয়াছে তাহার পর্যালোচনা কর।

[Examine the importance of irrigation in India. What are the different modes of irrigation practised in the country? Examine the various irrigation development programme introduced in India.]

৫। ভারতের প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক ফসল কি কি? ভারতের কোথায় কোথায় এবং কি কি অবস্থায় ঐ সকল ফসল জন্মায়?

[What are the principal commercial crops of India? Where do they grow and under what geographical conditions?]

৬। ভারতে কয়লা খনির বন্টন দেখাও। বিগত ২৫ বৎসরে ভারতে কয়লা খনি শিল্পের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে?

[Examine the distribution of coal fields in India. What steps have been taken to develop the coal mining industry in India during the last twenty five years?]

৭। ভারতে খনিজ তেল উত্তোলন ও পরিশোধন সম্পর্কে বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে পর্যালোচনা কর।

[Examine the present position and future prospects of the Indian petroleum mining and petroleum refining industry.]

৮। ভারতে শুধু জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পগুলি বর্ণনা কর। উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে ইহার অধিকতর সংগঠনের কারণ কি ?

[Describe the distribution of monopurpose hydro-electric power projects in India. Why have they been more developed in South India than in North India ?]

৯। বহুমুখী নদী পরিকল্পনা কি ? ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বহুমুখী নদী পরিকল্পনাগুলির আলোচনা কর।

[What are the multipurpose river valley projects ? Describe the more important multipurpose river valley projects of India.]

১০। ভারতের বনভূমির শ্রেণীবিভাগ কর এবং ইহার ব্যবহার আলোচনা কর। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ভারতে বনভূমি সংরক্ষণের যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহার আলোচনা কর।

[Classify the forests of India and describe the utilisation. Examine the forest conservation programme introduced in India during the five-year plan periods.]

১১। ভারতে রেলপথের বিভিন্ন আঞ্চলিক বিভাজন বর্ণনা কর।

[Describe the various railway zones of India.]

১২। ভারতের মুখ্য ও গৌণ বন্দর বলিতে কি বুঝ ? উপযুক্ত উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা কর।

[What do you mean by major and minor ports of India ? Illustrate your answer with suitable examples.]

১৩। ভারতের মুখ্য বন্দরগুলির পশ্চাদভূমি ও বাণিজ্যের প্রকৃতি বর্ণনা কর।

[Describe the hinterland and the pattern of trade of the major ports of India.]

১৪। ভারতে নিম্নলিখিত শিল্পগুলির একদেশীভবন, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আলোচনা কর :—

(ক) কার্পাস বস্ত্রবয়ন শিল্প, (খ) লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং (গ) কাগজ শিল্প।

[Account for the localisation, state the present position and indicate the future prospects of (a) Cotton Textile Industry, (b) Iron and Steel Industry and (c) Paper Industry of India.]

১৫। ভারতে জনবিন্যাসের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা কর।

[Account for the distribution of population of India.]

১৬। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সম্পদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

[Give a brief account of the economic resources of West Bengal.]

Specimen Questions : 1979

[আদর্শ প্রশ্নাবলী—১৯৭৯]

ECONOMIC GEOGRAPHY

Paper I

অর্থনৈতিক ভূগোল—প্রথম পত্র

১। কোন অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রভাব আলোচনা কর—

(ক) ভূ-প্রকৃতি, (খ) জলবায়ু, (গ) অবস্থান, আকার, আয়তন ও উপকূল ভাগ, (ঘ) মৃত্তিকা ও খনিজ সম্পদ এবং (ঙ) আভ্যন্তরীণ জলভাগ।

[Examine the influence of the following on the economic life of a region :

(a) Topography, (b) Climate, (c) Location, size, form and coast line, (d) Soils and minerals and (e) Inland waterbodies.]

২। নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহের প্রতিটিতে অর্থনৈতিক প্রগতির ধরণ সহ বিস্তারিত আলোচনা কর :

(ক) নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল, (খ) মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল, (গ) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল এবং (ঘ) সেন্ট লরেন্স আদর্শের জলবায়ু অঞ্চল।

[Describe the following natural regions, indicating the nature of economic development of each of these regions.

(a) Equatorial region, (b) Monsoon region, (c) Mediterranean region and (d) St Lawrence region.]

৩। নিম্নলিখিত খনিজসমূহের শিল্প-বাণিজ্যে ব্যবহার এবং উহাদের প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কে আলোচনা কর:

(ক) তাম্র, (খ) সীসা, (গ) টিন, (ঘ) দস্তা (ঙ) অ্যালুমিনিয়াম।

[Indicate the commercial and industrial use of the following minerals and mention the areas where they are found :

(a) Copper, (b) Lead, (c) Tin, (d) Zinc and (e) Aluminium.]

৪। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ বর্ণনা কর।

[Describe the most important ocean routes of the world.]

৫। সুয়েজ ও পানামা খালপথের আপেক্ষিক সুবিধা-অসুবিধাগুলি পর্যালোচনা কর।

[Describe and point out the relative advantages and disadvantages of Suez Canal and Panama Canal.]

৬। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরিবহণ ব্যবস্থার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

[Describe the role of transport in the economic development of a country.]

Paper II

[দ্বিতীয় পত্র]

১। ভারতে দোহ শিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর।

[Examine the present position of dairy farming in India.]

২। ভারতে মৎস্য শিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর।

[Examine the present position of fishing industry in India.]

৩। ভারতে নিম্নলিখিত শিল্পগুলির একদেশীভবন, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আলোচনা কর: (ক) শর্করা শিল্প, (খ) পাট শিল্প, (গ) রাসায়নিক শিল্প এবং (ঘ) রাসায়নিক সার শিল্প।

[Account for the localisation, state the present position and indicate the future prospects of (a) Sugar, (b) Jute, (c) Chemical industries and (d) Fertiliser industry of India.]

৪। ভারতের বহির্বাণিজ্যের বিবরণ দাও। ভারতের বহির্বাণিজ্যের পুনর্গঠনের প্রয়োজন আছে কি? প্রয়োজন হইলে, কোন্ খাতে?

[Give an account of the foreign trade of India. Do you want the reconstruction of India's foreign trade? If so, in what directions?]

Specimen Questions : 1980 & 1981

[আদর্শ প্রশ্নাবলী : ১৯৮০ এবং ১৯৮১]

ECONOMIC GEOGRAPHY

Paper I

[অর্থনৈতিক ভূগোল—প্রথম পত্র]

১। অর্থনৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং ইহার বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

[Define Economic Geography and explain its scope and importance.]

২। প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত উপাদানগুলি কি কি? মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর নদী অথবা ভূ-প্রকৃতির প্রভাব পর্যালোচনা কর।

[What are different elements of physical environment ? Critically examine the role of rivers or topography on the economic activities of man.]

৩। জলবায়ুর সংজ্ঞা নির্দেশ কর। মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর জলবায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর।

[Define climate. Describe the influence of climate on man's economic activities.]

৪। মৌসুমী অথবা ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। যে সকল অঞ্চলে এই প্রকার জলবায়ু দৃষ্ট হয় তাহার নাম লিখ। এই বিশেষ জলবায়ু অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ ও মুখ্য কৃষিজ সম্পদের বিবরণ দাও।

[Describe the characteristics of either the Monsoon or the Mediterranean type of climate. Name the areas where such type of climate prevails. Account for the natural vegetation and principal agricultural products of the areas having the particular type of climate.]

৫। নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পর্কে বিবরণ দাও।

[Describe the characteristic features and the nature of economic development of the Equatorial type of climate.]

৬। সম্পদের সংজ্ঞা দাও এবং শ্রেণীবিভাগ কর। সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর এবং সম্পদ উন্নয়নের আধুনিক ধারা নির্দেশ কর।

[Define and classify rescurces. Analyse the functional theory of resources and indicate the modern trend in resource development.]

৭। সম্পদ সৃষ্টির উপাদান কি কি ? সম্পদ সংরক্ষণের তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর।

[What are the resource creating factors ? Explain the concept of conservation of resources.]

৮। মানুষ-জমির অনুপাত বলিতে কি বুঝ ? জনঘনত্বের সহিত ইহার পার্থক্য নির্দেশ কর।

[What do you understand by man-land ratio ? How does it differ from population density ?]

৯। কাম্য জনসংখ্যার সংজ্ঞা দাও। কাম্য জনসংখ্যা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ আলোচনা কর। উপযুক্ত উদাহরণ দাও।

] Define optimum popu lation. Discuss the factors which determine this with specific examples.]

১০। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জনবসতির তারতম্যের কারণ বর্ণনা কর।

[Describe the causes of uneven distribution of population in different parts of the world.]

১১। বিশ্বের প্রধান প্রধান মৎস্যচারণ ক্ষেত্রগুলির বিবরণ দাও এবং উহাদের বাণিজ্যিক উন্নতির কারণ বিশ্লেষণ কর।

[Give an acco int of the important fisheries of the world and analyse thefactors of their commercial development.]

১২। সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনাঞ্চলের বিশ্বব্যাপী ভৌগোলিক বন্টন নির্দেশ কর এবং এই বনভূমি হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির বাণিজ্যিক ব্যবহার আলোচনা কর।

[Indicate the geographical location of the coniferous forests of the world and describe the commerical uses of the products of these forests.]

১৩। লৌহ আকরিকের বিভিন্ন শ্রেণীর নাম কর। বিশ্বে লৌহ আকরিকের বন্টন ও উৎপাদনের বিবরণ দাও।

[Name the different grades of iron ore. Give the world production and distribution of iron ore.]

১৪। নিম্নলিখিত খনিজ দ্রব্যের যে কোন একটির বাণিজ্যিক ও শিল্পগত ব্যবহার আলোচনা কর এবং উহাদের ভৌগোলিক বন্টন নির্দেশ কর।

(ক) বক্সাইট, (খ) ম্যাঙ্গানিজ, (গ) তাম্র এবং (ঘ) নিকেল।

[Indicate the commercial and industrial uses and regional distribution of any one of the following : (i) Bauxite, (ii) Manganese, (iii) Copper, (iv) Nickel.]

১৫। খনিজ তেলের শিল্পগত ব্যবহার কি ? ইহার বিশ্বব্যাপী বন্টনের বিবরণ দাও।

[What are the industrial uses of mineral oil ? Give an account of its world distribution.]

১৬। শক্তির বিভিন্ন উৎস কি ? জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ আলোচনা কর। কোন্ কোন্ বিষয়ে জলবিদ্যুৎ শক্তি অন্যান্য উৎস হইতে উন্নততর ?

[What are the different sources of power ? Describe the natural and economic factors for the development of hydro-electric powers. In what respect is hydro-electricity superior to other sources of power ?]

১৭। গম, তূলা, কফি, রবার, ইক্ষু ও বীট উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ উৎপাদক অঞ্চল এবং বিশ্বে উহার বন্টন সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Explain the conditions of growth, areas of production and world distribution of Wheat, Cotton, Coffee, Rubber, Sugar-cane and Sugar-beet.]

১৮। দোহ শিল্পের উন্নতির অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ কি কি ? বিশ্বের কোন্ কোন্ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দোহ শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে ? দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উল্লেখ কর।

[What are the geographical and economic conditions for the development of Dairy Industry ? What are the regions of the world where dairy farming is carried on in extensive scale ? Mention briefly the world trade in dairy products.]

১৯। পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যম কি কি ? বিভিন্ন প্রকারের পরিবহনের আপেক্ষিক সুবিধা-অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা কর।

[W hat are the different modes of transport ? Compare the relative advantages and disadvantages of different modes of transport.]

২০। বন্দরের শ্রেণীবিভাগ কর এবং সমুদ্রবন্দর গঠনের অনুকূল অবস্থা আলোচনা কর।

[Classify ports and discuss the factors favouring the growth of sea ports.]

২১। শিল্প সমাবেশের ভিত্তিগুলি পর্যালোচনা কর। কাঁচামাল, শক্তি সম্পদ ও বাজারের নিকট সন্নিবেশিত শিল্পের উদাহরণ দাও।

[Analyse the bases of industrial location and give examples of concentration of industries near raw material, power and market.]

২২। লৌহ-ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল কি কি? বিশ্বের কোন একটি মুখ্য লৌহ-ইস্পাত কেন্দ্রের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া ঐ শিল্পগঠনের অনুকূল বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ কর।

[What are the raw materials for the Iron and Steel Industry ? Analyse the factors for the location of the industry with reference to any outstanding centre of iron and steel production in the world.]

২৩। বাণিজ্যের সংজ্ঞা দাও। বাণিজ্যকে জাতীয় সমৃদ্ধি ও সভ্যতার সূচক বলিয়া কেন গণ্য করা হয় তাহা ব্যাখ্যা কর।

[Define trade. Explain why International Trade is treated as an index of civilization and of nation's prosperity.]

Paper II

[দ্বিতীয় পত্র]

১। ভারতীয়দের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর (ক) ভূ-প্রকৃতি এবং (খ) নদীর প্রভাব আলোচনা কর।

[Discuss the influence of (a) topography and (b) river on the economic life of Indian people.]

২। ভারতে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার বণ্টন লিখ। সাম্প্রতিককালে ভারতে মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য যে পরিকল্পনা প্রযুক্ত হইয়াছে উহার পর্যালোচনা কর।

[Give the distribution of different types of soil in India. Briefly examine the soil conservation programme introduced in this country in recent years.]

৩। নিম্নলিখিত কৃষিজ দ্রব্যাদির উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা ও উৎপাদক অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা কর (ক) ধান, (খ) চা, (গ) পাট, এবং (ঘ) ইক্ষু।

[Describe the geographical condition and areas of production of the following crops in India : (a) Rice, (b) Tea, (c) Jute, (d) Sugar-cane]

৪। ভারতে কি কি বিভিন্ন ধরনের মৎস্যচারণ ক্ষেত্র দেখা যায়? এই দেশে মৎস্য শিল্পের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে?

[What are the different types of fisheries found in India? What measures have been taken to improve the conditions of fishing industry in this country?]

৫। ভারতে খনিজ তেল ক্ষেত্রের বন্টন পর্যালোচনা কর। এই দেশে খনিজ তেল পরিশোধনের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আলোচনা কর।

[Examine the distribution of oil fields in India. Give the present position and future prospects of oil refining industry in the country.]

৬। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জলজাত শক্তির গুরুত্ব আলোচনা কর। দক্ষিণ ভারতে জল বিদ্যুতের উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

[Discuss the importance of water power in the context of Indian condition. Give a brief account of water power development in South India.]

৭। বহুমুখী নদী-প্রকল্প বলিতে কি বুঝায়? ভারতের যে কোন একটি বহুমুখী নদী-প্রকল্পের বিবরণ দাও।

[What is meant by a multipurpose river valley project? Describe any one of the multipurpose river valley projects of India.]

৮। ভারতে নিম্নলিখিত খনিজ সম্পদের অর্থনৈতিক ব্যবহার ও উৎপাদক অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনা কর: (ক) তাম্র, (খ) বকসাইট এবং (গ) ম্যাঙ্গানিজ।

[Describe the economic uses and areas of mining of the following minerals in India: (a) Copper, (b) Bauxite and (c) Manganese.]

৯। ভারতে কি কি বিভিন্ন ধরনের বনভূমি দৃষ্ট হয়। ভারতীয় বনভূমি হইতে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ পণ্যাদির বিবরণ দাও।

[What are the different types of forests found in India? Give the important products of Indian forests.]

১০। ভারতের মুখ্য বন্দর কি কি? ভারতের যে কোন একটি বন্দরের পশ্চাদ-ভূমি ও বাণিজ্যের ধরন বর্ণনা কর।

[What are the major ports of India? Describe the hinter land and pattern of trade of any one of the major ports of India.]

১১। ভারতের রেলপথের আঞ্চলিক বিভাজন কি কি? কোন একটি অঞ্চলের বিবরণ দাও এবং ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ঐ আঞ্চলিক রেলপথের ভূমিকা বর্ণনা কর।

[What are the railway zones of India? Describe any one of these zones with special reference to the part played by railway in the economic developement of the region.]

১২। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন এবং গতিপথ বর্ণনা কর।

[Give the composition and direction of India's foreign trade.]

১৩। ভারতের নিম্নলিখিত শিল্পের একদেশীভবন, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা কর: (ক) লৌহ-ইস্পাত শিল্প, (খ) শর্করা শিল্প, (গ) কাগজ শিল্প এবং (ঘ) রাসায়নিক শিল্প।

[Account for the localisation, state the present position and indicate the future prospects of (a) Iron & Steel, (b) Sugar, (c) Paper and (d) Chemical Industries of India.]

১৪। ভারতে জন বন্টনের বিষয়টি পর্যালোচনা কর।

[Account for the distribution of population in India.]

১৫। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব আলোচনা কর।

[Discuss the importance of Calcutta port in the economy of West Bengal.]

১৬। পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্প সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

16. Write a short essay on the Tea industry of West Bengal.

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের প্রশ্নাবলী

১৯৮১

অর্থনৈতিক ভূগোল—প্রথম পত্র

১। অর্থনৈতিক ভূগোলকে একটি গতিশীল বিজ্ঞান বলা হয় কেন? উদাহরণসহ আলোচনা কর। ১০+৫

[উত্তর-সংকেত: অর্থনৈতিক ভূগোল একটি গতিশীল বিজ্ঞান—পৃঃ ১৪।]

২। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ মৃত্তিকার নামগুলি উল্লেখ করিয়া উহাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর। কি কি কারণে ভূমিক্ষয় হইয়া থাকে? ৫+৫+৫

[উত্তর-সংকেত : মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ—পৃঃ ১৪৪, ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকার সমস্যা পৃঃ ১৪৭।]

৩। নিরক্ষীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা দাও। পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে এইরূপ জলবায়ু দেখা যায়? এই জলবায়ু অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক কার্যকলাপ উল্লেখ কর। ৬+৪+৫

[উত্তর-সংকেত : নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল—পৃঃ ৫৬-৫৮]

৪। 'মানুষ-জমির অনুপাত' বলিতে কি বুঝায়? 'জনবসতির ঘনত্ব'-এর সহিত ইহার পার্থক্য কি? উদাহরণ সহ-আলোচনা কর। ৮+৭

[উত্তর-সংকেত : মনুষ্য বসতির ঘনত্ব এবং মানুষ ও জমির অনুপাত—পৃঃ ১০১]

৫। পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রগুলির অবস্থান নির্দেশ কর। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে উহাদের অবস্থানের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৫+১০

[উত্তর-সংকেত : পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যচারণক্ষেত্রসমূহ—পৃঃ ১২৫ ; প্রাকৃতিক কারণসমূহ—পৃঃ ১২২]

৬। লৌহ আকরিকের নানাবিধ ব্যবহারের কথা উল্লেখ কর। এশিয়া অথবা উত্তর আমেরিকার প্রধান প্রধান লৌহ আকরিক-উৎপাদক অঞ্চলগুলির বিবরণ দাও। ৫+১০

[উত্তর-সংকেত : লৌহ আকরিকের ব্যবহার—পৃঃ ১৫২ ; উৎপাদক অঞ্চল—পৃঃ ১৫৩ ও ১৫৬]

৭। জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থাগুলি আলোচনা কর। তাপবিদ্যুৎ শক্তির তুলনায় ইহার কি কি সুবিধা আছে? ১০+৫

[উত্তর-সংকেত : জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ ১৮৮ ; বিভিন্ন শক্তি সম্পদের তুলনা—পৃঃ ১৯২]

৮। তুলা চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা কর। পৃথিবীর প্রধান প্রধান তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির নাম উল্লেখ কর। ১০+৫

[উত্তর-সংকেত : তুলা উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ ২৩৬ ;। উৎপাদক অঞ্চল—পৃঃ ২৩৭।]

৯। পাটশিল্প গঠনে কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন হয়? হুগলী-শিল্পাঞ্চলে চটকল কেন্দ্রীভবনের কারণ নির্দেশ কর। ৫+১০

[উত্তর-সংকেত : পাট শিল্প—পৃঃ ৩৫৫]

১০। বাণিজ্যপথ হিসাবে সুয়েজ ও পানামা খালের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ৭½+৭½

[উত্তর-সংকেত : সুয়েজ খাল—পৃঃ ২৯১ ; পানামা খাল—পৃঃ ২৯৩]

১১। নিম্নলিখিত যে কোন দুইটি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :—
৭½+৭½

(ক) সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব। (খ) নানাবিধ কৃষিপদ্ধতি। (গ) কয়লার নানাবিধ ব্যবহার। (ঘ) বিশ্ব-জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি।

[উত্তর-সংকেত : (ক) সম্পদের কার্যকারিতা তত্ত্ব—পৃঃ ৯৫। (খ) কৃষি প্রণালী—পৃঃ ২০১। (গ) কয়লার ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্য—পৃঃ ১৭৬। (ঘ) পৃথিবীর জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি—পৃঃ ১১০।]

১২। নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে সঠিক উত্তর লিখ :— ১ × ১০

(ক) নরম কাঠের বনভূমি সাধারণত নিরক্ষীয়-ক্রান্তীয় মৌসুমী/নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দেখা যায়।

(খ) নিরক্ষীয়/ক্রান্তীয়/মৌসুমী ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে কেবলমাত্র শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়।

(গ) পডজল মৃত্তিকা সাধারণত আর্দ্র অব-ক্রমেরীয়/আর্দ্র ক্রান্তীয়/শুষ্ক ক্রান্তীয় অঞ্চলে দেখা যায়।

(ঘ) অ্যানথ্রাসাইট/হেমাটাইট/বক্সাইট হইল এক প্রকার উচ্চ শ্রেণীর লৌহ আকর।

(ঙ) খনিজ তৈল উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া/ভেনেজুয়েলা/ঘানা উল্লেখযোগ্য।

(চ) বীট-চিনি প্রধানত ক্রান্তীয়/উপক্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উৎপন্ন হয়।

(ছ) পানামা খাল আটলান্টিক মহাসাগরের সহিত ভারত মহাসাগর/প্রশান্ত মহাসাগর/ভূমধ্যসাগর-কে যুক্ত করিয়াছে।

(জ) ইয়োকোহামা/ব্রাসেলস শেফিল্ড/জাহাজ-নির্মাণ শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

(ঝ) পিট্সবার্গ জার্মানির/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ কার্পাসবয়ন/লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র।

(ঞ) দক্ষিণ আমেরিকার নিরক্ষীয় বনভূমি/মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি আফ্রিকার মরুভূমিকে সেল্‌ভাস্ বলা হয়।

অর্থ নৈতিক ভূগোল—দ্বিতীয় পত্র

১। (ক) ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের বর্ণনা দাও।

(খ) ভারতীয়দের অর্থ নৈতিক জীবনের উপর এইরূপ অবস্থানের প্রভাব আলোচনা কর।

[উত্তর-সংকেত : অবস্থান ও ইহার প্রভাব—পৃঃ ৮]

২। (ক) ভারতের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য সংক্ষে লিখ।

(খ) ভারতকে জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত কর এবং এইরূপ যেকোনটি অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ এবং প্রধান কৃষিজ শস্য কি কি নির্দেশ কর। ৫+১০

[উত্তর-সংকেত : জলবায়ু ও ইহার প্রকার—পৃঃ ৩৯, দ্বীপাক্ষ অঞ্চল পৃঃ ৫৫]

৩। (ক) ইক্ষু উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশগুলির বর্ণনা দাও।

(খ) অধিক ইক্ষু উৎপাদনশীল ভারতীয় রাজ্যগুলির নাম লিখ।

(গ) ভারতে ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধির পন্থা নির্দেশ কর। ৫×৩

[উত্তর-সংকেত : ইক্ষু উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ—পৃঃ ১১০। উৎপাদক অঞ্চল—পৃঃ ১১০]

৪। (ক) ভারতের বিভিন্ন মৎস্য শিকারের উৎসগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

(খ) ভারতে মৎস্য শিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর। ১০+৫

[উত্তর-সংকেত : (ক) এবং (খ) ভারতের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্যচাষ—পৃঃ ১২৪]

৫। (ক) ভারতীয় অর্থনীতিতে জলশক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

(খ) জলশক্তি উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশগুলি লিপিবদ্ধ কর এবং ভারতের যে অঞ্চলসমূহে এইরূপ পরিবেশ বিদ্যমান তাহাদের নাম লিখ। ৫+৬+৪

[উত্তর-সংকেত : জলবিদ্যুৎ—পৃঃ ১৬৯]

৬। (ক) তাম্র ও অভ্রের ব্যবহারের বর্ণনা দাও।

(খ) ভারতে যে সমস্ত অঞ্চলে এইগুলি উত্তোলন করা হয় তাহাদের নাম লিখ। ৭+৮

[উত্তর-সংকেত : তাম্র—পৃঃ ১৭৫, অভ্র পৃঃ—১৫০]

৭। ভারতের যে কোন বৃহৎ বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনার বিবরণ দাও এবং এইরূপ পরিকল্পনা হইতে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি বিবৃত কর। ৯+৬

[উত্তর-সংকেত : ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা—পৃঃ ১৮৫]

৮। (ক) ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক রেলপথগুলির নাম লিখ।

(খ) পূর্ব-রেলপথভুক্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিতে এই রেলপথের অবদান বর্ণনা কর। ৯+৬

[উত্তর-সংকেত : রেলপথ—পৃঃ ২০২, পূর্ব-রেলপথ—পৃঃ ২০৫]

৯। (ক) ভারতের যে কোন চারিটি প্রধান লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্রের নাম লিখ।

(খ) দুর্গাপুরে ও জামশেদপুরে লৌহ-ইস্পাত শিল্প অবস্থানের কারণ নির্দেশ কর। ৪+১১

[উত্তর-সংকেত : বিভিন্ন লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনকেন্দ্র—পৃঃ ২৩২]

১০। (ক) জনবসতির ঘনত্বের ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ কর।

(খ) ভারতের অসম জনবসতির বণ্টনের কারণ নির্দেশ কর। ৬+৯

[উত্তর সংকেত : ভারতের জনবিন্যাস—পৃঃ ২৮০ অসম জনবণ্টনের কারণ পৃঃ—২৮১।]

১১। যে কোন তিনটির ব্যাখ্যা কর : ৫+৫+৫

(ক) নিজস্ব চাহিদা অপূর্ণ রাখিয়াও ভারত চিনি রপ্তানি করে।

(খ) উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ভারতের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদ বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে।

(গ) কলিকাতা পূর্ব ভারতের বাণিজ্যের রাজপথ।

(ঘ) মহারাষ্ট্র অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা বেশী।

[উত্তর সংকেত : (ক) পৃঃ ৫৫ ; (খ) পৃঃ ৯ ; (গ) পৃঃ ২১৪ ; (ঘ) পৃঃ ২৯২]

১২। যে কোন দুইটির উপর টীকা লিখ : ৭½×২

(ক) পশ্চিমবঙ্গের শক্তি সম্পদ, (খ) পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদ। (গ) হলদিয়ার শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা। (ঘ) পশ্চিমবঙ্গে কাগজ শিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা।

[উত্তর সংকেত : (ক) পৃঃ ২৯২ ; (খ) পৃঃ ২৯০ ; (গ) পৃঃ ৩০১ ; (ঘ) পৃঃ ৩০০]

১৯৮২

অর্থনৈতিক ভূগোল—প্রথম পত্র

১। (ক) ভৌগোলিক পরিবেশের প্রধান প্রধান উপাদান কি?

(খ) মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা কর। ৭+৮

[উত্তর-সংকেত : প্রাকৃতিক পরিবেশ—পৃঃ ১৯, মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর পরিবেশের প্রভাব—পৃঃ ৪৬]

২। (ক) উষ্ণ-নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

(খ) যে সকল দেশে এই প্রকার জলবায়ু দেখা যায় তাহাদের নাম উল্লেখ কর।

(গ) এইরূপ জলবায়ু অঞ্চলে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সংক্ষেপে উল্লেখ কর। ৭+৩+৫

[উত্তর-সংকেত : উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বলিতে উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীয় জলবায়ুকে বুঝায়। এই মণ্ডলে অবস্থানভেদে চারি প্রকার জলবায়ু দৃষ্ট হয়। পৃঃ ৫৫। এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখযোগ্য জলবায়ু অঞ্চলের আলোচনা করিতে হইবে। অতএব ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন; পৃঃ—৭৫]

৩। (ক) শক্তিসম্পদের শ্রেণীবিভাগ কর।

(খ) বর্তমানে শক্তিসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

(গ) পৃথিবীর শক্তিসম্পদ সংরক্ষণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

[উত্তর সংকেত : শক্তি ও শক্তির উৎস—পৃঃ ১৭৪ সম্পদ সংরক্ষণের নীতি ও পদ্ধতি—পৃঃ ৯৭]

অথবা

৩। (ক) জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক কারণসমূহ নির্ণয় কর।

(খ) জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে উন্নত দেশগুলির নাম উল্লেখ কর। ৫+১০

[উত্তর সংকেত : জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ—১৮৮ জলবিদ্যুৎ উৎপাদক অঞ্চল—পৃঃ ১৯০]

৪। (ক) পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অসম জনবসতি বিন্যাসের ভৌগোলিক কারণ নির্দেশ কর। ১৫

[উত্তর সংকেত : পৃথিবীর জনবসতি ঘনত্বের তারতম্যর কারণ—পৃঃ ১০৪]

৫। (ক) বনভূমির সম্প্রসারণে অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ উল্লেখ কর।

(খ) পৃথিবীর বনাঞ্চলের শ্রেণীবিভাগ কর।

(গ) বনভূমির বহুবিধ অর্থনৈতিক ব্যবহার আলোচনা কর। ৯+৩+৩

[উত্তর সংকেত : চিরহরিৎ ও সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ১৩৫ ও ১৩৭, অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ—পৃঃ ১৩৩, বনভূমির ব্যবহার ও গুরুত্ব—পৃঃ ১৩২]

৬। (ক) মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ কর।

(খ) ভূমিক্ষয় নিবারণে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তাহা আলোচনা কর। ৫+১০

[উত্তর সংকেত—মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ—পৃঃ ১৪৪, ভূমিক্ষয় সংরক্ষণ—পৃঃ ১৪৭]

৭। (ক) পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে পশুপালন অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা সেই সকল অঞ্চলের নাম কর।

(খ) ঐ সকল অঞ্চলে শস্য উৎপাদন অপেক্ষা পশুপালনের উপর অধিবাসীদের অধিকতর নির্ভরশীলতার কারণগুলি বর্ণনা কর।

(গ) পশুপালন-খামার হইতে উৎপন্ন প্রধান দ্রব্যসমূহ কি কি? ৩+৮+৪

[উত্তর সংকেত : (ক) ও (খ) পশুচারণ ক্ষেত্রসমূহ—পৃঃ ২৬৩, (গ) পশুজাত দ্রব্যাদি ও পশুপালনের গুরুত্ব—পৃঃ ২৬১ অবলম্বনে লিখ।]

৮। (ক) চা-উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ বর্ণনা কর। ৪+৮+৩

(খ) পৃথিবীর চা-উৎপাদক অঞ্চল ও চা-রপ্তানীকারক দেশগুলির নাম উল্লেখ কর।

[উত্তর সংকেত—(ক) চা চাষের উপযোগী অবস্থা—পৃঃ ২১৯ (খ) উৎপাদক অঞ্চল—পৃঃ ২২০, ও ব্যবসায়—পৃঃ ২২২]

৯। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোনো তিনটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ : ৫×৩

(ক) পূরণশীল ও ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ।

(খ) পরিবেশের উপর মানুষের জীবনযাত্রার নির্ভরশীলতা।

(গ) ভূমির মাত্রা সম্পর্কীয় ধারণা।

(ঘ) কৃষিব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ।

(ঙ) খনিজ তৈল ও ইহার উপজাত দ্রব্যের নানাবিধ ব্যবহার।

[উত্তর সংকেত—(ক) পূরণশীল সম্পদ—যাহা ব্যবহারে নিঃশেষিত হইলেও প্রাকৃতিক কারণে ও মানুষের কার্যকরী হস্তক্ষেপে পুনরায় আহরণ ও ব্যবহার যোগ্য হয়।

যেমন—বনভূমি, প্রবহমান জলধারা, মৎস্য, কৃষি ইত্যাদি। ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ—প্রাকৃতিক দান হিসাবে যাহা পৃথিবীতে সঞ্চিত আছে এবং মানুষের ব্যবহারে শুধু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পুনঃস্থাপিত হয় না। যেমন, কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ আকরিক ইত্যাদি। মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও ইহার তিলার্ধ সৃষ্টি করিতে পারে না।

(খ) মানুষের উপর প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ—পৃঃ ৪৭ ; (গ) মানুষ/ভূমির অনুপাত—পৃঃ ১০২ (ঘ) কৃষি প্রণালী—পৃঃ ২০১ ; (ঙ) খনিজ তেলের ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্য পৃঃ ১৮১-১৮২]

১০। (ক) পৃথিবীর অর্থনৈতিক কার্যাবলী বণ্টনে পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(খ) বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা আলোচনা কর। ১০+৫

[উত্তর সংকেত : পরিবহণ—পৃঃ ২৭৫ ও ৩০০]

অথবা

(ক) কার্পাস বয়ন শিল্পের অবস্থানের উপর কাঁচামাল ও বাজার-চাহিদার প্রভাব আলোচনা কর।

(খ) বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ কার্পাসবয়ন শিল্পাঞ্চলগুলির নাম উল্লেখ কর। ১০+৫

[উত্তর সংকেত : কার্পাস বয়ন শিল্প—পৃঃ ৩৪৩]

১১। নিম্নলিখিত যে কোনো দশটির সঠিক উত্তর লিখ :—১½ × ১০

(ক) আলাস্কা নিরক্ষীয়/মৌসুমী/মেরু অঞ্চলে অবস্থিত।

(খ) জনবসতির ঘনত্ব সাধারণত পার্বত্য/মালভূমি/সমুদ্র উপকূলের সমভূমিতে অধিক হইয়া থাকে।

(গ) আটলাণ্টিক মহাসাগর/ভূমধ্যসাগর/ভারত মহাসাগরে ডগার্স ব্যাঙ্ক অবস্থিত।

(ঘ) অভ্র/আকরিক লৌহ/খনিজ তৈল উৎপাদনে ওড়িশা খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

(ঙ) সিন্ধ্রি একটি গুরুত্বপূর্ণ লৌহ-ইস্পাত/রাসায়নিক দ্রব্য/পোশাক-পরিচ্ছদ উৎপাদন কেন্দ্র।

(চ) বম্বে-হাই হইতে বনজ দ্রব্য খনিজ তৈল/ম্যাঙ্গানিজ ধাতু উৎপন্ন হয়।

(ছ) মিজোরাম/পশ্চিমবঙ্গ/আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্থান পরিবর্তনশীল কৃষি-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(জ) চা/কার্পাস তুলা/কফি উৎপাদনে ব্রাজিল বিখ্যাত।

(ঝ) পারাদীপ ভারতের একটি নূতন শহর/বন্দর/শৈলাবাস/দ্বীপ।

(ঞ) ভারী কাঠ/বাঁশ/পাইন গাছে সাইবেরিয়া খুব সমৃদ্ধ।

(ট) নাগাসাকি চীনদেশ/কামপুচিয়া/জাপানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর।

(ঠ) আর্জেন্টিনা/নেদারল্যাণ্ডস/দক্ষিণ আফ্রিকা পশুপালনে সমধিক প্রসিদ্ধ।

অর্থ নৈতিক ভূগোল—দ্বিতীয় পত্র

১। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং নদ ও নদী কিভাবে ভারতের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা আলোচনা কর। ১৫

[উত্তর সংকেত : পরিবেশ—পৃঃ ৮, নদ-নদীর প্রভাব—পৃঃ ৩৭]

২। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার জলসেচ ব্যবস্থা বর্ণনা কর। উহাদের প্রত্যেকটির সুবিধা ও অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা কর। ১০+৫

[উত্তর সংকেত : জলসেচ—পৃঃ ৬২]

৩। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মূল রূপরেখা বর্ণনা কর। এই পরিকল্পনা হইতে পশ্চিমবঙ্গ কি কি সুবিধা পাইয়া থাকে? ৮+৭

[উত্তর সংকেত : দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—পৃঃ ১৮০]

৪। ভারতের প্রধান প্রধান ধান উৎপাদক অঞ্চলের কথা উল্লেখ কর এবং কি কি ভৌগোলিক অবস্থায় ধান উৎপন্ন হয় তাহা বর্ণনা কর। ৫+১০

[উত্তর সংকেত : ধান ও ধান উৎপাদক অঞ্চল—পৃঃ ৮২ ও ৮৩]

৫। (ক) কি ধরনের অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থায় ভারতে পাট ও চা উৎপাদন করা হয় তাহা বর্ণনা কর।

(খ) ভারতে কোন্ কোন্ রাজ্য পাট ও চা উৎপাদনে অগ্রণী? ১০+৫

[উত্তর সংকেত : চা—পৃঃ ৯৭, পাট—পৃঃ ১০৪]

৬। ভারতে কয়লা প্রধানত কিরূপে ব্যবহার করা হয়? এই দেশের প্রধান প্রধান কয়লা খনির ভৌগোলিক আলোচনা কর। ৫+১০

[উত্তর সংকেত : কয়লার উৎপাদন ও ব্যবহার—পৃঃ ১৬১]

৭। ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে কার্পাসবয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ উল্লেখ কর। এই শিল্পের বর্তমান সমস্যা কি কি? ১০+৫

[উত্তর সংকেত : কার্পাস বয়ন শিল্প—পৃঃ ২৩৮]

৮। ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা কর। এই বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তুমি কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন মনে কর? ১০+৫

[উত্তর সংকেত : বহির্বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি—পৃঃ ২৭১]

৯। ভারতে লোকবসতির অসম বন্টনের কারণ নির্দেশ কর। এই দেশ কি প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ? ১২+৩

[উত্তর সংকেত : ভারতের জনবিন্যাস—পৃঃ ২৮১ ও ২৭৮]

১০। পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব বর্ণনা কর। এই বন্দরের বর্তমান সমস্যা কি কি? ১০+৫

[উত্তর সংকেত : কলিকাতা বন্দরের সমস্যা—পৃঃ ৩০৬]

যেমন—বনভূমি, প্রবহমান জলধারা, মৎস্য, কৃষি ইত্যাদি। ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ—প্রাকৃতিক দান হিসাবে যাহা পৃথিবীতে সঞ্চিত আছে এবং মানুষের ব্যবহারে শুধু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পুনঃস্থাপিত হয় না। যেমন, কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ আকরিক ইত্যাদি। মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও ইহার তিলার্ধ সৃষ্টি করিতে পারে না।

(খ) মানুষের উপর প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ—পৃঃ ৪৭ ; (গ) মানুষ/ভূমির অনুপাত—পৃঃ ১০২

(ঘ) কৃষি প্রণালী—পৃঃ ২০১ ; (ঙ) খনিজ তেলের ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্য পৃঃ ১৮১-১৮২]

১০। (ক) পৃথিবীর অর্থনৈতিক কার্যাবলী বন্টনে পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(খ) বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা আলোচনা কর। ১০+৫

[উত্তর সংকেত : পরিবহণ—পৃঃ ২৭৫ ও ৩০০]

অথবা

(ক) কার্পাস বয়ন শিল্পের অবস্থানের উপর কাঁচামাল ও বাজার-চাহিদার প্রভাব আলোচনা কর।

(খ) বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ কার্পাসবয়ন শিল্পাঞ্চলগুলির নাম উল্লেখ কর। ১০+৫

[উত্তর সংকেত : কার্পাস বয়ন শিল্প—পৃঃ ৩৪৩]

১১। নিম্নলিখিত যে কোনো দশটির সঠিক উত্তর লিখ :—১½×১০

(ক) আলাস্কা নিরক্ষীয়/মৌসুমী/মেরু অঞ্চলে অবস্থিত।

(খ) জনবসতির ঘনত্ব সাধারণত পার্বত্য/মালভূমি/সমুদ্র উপকূলের সমভূমিতে অধিক হইয়া থাকে।

(গ) আটলান্টিক মহাসাগর/ভূমধ্যসাগর/ভারত মহাসাগরে ডগার্স ব্যাঙ্ক অবস্থিত।

(ঘ) অভ্র/আকরিক লৌহ/খনিজ তৈল উৎপাদনে ওড়িশা খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

(ঙ) সিন্ধ্রি একটি গুরুত্বপূর্ণ লৌহ-ইস্পাত/রাসায়নিক দ্রব্য/পোশাক-পরিচ্ছদ উৎপাদন কেন্দ্র।

(চ) বম্বে-হাই হইতে বনজ দ্রব্য খনিজ তৈল/ম্যাঙ্গানিজ ধাতু উৎপন্ন হয়।

(ছ) মিজোরাম/পশ্চিমবঙ্গ/আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্থান পরিবর্তনশীল কৃষি-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(জ) চা/কার্পাস তুলা/কফি উৎপাদনে ব্রাজিল বিখ্যাত।

(ঝ) পারাদীপ ভারতের একটি নূতন শহর/বন্দর/শৈলাবাস/দ্বীপ।

(ঞ) ভারী কাঠ/বাঁশ/পাইন গাছে সাইবেরিয়া খুব সমৃদ্ধ।

(ট) নাগাসাকি চীনদেশ/কামপুচিয়া/জাপানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর।

(ঠ) আর্জেন্টিনা/নেদারল্যাণ্ডস/দক্ষিণ আফ্রিকা পশুপালনে সমধিক প্রসিদ্ধ।

অর্থনৈতিক ভূগোল—দ্বিতীয় পত্র

১। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং নদ ও নদী কিভাবে ভারতের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা আলোচনা কর। ১৫

[উত্তর সংকেত : পরিবেশ—পৃঃ ৮, নদ-নদীর প্রভাব—পৃঃ ৩৭]

২। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার জলসেচ ব্যবস্থা বর্ণনা কর। উহাদের প্রত্যেকটির সুবিধা ও অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা কর। ১০+৫

[উত্তর সংকেত : জলসেচ—পৃঃ ৬২]

৩। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার মূল রূপরেখা বর্ণনা কর। এই পরিকল্পনা হইতে পশ্চিমবঙ্গ কি কি সুবিধা পাইয়া থাকে? ৮+৭

[উত্তর সংকেত : দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—পৃঃ ১৮০]

৪। ভারতের প্রধান প্রধান ধান উৎপাদক অঞ্চলের কথা উল্লেখ কর এবং কি কি ভৌগোলিক অবস্থায় ধান উৎপন্ন হয় তাহা বর্ণনা কর। ৫+১০

[উত্তর সংকেত : ধান ও ধান উৎপাদক অঞ্চল—পৃঃ ৮২ ও ৮৩]

৫। (ক) কি ধরনের অনুকূল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় ভারতে পাট ও চা উৎপাদন করা হয় তাহা বর্ণনা কর।

(খ) ভারতে কোন্ কোন্ রাজ্য পাট ও চা উৎপাদনে অগ্রণী? ১০+৫

[উত্তর সংকেত : চা—পৃঃ ৯৭, পাট—পৃঃ ১০৪]

৬। ভারতে কয়লা প্রধানত কিরূপে ব্যবহার করা হয়? এই দেশের প্রধান প্রধান কয়লা খনির ভৌগোলিক আলোচনা কর। ৫+১০

[উত্তর সংকেত : কয়লার উৎপাদন ও ব্যবহার—পৃঃ ১৬১]

৭। ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশে কার্পাসবয়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ উল্লেখ কর। এই শিল্পের বর্তমান সমস্যা কি কি? ১০+৫

[উত্তর সংকেত : কার্পাস বয়ন শিল্প—পৃঃ ২৩৮]

৮। ভারতের বহির্বাণিজ্যের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা কর। এই বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তুমি কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন মনে কর? ১০+৫

[উত্তর সংকেত : বহির্বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি—পৃঃ ২৭১]

৯। ভারতে লোকবসতির অসম বন্টনের কারণ নির্দেশ কর। এই দেশ কি প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ? ১২+৩

[উত্তর সংকেত : ভারতের জনবিন্যাস—পৃঃ ২৮১ ও ২৭৮]

১০। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব বর্ণনা কর। এই বন্দরের বর্তমান সমস্যা কি কি? ১০+৫

[উত্তর সংকেত : কলিকাতা বন্দরের সমস্যা—পৃঃ ৩০৬]

১১। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থান নির্দেশ করিয়া উহাদের যে কোনো একটির শিল্পায়নের কারণ নির্দেশ কর। ৫+১০

[উত্তর সংকেত : পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চল—পৃঃ ২৯৬]

১২। নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে সঠিক উত্তর দাও :— ১$\frac{১}{২}$×১০

(ক) ভারতের পূর্বাঞ্চলে/উত্তরাঞ্চলে/দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা যায়।

(খ) পাট/ইক্ষু/রবার ভারতে বাগিচা ফসলরূপে পরিচিত।

(গ) মেত্তুর/শিবসমুদ্রম/মাইথন ভারতের প্রাচীনতম জলবিদ্যুৎকেন্দ্র।

(ঘ) ভারতের বৃহত্তম তৈল শোধনাগারটি কানপুরে/মথুরায়/হলদিয়াতে গড়িয়া উঠিয়াছে।

(ঙ) ভারতের চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ/আসাম/তামিলনাড়ু প্রথম স্থান অধিকার করে।

(চ) কানপুর/এলাহাবাদ/লক্ষ্ণৌ উত্তর প্রদেশের রাজধানী।

(ছ) পশ্চিমবঙ্গে আসানসোলের/উত্তরপাড়ার/দুর্গাপুরের নিকট একটি মোটরগাড়ী নির্মাণের কারখানা আছে।

(জ) সাইকেল/রেলইঞ্জিন/সার কারখানার জন্য সিন্ধ্রি বিখ্যাত।

(ঝ) মার্মাগাঁও পশ্চিম ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্দ্র/বন্দর/শৈলাবাস।

(ঞ) মধ্য রেলপথের সদর দপ্তর পুনে/নাগপুর/বোম্বাই-তে অবস্থিত।

১৯৮৩

অর্থনৈতিক ভূগোল—প্রথম পত্র

[যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

১। সম্পদ বলিতে কি বুঝায়? যথাযথ উদাহরণসহ ইহার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর ৫+১০

[উত্তর সংকেত : সম্পদের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ৮৮]

২। উপযুক্ত উদাহরণ দ্বারা "মানুষ-জমির অনুপাত" তত্ত্বটির ব্যাখ্যা কর। জনসংখ্যার বিভাজন ও কৃষিজ পদার্থের উৎপাদনের উপর এই অনুপাত কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে? ৮+৭

[উত্তর সংকেত : মানুষ-জমির অনুপাত—পৃঃ ১০২]

৩। বিশ্বের প্রধান প্রধান মৎস্যচারণভূমির অবস্থান নির্দেশ কর। ইহাদের অবস্থান ও উন্নয়নে যে সকল ভৌগোলিক কারণ প্রভাব বিস্তার করে তাহা আলোচনা কর। ৫+১০

[উত্তরসংকেত : পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যচারণ ক্ষেত্রসমূহ—পৃঃ ১২৫ ; বাণিজ্যিক মৎস্য-চারণ ক্ষেত্র গঠন—প্রাকৃতিক কারণ—পৃঃ ১২২]

৪। লৌহ আকরিকের অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণ উল্লেখ কর। যে সকল দেশে ইহা খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে উত্তোলন করা হয় তাহাদের নাম উল্লেখ কর। লৌহ-আকরিক রপ্তানি ও আমদানিকারক প্রধান প্রধান দেশগুলির নাম কর। ৫+৫+২½+২½

[উত্তর সংকেত : লৌহ আকরিক—ব্যবহার—পৃঃ ১৫২ ; উৎপাদক অঞ্চল—পৃঃ ১৫৩ ; বাণিজ্য—১৫৮]

৫। কয়লা কয় প্রকারের হইয়া থাকে? ইহার প্রধান উপজাত দ্রব্যগুলির নাম কর। ইহা কিভাবে শিল্পের অবস্থানের উপর প্রভাব বিস্তার করে, যথাযথ উদাহরণসহ আলোচনা কর। ২½+২½+১০

[উত্তর সংকেত : কয়লার শ্রেণীবিভাগ—পৃঃ ১৭৪ ; ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্য—পৃঃ ১৭৬]

৬। বিভিন্ন প্রকারের কৃষিপদ্ধতি কি কি? কি পরিবেশে এবং কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই সকল কৃষিব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা বিশ্লেষণ কর। ৫+১০

[উত্তর সংকেত : কৃষি প্রণালী—পৃঃ ২০১]

৭। চাল উৎপাদনের অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ আলোচনা কর। বিশ্বের প্রধান প্রধান চাল উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম উল্লেখ কর। ১০+৫

[উত্তর সংকেত : চালের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ ২০৬ ; প্রধান উৎপাদক দেশসমূহ-পৃঃ ২০৭]

৮। কি কি ভৌগোলিক পরিবেশে সুতীবস্ত্র শিল্প উন্নতি লাভ করে, তাহা আলোচনা কর। যে সকল দেশ এই শিল্পে খ্যাতি লাভ করিয়াছে তাহাদের নাম কর। ১০+৫

[উত্তর সংকেত : কার্পাস শিল্প—কার্পাসের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ ২৭০ ; পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র—পৃঃ ২৭০]

৯। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিয়া সুয়েজ ও পানামা খালের উপর একটি তুলনামূলক আলোচনা কর :—

(ক) ইহাদের ভিতর দিয়া চলাচলকারী পণ্যসমূহ।

(খ) ইহাদের দ্বারা উপকৃত দেশসমূহ। ৭+৮

[উত্তর সংকেত : সুয়েজখাল—পৃঃ ২৯১ ; পানামাখাল—পৃঃ ২৯৩]

অথবা

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলগুলির অবস্থান নির্দেশ করিয়া ইহাদের উন্নতির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৭+৮

[উত্তর সংকেত : বিশ্বের শিল্পাঞ্চল—পৃঃ ৩১৬]

১০। পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠার অনুকূল ভৌগোলিক কারণ কি কি? যথাযথ উদাহরণসহ আলোচনা কর। ১০+৫

[উত্তর সংকেত : পোতাশ্রয় গঠনের কারণ—পৃঃ ৩০৬]

অথবা

পাটশিল্পের উন্নতিতে কাঁচামালের অবদান আলোচনা কর। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের নাম কর। ১০+৫

[উত্তর সংকেত : পাটশিল্প—পৃ: ৩৫৫]

১১। নিম্নোক্ত যে কোন তিনটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :— ৫×৩

(ক) অর্থ নৈতিক উন্নয়নে জলবায়ুর ভূমিকা।

(খ) আদর্শ-জনবসতি তত্ত্ব (গ) ভূমিক্ষয় ও ভূমি সংরক্ষণ।

(ঘ) জ্বালানি খনিজ। (ঙ) বনভূমির শ্রেণীবিভাগ।

[উত্তর সংকেত : (ক) পৃ: ২৯ ও ৩১ ; (খ) পৃ: ১০৭ ; (গ) পৃ: ১৪৭ ; (ঘ) পৃ: ১৭৫ ; (ঙ) পৃ: ১৩৩]

১২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঠিক উত্তর লিখ :— ১×১৫

(১) কয়লা একটি পূরণশীল/অপূরণশীল সম্পদ।

(২) জলবায়ু/ সম্পদের ব্যবহার /সামাজিক পরিবেশ/-এর উপর কোন স্থানের জনবসতির ঘনত্ব নির্ভর করে।

(৩) কয়লা / খনিজ তেল / নারকেল এ কেরালা উন্নত।

(৪) কানাডার বনভূমি পর্ণমোচী/চিরহরিৎ/সরল বর্গীয় গোষ্ঠীভুক্ত।

(৫) বোম্বাই-আমেদাবাদ/জম্মু-শ্রীনগর/কটক-ভুবনেশ্বর অঞ্চলে কার্পাস-বয়ন শিল্প কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে।

(৬) ম্যাঙ্গানিজ / তিমি মাছ / মৎস্য সম্পদে চিল্কা হ্রদ সমৃদ্ধ।

(৭) তামা / টিন / অভ্র মালয়েশিয়ায় পাওয়া যায়।

(৮) রানীগঞ্জ জামশেদপুর/দার্জিলিং-এর খনি হইতে কয়লা তোলা হয়।

(৯) নীল নদের বদ্বীপ / গাঙ্গেয় বদ্বীপ / পো নদীর উপত্যকা অঞ্চলে পাটচাষ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।

(১০) নূতন পলিমাটি/লাল মাটি / কৃষ্ণ মৃত্তিকা ধান চাষের উপযোগী।

(১১) নাইজেরিয়া / পশ্চিম জার্মানী / আর্জেন্টিনা কাঁচা পশম রপ্তানী করে।

(১২) আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগর/ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর / কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের সংযোগস্থলে সুয়েজ খাল অবস্থিত।

(১৩) দক্ষিণপূর্ব এশিয়া / জাপান / পশ্চিম ইউরোপে মিশ্র কৃষি ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(১৪) তারাপুরে জলবিদ্যুৎ / আণবিক শক্তি / তাপবিদ্যুৎ কারখানা আছে।

(১৫) বুয়েনস আইরিস হইতে কাঁচা তুলা / পাট / পশুজাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হয়।

———

১৯৮৩

অর্থনৈতিক ভূগোল—দ্বিতীয় পত্র

[যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

১। ভারতের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর জলবায়ুর প্রভাব উদাহরণসহ আলোচনা কর। ১০+৫

[উত্তর সংকেত : জলবায়ু ও ইহার প্রভাব—পৃঃ ৩৯]

২। ভারতের প্রধান প্রধান বাগিচা-ফসল কি কি? উহাদের যে কোন একটি ফসলের উৎপাদন উপযোগী ভৌগোলিক পরিবেশ ও উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলির কেন্দ্রীভূত হওয়া সম্বন্ধে লিখ। ৪+৮+৩

[উত্তর সংকেত : চা, কফি, রাবার, সিঙ্কোনা—চা—পৃঃ ৯৭]

৩। ভারতের জলবিদ্যুৎ সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা কর এবং সেই সম্পদ হইতে আমরা কিভাবে উপকৃত হই সে সম্বন্ধে বর্ণনা কর। ১০+৫

[উত্তর সংকেত : জলবিদ্যুৎ—পৃঃ ১৬৯]

৪। কি কি ভৌগোলিক পরিবেশে ভারতে গম চাষ হয়, তাহা বর্ণনা কর। এই ফসলের বর্তমান সমৃদ্ধির কারণ নির্দেশ কর। ১০+৫

[উত্তর সংকেত : গম চাষ—পৃঃ ৮৮]

৫। ভারতের বনজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ কর এবং ইহাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৫+১০

[উত্তর সংকেত : অরণ্যভূমির শ্রেণীবিভাগ—পৃঃ ১২৮, বনজসম্পদ ও ইহার ব্যবহার—পৃঃ ১৩১]

৬। ভারতের খনিজ তৈলক্ষেত্রগুলির অবস্থান বিষয়ে আলোচনা কর। খনিজ তৈল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই দেশে যে সকল প্রচেষ্টা লওয়া হইয়াছে তাহার উল্লেখ কর। ১০+৫

[উত্তর সংকেত : খনিজ তেলের উৎপাদক অঞ্চল—পৃঃ ১৬৩, উৎপাদন—পৃঃ ১৬৪]

৭। গাঙ্গেয় উপত্যকায় চিনি শিল্পের কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। এই শিল্পের বর্তমান সমস্যা কি কি? [উত্তর সংকেত : শর্করা শিল্প—পৃঃ ২৫৪] ১০+৫

৮। ভারতের তিনটি প্রধান বন্দরের নাম উল্লেখ করিয়া ইহাদের (১) অবস্থান, (২) রপ্তানি এবং (৩) আমদানি বিষয়ে আলোচনা কর। ৫×৩

[উত্তর সংকেত বন্দর—পৃঃ ২১১]

৯। ভারতের জনবসতি বিভাজনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। ভারতের অর্থনৈতিক পরিবেশ এই বসতি বিভাজনের উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? ৮+৭

[উত্তর সংকেত : ভারতের জনবিন্যাস—পৃঃ ২৭৮]

১০। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের অবদান নির্ণয় কর। খনিজ উৎপাদনে এই দেশে কি কি অসুবিধা দেখা যায়? ১০+৫

[উত্তর সংকেত : পশ্চিমবঙ্গের খনিজ ও শিল্প—পৃঃ ২১০ ও ২১২]

১১। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলায় চা-শিল্প অবস্থিত হইবার কারণ কি? এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা কর। [উত্তর সংকেত : চা—পৃ: ৯৭ এবং শিল্পাঞ্চল—পৃ: ৩০৬] ১০+৩+২

১২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যথাযথ উত্তর লিখ :— ১×১৫

(১) পৃথিবীর মধ্যে ভারত সর্বাপেক্ষা অধিক জনবসতিপূর্ণ / জনবসতি বিরল / দ্বিতীয় বৃহত্তম জনাকীর্ণ দেশ।

(২) চেরাপুঞ্জি/মহাবালেশ্বর/বোম্বাই ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল স্থান।

(৩) শস্য উৎপাদন/খনিজ/পশুপালনের জন্য দাক্ষিণাত্যের মালভূমি বিখ্যাত।

(৪) হিমালয়/রাজস্থান/পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে গোদাবরী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

(৫) কয়লা/ম্যাঙ্গানিজ/লৌহ-আকরিক উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

(৬) ভুঁতফল/আপেল/কাঠ/চা উৎপাদনে ডুয়ার্সের সমভূমি উন্নত।

(৭) মাদ্রাজ/কলিকাতা/কোচিনের পরিপূরক বন্দর হিসাবে হলদিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

(৮) গাঙ্গেয় বদ্বীপ/রাজস্থান/কৃষ্ণা নদীর উপত্যকা-অঞ্চলে পাটশিল্প কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে।

(৯) হীরাকুঁদ/তিলাইয়া/ভাকরা-য় ভারতের সর্বোচ্চ বাঁধ অবস্থিত।

(১০) কেরালা/গুজরাট/অন্ধ্র প্রদেশে/কাণ্ডলা অবস্থিত।

(১১) ভূপালে একটি সুবৃহৎ বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং/লৌহ-ইস্পাত/রেলগাড়ি মেরামতের কারখানা অবস্থিত।

(১২) ২ নম্বর জাতীয় সড়কটি বোম্বাই-র সহিত মাদ্রাজ/দিল্লীর সহিত অমৃতসর/কলিকাতার সহিত দিল্লীর যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে।

(১৩) ঝরিয়ায় উন্নত মানের অভ্র/কয়লা/বক্সাইট প্রচুর পরিমাণে মজুত রহিয়াছে।

(১৪) ভারতের সর্বাধিক পরিমাণ বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য বোম্বাই/কলিকাতা/মাদ্রাজ-এর মাধ্যমে হইয়া থাকে।

(১৫) বোম্বাই/কলিকাতা/দিল্লী ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর-গোষ্ঠী বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

১৯৮৪

অর্থনৈতিক ভূগোল—প্রথম পত্র

[যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। অর্থনৈতিক ভূগোলকে গতিশীল বিজ্ঞান বলা হয় কেন? উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর। ১৬

[উত্তর সংকেত : অর্থনৈতিক ভূগোল একটি গতিশীল বিজ্ঞান—পৃ: ১৪]

২। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব আলোচনা কর। উদাহরণসহ আলোচনা কর। ১৬

[উত্তর সংকেত : ভূ-প্রকৃতি—পৃঃ ২৫]

৩। (ক) ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দাও।

(খ) পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে এইরূপ জলবায়ু দেখা যায় ?

(গ) ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য কি কি ?

৫+৪+৭=১৬

[উত্তর সংকেত : (ক) জলবায়ু—পৃঃ ৬০। (খ) অবস্থান—পৃঃ ৬০।
(গ) অর্থ নৈতিক অবস্থা—পৃঃ ৬২]

৪। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে লোকবসতি বন্টনের তারতম্যের কারণসমূহ বর্ণনা কর। ১৬

[উত্তর সংকেত : পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন পৃঃ ১১৩]

৫। (ক) কয়লার শ্রেণী বিভাগ কর। (খ) কয়লার নানাবিধ ব্যবহার লিখ।
(গ) বৃটিশ যুক্তরাজ্য অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কয়লা উৎপাদক অঞ্চলগুলির বিবরণ দাও। ৪+৫+৭=১৬

[উত্তর সংকেত : (ক) কয়লার শ্রেণীবিভাগ—পৃঃ ১৭৫ (খ) ব্যবহার পৃঃ ১৭৬
(গ) বৃটিশ যুক্তরাজ্য পৃঃ ১৭৮ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পৃঃ ১৮০]

৬. টীকা লিখ : (যে কোন দুইটি)

(ক) ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ, (খ) সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি ও ইহার ব্যবহার এবং (গ) জীবিকাসত্তাভিত্তিক মৎস্য চাষ।

[উত্তর সংকেত : (ক) ভূমিক্ষয় ও ভূমি সংরক্ষণ পৃঃ ১৪৭ (খ) সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য—পৃঃ ১৩৮ এবং (গ) মৎস্য চাষ পৃঃ ১১৯]

৭। (ক) ধান অথবা রাবারের ব্যবহার কি কি ?

(খ) কি রকম ভৌগোলিক অবস্থায় এবং পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে ধান অথবা রাবারের চাষ হইয়া থাকে ?

(গ) ইহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৪+৮+৪=১৬

[উত্তর সংকেত : (ক) ধানের ব্যবহার—পৃঃ ২০৫ ; রাবারের ব্যবহার—পৃঃ ২৪৮ (খ) ধান ও রাবার চাষের অনুকূল অবস্থা—পৃঃ ২০৬ এবং পৃঃ ২৪৯ (গ) বাণিজ্য পৃঃ ২১০ এবং ২৫২]

৮। সামুদ্রিক বন্দরের গঠন ও উন্নতির অনুকূল অবস্থাসমূহ দৃষ্টান্ত উল্লেখপূর্বক লিখ। [উত্তর সংকেত : বন্দর গঠন—পৃঃ ৩০৪] ১৬

৯। কার্পাস বয়নশিল্প বা কাগজ শিল্পের উন্নতির মূলে ভৌগোলিক উপাদান কি কি ? পৃথিবীর প্রধান প্রধান কার্পাস বস্ত্র বা কাগজ উৎপাদন কেন্দ্রের উল্লেখ কর।
[উত্তর সংকেত : কার্পাস বয়ন শিল্প—পৃঃ ৩৪৩ ; কাগজ শিল্প—পৃঃ ৩৫৭] ১০+৬=১৬

১০। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মৌলিক কারণসমূহ বর্ণনা কর। ১৬

[উত্তর সংকেত : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—পৃঃ ৩৬৫]

১১। নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে সঠিক উত্তর লিখ : ৮×২=১৬

(a) পর্বত বৃষ্টিপাত সৃষ্টির জন্য / জ্বালানি উৎপাদনের জন্য দায়ী। (b) ভারতের এক তৃণভূমির / ব্রাজিলের নিরক্ষীয় বনভূমির / কঙ্গোর বনভূমির নাম সেলভা। (c) নাতিশীতোষ্ণ / নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে পশুচারণ ক্ষেত্র দেখা যায়। (d) জনবসতি ঘনত্ব নীলনদ উপত্যকা / আমাজন নদী উপত্যকাতে সর্বাপেক্ষা কম। (e) চা উৎপাদনে পক্ষে লোহযুক্ত রক্তাভ মৃত্তিকা / লবণাক্ত মৃত্তিকা অনুকূল। (f) ম্যাঙ্গানিজ, ইস্পাত / অ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত করিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। (g) পানামা খাল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা / আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর / ভূ-মধ্য সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করিয়াছে। (h) ওসাকা ইস্পাতশিল্পের / চিনি শিল্পের / কার্পাস বয়নশিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র।

অর্থনৈতিক ভূগোল—দ্বিতীয় পত্র

[যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। (ক) ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের বর্ণনা দাও।

(খ) ভারতীয়দের অর্থনৈতিক জীবনের উপর এইরূপ অবস্থানের প্রভাব আলোচনা কর। ৬+১০=১৬

[উত্তর সংকেত : (ক) অবস্থান—পৃঃ ৫ ; (খ) প্রভাব—পৃঃ ৮]

২। (ক) ভারতের বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার বণ্টন উল্লেখ কর।

(খ) সম্প্রতিকালে মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য যে সকল পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। ৮+৮=১৬

[উত্তর সংকেত : (ক) মৃত্তিকা—পৃঃ ৫৫ ; (খ) ভূমি সংরক্ষণ—পৃঃ ৬০]

৩। ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য কি কি ? যে কোন দুইটি খাদ্যশস্য যে যে ভৌগোলিক অবস্থায় জন্মায় তাহা বর্ণনা কর। ৪+১২=১৬

[উত্তর সংকেত : ধান ও গম—পৃঃ ৮৩ ও ৮৭]

৪। (ক) ভারতের দুগ্ধ সংক্রান্ত শিল্পের সাফল্যজনক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের বর্ণনা কর।

(খ) ইহার বর্তমান অবস্থা বর্ণনা কর। ১০+৬=১৬

[উত্তর সংকেত : পশু সম্পদ—উৎজাত দ্রব্য—পৃঃ ১২০-১২১]

৫। (ক) ভারতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর মৎস্য ক্ষেত্র দেখা যায় ?

(খ) এই দেশে মৎস্য চাষের উন্নতির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ? ৬+১০=১৬

[উত্তর সংকেত : উৎপাদন ও প্রসার—পৃঃ ১২৫-১২৬]

৬। (ক) ভারতের খনিজ তৈলক্ষেত্রগুলির ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ কর।

(খ) তৈলশোধন শিল্পে ভারতের অগ্রগতির রূপরেখা বর্ণনা কর। ৮+৮=১৬

[উত্তর সংকেত : খনিজ তৈলের উৎপাদক অঞ্চল—পৃঃ ১৬৩, উৎপাদন—পৃঃ ১৬৩]

৭। (ক) "বহুমুখী নদী পরিকল্পনা" বলিতে কি বুঝায় ?

(খ) ভারতের যে কোন বৃহৎ এইরূপ একটি নদী পরিকল্পনার বিবরণ দাও। ৬+১০=১৬

[উত্তর সংকেত : বহুমুখী নদী পরিকল্পনা—পৃঃ ১৭৯, দামোদর পরিকল্পনা—পৃঃ ১৮০]

৮। (ক) ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিবহণ-ব্যবস্থায় রেলপথ কি ভূমিকা অবলম্বন করে ?

(খ) ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক রেলপথগুলির নাম লিখ। ১০+৬=১৬

[উত্তর সংকেত : রেলপথ—পৃঃ ২০৩ এবং ২০৫]

৯। (ক) ভারতের পাট শিল্পের উন্নতির কারণসমূহ বর্ণনা কর।

(খ) ভারতে এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। [উত্তর সংকেত : পাট শিল্প—পৃঃ ২৪৫] ১০+৬=১৬

১০। টীকা লিখ : (যে কোন দুইটি)

(ক) পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্প, (খ) ফরাক্কা বাঁধ, এবং (গ) পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজ সম্পদ। ৮+৮=১৬

[উত্তর সংকেত : (ক) পৃঃ ২৯৫ ; (খ) পৃঃ ১৮৯ (গ) পৃঃ ২৮৭]

১১। প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ও আমদানি দ্রব্য নির্দ্দেশপূর্বক ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা কর। ১৬

[উত্তর সংকেত : আমদানি-রপ্তানি—পৃঃ ২১০ ; বাণিজ্যের পুনর্গঠন—পৃঃ ২১৫]

১২। সঠিক উত্তর দাও : ৪×২=১৬

(ক) মহাবালেশ্বর / বোম্বাই / চেরাপুঞ্জি ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল স্থান। (খ) ভারতে চা উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ / আসাম / তামিলনাড়ু প্রথম স্থান অধিকার করে। (গ) মালদায় / হরিণঘাটায় আধুনিক দুগ্ধ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (ঘ) অভ্র উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে পঞ্চম / সপ্তম / প্রথম স্থান অধিকার করে। (ঙ) বোকারোতে একটি জলবিদুৎ / তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। (চ) কেরালা / গুজরাট / অন্ধ্রে কাণ্ডালা অবস্থিত। (ছ) চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন / জাহাজ নির্মান শিল্পের জন্য বিখ্যাত। (জ) সাইকেল / রেলইঞ্জিন / সার কারখানার জন্য সিন্ধ্রী বিখ্যাত।

১৯৮৫

অর্থনৈতিক ভূগোল—প্রথম পত্র

[যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

১। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর। ১৫

[উত্তর-সংকেত : জলবায়ু—পৃঃ ২৯]

২। সম্পদের সংজ্ঞা দাও। সম্পদের উৎকর্ষ সাধনের উপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বদানের কারণ কি ? সম্পদের সংরক্ষণ বলিতে কি বুঝ ? ৫+৫+৫=১৫

[উত্তর-সংকেত : সম্পদের সংজ্ঞা—পৃঃ ৮৮। সম্পদ সংরক্ষণের ধারণা—পৃঃ ৯৬]

৩। 'মানুষ-জমির অনুপাত' ও 'জনবসতির ঘনত্বের' মধ্যে পার্থক্য আছে কি ? বর্তমানে পৃথিবীর জনবসতি বিন্যাসের গতি-প্রকৃতি বর্ণনা কর। ৫+১০=১৫

[উত্তর-সংকেত : মনুষ্য বসতির ঘনত্ব—পৃঃ ১০১। মানুষ-জমির অনুপাত—পৃঃ ১০২। পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টন—পৃঃ ১১৩]

৪। সমুদ্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। কি কি ভৌগোলিক কারণে সামুদ্রিক মৎস্যচারণ ক্ষেত্রগুলি বিকাশলাভ করে—যথাযথ উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৫+৭+৩=১৫

[উত্তর-সংকেত : সমুদ্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব—পৃঃ ১১৮। গঠন—পৃঃ ১২১]

৫। ভূমিক্ষয়ের কারণ কি? ভূমি সংরক্ষণের জন্য যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়, তাহা আলোচনা কর। ৬+৯=১৫

[উত্তর-সংকেত : ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকার সমস্যা—পৃঃ ১৪৭। ভূমি সংরক্ষণ—পৃঃ ১৪৭]

৬। কয়লা কয় প্রকারের হয়? কয়লার ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্যাদির বিষয় আলোচনা কর। ৩+৫+৭=১৫

[উত্তর-সংকেত : কয়লার শ্রেণীবিভাগ—পৃঃ ১৭৫। ব্যবহার ও উপজাত দ্রব্য—পৃঃ ১৭৬]

৭। কৃষি-ব্যবস্থার প্রকারভেদের উল্লেখ কর। যে সকল ভৌগোলিক পরিবেশে ইহাদের প্রচলন আছে, তাহাদের বর্ণনা দাও। ৫+১০=১৫

[উত্তর-সংকেত : কৃষি প্রণালী—পৃঃ ২০১]

৮। ধান চাষের অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা কর। ধানের বহুবিধ ব্যবহার কি কি? পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধান উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম উল্লেখ কর। ৫+৫+৫=১৫

[উত্তর-সংকেত : ধান চাষ—পৃঃ ২০৫, ২০৬ ও ২১০]

৯। প্রধান প্রধান তৈলবীজের নাম কর। ইহাদের যে কোন দুইটির চাষের অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থার বর্ণনা দাও। ৫+৫×২=১৫

[উত্তর-সংকেত : তৈলবীজ—পৃঃ ২৫৩]

১০। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে সুয়েজ খালের অর্থনৈতিক গুরুত্বের আলোচনা কর। [উত্তর সংকেত : সুয়েজ খাল—পৃঃ ২৯১] ১৫

অথবা

কার্পাস বয়ন শিল্পে কাঁচামাল ও বাজারের প্রভাব বিশ্লেষণ কর। পৃথিবীর তিনটি উল্লেখযোগ্য কার্পাসবস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রের নাম লিখ। ৫×২+৫=১৫

[উত্তর সংকেত : কার্পাস বয়ন শিল্প—পৃঃ ৩৫৩]

১১। নিম্নলিখিত যে কোন **তিনটির** সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর :— ৫×৩=১৫

(ক) অর্থনৈতিক ভূগোল অনুশীলনের গুরুত্ব। (খ) লৌহ-সঙ্কর গোষ্ঠীর ধাতব খনিজ।
(গ) বন্দর সৃষ্টির অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ। (ঘ) বনসম্পদ সংরক্ষণ।

উত্তর সংকেত : (ক) পৃঃ ১৩, (খ) পৃঃ : ১৫১ ও ১৫৮ (গ) পৃঃ (ঘ) পৃঃ ১৪১]

১২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঠিক উত্তর দাও :— ১×১৫=১৫

(ক) হিমালয় পর্বতের পাদদেশ সুন্দরবনের / তরাই বনভূমির / শুষ্ক বনভূমির জন্য বিখ্যাত।

(খ) প্ল্যাঙ্কটন মানুষের / মৎস্যকুলের / বন্যপ্রাণীর প্রিয় খাদ্য। (গ) পাইনের বনভূমি হইতে লাক্ষা / মধু / তার্পিন তৈল সংগ্রহ করা হয়। (ঘ) লৌহ-ইস্পাত শিল্পেবক্সাইট / হেমাটাইট / টিন প্রধান কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। (ঙ) আলকাতরা হইল কয়লা / বাদাম তৈল / লৌহ আকরের উপজাত দ্রব্য। (চ) ইউরেনিয়াম / লিগনাইট / সীসা হইতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করা হয়। (ছ) কৃষ্ণমৃত্তিকা ধান / ইক্ষু / তুলা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। (জ) দুগ্ধজাত শিল্পে ডেনমার্ক / কোরিয়া / চীনদেশ বিশেষ উন্নত। (ঝ) নাইজেরিয়া / ভারতবর্ষ / পাকিস্তান কোকো উৎপাদনে বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।(ঞ) বাগিচা-ফসল উৎপাদনে সাইবেরিয়া / নিউজীল্যাণ্ড / দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। (ট) কৃষ্ণা / গোদাবরী / গঙ্গা নদীর ব-দ্বীপে পাটচাষ কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। (ঠ) শীতল ও শুষ্ক / উষ্ণ ও আর্দ্র / উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু মেষ পালনের বিশেষ উপযোগী। (ড) তুলা / পাট / রেশম উৎপাদনে মিশর এক গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান অধিকার করে। (ঢ) প্রশান্ত মহাসাগরের / ভূমধ্য সাগরের / বঙ্গোপসাগরের তীরে সানফ্রান্সিস্কো বন্দর অবস্থিত। (ণ) জাপান / সোভিয়েত ইউনিয়ন / ভারতবর্ষ আকরিক-লৌহ আমদানি করে।

অর্থনৈতিক ভূগোল দ্বিতীয় পত্র

[যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

১। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর মৃত্তিকার প্রভাব যথাযথ উদাহরণ সহ আলোচনা কর। ১০+৫=১৫

[উত্তর-সংকেত : মৃত্তিকা—পৃঃ ৫৫]

২। ভারতের বনভূমির শ্রেণীবিভাগ কর এবং ইহাদের অবস্থান নির্দেশ কর। এই সকল বনভূমির মুখ্য বাণিজ্যিক সম্পদ কি কি? ৪+৪+৭=১৫

[উত্তর-সংকেত : অরণ্যের শ্রেণীবিভাগ—পৃঃ ১২৮। বনজ সম্পদ—পৃঃ ১৩১-১৩২]

৩। জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে ভারতের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা কর। এই দেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সমস্যাবলীর আলোচনা কর। ১০+৫=১৫

[উত্তর-সংকেত : জলবিদ্যুৎ—পৃঃ ১৬৯]

৪। ভারতের যে কোন অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি বহুমুখী নদীপ্রকল্পের অবদান যথাযথ উদাহরণ সহ আলোচনা কর। ১০+৫=১৫

[উত্তর-সংকেত : ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা—পৃঃ ১৮৫]

৫। ভারতের কৃষি ব্যবস্থার মুখ্য সমস্যাবলী নির্দেশ কর। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সকল সমস্যা সমাধানে যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন তাহা আলোচনা কর। ৮+৭=১৫

[উত্তর-সংকেত : ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থা ও খাদ্য-সমস্যা—পৃঃ ৭১ এবং ৭৪]

৬। ভারতের প্রধান প্রধান খাদ্য ফসলের নাম উল্লেখ কর। কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই সকল ফসল বেশি পরিমাণে উৎপন্ন করা হয়? এই দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

[উত্তর-সংকেত : ধান, গম, ভুট্টা, বাজরা, জোয়ার, যব—পৃঃ ৮৩-]

৭। ভারতে চা চাষের উপযোগী অবস্থা বর্ণনা কর। ভারতে এই ফসলের প্রধান প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চলের নাম কর। এই দেশে চা চাষের বর্তমান সমস্যাবলী কি কি? ৫+৫+৫=১৫

[উত্তর-সংকেত : চা—পৃঃ ৯৭]

৮। ভারতের খনিজ তৈল উৎপাদক অঞ্চলগুলির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। এই খনিজ উৎপাদনে ভারতের বর্তমান অবস্থা কি? ১০+৫=১৫

[উত্তর-সংকেত : খনিজ তৈল—পৃঃ ১৬২]

৯। ভারতের যে কোন তিনটি কেন্দ্রে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিকাশের ভৌগোলিক বিবরণ দাও ৫×৩=১৫

[উত্তর-সংকেত : লৌহ-ইস্পাত শিল্প—পৃঃ ২৩৩—(রাউরকেল্লা, ভিলাই, দুর্গাপুর)]

১০। পশ্চিমবঙ্গে নানাবিধ খনিজ সম্পদের অবস্থানের আলোচনা কর। এই রাজ্যে শিল্পোন্নয়নে খনিজ সম্পদের অবদান উল্লেখ কর। ১০+৫=১৫

[উত্তর সংকেত : পশ্চিমবঙ্গের খনিজ—পৃঃ ২৯০ ; শিল্পাঞ্চল—পৃঃ ২৯৬]

১১। কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের শিল্পের মূল কাঠামো ও বর্তমান গতি-প্রকৃতি নির্দেশ কর। কি কি কারণে এই শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে? ১০+৫=১৫

[উত্তর-সংকেত :—পৃঃ ২৯৬]

১২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোন দুইটির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। $৭\frac{১}{২}$×২=১৫

(ক) কেরালায় ঘন জনবসতি বর্তমান, কিন্তু আসামের অবস্থা তেমন নহে।

(খ) কলিকাতা বন্দরের উন্নয়নে হলদিয়ার অবদান।

(গ) ফরাক্কা প্রকল্প।

[উত্তর সংকেত : (ক) পৃঃ ২৮১ ; (খ) পৃঃ ৩০১ ; (গ) পৃঃ ১৮৯]

ত্রিপুরা সংসদের
উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী : ১৯৮১
অর্থ নৈতিক ভূগোল প্রথম পত্র

১। যে কোন পাঁচটির উত্তর দাও : ৫×৫ (৪×৫)

(ক) মেরু-অঞ্চলের অধিকাংশ লোক যাযাবর—ইহার কারণ কি?

(খ) সম্পদের সংজ্ঞা নির্ণয় কর ও উহাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত কর।

(গ) রবার চাষের অনুকূল অবস্থাগুলি উল্লেখ কর।

(ঘ) কয়লার উপজাত দ্রব্যগুলির নাম লিখ।

(ঙ) বনভূমির উপকারিতাসমূহ কি কি?

(চ) আফ্রিকা মহাদেশে অনেকগুলি বড় নদী ও হ্রদ থাকিলেও জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন হয় অত্যন্ত অল্প—ইহার কারণ কি?

(ছ) ইক্ষু উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম উল্লেখ কর।

(জ) মধ্য-প্রাচ্যের খনিজ তৈলখনি অঞ্চলগুলির নাম লিখ।

(ঝ) সামুদ্রিক মৎস্য-শিকারের আধুনিক পদ্ধতিসমূহের উল্লেখ কর।

(ঞ) দুইটি ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনকারী এবং দুইটি অভ্র উৎপাদনকারী দেশের নাম লিখ।

২। যে কোন **পাঁচটির** উত্তর দাও : ৯×৫ (৮×৫)

(ক) মানুষ-জমির অনুপাত এবং লোকবসতির ঘনত্বের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

(খ) মৌসুমী অঞ্চল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পার্থক্য দেখাও।

(গ) পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্যচারণ ক্ষেত্রগুলি নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে সীমাবদ্ধ—ইহার কারণসমূহ কি ?

(ঘ) ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণগুলি এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলি উল্লেখ কর।

(ঙ) দুইটি দেশ হইতে বাছিয়া পৃথিবীর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলের বর্ণনা কর।

(চ) বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠার প্রয়োজনীয় অনুকূল অবস্থা কি কি ?

(ছ) কয়লার পৃথিবীব্যাপী বন্টনের বর্ণনা দাও।

(জ) যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কার্পাসবয়ন-শিল্প গড়িয়া উঠার কারণগুলি দাও।

(ঝ) বাণিজ্যকে কোন্ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয়—ইহার কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর।

৩। যে কোন **একটির** উত্তর দাও : ১৫(১৫)

(ক) এক-ফসলী কৃষি এবং মিশ্র কৃষি-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর এবং ইহাদের সুবিধাগুলি লিখ।

(খ) লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কি কি ? পৃথিবীর যে কোন একটি বিশিষ্ট লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত কেন্দ্রের উল্লেখ করিয়া উহার অবস্থানের কারণ বিশ্লেষণ কর।

(গ) পরিবহন-ব্যবস্থায় স্থল, জল ও বিমানপথের তুলনামূলক গুরুত্ব উদাহরণসহ পর্যালোচনা কর।

(ঘ) পৃথিবীতে লোকবসতির অসম বন্টনের কারণগুলি আলোচনা কর।

৪। প্রশ্নের সহিত সরবরাহকৃত পৃথিবীর মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অবস্থান, নাম ইঙ্গিতের সাহায্যে নির্দেশ কর : ১৫ (১৫)

(ক) আবাদান, বোস্টন, কলম্বো, টোকিও।

(খ) দুইটি লৌহখনি অঞ্চল, একটি খনিজ তৈল উৎপাদন অঞ্চল।

(গ) দুইটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র এবং দুইটি কার্পাসবয়ন শিল্পকেন্দ্র।

(ঘ) দুইটি কার্পাস উৎপাদন অঞ্চল।

দ্বিতীয় পত্র

১। যে কোন **আটটির** উত্তর দাও : ২½×৮(২×৮)

(ক) ভারতের সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাতযুক্ত দুইটি অঞ্চলের নাম কর।

(খ) উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যবর্তী দুইটি পর্বতের নাম উল্লেখ কর।

(গ) দামোদর-উপত্যকা পরিকল্পনার দুইটি বাঁধের নাম দাও।

(ঘ) ভারতের দুইটি প্রধান বাণিজ্যিক ফসলের নাম কর।

(ঙ) ভারতের দুইটি তৈল শোধনাগারের নাম উল্লেখ কর।

(চ) ভারতের দুইটি অভ্র উত্তোলনকারী অঞ্চলের নাম লিখ।

(ছ) ত্রিপুরার দুইটি আবাদী ফসলের নাম কর।

(জ) ভারতের দুইটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রের নাম দাও।

(ঝ) রাশিয়া হইতে আমদানিকৃত দুইটি এবং সেখানে রপ্তানিকৃত ভারতের দুইটি দ্রব্যের নাম উল্লেখ কর।

(ঞ) ভারতের বনভূমির চারটি গৌণ বনজ সম্পদের নাম দাও।

(ট) পশ্চিমবঙ্গের দুইটি শিল্পাঞ্চলের নাম বল।

(ঠ) ভারতের পশ্চিম উপকূলের দুইটি বন্দরের নাম দাও।

২। যে কোন **পাঁচটির** উত্তর দাও : ১০×৫(৯×৫)

(ক) ভারতের বৃষ্টিপাতের বণ্টন ও কৃষির উপর উহার প্রভাব বর্ণনা কর।

(খ) ভারতের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ কর এবং উহাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

(গ) বহুমুখী নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝায়? ভারতের যে কোন একটি নদী-পরিকল্পনা অবলম্বন করিয়া উত্তর দাও।

(ঘ) তুলাচাষের জন্য কি কি প্রাকৃতিক অবস্থার প্রয়োজন? ভারতের কোন্ কোন্ রাজ্যে ইহা প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়?

(ঙ) লৌহের ব্যবহার উল্লেখ কর। ভারতের লৌহখনিগুলির অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(চ) পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের প্রাধান্যের কারণগুলি উল্লেখ কর।

(ছ) ত্রিপুরা শিল্পে অনুন্নত কেন আলোচনা কর।

(জ) ভারতের বোম্বাই ও আহমেদাবাদ অঞ্চলে বস্ত্রবয়ন-শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণ দেখাও।

(ঝ) ভারতের দুইটি প্রধান বন্দরের পশ্চাদ্‌ভূমি ও বাণিজ্যের ধরন বর্ণনা কর।

(ঞ) ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। যে কোন **একটি** উত্তর দাও : ১৫ (১৪)

(ক) ভারতের প্রধান প্রধান বনভূমি অঞ্চলের বর্ণনা কর এবং দেশের বনজ সম্পদের বিবরণ দাও।

(খ) ভারতের চিনিশিল্পের অবস্থান এবং বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(গ) ভারতে অনুসৃত বিভিন্ন জলসেচ-ব্যবস্থা কি কি? কোন্‌টি সবচেয়ে বেশী অনুসৃত হয়? উহার কারণ দেখাও।

৪। প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বিতরিত ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নাম ও ইঙ্গিত দ্বারা অবস্থান উল্লেখ কর : ১৫ (১৫)

(ক) টাটানগর, শোলাপুর, ব্যাঙ্গালোর, ভিলাই, মাদুরাই।

(খ) কফি উৎপাদক অঞ্চলসমূহ।

(গ) একটি বিমানপোত নির্মাণ শিল্পকেন্দ্র এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পকেন্দ্র।

অর্থনৈতিক ভূগোল—১৯৮২

প্রথম পত্র

১। যে কোন **পাঁচটির** উত্তর দাও : ৫×৫=২৫

(ক) হারবার্টসনের বিভাগ অনুসারে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহের নাম লিখ।

(খ) সম্পদ সৃষ্টির উপাদানসমূহ কি কি লিখ।

(গ) প্রগাঢ় কৃষি ও ব্যাপক কৃষি বলিতে কি বুঝ ?

(ঘ) তাম্র উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম উল্লেখ কর।

(ঙ) সংজ্ঞা লিখ : মাধ্যম বন্দর, পশ্চাদ্‌ভূমি।

(চ) পৃথিবীর প্রধান প্রধান পশম উৎপাদনকারী দেশগুলির নাম কর।

(ছ) গম চাষের অনুকূল অবস্থাগুলি উল্লেখ কর।

(জ) পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায় ?

(ঝ) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রধান প্রধান বিশেষত্ব কি ?

২। যে কোন **পাঁচটির** উত্তর দাও : ৯×৫=৪৫

(ক) অর্থনৈতিক ভূগোলের গতিশীল চরিত্র আলোচনা কর।

(খ) নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা ও জলবায়ু আলোচনা কর।

(গ) খনিজ তৈলের ব্যবহার লিখ এবং উৎপাদক দেশগুলির নাম লিখ।

(ঘ) দুগ্ধশিল্প স্থাপনের অনুকূল অবস্থাসমূহ আলোচনা কর।

(ঙ) আদর্শ লোকবসতি সম্পর্কে ধারণা আলোচনা কর।

(চ) পৃথিবীর কয়েকটি দেশে রেশম উৎপাদন সীমাবদ্ধ হইবার কারণসমূহ আলোচনা কর। রেশমের ব্যবহার কি কি ?

(ছ) রাশিয়ার প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চলের বিবরণ দাও।

(জ) চা চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থাসমূহ বর্ণনা কর। চা-এর প্রধান প্রধান উৎপাদকের নাম লিখ।

৩। যে কোন **একটির** উত্তর দাও : ১৫

(ক) কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে জলবায়ুর প্রভাব আলোচনা কর।

(খ) শিল্প স্থাপনের উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ কর।

(গ) সামুদ্রিক বন্দর গড়িয়া উঠিবার উপাদানসমূহ বর্ণনা কর।

৪। প্রশ্নপত্রের সহিত সরবরাহকৃত পৃথিবীর মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অবস্থান, নাম ও চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশ কর : ১৫

(ক) নিউইয়র্ক, সিঙ্গাপুর, সিডনি, আলেকজান্দ্রিয়া, লেনিনগ্রাড।

(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি কয়লাখনি অঞ্চল।

(গ) ইউরোপের তিনটি প্রধান বন্দর।

দ্বিতীয় পত্র

১। যে কোন **আটটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ২½×৮=২০

(ক) ভারতে যে কোন চারটি শ্রেণীর মৃত্তিকার নাম লিখ।

(খ) ভারতের দুইটি বাণিজ্যিক ফসলের নাম লিখ।

(গ) ভারতের চারটি কয়লা উৎপাদক অঞ্চলের নাম কর।

(ঘ) ত্রিপুরার দুইটি তন্তুজাতীয় ফসলের নাম লিখ।

(ঙ) ভারতের চারটি লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদক কেন্দ্রের নাম লিখ।

(চ) পশ্চিমবঙ্গের দুইটি প্রধান শিল্পের নাম কর।

(ছ) ভারতের পূর্ব উপকূলের তিনটি প্রধান বন্দরের নাম লিখ।

(জ) ভারতের চারটি বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার নাম লিখ।

(ঝ) দক্ষিণ ভারতের তিনটি প্রধান নদীর নাম লিখ।

(ঞ) ভারতের পশম উৎপাদনকারী দুইটি রাজ্যের নাম লিখ।

(ট) গ্রেট ব্রিটেন হইতে আমদানিকৃত দুইটি এবং সেখানে রপ্তানিকৃত ভারতের দুইটি দ্রব্যের নাম উল্লেখ কর।

(ঠ) রাজস্থানে গড় লোকবসতি বিরল হওয়ার কারণ কি ?

২। যে কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০×৫=৫০

(ক) ভারতের ভূমিক্ষয় সমস্যা ও উহার সমাধান আলোচনা কর।

(খ) গম চাষের উপযোগী ভৌগোলিক পরিবেশ আলোচনা কর। ভারতে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ অঞ্চলে গম উৎপাদিত হয় তাহা লিখ।

(গ) ভারতের যে সকল স্থানে নিম্নলিখিত খনিজ দ্রব্যসমূহ পাওয়া যায় তাহাদের নাম এবং তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে লিখ : (১) তাম্র, (২) ম্যাঙ্গানীজ।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিতে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা কর।

(ঙ) ভারতের কাগজ-শিল্পের জন্য কি কি কাঁচামাল প্রয়োজন ? কোথায় এবং কি পরিমাণে এইগুলি ভারতে পাওয়া যায় ?

(চ) কলিকাতা বন্দরের অবস্থান ও উন্নতিতে যে সকল ভৌগোলিক অবস্থার অবদান আছে তাহা বিশ্লেষণ কর।

(ছ) ভারতের কয়লা উৎপাদনের সমস্যাগুলি আলোচনা কর।

(জ) আসামে চা-এর অধিক উৎপাদনের কারণগুলি আলোচনা কর।

(ঝ) ভারতের অর্থনীতিতে রেল-যোগাযোগের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। যে কোন **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ১৫

(ক) ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর জলবায়ুর প্রভাব আলোচনা কর।

(খ) ভারতের জনসংখ্যার অসমান বন্টনের কারণসমূহ আলোচনা কর।

(গ) ভারতের খনিজ তৈলের উত্তোলন ও তৈলশোধন শিল্পের সঠিক বর্ণনা দাও।

৪। প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বিতরিত ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নাম ও ইঙ্গিত দ্বারা অবস্থান উল্লেখ কর। ১৫

(ক) দুর্গাপুর, কোয়েম্বাটোর, কানপুর, কোচিন, অমৃতসর।

(খ) তিনটি কয়লাখনি অঞ্চল ও দুইটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

(গ) তিনটি ইস্পাতশিল্প কেন্দ্র এবং দুইটি খনিজ তৈল শোধন কেন্দ্র।

অর্থনৈতিক ভূগোল-১৯৮৩

প্রথম পত্র

১। যে কোন **পাঁচটির** উত্তর দাও।

(ক) তুন্দ্রা অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক দিয়া অনুন্নত হওয়ার কারণ কি?

(খ) নিরক্ষীয় অঞ্চলের স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ কি কি?

(গ) অভ্রের ব্যবহার কি কি?

(ঘ) মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ লিখ।

(ঙ) পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চলগুলির নাম লিখ।

(চ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া রবার চাষে উন্নত কেন?

(ছ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: প্রগাঢ় চাষ ও ব্যাপক চাষ।

(জ) পাঁচটি ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনকারী দেশের নাম কর।

(ঝ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি সামুদ্রিক বন্দরের নাম কর।

২। যে কোন **পাঁচটির** উত্তর দাও:

(ক) জলবায়ুর ভিত্তিতে বনভূমির শ্রেণীবিভাগ কর এবং পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে ঐগুলি অবস্থিত তাহা লিখ।

(খ) সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

(গ) পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলে রবারের চাষ সীমাবদ্ধ হইবার কারণসমূহ আলোচনা কর।

(ঘ) খনিজ সম্পদ উত্তোলনের সহিত কৃষিকার্যের তুলনা কর।

(ঙ) একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পরিবহণ-ব্যবস্থার ভূমিকা আলোচনা কর।

(চ) তূলা-উৎপাদনের ভৌগোলিক অবস্থানসমূহ আলোচনা কর এবং ইহার উল্লেখযোগ্য উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম কর।

(ছ) বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়িয়া উঠার কারণ কি কি?

(জ) বাণিজ্যিক মৎস্যক্ষেত্রসমূহের উন্নতির কারণগুলি আলোচনা কর।

৩। যে কোন **একটির** উত্তর দাও:

(ক) জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ বর্ণনা কর।

(খ) পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জনবসতি ঘনত্বের তারতম্যের কারণসমূহ আলোচনা কর।

(গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাসবয়ন-শিল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৪। প্রশ্নের সহিত সরবরাহকৃত পৃথিবীর মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অবস্থান, নাম ও চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশ কর:

(ক) লিভারপুল, চিকাগো, কায়রো, জিব্রালটার, করাচী ; (খ) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল, (গ) যুক্তরাজ্যের একটি ও জাপানের একটি কার্পাসবয়ন-শিল্পকেন্দ্র।

দ্বিতীয় পত্র

১। যে কোন **আটটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) ভারতের উপকূলের বিভাগগুলির নাম উল্লেখ কর ; (খ) ভারতের তিনটি অতিবর্ষণাঞ্চলের নাম কর ; (গ) ভারতের তিনটি বনজ সম্পদের নাম লিখ ; (ঘ) ভারতের তিনটি আবাদী ফসলের নাম কর ; (ঙ) দক্ষিণ-ভারতের দুইটি স্থানের নাম লিখ যেখানে রেশম উৎপাদন বেশী ; (চ) ভারতের যে সকল অঞ্চলে চুনাপাথর পাওয়া যায় তাহাদের নাম লিখ ; (ছ) ভারতের পাঁচটি মৎস্য-বন্দরের নাম কর ; (জ) ভারতের পাঁচটি তৈল-শোধনাগারের নাম লিখ ; (ঝ) ভারতের তিনটি জাহাজ-শিল্প কেন্দ্রের নাম কর ; (ঞ) ভারতের চারটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম লিখ ; (ট) ভারত কর্তৃক আমদানিকৃত পাঁচটি দ্রব্যের নাম কর ; (ঠ) ভারতে অভ্র উৎপাদন অঞ্চলের নাম লিখ।

২। যে কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :

(ক) গঙ্গা-সমভূমির ভৌগোলিক বিবরণ দাও এবং ইহাকে উপযুক্ত অঞ্চলে বিভক্ত কর ; (খ) ভারতের জলবায়ুর উপর মৌসুমীবায়ুর প্রভাব পর্যালোচনা কর ; (গ) ভারতের বনভূমিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর এবং উহাদের ব্যবহার বর্ণনা কর। (ঘ) ভারতে সীসা ও বক্সাইটের উৎপাদন, বন্টন ও ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা কর ; (ঙ) পশ্চিমবঙ্গের পাট-শিল্পের বিবরণ দাও ; (চ) ত্রিপুরা শিল্পে অনুন্নত কেন, আলোচনা কর ; (ছ) ভারতের যে সমস্ত অংশে এবং যে যে ভৌগোলিক অবস্থায় তুলা চাষ হয় তাহা বর্ণনা কর ; (জ) ভাকরা-নাঙ্গাল বহুমুখী পরিকল্পনা সম্বন্ধে কি জান? ইহার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় কোন্ কোন্ অঞ্চল উপকৃত হইয়াছে?

৩। যে কোন একটি সেচ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা কর। এই দেশে অনুসৃত বিভিন্ন সেচ-পদ্ধতিগুলি কি কি? প্রত্যেকটি পদ্ধতি যে সকল অঞ্চলে প্রচলিত আছে উহাদের নাম লিখ।

(ক) দুর্গাপুর, রাউরকেল্লা ও ভিলাইতে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প অবস্থানের কারণ সমূহ বিশ্লেষণ কর। এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর।

(খ) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ, গঠন ও গতির বিবরণ দাও এবং ইহার সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি বর্ণনা কর।

৪। প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বিতরিত ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নাম ও ইঙ্গিত দ্বারা অবস্থান উল্লেখ কর :

(ক) গৌহাটি, আমেদাবাদ, শ্রীনগর, বাঙ্গালোর, জয়পুর ; (খ) তিনটি তুলা উৎপাদক অঞ্চল ও দুইটি কফি উৎপাদক অঞ্চল (গ) তিনটি চিনি শিল্পকেন্দ্র ও পশ্চিম উপকূলের দুইটি বন্দর।

১৯৮৪

অর্থ নৈতিক ভূগোল-প্রথম পত্র

১। যে কোন পাঁচটির উত্তর দাও— ৫×৫=২৫

(ক) সম্পদ সৃষ্টির উপাদানসমূহ কি কি? (খ) ভূমধ্য-সাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলির নাম লিখ। (গ) বনভূমির উপকারিতাসমূহ কি কি? (ঘ) তিনটি বাগিচা ফসলের নাম লিখ এবং যে কোন একটির প্রধান উৎপাদক দেশ দুইটির নাম কর। (ঙ) ব্রেজিলে কফি চাষের উন্নতির প্রধান কারণগুলি কি কি? (চ) খনিজ তৈলের পাঁচটি উপজাত দ্রব্যের নাম কর। (ছ) পৃথিবীর পাঁচটি আন্তর্জাতিক সমুদ্র-পথের নাম কর। (জ) পৃথিবীর পাঁচটি তাম্র উৎপাদনকারী দেশের নাম কর। (ঝ) পৃথিবীর পাঁচটি প্রধান তুলা আমদানিকারী দেশের নাম কর।

২। যে কোন পাঁচটির উত্তর দাও:— ৫×৯=৪৫

(ক) "মানুষ পরিবেশের সৃষ্টি"। এই বিবৃতিটি ব্যাখ্যা কর।

(খ) ধান ও গম চাষের অবস্থানসমূহ তুলনা কর।

(গ) আদর্শ লোকবসতি বলিতে কি বুঝায়?

(ঘ) বাণিজ্যিক পশম উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক অবস্থা এবং বাণিজ্যিক পশম উৎপাদনকারী প্রধান অঞ্চলগুলির বর্ণনা দাও।

(ঙ) মৃত্তিকা সংরক্ষণের পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(চ) বন্দর গড়িয়া উঠিবার উপযোগী কারণসমূহ আলোচনা কর।

(ছ) পৃথিবীর সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমির অবস্থান নির্দেশ কর এবং এই সকল বনভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির বাণিজ্যিক ব্যবহার বর্ণনা কর।

(জ) অর্থনৈতিক ভূগোলের গতিশীল চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। যে কোন একটির উত্তর দাও:— ১৫

(ক) রাশিয়ার লৌহ-ইস্পাত শিল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

(খ) বাণিজ্যিক পথ হিসাবে সুয়েজখাল ও পানামাখালের তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা কি কি?

(গ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মৌলিক উপাদানসমূহ আলোচনা কর।

৪। প্রশ্নের সহিত সরবরাহকৃত পৃথিবীর মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অবস্থান, নাম ও চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশ কর:— ১৫

(ক) ওডেসা, বোস্টন, মন্ট্রিল, সিডনী, হংকং।

(খ) ক্রান্তীয় মরুভূমির দুইটি অঞ্চল।

(গ) ইউরোপের দুইটি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি লৌহ ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র।

দ্বিতীয় পত্র

১। যে কোন আটটি প্রশ্নের উত্তর দাও:— ৮×২½=২০

(ক) ভারতের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলের নাম লিখ।

(খ) ভারতের চারিটি অল্প বর্ষণাঞ্চলের নাম কর।

(গ) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন প্রধান তিনটি নদীর নাম কর।

(ঘ) ভারতের কৃষ্ণ মৃত্তিকার দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
(ঙ) ভারতে প্রধান বাণিজ্যিক ফসল কি ?
(চ) ভারতের ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদন অঞ্চলের নাম কর।
(ছ) ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প কি কি ?
(জ) ভারতের রেলইঞ্জিন নির্মাণ শিল্পকেন্দ্রের নাম দাও।
(ঝ) ভারতের পাঁচটি প্রধান আমদানি দ্রব্যের নাম লিখ।
(ঞ) উত্তর-পূর্ব ভারতের তিনটি বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম কর।
(ট) ভারতের চিরহরিৎ অরণ্যের তিন প্রকার প্রধান জাতের বৃক্ষের নাম কর।
(ঠ) ভারতের তিনটি প্রধান পশম বয়ন শিল্পকেন্দ্রের নাম কর।

২। যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও :— ৫×১০=৫০

(ক) ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাব পর্যালোচনা কর।

(খ) ভারতের জলবায়ু অঞ্চলের নাম লিখ এবং ইহাদের অবস্থান বর্ণনা কর।

(গ) ভারতের ভূমিক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা কর।

(ঘ) ভারতে কয়লার ব্যবহার ও কয়লা শিল্পের সমস্যা আলোচনা কর।

(ঙ) উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের প্রসার এত ব্যাপক কেন তাহার কারণ ব্যাখ্যা কর।

(চ) ভারতের বনভূমিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর এবং ঐগুলির ব্যবহার বর্ণনা কর।

(ছ) একদিকে বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস বয়ন শিল্পের একদেশীভবনের কারণসমূহ আলোচনা কর।

(জ) ভারতে চা ও রবার চাষের উপযোগী অবস্থা, উৎপাদন এবং প্রধান উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ বর্ণনা কর।

৩। যে কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :— ১৫

(ক) ভারতের চিনি শিল্পের অবস্থানের ধরন বিশ্লেষণ কর এবং এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর।

(খ) ভারতে লোকবসতি বণ্টনের বিবরণ দাও। ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই বণ্টন কতটা প্রভাবিত হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।

(গ) ভারতের প্রধান পরিবহণ ব্যবস্থা কি কি ? যে কোন একপ্রকারের উপর বিস্তৃত আলোচনা কর।

৪। প্রশ্নপত্রের সঙ্গে বিতরিত ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নাম ও ইঙ্গিত দ্বারা অবস্থার উল্লেখ কর : ১৫

(ক) দুর্গাপুর, কানপুর, ডিগবয়, সুরাট, মাদ্রাজ।
(খ) দুইটি চা উৎপাদক অঞ্চল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের তিনটি বিমানবন্দর।
(গ) দুইটি রেলইঞ্জিন নির্মাণকেন্দ্র এবং তিনটি কয়লাখনি অঞ্চল।

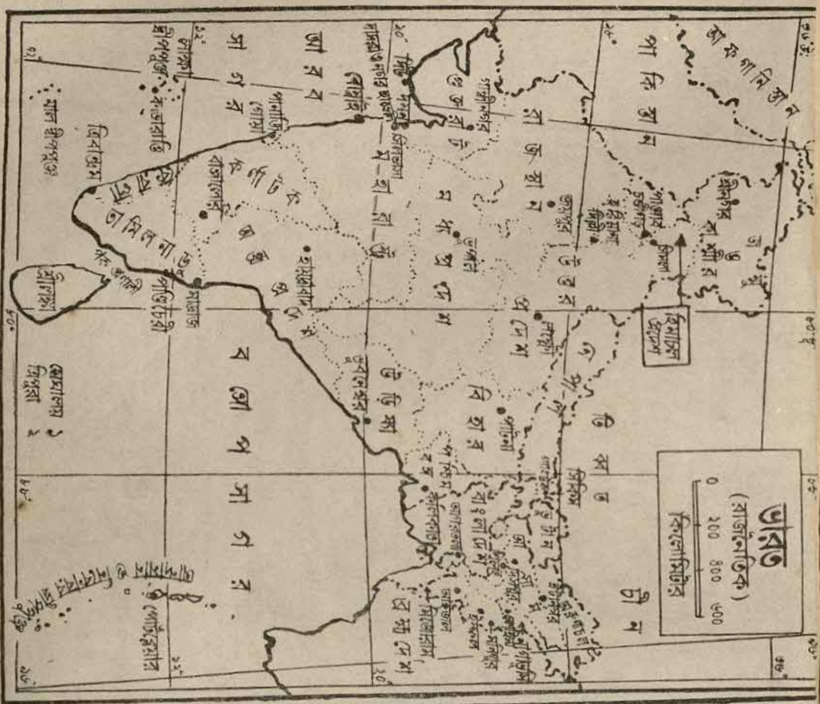

ভারত
(রাজনৈতিক)
কিলোমিটার

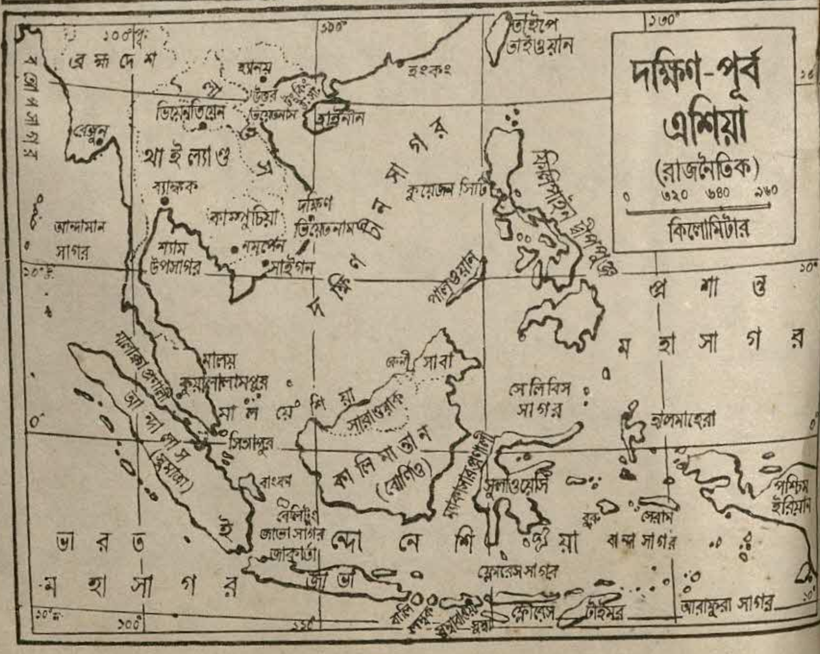

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
(রাজনৈতিক)
০ ৩২০ ৬৪০ ৯৬০
কিলোমিটার
তাইপে
তাইওয়ান
হংকং
ব্রহ্ম দেশ
রেঙ্গুন
থাই ল্যাণ্ড
ব্যাঙ্কক
আন্দামান সাগর
কাম্পুচিয়া
শ্যাম উপসাগর
নমপেন
সাইগন
দক্ষিণ ভিয়েতনাম
ভিয়েনতিয়েন
উত্তর ভিয়েতনাম
কুয়েজন সিটি
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ
পালাওয়ান
দক্ষিণ চীন সাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
মালয়
কুয়ালালামপুর
মালয়েশিয়া
সিঙ্গাপুর
সারাওয়াক
সাবা
সেলিবিস সাগর
হালমাহেরা
কালিমাস্তান (বোর্নিও)
সুলাওয়েসি
বান্দা সাগর
জাভা সাগর
জাকার্তা
জাভা
ফ্লোরেস সাগর
ফ্লোরেস
টিমর
আরাফুরা সাগর
পশ্চিম ইরিয়ান
ভারত মহাসাগর
ইন্দোনেশিয়া
বাংকা
বেলিটুং

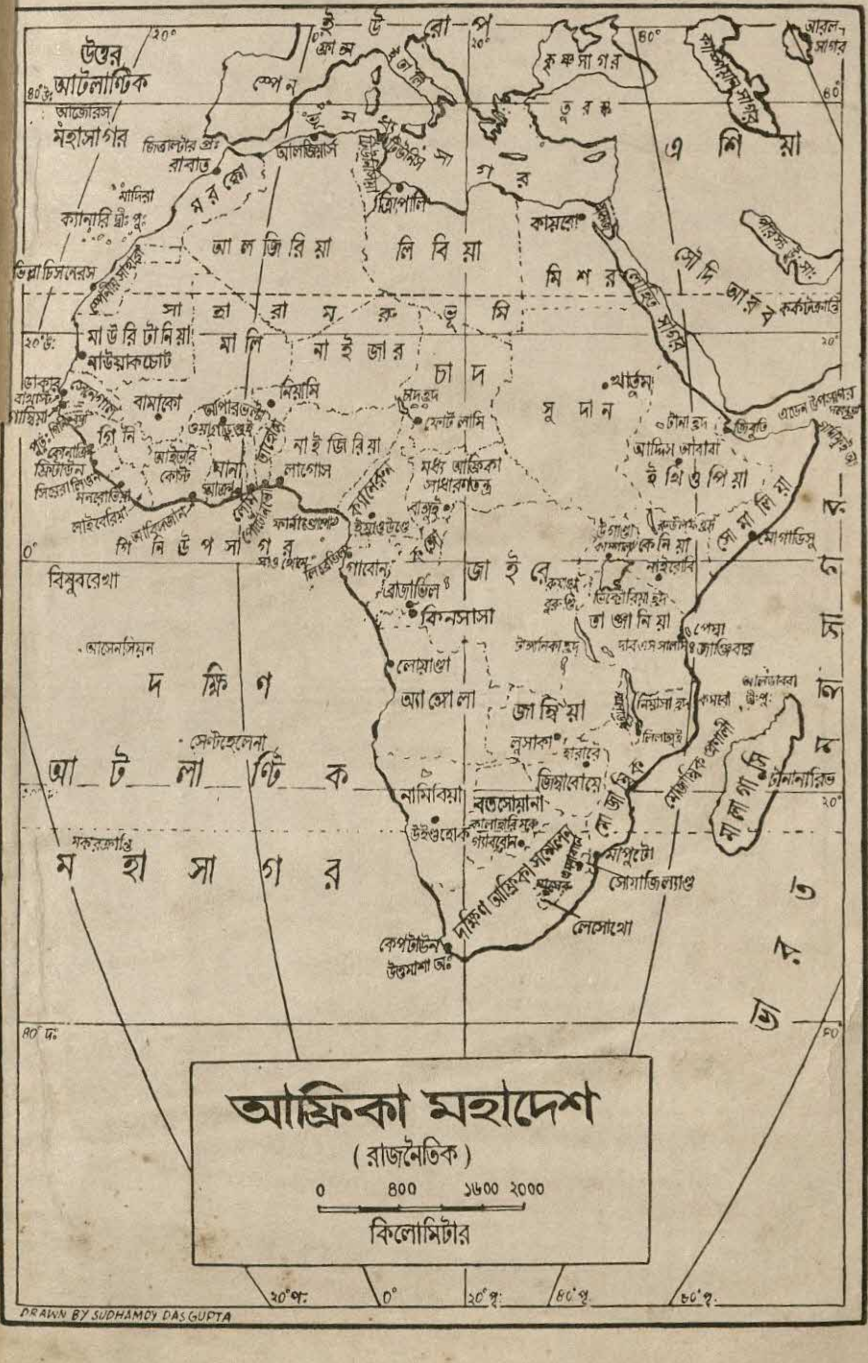

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
আজোরস
স্পেন
ফ্রান্স
ইতালি
কৃষ্ণ সাগর
তুরস্ক
এ শি য়া
আরল সাগর
আলজিয়ার্স
রাবাত
ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ
মরক্কো
আলজিরিয়া
লিবিয়া
ত্রিপোলি
কায়রো
মিশর
সৌদি আরব
লোহিত সাগর
কর্কটক্রান্তি
ভিলাচিসনেরস
সা হা রা ম রু ভূ মি
মাউরিটানিয়া
মালি
নাইজার
নাউয়াকচোট
চাদ
সুদান
খার্তুম
নিয়ামি
বামাকো
ডাকার
গিনি
নাইজিরিয়া
লাগোস
মধ্য আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র
আদ্দিস আবাবা
ইথিওপিয়া
সোমালিয়া
মোগাডিসু
লাইবেরিয়া
গিনি উপসাগর
বিষুবরেখা
গাবোন
ব্রাজাভিল
কিনসাসা
জাইরে
কেনিয়া
নাইরোবি
ভিক্টোরিয়া হ্রদ
তাঞ্জানিয়া
দারএসসালাম
জাঞ্জিবার
আসেনসিয়ন
লোয়াণ্ডা
অ্যাঙ্গোলা
জাম্বিয়া
লুসাকা
সেন্টহেলেনা
দ ক্ষি ণ আ টলা ন্টি ক ম হা সা গ র
নামিবিয়া
বতসোয়ানা
উইণ্ডহোক
মাপুটো
সোয়াজিল্যাণ্ড
লেসোথো
কেপটাউন
উত্তমাশা অন্তঃ
মালাগাসি
মকরক্রান্তি
ভা র ত ম হা সা গ র
আফ্রিকা মহাদেশ
(রাজনৈতিক)
0 ৪০০ ১৬০০ ২০০০
কিলোমিটার
DRAWN BY SUDHAMOY DASGUPTA